ছোটদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

ষান্মাসিক সূচীপত্র

অষ্টমবর্ষ—প্রথমখণ্ড

বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৭৫ মে-অক্টোবর ১৯৬৮

আগস্টের সেই দুটো দিন (সত্য ঘটনা) অতসি সেন ১৭৫

আকাশে ওড়া (বিজ্ঞানের আসর) মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ ৩৪৫

আগন্তুক (বিদেশী গল্প) লীলা মজুমদার ২২

আজব দেশে কুটুর সোনা (নাটিকা) সুবীর চট্টোপাধ্যায় ৮৭

আমাদী চাঁপার গাছ (উপন্যাস) মহাশ্বেতা দেবী ৫৬, ১০৩

আর নেই (কবিতা) আশিস সান্যাল ৪০০

আশুতোষ (নাটিকা) ধীরেন্দ্র লাল ধর ৩৮

আশ্বিনের এই আকাশ (কবিতা) উমাদেবী ৩৫০

আশ্বিনেতে (কবিতা) শ্যামাপ্রসাদ দাশ ৩৮৩

আশ্বিনের ছড়া (ছড়া) আশানন্দন চট্টরাজ ৩৮০

আসাম চা-বাগান (কবিতা) সুতারা সেন ২১৯

ইক্ষ্বাকুর জন্ম (পৌরাণিক গল্প) সবিতা দত্ত মজুমদার ১৫০

এক ঝাঁক বাবুতর (কবিতা) ঝুমুর চৌধুরী ২৩৯

এক রাজপুত্তুরের গল্প (জীবনী) মোহিত রায় ২১৫

একটি খবর (কবিতা) নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩২

একটি ঐতিহাসিক নির্দেশ (সত্য ঘটনা) মহাবীর শরণ ৪৪৯

একটি নূতন গণিতের আবিষ্কার (সত্য ঘটনা) মহাবীর শরণ ২৫৩

একটি রেড ইণ্ডিয়ান রূপকথা (গল্প) রমা পালিত ৩৫৫

এই মন জাদু জানে (কবিতা) করুণাময় বসু ৮৫

এপার ওপার (কবিতা) সুরুচি সেনগুপ্ত ২৮

কফির চোরা চালান (গল্প) কল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৩

করল পাগল (কবিতা) শৈলশেখর মিত্র ৩৩৯
কংকালীতলা (ভ্রমণ) করবী গুপ্ত ১৮০
কাক (কবিতা) রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১৩২
কাঁচা গল্প (প্রবন্ধ) ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য ৪৪৩
কাঁচের কথা (বিজ্ঞানের আসর) মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ ৫৩
কোকিল (গল্প) গৌরী ধর্মপাল (চৌধুরী) ২০১
কোনটা চাই (কবিতা) তুষার আদক ১৭০
ক্রীড়াজগৎ—অজয় হোম ৭৫, ১৩০, ১৯৯, ২৩৭, ৪৩২
খুকু (কবিতা) ঝুমুর চৌধুরী ২২৫
খ্যাঁদা প্যাঁচা (কবিতা) শিমুল রায় ১২২
গল্পগল্প ৩৫১
গণ্ডালু ও তিব্বতী গুহার ভূত (উপন্যাস) নলিনী দাশ ২৭০
গালে হাত দিয়ে ভাবছে ছেলেটি (কবিতা) সুচেতা ভট্টাচার্য ৪২৩
গোলমাল (কবিতা) রমা ভট্টাচার্য ৬
ঘেউ ঘুঁৎঘুঁৎ (কবিতা) তমাল চট্টোপাধ্যায় ৩৫৪
চটপট-প্রতিযোগিতা ৮৪
চণ্ডের মহত্ত্ব (ঐতিহাসিক গল্প) সুখরঞ্জন রায় ৩৮১
চাঙ্ (গল্প) উপেন্দ্র কিশোর রায় ২৬৩
চারা (কবিতা) অশোক ভট্টাচার্য ২১৪
চিঠিপত্র ৭৩, ১৭৮, ২৪২, ৪২৭
চোরধরা (কবিতা) মোহিনী মোহন গাঙ্গুলী ১৭১
চোরধরা (কবিতা) সুশীলকৃষ্ণ সেনগুপ্ত ৩২৬
ছড়া—উৎপল চক্রবর্তী ৩৪৯
ছড়া—কার্ত্তিক ঘোষ ৪০০
ছড়া—জ্যোতি ভূষণ চাকী ৪০৯
ছাত্র দরদী উপাচার্য (সত্য ঘটনা) অমরনাথ রায় ৩৯৩
ছুটির ছড়া (কবিতা) শৈলেন দত্ত ৪২৬
ছোট ত নই মোটে (কবিতা) শঙ্কর রায়চৌধুরী ১
ছোটদের বই (সাহিত্য-সংবাদ) লীলা মজুমদার ৭৯
ছোট পাখির ইচ্ছে (কবিতা) কার্ত্তিক ঘোষ ১০২
ছোট্ট ছেলে ও ছোট্ট মেয়ের উক্তি (ছড়া) চঞ্চল ভট্টাচার্য ৩৫৬
জান কি ? (খবর) চুনীলাল রায় ১৭৯
জৈব বিদ্যুৎ ও তার ব্যবহার (বিজ্ঞানের আসর) সুনীল সরকার ২২৫
জ্যোতিষ্ক (কবিতা) নগেন্দ্রকুমার মিত্র মজুমদার ২

জ্যান্ত ভূত (সচিত্র কবিতা) অঞ্জন সেনগুপ্ত ১৭৬
ঝলমল তারা (কবিতা) দীপকরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ৩৬
টিমি বেড়াল (গল্প) শান্তা দেবী ২০
তাল বেতালের ছড়া (ম্যাজিক) যাদুকর এ, সি, সরকার ৬২
তাঁর গল্প (গল্প) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৬৮
তুল তুল (গল্প) অমিতাভ মাইতি ৯৪
দ-এর হয়েছে জ্বর (ছোট্টদের জন্য ছোট্ট কবিতা) ঝুমুর চৌধুরী ২৬৮
দাদাকে (কবিতা) অশোক ভট্টাচার্য ৬
দুষ্টু চুনী (গল্প) বাণী রায় ৩৮৪
দূত (উপন্যাস) অজেয় রায় ৩২৭
ধাঁধা ১৪৮, ১৯৬, ২৫০, ৪৫২
নতুন বছর ৭২
নায়কের জন্ম (ঐতিহাসিক গল্প) ময়ূখ চৌধুরী ৩১৪
নীল আতঙ্ক (উপন্যাস) সত্যজিৎ রায় ৪১১
নেপোর বই (উপন্যাস) লীলা মজুমদার ৬৪, ১৪৩, ১৫৪, ২৫৭, ৩২০
পথিক (এস্তোনীয় কাহিনী) সুনীল সরকার ৪৪৭
পাথরের চোখে জল (নাটিকা) গৌরাঙ্গ সরকার ২০২
পিটারসন সাহেবের গাড়ি (গল্প) সুভাষ সেন ৪৮
পুস্তক পরিচয়—কল্যাণী কার্লেকার ১৯৮
প্যারি সহরের ২টি ম্যাজিকপ্রিয় শিশু (ম্যাজিক) যাদুকর এ, সি, সরকার ৪২৫
প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর—জীবন সর্দার ৭৭, ১৪০, ১৯৩, ২৪০, ৪২৯
প্রতিযোগিতা ৪৫৪
প্রতিযোগিতার ফলাফল ৪৫৪
প্রোফেসর শঙ্কু ও রক্ত মৎস্য রহস্য (উপন্যাস) সত্যজিৎ রায় ৭, ১১১
বনমানুষের খেল (গল্প) অম্বিকাপ্রসাদ চৌধুরী ২২০
বাঘা (গল্প) গৌরী ধর্মপাল চৌধুরী ৩৬১
বাঘ বেরোচ্ছে (কবিতা) নির্মলেন্দু গৌতম ২০৪
বাদল দিনে (কবিতা) নোটুবিহারী চট্টোপাধ্যায় ২২৬
বাপি ফিরে এলে (কবিতা) প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ৩৩৯
বাঁশ (গল্প) শান্তাদেবী ২৭৪
বিচিত্র গল্প (সত্য ঘটনা) উপেন্দ্রকিশোর রায় ২
বিলিতি নাচ (গল্প) সমীরকুমার চট্টোপাধ্যায় ২৪৪
বীর শিকারী (সচিত্র ছড়া) অঞ্জন সেনগুপ্ত ১৯
বৃষ্টি (কবিতা) প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ২১৮
ব্যাঙের নৌকা (ছোট্টদের জন্য ছোট গল্প) পুণ্যলতা চক্রবর্তী ২৬৯
ভারতীয় বাইসন (প্রবন্ধ) সলিল মিত্র ২২৫
ভাল লাগে (কবিতা) সুধীর কাব্যশ্রী ২১৩
ভালবাসেন (কবিতা) সুখলতা রাও ১৪৯
ভীম (কবিতা) সুখরঞ্জন রায় ৩৭
মরু সাগরের পুঁথি (প্রবন্ধ) অজেয় রায় ১৮৮
ময়না (ছড়া) প্রণব দাশ গুপ্ত ১৫৩
মাসের ছড়া (কবিতা) সুধীর কাব্যশ্রী ৪৭

মিছে রাগ (গল্প) সুবিনয় রায় ১২১
মুসুরিয়ার চিতা (গল্প) সৌরেন্দ্রকুমার পাল ১৬১
মুসকিল আসান (গল্প) অলোককুমার রায় ২০৫
মেঘের ঘুড়ি (কবিতা) প্রেমেন্দ্র মিত্র ৪১০
মেছো মাকড়সা (বিজ্ঞানের আসর) গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৬৮
যদি পার (কবিতা) অনুপম দত্ত ২১৪
যষ্ঠি মধু (কবিতা) প্রদীপকুমার রায় ২৬১
যেমন গুরু তেমনি শিষ্য (সত্য গল্প) নিখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৯
রাজস্থানে একরাত্রি (গল্প) শ্যামল ঘোষ ৪০১
রাজার কাজ (গল্প) অনুপম দত্ত ৪৫৫
রেলগাড়ি (ছোট্টদের জন্য ছোট্ট কবিতা) পরিমল ভট্টাচার্য ২৬৮
লালু আর নীলু (ছোট্টদের জন্য ছোট্ট গল্প) পুণ্যলতা চক্রবর্তী ৩৯
লালুর স্বপ্ন (গল্প) শিবানী রায় চৌধুরী ৩৯৪
লিয়রের ছড়া (অনুবাদ) সত্যজিৎ রায় ৩৫৭
শরতে (কবিতা) গোবিন্দ প্রসাদ বসু ৪২৬
শরতের ছড়া (কবিতা) অতীন মজুমদার ৪৫১
শরতের মায়া (কবিতা) করুণাময় বসু ৪২৪
শরৎ চন্দ্র (জীবন নাট্য) ধীরেন্দ্র লাল ধর ৩৬৬
শটকের সন্দেশ (কবিতা) সুবীর চট্টোপাধ্যায় ২২২
শিউলি সকাল (কবিতা) প্রশান্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় ৪৫১
শুক শারী (গল্প) সুরুচি সেনগুপ্ত ৩৪০
শ্যামাপ্রসাদ (কবিতা) তমাল চট্টোপাধ্যায় ১৬০
শ্রাবণে (কবিতা) আশা দেবী ২৪৩
শ্রাবণে (কবিতা) তমাল চট্টোপাধ্যায় ২২৪
সহস্রবুদ্ধের গুহা (প্রবন্ধ) অজেয় রায় ১৩৩
সন তের শ' পঁচাত্তরের ছড়া (ছড়া) আশানন্দন চট্টরাজ ৫২
সমুদ্রের তলায় (বিজ্ঞানের আসর) চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ১০৯
সিনেমার কথা (প্রবন্ধ) সত্যজিৎ রায় ৮১,৩৬২
সিঁড়ি (কবিতা) অশোক ভট্টাচার্য ৩১৩
সুখী আর দুঃখী (ছোট্টদের জন্য ছো[illegible] পুণ্যলতা চক্রবর্তী ১৫৯
সেই যাদুকর (কবিতা) নির্মলেন্দু গৌতম ৩১৮
সেরা আশ্রয় (কবিতা) অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায় ১৭৭
সেয়ানা ছেলে (গল্প) শৈলেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ২১০
স্নোমানের ট্রয় আবিষ্কার (প্রবন্ধ) অজেয় রায় ৩৩
স্নেক গুল (কবিতা) চম্পক দাশ ১৩৯
হরিণেরা খেলা করে (কবিতা) সুবীর চট্টোপাধ্যায় ৩৪৪
হাওয়ার ঘুমপাড়ানী ছড়া (কবিতা) বিদ্যুৎ মৈত্র ১০১
হাত পাকাবার আসর ১২৩, ১৮২, ২২৭, ৪৩৪
হাত বাড়ালেই (কবিতা) নির্মলেন্দু গৌতম ৩০
হাতি চড়া মেজাজ (গল্প) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৪৭৮
হিসাবী (কবিতা) বীণা গোস্বামী ৯৩
হেলিকপটার (সচিত্র কবিতা) ঝুমুর চৌধুরী ২৭

ভূতের রাজার বর পেয়ে গুপী ও বাঘা মনের আনন্দে ভোজ করে।

বর্ষ—প্রথম সংখ্যা   বৈশাখ ১৩৭৫/মে ১৯৬৮

ছোট তো নই মোটে

শঙ্কর রায় চৌধুরী

হইনি হয়ত বাবার মতন বড়,
(তা হলেও) আমায় যদি ছোটর মধ্যে ধর,
ভীষণ রকম রেগে কিন্তু যাব,
কাঁচা একদম চিবিয়ে বলছি খাব !
বাড়ির পাশের ইস্কুলেতে দেখনা কি পড়ি,
শক্ত যত অঙ্ক সবই আঙুল গুনে করি।
এখন আমি স্নানটা সারি নিজে,
ভাল লাগে ঝাল খেতে রোজ কি যে।
ছোট্ট সীমুর হাতটি ধরে নিত্য মাঠে যাই,
কাবুল ওয়ালা বিস্কু ওয়ালা সবই তো দেখাই,
কুকুর টুকুর গাড়ি গরু যারাই তখন আসে,
ঝক্কি নিয়ে সামলে তারে রাখি নিজের পাশে।
রাত্তিরে আর ভয় করি না মোটে,
এখনো ছোট্ট আছি এই কথা কি ওঠে ?
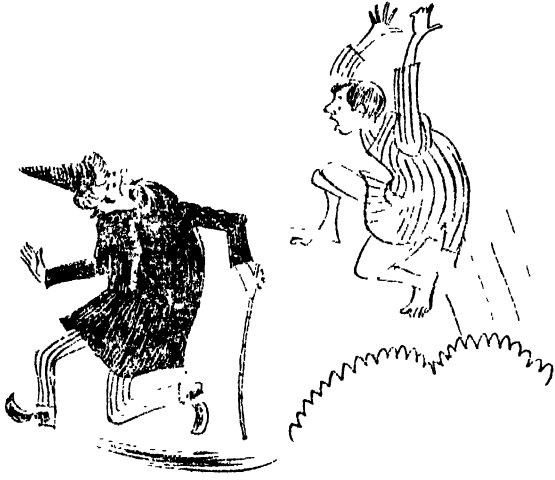
বিচিত্র গল্প

উপেন্দ্রকিশোর রায়

যদুর স্বভাবটা চিরদিনই একটু পাগলাটে ধরনের ছিল। আর সে যে ক্লাসে পড়ত, সে ক্লাসের মাষ্টার মশায়ের মেজাজটা ছিল তার চেয়েও আর একটু পাগলাটে আর বেজায় রগচটা।

এর মধ্যে একদিন খবর এসেছে যে একজন ভারি বড় লোক ইস্কুল দেখতে আসবেন। মাষ্টার মশাইরা তাই সেদিন সকলেই সেজেগুজে এসেছেন আর যতদূর সম্ভব গম্ভীর দেখাতে চেষ্টা করছেন। তাঁদের সকলের মাথায়ই টুপি, খালি সেই পাগলাটে মাষ্টার মশায়ের মাথায় ভারি মজার ধরনের একটা পাগড়ী। সেটার রং লাল আর গড়নটা ঠিক যেন মন্দিরের চূড়োর মত। মাষ্টার মশাই আবার সেটাকে পিছনবাগে হেলিয়ে পরেছেন। কাজেই তাঁর চেহারাটি অবিকল কাঠঠোকরার মত হয়েছে। যদুর কি দুর্মতি, সে আবার গিয়েছে সেই কথাটা পাশের ছেলেটির কানে কানে বলতে।

যেই বলা, অমনি সেই ছেলেটি ছুটে গিয়ে মাষ্টার মশাইকে বলেছে,—'শুনেছেন স্যর যদু রায় আপনাকে কাঠঠোকরা বলেছে।'

আগেই বলেছি যে মাষ্টারটি ছিলেন বড় রাগী। তিনি সেই ছেলের কথা শুনেই ইস্কুলের ঘর কাঁপিয়ে গর্জন করে উঠলেন—'হু ইজ যদু রায়?' কে যদু রায়?'

সেই গর্জন শুনে কি আর যদু সেখানে দাঁড়ায়?

সে বেগতিক বুঝে তখনই বাড়ির পানে ছুট দিয়েছে। এদিকে মাষ্টার মশাই দুই চোখ লাল করে বিশাল বেত হাতে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন আর বলছেন 'কে যদু রায়?' ছেলেদের একজন বলল—'স্যর, যদু রায় মুন্সী মহাশয়ের ভাই।'

অমনি মাষ্টার মশাই—'কে যদু রায়? কে যদু রায়? কে যদু রায়?' করে বেত হাতে মুন্সী মশায়ের বাড়ির দিকে ছুটলেন।

যদুনাথ ইস্কুল থেকে পালিয়ে ভেবেছিল এখন আর ভয় নেই। তাই সে ধীরে সুস্থে বেশ

নিশ্চিন্ত ভাবেই চলছিল। এমন সময় মোড়ের আড়াল থেকে মাষ্টার মশাইয়ের সেই ভীষণ গর্জন তার কানে এসে পৌছল। তখন তাড়াতাড়ি নর্দমা পার হয়ে একটা ঝোপের ভিতর লুকানো ছাড়া আর কি করা যেতে পারে? তাতে কিন্তু বিপদ বেড়েই গেল, এখন ত মাষ্টার মশাই সটান গিয়ে মুন্সী মশাইর বাড়িতে উপস্থিত হবেন, আর তাহলে ডবল মার খেতে হবে,—মাষ্টার মশায়ের হাতে আর বাড়ির লোকদের হাতে। তার চেয়ে এখানেই এর শেষ হয়ে হওয়া ভাল ছিল।

এত কথা যে যদু ভেবেছিল, আমি তা বলছি না, কিন্তু মাষ্টার মশাই সেখানে আসতেই সে তাঁর সামনে উপস্থিত হয়েছিল, এ কথা ঠিক। তবে সেই উপস্থিত হওয়াটা ছিল একটু অদ্ভুত রকমের। যদু তোমার আমার মত হেঁটে গিয়ে শান্ত ভাবে তাঁর কাছে দাঁড়ায় নি।

সে বিষম পাগলাটে আর বেজায় ষণ্ডা ছিল। মাষ্টার মশাই যেই সেখানে এসে বলেছেন 'কে যদু রায়?'

অমনি যদু 'আমি যদু রায়,' বলে দিয়েছে সেই ঝোপের ভিতর থেকে এক লাফ আর পড়েছে ঠিক তাঁর সামনে। এত বড় লাফ দিতে আর মাষ্টার মশাই তাঁর জন্মে কোন মানুষকে দেখেন নি। আর সেই জায়গাটিও ছিল একটু জংলাটে গোছের। যদুকে তখন তিনি, বাঘ না ভূত, কি ভেবেছিলেন, তা ঠিক বলতে পারি না, কিন্তু তিনি তাকে লাফিয়ে পড়তে দেখে বেত ফেলে 'মাগো' বলে যে সেখান থেকে ছুট দিয়েছিলেন, তেমন ছুট নিতান্ত বাঘের ভয়ে ছাড়া খুব কম লোকেই দিতে পারে!

॥ ২ ॥

আকাশে চাঁদ উঠেছে আর ছোট ছোট মেঘ ভেসে চলছে। কয়েকটি ছেলে খেলা করছিল, তাদের একজন বলল, 'ঐ দেখ, চাঁদটা কেমন ছুটে চলেছে।' তাই দেখে অন্য সকলে বলল, 'তাইত, চাঁদটা অমন ছুটেছে কেন?'

তাদের মধ্যে একটি আট বছরের ছেলে ছিল, সে কিন্তু বিশ্বাস করল না যে চাঁদ ছুটছে। সে তার সঙ্গীদের ডেকে একটা গাছের তলায় নিয়ে বলল—'এই গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে দেখ ত চাঁদ ছুটছে না আর কিছু ছুটছে?'

তখন সকলেই দেখল চাঁদ ছুটছে না, মেঘগুলোই ছুটছে। ছোট ছেলেটি জানত যে একটা স্থির জিনিসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে চাঁদ না মেঘ কোনটা ছুটছে।

গাছের পাতা স্থির, তাই সে সকলকে গাছের পাতার ভিতর দিয়ে তাকাতে বলেছিল।

এই ছেলেটি বড় হয়ে শেষে পিয়ারে গ্যাসেণ্ডী নামে মস্ত জ্যোতিবিদ হয়েছিল।

॥ ৩ ॥

পূজোর সময় ছেলেদের সকলের জন্যই সুন্দর সুন্দর জুতো এসেছে। নরেশের জুতো এসেছে বাদামী রঙের। সুরেশের জুতো এসেছে কালো।

সুরেশ বলল—'নরেশ-দাদা তোমার জুতো কি-করে সাদা হল?' নরেশ তামাসা করে বলল—'তাও জানো না, আমার জুতো দুধে সিদ্ধ করেছিলাম, তাতেই সাদা হয়েছে।'

সুরেশ কি যেন ভাবল, কিন্তু কিছু বলল না। পরদিন সকালে ঠাকুর যেই দুধের কড়া থেকে দুধ ঢালতে গেছে, অমনি ধপাস ধপাস করে দুখানি ছোট ছোট কালো জুতো দুধের সঙ্গে বাটিতে পড়ল!

সকলেই ভারি আশ্চর্য হয়ে গেছে, দুধের ভিতর কি করে জুতো এল, কেউ কিছু বুঝতে পারছে না!

সুরেশ তাই শুনে ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসে বলল—'দেখি, দেখি! আমার জুতো সাদা হয়েছে কিনা?'

॥ ৪ ॥

চিনাখালী ইস্কুলের মাষ্টার—রায়মশাই বড় কড়া লোক ছিলেন। ছেলেরা তাঁর ভয়ে অস্থির থাকত, আর ভাবত কখন জানি তাঁর ঐ লকলকে বেতখানি সপাং করে কার ঘাড়ে এসে পড়ে।

এর মধ্যে একদিন চিনাখালীর দেওয়ানজী ইস্কুল দেখতে এসেছেন, আর রায়মশাই শশব্যস্ত হয়ে তাঁকে ক্লাসে ক্লাসে নিয়ে দেখাচ্ছেন। দেওয়ানজীমশাই ক্লাস দেখছেন, কাউকে কিছু বলেন নি।

তারপর আরেক ক্লাসে এসে মতে বলে একটি পাতলা ছিপছিপে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেছেন:—'শশী' মানে কি?'

সে ছেলেটি ছিল দুরন্তপনার সর্দার কিন্তু পড়াশোনায় আস্ত গাধা। সে তখন আনমনে কিসের কথা ভাবছিল, দেওয়ানজীর কথায় থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল—'আজ্ঞে, তিনি আমার মেসোমশাই হন।' সে কথা শেষ হতে না হতেই 'সাঁই' করে একটা শব্দ হল। কিন্তু মতে তার আগেই, রায় মশায়ের হাত উঠতে দেখেই বন্দুকের গুলির মতন ছুটে পালিয়েছিল। রায় মশায়ের বেতখানা 'সাঁই' করে এসে, তাকে না পেয়ে 'চটাস' করে পড়ল দেওয়ানজীর জালার মতন বিশাল ভুঁড়িটিতে! ছেলেরা তা দেখে হাসবার কথা ভুলে গেল, রায়মশায়ের মুখ হাঁ হয়ে গেল, চোখ কপালে উঠল!

দেওয়ানজী মশায়ের কথা আর কি বলব ? বেচারা চটতেও পারছেন না কাঁদতেও পারছেন না, জ্বালায় টিকতেও পারছেন না, লজ্জায় হাত বুলোতেও পারছেন না ! গম্ভীর হয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

॥ ৫ ॥

একটা উঁচু স্তম্ভ বেঁকে গেছে, তাকে আবার সোজা করবার জন্য সকলে মিলে তাতে দড়ি বেঁধে টানছে। কিন্তু কিছুতেই তাকে সোজা করতে পারছে না। চারিদিকে অনেক লোক দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছে আর খালি বলছে 'এটা কর'—'ওটা কর'—'এইখানটায় বাঁধ'—'এমনি করে টান' ! তাতে আরো কাজের গোল লেগে যাচ্ছে। তখন এই হুকুম হল যে, যে আবার কথা বলবে, তার মাথা কাটা যাবে।

তা শুনে সকলেই চুপ করল, কিন্তু স্তম্ভ তবু সোজা হয় না। কি করলে যে সোজা হবে, সে কথা কেউ জানে না, জানে খালি একজন লোক। সে বেচারা প্রাণের ভয়ে চুপ করে আছে। কিন্তু তার মনটা সেই কথাটুকু বলবার জন্য ছটফট করছে।

খানিক বাদে, সে আর থাকতে না পেরে, বলে ফেলল 'দড়িটা ভিজিয়ে দাও' !

দড়ি ভেজালে একটু খাটো হবে। সেই খাটো হওয়ার টান মানুষের টানের চেয়ে অনেক বেশি, সে টানে স্তম্ভকে সোজা করে দেবে।

কাজেও তাই হল। শত শত লোকের প্রাণপণ চেষ্টায় যে কাজ হচ্ছিল না, ভিজান দড়ির টানে দেখতে দেখতে তা হয়ে গেল। সেই লোকটির তখন খুব প্রশংসা হল। তার মাথা কাটবার কথা আর কেউ বলল না !

॥ ৬ ॥

ভটচাযি্যি মশাই ঘরে বসে ন্যায়-শাস্ত্রের কথা ভাবছেন, তাঁর ব্রাহ্মণী একটা দরকারী কাজে অন্য ঘরে গিয়েছেন উনানে ডালের হাঁড়ি চড়ানো রয়েছে।

এমন সময়ে হঠাৎ সেই জল উথলে উঠল, আর তাই দেখে ভটচাযি্যি মশায়ের প্রাণ উবে গেল ! তিনি ন্যায়শাস্ত্রে ভয়ঙ্কর পণ্ডিত বটে, কিন্তু রান্নাবান্নার কথা কিচ্ছু জানেন না, আর জলের এমনতর পাগলামি আর জন্মেও কখনও দেখেননি। তিনি খালি পাগলের মতন ছুটে বেড়াচ্ছেন আর বলছেন— 'হায়, হায় ! কি হবে ?'

ততক্ষণে ব্রাহ্মণী ঘরে এসে জলে খানিকটা তেল ঢেলে দিয়েছেন আর অমনি তার রাগ থেমে সে চুপ হয়ে গেছে।

ভটচাযি্যি মশাই সেই আশ্চর্য ব্যাপার দেখে জোড়হাতে ব্রাহ্মণীর স্তব করতে করতে বললেন— 'তেল ঢেলে প্রলয় থামিয়ে দিলে ! বল তুমি কোন দেবতা !'

বাস্তবিক, খ্যাপা জলকে শান্ত করার ক্ষমতা তেলের খুব আছে। শোনা যায়, সমুদ্রে তেল ঢেলে অনেক জাহাজ নাকি ঝড়ের হাত থেকে বেঁচেছে।

গোলমাল

রমা ভট্টাচার্য

গোলমাল গোলমাল গোলমাল
এইখানে
জগৎটা বেসামাল গোলমাল
সেইখানে ॥
ট্রাম বাস ঘড়ঘড় মোটরের সরসর
মোটা লোক তড়বড়
গোলমাল সেইখানে ॥
রিক্সার ঠনঠন স্কুটারের শোঁশোঁ।
খুকীদের হিহিহিহি খোকাদের হোহো
ফেরীঅলা হাঁকডাক বুড়োদের খাক খাক
যুবকের হাঁকপাঁক
গোলমাল সেইখানে ॥
বাড়িঅলা খিটমিটু ভাড়াটের গোঁ গাঁ
বাজারের গলাবাজি চাকরটা ভোঁ ভাঁ
কর্তার চিৎকার গিন্নীর শীৎকার
'এইবার জিৎ কার'
গোলমাল সেইখানে ॥
মনে মনে খুঁতখুঁত আবদারী কান্না
আরো আরো চাই চাই আহ্লাদী বায়না
পালোয়ানি সর্দ্দারি চিরকেলে জোরদারি
পরধনে পোদ্দারি
গোলমাল সেইখানে ॥

দাদাকে

অশোক ভট্টাচার্য

তুমিই যদি হতে
আমার মতো এমন ভীতু, রাতে
বাজি ধরে পারতে যেতে ছাতে একা ?
কতখানি সাহস যেত দেখা !
তুলসীতলায় শাঁখ বাজাতে গিয়ে
গাটা যদি উঠতো শিরশিরিয়ে—
'গাছে'
বলতে পারতে 'কিছুই-নেই আছে।'
আলো না নিয়ে একলা গেলে ঘরে
ছায়া ছায়া কারা যে নড়েচড়ে ;
'ওতে
ইঁদুর আছে' বলতে পারতে, তুমিই যদি হতে ?
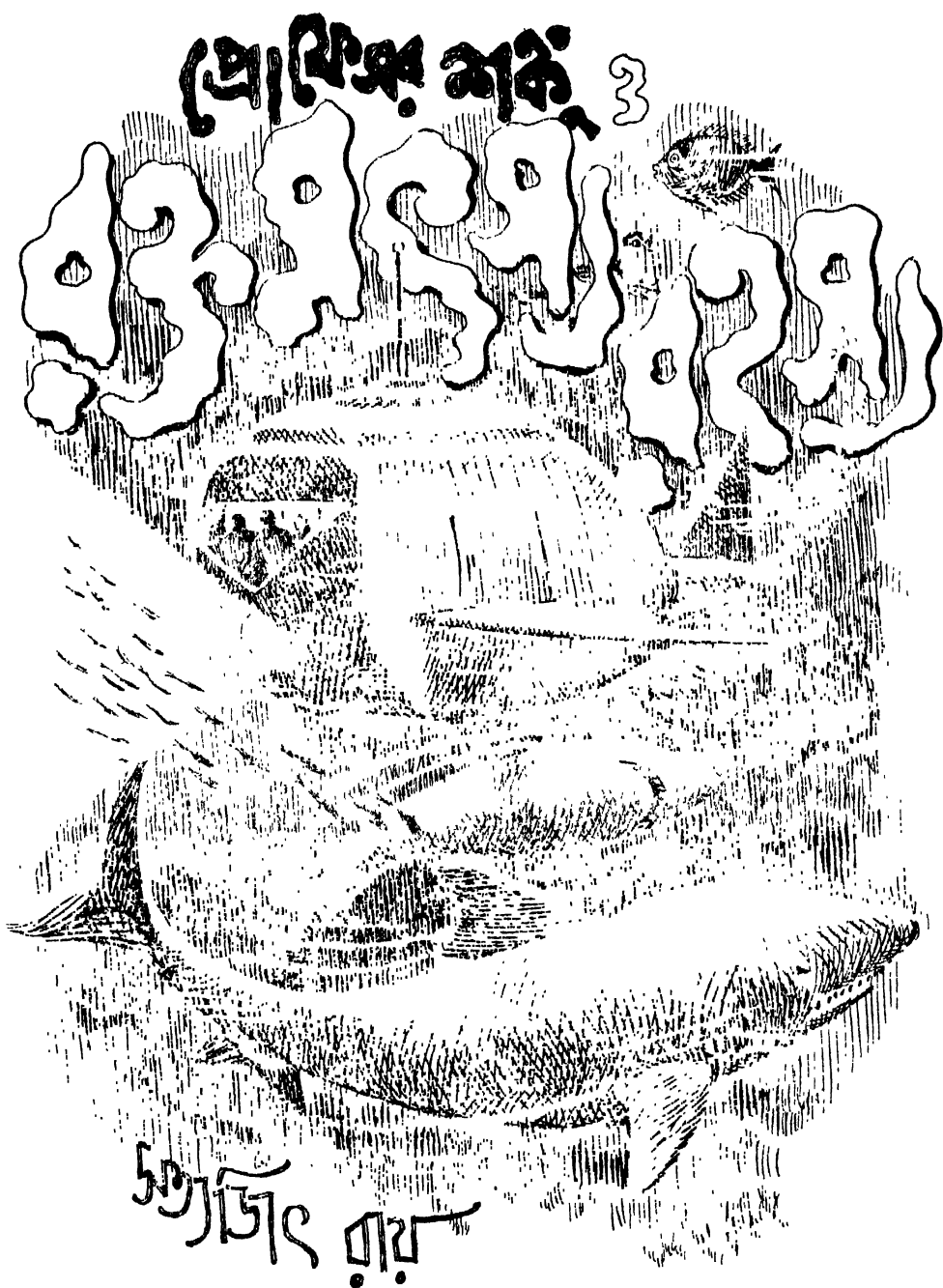
১৩ই জানুয়ারি

গত কদিনে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি, তাই আর ডায়রি লিখিনি। আজ একটা স্মরণীয় দিন, কারণ আজ আমার লিঙ্গুয়াগ্রাফ যন্ত্রটা তৈরি করা শেষ হয়েছে। এ যন্ত্রে যে কোন ভাষার কথা রেকর্ড

হয়ে গিয়ে তিন মিনিটের মধ্যে তার বাংলা অনুবাদ ছাপা হয়ে বেরিয়ে আসে। জানোয়ারের ভাষার কোন মানে আছে কিনা সেটা জানার একটা বিশেষ আগ্রহ ছিল। আজ আমার বেড়াল নিউটনের তিন রকম ম্যাও রেকর্ড করে তার তিন রকম মানে পেলাম। একটায় বলছে 'দুধ চাই', একটায় 'মাছ চাই' আর একটায় 'ইঁদুর চাই'। বেড়ালরা কি তাহলে খিদে না পেলে ডাকে না? আরো দু একরকম ম্যাও রেকর্ড না করে সেটা বোঝার কোন উপায় নেই।

মাছ বলতে মনে পড়ল—আজ খবরের কাগজে (মাত্র একটা বাংলা কাগজে) একটা খবর বেরিয়েছে, সেটার সত্যি মিথ্যে জানি না, কিন্তু সেটা যদি বানানোও হয়, তাহলে যে বানিয়েছে তার কল্পনাশক্তির প্রশংসা করতে হয়। খবরটা এখানে তুলে দিচ্ছি—

'গোপালপুর, ১০ জানুয়ারি। গোপালপুরের সমুদ্রতটে একটি আশ্চর্য ঘটনা স্থানীয় সংবাদদাতার একটি বিবরণে প্রকাশ পাইয়াছে। উক্ত বিবরণে বলা হইয়াছে যে গতকল্য সকালে নুলিয়া শ্রেণীর কতিপয় ধীবর জাল ফেলিয়া সমুদ্র হইতে মাছ ধরিয়া সেই জাল ডাঙ্গায় ফেলিবামাত্র উহা হইতে বিশ পঁচিশটি রক্তাভ মৎস্য লাফাইতে লাফাইতে পুনরায় সমুদ্রের জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া জলমধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়। নুলিয়াদের কেহই নাকি এই মৎস্যের জাত নির্ণয় করিতে পারে নাই, এবং জালবদ্ধ মৎস্যের এ হেন ব্যবহার নাকি তাহাদের অভিজ্ঞতায় এই প্রথম।'

আমার প্রতিবেশী অবিনাশবাবু খবরটা পড়ে বললেন, 'এ ত সবে শুরু। এবার দেখবেন জল থেকে মাছ ড্যাঙ্গায় ছিপ ফেলে মানুষ ধরে ধরে ফ্রাই করে খাচ্ছে। জলচর, স্থলচর আর ব্যোমচর—এই তিন শ্রেণীর জীবের উপরেই মানুষ যে অত্যাচার এতদিন চালিয়ে এসেছে। একদিন না একদিন যে তার ফলভোগ করতে হবে তাতে আর আশ্চর্য কী? আমি ত মশাই অনেকদিন থেকেই নিরামিষ ধরার কথা ভাবছি।'

এই শেষের কথাটা অবিশ্যি ডাঁহা মিথ্যে, কারণ, আর কিছু না হোক্—অন্ততঃ ইলিশমাছ ভাজার গন্ধ পেলে যে অবিনাশবাবু আর নিউটনের মধ্যে কোন তফাত থাকে না সেটা আমি নিজের চোখে বহুবার দেখেছি। তা, অবিনাশবাবু একটু আধটু বাড়িয়ে বলেই থাকেন, তাই আমি আর কিছু বললাম না।

আজ ঠাণ্ডাটা বেশ ভালো ভাবেই পড়েছে। এটাও একটা ঘটনা। আমার ল্যাবেরেটরির থার্মো-মিটারে সকালে দেখি ৪২০ ডিগ্রী (ফাঃ)। গিরিডিতে বহুকাল এ রকম ঠাণ্ডা পড়েনি। আমার 'এয়ার কণ্ডিশনিং পিল'-টা কাজ দিচ্ছে ভাল। সার্টের বুক পকেটে একটা বড়ি রেখে দিই, আর তার ফলে গরম জামার কোন প্রয়োজনই হয় না।

১৬ই জানুয়ারি

আজকের স্টেট্‌সম্যানের প্রথম পাতার একটা খবরের বাংলা করে দিচ্ছি।—

'ওয়ালটেয়ার, ১৪ই জানুয়ারি। স্থানীয় একটা খবরে প্রকাশ যে গতকাল সকালে একটি সুইডিশ বা সুইজীয় যুবক সমুদ্রে স্নানরত অবস্থায় একটি মাছের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করে। লার্স কর্ণস্টাট নামক ২৮ বর্ষীয় এই যুবক তারই এক মাদ্রাজী বন্ধু পরমেশ্বরের সঙ্গে জলে নেমেছিল। এক সময়ে ভারতীয় যুবক তার বন্ধুর গলায় এক আর্তনাদ শুনে তার দিকে ফিরে দেখে একটি বিঘতপ্রমাণ লাল রঙের মাছ কর্ণস্টাটের গলায় কামড়ে ধরে ঝুলে আছে। পরমেশ্বর তার বন্ধুটির কাছে পৌঁছানোর আগেই মাছটি জলে লাফিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়, আর তার পরমুহূর্তেই কর্ণস্টাটও অজ্ঞান হয়ে পড়ে। শুকনো বালির উপর কর্ণস্টাটকে এনে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু হয়। এই ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ তদন্ত করছে। আপাতত ওয়ালটেয়ারের সমুদ্রে স্নান নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।'

প্রথমে গোপালপুর, তারপর ওয়ালটেয়ার। দুটো মাছ একই জাতের বলে মনে হয়। হয় দুটো খবরকেই মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে হয়, না হয় দুটোকেই বিশ্বাস করতে হয়।

আজ সারাদিন ধরে মাছ সম্বন্ধে পড়াশুনা করেছি। যতই পড়ছি ততই ঘটনাদুটির অস্বাভাবিকত্ব বুঝতে পারছি। সকালে খবরটা পড়ে বৈঠকখানায় বসে বসে ভাবছি এই সুযোগে গোপালপুরটা একবার ঘুরে এলে মন্দ হত না, এমন সময় অবিনাশবাবু লাফাতে লাফাতে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উত্তেজিত ভাবে তার হাতের কাগজটা আমার নাকের সামনে নাড়তে নাড়তে বললেন, 'পড়েছেন মশাই, পড়েছেন? কি রকম বলেছিলাম? অলরেডি শুরু হয়ে গিয়েছে মানুষের বিরুদ্ধে অভিযান!'

আমি বললাম, 'তাহলে বলব অভিযানটা আমার বিরুদ্ধে নয়—আপনার বিরুদ্ধে। কারণ আমি বরতে মাছ মাংস খাইনা, আর আপনার দুবেলা পাঁচটুকরো করে মাছ না হলে চলে না।'

অবিনাশবাবু ধপ্‌ করে সোফায় বসে পড়ে কাগজটা পাশে ফেলে দিয়ে বললেন, 'যা বলেছেন মশাই—মাছ ছাড়া মানুষে কী করে বাঁচে জানিনা।'

আমি এ কথায় কোন মন্তব্য না করে বললাম, 'সমুদ্র দেখেছেন?'

অবিনাশবাবু তাঁর কম্ফর্টারটা আরো ভালো করে গলায় জড়িয়ে নিয়ে বললেন, 'হুঁ! সমুদ্র না

হাতি! পুরীটা পর্যন্ত যাবো যাবো করে যাওয়া হলনা। আসলে কী জানেন—সমুদ্রের মাছটা আবার আমার ঠিক রোচেনা, আর ওসব জায়গায় শুনিচি খালি ওই খেতে হয়।'

আমার গোপালপুর যাবার প্ল্যান শুনে ভদ্রলোক একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'ঝুলে পড়ব নাকি আপনার সঙ্গে? ষাটের উপর বয়স হল—সমুদ্র দেখলুম না, মরুভূমি দেখলুম না, খাণ্ডলি পাহাড় ছাড়া পাহাড় দেখলুম না—শেষটায় মরবার সময় আপশোষ করতে হবে নাকি?'

আমি নিজে গোপালপুর যাওয়া মোটামুটি স্থির করে ফেলেছি। এই অদ্ভুত মাছের সন্ধান না পেলেও, নিরিবিলিতে আমার লেখার কাজকর্মগুলো খানিকটা এগিয়ে যাবে, আর চেঞ্জও হবে ভালোই।

২১শে জানুয়ারি

দুদিন হল গোপালপুর এসে পৌঁছেছি। শেষ পর্যন্ত অবিনাশবাবু আমার সঙ্গ নিলেন। তবে আমি হোটেলে, আর উনি একজন স্থানীয় বাঙালীর বাড়িতে পেইং গেস্ট হয়ে আছেন। পিটপিটে লোক বলেই এই ব্যবস্থা। বললেন, 'ওসব বিলিতি হোটেলে কখন যে কী বলে কিসের মাংস খাইয়ে দেয়! তার চেয়ে পয়সা দিয়ে হিঁদুর বাড়িতে থাকা ভালো।'

আমার চাকর প্রহ্লাদকে রেখে এসেছি; তবে নিউটনকে সঙ্গে এনেছি। ও এসেই সমুদ্রতটের কাঁকড়াদের নিয়ে ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

এখনো পর্যন্ত রক্তমাছের কোন হদিস পাইনি। এখানে ভদ্রলোকদের মধ্যে কেউই ও মাছ দেখেনি। যে নুলিয়াদের জালে মাছগুলো ধরা পড়েছিল, তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা ত বলে এরকম ঘটনা তাদের চোদ্দপুরুষের জীবনে কখনো ঘটেনি। জালটা টানার সময় সেটা জলে থাকতেই তারা মাছের আশ্চর্য লাল রঙ দেখে বুঝেছিল একটা কোন নতুন জাতের মাছ ধরা পড়েছে। ডাঙ্গায় তুলে জালটা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই নাকি অন্য সব মাছের ভীড়ের মধ্যে থেকে লাল মাছগুলো সব একসঙ্গে লাফিয়ে উঠে লাফাতে লাফাতে সমুদ্রের জলে গিয়ে পড়ে। লাফটা নাকি অনেকটা ব্যাঙের মত, আর সেটা লেজের উপর ভর করে একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে। এটাও অনেক নুলিয়া লক্ষ্য করেছিল যে মাছের লেজটা নাকি দুভাগ হয়ে দুটো পায়ের মতো হয়ে গেছে।

অন্তত একজনও ক্যামেরাওয়ালা লোক যদি ওই ঘটনার সময় কাছাকাছি থাকত! আমি নিজে ক্যামেরা এনেছি, আর আরো কিছু কাজে লাগার মতো যন্ত্রপাতি এনেছি। সে সব ব্যবহার করার সুযোগ আসবে কিনা জানিনা। আমার মেয়াদ হল সাতদিন; যা হবার এর মধ্যেই হতে হবে।

কাল হোটেলে এক জাপানী ভদ্রলোক এসেছেন। ডাইনিং রুমে আলাপ হল। নাম হামাকুরা। ভাঙা ভাঙা ইংরিজি বলেন—বেশ কষ্ট করে তার মানে বুঝতে হয়। ভাগ্যিস আমার লিঙ্গুয়াগ্রাফটা সঙ্গে এনেছিলাম। এতে দুটো কাজ হয়েছে—ভদ্রলোকের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে কথা বলা সম্ভব হচ্ছে, আর উনিও আমার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা সম্পর্কে বেশ ভালো ভাবেই জেনে ফেলেছেন। উনি নিজে যে কী কাজ করেন সেটা এখনো ঠিক বুঝতে পারিনি। আমি এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে উনি ঘুরিয়ে পালটা প্রশ্ন করেন। এতো

লুকোবার কী আছে জানিনা। কাল বিকেল বেলা উনিও আমারই মত সমুদ্রের ধারে পায়চারি করতে বেরিয়েছিলেন। প্রায়ই দেখছিলাম উনি হাঁটা থামিয়ে একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে চেয়ে আছেন। জাপানে শুনেছি মুক্তার ব্যবসা আছে, আর জাপানী মুক্তার খ্যাতি আছে। উনি কি সেই ধান্দাতেই এলেন নাকি?

২৩শে জানুয়ারি

পরশু রাত থেকেই নানারকম ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে।

জাপানী ভদ্রলোকটি যে আমারই সমগোত্রীয়—অর্থাৎ উনিও যে বৈজ্ঞানিক—আর তাঁর গোপালপুর আসার উদ্দেশ্যটা কী—এসব খবর কী করে জানলাম সেটা আগে বলি।

গতকাল রোজকার মতো ভোরবেলা উঠে সমুদ্রের ধারে গিয়ে নুলিয়াদের জালটানা দেখছিলাম, এমন সময় জালে একটা নতুন ধরনের সামুদ্রিক জীব উঠল। বইয়ে ছবি দেখলেও এর নামটা আমার ঠিক মনে ছিল না। ওটার স্থানীয় নাম কিছু আছে কিনা সেটা নুলিয়াদের জিগ্যেস করতে যাবো, এমন সময় পিছন থেকে হামাকুরার গলা পেলাম—

'রায়ন ফিশ।' সত্যিই ত—লায়ন ফিশ!

আমি বেশ একটু অবাক হয়েই বললাম, 'তোমার এসব ব্যাপারে ইণ্টারেস্ট আছে বুঝি?'

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন ওটাই হল ওঁর পেশা, সামুদ্রিক প্রাণীতত্ত্ব নিয়ে পঁচিশ বছর ধরে গবেষণা করছেন তিনি।

এটা শুনে আমি তাঁকে আবার নতুন করে তাঁর গোপালপুরে আসার কারণটা জিগ্যেস করলাম। হামাকুরা বললেন তিনি আসছেন সিঙ্গাপুর থেকে। ওখানে সমুদ্রের উপকূলে গবেষণার কাজ করছিলেন; হঠাৎ একদিন কাগজে গোপালপুরের 'জামুপিনি ফিশের' কথা পড়ে সেটা দেখার আশায় এখানে চলে আসেন।

'জামুপিনি' যে 'জাম্পিং', সেটা বুঝতে অসুবিধা হল না। জাপানীরা যুক্তাক্ষরকে ভেঙে কী ভাবে দুটো আলাদা অক্ষরের মতো উচ্চারণ করে সেটা এ কদিনে জেনে গেছি। হসন্ত ব্যাপারটাও এদের ভাষায় নেই; আর নেই 'ল'-এর ব্যবহার। সিঙ্গাপুর আর গোপালপুর তাই হামাকুরার উচ্চারণে হ'ল সিঙ্গাপুরো আর গোপারপুরো। আর আমি হয়ে গেছি পোরোফেসোরো শোনোকু।

যাই হোক্, আমিও হামাকুরাকে বললাম যে আমারও গোপালপুর আসার উদ্দেশ্য ওই একই, কিন্তু যেরকম ভাবগতিক দেখছি তাতে আসাটা খুব লাভবান হবে বলে মনে হচ্ছে না! হামাকুরা আমার কথাটা শুনে কী যেন বলতে গিয়েও বলল না। বোধহয় ভাষার অভাবেই তার কথাটা আটকে গেল।

সন্ধ্যার দিকটা রোজই আমরা বারান্দায় বসে থাকি। বারান্দা থেকে এক ধাপ নামলেই বালি, আর বালির উপর দিয়ে একশো গজ হেঁটে গেলেই সমুদ্র। কাল বিকেলে আমি আর হামাকুরা পাশাপাশি ডেক চেয়ারে বসে আছি, আর অবিনাশবাবু একটা করাত মাছের দাঁত কিনে এনে আমাদের দেখাচ্ছেন

আর বলছেন যে এইটে বাড়িতে রাখলে আর চোর আসবেনা, এমন সময় একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল।

সন্ধ্যার আবছা আলোতে স্পষ্ট দেখতে পেলাম, সমুদ্রের মাঝখান থেকে কী যেন একটা লম্বা জিনি বেরিয়ে উঠল, আর তার পরমুহূর্তেই তার মাথার উপর একটা সবুজ আলো জ্বলে উঠল।

হামাকুরা জাপানী ভাষায় কী জানি বলে লাফিয়ে উঠে তার ঘরে চলে গেল। তারপর সে-ঘ থেকে খট্‌খট্ খুট্‌খুট্ পীঁ পীঁ ইত্যাদি নানারকম শব্দ বেরোতে লাগল। সবুজ আলোটা দেখি ক্রমাগ জ্বলছে—নিভছে। তারপর এক সময় সেটা আর নিভল না—জ্বলেই রইল।

এদিকে অবিনাশবাবু উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। বললেন, 'এ যেন বায়স্কোপ দেখছি মশাই কী হচ্ছে বলুন ত? ও জিনিসটা কী?'

এবার হামাকুরা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। তাকে দেখে মনে হল সে ভারী নিশ্চিন্ত বো করছে, এবং খুশিও বটে। সবুজ আলোটার দিকে আঙুল দেখিয়ে সে বলল, 'মাই শিপ—তু গে দাউন—আন্দুা ওয়াতা।'

বুঝলাম সেটা সাবমেরিন জাতীয় একটা কিছু—'আণ্ডার ওয়াটার' অর্থাৎ সমুদ্রের তলায় চলে।

আমি বললাম, 'ওতে কে আছে?'

হামাকুরা বলল, 'তানাকা। মাই ফুরেনোদো।'

'ইয়োর ফ্রেণ্ড?'

হামাকুরা ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলল, 'হুঁ:, হুঁ:।'

'উই তু—সানিতিস। গো দাউন তু সুতাদি লাইফ আন্দুা ওয়াতা।'

অর্থাৎ—আমরা দুজন সায়ান্টিষ্ট—আমরা 'গো ডাউন টু স্টাডি লাইফ আণ্ডার ওয়াটার।' বুঝলা তানাকা হল হামাকুরার সহকর্মী; ওরা দুজনে একসঙ্গে সমুদ্রগর্ভে নেমে সামুদ্রিক জীবজগৎ সম্পর্কে গবেষণা করছে।

এবার বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে জাহাজটা আমাদের দিকে এগিয়ে এসেছে, আর আলোট ক্রমেই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

হামাকুরা বারান্দা থেকে বালিতে নেমে জলের দিকে হাঁটতে শুরু করল। আমরা দুজন তার পিছু নিলাম। জাহাজটা সম্পর্কে ভারী কৌতূহল হচ্ছিল। হামাকুরা যে এতদিন এইটেরই অপেক্ষা করছিল সেটা বুঝতে পারলাম। অবিনাশবাবু বালির উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমার কানে ফিস্ ফিস্ করে বললেন, 'আপনার সঙ্গে আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রশস্ত্র আছে আশাকরি। আমার কিন্তু এদের ভাবগতিক ভালো লাগছে না মশাই। হয় এরা গুপ্তচর, নয় এরা স্মাগলার—এ আমি বলে দিলাম।'

জলের উপর দিয়ে যেভাবে সাবমেরিনটা তীরে চলে এলো তাতে বুঝলাম যে সেটা অ্যামফিবিয়ান অর্থাৎ জলেও চলে ডাঙ্গাতেও চলে। পুরীর সমুদ্রতীর হলে এতক্ষণে হাজার লোক এই জাহাজ দেখতে জমে যেতো, কিন্তু গোপালপুরে এই জাহাজ আসার কথা জানলাম কেবলমাত্র আমি, অবিনাশবাবু আর হামাকুরা।

আয়তনে জাহাজটা আমাদের হোটেলের একটা কামরার চেয়ে বেশি বড় নয়। আকৃতিতে মাছের সঙ্গে একটা সাদৃশ্য আছে, যদিও মুখটা চ্যাপটা। তলায় তিনটে চাকা, তুপাশে তুটো ডানা, আর লেজের দিকে একটা হাল লক্ষ্য করলাম। কাঁধের উপর যে ডাণ্ডাটা রয়েছে, সেটা জলের ভিতর পেরিস্কোপের কাজ করে। এই ডাণ্ডাটারই মাথার কাছে সবুজ আলোটা রয়েছে।

জল পেরিয়ে তীরে পৌঁছতেই জাহাজটা থামল, আর তার তুপাশ থেকে তুটো কাঁটার মত জিনিস বেরিয়ে বালির ভিতর বেশ খানিকটা ঢুকে গিয়ে জাহাজটাকে শক্ত করে ডাঙ্গার সঙ্গে আটকে দিল। বুঝলাম ঢেউ এলেও সেটা আর স্থানচ্যুত হবে না।

তারপর দেখলাম জাহাজের এক পাশের একটা দরজা খুলে গিয়ে তার ভিতর থেকে একজন চশমা পরা বেঁটে খাটো গোলগাল হাসিখুশি জাপানী ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে হামাকুরার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক ক'রে, আমাদের দিকে ফিরে বার বার নতজানু হয়ে অভিবাদন জানাতে লাগল। তারই ফাঁকে অবিশ্যি হামাকুরা তাঁর সহকর্মীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

অবিনাশবাবু এবার ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, 'অতিভক্তি ত চোরের লক্ষণ বলে জানতাম। ইনি এত বার বার হেঁট হচ্ছেন কেন বলুন ত?'

আমিও ফিস্‌ফিস্ করে বললাম, 'জাপানে চোর ছ্যাঁচড় সাধু সন্ন্যাসী সবাই ওভাবে হেঁট হয়। ওতে সন্দেহ করার কিছু নেই।'

সমুদ্রতীর থেকে হোটেলে ফিরে আসার পর সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে জানলাম।

তানাকাও ছিল সিঙ্গাপুরে হামাকুরার সঙ্গে। সে গোপালপুর পর্যন্ত সমস্ত পথটা সমুদ্রের তলা দিয়েই এসেছে। আর হামাকুরা এসেছে আকাশপথে আর স্থলপথে। গোপালপুরকে ঘাঁটি করে ওরা তুজন সমুদ্রের তলায় অভিযান চালাবে রক্তমৎস্যের সন্ধানে।

আমি জিগ্যেস করলাম, মিস্টার তানাকা যে এতখানি পথ জলের তলা দিয়ে এলেন—তিনি কি সেই আশ্চর্য লালমাছ একটাও দেখতে পাননি?

তানাকা হামাকুরার চেয়েও কম ইংরেজি জানেন। আমি লিঙ্গুয়াগ্রাফের সাহায্যে বুঝতে পারলাম যে রক্ত মাছের কোন চিহ্ন তিনি দেখেন নি। কিন্তু অন্য জলচর প্রাণীর হাবভাবে একটা অদ্ভুত চাঞ্চল্য লক্ষ্য করেছেন। রেঙ্গুনের উপকূল দিয়ে আসার সময় অনেক মাছকে মরে পড়ে থাকতে দেখেছেন। তার মধ্যে কিছু হাঙ্গর আর কিছু শুশুকও ছিল। এসবের কারণ তানাকা কিছুই অনুমান করতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর একটা ধারণা হয়েছে, যে রক্তমাছ না হলেও, অন্য কোন জলচর প্রাণীর দৌরাত্ম্য এসব মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

তানাকাকে ক্লান্ত মনে হওয়াতে তখন আর তাকে প্রশ্ন করে বিরক্ত করলাম না।

আমার ঘরে এসে অবিনাশবাবু বললেন, 'সমুদ্রের তলায় এভাবে দিব্যি চলে ফিরে বেড়াচ্ছে, এতো ভারী অদ্ভুত ব্যাপার। কালে কালে কীই না হল!'

ভদ্রলোক এখনো জানেন না যে সাবমেরিন বলে একটা জিনিস বহুদিন হল আবিষ্কার হয়েছে।

আর লোকে সেই তখন থেকেই জলের তলায় চলাফেরা করছে। তবে, খুব বেশি গভীরে নামা আগে সম্ভব ছিল না। সেটা বোধ হয় এই জাপানী আবিষ্কৃত জাহাজে সম্ভব হচ্ছে।

অবিনাশবাবু বললেন, 'জানেন, এ জায়গাটা চট্ করে একঘেঁয়ে হয়ে যাবার একটা সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু এখন দেখছি বেশ জমে উঠেছে। বেশ একটা রোমাঞ্চ অনুভব করছি। এত কাছ থেকে দু দুটো জাপানীকে একসঙ্গে দেখব, এ কোনদিন ভাবতে পারিনি! তবে ওইসব মাছফাছের ব্যাপারে আমার বিশ্বাস হয় না মশাই। হুঁঃ—লাল মাছ! লাল মাছটা আবার নতুন জিনিস হল নাকি? গিরিডিতে আমাদের মিত্তিরদের বাড়িতেই ত এক গামলা ভর্তি লাল নীল কতরকম মাছ রয়েছে। আর লাফিয়ে লাফিয়ে চলাটাই আর কী এমন আশ্চর্য বলুন। কই মাছ কানে হাঁটতে কি দেখেন নি আপনারা? সেও ত একরকম লাফানোই হল।'

অবিনাশবাবু চলে যাবার পর খাওয়া দাওয়া সেরে ঘণ্টা দুয়েক একটা প্রবন্ধ লেখার কাজ খানিকটা এগিয়ে রেখে, ঘর থেকে বেরিয়ে আবার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। এখানে রাত ন'টা থেকে ইলেকট্রিসিটির গোলমালে হোটেলের বাতিগুলো নিভে গিয়েছিল—তাই বেয়ারা এসে ঘরে মোমবাতি দিয়ে গিয়েছিল। বাইরে এসে দেখি সব থমথমে অন্ধকার। বারান্দার অন্যপ্রান্তে হামাকুরা আর তানাকার পাশাপাশি ঘর। সে দুটো অন্ধকার—বোধহয় দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছে। বহুদূরে কোথা থেকে জানি ঢোলের শব্দ আসছে। বোধহয় নুলিয়াদের কোন পরবটরব আছে। এ ছাড়া শব্দের মধ্যে কেবল সমুদ্রের ঢেউ-এর দীর্ঘশ্বাস।

আমি বারান্দা থেকে বালিতে নামলাম। এখনো চাঁদ ওঠেনি।

একটা মৃদু শব্দ পেয়ে পিছনে ফিরে দেখি নিউটন ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। তার দৃষ্টি সমুদ্রের দিকে, তার পিঠের লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে, আর লেজটা ফুলে উঁচিয়ে উঠেছে।

আমারও চোখ সমুদ্রের দিকে গেলো। সমুদ্রের ঢেউএ ফস্‌ফরাস্ থাকার দরুণ সেটা অন্ধকারেও বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। কিন্তু এই ফস্‌ফরাসের নীলচে আলো ছাড়াও আরেকটা আলো এখন চোখে পড়ল। সেটা জ্বলন্ত কয়লার মত লাল, আর এই লাল আভা চলে গেছে তীরের লাইন ধরে, এপাশ থেকে ওপাশ যতদূর চোখ যায়। এই আভা স্থির নয়; তার মধ্যে যেন একটা চাঞ্চল্য আছে, চলা ফেরা আছে, এগিয়ে আসা পিছিয়ে যাওয়া আছে।

নিউটন ওই লালের দিকে চেয়ে গরগর করতে আরম্ভ করল। আমি ওকে চট করে কোলে তুলে নিয়ে ঘরে রেখে, আমার সুপার টর্চ লাগানো বাইনোকুলারটা নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে আবার বারান্দায় এলাম।

টর্চটা জ্বেলে লালের দিকে তাগ করে বাইনোকুলার চোখে লাগাতেই একটা চোখ ধাঁধানো অবাক করা দৃশ্য দেখতে পেলাম। কাতারে কাতারে সোজা হয়ে দাঁড়ানো মাছের মতো দেখতে কোন প্রাণী—যাদের প্রত্যেকটির গা থেকে লাল আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে—আর তারা যেন কৌতূহলি দৃষ্টিতে ডাঙার দিকে চেয়ে আছে।

হল না। আমার আলোর জন্যেই, বা অন্য
মুদ্রের জলে ফিরে গেলো—আর সেই সঙ্গে
ফেনায় ফসফরাসের স্নিগ্ধ আভা।
য়ে থেকে, তারপর আস্তে আস্তে চিন্তা নিয়ে
প্রাণীর আবির্ভাব হল? এতদিন এরা কোথায়
।হল? এরহ একটার ছোবলে ওয়ালটেয়ারে একজন মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এরা কি তা হলে মানুষের শত্রু? সমুদ্রের তলায় যে মরা মাছ তানাকা দেখেছে, তাদের মৃত্যুর জন্যেও কি এরাই দায়ী?

রাত হয়েছিল অনেক। ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ভালো ঘুম হল না। তার একটা কারণ নিউটনের ঘন ঘন গরগরানি।

* * * *

আজ সকালে কাল রাত্রের ঘটনাটা আমার জাপানী বন্ধুদের কাছে বললাম। তানাকা শুনে বলল, 'তাহলে বোধ হয় আমাদের খুব বেশি ঘুরতে হবে না। ওরা নিশ্চয়ই কাছাকাছির মধ্যে আছে।'

আমি একটু ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত আমার মনের কথাটা বলেই ফেললাম—

'তোমাদের ওই জাহাজে কি দুজনের বেশি লোক যেতে পারে না?'

হামাকুরা বলল, 'আমরা ছ'জন পর্যন্ত ওই জাহাজে নেমেছি। তবে বেশিদিন একটানা ঘুরতে হলে চারজনের বেশি লোক একসঙ্গে না নেওয়াই ভালো।'

আমি বললাম, 'তোমাদের আপত্তি না থাকলে আমি আর আমার বেড়াল তোমাদের সঙ্গে আসতে চাই। আমাদের খোরাকির ব্যবস্থা আমি নিজেই করব, সে-বিষয় তোমাদের ভাবতে হবে না।'

হামাকুরা শুধু রাজিই হল না, খুশিও হল। তানাকা আবার রসিক লোক; সে বলল, 'তোমার ওই যন্ত্রটা সঙ্গে থাকলে হয়ত মাছের ভাষাও বুঝে ফেলা যেতে পারে।'

ঠিক হল, যে পরদিন—অর্থাৎ আগামী কাল সকালে—আমরা রওনা হব। ওদের সঙ্গে খাবার দাবার আছে সাতদিনের মতো। সেই সময়টুকু আমরা একটানা সমুদ্রগর্ভে ঘুরতে পারব।

ভাগ্যিস গোপালপুরে এসেছিলাম, আর ভাগ্যিস হামাকুরাও ঠিক এখানেই এসেছিল! সময় পেলে এ রকম একটা জাহাজ আমার পক্ষে তৈরি করে নেওয়া অসম্ভব ছিল না; কিন্তু আপাতত এই জাপানীদের সাবমেরিনের জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারলাম না।

আমাদের হোটেলের ম্যানেজার একজন সুইস্ মহিলা। তাকে বলে দিলাম আমাদের ঘরগুলো যেন অন্য কাউকে দিয়ে দেওয়া না হয়। এই ভদ্রমহিলাটির মতো এমন কৌতূহলমুক্ত মানুষ আমি আর দেখিনি। আমাদের এত উত্তেজনা, এত জল্পনা কল্পনা, এমন কি রক্তমৎস্যের গতরাত্রের আবির্ভাবের বর্ণনাও যেন তাঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করল না, বা তাঁর কৌতূহলের উদ্রেক করল না। তিনি কেবল বললেন—'যে কদিন থেকেছ তার ভাড়াটা চুকিয়ে দিলে, যে কদিন থাকবে না তার ভাড়াটা আমি

ধরব না। তোমাদের যদি দুর্ভাগ্যক্রমে সলিল সমাধি হয়, তাই তাড়াটা আমি আগে থেকে দিয়ে দিতে বলছি।' আশ্চর্য হিসেবী মহিলা!

দুপুরের দিকে অবিনাশবাবু এসে আমাকে গোছগাছ করতে দেখে বললেন, 'কী মশাই—ফেরার তাল করছেন নাকি? সবে ত খেলা জমেছে!'

আমি অবিনাশবাবু সম্পর্কে একটু কিন্তু কিন্তু বোধ করছিলাম; তবে এটাও বুঝেছিলাম যে এখন অবিনাশবাবুর কথা ভাবলে চলবেনা। তিনি এর মধ্যেই দু-একজন স্থানীয় বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে নিয়েছেন; কাজেই তাঁকে যে একেবারে অকূল পাথারে ফেলে দিয়ে যাচ্ছি তাও নয়।

আমার গোছগাছের কারণ বলাতে অবিনাশবাবু এক মুহূর্তের জন্য থ' মেরে গিয়ে তারপর একেবারে হাতপা ছুঁড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তলে তলে আপনি এই মতলব ফাঁদছিলেন? আপনি ত আচ্ছা সেলফিশ লোক মশাই! শুধু আপনারই হবে কেন এই প্রিভিলেজ? আপনি বৈজ্ঞানিক হতে পারেন—কিন্তু আপনি মাছ সম্বন্ধে কী জানেন? আমি ত তবু মাছ-খোর—ভালোবেসে মাছ খাই। আর আপনি ত প্র্যাকটিক্যালি মাছ খানই না!'

আমি কোনমতে তাকে থামিয়ে টামিয়ে বললাম, 'আপনাকে যদি সঙ্গে নিই তাহলে খুশি হবেন?'

'আলবৎ হব! এমন সুযোগ ছাড়ে কে? আমার বৌ নেই ছেলে নেই পুলে নেই—আমার বন্ধনটা কিসের? এতে তবু একটা কিছু করা হবে—লোককে অন্তত বলতে পারব যে 'ফরেনে' গেছি—তা সে মাছের দেশ না মানুষের দেশ সেটা বলার কী দরকার?'

হামাকুরাকে অবিনাশবাবুর কথা বলাতে সে একগাল হেসে বলল, 'উই জাপান তু—ইউ বেনেগারি তু—পারুফেকোতু!'

অর্থাৎ—আমরা জাপানী দুজন, তোমরা বাঙালী দুজন—পার্ফেক্ট!

কাল সকালে আমাদের সমুদ্রগর্ভে অভিযান শুরু। কী আছে কপালে ঈশ্বর জানেন। তবে এটা জানি যে এ সুযোগ ছাড়া ভুল হত। আর যাই হোক্ না কেন—একটা নতুন জগৎ যে দেখা হবে সে বিষয় ত কোন সন্দেহ নেই।

২৪শে জানুয়ারি

ঠিক বারো ঘণ্টা আগে আমরা সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করেছি।

এখানে ডায়রি লেখার সুযোগ সুবিধে হবে কিনা জানতাম না। এসে দেখছি দিব্যি আরামে আছি। ব্যবস্থা এত চমৎকার, আর অল্প জায়গার মধ্যে ক্যাবিনটা এত গুছিয়ে প্ল্যান করা হয়েছে যে কোন সময়েই ঠাসাঠাসি ভাবটা আসে না।

নিশ্বাসের কোন কষ্ট নেই। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাটা জাপানী, আর সেটা আমার ধাতে আসবে না বলে আমি আমার 'বটিকা ইণ্ডিকা'র একটা বড়ি দিয়েই খাওয়া সেরেছি। আমার আবিষ্কৃত এই বড়ির একটাতেই পুরো দিনের খাওয়া হয়ে যায়। জাপানীরা কাঁচা মাছ খেতে ভালোবাসে, এরাও

তাই খাচ্ছে বলে নিউটনের ভারী সুবিধে হয়েছে। অবিনাশবাবু আজ শাকসব্জী খেলেন, আর এক পেয়ালা জাপানী চা খেলেন। বুঝলাম এতে ওঁর মন আর পেট কোনটাই ভরল না। কাল বলেছেন আমার বড়ি একটা খেয়ে নেবেন, যদিও আমি জানি এ-বড়িতে ওঁর একেবারেই বিশ্বাস নেই।

আমার নিজের কথা বলতে পারি যে এখানে এসে অবধি খাওয়ার কথাটা প্রায় মনেই আসছে না—কারণ সমস্ত মন পড়ে রয়েছে ক্যাবিনের ওই তিনকোণা জানলাটার দিকে।

জাহাজ থেকে একটা তীব্র আলো জানলার বাইরে প্রায় পঁচিশ গজ দূর পর্যন্ত আলো করে দিয়েছে, আর সেই আলোতে এক বিচিত্র, ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল জগত আমাকে একেবারে স্তব্ধ করে রেখেছে। এই মাত্র দশ মিনিট হল আমাদের জাহাজ থেমেছে। হামাকুরা আর তানাকা ডুবুরির পোষাক পরে জাহাজ থেকে বেরিয়ে কিছু সামুদ্রিক উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করতে গেছে। এই যাবার সুযোগটা নিয়ে আমি ডায়রি লিখে ফেলছি। অবিনাশবাবু বললেন, 'আপনাকে ওই পোষাক পরিয়ে দিলে আপনি বাইরে বেরোতে পারেন ?' আমি বললাম, 'কেন পারব না ? ওতে ত বাহাদুরির কিছু নেই। জলের
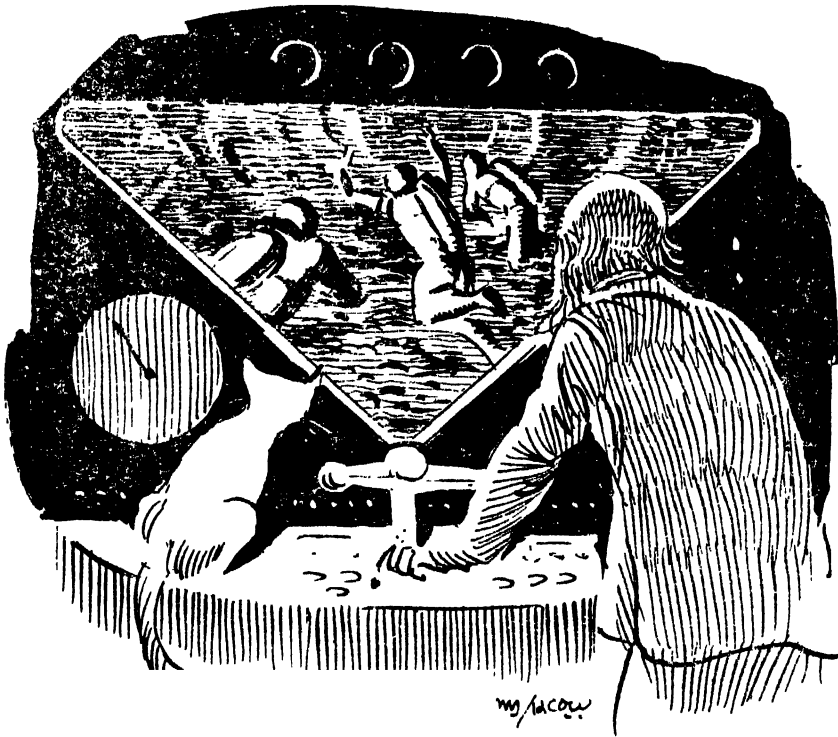
তলায় যাতে সহজে চলাফেরা করা যায় তার জন্যেই ত ওই পোষাক তৈরি। আপনাকে পরিয়ে দিলে আপনিও পারবেন।'

অবিনাশবাবু দুহাত দিয়ে তাঁর নিজের দুকান ম'লে বললেন, 'রক্ষে করুন মশাই—বাড়াবাড়িরও

একটা সীমা আছে। আমি এর মধ্যেই বেশ আছি। সাধ করে হাবুডুবু খাওয়ার মতো ভীমরতি আমার ধরেনি।'

সকাল থেকে নিয়ে আমরা প্রায় পঁচিশ মাইল পথ ঘুরেছি সমুদ্রের তলায়। উপকূল থেকে খুব বেশি দূরে সরে ভিতরের দিকে যাইনি, কারণ মাছগুলো যখন জালে ধরা পড়েছিল, আর পরে রাত্রেও যখন তাদের ডাঙ্গায় উঠতে দেখেছি, তখন তারা যে কাছাকাছির মধ্যেই আছে এটা আন্দাজ করা যেতে পারে।

খুব বেশি গভীরেও যাইনি আমরা, কারণ তিন-সাড়ে তিন হাজার ফুটের নীচে সূর্যের আলো পৌঁছায় না বলে মাছও সেখানে প্রায় থাকে না বললেই চলে। অন্তত রঙীন মাছত নয়ই, কারণ সূর্যের আলোই মাছের রঙের কারণ।

এই বারো ঘণ্টার মধ্যেই যে কত বিচিত্র ধরনের মাছ ও সামুদ্রিক উদ্ভিদ দেখেছি তার আর হিসেব নেই। দশ ফুট নীচে নামার পর থেকেই জেলি-ফিশ জাতীয় মাছ দেখতে পেয়েছি। ওগুলোও যে মাছ সে কথা অবিনাশবাবু বিশ্বাসই করবেন না। খালি বলেন, 'ল্যাজ নেই, আঁশ নেই, মাথা নেই কানকো নেই—মাছ বললেই হল?'

প্ল্যাঙ্কটন জাতীয় উদ্ভিদ দেখে অবিনাশবাবু বললেন, 'ওগুলোও কি মাছ বলে চালাতে চান নাকি?'

আমি ওকে বুঝিয়ে দিলাম যে ওগুলো সামুদ্রিক গাছপালা। অনেক মাছ আছে যারা ওইসব গাছপালা খেয়েই জীবনধারণ করে।'

অবিনাশবাবু চোখ কপালে তুলে বললেন, 'মাছের মধ্যেও তাহলে ভেজিটেরিয়ান আছে! ভারী আশ্চর্য ত!'

তানাকা উদ্ভিদ্ সংগ্রহ করে ফিরে এসেছে, আর আমাদের জাহাজ আবার চলতে শুরু করেছে। কাতারে কাতারে মাছের দল আমাদের জানালার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। একটা বিরাট চ্যাপ্টা মাছ এগিয়ে এলো, আর ভারী কৌতূহলি দৃষ্টি দিয়ে আমাদের কেবিনের ভিতরটা দেখতে লাগল। জাহাজ চলেছে আর মাছও সঙ্গে সঙ্গে চলেছে—তার দৃষ্টি আমাদের দিকে। নিউটন জানালার সামনের টেবিলের উপর উঠে কাঁচের উপর থাবা দিয়ে ঠিক মাছটার মুখের উপর ঘষতে লাগল। প্রায় পাঁচ মিনিট এইভাবে চলার পর মাছটা হঠাৎ বেঁকে পাশ কাটিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

তানাকা দিনের বেলা মাঝে মাঝে সার্চলাইট নিভিয়ে দিচ্ছেন স্বাভাবিক আলো কতখানি আছে দেখবার জন্য। বিকেলের পর থেকে আলো আর নেভানো হয় নি।

ঘণ্টাখানেক আগেই হামাকুরা বলেছেন 'যদি হাজার ফুট গভীরতার মধ্যে রক্তমাছ দেখা না যায়, তাহলে আমরা উপকূল থেকে আরো দূরে গিয়ে আরো গভীরে নামব। এমনও হতে পারে যে এমাছ হয়ত একেবারে অন্ধকার সামুদ্রিক জগতের মাছ।'

আমি তাতে বললাম, 'কিন্তু এরা যে সূর্যের আলোতে বেরোতে পারে, সেটার ত প্রমাণ পাওয়া গেছে।'

হামাকুরা গম্ভীর ভাবে বলল, 'জানি। আর সেখানেই ত এর জাত বুঝতে এত অসুবিধে হচ্ছে। সহজে এর সন্ধান পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।'

তানাকা তার ক্যামেরা দিয়ে ক্রমাগত সামুদ্রিক জীবের ছবি তুলে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে দুটো হাঙ্গর একেবারে জানালার কাছে এসে পড়েছিল। তাদের হাঁয়ের মধ্যে দিয়ে ধারালো দাঁতের পাটি দেখে সত্যিই ভয় করে।

অবিনাশবাবুকে বললাম, 'ওই যে হাঙ্গরের পিঠে তিনকোণা ডানার মত জিনিসটা দেখছেন, ওটিও মানুষের খাদ্য। ইচ্ছে করলে চীনে রেস্টোরেন্টে গিয়ে Shark's Fin Soup খেয়ে দেখতে পারেন আপনি।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'সেত বুঝলুম। সেরকম ত ষাঁড়ের ল্যাজের Soupও হয় বলে শুনেছি। কিন্তু ভেবে দেখুন—যে প্রথম এই সব জিনিস খেয়ে তাকে খাদ্য বলে সার্টিফিকেট দিল—তার কত বাহাদুরী! কচ্ছপ জিনিসটাকে দেখলে কি আর তাকে খাওয়া যায় বলে মনে হয়?'—আমাদের জানালার বাইরে দিয়ে তখন একজোড়া কচ্ছপ সাঁতার কেটে চলেছে—'ওই দেখুন না—পা দেখুন, মাথা দেখুন, খোলস দেখুন—যাকে বলে কিম্ভূত। অথচ কী সুস্বাদু!'

এখন বাজে রাত সাড়ে আটটা। অবিনাশবাবু এর মধ্যেই বার দুই হাঁই তুলেছেন। তানাকা একটা থার্মোমিটারে জলের তাপ দেখছে। হামাকুরা খাতা খুলে কী যেন লিখছে। ক্যাবিনের রেডিওতে ক্ষীণ স্বরে একটা মাদ্রাজি গান ভেসে আসছে। রক্তমৎস্যের কোন সন্ধান আজকের মধ্যে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। ক্রমশঃ

বীর শিকারী

অঞ্জন সেনগুপ্ত

বাঘের গলায় শিকল এঁটে।
বীর শিকারী যাচ্ছে হেঁটে।

শান্তা দেবী

বিদেশী গল্প

সাহেবদের দেশে একজনদের বাড়িতে একটা ছোট্ট ইঁদুর ছিল।

তারা ইঁদুরটাকে পছন্দ করত না, কি করে দূর করা যায় তাই ভাবত। অনেক ভেবে ঠি করলে যে একটা বেড়াল পুষবে ; বেড়ালটা ইঁদুর ধরবে।

বেড়াল একটা আনা হল। তার নাম রাখা হল টিমি। কিন্তু মুস্কিল হল এই যে টি ইঁদুরদের ভীষণ ভয় করত। যারা পুষল তারা কিন্তু তা জানত না। তারা ওকে বললে, 'টিমি, তু ইঁদুরটাকে ধর দিখি নি।'

ও যে ইঁদুরদের ভয় পায় তা বাড়ির লোকদের বলতে লজ্জা পেল। সবাই জানে বেড়াল চিরকালই ইঁদুর ধরে। টিমি বললে,

'হ্যাঁ, ধরব বৈকি। কিন্তু আগে একটু খেলা করে নিই। একটু খেলতে দেবে ত?'

টিমি বাঘ বাঘ খেলা সুরু করল : সবাইকার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তাদের ভয় দেখাতে লাগল।

ওরা আবার বললে, 'টিমি, এবার তুমি ইঁদুর ধর।'

টিমি বললে, 'হ্যাঁ, নিশ্চয় ধরব। কিন্তু এখন যে বড্ড খিদে পেয়েছে। আমায় এক রেকা দুধ দাও যদি ত খাই।'

বড় এক রেকাবি দুধ দেওয়া হল। তারপর তারা বললে 'এবার তোমায় নিশ্চয় নিশ্চয় ইঁদু ধরতে হবে।'

আর কত ছুতো করবে টিমি ভেবে অস্থির হয়ে গেল। বললে, 'আচ্ছা বেশ! ইঁদুরটা কোথায় বল ত!'

তারা বললে, 'তুমি গন্ধ শুঁকে শুঁকে ইঁদুর খুঁজে বের কর।'

টিমি ছোঁক ছোঁক করে গন্ধ শুঁকে বললে, 'রান্নাঘরের তাকে ভাল মাছের গন্ধ পাচ্ছি।' এই বলে তাকে লাফিয়ে উঠে মাছটা খেয়ে ফেললে। তাকের উপর কোনো ইঁদুর নেই দেখে তার মনটা নিশ্চিন্ত হল।

বাড়ির লোকরা বললে, 'আরো ভাল করে শোঁক।'

টিমি শুঁকে বললে, 'মেঝের তলার ঘরে ঘর গরম করার গন্ধ পাচ্ছি।' এই বলে নিচে গেল। কয়লার টিনের উপর খানিক ঘুরল। সেখানেও কোনো ইঁদুর নেই দেখে মনটা খুসি হল।

ওরা বললে আরও জোরে শোঁকো। টিমি বললে, 'কাপড় রাখা ঝুড়িতে পরিষ্কার কাপড়ের গন্ধ পাচ্ছি।'

সে লাফিয়ে ঝুড়িতে উঠল। সেখানেও ইঁদুর নেই দেখে তার মনটা ভারী খুসি।

কাপড় গুলোর উপর বার দুয়েক গোল হয়ে ঘুরে একটা নরম জায়গা দেখে সে ঘুমোতে লাগল।

জেগে উঠে দেখল ছোট্ট একটা ইঁদুর মেঝেতে বসে আছে।

টিমি বললে, 'ওরে বাবা! এইবার ত আমায় তোমাকে ধরতে হবে, ইঁদুর মশায়!'

ইঁদুর সরু গলায় বললে, 'কেন?'

টিমি অবাক হয়ে জবাব খুঁজে পেল না। কেন যে ধরতে হবে তা সে নিজেই জানে না।

সে বললে, 'তুমি কি খুব দুষ্টু ইঁদুর?'

ইঁদুর বললে, 'আমি লোকদের একটু ভয় পাওয়াই।'

টিমি ভাবল, 'আমি ও ত ভয় পাওয়াতে ভালবাসি।'

বললে, 'তবে আমি তোমাকে ধরব না।'

ইঁদুর বললে, 'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ,' বলে সে দৌড়ে নিজের গর্তে ঢুকে গেল।

টিমি কাপড়ের ঝুড়ির থেকে নেমে খাবার ঘরে চলে গেল, এমন ভাব দেখাল যেন কতই ইঁদুর খুঁজে বেড়াচ্ছে।

বাড়ির লোকেরা বললে, 'টিমি বেড়ালটা ভাল, কিন্তু ইঁদুরটাকে ও ধরতে পারে না।'

টিমি কোনো কথার জবাব দিলে না।

(বিদেশী গল্প থেকে)

খবরের কাগজের ঝানু রিপোর্টার কানু সামন্ত পুরনো চৌধুরীবাড়ির ফটকের সামনে পৌঁছেই বুঝল খবরটা ভুল। সত্যি হলে এতক্ষণে এখানে লোকের ভিড় হত।

সেকেলে তিন তলা বাড়ি, অর্ধেক জানলা বন্ধ, খড়খড়ি ঝুলে পড়েছে, বাগান আগাছায় ভরা। পিছনের বেড়া বাঁশ দিয়ে তক্তা দিয়ে কোনোমতে ঠেকা দেওয়া। ওখানে একটা পুরনো ইঁটের উঁচু আস্তাবল দেখা যাচ্ছে, তার মস্ত কাঠের দরজা। আগে সেখানে জুড়ি গাড়ি আর আর গোটা ছয় ঘোড়া থাকত নিশ্চয়। তা ছাড়া জাল দিয়ে ঘেরা অনেকগুলো মুরগির ঘর। হরিহর চৌধুরী মুরগির চাষ করেন। তার আয়তেই নাকি ওঁর সংসার চলে ; জমিদারি তো পঞ্চাশ বছর আগে ওঁর বাবাই ফুঁকে দিয়েছিলেন।

সামনের ফটকের একদিকটা ভাঙা ; খুলতেই কঁ্যাচ শব্দ করে ঝুলে পড়ল। কানু আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল ; সুরকি ঢালা পথ এখন ঘাসে ঢাকা। দুধাপ শ্বেত পাথরের সিঁড়িও একটু নড়বড়ে। সাবধানে উঠে দরজায় ধাক্কা দিতেই, দরজা খুলে হরিহর চৌধুরী নিজেই বেরিয়ে এলেন। দু' হাত তুলে বললেন, 'নমস্কার'। লোকটির বয়স হয়েছে।

কানু নমস্কার করে বলল, 'আমার নাম কানু সামন্ত, 'দৈনিক পত্রের' রিপোর্টার। আমাদের আপিসে কেউ ফোন করে জানিয়েছে এদিকে নাকি একটা এরোপ্লেন ভেঙে পড়েছে। তাই—'

হরিহরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'কই, না তো।' কানু বলল, 'ভেঙে পড়ে নি?' হরিহরবাবু বললেন, 'না।'

কঁ্যাচ করে দরজা খুলে হরিহরবাবুর স্ত্রী বেরিয়ে এলেন। তাঁরো যথেষ্ট বয়স হয়েছে, তবু স্বামীর চেয়ে বেশি বুদ্ধি আছে মনে হল। কিন্তু তিনিও বললেন, 'না! এরোপ্লেন ভাঙেনি।'

কানু সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলল, 'কিছু মনে করবেন না। আজ সকালে আমাদের আপিসে কে একজন অচেনা লোক ফোন করে বলেছিল নাকি আপনাদের জমিতে ভোরবেলায় একটা এরোপ্লেনকে পড়তে দেখা গেছে। নাকি সোজা পড়ছিল, পেছন থেকে আগুনের হলকা দেখা যাচ্ছিল।'

এতক্ষণে ভদ্রমহিলা যেন ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন: 'ও, তাই বলুন। কিন্তু ওটা মোটেই ভাঙে নি। তাছাড়া ওটাকে এরোপ্লেন বলা যায় না। ওর ডানা নেই।'

কানু থমকে দাঁড়াল। 'বলেন কি? একটা এরোপ্লেন নেমেছিল তাহলে? কিন্তু তার ডানা নেই? হেলিকপ্টার বোধ হয়।'

'না, না, হেলিকপ্টারের মাথায় তো পাখা ঘোরে। দেখেই আসুন না আস্তাবলে। ওঁকে নিয়ে যাও না গো, কিন্তু দেখো যেন কাদার উপর দিয়ে না হাঁটেন। জুতো নোংরা হয়ে যাবে।'

হরিহরবাবুর সঙ্গে কানু বাড়ির পিছনে আস্তাবলের দিকে চলল। অনেক অদ্ভুত লোক দেখেছে সে, কিন্তু এঁদের মতো কখনো দেখে নি।

হরিহরবাবু মুরগির ঘরের দিকে তাকিয়ে গর্বের সঙ্গে বললেন, 'অনেক মুরগি আনিয়েছি এ বছর। বুঝলেন মশায়, ভালো বিলিতি মুরগি, সব মিনর্কা। খুব ডিম পাচ্ছি, এই বড় বড়। কিন্তু তারায় কি আর বাচ্চা তোলার খুব সুবিধে হবে?'

'এ্যাঁ, কোথায় বললেন? তারায়?'

হরিহরবাবু আস্তাবলের দরজার শেকল খুলে ঠেলতে ঠেলতে বললেন, 'হ্যাঁ, তারায়।' ইস্ দরজাটা বড় আটকে যায়।'

দু জনে মিলে ঠেলতেই দরজাটা এক ফুট ফাঁক হয়ে গেল। কানু অবাক হয়ে দেখল ভিতরে ঠিক যেন একটা প্রকাণ্ড প্ল্যাস্টিকের বেলুন, ওপরটা গোল মতো, তলাটা চ্যাপটা, আস্তাবলের খড় বিছানো মাটির উপর লেগে রয়েছে।

কানুর হাসি পেল। এ নিশ্চয়ই খামখেয়ালা বুড়োর মহাকাশ-যান তৈরি করার চেষ্টা। মাথা ঘুরিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'হরিহরবাবু, আপনি এটাকে বানালেন নাকি?'

বুড়ো হেসেই একাকার, 'আমি বানাব কি! আমি ওসব জানি নাকি? আমাদের দু' জন বন্ধু ওতে চেপে আমাদের বাড়িতে এসেছেন। আমি ওটাকে চালাতেই পারব না।'

কানু বলল, 'আপনাদের বন্ধুরা কারা?'

হরিহরবাবু বললেন, 'বললে হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু ওঁরা কারা সেটা ঠিক জানি না। ভালো করে কথা বলেন না ওঁরা। সত্যি কথা বলতে কি, কোনো কথাই বলেন না।'

ততক্ষণে কানু আস্তাবলের ভিতরে ঢুকে জিনিসটার চারদিক ঘুরে দেখছিল। হঠাৎ কিসের সঙ্গে ধাক্কা খেল। অথচ কিছু দেখতে পেল না। হরিহরবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'আরে আপনাকে বলতেই ভুলে গেছি, ওঁরা ওটার চারদিকে কি একটা করে রাখেন, যাতে কেউ কাছে গিয়ে কোনো ক্ষতি করতে না পারে। সেটাকে আবার চোখে দেখা যায় না।'

কানু হরিহরবাবুর দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাদের বন্ধুরা এখন কোথায়?'

কেন, আমাদের বাড়িতেই আছেন। ইচ্ছে হলে গিয়ে দেখে আসতে পারেন। তবে ওঁদের সঙ্গে কথা বলা মুস্কিল।'

'কেন, রাসিয়ান নাকি?'

'না, বোধ হয়। চলুন না, দেখবেন গিয়ে।'

যেতে যেতে হরিহরবাবু বলতে লাগলেন, 'ওঁরা এসেছিলেন ছয় বছর আগে। ডিম নিে এসেছিলেন। ইচ্ছা ছিল বাড়ি ফিরে গিয়ে ডিম থেকে বাচ্চা তুলবেন। তিন বছর লাগে ওঁদের বাি যেতে। সব ডিম পচে গেল। তাই আবার ফিরে এসেছেন। এবার সঙ্গে মুরগি দিয়ে দিয়েছি যাবার পথেই তা' দিয়ে বাচ্চা তুলবেন। ডিম পচার ভয় নেই।'

পেছনের দরজা দিয়ে ওরা বাড়িতে ঢুকল। রান্না ঘরের মধ্যে দিয়ে গিয়ে বসবার ঘরে ঢুকবা আগে হরিহরবাবু বললেন, 'দেখুন, আমার চেয়ে আমার গিন্নিই ওদের সঙ্গে কথা বলেন ভালো। আপি যা জানতে চান, তাঁকেই বলবেন। ওঁদের সঙ্গে যে ভদ্রমহিলা এসেছেন, তাঁর সঙ্গে গিন্নির বড় ভাব।'
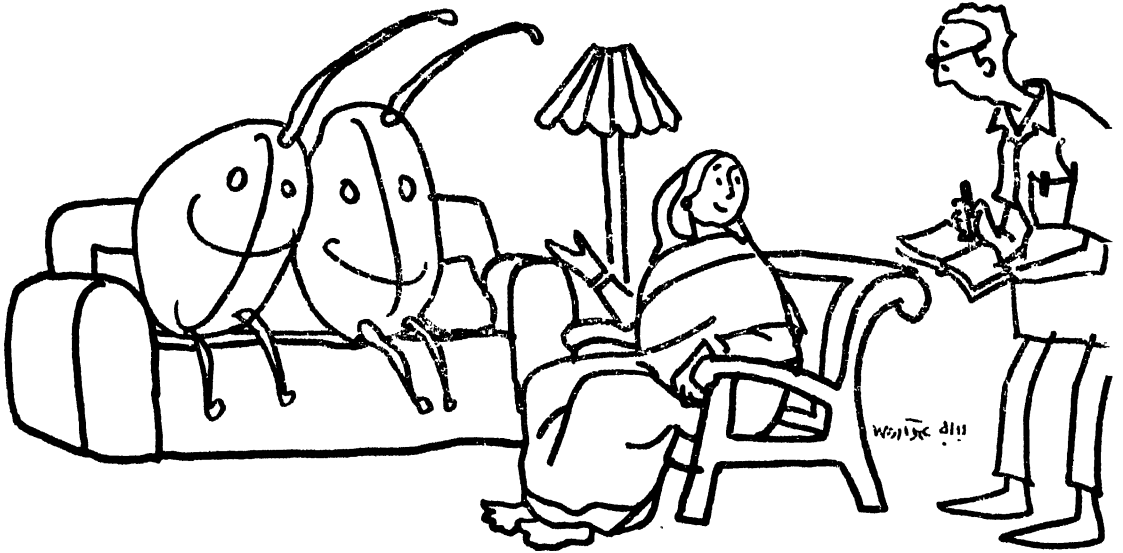
ঘরে ঢুকে কানু দেখল হরিহরবাবুর স্ত্রী একটা আরাম কেদারায় বসে আর তাঁর সামনে কৌচে উপর অতিথি দু' জন পাশাপাশি বসে লম্বা লম্বা শুঁড় নাড়ছেন। তাঁদের ফিকে বেগনি মুখে গো গোল চোখ দুটো ঠিক যেন আঁকা।

কানু কোনো রকমে দরজার পাল্লা আঁকড়ে ধরে খাড়া হয়ে রইল। হরিহরবাবুর স্ত্রী মহা খুি হয়ে বলতে লাগলেন, 'এই যে এঁরা-ই ঐ এরোপ্লেন চড়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। ভদ্রমহিলা আঙুল তুলতেই অতিথিরা তাঁর দিকে শুঁড় নামালেন।

ভদ্রমহিলা বললেন, 'এঁর নাম কানু সামন্ত, আপনাদের এরোপ্লেন দেখতে এসেছেন।'

কানু মাথা নাড়তেই, অতিথিরাও শুঁড় গুটিয়ে ভদ্রভাবে মাথা নাড়লেন। মহিলাটি বাঁ দিকে নখ দিয়ে গা চুলকোতে লাগলেন। অনেক কষ্টে কানু স্বাভাবিক স্বরে কথা বলতে লাগল।

'ওঁদের কি নাম বললেন?'

হরিহরবাবুর স্ত্রী বললেন, 'সেটা ঠিক জানি না। বুঝলেন না ওঁরা তো কথা বলেন না, ছবি তৈি

করেন। ওঁদের ঐ পাকানো পাকানো শিংএর মতো জিনিসগুলো আপনার দিকে ঘুরিয়ে ওঁরা ভাবতে থাকেন। তাতে আপনিও ভাবতে শুরু করে দেবেন।'

কানু বললে, 'আচ্ছা, ওঁরা কি আমার সঙ্গেও কথা বলবেন, তার মানে ই'য়ে—ভাববেন?'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু কাজটা একটু শক্ত।'

'তবু একবার চেষ্টা করেই দেখি না। ওঁদের জিজ্ঞাসা করুন না কোত্থেকে এসেছেন।'

হরিহরবাবুর স্ত্রী বললেন. 'করেছিলাম একবার। কিন্তু ছবিটার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝলাম না। আচ্ছা, আরেকবার করে দেখি।'

ভদ্রমহিলা আঙ্গুল তুলতেই অতিথিরা তাঁর মাথার দিকে শিং বাগিয়ে ধরলেন। ভদ্রমহিলা বললেন,

'ইনি জানতে চান আপনারা কোথা থেকে এসেছেন।'

হরিহরবাবু কানুর পেটে কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে বললেন,

'আঙ্গুল তুলুন।'

কানু আঙ্গুল তুলল। মহিলা অতিথি কানুর দুই চোখের ঠিক মাঝখানে শুঁড় তাগ করলেন। কানু হঠাৎ দরজা আঁকড়ে ধরল। ওর মনে হল ওর মগজটা রবারের তৈরী, ভয়ে প্রাণ উড়ে যাবার জোগাড়! মনে হল মহাশূন্য দিয়ে যেন উড়ে যাচ্ছে। চারদিকে নক্ষত্র আর ধূমকেতু ছুটে যাচ্ছে আর সামনে একটা প্রকাণ্ড সাদা তারা। তারপর সেটা যেন নিবে গেল। কানুর সারা গা কাঁপছিল। মুখটা ছাইয়ের মত সাদা।

'ও হরিহর বাবু! ওঁরা সত্যিই মহাশূন্য থেকে এসেছেন!!'

'এসেছেনই তো।'

কানু ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'আপনাদের টেলিফোনটা কোথায়? এমন কাণ্ড কেউ কখনো শোনে নি। আমাদের সম্পাদক মশাইকে তো জানাতে হবে।'

হরিহর বাবু বললেন, 'এখানে ফোন টোন নেই। তবে দূরের ঐ পেট্রল স্টেশনে থাকতে পারে। এঁদের বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে তারপর যাবেন। ডিম, মুরগি, মুরগিদের খাবার সব তোলা হয়েছে, এঁরাও এই গেলেন বলে।'

কানু চেঁচিয়ে উঠল, 'না না, এখনি যেতে দেবেন না। ফোন করতে হবে, ফটো তুললে হবে।' হরিহর বাবুর স্ত্রী বললেন, 'তা হয় না, বাবা আমিও তো কত করে বললাম রাতে খেয়ে যেতে। তা ওঁরা কিছুতেই রাজি হলেন না। কিসের যেন জোয়ার আসে, সেই সময় পাড়ি দিতে হয়।'

হরিহর বাবু বললেন, 'না, না, জোয়ার নয়, চাঁদটা একটা বিশেষ জায়গায় এলেই যেতে হয়।' মহাশূন্যের অতিথিরা ভালোমানুষের মতো কোলের উপর নখ গুটিয়ে, শুঁড় পাকিয়ে বসে রইলেন, যেন কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছেন না।

কানু উত্তেজিত ভাবে বলল' 'ক্যামেরা আছে, হরিবাবু? যে কোনো রকম ক্যামেরা?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে। বক্স্-ক্যামেরা, কিন্তু খাসা ছবি ওঠে। ক্যায়সা সব মুরগিদের ছবি তুলেছি দেখবেন ?'

'আরে না না, মুরগির ছবি দেখতে চাইনা, ক্যামেরাটা চাই।'

হরিহর বাবু বসবার ঘরে গিয়ে দেরাজের টানা খুলে ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগলেন। কানু তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল।

'ওঁদের অনেক কথা জিজ্ঞাসা করার ছিল।'

'করুন, করুন, ওঁরা কিছু মনে করবেন না।'

কানু পড়ল মুস্কিলে। জিজ্ঞাসা করাটা কি ? কোত্থেকে এসেছেন, কেন এসেছেন সব ই তো জানা হয়ে গেছে। হরিহর বাবুর গলা শোনা গেল, 'ওগো, আমার ক্যামেরাটা দেখেছ ?'

গিন্নি বললেন, 'না, দেখিনি। তুমিই তো তুলে রাখলে।'

হরিহর বাবু বললেন, 'এখন মুস্কিল হল যে ক্যামেরা পেলেও, ফিলিম টিলিম নেই।'

মহাকাশের আগন্তুকরা এ ওর দিকে ফিরে একটু শুঁড় নাড়ানাড়ি করে, হঠাৎ উঠে পড়লেন। এক মিনিট ঘরের মধ্যে ছুটোছুটি করে, টুক্ করে দরজা দিয়ে বেরিয়ে আস্তাবলের দিকে চললেন।

কানু আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইল। ওঁরা অনেকটা বড় বড় আরশোলার মতো দেখতে। একথা মনে হতেই কানুর সম্বিৎ ফিরে এল। 'থামুন, থামুন!' বলে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে সে-ও আস্তাবলের দিকে দৌড়ল। কিন্তু অর্ধেক পথ-ও পার হবার আগেই দেখতে পেল আস্তাবলের খোলা দরজা দিয়ে মস্ত চকচকে প্ল্যাস্টিকের জিনিসটা বেরিয়ে আসছে। একটু শোঁ-শোঁ শব্দ হল। তারপরেই সেটা শূন্যে উঠে পড়ে দেখতে দেখতে মেঘের আড়াল হয়ে গেল। কাদা থেকে একটু ধোঁয়া উঠতে লাগল আর মাটিতে দেখা গেল একটা গোল পোড়া দাগ।

কানু হতাশার চোটে কাদার মধ্যেই বসে পড়ল। চোখের সামনে এমন একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল অথচ একটা ছবি পর্যন্ত তোলা গেল না, প্রমাণ স্বরূপ একটা চিহ্ন অবধি পাওয়া গেল না ! সম্পাদক মশাই বিশ্বাস করবেন কেন ? কিছু ছাপালে পাঠকরাও বলবে—গাঁজাখুরি কথা !

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে কানু দৌড়ে আবার বসবার ঘরে ফিরে এসে বলল, 'ও হরিহর বাবু, ওঁরা মুরগির ডিমের দাম দিয়ে গেছেন কি ?'

হরিহরবাবু তখনো ক্যামেরা খুঁজতে ব্যস্ত। বললেন,

'তা একরকম বলতে পারেন দাম দিয়েছেন।'

কানু বললে, 'কই, পয়সাগুলো দেখি।'

হরিহরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'পয়সা তো দেন নি। কিন্তু ছয় বছর আগে প্রথমবার যখন এসেছিলেন, বদলি দেবার জন্য ওঁদের দেশের কয়েকটা ডিম এনেছিলেন।'

কানুর কান্না পাচ্ছিল। 'ছয় বছর আগে !! কি রকম ডিম ?'

হরিহরবাবু ফিক ফিক করে হাসতে লাগলেন, যেন ভারি মজার কথা মনে পড়েছে। 'অদ্ভুত ডিম,

ছয় কোণা তারার মতো। আমাদের বুড়ো মুরগিটা কি সহজে সেগুলোতে তা' দিতে চায়! বোধ হয় খোঁচা গুলো গায়ে ফুটত।'

হরিহরবাবু ক্যামেরা খোঁজা বন্ধ রেখে কাছে এলেন।

'বাচ্চাগুলোর নাম দিয়েছিলাম 'তারার হাঁস।' খানিকটা হিপ্পোপটেমাস খানিকটা কাগের মতো দেখতে। কিচ্ছু ভালো না। ছয়টা করে ঠ্যাং। সব গুলো মরে গেল, খালি দুটো বাঁচল। সে দুটোকে আমরা নববর্ষের দিন রেঁধে খেয়ে ফেলেছিলাম। এমন বিচ্ছু ভালো নয়।'

কানুর দম বন্ধ হয়ে আসছিল। 'তারার হাঁসের এতটুকু চিহ্ন দেখলেও তো সম্পাদকমশাই বিশ্বাস করতে পারেন।

হরিহরবাবুর কানের কাছে মুখ নিয়ে কানু জিজ্ঞাসা করল, 'ওদের হাড়গোড়গুলো দিয়ে কি করলেন?'

হরিহরবাবু একটুক্ষণ ভেবে বললেন, 'কেন, আমাদের কুকুর বাঘা সেগুলোকে খেয়েছিল। বাঘাটাও কবে মরে গেছে। তবে তার হাড়গোড় কোথায় আছে জানি। দেখবেন নাকি?'

কানু বলল, 'থাক, দরকার নেই।' এই বলে ফটকের দিকে রওনা দিল। হরিহরবাবু পিছন থেকে ডেকে বললেন, 'এই যে, ক্যামেরাটা পেয়েছি। ও কি, চলে যাচ্ছেন যে, দেখবেন না?'
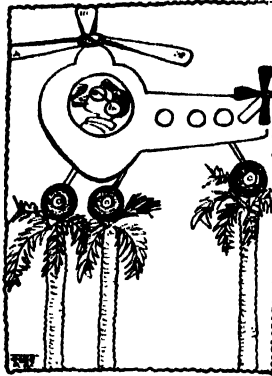
॥ হেলিকপটার ॥

ঝুমুর চৌধুরী

হেলিকপটার
হেলিকপটার:
বড় বড় পাখা তার
মাথার উপরে ঘোরে
বন্ বন্ ক'রে:
ভর দিয়ে বাতাসেতে
সোজা ওঠে আকাশেতে
শূন্যেতে ওড়ে॥

পিছনের ছোট পাখা
দেয় গতি আঁকাবাঁকা।
আপনার মনে
চলে হেলিকপ্টার
সমুখে পেছনে—
মাঠ ঘাট বনভূমি তুষার পাহাড়
হয়ে যায় পার
হেলিকপ্টার।
বন্ বন্ শন শন ঘোরে পাখা তার॥

এপার ওপার

সুরুচি সেনগুপ্ত

ইংলিশ চ্যানেল যেন রুদ্র পারাবার,
ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড তার এপার ওপার।
ফ্রান্সের সিক্ত তট, ঊর্মিমালা লটপট্,
ভ্রমিছে বালুকা' পরে পদচিহ্ন আঁকি,—
ইংরেজ যুবক এক বিষণ্ণ একাকী।

দু' চোখের দৃষ্টি তার সজল উদাস,
দিগন্ত ছাড়িয়া যায় বিশাল আকাশ—
দূরে সুদূরেতে আঁকা, নীল সীমা রেখা বাঁকা—
তারি ওপারেতে আছে একখানা গ্রাম
সুশীতল ছায়া ঢাকা শস্যময় শ্যাম।

সে যে তার জন্মভূমি, মাতৃভূমি সে যে
তারি স্মৃতি সারা বুক ভ'রে র'য়েছে যে!
কত পাখি পাখা খুলে, উড়ে যায় ওই কূলে,
যেখানে কুটিরে এক প্রভাতে প্রদোষে,
তারি পথ চেয়ে তার মা কাঁদেন ব'সে।

পাখিরা কাকলি তানে কি জানি কি কয়,
বোঝে না পাখির ভাষা, শুধু চেয়ে রয়।
ওরা যদি একবার নেমে আসে কাছে তার,
যদি ওরা ভাষা বোঝে শোনে দুটি কথা,
মার কাছে গিয়ে বলে তাহার বারতা!

বিধাতা যদিই এক দিবসের লাগি,
ওদের মতন তারে ক'রে দেন পাখি,
যদি বা করুণা ক'রে, দুটি ডানা দেন ওরে,
সে ও পারে উড়ে যেতে চ্যানেলের পার,
মুছাইয়া দিতে পারে মার অশ্রুধার।

ছোটো সে কুটিরখানি শান্তি দিয়ে ঘেরা,
সব চেয়ে মনোরম স্বরগের সেরা
ঠিক্ আঙ্গিনার মাঝে দুটি ফুলগাছ আছে,
বসিবে সে গিয়ে সেই ফুলময় শাখে
ডাকিবে পাখির সুরে 'মা' বলিয়ে মাকে।

ফরাসী ইংরেজে যুদ্ধ হ'ল যে সময়,
সেই যুদ্ধে বৃটিশের হ'ল পরাজয়!
যুদ্ধজয়া উচ্চশির, বোনাপার্ট মহাবীর,
বৃটিশের সৈন্য দলে বন্দী ক'রে আনে,
বিজেতা কি বিজিতের মনোব্যথা জানে?

মা আর জন্মভূমি এই কথা দুটি
বুকে তার জ্বালাইয়া রেখেছে দেউটি।
সাথী এসেছিল যারা, কি ক'রে ভুলিল তারা?
বিবাহ করিয়া কেহ পেতেছে সংসার।
তারি বুক জুড়ে কেন এত হাহাকার?

ভুলিতে পারে না মাকে শয়নে স্বপনে,
মাকে ভুলে গেলে আর কি রাখিবে মনে?
ও পারেতে অবিরল, ঝরে মার আঁখিজল
সন্তান এ পারে ব'সে ভাবে শুধু মাকে.
দুর্লঙ্ঘ্য চ্যানেল দু'য়ে দুই পারে রাখে।

সঙ্গীহীন একা একা চ্যানেলের তীরে,
সময় কাটিয়ে যায়, ধীরে ধীরে ধীরে।
সহসা একদা দেখে, নীল লহরের বুকে
একটি কাঠের পিপা ভেসে ভেসে আসে,
উঠালো যুবক তারে কি জানি কি আশে।

চুপে চুপে খুঁজে আনে হাতুড়ি পেরেক
ঠুক ঠাক্ ঠাক্ ঠুক্ থামে না বারেক
ব'সে ব'সে সারা বেলা, বানালো একটি ভেলা,
সকলের অগোচরে ভাসাইল জলে
ভেলায় বসিয়া নিজে ভাসিল অকূলে।

চারিদিকে চেয়ে দেখে কত হ'ল বেলা
কতক্ষণে আর পারে ভিড়িবে এ ভেলা
কিন্তু মন্দ ভাগ্য তার, বন্দী হ'ল আরবার
ফরাসী প্রহরী তারে পরালো শৃঙ্খল
নীল জলে শূন্য ভেলা করে টলমল্।

সম্রাট নেপোলিয়ন রাজ সিংহাসনে,
বিচার করেন বসি প্রসন্ন আননে।
বিচারের তরে তারে, নিয়ে এলো রাজদ্বারে
মহাবীর বোনাপার্ট শুধালেন তারে,
কার কাছে যেতে চাও কে আছে ওপারে ?

হে যুবক বন্দী বীর! ওহে দুঃসাহসী,
উত্তাল তরঙ্গময় ক্ষিপ্ত জলরাশি;
একথা কি বোঝো না যে, নিমেষে তরঙ্গ মাঝে
অতলে তলায়ে যাবে ওই ক্ষুদ্র ভেলা,
জীবন লইয়া তব একি ছেলে খেলা ?

ভেলায় চড়িয়া সিন্ধু চাও লঙ্ঘিবারে
প্রাণের অধিক প্রিয় কে আছে ওপারে ?
কি সুন্দর এ ভুবন, কি সুন্দর এ জীবন,
কেন বিসর্জিতে চাও সাগরের জলে ?
কার কাছে যাবে ব'লে ডুবিছ অতলে ?

সসম্মানে মুখ তুলি চাহিল যুবক
সম্রাটের মুখ পানে আঁখি অপলক
কাতর বচনে কয়, হে সম্রাট, সদাশয়,
আমার মনের ব্যথা বুঝিবেনা তুমি
ওপারে জননী মোর আর জন্মভূমি।

আমি যে মায়ের বড় আদরের ছেলে,
কতদিন আছি হেথা সেই মাকে ফেলে।
সম্রাট আমার মা যে, পথ চেয়ে ব'সে আছে,
আমারে স্মরিয়া নিত্য ফেলে আঁখিনীর
মার কাছে যেতে আমি হ'য়েছি অধীর।

সেজন্য গভীর জলে দিতে পারি ঝাঁপ
উচ্চ গিরিশৃঙ্গ থেকে দিতে পারি লাফ—
তাতে যদি প্রাণ যায়, কিছু দুঃখ নাহি তায়
মৃতদেহ মার কাছে যাবে ভেসে ভেসে
জীবন সার্থক হবে জীবনের শেষে।

যুবকের কথা শুনি স্তব্ধ সম্রাট
খুলে গেল হৃদয়ের রুদ্ধ কপাট।
চাহি তার মুখ পানে, জল আসে দু'নয়নে
কাঁপিয়া উঠিল বক্ষ দীর্ঘ শ্বাসে শ্বাসে,
মার কত পুণ্যস্মৃতি অন্তরেতে ভাসে।

যুবকের হাতে ধরি টেনে আনে পাশে,
আঁখি ছল্ ছল্, কহে কম্পিত ভাষে—
মার কাছে যাবে ব'লে, প্রাণ দাও অবহেলে,
তোমার সৌভাগ্য হেরি ওহে বন্দীবীর ?'
ফরাসী সম্রাট আজি ঈর্ষায় অধীর।

মায়েরে এমন ভালো কে বাসিতে পারে ?
মার কাছে যাবে ব'লে ভাসে পারাবারে ?

মার লাগি দিব প্রাণ, নহি ততো ভাগ্যবান—
জয়ী আমি, দিগ্বিজয়ী রাজা আমি বটে,
কিন্তু পরাজিত আমি তোমার নিকটে।

তোমার মতন ক'রে যদি পারি ভাই
মাকে ভালোবাসিবারে, ধন্য জন্মটাই।
তুচ্ছ এই রাজ্যধন, তুচ্ছ এই সিংহাসন,
মার কোলে শিশু হ'য়ে কাটাবো জীবন—
অন্য কোনো সুখে মোর নাহি প্রয়োজন।

এখনি জাহাজে চড়ি চ'লে যাও দেশে,
অজেয় অজেয় তুমি মাকে ভালোবেসে।
মার স্নেহপাশ ছিঁড়ি আনিয়াছি বন্দী করি
অমার্জনীয় এই অপরাধ মম,
হে যুবক! দয়া করি ক্ষম আজি ক্ষম।

বোনাপার্ট মহাবীর, তব কাছে নতশির,
ভুলিও না, মনে রেখো,—শত্রু ব'লে নয়,
বন্ধু ব'লে মনে কোরো সকল সময়।

হাত বাড়ালেই

নির্মলেন্দু গৌতম

হাত বাড়ালেই হাত ধরে যে
তার দিকে হাত বাড়াই,
অসম্ভবের খাড়াই
অমনি যেন পেরিয়ে গিয়ে
অন্যদেশে দাঁড়াই !!
ছুটতে ছুটতে হাততালি দি',
লাফিয়ে উঠি যতোই,
মনের মধ্যে ততোই,
খুশির ঝোরা লাফিয়ে ওঠে
'পাগলা ঝোর'ার মতোই !!
হাত বাড়ালেই সঙ্গে সঙ্গে
হাতখানি যে বাড়ায়,
সর্বদা সে হারায়!
মনের মধ্যে বাস করে সে,
নয়কো কোনো পাড়ায় !!

পুণ্যলতা চক্রবর্তী

বড় বাড়ির 'খোকনবাবু' টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে বেড়ায়। তাই দেখে, নীলু বলল 'ওমা আমায় একটা ঘোড়া কিনে দাওনা!' মা একটা কাঠের ঘোড়া এনে বলল 'আমরা গরীব মানুষ, বাবুদের মত ঘোড়া কোথায় পাব বাবা? এই ঘোড়া নিয়ে খেলা কর।'

ছোট্ট লাল ঘোড়া, নীলু তার নাম রাখল 'লালু'। সারাদিন সে লালুকে নিয়ে খেলা করল, খাবার সময়ে লালুর মুখেও খাবার গুঁজে দিল, রাতে তাকে নিজের বিছানায় ঘুম পাড়াল। লালু এখন ছোট্ট ছানা খেয়ে দেয়ে বড় হবে, তখন তার পিঠে চড়ে কত বেড়াবে—ভাবতে ভাবতে নীলু ঘুমিয়ে পড়ল।

হঠাৎ শুনল, 'চিঁ-হিঁ-হিঁ! বেড়াতে যাবে না?' চেয়ে দেখে, আরে! লালু কত বড় হয়ে গেছে! তড়াক্ করে নীলু তার পিঠে চড়ে বসল, অমনি লালু ছুটল—খট্ খটাস্-খট্ খট—।

খোকনও তখন ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরিয়েছ, ওদের দেখে হেসে বলল 'রেস দিবে?' টগ্-বগ্ টগ্-বগ্ খট্-খট্—খট্-খট্—দুই ঘোড়া ছুটল—দেখতে দেখতে টাট্টুকে পিছনে ফেলে লালু অনেকদূর এগিয়ে গেল!

সহর ছাড়িয়ে, মাঠ পেরিয়ে, নদীর ধারে খানিক ঘুরে বেড়িয়ে, নীলু বলল 'এবার ঘরে চল, লালু।' নীলুকে ঘরের দরজায় নামিয়ে দিয়েই, লালু আবার পা বাড়াল—'চিঁ-হিঁ-হিঁ! চললাম!'

'ওরে লালু, কোথা যাস্ ?' বলে নীলু তার লেজ টেনে ধরল।

'উঃ হুঃ হুঃ—চুলগুলো যে ছিঁড়ে দিলি রে! ও নীলু, স্বপন্ দেখছিস্ নাকি?' মায়ে ডাকে জেগে উঠে নীলু দেখল, ছোট্ট লালু তার পাশেই ঘুমিয়ে আছে—লালুর লেজ ভেবে মায়ের চুল টেনে ধরেছে!'

ইরমা সোখাজির (Irma Sokhadze) বয়স মাত্র ১১ বছর। কিন্তু এর মধ্যেই সে গাইয়ে হিসাবে খ্যাতি অর্জন করে ফেলেছে। রাশিয়ান, ইটালিয়ান, ইংরাজি ও ফরাসি ভাষায় মোট ২০০ টি গান সে জানে। গানের পরেই তার প্রিয় হল পুতুল খেলা।

সোভিয়েত ইনফর্মেশন সার্ভিসের সৌজন্যে।

স্লীমানের ট্রয়-আবিষ্কার

অজন্ত রায়

জার্মানির হাইনরিস স্লীমান ছেলেবেলায় একখানি ছবি দেখেছিলেন—জ্বলন্ত এক নগর। উঁচু পাথরের প্রাচীরে ঘেরা নগর। ভিতরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকার সারি। আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে যাওয়া ঘর-বাড়ি, গোটা সহর। তারি মধ্যে একজন যুবাপুরুষ, বুড়ো বাপকে কাঁধে নিয়ে, শিশু পুত্রের হাত ধরে পালাচ্ছে নগর ছেড়ে। ছবির নাম—অগ্নিদগ্ধ ট্রয় থেকে ইনিসের পলায়ন।

ছবিটা ভীষণভাবে আকৃষ্ট করেছিল তাঁকে।

কোথায় ট্রয়? এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের কারণই বা কি?

তাঁর বাবা বললেন—এ হচ্ছে ইলিয়াসের গল্প।

আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীক কবি হোমার গ্রীসদেশের বহু প্রচলিত পুরাকাহিনী আশ্রয় করে একখানি অতুলনীয় মহাকাব্য রচনা করেন, ইলিয়ড। ইলিয়ডে আছে ট্রয় যুদ্ধের বর্ণনা। ট্রয়ের রাজকুমার প্যারিস গ্রীক দেশের স্পার্টা রাজ্যের রাণী হেলেনকে নিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে যান নিজের রাজ্যে। অপমানে ক্ষিপ্ত গ্রীকরা জাহাজে চড়ে ইজীয়ান সাগর পার হয়ে ট্রয় আক্রমণ করে। প্রাচীর বেষ্টিত সুরক্ষিত ট্রয়। দশবছর চেষ্টা করেও গ্রীকরা নগরে প্রবেশ করতে পারে নি। অবশেষে প্রকাণ্ড এক কাঠের ঘোড়ার পেটে লুকিয়ে তারা চুরি করে নগরে ঢুকেছিল। গ্রীকদের হাতে ট্রয় ধ্বংস হল। সারা সহর তারা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিল। অনুমান, এ যুদ্ধ ঘটেছিল হোমারের সময়ের প্রায় সাত আটশো বছর আগে।

বাবা বললেন ট্রয়ের কোনো চিহ্নই নেই আজ। বোধহয় বর্তমান তুরস্কের উত্তর পশ্চিম ধারে ইজীয়ান সাগরের তীরে ছিল এই নগর। কিন্তু আজ কেউই বলতে পারে না এর ঠিক ঠিকানা।

সাত বছরের ছেলে তখুনি প্রতিজ্ঞা করে বসল—বড় হয়ে আমি একদিন এই ট্রয়কে খুঁজে বের করবই করব।

এসব হল ১৮২৯ সালের কথা।

প্রতিজ্ঞাতো অনেকেই করে, রাখে ক'জন? তারপর আবার ছোটবেলার ঝোঁকের মাথায় প্রতিজ্ঞা। কিন্তু হাইনরিখ স্লীমান ছিলেন ভিন্ন ধাতুতে গড়া। জীবনযুদ্ধে হাবুডুবু খেতে খেতে দীর্ঘকাল কোনো অবসর মেলে নি টাকা রোজগার ছাড়া অন্য কিছু করার। কিন্তু কথাটা ভোলেন নি তিনি। মনের কোণে সযত্নে লালন করেছেন ছেলেবেলার সেই শপথ।

পিতার মৃত্যুর ফলে মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে স্লীমানকে স্কুল ছাড়তে হল।—বেরোতে হল রোজগারের ধান্দায়। এর পরে তাঁর জীবনের অনেক বছর কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে কেটেছিল।

প্রথমে এক মুদির দোকানে কাজ করলেন বছর পাঁচেক। উদয়াস্ত খাটুনিতে স্বাস্থ্য গেল ভেঙে। উনিশ বছর বয়সে ভাগ্য ফেরাবার আশায় তিনি স্বদেশ জার্মানী ত্যাগ করে দক্ষিণ আমেরিকায় পাড়ি দিলেন। পথে হল জাহাজ ডুবি। কোনোমতে প্রাণে বেঁচে উপস্থিত হলেন হল্যাণ্ডে। সেখানে এক সামান্য চাকরি জুটল। ধীরে ধীরে উন্নতি হতে লাগল চাকরিতে। শেষে তিনি নিজেই একটা ব্যবসা ফাঁদলেন। অল্পদিনেই সৌভাগ্যের মুখ দেখলেন। প্রচুর লাভ করলেন ব্যবসায়। এতদিনে অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হলেন স্লীমান।

ভাষা শেখার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর। কত কম বয়সে স্কুল ছেড়েছেন, তারপর সুযোগ পাননি আর কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ার। কিন্তু ঘরে বসে নিজের চেষ্টায় তিনি এক ডজনের বেশি বিদেশী ভাষা রপ্ত করেছিলেন। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য তিনি ভালো করে পড়েছিলেন। বার বার পড়ে ইলিয়ড তাঁর মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। আর পড়েছিলেন—ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব। তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল ইলিয়ডের প্রত্যেকটি বর্ণনা বাস্তব সত্য।

ছেচল্লিশ বছরে পৌঁছে স্লীমান ব্যবসা থেকে অবসর নিলেন। অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। আর দেরি করা নয়। অনেক দিনের রুদ্ধ বাসনা নিয়ে তিনি নিবিষ্ট হলেন ট্রয় আবিষ্কারে।

পণ্ডিতরা বাঁকা হাসি হেসেছিলেন। বলিহারি সাহস! ঐটুকু বিদ্যে আর শূন্য অভিজ্ঞতা নিয়ে ঝানু পুরাতত্ত্ববিদরা যে কাজে হাত দিতে সাহস করে নি সেই লুপ্ত ট্রয়কে খুঁজে বের করার ভরসা রাখে লোকটা। তাছাড়া অনেক হোমরা চোমরা পণ্ডিত মনে করতেন হোমারের বর্ণনার কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। প্যারিস-হেলেন উপাখ্যান, ট্রয়-যুদ্ধ, ট্রয় নগরের বর্ণনা—এসব কিংবদন্তী, হয়তো ঐ দেশের লোকের বানানো। আর তার উপর রঙ চড়িয়েছেন কবি হোমার কাজেই হোমারের কাব্য সম্বল করে ট্রয় আবিষ্কারের চেষ্টাকে নিছক পাগলামি ছাড়া আর কি বলা যায়?

অবশ্য স্লীমান এদের কথা বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করলেন না।

তিনি তুরস্কে উপস্থিত হলেন। ইজীয়ান সাগরের উত্তর-পূর্ব পারে কোথাও ছিল ট্রয়। তখনকার বেশিরভাগ পুরাতত্ত্ববিদ যে স্তূপটার নিচে ট্রয় লুকিয়ে আছে বলে বিশ্বাস করতেন সেটা দেখে তাঁর আস্থা হল না। এর চারদিকের দৃশ্য সমুদ্রকূল থেকে দূরত্ব ইত্যাদি হোমারের বর্ণনার সঙ্গে তো মিলছে না।

হিসারলিক নামে এক গ্রামের কাছে আর একটা স্তূপ তাঁর চোখে পড়ল। কয়েকজন পুরাতত্ত্ব-বিদও এই জায়গাতেই ট্রয় ছিল বলে সন্দেহ করেছেন। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যেও আছে এই হিসারলিকেই ছিল হোমারের বর্ণিত ট্রয়। কাছেই একটা পুরনো সহরের ধ্বংসাবশেষ। সহরটা তৈরি করে ছিল হোমারের পরের যুগের গ্রীকরা। নাম দিয়েছিল—নবট্রয়। স্লীমান এই স্তূপটাই খুঁড়ে দেখবেন স্থির করলেন।

১৮৭০ সালে খনন কার্য আরম্ভ হ'ল।

স্লীমান ও তাঁর স্ত্রী সারাদিন দাঁড়িয়ে থেকে কাজের তদারক করতেন। ঢিপির উপরেই তাঁরা একটি কুটীর বানিয়ে সেখানে বাস করতে লাগলেন।

কিছুদূর গর্ত খোঁড়ার পরেই দেখা গেল নগরের চিহ্ন। গর্ত যত গভীরে যায় দেখা যায় একাধিক নগরের অস্তিত্ব। হোমারের ট্রয় তাহলে একমাত্র ট্রয় নয়! অনেকগুলি ট্রয়ের জন্ম-মৃত্যু ঘটেছিল এখানে। ভূমিকম্প, শত্রুর আক্রমণ ইত্যাদি কারণে একটা করে সহর ভেঙ্গে পড়েছে আর, প্রত্যেকবার নতুন এক জনপদ গড়ে উঠেছে পুরনো সহরের বুকের উপর। আগের সহর চাপা পড়ে গেছে নতুন সহরের পায়ের তলায়।

পর পর নটি নগর আবিষ্কৃত হল।

এখন হোমারের ট্রয় কোনটি? স্লীমানের ধারণা যে সেই ট্রয় যেহেতু খুবই প্রাচীন, তাকে পাওয়া যাবে একেবারে নিচের দিকে। তিনি খুঁজছেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই দিয়ে তৈরি সুদৃঢ় প্রাচীরের অবশেষ। যা নাকি গ্রীক আক্রমণকে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন বছরের পর বছর। বিশাল সব সৌধ-মালার নিদর্শন—

দু বছর চলল খননকার্য টিপির নানা অংশে।

শেষকালে আবিষ্কার হল তেমনি এক নগর—সব চেয়ে তলা থেকে দ্বিতীয় স্তরে। পাওয়া গেল বিশাল পাথর দিয়ে তৈরি প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ—বিশাল এক অট্টালিকার প্রমাণ—আর সাংঘাতিক কোনো অগ্নিকাণ্ডের চিহ্ন। স্লীমান ধারণা করলেন এই হচ্ছে হোমারের বর্ণিত ট্রয়—আর এই অট্টালিকাটিই ছিল রাজপ্রাসাদ। কাব্যে বর্ণিত আছে এখানেই ট্রয়ের রাজবংশের ধনরত্ন লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।

দেখা যাক ট্রয়ের অতুল ঐশ্বর্যের কিছু সন্ধান মেলে কিনা।

একদিন হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল ইট পাথরের আবর্জনার ফাঁকে কি জানি চকচক করছে।—সোনা!

তাড়াতাড়ি সমস্ত লোকজনকে ছুতো করে দূরে সরিয়ে স্লীমান নিজেই নেমে পড়লেন কাজে। ছুরি দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে অতি সাবধানে বের করতে থাকলেন একটার পর একটা অলঙ্কার, পাত্র, ছুরি ইত্যাদি। গুনে দেখলেন মোট ছাপ্পান্নটি সোনার কানের গয়না, চৌত্রিশটি তামার ছুরি আট হাজারেরও বেশি সোনার আংটি। কয়েকটি সোনার হাতের গয়না ও পানপাত্র এবং অপূর্ব সুন্দর দুটি ঝালর লাগানো সোনার মুকুট।

স্লীমানের আনন্দ দেখে কে!

এ নিশ্চয় রানী হেলেনের অলঙ্কার! কেউ বোধ হয় সিন্দুক ভরা ধনরত্ন নিয়ে পালাচ্ছিল জ্বলন্ত প্রাসাদ ছেড়ে। কিন্তু বেশী দূর যেতে পারে নি, ভাঙ্গা পাথর ও ভস্মস্তূপের তলায় চাপা পড়ে গেল সিন্দুক।

খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। স্লীমান ট্রয় আবিষ্কার করেছেন—খুঁজে পেয়েছেন হেলেনের অলঙ্কার। লোকের মুখে মুখে তাঁর নাম। তিনি যেন এক রূপকথার নায়ক।

স্লীমানের মৃত্যুর পর আরও খোঁজাখুজি হয়। অনেক পরীক্ষার পর পুরাতত্ত্ববিদরা স্থির করেন তাঁর অনুমান ঠিক নয়। দ্বিতীয় ট্রয়—যাকে স্লীমানের ইলিয়ডের ট্রয় বলেছেন তা নাকি প্যারিস ও

হেলেনের আমল থেকে অন্ততঃ হাজার বছরের পুরনো। ঐ ধনরত্ন বোধকরি অন্য কোনো রাজার। ইলিয়ডের ট্রয়ের প্রমাণ পাওয়া গেছে আরও অনেক উপরের স্তরে। আবিষ্কার হয়েছে সেই বিখ্যাত প্রাকারের ভগ্নাবশেষ। এই প্রাকার ছিল পনেরো ফুট চওড়া ও ত্রিশ ফুট উঁচু।

এই নগরের কিছুটা স্লীমানের চোখেও পড়েছিল। কিন্তু তিনি ভেবেছিলেন জনপদটি হোমারের ট্রয় থেকে বয়সে অনেক নবীন।

ইলিয়ডের ট্রয়কে সঠিক চিনতে পারেন নি বলে হাইনৃরিখ স্লীমানের কৃতিত্ব কিছুমাত্র খাটো হয়ে যায় নি। ইলিয়ডের ট্রয় খোঁজার নেশায় তিনি পৌরাণিক যুগের এক লুপ্ত সভ্যতার ইতিহাস উন্মোচিত করেন। তার গুরুত্ব আরও বেশি।

ছেলেবেলার প্রতিজ্ঞা তিনি রেখেছিলেন, প্রমাণ করেছিলেন ট্রয় সত্যি। হোমারের বর্ণনা ও কিংবদন্তীর কাহিনীগুলি নিছক কল্পনা নয়।

ঝল্‌মল্‌ তারা

শ্রীদীপক রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (বহুব্রীহি)

ওগো উজ্জ্বল জ্বল্‌ জ্বল্‌
ঝল্‌মল্‌ তারা।
তোমায় দেখিগো চেয়ে
তন্দ্রাহারা॥
ক্লান্তিতে চাঁদ ওই
ডুবে গেলে পরে।
তুমি তবু জেগে থাক
সারা রাত ধরে।
সবাই ঘুমায় শুধু
তুমি নিদ্‌হারা॥
ওগো উজ্জ্বল জ্বল জ্বল
ঝল্‌মল্‌ তারা॥
অমানিশা রাত যবে
চাঁদ থাকে নাকো

ঢল্‌ ঢল্‌ চোখে তুমি
তবু চেয়ে থাকো॥
তখন প্রদীপ খানি
হাতে তুলে নাও
পথহারা পথিকেরে
পথটি দেখাও॥
ওগো উজ্জ্বল জ্বল্‌ জ্বল্‌
হীরকের দুল্‌
তুমি নভোবসনের
চুমকীর ফুল
তুমি মোর স্বপ্নের
সোনালী ফসল
ওগো উজ্জ্বল জ্বল জ্বল
তারকার দল॥

ভীষ্ম

সুখরঞ্জন রায়

গঙ্গা আর শান্তনুর অষ্টম নন্দন,
শাপভ্রষ্ট বসুদেব তুমি একজন।
অদ্বিতীয় ধনুর্ধর সর্ববিদ্যাবিদ,
শস্ত্র-বিশারদ সর্ব শাস্ত্রেতে কোবিদ ;
নর দেবতার প্রিয় নাম দেবব্রত
প্রশান্ত তেজস্বী ধীর সদা সত্যরত।
দাসরাজ কাছে কৈলে প্রতিজ্ঞা ভীষণ—
বিমাতার পুত্রে দিবে রাজ্য সিংহাসন,
নিজে ছাড়ি'রাজ্যলোভ যাতে ভবিষ্যতে
রাজ্য লোভী পুত্র নাহি জন্মে কোনমতে,
আজীবন ব্রহ্মচর্য করিবে পালন,
করিবে রাজার সেবা রাজ্য-সংরক্ষণ।
অপার্থিব প্রতিজ্ঞায় পৃথিবী স্তম্ভিত,
স্বর্গধামে সুরগণ হ'ল পুলকিত ;
অমর অপ্সরাগণ পুষ্পবৃষ্টি করে,
হইল আকাশ বাণী সুদূর অম্বরে—
'ভীষণ প্রতিজ্ঞা লাগি' এই অভিনব
আজি হতে এ জগতে ভীষ্ম নাম তব।'
সূর্য পারে নিজ প্রভা ত্যাগ করি' দিতে,
নাহি দেখা যেতে পারে উত্তাপ অগ্নিতে ;
বায়ু পারে স্পর্শগুণ দিতে পরিহরি,
জ্যোতি সে থাকিতে পারে রূপ নাহি ধরি' ;
আকাশ শব্দের গুণ পারে বিসর্জিতে,
ইন্দ্র, পারে পরাক্রম নাহি প্রকাশিতে ;
ধর্মরাজ ছেড়ে পারে ধর্মেরে আপন,
ভীষ্ম নিজ সত্যে তবু করে না লঙ্ঘন!
রাজ্যলোভ ধনলোভ সর্বভোগ ছাড়ি'
পরহিতে দিলে নিজ জীবনেরে ডারি ;
আপনার সুবিরাট পক্ষ ছায়া-তলে
পালিলে পুরুষে তিন সত্য-ধর্ম বলে ;
পরে যবে কুরুকুলে বাধিল বিবাদ,
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল তব মনো সাধ,
যার অন্নে পুষ্ট দেহ তারে দিলে দেহ,
পাণ্ডবেরে হৃদিমন হৃদয়ের স্নেহ ;
আপনারে বাটি' দিলে করিয়া বিভাগ,
আত্মযুদ্ধে ফুটাইলে সুমহান ত্যাগ।
শর-শয্যা স্বেচ্ছামৃত্যু বরি' নিলে বীর,
সবার উপরে রাজে তব শুভ্র শির ;
সর্বত্যাগী সর্বদর্শী হে চির কুমার,
প্রণমি হে অভ্রভেদী ব্যক্তিত্বে তোমার।
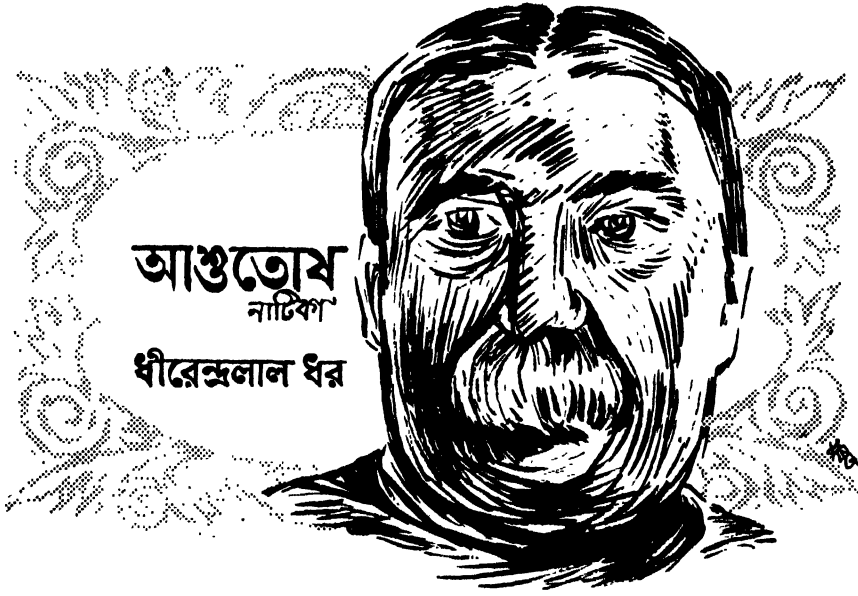
প্রথম দৃশ্য-ঃ

কলিকাতা ভবানীপুরের বাড়ির দোতলার ঘর। আশুতোষের পড়বার ঘর। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। জানালার পাশে একখানি চেয়ারে বসে বালক আশুতোষ নিবিষ্ট মনে একখানি বই পড়ছেন।

[ভৃত্যের প্রবেশ]

ভৃত্য। অন্ধকারে পড়ছ দাদাবাবু, আলোটা জেলে দিয়ে যাই।

আশু। [সচকিতে] অাঁ! হ্যাঁ দাও!

[টেবিলের উপর টেবিল ল্যাম্প ছিল, চিমনি খুলে ভৃত্য আলো জেলে দিল।]

ভৃত্য। এবার পড়ুন। [প্রস্থান]

[আশুতোষ চেয়ারখানি টেবিলের কাছে টেনে নিয়ে এলেন। তারপর আলোর নিচে টেবিলের উপর বই রেখে আবার পড়তে সুরু করলেন।]

[ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদের প্রবেশ]

গঙ্গা। পড়ছিস্? পড়!

আশু। [সচকিতে] পড়ছি।

গঙ্গা। পড়। [প্রস্থানোপক্রম।]

আশু। চলে যাচ্ছ? আজ বক্তৃতা শুনবে না বাবা?

গঙ্গা। পড়ার ক্ষতি হবে।

আশু। এ তো গল্পের বই পড়ছি বাবা, তুমি বসো আমি বক্তৃতা করি।

[গঙ্গা হাসতে হাসতে একখানি চেয়ারে বসলেন]

আশু। আজ দুটো বলব বাবা।

গঙ্গা। বেশ।

[টেবিলের একপাশে একটি ছোট টুল ছিল, আশুতোষ সেই টুলটির উপর উঠে দাঁড়ালেন। বুকের উপর দুহাত রেখে গম্ভীরভাবে পিতার মুখের পানে তাকালেন।]

আশু। বাবা, বলছি—

গঙ্গা। বল—

আশু। [উচ্চকণ্ঠে] 'জননীর এই অবস্থা ও ক্লেশ দেখিয়া পুত্র মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল ; ইনি অনেক কষ্টে আমায় লালন পালন করিয়াছেন। ইহার স্নেহ ও যত্নেই আমি এত বড় হইয়াছি ও এতদিন পর্যন্ত জীবিত রহিয়াছি। এখন ইঁহার এই অবস্থা উপস্থিত। আমার প্রতিপালন ও বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত ইনি এত দিন যত যত্ন ও যত পরিশ্রম করিয়াছেন, এক্ষণে ইঁহার জন্য আমার তদপেক্ষা অধিক যত্ন ও অধিক পরিশ্রম করা উচিত। আমি থাকিতে যদি ইনি অনাহারে প্রাণত্যাগ করেন তাহা হইলে আমার বাঁচিয়া থাকা বিফল। আমার বারো বৎসর বয়স হইয়াছে এ বয়সে পরিশ্রম করিলে অবশ্যই কিছু কিছু উপার্জন করিতে পারিব।'

[বালক থামলেন, পিতার মুখের পানে তাকালেন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে]

গঙ্গা। বাঃ, বেশ হয়েছে ! ও কোন বই থেকে ? [উঠে দাঁড়ালেন]

আশু। আখ্যান মঞ্জরী। আজ আরেকটী বলব বাবা।

গঙ্গা। আরেকটী বলবে ? বেশ বল—

আশু। তুমি বসো বাবা, না বসলে শুনবে কি করে ?

গঙ্গা। [হাসতে হাসতে আবার বসলেন] বেশ, এবার বল—

আশু। [উচ্চকণ্ঠে] 'মহাশয়, আমরা বহুকালের অসভ্য জাতি। আপনারা সভ্যজাতি বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। কিন্তু দেখুন. সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার বিষয়ে অসভ্য জাতি, সভ্য জাতি অপেক্ষা কত অংশে উৎকৃষ্ট। সে যাহা হউক, অবশেষে আপনকার প্রতি আমার বক্তব্য এই, যে অবস্থার লোক হউক না কেন, যখন ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হইয়া আপনার আলয়ে উপস্থিত হইবে, তাহার যথোপযুক্ত আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিবেন ; তাহা না হইলে তেমন অবস্থায়; অবমাননাপূর্বক তাড়াইয়া দিবেন না।'

গঙ্গা। বেশ্ হয়েছে। এ কোন্ বই থেকে ?

আশু। আখ্যান মঞ্জরী।

গঙ্গা। ক'দিন তো আখ্যানমজরী শুনলাম। কাল অন্য বই থেকে বলবে।

আশু। বাবা, বক্তৃতা আমার ঠিক হচ্ছে ? এইভাবে বক্তৃতা করতে পারলে হবে ? আমি জজ্ হতে পারবো দ্বারিক কাকার মতো ?

গঙ্গা। জজ্ হবি দ্বারিক কাকার মতো—জাস্টিস্ দ্বারকা নাথ মিত্র ?

আশু। হ্যাঁ বাবা, আমি বড় হয়ে অম্‌নি জজ হব।

গঙ্গা। তুমি হবে—জাস্টিস আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, এঁ্যা ?

আশু। হ্যাঁ বাবা। তুমি তো বলেছ বক্তৃতা করতে, আমি বক্তৃতা করছি। আর কি করলে জজ্ হয় বল, সি সব করব।

গঙ্গা। এ তো একটা দিক হল। জজ হতে হলে অনেক কিছু জানতে হবে, অনেক পড়তে হবে।

আশু। পড়ছি তো বাবা, তুমি যত বই এনে দাও, সবই তো পড়ি।

গঙ্গা। এসব বই তো বাইরের বই। ইস্কুলের পড়া কেমন হচ্ছে ?

আশু। সে আমার ঠিক আছে বাবা।

গঙ্গা। আজ?

আশু। ক্লাসে ফার্ষ্ট।

গঙ্গা। তাহলে এই নাও আজকের পাওনা, ফার্ষ্ট হলে একটাকা, সেকেণ্ড হলে আট আনা।

[পকেট থেকে একটী চকচকে রূপার টাকা বের করে দিলেন।]

আশু। [টাকাটা দেখতে দেখতে] সেকেণ্ড আমি ক্লাসে একদিনও হব না, তুমি দেখো। আমার রোজ একটাকা করে চাই। অনেকগুলো নতুন বই কিনতে হবে।

গঙ্গা। কোন্ কোন্ বই কিনতে হবে, আমাকে লিস্ট দিয়ে দিস্ কাল সকালে।

আশু। তুমি যা দেবার কিনে দিও বাবা, আমার টাকা দিয়ে আমি আমার পছন্দমত বই কিনব।

গঙ্গা। কি কি বই তোর পছন্দ তার একটা লিস্ট করে আমাকে দিস্। যেগুলো তুই পারবি কিনবি বাকি আমি কিনে দোব।

আশু। তাহলে তো ভারী মজা, আমি এখনি বসে লিস্ট করে দিচ্ছি।

গঙ্গা। [উঠে পড়লেন।] আচ্ছা, তুই এখন লিস্ট তৈরি কর, আমি নিচে যাই, অনেক রোগী বসে আ

[বেরিয়ে গেলেন

আশু। [আবার চেয়ারে এসে বসল। টেবিলের উপর থেকে বইখানা তুলে নিলে।] কাল বাব নতুন জিনিস শোনাবো—কাল বলব মেঘনাদবধ কাব্য থেকে, বাবা অবাক হয়ে যাবেন—[পড়তে করে দিল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

১৯০২ সাল।

কলিকাতায় লাট সাহেবের বাড়ি।

[আশুতোষ প্রবেশ করলেন।

একজন আরদালি এসে সেলাম দিল। একখানি ছোট রুপার রেকাবি ধরল আশুতোষের সামনে।

আশুতোষ নামের একখানি কার্ড রাখলেন রেকাবির উপর।

আরদালী ভিতরে চলে গেল।

আশুবাবু একখানি চেয়ারে গিয়ে বসলেন।

সামনে দেয়ালের কাছে একটি সুদৃশ্য সৌখীন ঘড়ি, একটি ছোট টেবিলের উপর বসানো। এবার টুং টাং করে সেটিতে জলতরঙ্গের সুর উঠল। ন'টা বাজল।

আরদালী ফিরে এল।

আরদালী। সেলাম সাব্।

[আশুতোষ উঠে দাঁড়ালেন, আরদালীর সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।]

মঞ্চের আলো নিবে গেল।

এক মিনিট পরে আবার আলো জ্বলে উঠল। একখানি বড় ভিকটোরিয়ান চেয়ার। চেয়ারে বসে আছেন লর্ড কার্জন সামনে টেবিলের উপর একটি ফুলদানী, তাতে টাট্‌কা ফুলের একটি তোড়া সাজানো।

কার্জনের পিছনে একজন দেহরক্ষী দাঁড়িয়ে আছেন।

[আরদালী আশুতোষকে দরজা অবধি পৌঁছে দিয়ে গেল, আশুতোষ ভিতরে প্রবেশ করলেন।]

আশুতোষ। গুড্ মর্নিং ইওর একসেলেনসি।

কার্জন। গুড্ মর্নিং ডক্‌টর মুখার্জি, বসুন।

[আশুতোষ বসলেন।]

কার্জন। আপনি আমার নিমন্ত্রণপত্র পেয়েছেন ?

আশু। আজ্ঞে হ্যাঁ।

কার্জন। কবে আপনি যাত্রা করবেন ?

আশু। আমি দুঃখিত।

কার্জন। এখনও কিছু ঠিক করেন নি ?

আশু। করেছি।

কার্জন। কবে গেলে আপনার সুবিধা হয় ?

আশু। আমার যাওয়া হবে না।

কার্জন। কোন অসুবিধা আছে ?

আশু। না। আমার মায়ের মত নেই।

কার্জন। মাকে আমার কথা বলেছেন ?

আশু। আপনার পত্র দেখিয়েছি। তিনি অনুমতি দেন নি।

কার্জন। বলেছেন, সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উৎসব বিশেষ সমারোহের ব্যাপার। মাত্র কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয় সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেবার নিমন্ত্রণ পেয়েছেন আপনি তাঁদের মধ্যে একজন। এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া অতীব সম্মানের ব্যাপার।

আশু। মাকে সব বলেছি, কিন্তু মা আমার বিলেত যাওয়া পছন্দ করেন না।

কার্জন। আপনি গেলে আমি সুখী হতাম।

আশু। আমি দুঃখিত।

কার্জন। আমার অনুরোধ রক্ষা করাই আপনার কর্তব্য। আপনার মা সেকেলে মানুষ, তিনি ব্যাপারটার গুরুত্ব হয়তো ঠিকমত বুঝতে পারেন নি।

আশু। আমি তাঁকে সব কথাই বলেছি। আরও বলেছি যে রাজপ্রতিনিধির অনুরোধ মানেই আদেশ।

কার্জন। আপনি এই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলে, আমাদের কাছ থেকে ভবিষ্যতে আপনার আর কিছু প্রত্যাশা করার থাকবে না।

আশু। জানি। প্রত্যাশা আমি কিছুই রাখি না। মা যখন অনুমতি দেননি, আমি যাব না। আমার কাছে মায়ের চেয়ে বড় আর কিছু নেই।

কার্জন। তাহলে না যাওয়াই আপনার শেষ কথা?

আশু। আজ্ঞে হ্যাঁ।

কার্জন। আপনি যা কিছু করেন মায়ের অনুমতি নিয়ে করেন?

আশু। আজ্ঞে হ্যাঁ।

কার্জন। আমি যদি আপনাকে হাইকোর্টের জজ্ করি, তখনও কি আপনি মাকে জিজ্ঞাসা করবেন?

আশু। আজ্ঞে হ্যাঁ।

কার্জন। তিনি যদি অনুমতি না দেন?

আশু। তাহলে আমি সে পদ গ্রহণ করব না।

কার্জন। [কয়েক মিনিট চুপ করে তাকিয়ে রইলেন আশুতোষের মুখের পানে তারপর] আমি তোমার মাতৃভক্তির প্রশংসা করি। তুমি সত্যই সুসন্তান। তোমার লেখাপড়া শেখা সার্থক হয়েছে।

[উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন]

তোমার এই মাতৃভক্তির কথা আমার মনে থাকবে।

আশুতোষ উঠে দাঁড়ালেন, লাট সাহেবের সঙ্গে করমর্দন করলেন।]

কার্জন। গুড্ বাই।

আশু। গুড আফটারনুন ইওর একসেলেন্সি।

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

মহীশূরের রাজপ্রাসাদের ফটক। উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে ফটকের দুপাশে দুজন শান্ত্রী। ফটক খোলা। সামনে দাঁড়িয়ে আছেন রাজমন্ত্রী।

[ধুতি পাঞ্জাবী চাদর পরণে আশুতোষ প্রবেশ করলেন।]

মন্ত্রী। গুড মর্নিং স্যার, আসুন।

আশুতোষ। নমস্কার। [হাত তুলে নমস্কার করলেন।]

মন্ত্রী। চলুন স্যার—[এক সঙ্গে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ফিরে এলেন।]

আশুতোষ এগিয়ে চললেন।

মন্ত্রী—সহসা ফিরে দাঁড়িয়ে পিছন পানে তাকালেন। তারপরেই দ্রুতপদে এসে আশুতোষকে ধরলেন।

মন্ত্রী। স্যার!

আশু। [ফিরে দাঁড়ালেন] আমায় কিছু বলছেন?

মন্ত্রী। একটা কথা স্যার।

আশু। বলুন?

মন্ত্রী। দরবারে মহারাজা আছেন স্যার।

আশু। জানি। [হেসে] তিনিই তো নিমন্ত্রণ-কর্তা।

মন্ত্রী। আপনি তো সেইখানেই যাচ্ছেন স্যার।

আশু। হ্যাঁ, কেন?

মন্ত্রী। দরবারে মহারাজের সামনে টুপি বা পাগড়ি মাথায় দিয়ে যাওয়াই রীতি স্যার।

আশু। কিন্তু আমরা বাঙালীরা তো পাগড়ি পরি না।

মন্ত্রী। এইটাই এখানকার দরবারী রীতি স্যার, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি একটা পাগড়ি ।পনাকে আনিয়ে দি।

আশু। এই ধুতিপাঞ্জাবীর সঙ্গে পাগড়ি মাথায় দিলে তো একটা সং দেখাবে।

মন্ত্রী। কিন্তু স্যার, এই রীতির অন্যথা হলে মহারাজ বিরক্ত হতে পারেন।

আশু। আমি তো আপনাদের মহারাজের কাছে কোন অনুগ্রহ চাইতে আসিনি। আমি স্যাডলার মিশনের সদস্য সেইজন্যই তিনি আমাকে আমন্ত্রণ করেছেন।

মন্ত্রী। জানি স্যার। আপনি মাননীয় অতিথি, তিনি আপনাকে কিছুই বলবেন না। পরে আমাকে ।বেন। আমি একটা পাগড়ি আপনাকে আনিয়ে দিচ্ছি স্যার।

আশু। না, আপনি ব্যস্ত হবেন না মন্ত্রী মশাই। সং সেজে আমি মহারাজের দরবারে যাব না। এই মার জাতীয় পোষাক, এই পোষাকে গেলে আপনি যখন শঙ্কিত হচ্ছেন, তখন আমি ফিরে যাচ্ছি। এই াজসভায় না গেলেও আমার কোন ক্ষতি নেই। [ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।]

[মন্ত্রী কী বলবেন ভেবে পেলেন না, বোকার মত তাকিয়ে রইলেন। ইতিমধ্যে দুজন এদেশীয় লোক স পড়ল, তাদের পরণে সাহেবী পোষাক। মন্ত্রী তাদের অভ্যর্থনা জানালেন।]

মন্ত্রী। গুড মর্নিং স্যার! গুড মর্নিং স্যার!

প্রথম আগন্তুক। গুড মর্নিং!

দ্বিতীয় আগন্তুক। গুড মর্নিং!

[মন্ত্রী দুজনকে কয়েক পা এগিয়ে দিয়ে গেলেন। তারা ভিতরে চলে গেল।

রাজবাড়িতে বিকাল পাঁচটার ঘণ্টা পড়ল।

ভিতর দিক থেকে মহারাজ প্রবেশ করলেন। সঙ্গে সেক্রেটারী, পিছনে দুজন আরদালী।]

মহারাজ। পাঁচটা বাজলো, সবাই এলো, স্যার আশুতোষের কি হল? মন্ত্রী মশাই!

মন্ত্রী। [ত্রস্তে] ইয়েস, ইওর হাইনেস!

মহারাজ। স্যার আশুতোষ এখনও এলেন না কেন? একবার খবর নিন তো।

মন্ত্রী। তিনি এসেছিলেন স্যার।

মহারাজ। এসেছিলেন? কোথায় গেলেন?

মন্ত্রী। তিনি ধুতি পাঞ্জাবী পরে এসেছিলেন, ফিরে গেছেন।

মহারাজ। ফিরে গেছেন কেন?

মন্ত্রী। আমি তাঁকে বললাম যে মাথায় পাগড়ি পরে যাওয়াই এখানকার দরবারী রীতি, তিনি তাই ফিরে গেলেন।

মহারাজ। তুমি তাঁকে ফিরিয়ে দিলে?

মন্ত্রী। আজ্ঞে না। আমি তাঁকে একটা পাগড়ি আনিয়ে দিচ্ছিলাম তিনি অপেক্ষা করলেন না।

মহারাজ। স্যার আশুতোষকে তুমি পাগড়ি পরাতে চেয়েছিলে?

মন্ত্রী। দরবারে এই রীতিই তো চলে আসছে, ইওর হাইনেস!

মহারাজ। তোমরা কিছু বোঝ না। এক নিয়ম সবাইকার জন্য নয়। স্যার আশুতোষ সাধারণ মানুষ নন্ তিনি ভারতবর্ষের শিক্ষাবিদ্‌দের মুখপাত্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যানসেলর, কলিকাতা হাইকোর্টের জজ্, তাঁর সাজপোষাক কিছু নয়, তাঁর উপস্থিতিটাই এখানে বড় কথা।

মন্ত্রী। [হাত কচলাতে কচলাতে] আমি দুঃখিত ইওর হাইনেস।

মহারাজ। এখনি যাও, এখনি গিয়ে তাঁকে নিয়ে এসো। যে ভাবে যে বেশে তিনি আসতে চান আসুন, যাও—[সহসা কি ভেবে] নানা, একটু দাঁড়াও, তুমি একা গেলে হবে না। রাজকুমার তোমার সঙ্গে যাক্।

[আরদালীর প্রতি] ওরে, রাজকুমারকে ডেকে নিয়ে আয়—

[একজন আরদালী ছুটে ভিতরে চলে গেল।]

তোমরা শুধু নিয়মকানুন রীতি নিয়েই ব্যস্ত। মানুষকে ছাপিয়ে তোমাদের সাজপোষাক কায়দা কানুনের আড়ম্বর! বাইরের ঠাট্ বজায় রাখতেই তোমরা সর্বশক্তি ব্যয় কর ভিতরের গুণের বিচার করার অবকাশ তোমাদের কোথায়?

[রাজকুমার প্রবেশ করলেন, পিছনে আরদালী।]

মহারাজ। রাজকুমার, মন্ত্রীমশায়ের সঙ্গে তাড়াতাড়ি যাও, স্যার আশুতোষকে ডেকে নিয়ে এসো। বলবে আমি তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছি, না এলে চলবে না।

[রাজকুমার মন্ত্রীর সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন।

মহারাজ। [স্বগতঃ] স্যার আশুতোষের মাথায় পাগড়ি পরাবেন! উনিই তো এখন এদেশের শিক্ষিত সমাজের মাথার পাগড়ি। ওই মাথায় আবার পাগড়ির দরকার কি! এদের কোনো বুদ্ধি নেই, কিচ্ছু বোঝে না। এদের নিয়ে আমার রাজ্য চলে।......

[চঞ্চলভাবে পায়চারী করতে লাগলেন।]

সেক্রেটারী। ইওর হাইনেস!

মহারাজ। বল?

সেক্রেটারী। পাঁচটায় টাইম দেয়া ছিল।

মহারাজ। জানি।

সেক্রেটারী। ভিতরে সবাই বসে আছেন।

মহারাজ। জানি।

সেক্রেটারী। আপনি গেলেই সভার কাজ সুরু হতে পারে।

মহারাজ। তা জানি। কিন্তু আমি এখনি যেতে পারছি না। আগে স্যার আশুতোষ আসুন, তাঁকে নিয়ে তবে যাব।

সেক্রেটারী। দেরী হয়ে যাবে ইওর হাইনেস।

মহারাজ। হবে।

সেক্রেটারী। সাহেবরা রয়েছেন, ভাববেন আমাদের সময়-জ্ঞান নেই।

মহারাজ। তা তাঁরা ভাবতে পারেন। তুমি তাঁদেরকে গিয়ে বলগে আমি কয়েক মিনিটের মধ্যেই যাচ্ছি।

[সেক্রেটারী ভিতরে চলে গেলেন।

মহারাজ পায়চারি করতে করতে বার বার—হাতঘড়ি দেখতে লাগলেন।]

[স্যার আশুতোষকে নিয়ে রাজকুমার প্রবেশ করলেন। পিছনে মন্ত্রী।]

মহারাজ। [এগিয়ে গিয়ে] আসুন আসুন—

আশু। নমস্কার।

মহারাজ। আপনি ফিরে গেছেন শুনে আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।

আশু। [হাসতে হাসতে] দেরী হয়ে গেল।

মহারাজ। সে তো আপনার জন্য [হাসতে হাসতে] শিবহীন যজ্ঞ কি হয় ?

আশু। তাহলে তো 'বেটার লেট দ্যান নেভার।' [হাস্য]

মহারাজ। চলুন—চলুন—

আশুতোষের হাত ধরে মহারাজ ভিতরে চলে গেলেন।

রাজকুমার ও মন্ত্রী অনুসরণ করলেন।

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

কলিকাতাগামী ট্রেন। প্রথম শ্রেণীর কামরায় একটি বার্থে আশুতোষ কম্বলমুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছেন।

সামনের বার্থে একজন মিলিটারী অফিসার শুয়ে আছে।

কামরায় আর যাত্রী নেই।

আশুতোষ ফিরছেন আলিগড় থেকে।

সহসা ট্রেনের শব্দ থেমে গেল।

(নেপথ্যে) গরম চায়। পুরী মিঠাই। পান বিঁড়ি সিগ্রেট।

সাহেব উঠল। জানালাটা একবার খুলল। শীতের রাতের এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ঢুকল কামরায়।

সাহেব জানালা বন্ধ করল। তারপর বার্থের এক পাশ থেকে একটা বাস্কেট টেনে নিলে। বাস্কেটে দুটি বোতল ও দুটি গেলাস ছিল। একটি গেলাসে আধ গেলাস মদ ঢেলে নিয়ে সাহেব চুমুক দিলে।

হুইস্‌ল বাজল, গাড়ি আবার চলতে শুরু করলো। সাহেব ধীরে ধীরে গেলাস শেষ করল।

এবার গেলাসটা হাতে নিয়ে সাহেব উঠে দাঁড়াল, চলল কলঘরের দিকে।

আশুতোষের জুতো পড়েছিল বার্থের পাশে। একপাটি জুতো সাহেবের পায়ে বেধে গেল।

সাহেব। ড্যাম্‌ নিউসেন্স!

[জুতোর পাটি সুট করে দিল দরজার দিকে।

একবার তাকালো ঘুমন্ত আশুতোষের মুখের পানে। তারপর কি ভেবে দরজা খুলে জুতোটা পায়ের ঠোক্করে ফেলে দিল বাইরে। তারপর আশুতোষের মুখের পানে তাকিয়ে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে একটু হাসল। হাসতে হাসতে ফিরে এলো নিজের বার্থে। গেলাসটা বাস্কেটে রেখে শুয়ে পড়ল। গাড়ী চলছে!]

আশুতোষের ঘুম ভাঙল। উঠে বসলেন। পকেট থেকে ঘড়ি বের করে টাইম দেখলেন। তারপর জুতো পায়ে দিতে গিয়ে দেখেন—এক পাটি জুতো নেই।]

আশুতোষ। জুতো আরেকপাটি কোথায় গেল?

[এদিকে ওদিকে দেখতে লাগলেন।]

না, জুতো তো নেই। কিন্তু একপাটি গেল কোথায়?

[সাহেবের পানে তাকালেন। সাহেব একবার চোখ মেলেই চোখ বুজল।]

বুঝেছি, এ কাজ তোমার। জুতো ফেলে দিয়ে এখন ঘুমোনোর ভান করে মজা দেখছ? আমিও মজা দেখাচ্ছি।

[বার্থের পাশের হ্যাংগারে সাহেবের কোট ঝুলছিল, উঠে গিয়ে সেই কোটটা তুলে নিলেন। তারপর একটা জানালা খুলে ফেলে দিলেন বাইরে। জানলা খোলার শব্দ ও ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্‌টায় সাহেব চোখ মেলে তাকাল। পরক্ষণে দেখল হ্যাংগারে কোট নেই।]

সাহেব। আমার কোট! আমার কোট কোথায় গেল?

[আশুতোষ কোন জবাব দিলেন না।]

সাহেব। [উঠে বসলো] মিস্টার, আমার কোট কি করলে?

[আশুতোষ কোন জবাব না দিয়ে বার্থে এসে বসলেন।]

সাহেব। [উঠে এল আশুতোষের সামনে] আমার কোট কোথায়?

আশু। অমন চিৎকার করছ কেন?

সাহেব। আমার কোট?

আশু। আমার একপাটি জুতো?

সাহেব। তোমার জুতো? নোংরা নেটিভ স্লিপার!

আশু। তুমি সে জুতো ফেলে দিয়েছ?

সাহেব। অমন নোংরা জুতো ফার্স্ট ক্লাশে অচল। বেমানান। আমি ও পাটিটাও ফেলে দোব।

আশু। দাও।

সাহেব। কিন্তু আমার কোট কোথায় বল?

আশু। তোমার কোট আমার সেই জুতো আনতে গেছে।

সাহেব। তার মানে?

আশু। তোমার কোটকে আমি পাঠিয়েছি জুতো খুঁজে আনতে।

সাহেব। তুমি আমার কোট ফেলে দিয়েছ ?

আশু। হ্যাঁ।

সাহেব। তোমার তো বড় দুঃসাহস, আমি তোমাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দোব।

আশু। চেষ্টা করে দ্যাখ। মিছামিছি চিৎকার করো না। আমাকে যদি বেশী বিরক্ত কর, আমিই তোমাকে এর স্টেশনে নামিয়ে দোব—

[কম্বল মুড়ি দিয়ে আবার শুয়ে পড়লেন।]

সাহেব আশুতোষের গাম্ভীর্য দেখে থতিয়ে গেল। কয়েক মিনিট কিছু বলতে পারল না।

সাহেব। জিজ্ঞাসা করতে পারি তুমি কে ?

আশু। কাল সকালে আলাপ করব।

[চোখ বুজলেন]

গাড়ি তখনও চলছে।

মাসের ছড়া

সুধীর কাব্যশ্রী

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ গ্রীষ্ম কাল
শুকায় রোদে গাছের ডাল।
আষাঢ় শ্রাবণ বর্ষা কাল
বৃষ্টিজলে ডোবে খাল।
ভাদ্র আশ্বিন শরৎ কাল
সহরটা হয় রংমশাল।

কার্ত্তিক অগ্রাণ হেমন্ত কাল
মাঠে চরে গরুর পাল।
পৌষ মাঘ শীত কাল
দাদু গায়ে জড়ায় শাল।
ফাল্গুন চৈত্র বসন্ত কাল
খুসি ভরা খুকুর গাল।

রাত বারোটার পর রেড রোডে যে কি কাণ্ডকারখানা ঘটে আমি হলফ করে বলতে পারি তোমরা কেউ জানো না। জানলে এতদিন মুখ বুজে থাকতে না।

ব্যাপারটা হঠাৎ ঘটে গেল। বাবার আপিসের এক সাহেব বন্ধুর বাড়ি আমাদের সবায়ের সেদিন নেমন্তন্ন ছিল। ঠিক নেমন্তন্ন নয়, পিক্‌নিকের মতো কতকটা। মিস্টার পিটারসন, অর্থাৎ বাবার সেই সাহেব বন্ধু তাঁর বিরাট বাগানওয়ালা বাংলোতে আমাদের রবিবার সারাদিন কাটাবার নেমন্তন্ন করেছিলেন। ঠিক হয়েছিল বাগানে গাছতলায় সেই আদিম যুগের অসভ্যদের মতো ডালপালা জ্বালিয়ে তাতেই রান্না করে খাওয়া হবে। চাকর-বাকরদের সেদিন ছুটি। সুতরাং সব কাজকর্ম নিজেদেরই করে নিতে হবে। পিটারসন সাহেবের এই প্রস্তাবে আমার তো খুব মজা লাগল। সমস্ত ব্যাপারটায় বেশ একটা এ্যাড্‌ভেঞ্চার এ্যাডভেঞ্চার গন্ধ।

রবিবার সকালে মা বাবার সঙ্গে আমি আর আমার ছোট বোন টুটু গেলাম পিটারসন সাহেবের বাড়ি। প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডওয়ালা বিরাট বাড়ি। পেছন দিকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাগান। বাগান না বলে জঙ্গল বললেই বোধ হয় ঠিক হয়। সাহেব একা থাকেন, তার উপরে অত্যন্ত ভালো মানুষ। চাকরবাকরেরা তাঁর কথাই শোনে না, প্রায়ই বাবা বলেন।

ফলে বাগানের দেখাশোনা এক রকম হয় না বললেই চলে। সাহেবের অবশ্য তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। উনি বাগানটাগানের ধার ধারেন না। ওঁর নেশা হল গাড়ি। মোটর গাড়ি। বাড়ির পেছন দিকে একটা মাঝারি সাইজের মোটর গেরাজ তৈরি করেছেন। সেটা রকমারি যন্ত্রপাতিতে ভরা। আপিস থেকে বাড়ি ফিরেই উনি সটান গিয়ে ঢোকেন গেরাজে। সেখানে গাড়ির যন্ত্রপাতি কলকব্জা নিয়ে নানারকম এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করেন।

কগাদা পুরনো ভাঙা গাড়ি জোগাড় করেছেন। এটার থেকে এ অংশ, ওটার থেকে আরেক অংশ নিয়ে কখনো বার আনকোরা নতুন পার্টস এনে পিটারসন সাহেব রেসিং কার তৈরি করেন। বারকয়েক প্রাইজও পেয়েছেন।

আমি বাবার সঙ্গে আগেও কয়েকবার গেছি সাহেবের বাড়ি। যখনি গেছি দেখেছি উনি ওঁর সেই নীলরঙা ভারঅল প'রে হাতে মুখে কালি মেখে গেরাজে কলকব্জা নিয়ে এক মনে ঘাঁটাঘাঁটি করছেন। আমাকে দেখলেই উৎসাহে সব বোঝাতে চেষ্টা করতেন। বাবাকে বলতেন, 'ডাট্, ছেলেকে তোমার মতো বড় সাহেব বানিয়ো। তাকে হাতে কলমে কাজ শিখে ভালো মিস্ত্রি হতে দাও। এ কাজে অনেক মজা। আর পয়সাও কম নয়।'

পিটারসন সাহেব আমাদের অপেক্ষায় গেটের কাছে পায়চারি করছিলেন। আমাদের দেখে এগিয়ে এলেন। ফুটের ওপরে লম্বা, মাথাভর্তি কাঁচাপাকা চুল, ব্যাকব্রাশ করা। মজবুত শরীর। গায়ে কালোরঙের পুলোভার, চ ছাইরঙা আজকালকার ফ্যাশানের সরু টাইট প্যাৎলুন। পায়ে কাবলি স্যাণ্ডাল। সব মিলিয়ে এত সুন্দর রা ভদ্রলোকের যে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। মুখে বাঁকা পাইপটাও কি চমৎকার মানিয়েছে।

প্রথমে মাকে হাতজোড় করে নমস্কার জানালেন, তারপর বাবাকে 'হ্যালো' বলে, টুটুকে সটান কোলে তুলে লেন। আমি ওঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে যখন 'হ্যালো আঙ্ক্ল' বললাম, উনিও 'হ্যালো পোরাস্' বলে ওঁর বিরাট বার মতো হাত দিয়ে আমার হাতটা থাবলে ধরে কাছে টেনে নিলেন। আমার নাম পুরু। পিটারসন সাহেব সময়ে আমাকে পোরাস্ বলে ডাকেন।

সারাদিন খুব হৈ চৈ খাওয়া-দাওয়া চলল। আরো দুই বন্ধু এসেছিলেন সাহেবের, সপরিবারে। আমার সী ছেলেমেয়েও ছিল কয়েকজন। কিন্তু তাদের সঙ্গে আমার তেমন জমল না। আমার মন পড়েছিল পিটারসন হেবের গেরাজে।

সন্ধ্যেবেলা আর সবাই চলে যাবার পর পিটারসন সাহেব বাবাকে বললেন, 'ত্মাখো ডাট্, তোমার গাড়ি নেই থাক। আমার নতুন গাড়িতে চল একটা লংড্রাইভ দিয়ে আসি। ফিরে এসে তোমার গাড়িতে ড় যেয়ো।'

বাবার নিজের কি একটা কাজ ছিল বাড়িতে, তাই উনি বললেন, 'আজ থাক, আমাকে সাতটার মধ্যে ড় ফিরতেই হবে, একজন আসবেন। আরেক দিন তোমার গাড়িতে হাওয়া খাওয়া যাবে।'

আমার তখন বাড়ি ফেরবার ইচ্ছে মোটেই নেই। পিটারসন সাহেবের নতুন গাড়ি না দেখে কেমন করে ? সাহেব আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেই বাবাকে বললেন, 'আচ্ছা, তা হলে পোরাস্‌কে রেখে যাও। মিই ওকে পরে বাড়ি পৌঁছে দেবো। একটু দেরি হলে চিন্তা করো না।'

মা আর টুটুকে নিয়ে বাবা বাড়ি ফিরে গেলেন। আমি পিটারসন সাহেবের সঙ্গে ওঁর গেরাজের দিকে াড়ালাম।

হালফ্যাশানের আমেরিকান গাড়িগুলো লক্ষ্য করেছ ? যেন অতিকায় কোনো উড়ুক্কু প্রাণী। সামনে দুটো ার মতন লাল চোখ ! পাখনা মেলা। এত স্বচ্ছন্দগতি যে হঠাৎ দেখলে মাটিতে চলছে, না মাটির ওপর দিয়ে ছ বোঝা না। চলতে থাকলে সামনে থেকে দেখলে মনে হয় এইবারই আকাশে উঠবে।

পিটারসন সাহেবের নতুন গাড়িটা আরো এক কাঠি সরেস। সামনের দিকটা অনেকটা ছুঁচলো, কতকটা প্লেনের মতো। সাধারণ গাড়ির চাইতে আরো লম্বা। দুধারে পাখনা মেলা। এরকম গাড়ি আগে আমি া দেখিনি। সাহেবকে সে কথা বলায় উনি বললেন, 'আগে তো কত কিছুই দেখনি, এখন দেখবে। এ র নিজের তৈরি। কত দিন ধরে এর পেছনে লেগে আছি।'

আমি অধীর আগ্রহে মিনিট গুনছি কখন এই কলের পক্ষীরাজে চেপে সকলের চোখের সামনে কলকাতার পথে পথে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াব, কিন্তু সাহেবের যেন কোনো তাড়া নেই। এটা টিপছেন, ওটা ঠুকছেন। গাড়ির তলায় ঢুকে কি পরীক্ষা করছেন। আমি আর থাকতে না পেরে বললাম, 'কখন যাবো আমরা আঙ্কল? দেরি হয়ে যাবে না তো?'

উত্তরে সাহেব বললেন, 'অত ছটফট করছ কেন, একটু ধৈর্য ধর। যন্ত্রপাতি সব ঠিক আছে কিনা দেখে নিই। রাস্তায় লোকজন একটু কমুক, তারপর বেরুব। তোমার বাবাকে ফোন করে বলে দিচ্ছি তোমার ফিরতে দেরি হবে।'

বেরুতে বেরুতে বেশ রাত্তির হয়ে গেল। সুতরাং আমরা ডিনার সেরে নিলাম। গাড়ি নিয়ে যখন রাস্তায় বেরোলাম, তখনই পথ প্রায় নির্জন। শীতের রাত, সবাই একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে।

গঙ্গার ধার দিয়ে, রেসকোর্সের পাশ দিয়ে যখন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে এসে পড়েছি দেখি একটু দূরেই আরো কয়েকটা গাড়ি জটলা করছে। আমরা ওখানে পৌঁছতেই আমাদের গাড়ির চারধারে সবাই ঘিরে দাঁড়াল। তাদের মধ্যে সাহেব, বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী ও অন্যান্য আরো নানা জাতের লোক ছিল। পিটারসন সাহেবকে দেখলাম সকলেই খুব খাতির করে।

এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমাকে ওখানে দেখে অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন, 'তুমি এখানে কি দেখতে এসেছ খোকা? মোটর রেস?' বুঝলাম খালি রেড রোডে ওঁরা রেস প্র্যাকটিস করবেন।

সবগুলো গাড়ির মধ্যে পিটারসন সাহেবের গাড়িটাই সবচেয়ে জমকালো, সবচেয়ে সুন্দর দেখতে। সবাই খুব তারিফ করছিল গাড়িটার। অনেকেই এসে ওঁকে জিগ্যেস করল কত মাইল অবধি স্পীড উঠছে ওঁর এই নতুন গাড়ির। সাহেব জবাবে শুধু মুচকি হেসে বললেন, 'দেখবে দেখবে, নিজের চোখেই দেখতে পাবে। একটু সবুর কর।'

রেস শুরু হল। আমাকে পাশে বসিয়ে পিটারসন সাহেব সীটের সঙ্গে আমাকে বেল্ট দিয়ে বেঁধে দিলেন। নিজেকেও বাঁধলেন। বললেন, 'ভয় পেয়ো না। আমি তো পাশেই আছি।'

গভীর রাত। সারা রেড রোডে জনমানব নেই। খাঁ খাঁ করছে। শুধু ফ্লুরেসেন্ট বাতিগুলো রাস্তাটাকে আলো করে রেখেছে। পাশাপাশি ছটা গাড়ি স্টার্ট নেবার জন্য তৈরি। উত্তেজনায় আমার বুকের ভেতর টিপটিপ করছে। পিটারসন সাহেবের মুখটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম না, কারণ আমাদের দুজনের মাথাতেই রেসিংগাড়ির ড্রাইভারের হেলমেটধরনের টুপি। কিন্তু অনুভব করছিলাম উনিও উত্তেজনায় থমথম করছেন।

হঠাৎ স্টার্টারের ফায়ার করার শব্দ শোনা গেল। মুহূর্তের মধ্যে গোঁ গোঁ শব্দে ছটা গাড়ি ঝড়ের বেগে ছুটতে শুরু করল। ভয়ে উত্তেজনায় চোখ বুজে ফেললাম। যখন চোখ খুললাম দেখি অন্য গাড়িগুলোকে আমরা বেশ পেছনে ফেলে এসেছি। হঠাৎ পিটারসন সাহেবের গুরুগম্ভীর গলা কানে এল, 'স্টেডি পোরাস, সীটের হাতল চেপে ধর।' সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির গতি আরো বেড়ে গেল। নিজের থেকেই আমার চোখ আবার বুজে এল।

হঠাৎ শরীরটা কেমন যেন হাল্কা হয়ে গেল। পেটের ভেতরে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হল। গাড়ির গোঁ গোঁ শব্দটাও যেন কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও চোখ খুললাম ব্যাপারটা বোঝবার জন্য। আরে একি? এ যে আমরা মনুমেন্টের চূড়ার কাছাকাছি চলে এসেছি। হাওয়াগাড়ি হয়ে গেছে হাওয়াই জাহাজ। ব্যাপার দেখে তো আমার মাথা ঘুরে গেল। আড়চোখে পিটারসন সাহেবের দিকে একবার তাকালাম।

ওঁর মুখ দেখে কিছু বোঝবার জো নেই। গভীর মনোযোগ সহকারে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন। আমি পেছন ফিরে দেখবার চেষ্টা করলাম বাকি গাড়িগুলোর কি অবস্থা হল। কিন্তু একটা গাড়িও নজরে পড়ল না। আমরা অনেক উপরে উঠে পড়েছি বলেই বোধ হয়।

আমি আর চেপে রাখতে পারলাম না, চিৎকার করে বললাম যাতে পিটারসন সাহেব শুনতে পান, 'এ আমরা কোথায় চলেছি? এটা কি এরোপ্লেন?'

'না এটা এরোপ্লেন নয়। এ একটা নতুন ধরনের গাড়ি, আমার আবিষ্কার। আর কেউ জানে না এর গোপন রহস্য। কতদিন থেকে লেগে আছি এটার পেছনে।' পিটারসন সাহেবও চিৎকার করে জবাব দিলেন।

পিটারসন সাহেবকে ব্যঙ্গ করেই বোধ হয় ঠিক পেছনে একটা গোঁ গোঁ শব্দ শোনা গেল।

চমকে দুজনেই পেছন ফিরে তাকালাম। যে পাঁচটা গাড়িকে পেছনে ফেলে এসেছিলাম তারই একটা আমাদের পেছু নিয়েছে। অর্থাৎ আমাদেরই মতো উড়ছে।

পিটারসন সাহেবের অবস্থা তখন যদি দেখতে। নিজের আবিষ্কারের নেশায় এমন মশগুল হয়ে ছিলেন যে এরকম কিছু ঘটতে পারে বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। মুখে শুধু বিড় বিড় করে বলতে লাগলেন, 'আশ্চর্য, ভারা আশ্চর্য, কী করে আমার ফর্মুলাটা পেল?'

আমাদের গাড়ি বা উড়োগাড়ি তখন ডালহাউসি স্কোয়ারের ও-মাথায়। রাইটার্স বিল্ডিং-এর উপরে। অন্য গাড়িটা তখনো আমাদের পেছু ছাড়েনি। হঠাৎ গোঁ গোঁ শব্দ করে আমাদের গাড়িটা মোড় ফিরে আবার রেডরোডের দিকে চলল। রেডরোডের মাঝামাঝি এসে গাড়ি ধীরে ধীরে নিচে নামতে লাগল। পেছনে পেছনে অন্য গাড়িটাও।

গাড়ির চাকা মাটিতে ঠেকাতে আমার ধড়ে যেন প্রাণ এল। গাড়ি থামলে পর পিটারসন সাহেব আমার মাথার টুপি আর কোমরের বেল্ট খুলে দিলেন। তারপর নিজের টুপি আর বেল্ট খুলে আমার হাত ধরে গাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। পেছনের গাড়ি থেকে যিনি বেরোলেন তিনি সেই বাঙালী ভদ্রলোক, আমাকে খোকা বলে যিনি ডেকেছিলেন।

পিটারসন সাহেব ওঁর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'সাবাস, মিটার, খুব সারপ্রাইজ দিলে যাহোক। আমার বাবুর্চি আর বেয়ারাকে কত টাকা দিয়েছ বল তো?'

মিটার অর্থাৎ মিস্টার মিত্র প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে শুধু আকাশের দিকে আঙুল দেখালেন। ওঁর নিশানা লক্ষ্য করে দেখি বাকি চারটা গাড়িই ফোর্টউইলিয়ামের ওপর দিয়ে উড়ে আসছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সবগুলো গাড়ি নিচে নেমে এল।

সকলে এক জায়গায় জমায়েত হবার পর যখন পরস্পর পরস্পরকে অভিনন্দন জানানো হয়ে গেছে, পিটারসন সাহেবকে ঘিরে দাঁড়িয়ে সবাই মিলে থ্রী চীয়ার্স দিলে। মিস্টার মিত্র বললেন, 'পিটারসনের কাছে সবাই আমরা ক্ষমা চাইছি, ওর গোপন ফর্মুলাটি হস্তগত করার অপরাধে। দোষ অবশ্য ওরই, কারণ আমাদের মিড্‌নাইট রেসার্স ক্লাবের নিয়মকানুনের একটা প্রধান শর্ত ছিল এই যে সভ্যরা কেউ কারুর কাছ থেকে কোনো কিছু গোপন রাখবে না। আমাদের বোকা বানাবার জন্যই হোক বা আর কোনো কারণেই হোক, পিটারসন এই শর্ত ভঙ্গ করেছে। সুতরাং আমরা ওর বাবুর্চি বেয়ারাকে সামান্য ঘুষ দিয়ে যদি ওর গোপন ফর্মুলা বার করে নিয়ে গিয়েই থাকি, তবে তাতে বিশেষ অপরাধ হয়নি। কী বল পিটারসন, তোমারে এ ব্যাপারে

কী বলার আছে ?'

সত্যি চমৎকার লোক পিটারসন সাহেব। এ কথায় চটলেন তো না-ই, উল্টে ঘুরে ঘুরে সকলের হা ধরে ক্ষমা চাইলেন এবং বললেন, 'স্রেফ্‌ আমারই দোষ, তোমাদের সকলের কাছে একটা স্টান্ট দেবা লোভ সামলাতে পারিনি। তাই ফর্মুলাটা চেপে গিয়েছিলাম। তোমরা যে আমারও উপরে যাও এ কথা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারিনি। যাক, এবার এসো সবাই একসঙ্গে উড়ে আমাদের এই আবিষ্কারে সেলিব্রেট করি।'

এবার ছটা গাড়ি যখন একসঙ্গে আকাশে উঠল সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। অনেকক্ষণ ধরে কলকাতা শহরে এধার থেকে ওধার অবধি ঘুরে যখন আমরা আবার রেড রোডে ফিরে এলাম, গাড়ি মাটিতে ঠেকলে পিটারসন সাহেব আমার কানে কানে বললেন, 'যা দেখলে, খবরদার কাউকে বলবে না, তা হলে মহা বিপদ হবে।'

আমি জিগ্যেস করলাম, 'কেন, বিপদ আবার কিসের ?'

পিটারসন সাহেব মৃদু হেসে বললেন, 'পুলিস টের পেলে জেলে পুরে তবে ছাড়বে। মোটরগাড়ির লাইসেন্স আছে আমাদের, ফ্লাইং লাইসেন্স তো নেই।'

পিটারসন সাহেবের গাড়িতে প্রায় হাওয়ার উপর ভাসতে ভাসতে কখন যে বাড়ি ফিরেছিলাম মনে নেই। পথে নির্ঘাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সকালে ঘুম ভাঙতেই গত রাত্রের সব ঘটনা ছবির মতো মনে পড়ে গেল। তোমাদের ব্যাপারটা না বলা অবধি স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। পিটারসন সাহেব ভাগ্যিস বাংলা পড়তে পারেন না, নইলে এ লেখা পড়লে আর কক্ষনো আমায় ওঁর গেরাজে ঢুকতে দিতেন না!

॥ সন তের শ' পঁচাত্তরের ছড়া ॥

আশানন্দন চট্টরাজ

"বোশেখ মাসে বছর সুরু"
বল্‌ছে হেঁকে, মেঘের গুরু।
মেঘের গুরু গভীর স্বরে
খোকন জাগে আপন ঘরে।
আপন ঘরে রোদের রাখী
রাখ্‌ছে এনে, ঝড়ের পাখী।
ঝড়ের পাখী সকাল থেকে—
থম্‌কে দ্বারে বলছে ডেকে,
বল্‌ছে ডেকে' "আয়রে সবে
মাস্‌ পয়লা, এ উৎসবে।"

এ উৎসবে দোকানদার
নতুন খাতা খুল্‌ছে তার।
খুল্‌ছে তার চুলের রাশ্‌
'খুকুন্‌ বসে খোকার পাশ।
খোকার পাশে দিদির কোলে
ভাইটি-সোনা দোদুল-দোলে।
দোদুল-দোলে বটের ঝুড়ি,
ঝুড়ির কাছে ঠাক্‌মা বুড়ি।
ঠাক্‌মা বুড়ি বরণ করে—
'সন তের শ' পঁচাত্তরে।'
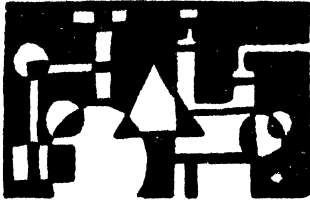
কাঁচের কথা

মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ

কাঁচ একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস। আমরা কাঁচের কতরকম জিনিস ব্যবহার করি, তার একটা হিসেব কর দেখি! আশেপাশে তাকালেই দেখবে, শিশি-বোতল, চশমা আরশি, জানালার সার্সি, আরও কত কি! একটা দোকানে যাও, দেখবে, কি সুন্দর সুন্দর কাঁচের সো কেস, আর কি বড় বড় সব আয়না, ফ্লুওরেসেণ্ট আলোয় কেমন ঝলমল করছে! একটা ল্যাবরেটরীতে যাও, সেখানে টেষ্ট টিউব, বীকার, ফ্লাস্ক, লেন্স, প্রিজম এমনি আরও কত জিনিস দেখতে পাবে। এসবই কাঁচের তৈরি। এ থেকেই বোঝা যায়, বর্তমান সভ্যজগতে কাঁচ কত প্রয়োজনীয় জিনিস।

মহাভারতে বর্ণিত স্ফটিক-নির্মিত প্রাসাদের বিবরণ দেখে মনে হয়, অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে কাঁচের প্রচলন ছিল। সিন্ধু নদের তীরে অবস্থিত মহেন-জো-দারো এবং হরপ্পায় প্রাচীন সভ্যতার যে সব নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যেও আছে কাঁচের তৈরি নানাবিধ উপকরণ। এছাড়া সারনাথ তক্ষশীলা প্রভৃতি বৌদ্ধ কীর্তিমণ্ডিত প্রাচীন নগরী সমূহের ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও কাঁচের তৈরি অনেক দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে।

কাঁচ কবে কোথায় প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল, তা কেউ ঠিক ক'রে বলতে পারেন না। তবে এ সম্পর্কে একটা সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে, তাই এখানে বলছি।

অনেকদিন আগেকার কথা। একদা কয়েকজন ফিনিসীয় নাবিক ভূমধ্যসাগরের তীরে বালির উপর কয়েকটি পাথর সাজিয়ে উনান বানান এবং তার ওপর হাঁড়ি চাপিয়ে রান্না করেন। রান্না শেষ হ'লে উনানের আগুন নিভিয়ে তাঁরা দেখলেন যে, আগুনের তাপে বালির ওপরে স্বচ্ছ একটি সর পড়েছে। এই হল পৃথিবীর প্রথম কাঁচ। এই আবিষ্কারের কথা প্রথমে গ্রীস, রোম এবং পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

কাহিনীটি একেবারে অলীক গল্প নাও হতে পারে। কারণ সাদা বালি, সোডা (সোডিয়াম কার্বনেট) এবং চক বা চুনা পাথরের গুঁড়ো (ক্যালসিয়াম কার্বনেট) যন্ত্র সাহায্য গুঁড়ো ক'রে ভাল করে মিশিয়ে তারপর চুল্লীর মধ্যে গলালে নরম কাঁচ (soft glass) তৈরী হয়। এই কাঁচই সবচেয়ে কম উষ্ণতায় গলে, আর এটা স্বচ্ছ ও বর্ণহীন হয়। তাই এদিয়ে কাঁচ-নল, ল্যাবরেটরীর নানাবিধ উপকরণ, জানালার সার্সি প্রভৃতি তৈরি করা হয়।

কাঁচ প্রস্তুতির সময় উপরোক্ত মিশ্রণটি অল্প অল্প ক'রে চুল্লীর মধ্যে দিয়ে গলানো হয়। এটুকু সম্পূর্ণ গলে গেলে আবার আর একটু মিশ্রণ ঢেলে দেওয়া হয়। এতে সবটা মিশ্রণ সমভাবে গলে এবং তার মধ্যে গ্যাসের বুদ্‌বুদ থাকে না। মিশ্রণটি তাড়াতাড়ি গলাবার উদ্দেশ্যে তার সঙ্গে ভাঙা কাঁচের গুঁড়ো উপযুক্ত পরিমাণে মেশানো হয়। আর তার রঙ দূর করার উদ্দেশ্যে তার মধ্যে বিরঞ্জক হিসাবে অল্প পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড দেওয়া হয়।

সাধারণ অবস্থায় কাঁচ একপ্রকার অনিয়তাকার স্বচ্ছ কঠিন পদার্থ। চুল্লী থেকে একে তুলে নেওয়া হয় উত্তপ্ত সান্দ্র প্রবাহী পদার্থরূপে (viscous fluid)। ঠাণ্ডা ক'রলে এটা ক্রমশঃ নমনীয় হয় এবং ধীরে ধীরে কঠিন আকার ধারণ করে।

কাঁচের কারখানায় শিশি-বোতল প্রভৃতি তৈরি করার সময় চুল্লী থেকে খানিকটা গলিত কাঁচ একটি লোহার নলের মাথায় তুলে নিয়ে তারপর সাবধানে ফুঁ দিয়ে বিভিন্ন আকৃতিতে গড়া হয়। ইংরেজীতে একেই বলা হয় blowing। এই উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার ছাঁচ ব্যবহার করা হয় এবং সেই ছাঁচের সাহায্যে বিভিন্ন আকৃতির শিশি-বোতল প্রভৃতি তৈরি করা সম্ভব হয়।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার। কাঁচের জিনিস উত্তপ্ত অবস্থা থেকে হঠাৎ ঠাণ্ডা করলে তার বাইরের অংশ তাড়াতাড়ি জমাট বাঁধে ব'লে অভ্যন্তরের কাঁচের ওপর চাপ পড়ে। এরূপ কাঁচ অত্যন্ত ভঙ্গুর হয়। সামান্য চাপ পড়লে অথবা উষ্ণতার ব্যতিক্রম ঘটলে তা ভেঙ্গে যায়। এর প্রতিকারের জন্যে উৎপন্ন কাঁচদ্রব্যের উষ্ণতা খুব ধীরে ধীরে কমানো হয়, যাতে অভ্যন্তর-ভাগের কাঁচের ওপর কোন-রকম চাপ না পড়ে এর নাম 'কাঁচের মৃদুকরণ' (annealing of glass)। এইভাবে ঠাণ্ডা করা কাঁচদ্রব্যই বেশি টেকসই হয়।

ফটো বাঁধাই করার জন্যে অথবা জানালার সার্সিরূপে যে কাঁচের চাদর বা 'সিট গ্লাস' (sheet glass) ব্যবহার করা হয়, তা তৈরির পদ্ধতি অন্যরকম। এক্ষেত্রে দুই পাশে অবস্থিত দুই জোড়া রোলারের সহায়তায় চুল্লীর চওড়া ট্যাঙ্ক থেকে পাতলা চাদরের মতো কাঁচ অবিরামভাবে তুলে নেওয়া হ'তে থাকে। কয়েক ফুট উঁচুতে উঠতেই তা যথেষ্ট ঠাণ্ডা হয়, তখন তাকে এস্‌বেস্‌টস্‌ দিয়ে মোড়া একরকম রোলারের ভিতর দিয়ে ঠেলে খাড়াভাবে ওপর দিকে তোলা হয়। যে টাওয়ারের ভিতর দিয়ে এই চাদর ওপর দিকে উঠতে থাকে তাই 'এনিলিং চেম্বার' এর কাজ করে। কাজেই এই ভাবে প্রায় ৩০ ফুট ওঠার পর স্বয়ং ক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে একে টুকরো টুকরো করে কেটে সাজিয়ে রাখা হয়।

সৌখীন টেবিলের ওপরে (Table Top) দোকানের জানালায় বা 'সো-কেসে' লাগাবার উদ্দেশ্যে যে 'প্লেট গ্লাস' (plate glass) ব্যবহার করা হয়, তা তৈরি করার সময় অনেক বেশি সাবধানতার প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে যান্ত্রিক ব্যবস্থা অনুযায়ী চুল্লীর ট্যাঙ্ক থেকে প্রায় একশ' ইঞ্চি চওড়া চাদরের মতো কাঁচ (পূর্বের চেয়ে পুরু হয়ে) অবিরামভাবে বেরিয়ে আসতে থাকে। তবে এই চাদর ভূমির সমান্তরালভাবে অবস্থিত রোলারের ভিতর দিয়ে চলতে থাকে। এই ভাবে চলতে চলতে তা 'এনিলিং চেম্বার' অতিক্রম করে এবং যথাযথভাবে ঠাণ্ডা হওয়ার পর বেরিয়ে আসে। তখন এর দু'পিঠেই

বিশেষ ধরনের যন্ত্রের সাহায্যে ঘষে মসৃণ ক'রে নিলে তবেই উঁচু মানের 'প্লেট গ্লাস' পাওয়া যায়।

ল্যাবরেটরীর কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি তৈরির জন্যে উচ্চ-তাপ সহনক্ষম শক্ত কাঁচ (hard glass) দরকার হয়। এই কাঁচ হ'ল পটাসিয়াম ও ক্যাল্‌সিয়াম সিলিকেটের মিশ্র যোগ। ল্যাবরেটরীর কাজে আরও ভাল হ'ল পাইরেক্স কাঁচ (pyrex glass)। এই কাঁচ তৈরি করতে প্রয়োজন হয় বালি, সোডা, অ্যালুমিনা এবং বোরনের অক্সাইড।

যে আয়না ছাড়া আমাদের একটি দিনও চলে না, তা কেমন ক'রে তৈরি হয় বল দেখি? এজন্য এক খণ্ড কাঁচের পুরু চাদর বা 'প্লেট গ্লাস' নিয়ে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তার এক পিঠে বিশুদ্ধ রূপোর প্রলেপ দিয়ে নেওয়া হয়।

চশমা, দূরবীণ, ক্যামেরা প্রভৃতিতে যে সব 'লেন্‌স' (lens) ব্যবহার করা হয়, সেগুলি তৈরির জন্যে দরকার হয় এক প্রকার বিশেষ ধরনের কাচ। সাধারণতঃ বালি, পটাশ ও লেড অক্সাইডের মিশ্রণ দিয়ে এই কাঁচ তৈরি করা হয়। এর নাম ফ্লিন্ট কাঁচ (flint glass)। এ কাঁচ তৈরি করতে যেমন সাবধানতার প্রয়োজন হয়, তেমনি দক্ষতার প্রয়োজন হয় লেন্‌স-এর নির্দিষ্ট আকার দেওয়ার জন্য। শুনলে আশ্চর্য হবে যে, কোন কোন চশমার লেন্‌স তৈরি করার সময় অন্ততঃ পক্ষে ষাটটি প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় এবং এজন্য অন্ততঃ পক্ষে ছাব্বিশটি যন্ত্রের সাহায্য নিতে হয়।

তোমরা হয়তো জান যে, পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীণটি রয়েছে ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত প্যালোমার পর্বতের মানমন্দিরে। এই দূরবীণে ব্যবহৃত অবতল দর্পণটি (concave mirror) তৈরি করার জন্যে কি বিরাট আয়োজন করতে হয়েছিল, তা শুনলে বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে যাবে।

দর্পনটির ব্যাস ২০০ ইঞ্চি, আর এর বেধ ২৬ ইঞ্চি! ওজন যথাসম্ভব কম করার উদ্দেশ্যে এর নীচের দিকটা নিরেট না ক'রে মৌচাকের মতো ফাঁপা করা হয়েছে, তবুও এর ওজন দাঁড়িয়েছে ২৬ টন। এই বিশাল দর্পনটি কি ভাবে তৈরি করা হয়েছিল, তাই এবার শোন।

কারখানায় দর্পন নির্মাণের উদ্দেশ্যে কাঁচ ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন করা হ'ল ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে। প্রায় এক বছর ধরে একে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হতে দেওয়া হ'ল (annealing)। তারপর সুরু হ'ল কাঁচ ঘষা আর পালিশ করার কাজ। লেন্‌স-এর নির্দিষ্ট আকার দিতে প্রায় ৫½ টন কাঁচ ঘষে তুলে ফেলতে হ'ল। আর এ কাজ শেষ হওয়ার পর দর্পনটি যখন কারখানা থেকে মানমন্দিরে স্থানান্তরের উপযোগী হয়েছে বলে বিবেচিত হ'ল, তখন ১৯৪৭ সাল! দর্পনটি যথাস্থানে নিয়ে জায়গামতো বসিয়ে ঠিকঠাক করতে আরও দু' বছর কেটে গেল। কিন্তু হায়, শেষ মুহূর্তে দেখা গেল যে, দর্পনটির নির্মাণে এক ইঞ্চির দু' কোটি ভাগের এক ভাগের মতো ত্রুটি রয়ে গেছে। তোমরা হয়তো ভাবছো যে, এ আবার ত্রুটি নাকি? কিন্তু বিজ্ঞানীরা এই সামান্য ত্রুটিও বরদাস্ত করতে রাজী হলেন না। তাই ঐ শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের বাধ্য হয়ে আরও প্রায় ছ' মাস ধরে কঠোর পরিশ্রম ক'রে তারপর সেই ত্রুটি সংশোধন করতে হ'ল। তবেই পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীণের দর্পন নির্মাণের কাজ সমাধা হ'ল বলা যায়। ভেবে দেখ, একাজে সময় লাগলো প্রায় পনের বছর।

(বুনোদের ছেলে মাতো,* বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে ওস্তাদ সর্বদা তার সঙ্গে থাকে কালোয় খয়েরীতে ছোপ দেওয়া তার পোষা ছাগলছানা, অর্জুন।

শিবতলায় এক কাপালিক এসেছে, তার কাছে লোকে লোকারণ্য, সবাই জোড়হাত।

কাপালিক বলেছে যে তাদের মহাপাপ হয়েছে, তাই প্লাবন হবে। পাপ কাটাতে হলে একটি কালোয়-খয়েরীতে চিত্তির-বিচিত্তির ছাগলছানা বলি দিয়ে যজ্ঞ করতে হবে। সেদিনই দশখানা গাঁয়ের লোক জেনে গেল যে বুনোদের মাতোর ছাগলছানা অর্জুনকে বলি দিয়ে স্বস্ত্যয়নের যজ্ঞ হবে। রাত্রে সবাই ঘুমোলে পরে মাতো বিছানা ছেড়ে উঠল। চুপিচুপি অর্জুনকে একখানা গামছায় বেঁধে নিয়ে সে অন্ধকারে জঙ্গলের পথে পা দিল। রাতটা সে মতিরায়ের মঠের মধ্যে ঘুমিয়ে রইল, পরদিন বহরমপুরের আর্মানী গির্জেয় যাবে।

সকালে সাপ-ধরা ওস্তাদ জটা সর্দারের সঙ্গে দেখা হল। মাতো এও শুনল যে অর্জুনকে ধরে দেবার জন্য একটী মোহর পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। এখন তাহলে সে যাবে কি করে ?)

॥ ৩ ॥

জটাসর্দার কতক্ষণ ধরে খুঁজে খুঁজে সাপ ধরল তা মাতো জানে না। খিদেয়, তেষ্টায়, অর্জুনকে বুকে নিয়ে সারাটি দিন ওর কেটে গেল। সন্ধ্যে যখন ঘোর ঘোর হয় তখন ও জটাসর্দারের গলার গান শুনতে পেল।

'হো আমার মনে বড় দুক্কু গো !
হো আমার কানাই ব্রজে এসতে চায় না
হো আমার বুক কান্নায় ফাটে গো
তবু চক্ষে জল এসে না।'

গান গাইতে গাইতে জটাসর্দার চলে যেতে লাগল। কোথায় যেন ওদের গ্রাম ? নতুন ডোমপাড়া ? ওখানে ওর বু' থাকে। জটাসর্দার এখন গিয়ে নাইবে, ভাত খাবে। ওর বু নিশ্চয় ভাত রেঁধেছে। মাতোর মনে হতে লাগল কতদিন ও ভাত খায়নি, রাঁধাভাতের গন্ধ পায়নি। একবার মাতোর

* আর্মানী চাঁপার গাছ শুরু হয়েছিল ১৩৭৪এর ফাল্গুন মাসে। পুরোন সংখ্যাগুলি এখনও কিনতে পারা যায়।

জ্বর হয়েছিল তখন মাতোর মা ডোবা থেকে মাগুরমাছ ধরে এনে ঝোল রেঁধে দিয়েছিল। ছুটো ভাত খেতে না খেতেই মাতোর যেন পেট ভরে গিয়েছিল। ভাত নিয়ে গিয়ে মাতো পুকুরে ঢেলে দিয়েছিল।

এখন মাতোর শুধু বুকের ভেতরটা ব্যথাব্যথা করছে। অনেকদিন অব্দি মাতো হাঁটতে পায়নি, খেলতে পায়নি, কবরেজ বলেছিল 'ওটা জন্মদোষ বাগদীবউ। ওটা ওর সারলে হয়।'

মাতোর মা চোখ বুজে বলেছিল 'সি আমার মন জানছে বাপ। উ ছেলা আমার ঘরে রইতে এসেনি।'

কবরেজ বলেছিল 'ওর রিদযন্ত্রটা, (মাতো পরে পণ্ডিতমশায়ের জামাইয়ের কাছে শুনেছে রিদযন্ত্র মানুষের বুকের মধ্যিখানে থাকে) বুঝলে কি না···বেশী ছুটোছুটি করলে পরে বেন্দাবন দেখতে হবে।'

মাতোর মনে হল শরীর যেন থেকে থেকে ঢিলে হয়ে যাচ্ছে। এখন মাতো কি করে, কোথায় যায়? ভাদ্দরমাসের দিন। মাঠের গর্তগুলো জলে ভরে উঠলে মা-মনসার ছেলেমেয়ের দল বেরিয়ে আসে জানা কথা। তা ছাড়া এখন তাঁদের ব্যাঙ ধরবার সময়ও হয়েছে। মাতো দেখতে পেল আকাশের রঙ ধোঁয়াটে লাল। ক্রমেই অন্ধকার হচ্ছে।

বাইরে এসে মাতো অর্জুনকে জল খাওয়ালে ছুটো ঘাসও দিলে। তারপর ওকে গামছায় আঁটসাঁট করে বেঁধে মাতো রওনা হল।

নতুন ডোমপাড়া, রায়চক, ময়রা-ফুলবাড়ি, তিন-চারখানা গাঁয়ের চাষীহাট সবে ভেঙেছে। মেলা নয়, কোন পালাপার্বণ নেই, তাই ছেলেপিলের গোলমাল, বাঁশীভেঁপুর প্যাঁ-প্যাঁ, বৈরেগীর গান শোনা যাচ্ছে না।

এই হাটে, এই সময়ে দরজাজানলার কাঠের পাল্লা, গোরুর গাড়ীর চাকা, আমকাঠের পিঁড়ে পাটা বিক্রী হয়। তাছাড়া হাঁড়ি ভর্তি করে মাছের পোনা-ডিম বিক্রী হয়। এ এক মজার কারবার। বড়গাঙ্গ, অর্থাৎ পদ্মায় মাছের ডিম ভাসে। তাই তুলে এনে জেলেরা হাটে হাটে বেচে যায়। এই সময়ে পুকুরে-ডোবায় টাপুর টুপুর জল। বিষ্টি পড়লে মনে হয় শাদা শাদা মল্লিকা ফুল পড়ছে আর ফেটে যাচ্ছে ধুলো ধুলো হয়ে। এই সময়ে মাছের ডিম ছাড়, পোনা ছাড়। তারপর সারাটি বছর মজা করে মাছ খাও। মাতো জানে, সারাবছর ধরে যারা মাছ খায় তারা বড়জাল ফেলে জল নাড়ায় না। রোজ খ্যাপলা জাল ফেলে আর রোজ খাওয়ার মত ছুটোচারটে মাছ ধরে।

মাতোর মা মাছ ধরে, এই বড় বড় খলশে-ট্যাংরা। সেবার মাতো ওর মার সঙ্গে বামুনবাড়িতে পেসাদ পেতে গিয়েছিল। কইমাছ যে অমন তেলে ডুবিয়ে রান্না হয় তা মাতো জানত না। মাতো অর্জুনকে বুকে সাপটে ধরে বড়রাস্তায় উঠল।

বড়রাস্তা মানে কাঁচারাস্তা। তবে এদিকে একটা ওদিকে একটা গোরুর গাড়ী যেতে পারে। একখানা গাড়ী বহরমপুরের দিকেই যাচ্ছে। মাতো দেখলে গাড়ীতে কতকগুলো শণের দড়ি আর খুঁটি।
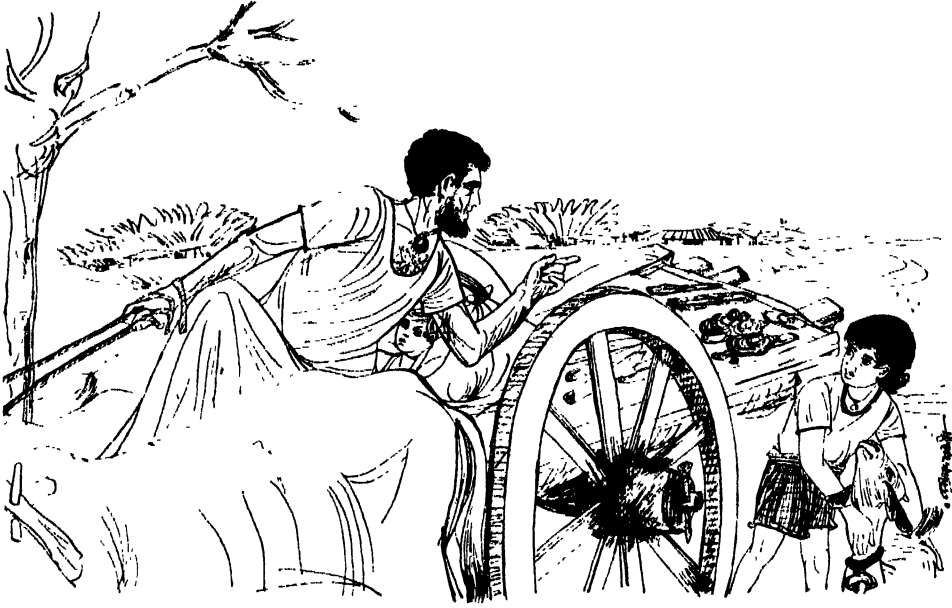
একপাশে একটি ছেলে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে আছে। বেলা পড়ে এসেছে চারিদিকে আজানের শব্দ, মন্দিরের ঘণ্টা।

'কাকা গো, আমারে এট্টু নে যাবে?' মাতো সাহস করে বলে ফেললে।

'কুনঠি যাবা বাপ?' মানুষটার কথা যেন ভাল।

'হো...ই বিষ্ণুপুরের দিকে।'

'কালীথানে যাবা?'

'হ্যাঁ কাকা।'

'ওটা কি?'

'পাঁঠা, মানত করা পাঁঠা।'

'কালীথানে দেবে।' লোকটি আস্তে বললে। তারপর বললে 'লাও, উঠে পড়! য্যাতটা যেতে চাও যাবা। মানত কেন? অসুখ করেছে?'

'হ্যাঁ গো!' মাতো অর্জুনকে বেশ করে সাপটে চেপে নিল। একটা ভাল এই, অর্জুনের মাথা আর কান দুই-ই কালো।

'কালোপাঁঠা কুলক্ষণ।' বলে নিশ্বাস ফেলে লোকটি চুপ করে রইল। তারপর বলল 'আমিও দেখনা বাপ, সয়দাবাদ যেলছি। উ-ই ছেলাটার পিলারোগ জন্মে গেছে, বুঝি কে নজর দেলে, না কি কি অপদেবতা ধরলে। সয়দাবাদে নে' উরে রামনাপিতের জলপড়া খাওয়াব বলে থির করেছি তা উর মাসীর বাড়ি দু'দিন থাকব। তানাদের গোলঘর (গোয়ালঘর)টা পড়ে যেলছেন কি না তাই চাট্টি শণ নে' যাচ্ছি, আর কাঁঠাল গাছের খুঁটো।'

ছেলেটা রীতিমত নিঝুম হয়ে নেতিয়ে আছে।

'আর কি বলব বল বাপ, উ-দিকে শুনতে পাচ্ছি এক অলুক্ষণে পাঁঠা না কি বণ্যে ডেকে এনতেছেন, ও কি, অমন নাপকাট (লাফ দেওয়া) কেন ? গাড়ী উলটে তিনভঙ্গ হবেন না ?'

'কিসে যেন কামড়ালে।'

'দাঁড়াও, এই নাককাটির গাছের কাছে গাড়ীটা এট্টু রাখি। আমার এক দাদা আছে, সে মস্ত জোয়ান। তারে এট্টা খবর দে' যাই, ছেলেটা আর পাঁঠাটাকে ধরা করালে মোহর পাবে বলে শুনতেছি। উনির নাম রাবণ মালাকার। উনির নামে সবাই ভয় খায়। উ কি নাপ কেটে নামতেছ কেন ?'

'এই একটু...'

ব্যস। আর কোন কথা শোনবার জন্যে মাতো দেরী করলে না। অর্জুনকে বুকে সাপটে বিষম ছুট লাগালে।

'ও খোকাডা, উ যে নাককাটির গাছ...' লোকটি দু'একবার চেঁচিয়ে বললে তারপর অবাক হয়ে ভাবলে ছেলেটা ছুটল কেন ? খ্যাপা পাগল নয় তো ?

সেই কথা সে ঘণ্টা ছয়েক বাদে রাবণ মালাকারকেও বললে। ছেলেটা কেন ছুটল বল তো ? ভূত মানলে না, পেত্নীর ভয় পেলে না, ছুটে গেলটা কোথা ?'

রাবণ মালাকার তামাক টানতে টানতে ভাবছিল কেমন করে গাঁয়ের ভুবন তেলীর ধানগোলা থেকে কিছু ধান সরানো যায়। ভায়ের কথা শুনে ও প্রথমটা হুঁ-হাঁ করে সেরে দিয়েছিল। তারপর বিরক্ত হয়ে বলেছিল,

'তোরা, পাড়াগেঁয়ে লোকরা বড় বকবক করিস বাবু। আমার এখন ছুটি বেলা সৈদবাদ আর খাগড়া হেঁটে হেঁটে বুজলি, শউরে কথা শুনে শুনে, তোদের কথা মোটে ভাল লাগে না। আমি বলে এখন নিজের জ্বালায় মরতেছি...'

রাবণ মালাকার লোকটা জমিজমা থাকলেও চাষবাস করতে ভালবাসে না। এর বাগানের কলা, ওর পুকুরের মাছ, তার ধানগোলার ধান চুরি করেই কাটিয়ে দেয়। আশপাশে সবাই জানে রাবণ চোর। তা ছাড়া ও খানিকটা খ্যাপা মোষের নত, রাগলে পরে রক্ষে নেই।

তবু ওকে সবাই সয়ে যায়। তার একটা কারণ হচ্ছে রাবণ যাত্রাতেও রাবণ সাজে আর

ওহে পবনলন্দন হলুমান
তোর ন্যাজে দিয়ে টান
এখনি করিব শাস্তিদান, বুঝলে কি না এ-এ-এ

বলে বেদম চেঁচিয়ে গান গাইতে পারে। আরেকটা কারণ হচ্ছে রাবণকে চটানো বুদ্ধির কাজ নয়। যদি তোমার কলাবাগান, কুমড়োখেত আর ধানের গোলা থাকে।

তাছাড়া ওকে দিয়ে একটা উপকার পাওয়া যায়। মানুষ মরলে পাড়াগাঁয়ে পোড়াবার লোক মেলে না। বিশেষ করে বর্ষার রাতে বা শীতকালে। রাবণ কিন্তু ঐ সময়ে মানুষের খুব উপকার করে।

কাঠ কাটবে, মড়া বইবে, শ্মশানে যাবে। ওর কেউ হোক না হোক ও বুক ফাটিয়ে কাঁদবে।

'ও দামোদর কাকা গো! তুমি মরলে কেন গো! কে আমাকে কোমরে লাঠি মেরে বলবে চল্ চল্, মাঠে চল্, কে আর সকাল সন্ধ্যে পরের গোয়াল থেকে গোরুর খড় চুরি করবে গো!'

রাবণকে মানুষ তাই খাতির করেই চলে। তবে ওর বুদ্ধি সহজে খেলতে চায় না আর ওর মগজে কোন কথা সত্যিই ঢোকাতে হলে অনেকবার ধরে কথাটা বলতে হয়। রাবণের ভাই তাই বলেই চলল।

'কেন ছেলাডা পাঁঠাটা জাপটে ধরে নাপ কেটে পালালে বল তো? আমি তো য্যাত ভাবতেছি ত্যাত আশ্চয্য যেতেছি গো দাদা! নাককাটির গাছের দিকে ছুটলে যি··· ছেলাডার চুল এই শূন্যপানে ঝুঁটি বাঁধা, বুজলে দাদা?'

শুনতে শুনতে অনেকক্ষণ বাদে রাবণের মাথায় বুদ্ধি খেলল।

'কি বললি?' তামাক খেতে খেতে রাবণ তো লাফিয়ে উঠেছে।

'এই ছেলাডা, বুজলে দাদা?'

'বুজলে দাদা? ওরে গাধা, ওরে বোকাপাঁঠা। ছেলাটা তার ছাগল নিয়ে তোর হাতে এসে পড়েছিল তা তুই বুজলি না রে? এট্টা মোহর ফাঁক গেল! তা ছাড়া বন্যে হয়ে দেশ ভাসবে, তোর ও মহাপাপ হবে না?'

রাবণ গলা তুলে একেবারে চেঁচাতে সুরু করলে 'ওরে মশাল জ্বালা, চ, ছুট্টে চ! সেই ছেলাডা বুঝি নাককাটির গাছের পানে পেলিয়েছে। ওরে চ রে চ! সবাই জানে মহাপাপে দেশ ভরে যেয়েছে। মা-কালী বলেছে উ পাঁঠার রক্ত খাব। না যদি দিতে পারিস তা'লে তো 'বেটাদের কাঁচা-কাঁচা খাব।'

মশাল এল, গাঁয়ের ছেলেবুড়ো সবাই এল। সবাই রে-রে-রে-রে ক'রে ছুটে চলল।

মাতো তখন কি করছে?

এই ধরো আঁধার রাত, তারার আলো ছাড়া আলো নেই। ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে সে আলোও পষ্ট দেখা যায় না।

নাককাটির গাছের কাছে নাককাটির খাল। কবে যেন এখানে একটা মন্দির ছিল। সেখানকার ঠাকুর নাকি জ্যান্ত ছিল! সে কি এখন না কি? সেই আদ্যিকালে। একটা চোর না কি প্রতিমার নাকের নথ ছিঁড়ে নিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে পাথরের প্রতিমার নাক থেকে সে কি ঝরঝরিয়ে রক্ত পড়েছিল। ও মা, যে জমিদারদের ঠাকুর, সেই জমিদার স্বপ্ন দেখেছিল ঝমঝম করে মল বাজিয়ে এত সুন্দর একটা ছোট্ট বউ ছুটে পালাচ্ছে।

কে রে, বলে যেমন তার আঁচল চেপে ধরা, অমনি বোঝা গেল উনি মানুষ নয় ঠাকুর। কেমন করে বোঝা গেল তা জিগ্যেস কোর না। যারা ঠাকুরদেবতার স্বপ্ন দেখে তারা সব টের পায়।

'তুমি যাচ্ছ কেন?' সেই আদ্যিকালের স্বপ্নে আদ্যিকালের জমিদার জিগ্যেস করেছিলেন।

'থাকব কেন? ওরে আমার তুমি রে! আমার নাক ছিঁড়ে দেবে, তেপান্তরের মাঠের মধ্যে আমায় রেখে দেবে, আমি থাকব কেন?'

জমিদার অমনি গ্রামের মধ্যে মন্দির করে ঠাকুরকে ঢাকবাদ্যি বাজিয়ে তুলে এনেছিলেন। শুধু যে গাছের নিচে মন্দির ছিল তার নাম রয়ে গেল নাককাটির গাছ আর যে খালটায় রাখাল ছেলেরা মোষকে চান করায়, পাঁকালমাছ ধরে তার নাম রয়ে গেল নাককাটির খাল।

মাতো সেই খালের ধারে বসে বসে হাঁপাচ্ছিল। ভেতর থেকে যেন সব নিভে আসছে, হাত পা ঘামছে। যেন দেওয়ালীর পিদীম সব নিভিয়ে দিচ্ছে কে, মন্দিরের ঘণ্টা যেন থেমে আসছে কোথাও।

যখন গ্রামের দিক থেকে কোলাহল করে মশালগুলো নাচতে নাচতে ছুটে আসছে তখন মাতো বুঝতে পারল সব।

বুঝতে পেরে অর্জুনকে গামছার সঙ্গে পিঠে বেঁধে নিয়ে মাতো জলে ঝাঁপ দিলে।

কি ঠাণ্ডা জল। জলে কত তারার ছায়া ফুটে রয়েছে। মাতো যে সাঁতার কাটে এমন শক্তি তার হাতে পায়ে নেই। তবুও আস্তে আস্তে ভেসে চলল। খালের ওপারে বহরমপুরের রাস্তা আর সেখানেই আছে সেই গির্জে যেখানে মাতো পালিয়ে যেতে চায়। গির্জেতে আছে সেই আর্মানী চাঁপার গাছ। সেখানে সেই আশ্চর্য চাঁপাফুল ফোটে আর সেখানে গেলে নরম ঘাসে পা ডুবে যায়।

'ঠাকুর গো!' মাতো অসহায় সুরে কে জানে কাকে ডাকল। তারপর আস্তে আস্তে ভেসে চলল।

—ক্রমশঃ
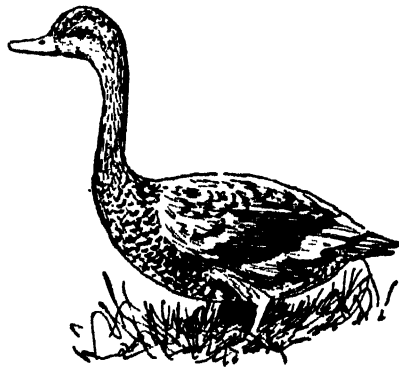
দেখতে এসে দিল্লী শহর,
লাগল তালা কর্ণে,
ভূতের রানী শাকচুন্নীর,
মোটর গাড়ীর হর্ণে !

হেকিম এলো, বৈদ্যি এলো,
যায় না কানের তালা।
হদ্দ হল ওষুধ খেয়ে,
একি বিষম জ্বালা !

স্কন্ধকাটা মামদো এল
বাজিয়ে মাদল-কাশি,
ভূতের রানীর কান সারাতে,
বাজল শিংগা বাঁশী !

এত করে ও সারলো না রোগ'
ভূতের রাজা শেষে,
শাকচুন্নির কান সারাতে
পিটলো ঢেঁড়া দেশে।

খবর পেয়ে রোগ সারাতে
বেতাল মশাই এলো।
মস্তবড় পাকানো গোঁফ,
পোষাক এলো মেলো।

এসেই বেতাল ঝুলীর থেকে
বের করলো ছুরি।
সবাই ভাবে এবার বুঝি
ফাঁসায় রোগীর ভুঁড়ি।

মুচকি হেসে বেতাল বলে,
"আনরে লেবু আন —
লেবু কেটে রক্ত নিয়ে,
সারিয়ে দেব কান।"

কাটলো লেবু বেতাল মশাই,
বসিয়ে ছুরির পোঁচ,
পড়লো ঝরে রক্ত ধারা।
চোমড়ালো সে মোচ্।

অবাক হয়ে ভূতের রানী,
বিষম বিষম খেল,
হেঁচকি উঠে কানের তালা,
আপনি খুলে গেল।

এক পলকে রোগ হতে দূর,
সবাই বলে, 'ধন্য!
বেতাল মশাইর মতন গুণীন,
নেই জগতে অন্য!'

অল্প পরেই সেই কথাটা
তাল-এর কানে উঠলো,
বেতালেরে করতে নাকাল
তক্ষুনি সে ছুটলো!

তাল বললো, 'বুজরুকি সব,
নয় কিছু এর সত্য।
শুনুন সবে, প্রকাশ করি—
আসল গোপন তথ্য:

জবা ফুলের পাপড়ি ঘ'ষে,
ছুরির ফলার 'পরে,
সেই ছুরিতে কাটলে লেবু,
লাল রঙা রস ঝরে।

দেখুন সবে পরখ করে,
ঐ তো জবা ফুল।
আচ্ছা, আমিই দিচ্ছি ভেঙ্গে,
সবার চোখের ভুল।'

এই না বলে তক্ষুণি তাল,
করলো সুরু কার্য।
তার পরে যা ঘটলো সে তো,
ঘটাই অনিবার্য

তাল বেতাল এর মুড়িয়ে মাথা
চড়িয়ে গাধার পিঠে—
সবাই দিল তাড়িয়ে তাদের
ছাড়িয়ে বসত ভিটে!

এক

এটা কিন্তু সত্যিকার নেপোর বই নয়। আসল বইটাকে নেপো নিয়ে চলে গিয়েছিল। পরে যখন পাওয়া গেল, দুমড়োনো, মুচড়োনো, আঁচড়ানো, কামড়ানো, খিমচোনো কাদামাখা, কালো কালো থাবার দাগ, কোনো কাজেই লাগে না। কিচ্ছু পড়া যায় না, মাঝে মাঝে খোবলানো ছ্যাঁদা। ভাগ্যিস তাতে কিছু লেখা ছিল না, নইলে হয়েছিল আর কি। শুধু মলাটটাই ভালো ছিল আর তাই দিয়েই গুপি এই বালি কাগজের খাতাটাকে বাঁধিয়ে দিয়েছে। হলদে মলাট, তার ওপর বেগনি কালি দিয়ে লেখা নেপোর বই। নইলে নেপো কিছু এমন সৎ বেড়াল নয় যে ওর নামে বইয়ের নাম রাখব। সৎ হলে আর ওর ল্যাজটা—সে যাক গে। মোট কথা ভজুদা বলেছিল বইয়ের নাম রাখতে পানুপুরাণ।

আমার নাম পানু, আমার বয়স বারো। সাত মাস আগে বাস থেকে পড়ে গিয়ে আমার শিরদাঁড়ার হাড় জখম হয়েছিল। সেই থেকে আমি হাঁটতে পারি না। তবে একটু একটু করে গায়ে জোর পাচ্ছি আর ডাক্তারবাবু বলেন আমি নাকি চেষ্টা করলেই হাঁটতে পারব, কিন্তু আসলে তা পারি না। আমার একটা দু চাকাওয়ালা ছোট গাড়ি আছে, দাদু করিয়ে দিয়েছেন, তাতে করে আমি বাড়িময় ঘুরে বেড়াই। তাতে বসেই আমি আমাদের তিন তলার ফ্ল্যাটের প্রত্যেকটা জানলা দিয়ে রাস্তা দেখি। তা যদি না দেখতাম তা হলে আর এ বই লিখবার দরকারই হত না।

বেশির ভাগ সময় আমি নিজের ঘরে থাকি আর নিজের জানলা দিয়ে দেখি। আমার ঘরে দুটো

জানলা। একটার নিচে, বাইরে কার্নিসের উপর লম্বা টিনের টবে বড় মাস্টার আমাকে গাছ-গাছলা করতে শিখিয়েছেন। অদ্ভুত চেহারার সব কাঁটা গাছ, কি সুন্দর ফুল ফোটে। অথচ রোদ লাগলেও মরে না, গরমের সময়ও শুকোয় না। রোজ ভোরে ঘুম থেকে উঠে গুণে এক মগ্ জল দিতে হয়।

অন্য জানলার নিচে ভজুদার টব, তাতে ধনেপাতা, রসুন, কাঁচালঙ্কা, টোমাটো কলাই। বড় মাস্টারের পোড়া বৌও নাকি ওঁদের ছাদের কোনে জলের ট্যাঙ্কের পাশে গাছ গজায়, বেল, যুঁই, রজনীগন্ধা; কুমড়ো গাছে কুমড়ো হয়, মাটির হাঁড়ির তলা ফুটো করে তাতে পুঁই ডাঁটা হয়। বৌকে কেউ নাকি চোখে নি, তবে দূর থেকে জানলা দিয়ে ওর ঘোমটাপরা মাথা দেখতে পাই। আগে নাকি বৌ পরমাসুন্দরী ছিল, দূর থেকে লোকে তাকে দেখতে আসত। তারপর আধখানা মুখ পুড়ে কালি হলে পর আর কারো সামনে বেরোয় না। তাই নিয়ে বড় মাস্টার কত দুঃখ করেন।

বড় মাস্টার প্রত্যেক রবিবার বিকেলে আমাকে গল্প বলতে আসেন। ঐ সময় আমাদের বাড়ির সবাই বেড়াতে চলে যায়, খালি রামকানাই থাকে। সে আমাদের জন্যে চা আর মাছের কচুরি, মেটুলির ঘুগ্‌নি, এই সব করে দেয়। আটটার সময় বাড়ির লোকেরা ফিরে এলে, বড় মাস্টার বাড়ি যান।

পাশেই বাড়ি; আমাদের বাড়ির গলি দিয়ে মাপলে আট ফুট তফাতে। একটা ঘোরানো লোহার সিঁড়ি ও বাড়ির পাঁচতলা থেকে পাকিয়ে পাকিয়ে এক তলা অবধি নেমে গেছে। সেটা থেকে মাপলে আরো কাছে। গুপি বলে আমার স্নানের ঘরের বাইরের ঘোরানো সিঁড়ি থেকে রং মিস্ত্রিদের একটা তক্তা ফেলে ও নাকি ওদের ঘোরানো সিঁড়িতে গিয়ে উঠতে পারে। তবে বড় মাস্টার থাকেন পাঁচতলার উপরে ছাদের কোনে ছুটো ঘরে, ঘোরানো সিঁড়ি অত দূর ওঠে না। বড় মাস্টার ছাপাখানার ভিতরের সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করেন।

ঐখানে উনি প্রুফ দেখেন, ঘর পান। সন্ধ্যে বেলায় ছাপাখানার বড় সাহেবরা চলে গেলে, গাড়ির সেডে মাস্টারের নাইটস্কুল বসে, তার জন্যে সামান্য মাইনে পান কষ্টেসৃষ্টে দিন চলে, বড় মাস্টার বলেছেন।

রবিবার ছাড়া রোজ সকালে ভজুদা এসে আমাকে তিন ঘণ্টা পড়ান, আটটা থেকে এগারোটা। ক্লাসের বই নিয়ে ঠেসে পড়ান, ইংরিজি, অঙ্ক, বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল, হিন্দী, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান। কি না জানেন ভজুদা। ছবি দেওয়া মোটা মোটা বই নিয়ে এসে আশ্চর্য সব ছবি দেখান। মরুভূমির বালিতে চাপা পড়া হেলিওপোলিসের রাস্তার প্রাচীন কালের রথের চাকার দাগ, আরো কত কি!

ভজুদা খুব ভালো, কিন্তু খুব কড়া। আমিত বাড়িতে বসেই বার্ষিক পরীক্ষা পাশ করে উপরের ক্লাসে উঠেছি। এ বছর সাতজন নতুন ছেলে ভরতি হয়েছে আমাদের ক্লাসে। তাদের কাউকে অবিশ্যি এখনো দেখি নি, গুপির কাছে সব খবর পেয়েছি।

গুপি আমার বন্ধু। প্রত্যেক রবিবার আর ছুটির দিনে সে আমাকে দেখতে আসে। বড় মাস্টারের গল্প শোনে অদ্ভুত সব গল্প। সব তাঁর অভিজ্ঞতার কাহিনী। বর্মার গল্প; প্রশান্ত মহাসাগরে আশ্চর্য সব দ্বীপের গল্প, যার কথা কেউ জানে না; সমুদ্রে ঝড়ের গল্প, জাহাজডুবির গল্প, যুদ্ধের গল্প,

ভয়ঙ্কর সব অগ্নিকাণ্ডের গল্প ; উত্তরমেরু দক্ষিণমেরুর কথা। মেক্সিকো, ব্রেজিল, কোথায় যান নি বড় মাস্টার, ব্যবসার খাতিরে। তারপর বৌ পুড়ল, মাস্টারের বাঁ ঠ্যাং কাটা গেল, ঘোরাঘুরি ঘুচল। একদিন যে মানুষ লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার করত, আজ সে সামান্য কটা টাকার জন্যে সরকারি ছাপা-খানায় কপালে একজোড়া ম্যাগনি ফাইং চশমা এঁটে প্রুফ দেখে আর সন্ধ্যেবেলা নাইট স্কুল চালায়।

এই অবধি বলে—পা ঠুকে বড় মাস্টার হেসে বললেন, 'তাতে কোনো দুঃখ নেই, একটু সময় পেলেই নিজের জীবনের সত্যিকার অভিজ্ঞতাগুলো লিখে ফেলব। প্রকাশকরা দু পাতা পড়লেই লুফে নেবে। তখন আমার আবার লাখপতি হওয়া ঠেকায় কে!'

মাস্টারের বাঁ ঠ্যাং হাঁটুর নিচে থেকে কাটা। তার জায়গায় চামড়ার স্ট্র্যাপ আর বগলেস দিয়ে একটা কাঠের ঠ্যাং আঁটা। দেখতে অনেকটা টেবিলের পায়ার মতো। মাঝে মাঝে গল্প বলতে বলতে বেশি হাত পা ছুঁড়লে সেটা ফস্ করে বেরিয়ে আসে। অনেক কষ্টে আবার পরাতে হয় ; আমরা সাহায্য করি, মাস্টার ঘেমে নেয়ে ওঠেন। নাকি বড্ড লাগে। অনেক দিন আগে নাকি প্রশান্ত মহাসাগরে বাকি পা'টা হাঙরে খেয়েছিল। অনেক কষ্টে দু মাইল সাঁতরে তবে প্রাণে বেঁচে-ছিলেন। তা-ও বাঁচতেন না ; ভাগ্যক্রমে হঠাৎ শোঁ শোঁ করে সাইমুন ঝড় উঠল, তিনতলার সমান ঢেউ আছড়ে পড়তে লাগল! প্রাণের ভয়ে শিকার ছেড়ে হাঙর সমুদ্রের তলায় ডুব দিল। বড় মাস্টার খোলাম কুচির মতো ঢেউয়ের সঙ্গে উঠতে পড়তে লাগলেন।

ভাগ্যিস একটা বড় তেল ট্যাঙ্কারের দয়ালু কাপ্তেন ঠিক সেই সময় তাঁকে দেখতে পেয়ে, পঞ্চাশ মণ তেল ঢেলে ঢেউ শান্ত করে, তাঁকে জাহাজে টেনে তুলেছিলেন, নইলে সে যাত্রা হয়ে গিয়েছিল আর কি! ঠ্যাংটা আসলে ঐ জাহাজেরি রান্নাঘরের একটা ভাঙা টেবিলের পায়া। নাবিকদের দয়ার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপে মাস্টার ওটাকে এখনো রেখেছেন। নইলে ছাপাখানার বড় সাহেবের চিঠি নিয়ে গেলে সস্তায়, এমন কি হয় তো বিনি পয়সাতেই, কত ভালো ভালো ঠ্যাং কিনতে পাওয়া যায়, এলুমিনিয়মের কাঠামোর উপর রবার দিয়ে প্ল্যাস্টিক দিয়ে তৈরি। সত্যিকার পা থেকে দেখতে কোনো তফাৎ নেই। বরং ঢের ভালো, আলপিন ফুটলেও টের পাওয়া যায় না। তবে এই টেবিল-পায়ার ঠ্যাংটাই বা মন্দ কি? বন্ধুদের দান!'

এই বলে বড় মাস্টার আমার যন্ত্রপাতির বাক্স থেকে লম্বা একটা পেরেক নিয়ে কেঠো পায়ের গোড়ালির কাছে হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে নিলেন। নাকি বোলতায় গর্ত করেছিল। পরে মাস্টার কেঠো পায়ের গুলির কাছে ছোট একটা দেরাজ করে নেবেন ; তাতে পয়সাকড়ি রাখবেন, কাকপক্ষীও টের পাবে না। যা পকেটমারের দাপট আজকাল!

বড় মাস্টার চলে গেলে গুপি পকেট থেকে কাগজে মোড়া একটা মলাট ছেঁড়া বই বের করল। বইটার নাম 'পুষ্পক থেকে প্লেন।' গুপির ছোটমামার বই। অনেক কষ্টে জোগাড় করা। আশ্চর্য সব বই আনে গুপি। মঙ্গলের মানুষ, বুধে বিপত্তি, চন্দ্রনাথের চন্দ্রযাত্রা, এই সব। একটা টাইম-মেসিনের বই এনেছিল ; ঐ মেসিনে চেপে অতীতে ভবিষ্যতে যে সময়ে ইচ্ছা যাওয়া আসা যায়। পড়ে

গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। তাছাড়া কলের মানুষের গল্প আনে, তাদের রোবো বলে।

এই সবই আমাদের ভালো লাগে। আমরা বড় হয়ে প্রথমেই চাঁদে যাব। গুপির ছোটমামা নাকি চাঁদে জমি কিনবে। সেখানে ছোট একটা বাড়ি করবে, তাতে মেসিনে রান্না হবে। তাহলে তো আমাদের সেখানে গিয়ে কোনো অসুবিধাই হবে না। খালি তার আগে আমার পা দুটোকে সারিয়ে নিতে হবে। এদিকে ছোটমামা বি-এস্-সি পাশ করেই মহাকাশযান বানাতে শিখবে। এখন থেকেই তার জন্যে টিন, এলুমিনিয়ম, রবার, বল্টু, এই সব জমাচ্ছে।

ক্রমশঃ

তাঁর গল্প

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ট্রেনে সেই গোল গোল চোখওলা লোকটি বার বার নস্যি নিচ্ছিলেন আর আমাকে ভীষণ একটা গল্প বলছিলেন। কামরার আর একপাশে আর একজন মস্ত গোঁফওলা, মাথায় খয়েরী টুপিপরা দারুণ গম্ভীর ভদ্রলোক এক মনে একখানা ইংরিজি খবরের কাগজ পড়ে যাচ্ছিলেন।

গোল গোল চোখওলা লোকটি বললেন, 'আমার পিসিমাদের গাঁয়ে মশাই—ওঃ, সে কি কুমির!'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'গাঁয়ে কুমির! সে কি কথা! তারা কি রাস্তা ঘাটে চলে ফিরে বেড়ায় নাকি? আমি তো যদ্দুর জানতুম, তারা জলে-টলেই থাকে।'

'আহা—জলেই তো, জলেই তো। পুকুর-টুকুর সব জায়গাতেই কুমির গিজগিজ করছে।'

আমি বললুম, 'কী সাংঘাতিক!'

'সাংঘাতিক বলে সাংঘাতিক! ভোজুগঞ্জের নাম শুনেছেন?'

'আজ্ঞে না।'

'বসিরহাটের সাইডে। এমনিতে বেড়ে জায়গা মশাই। চারদিকে বেশ মনোরম গাছপালা, তাতে এন্তার পাখি টাখি ডাকছে। আর কী ভালো ভালো মোটা কলা হয়—দেখতে কাঁচা সোনার মতো, খেতে চমচমের মতো। একবার ভোজুগঞ্জে গেলে মশাই, আর আপনি ফিরতে চাইবেন না—রাতদিন ওই কলা-বাগানেই বসে থাকবেন।'

বললুম, 'শুনেই তো আমার সেখানে যেতে ইচ্ছে করছে। তা অমন ভালো জায়গায় আবার কুমির টুমির কেন? তারাও কলা খায় নাকি?'

'খেলে তো ভালোই হত। কোনো ঝঞ্ঝাট থাকত না। কিন্তু ব্যাটারা ভারী ত্যাঁদোড় মশাই—কলা-টলা বোঝে না।'

'লোককে ধরে-টরে নাকি?'

'ধরে না আবার? এই তো সেদিন পিসিমার পিসতুতো ভাশুরের ছেলে বোঁদেকে—'

'কী নাম বললেন?'

'বোঁদে। ভালো নাম বদ্যিনাথ—সংক্ষেপে বোদে, তাই থেকে আর একটু মিষ্টি করে বোঁদে। তা সেই বোঁদেকে একদিন কপাৎ করে—'

আমি শিউরে উঠে বললুম, 'খেয়ে ফেললে নাকি? তা খেতেই পারে। বোঁদে নাম শুনলে আমাদেরই তো খেতে ইচ্ছে করে মশাই, কুমিরের আর—

'আহা, আগে শুনুনই না ব্যাপারটা।'—ভদ্রলোক আমাকে থামিয়ে দিয়ে এক টিপ নস্যি নিলেন: 'বোঁদে নাম শুনেই খুশি হবেন না, তারা বিচ্ছু ছেলে মশাই। একেবারে বাঘা তেঁতুলের মতো টক। সেই বোঁদে যেই পুকুরে নাইতে নেমেছে, অম্‌নি কপ্‌!'

'ধরে ফেললে?'

'ফেললেই তো। একেবারে পায়ের গোড়ালিতে। তারপর হিড়হিড়িয়ে—'

'টেনে নিয়ে গেল?'

'যেত। কিন্তু বোঁদে সঙ্গে সঙ্গে কাঠ-ফেলা ঘাটের একটা শক্ত খুঁটি চেপে ধরলে। তারপরে এমন একখানা গগনভেদী হাঁক ছাড়লে যে গোটা ভোজুগঞ্জ কেঁপে উঠল।'

'নিতে পারল না তা হলে?'

'আপনি আমি হলে মশাই দু-মিনিটে কুমিরের ফলার হয়ে যেতুম। কিন্তু এ হল বোঁদে। যাকে বলে সাক্ষাৎ বাঘা তেঁতুল। দাঁত বসিয়েই বুঝল, এ চীজ হজম করা চারটিখানি কথা নয়। তারপর ওই চিৎকার। বললে, বিশ্বাস করবেন না—সেই একখানা চ্যাঁচানিতেই গাঁয়ের যত গোরু সব দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে গেল, পণ্ডিত মশাইয়ের বুড়ো বাপ এক বছর বাতে শয্যাশায়ী—বিছানা ছেড়ে নড়তে পারেন না—তিনি এক লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, তারপর তড়বড় করে একটা নারকেল গাছের মাথায় উঠে গেলেন। সেখান থেকে তাঁকে টেনে নামানো—ওঃ, সে এক কাণ্ড!'

আমি অধৈর্য হয়ে বললুম, 'তিনি এখন নারকেল গাছ থেকে না-ই নাবলেন। কুমিরের কী হল, তাই বলুন।'

'আহা বলছি, সেই কথাই তো বলছি। বোঁদের সেই বাঘা চিৎকার কুমিরের কানে মোটেই মিষ্টি লাগল না। তার দাঁত খুলে গেল, বোঁদেকে ছেড়ে দিয়ে সে কেটে পড়ল।'

'বেঁচে গেল তা হলে?'

'হুঁ, বোঁদে বলেই। কুমির পালিয়ে গেল, ঘাটের খুঁটি ধরে বোঁদে ঠায় অজ্ঞান। তার পা দিয়ে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে। তারপর সারা গাঁয়ে দারুণ হৈ চৈ। বোঁদের বাবা তখুনি গাঁয়ের কালী বাড়িতে পাঁচ টাকা পুজো পাঠিয়ে দিলেন।'

'আর কুমিরের কী হল?'

'মস্ত কমিটি বসে গেল। শেষকালে পুকুরে কুমির!! লোকে ঘাটে যাবে না—জল আনবে না, চান-টান করবে না? ভীষণ সেনসেশন!'

আমি বললুম, 'সেনসেশন কেন হবে: আপনি তো বললেন, ওখানে সব পুকুরেই কুমির—।

'আহা—এখনো আসেনি, কিন্তু একটা যখন এসে গেল, তখন বাকীগুলো আসতে আর কতক্ষণ? ডিম ফুটলেই তো কিলবিলিয়ে বাচ্চা বেরুতে থাকবে।'

'তা বেরুবে। কিন্তু পুকুরে হঠাৎ কুমিরটা এল কী করে ?'

'কে জানে, কী করে এল ! বোধ হয় ইছামতী নদী থেকে উঠে এসেছে।'

'কাছেই বুঝি ইছামতী ?'

'হঁ্যা—কাছেই বলতে পারেন। এই মাইল তিনেক দূরে !'

'তিন মাইল দূর থেকে কুমির চলে এল ? বলেন কি ?'

'আপনি জেট প্লেনে চেপে ঝাঁ করে কয়েক ঘণ্টায় বিলেত চলে যেতে পারেন, আর একটা কুমির তিন মাইল মোটে হেঁটে আসতে পারে না ? চার-চারটে পা আছে, সেটা খেয়াল রাখবেন।'—বিরক্ত হয়ে তিনি আর এক টিপ নস্যি নিলেন।

আমি বললুম, 'তা বটে—চার-চারটে পা তো আছেই। তারপর কী হল বলুন।'

'তারপর ভীষণ কাণ্ড। থানা থেকে বন্দুক নিয়ে দারোগা এলেন, একজন অবস্থাপন্ন লোক দুটো রাইফেল নিয়ে এলেন, গাঁয়ের লোকে বল্লম নিয়ে এল। কিন্তু কোথায় কুমির ?'

আমিও বললুম, 'কোথায় কুমির ?'

'বোঁদের চিৎকারেই মশাই, তার ভিরমি লেগে গিয়েছিল। সে যে জলের তলায় বসে রইল, বসেই রইল। না ভাসলে তো গুলি করা যায় না। সবাই তাক করে বসেই রইল। শেষে সন্ধ্যেবেলায়—'

রোমাঞ্চিত হয়ে আমি বললুম, 'সন্ধ্যেবেলায় ?'

'ভেসে উঠল। বললে বিশ্বাস করবেন না—পাক্কা ষোলো হাত লম্বা, টেনিস বলের মতো দুটো পেল্লায় চোখ, হাতির মতো শুঁড়ওলা মাথা—'

'তারপর ?'

'দমাদ্দম গুলি। আঠারোটা গুলি খেয়ে তবে মরল। সেই কুমির টেনে তুলতে দুশো জোয়ান—'

খয়েরী টুপিপরা সেই মোটা গুঁফো ভদ্রলোক এবার কাগজ সরিয়ে রেখে, একেবারে হঠাৎ—বিচ্ছিরি হেঁড়ে গলায় বললেন, 'খুব হয়েছে, এবারে থামুন।'

'অ্যাঁ !'

আমরা দুজনেই তাঁর দিকে আঁৎকে ফিরে তাকালুম।

তিনি বললেন, 'আমার নাম আদ্যনাথ ঘোষ। আমার বাড়ি ভোজুগঞ্জে। আমার ছেলের নাম বোদে। তাকে সবাই বোঁদে বলে !'

আমরা আবার বললুম, 'অ্যাঁ !'

তিনি বললেন, 'বন্দুক লাগেনি। একটা জাল ফেলেই কুমিরটা ধরা হয়েছিল।'

আমি বললুম, 'সেকি ! আঠারো হাত কুমির—'

'আঠারো হাত নয়, সাড়ে সাত কিলো। দারুণ সাইজ মশাই। ঘাটলার নিচে ডিম পেড়েছিল, তাই বোঁদের পা সেখানে পড়তেই তাকে খ্যাক্‌ করে দিয়েছে কামড়ে।'

'কিছু তো বুঝতে পারছি না।'—আমি হতাশ হয়ে বললুম।

ট্রেন ব্যাণ্ডেলে আসছিল। মোটা গোঁফ ভদ্রলোক উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, 'জাল প্রায় ছিঁড়ে ফেলেছিল। ভারী পাজী ছিল মশাই—পুকুরে সব পোনা ও-ই সাবড়ে দিত। আমরাও প্রতিশোধ নিলুম। টুকরো টুকরো করে কেটে রান্না করে খেয়ে ফেললুম। থালাজোড়া এক-একখানা পেটি মশাই—কী তার তেল!

আমি বললুম, 'কী সর্বনাশ, কুমির খেলেন?'

দরজার দিকে এগোতে এগোতে তিনি বললেন, 'কুমির কোথায়—চেতল মাছ। অমন চেতল আর পাওয়াই যায় না আজকাল। বোদে তো এত খেয়েছিল যে তিন দিন ধরে তার পেটের অসুখ।' —ট্রেন থেমে গিয়েছিল, নামতে নামতে গোল গোল চোখওলা লোকটির দিকে কটমট করে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'ছেলেপুলের কাছে গুল দেবেন না—ভারী খারাপ অভ্যেস।'

তিনি চলে গেলেন। আমি খানিক গুম হয়ে থেকে গোল চোখ লোকটিকে বললুম, 'এটা কি রকম হল?'

কোনো জবাব না দিয়ে, স্টেশনের ভেণ্ডারের কাছ থেকে পুরী আর বোঁদে কিনে, তিনি একমনে খেতে থাকলেন।

খেতেই থাকলেন।

নতুন বছর

আরেকটা বছর শেষ হয়ে আবার একটা নব-বর্ষ এল। তোমাদের সকলের বয়স-ও এক বছর করে বাড়ল। আমাদের প্রিয় 'সন্দেশ' ও নতুন বছর শুরু করল।

তোমাদের সকলকে আমাদের নতুন বছরের প্রীতি জানাই। এ বছরটা তোমাদের ভালোভাবে কাটুক। অনেক কাজ কর আর আনন্দ পেয়ো।

সারা বছর ধরে প্রতি মাসে আমরা যথা সময়ে পত্রিকা বের করেছি। পত্রিকার জন্যে তোমাদের প্রিয় লেখক-লেখিকাদের রচনা জোগাড় করার চেষ্টা করেছি। তবে সকলের লেখা তো আর এক সঙ্গে পাওয়া যায় না, কাজেই মাঝে মাঝে যদি দুচারজনের নাম কিছুদিন না দেখতে পাও, তা হলেও ধৈর্য হারিয়ো না।

তোমাদের হাত পাকাবার আসরের কথা বিশেষ করে বলতে হয়। এ বছর অনেক ভালো লেখা পেয়েছি আর যখনি ভালো লেখা পেয়েছি তখনি সেটিকে আমরা আনন্দের সঙ্গে ছেপেছি। যদি কারো লেখা বেরোয় নি বলে মনে ক্ষোভ জমে থাকে, সে যেন এই কথাটি শুধু ভেবে দেখে যে ভালো জিনিস না হলে আমাদের আদরের কাগজে দেওয়া যায় কি করে? যাদের লেখা বেরিয়েছে তারা আরো ভালো লিখো আর যারা লেখা বেরোয় নি বলে দুঃখ বোধ করেছে, তারাও আরো ভালো লিখো।

তারপর আবার সেই পুরনো কথা বলি, এ বছর কোন কোন লেখা বিশেষ করে ভালো লেগেছে সেটা আমাদের জানিও। আর যদি কিছু ভালো না লেগে থাকে, কারণ আমাদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়, সে কথাও জানিও। এ কাগজ তোমাদেরি কাগজ, এর জন্যে আমরাও যেমন চিন্তা করি, আশা করি তোমরাও তেমনি চিন্তা কর।

জানই তো আমাদের কাগজ কষ্টে চলে; অনেকের অকাতর পরিশ্রম আর অনাবিল প্রেমের জন্যেই কাগজ বের করা সম্ভব হয়। তোমরা নতুন বছরের চাঁদা পাঠিয়ে আর নতুন গ্রাহক করে দিয়ে অন্যান্য বছরের মতো এবার-ও আমাদের সহযোগিতা কর। নতুন গ্রাহক করলে কিন্তু তার নাম, ঠিকানা, বয়স ও অভিভাবকের নামের সঙ্গে চাঁদাটাও পাঠাতে হয়। তা হলে সঙ্গে সঙ্গে কাগজ পাঠানো যায়। সকলকে শুভেচ্ছা জানাই। ইতি—

সঃ সঃ

(১) মৃদুল দাশগুপ্ত, ১৫৫১, বয়স—১২½

প্রত্যেক সংখ্যায় প্রফেসর শঙ্কুর গল্প দিলে, বড়ো পুরনো হয়ে যাবে যে।

(২) ঊর্মিলা দাশগুপ্ত, ২৩৫২, বয়স—১৬

সব চিঠি কি আর উত্তর দেওয়া যায় ভাই? মাঝে মাঝে চিঠি-পত্রে উত্তর দেবার মতো কিছু পাই না। এমন কথা লিখতে চেষ্টা কর, যার উত্তরটা শুধু ব্যক্তিগত হবে না। অন্য পাঠকদেরো শুনতে ভালো লাগবে।

(৩) রামেন্দ্রকুমার ভুঞ্যা, ১৭৯৮, বয়স—১৬

ভাই, লেখা ছাপানোটাই বড় কথা নয়, এর মধ্যে দুর্ভাগ্যের কথাও উঠছে না। ছাপবার মতো হলে কেন ছাপাব না বল? হাতপাকাবার আসরটা তোমাদের লেখা ছাপানোর জন্যেই হয়েছে। কিন্তু তাই বলে যদি সব লেখাই ছেপে দিই, ভালোমন্দ বিচার করি না, তা হলে কি আমাদের প্রিয় কাগজের মান বাড়বে? পাঁচবার ছাপা না হলেও, ছয়বার চেষ্টা কর; একটুও ভালো হলে নিশ্চয় ছাপা হবে।

(৪) পার্থসারথি মুখোপাধ্যায় ১৩৫৯, বয়স ১৪

গিরিডি সহর সম্পর্কে যে কথা লিখেছ সেটা ঠিক-ই লিখেছ। তবে প্রফেসর নিজে বাঙালী ও বাঙলা দেশে মানুষ এবং জীবনের বেশির ভাগ কাটিয়েছেন, যদিও বৃদ্ধ বয়সে গিরিডিবাসী হয়েছেন, এসব কথা মনে করেই বোধ হয় লেখা হয়েছিল, 'বাঙলাদেশে সামান্য রসদে বাঙালী বৈজ্ঞানিক কি করতে পারে' ইত্যাদি।

তারপর 'আকে'র কথার উত্তরে, তোমাকে 'চলন্তিকা' দেখতে বলি। তাতে আছে 'আক, আখ, ইক্ষু', কাজেই সব বানানের-ই চল আছে।

ইলিয়াড বা অডিসি ধারাবাহিকভাবে ছাপানোর কথাটা মন্দ বল নি। উপেন্দ্রকিশোরের চতুর্থ ভাই কুলদা রঞ্জন ঐ দুটি গল্পই ছোটদের জন্যে সুন্দর করে লিখেছিলেন। সে বই এখন আর দেখি না। যাই হক উদ্ধার করার চেষ্টা করব।

(৫) মলয় বীজন ভট্টাচার্য ১৩৪৪, বয়স ১৩

নাম ভুলের জন্যে দুঃখিত, ছাপাখানায় হয়, যাঁরা প্রুফ দেখেন তাঁদেরো নজর এড়িয়ে যায়, তাই এমন হয়, ভাই। তারপর ধাঁধা ইত্যাদির কথা বলি। ইংরেজি মাসের ২৭।২৮শের মধ্যে শুধু যারা নিজেরা এসে হাতে করে কাগজ নিয়ে যায়, তারা পায়। বাকি সব কাগজ এক সঙ্গে ২৯।৩০শে ডাকে দেওয়া হয়। কাজেই ১লা।২রা পাওয়া খুব আশ্চর্য নয়। অর্থাৎ দিন ৮।১০ হাতে পাচ্ছ তোমরা। তার বেশি কি দরকার হয়? তাছাড়া দূর থেকে যারা পাঠায়, তাদের ২।১ দিন দেরি হলেও আমরা নিই। তার চেয়ে দেরি করলে আবার পরের মাসে যেতে পারে না। তোমার কবিতা যখন পৌঁছল, তার আগেই ফাল্গুনের হাত পাকাবার আসর ছাপা হয়ে গেছে।

(৭) তপনকুমার পাল, ৮৭৫, বয়স ১৬

দুতিন বছরের শিশুরা কাঁদলে চোখের জল পড়ে বই কি। জলের উৎস যে গ্রন্থি সেটার কোনো দোষ থাকলে হয়তো কম পড়ে। তুমি বড় হয়েছ, এ বিষয়ে কোনো শরীর বিজ্ঞানের বইয়ে ভালো করে পড়ে নিও।

শুনেছি স্বপ্নে কিছুতে তাড়া করলে দৌড়ানো যায় না, তার কারণ মনের ভয়। চ্যাঁচানোও যায় না; বেশি চেষ্টা করলে ঘুমটাই ভেঙে যায়!

রাস্তার বাঁ দিক দিয়ে গাড়ি চালানোর নিয়ম শুধু ইংরেজদের নিজেদের ও তাদের প্রভাবিত দেশেই দেখা যায়। আর সব জায়গায় ডান দিক দিয়ে চালাতে হয়। দেখ নি, অ্যামেরিকান গাড়ির বাঁ দিকে স্টিয়ারিং হুইল, অর্থাৎ গাড়ি থাকবে ডান ফুটপাথ ঘেঁষে আর রাস্তার দিকটাতে চালক বসবে। আগে ইংরেজদের ধারণা ছিল ডান চোখে বেশি ভালো দেখা যায়। শুনেছি সেই জন্যেই রাস্তার বাঁ দিকে গাড়ি চালানো নিয়ম করেছিল, যাতে ডান চোখটা রাস্তার দিকে থাকে আর তাই দিয়ে বেশি দেখতে পায়। এখন শুনি ওসব ধারণা ভুল। দুটো চোখ দিয়ে আলাদা করে কিছু দেখি না আমরা। তোমার শেষ প্রশ্নটার উত্তর হয় না, কারণ মানস রাজ্যের আরো বৈজ্ঞানিক গবেষণা হওয়া দরকার।

(৭) পত্রবন্ধু চাই:

(ক) নন্দিতা ঘোষাল, ১৮৮৪, বয়স ১২
শখ—বইপড়া, নাচগান, ছবি আঁকা।

(খ) সৈয়দ আহসান জমিল, ১৮৫৪, বয়স ১৩
শখ—গল্পের বই পড়া, গল্প ছড়া লেখা।
ছবি আঁকা ও ম্যাজিক।

অজয় হোম

বিশ্ব-ক্রিকেটের পঞ্জিকা—উইসডেন'স অ্যালম্যানাক—তাতে বিশ্বের ৫ জন শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড়দের ছবিসহ তালিকায় স্থান পেয়েছেন ভারতের অধিনায়ক মনসুর আলি পতৌদি। তাঁর বাবা ইফতিকার আলিও উইসডেনে স্থান পান ১৯৩২ সালে।

অহঙ্কার বা দর্প হলেই পতন হয়। এই হল ভগবানের অলিখিত আইন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বড়ো দর্প হয়েছিল জগতের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটদল হওয়াতে। যাকে বলে ধরাকে সরা জ্ঞান। ভারতে এসে নাকি তাদের খুব লোকসান হয়েছিল। এদিকে আমরা টিকিট পাই ন', মাঠে স্থানাভাব, আগুন জ্বলে যায়। সেই দর্পচূর্ণ হল ইংল্যাণ্ডের কাছে রাবার হারাতে। চতুর্থ টেস্ট সোবার্সের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের ফলে হারল। বার বার ফলো অন করেও তাদের জ্ঞান হল না ইংল্যাণ্ড আর সে-দল নেই। কলিন কাউড্রের নেতৃত্বে তার রূপ বদলে গেছে। পঞ্চম টেস্ট ভাগ্যলক্ষ্মীর হাতের পেয়ালা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মুখের কাছে এসেও ফসকে গেল। ছিনিয়ে নিল কাউড্রে ও নট। ইংল্যাণ্ড দুজন ভালো খেলোয়াড় আবিষ্কার করেছে—নট আর পোকক।

তোমরা রেডিওতে রিলে শুনতে গিয়ে ভাষ্যকার পিয়ার্সন সুরিটার বাচনভঙ্গীর সঙ্গে অনেকেই পরিচিত আছ। তাঁর ছোট ভাই আইভান ছিলেন পশ্চিম বাংলার উত্তর বিভাগের কমিশনার। তিনি সম্প্র'ত দেহত্যাগ করেছেন। পিয়ার্সন সুরিটার ছোটোভাই হিসেবে নয় তিনি একজন ভালো উইকেটরক্ষক ছিলেন। কলকাতার এরিয়ান ক্লাবে খেলতেন। ১৯৩৯ সালে বাংলার হয়ে রঞ্জি ট্রফি খেলেন। তাঁর মিষ্টি হাসি আর সকলের সঙ্গে সহজ সরল ব্যবহার আজ বারবার মনে পড়ছে। তাঁর আত্মা শান্তি লাভ করুক এই কামনাই করি।

ফুটবলে রেফারীর উপর অত্যাচার এবং মাঠে অপ্রীতিকর ঘটনা সারা দুনিয়াতেই দুঃখজনকভাবে ঘটে থাকে কিন্তু তাঁর ছোঁয়াচ ক্রিকেটে এসেও লেগেছে। শুধু ওয়েস্ট ইণ্ডিজে নয় কলকাতায় সিএবি নকআউট

কোয়ার্টার ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল বনাম টাউন এবং স্পোর্টিং ইউনিয়ন বনাম মোহনবাগান এই দুই খেলায় আম্পায়াররা নিগৃহীত হন। দর্শকদের এই আত্মবিস্মৃতি অত্যন্ত দুঃখের। তবে মোহনবাগানের সময়োপযোগী সিদ্ধান্তকে প্রশংসাই করতে হয়। নিজেদের ক্ষতি স্বীকার করে নিয়ে দর্শক হামলার প্রতিবাদ জানানোতে প্রকৃত খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন।

ফুটবলের দল বদলের পালা শেষ হয়েছে। মোট ৬৪০ জন দল বদলের উদ্দেশ্যে আইএফএ অফিসে ছাড়পত্রে সইসাবুদ করেছিলেন। নামকরা কয়েকজন খেলোয়াড় তাঁদের পুরোনো দলে ফিরে এসেছেন। ফিরতি খেলা বন্ধের প্রতিবাদে ইস্টবেঙ্গল লীগে যোগদান করবে না বলে সিদ্ধান্ত নেওয়াতে আইএফএ উদ্বিগ্ন এবং নীতিগত লড়াইয়ে কি ফল দাঁড়ায় তা দেখার জন্যে আমরা সবাই উদগ্রীব।

হকি আম্পায়ারদের হঠাৎ ধর্মঘটের ফলে বেশ কয়েকদিন খেলা বন্ধ থাকার পর আবার খেলা শুরু হয়েছে। আম্পায়ারদের এই ধর্মঘট খুবই ন্যায়সঙ্গত। কলকাতায় হকি খেলা বেশ জমে উঠেছে। ইস্টবেঙ্গল, বি এন আর মহমেডান স্পোর্টিং, মোহনবাগান সবাই জোর খেলে চলেছে।

ক্রিকেট

আন্তঃ কলেজ এস রায় শীল্ড নকআউট প্রতিযোগিতায় ফাইনালে ল' কলেজ ১৬ রানে বিদ্যাসাগরকে হারিয়ে শীল্ড বিজয়ী হয়। ল' কলেজের রমেশ রতন দু'দলের মধ্যে সর্বোচ্চ রান ৫৩ করে শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানের পদক লাভ করেন। ল' কলেজ—১৩৩ (রমেশ রতন ৫৩, এ ব্যানার্জি ২৭ ; এস চ্যাটার্জি ৫৩ রানে ৫, পি কর্মকার ১৮ রানে ৩ উইঃ)। বিদ্যাসাগর—১১৭ (এস সেন ২২ ; এ ঘোষ ৩৮ রানে ৫, টি জে ব্যানার্জি ৪০ রানে ২ উইকেট)।

দক্ষিণ কলকাতা স্কুল ক্রিকেট লীগের দুদিন ব্যাপী ফাইনাল খেলায় তীর্থপতি স্কুল ৪৩ রানে রুংটা স্কুলকে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছে। তীর্থপতি—১১২ (এস রায় ২৫, এ দত্ত ২০ ; এ গাঙ্গুলী ২৫ রানে ৪ উইঃ)। রুংটা—৬৯ (এফ চৌধুরী ১৭ রানে ৫, ডি দাশগুপ্ত ২২ রানে ৪ উইকেট)।

টেনিস

বেঙ্গল লন টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে গৌরব মিশ্র সিঙ্গলস ও ডাবলস চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনাল—গৌরব মিশ্র ৬-২, ৬-০ সেটে হারান গোপাল রায়কে। পুরুষদের ডাবলস ফাইনাল—গৌরব মিশ্র ও বলরাম সিং ৬-৪, ৬-২ সেটে বিনয় ধাওয়ান ও সুবীর মুখার্জিকে পরাজিত করেন। জুনিয়র সিঙ্গলস ফাইনাল (১৮ বছর বয়স্ক বালকদের)—সুবীর মুখার্জি ৬-২, ৪-৬, ৬-৪ সেটে প্রভীন সিংকে হারান। ১৪ বছর বয়স্ক বালকদের ফাইনাল—এস ভট্টাচার্য আফজল আলিকে পরাজিত করেন ৬-৪, ১১-৯ সেটে।

বাস্কেটবল

হাওড়ায় ডালমিয়া পার্কে আন্তঃজেলা বাস্কেটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে দক্ষিণ কলিকাতা ৫৭-৩৭ পয়েন্ট বর্ধমান জেলাকে হারিয়ে পর পর দু'বছর আন্তঃজেলা চ্যাম্পিয়ন হল। বিজয়ী দক্ষিণ কলিকাতা দলের তপন মণ্ডল সবচেয়ে বেশি ১৮ পয়েন্ট করেন। বর্ধমানের বি জস ও পি চ্যাটার্জি প্রত্যেকে ৮ পয়েন্ট করেন।

ফুটবল

কুইলনে লালবাহাদুর স্টেডিয়ামে ইস্টবেঙ্গল ৩-০ গোলে ওয়েলিংটনের এম আর সি-কে হারিয়ে কেরল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন শীল্ড বিজয়ী হয়ে আর একটি ট্রফি লাভ করল। প্রথম দিন গোলশূন্য ভাবে শেষ হয়েছিল। ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে প্রথমার্ধে গোল করেন অসীম মৌলিক, দ্বিতীয়ার্ধে অ্যান্টনি ও এ বসু একটি করে।

পড়া

জীবন সর্দার

চারপাশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া কি কষ্ট, ভেবে দেখেছ একবার ? অথচ, প্রকৃতিতে, যা কিছু জ্যান্ত তাকেই, বেঁচে থাকার জন্য চারপাশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়েছে। মানিয়ে নেবার জন্য, যেখানকার জীব তার, সেখানকার উপযোগী আকার আকৃতি গড়ে উঠেছে। তুমি যদি একটু সময় দিতে পার, তবে, ঘুরে'ফিরে প্রকৃতিটা একবার দেখতো' দেখি। দেখে একটু ভেবে বলতো দেখি, আমি যে কথাগুলি বললাম তা সত্যি কিনা !

জলে জীবগুলোর কথাই ধরনা কেন ! জলে চলার জন্য 'পাখনা' হলেই সুবিধে। মাছের তাই আছে। তিমি যদিও মাছ নয়, কিন্তু জলে চলে বলে মাছের মত 'আকার' পেয়ে তার সুবিধেই হয়েছে। বাদুড় পাখি নয়, কিন্তু, বাতাসে ভাসতে হলে 'পাখা' চাইই। পাখির ডানার মত না হলেও, বাদুড়ের ডানা ওড়ার কাজেই সাহায্য করে। এগুলো সব সহজ সহজ উদাহরণ। বুঝতেই পারছ। এদের কথা বললাম, কেননা, এরা একজাতের জীব, থাকে ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন জাতের জীবের কাছাকাছি। সেই পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেবার 'আকার' ঠিক তারা পেয়ে গেছে।

ধর যদি এমনটি না হত। মানে, এখন আমরা আমাদের চারপাশে যে পোকামাকড়, গাছপালা পশুপাখিদের দেখছি এরা যদি তাদের 'চারপাশের' সাথে মানিয়ে নিতে না পারে তবে কি হবে ! সোজা উত্তর—ধ্বংস হবে। যেমন সেই আদিম যুগে অতিকায় প্রাণীদের হয়েছিল। ধ্বংস হয়ে যাচ্ছেনা তারাই যারা মানিয়ে নিতে পারছে। একথা বলা বোধহয় ঠিক হবে না যে সবাই ঠিক একই ভাবে পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিচ্ছে।

মাছ ছাড়াও জলে হাজার ধরনের জীব আছে, গাছপালা আছে। তেমনি ডাঙায় হাজার ধরনের গাছপালা, পশুপাখি পোকামাকড় আছে। এরা সবাই মানিয়ে নিয়েছে নিজেকে, নিজের নিজের মত করে। শুধু জল আর ডাঙ্গা নয়, পাহাড় আর মাঠ, বৃষ্টি আর রোদ, সবকিছু মানিয়ে নিতে হয়েছে। মানাতে না পেরেছে হটে গেছে। আমি তোমাকে প্রকৃতিটা ঘুরেফিরে দেখার জন্য একটু সময় দিতে বলেছিলাম। আমাদের পরিবেশ আর আলোচনার বিষয় একটু ছড়িয়ে গেছে, আর একটু যদি সময় দাও, আর একটি কথা বলতে পারি : তুমি আমি আমরা সব মানুষেরা সেই জীবজগতেরই অংশ যারা মায়ের দুধ খায়। আমাদের বাইরেটা যেমন দেখাক শরীরের ভেতরটায় তাদের ভেতরের অংশের সাথে কোন তফাৎ নেই। তবুও, মানুষ আর সব জীব থেকে এমন ভাবে আলাদা যে পৃথিবীতে তাকে আলাদা প্রকৃতি বলে দাবী করা যেতে পারে। আলাদা সে ভেতরকার 'আকারে' বা 'গড়নে' নয়, আলাদা সে শিক্ষায় বুদ্ধিতে। যার অধিকারী তুমিও আমিও।

এবার যদি চারপাশে তাকাও, মনে হবে, মানুষের সাথে আর সব পশুপাখির আকাশ পাতাল ফারাক। মানুষ পৃথিবীর দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে, প্রকৃতির বাধা মানেনি। বরং প্রকৃতিকে নিজের সুবিধে মত করে গড়ে নিয়েছে। মানুষের এই কাজকারবার দেখে আমরা অবাক হই, আর ভাবি প্রাকৃতিক নিয়ম মানুষের বেলা খাটেনা। মানুষ সবকিছু থেকে সত্যিই আলাদা। আজকের মানুষ যা করছে যা করতে পারছে একদিনে

সে তা পারেনি। বিবর্তনের ধারা বেয়ে মানুষের বুদ্ধির বিকাশ কি করে ঘটল, তা জানা বড় একটি সমস্যা। কিন্তু জানার চেষ্টা চলেছে, জানার উপায় আছে। একটি উপায়, চারপাশের জীবজগতের হাবভাব দেখে, পড়ে বোঝা, আর একটি, আদিম ইতিহাসের উপকরণ দেখে বোঝা। দ্বিতীয় কাজটি ইতিহাসের ছাত্রদের জন্য ছেড়ে দিলাম। প্রথম কাজটি, ভেবে দেখ, আমরা 'প্রকৃতি-পড়ুয়ারা' নিতে পারি কিনা!

আমি এতক্ষণ যা বলেছি, এবার, একটু গুছিয়ে সে কথা বলছি:

পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য পোকামাকড় গাছপালা পশুপাখিকে তাদের পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে হয়েছে। মানিয়ে নেবার জন্য তাদের দেহের গড়ন ধরনের অদল বদল হয়েছে। হাবভাব শুধরেছে। মানুষ, জীবজগত থেকে আলাদা না হয়েও আলাদা। আলাদা সে শিক্ষা আর স্বভাব প্রকৃতিকে নিজের মত করে নিজের প্রয়োজনে সে গড়ে নেবার চেষ্টা করছে। চেষ্টা করে কখনও কোথাও অনেকটা সফল হয়েছে। তুমি আমি আর সব মানুষেরা যারা মানুষের এই সফলতা দেখে মুগ্ধ কিন্তু প্রকৃতিকে তাই বলে অবহেলা করতে চাই না, বরং ভালবেসে তার নিয়মের কার্যকারণ জানতে চাই তারা হলাম 'প্রকৃতি-পড়ুয়া'। আমরা জানতে চাই জীবজগতের আর সবাই কেমন করে পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিচ্ছে। জানতে চাই তাদের সাথে আমাদের সত্যিকারের সম্পর্কটা কি। জানতে চাই, তাদের জীবন থেকে প্রকৃতির সাথে মানিয়ে নিয়ে বাঁচার নতুন নতুন উপায়।

এই কাজের জন্যে দু' একজন নয় শ' শ' প্রকৃতি-পড়ুয়া চাই। তুমি কি প্রকৃতি-পড়ুয়া?

* **সন্দেশ যে পড়ে সেই প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তরের সভ্য হতে পারে।**
* **চোখ কান হাত মাথা ঠিক থাকলে 'প্রকৃতি-পড়ুয়া' হবার জন্য চিঠি লেখ।**
* **তোমার চিঠি পেয়ে দপ্তরের আর সব নিয়ম জানিয়ে দেওয়া হবে।**

ছোটদের বইয়ের কথা

আমাদের দেশের মানচিত্রে আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর নাম-ও দেখতে পাবে। উত্তরে নেপাল, ভুটান ও সিকিম; দক্ষিণে সীলন বা সিংহল; পুবে খানিকটা পূর্ব পাকিস্তান আর খানিকটা বর্মা; পশ্চিমে পশ্চিম পাকিস্তান। এদের মাঝখানে ভারত।

এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকলে আমাদেরি ভালো, কাজেই এদের সম্বন্ধে আমাদের জানাও দরকার, জানবার বিষয়ও আছে যথেষ্ট।

চেহারায় বা ভাষায় যতই আলাদা হই না কেন, অনেক বিষয়ে আমরা এক-ই রকম। বেশির ভাগ লোক-ই হয় হিন্দু, নয় মুসলমান, কি বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টান; কিছু অন্য ধর্মাবলম্বীও আছেন। প্রায় সবাই ভাত খাই, নয় তো রুটি। আমাদের নাচগান বাজনা যাত্রা ইত্যাদিতেও কত সাদৃশ্য। তাছাড়া অনেক দেশের তুলনায় আমরা সবাই গরীব, সবাই দুঃখী। এই প্রতিবেশিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা খুব শক্ত কাজ হওয়া উচিত নয়। শুধু তাই নয়, সকলের উন্নতির জন্যে এই রকম বন্ধুত্বের খুব দরকার আছে।

এই বিষয়ে দুটি ইংরিজি বই আমার হাতে এসেছে।

একটির নাম ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড হার নেবার্স (India and Her Neighbours)। অর্থাৎ ভারত ও তার প্রতিবেশীরা। লেখিকার নাম তায়া জিনকিন, ছবি এঁকেছেন বিমান মল্লিক, প্রকাশ করেছেন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস (Oxford University Press)। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৬; দাম ১৮.৯০।

চমৎকার বাঁধাই, বড় বই। ভিতরে অনেক সুন্দর রঙিন ছবি। তবে রামায়ণমহাভারতের গল্পের মধ্যে কিছুটা তফাৎ লক্ষ্য করবে। ভারতের বাইরে প্রচলিত রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী সব বিষয়ে আমাদের দেশের গল্পের মতো নয়।

অক্সফোর্ড চিলড্রেন্স রেফারেন্স লাইব্রেরি (Oxford Children's Reference Library), অর্থাৎ অক্সফোর্ড শিশু গ্রন্থাগারের ধারাবাহিক বইগুলিতে সহজ সরল ইংরিজিতে অল্প কথায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়, ভূগোল, ইতিহাস, সাহিত্য, আরো অনেক কিছু সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই বই পড়ে তোমরা দেশবিদেশের অনেক কথা জানতে পারবে। যে বইখানির কথা বলছি সেটিও ঐ ধারাবাহিক প্রকাশনীর একটি।

আমরা ভারতবাসী; আমাদের দেশের পুরাণ, মহাকাব্য, ইতিহাস সাহিত্য সম্পর্কে আমরা অনেক কথা শুনি ও জানি। কিন্তু এই বইটাতে একজন বিদেশী মহিলা ভারতের পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, সেকালের কথা, মোগল রাজত্ব, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, স্বাধীনতা সংগ্রাম, সব কিছুর কথা বলেছেন।

তাছাড়া নানান্ প্রদেশের, যেমন বাংলা, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, রাজপুতানা ইত্যাদির গ্রাম্য জীবনযাত্রা, জাতীয় উৎসব ও পালা পার্বনের কথাও বলেছেন। এই বই পড়ে বিদেশী ছেলেমেয়েরাও আমাদের দেশ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারবে।

এ বইতে ভারতের প্রতিবেশী রাজ্যগুলির কথাও খানিকটা আলোচিত হয়েছে। নেপালের পৌরাণিক কাহিনী, বর্মার ইরাবতী নদী, পূর্ব পাকিস্তানের গ্রাম্য জীবন, সিংহলের চা বাগান এবং আরো অনেক কথা আছে।

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের এই গ্রন্থাগারের আরো বই আছে। সেগুলি পড়লেও সাধারণ জ্ঞান বাড়বে আর অনেক নতুন খবর শুনে আনন্দ পাওয়া যাবে।

এইতো গেল একখানি বইয়ের কথা। অন্যটি হল দিল্লীর চিলড্রেন্স বুক ট্রাষ্টের 'আওয়ার নেবার্স', (Our Neighbours), অর্থাৎ 'আমাদের প্রতিবেশীরা।'

এ বইটি লিখেছেন চন্দ্রলেখা মেহতা, ছবি এঁকেছেন পুলক বিশ্বাস। মাত্র চুয়ান্ন পৃষ্ঠার বই, দাম দুইটাকা পঁচিশ পয়সা।

এই ছোট বইখানিতে আমাদের ঐ ছয়জন প্রতিবেশী, তাদের দেশের কথা শিল্প, জীবনযাত্রা, পুরনো ঐতিহ্য ইত্যাদি সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। তথ্যগুলো নির্ভুল আর ছবিগুলির তুলনা হয় না।

দিল্লীর চিলড্রেনস্ বুক ট্রাস্ট ছোটদের জন্যে প্রথমে ইংরিজিতে বই প্রকাশ করেন। তারপর ইংরিজি থেকে নানান প্রাদেশিক ভাষায় একই ছবি দিয়ে, একই রকম বই বের করার চেষ্টা করেন। বাংলাতেও কিছু কিছু হয়েছে ও হচ্ছে। এই বইটাও হয়তো শীঘ্রই একদিন বাংলায় দেখতে পাবে।

দিল্লী যদি যাও, হার্ডিঞ্জ ব্রিজের কাছে, চিলড্রেন্স বুক ট্রাস্টের বাড়ি, 'নেহেরু হাউসে' যেও। সেখানে বিখ্যাত ডল্‌স-মিউজিয়ম বা পুতুলের জাদুঘর দেখে অবাক হয়ে যাবে। পৃথিবীর সব দেশ থেকে আনা হাজার হাজার চমৎকার পুতুল। লোকে বাড়িটাকে বলে গুড়িয়া-মাকান বা পুতুল বাড়ি।

ছোটদের গ্রন্থাগারটিও দেখো। সেখানে খুব বেশি বাংলা বই না থাকলেও, দেখে খুশি হবে। শ্রীশঙ্কর পিল্লে বলে একজন মানুষের চেষ্টায় এই ব্যাপার সম্ভব হয়েছে। ছোটদের আঁকা ছবি, ছোটদের লেখা গল্প, দেখলে বেজায় খুসি হন। ছোটদের জন্যে একটা পত্রিকাও বের করেন।

সত্যজিৎ রায়

(৩)

গতবার তোমাদের 'রাম ভালো ছেলে' বোঝানোর জন্য একটা চিত্রনাট্য লিখতে বলেছিলাম। অনেকেই সেটা লিখে পাঠিয়েছে, আর তার মধ্যে কয়েকজনের লেখা সত্যিই খুব সুন্দর হয়েছে। সামনের বারে কার কার লেখা ভালো হয়েছে জানাবো, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব, আর যারটা সব চেয়ে ভালো হয়েছে সেটা ছাপিয়েও দেবো। এবারে চিত্রনাট্যের পরে কী আসে সেটা বলি।

চিত্রনাট্য শেষ হয়ে গেলে লেখাজোখার কাজ মোটামুটি শেষ হ'ল বলা যেতে পারে। 'শুটিং' (বা ছবি তোলা) শুরু হবার আগে অবিশ্যি এই চিত্রনাট্যের উপরেও আরো কিছুটা কাজ করার থাকে —সেটা হল, এই চিত্রনাট্যকে ছবিতে তোলার সুবিধের জন্য টুক্‌রো টুক্‌রো করে বিভিন্ন 'শট্'-এ ভাগ করা। এটার প্রয়োজন কেন হয় সেটা একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে।

ধরো, চিত্রনাট্যতে বলা হয়েছে 'রাম ঘুম থেকে উঠে তার শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এলো'। এই ঘটনাটা যদিও লেখার সময় মাত্র একটা বাক্য বা Sentence এই বুঝিয়ে দেওয়া হল, ছবি তোলার সময় দেখা যাবে যে এটাকে ছুটো 'শট্'-এ ভাগ করলে সুবিধা হয়। সেই ছুটো শট্‌কে বর্ণনা করতে গেলে এই রকম দাঁড়াবে—

শট্ (১) রামের শোবার ঘরের ভিতর।

রাম ঘুম থেকে উঠে বিছানা থেকে নেমে পাশের দরজা দিয়ে এগিয়ে গেলো।

শট্ (২) রামের বাড়ির বারান্দা।

রাম শোবার ঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে বারান্দায় এলো।

এমনও হতে পারে যে এই শট্-এর একটা হয়ত আজ নেওয়া হল, আরেকটা নেওয়া হল ছু মাস পরে। কিন্তু শট্-ছুটো যখন একটার সঙ্গে আরেকটা জুড়ে ফেলা হল, তখন দেখা গেল সে জোড়াটা

আর টেরই পাওয়া যাচ্ছে না। দুটো মিলে একেবারে একটা গোটা sentence এর মতো হয়ে গেছে।

এইভাবে—যেমন একটা গল্প চলতে অনেকগুলো টুক্‌রো টুক্‌রো sentence এর দরকার হয়—তেমনি অনেকগুলো আলাদা আলাদা শট্‌-কে জুড়ে তবে একটা সিনেমার গল্পকে বলা যায়। হিসেব করলে দেখা যায় যে এক একটা ছবিতে গড়ে প্রায় চার পাঁচশ আলাদা আলাদা শট্‌ থাকে। কোন পরিচালক যদি খুব তাড়াতাড়ি কাজ করেন, তাহলেও তার পক্ষে দিনে পনর-বিশটার বেশি শট্‌ নেওয়া সম্ভব হয় না। তাই সাধারণতঃ দেখা যায় যে একটা খুব সাদাসিধে ছবি করতে প্রায় ২৫।৩০ দিন শুটিং করার প্রয়োজন হয়।

আর শুধু শুটিং করলেই ত কাজ ফুরিয়ে গেলো না। যে ছবি তোলা হল তাকে ডেভেলাপ করতে হবে, প্রিন্ট করতে হবে, সেগুলোকে দেখে তার মধ্যে ভালো মন্দ বাছাই করতে হবে। তারপর সেগুলো কাটা ছাঁটা জোড়া ও আরো খুঁটিনাটি অনেক কাজ করে, একটা ছবিকে দাঁড় করাতে কম পক্ষে তিন চার মাস লেগে যায়। এই তিন চার মাসে অনেক লোক তাদের হাতের কাজের ছাপ ছবিতে রেখে যায়। একটা ছবি দেখতে গিয়ে আসল গল্প শুরু হবার আগে যে নামের তালিকাটা তোমরা দেখো (যাকে বলে credit list)—সেটা হচ্ছে এই সব কাজের লোকদের নাম।

এই কর্মীদের সাধারণত দু ভাগে ভাগ করা হয়। এক হল যারা ক্যামেরার সামনে থাকেন—অর্থাৎ যাদের চেহারা আমরা ছবিতে দেখি। এরা হলেন অভিনেতা—তা সে ছেলেই হোক বুড়োই হোক বা কুকুর বেড়ালই হোক্।

অন্য দলের কর্মীরা থাকেন ক্যামেরার পিছনে। এদের প্রত্যেকেরই এক একটা নাম আছে সে নাম গুলো হল—

(১) পরিচালক (Director) :—

ছবি তৈরির সব ব্যাপারেই এর কর্তৃত্ব করার অধিকার আছে, কারণ তোলা আর জোড়া শেষ হলে পর পুরো ছবিটা কেমন দাঁড়াবে, সে সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা একমাত্র পরিচালকেরই থাকে। অভিনয়টা কেমন ধরনের হবে, ক্যামেরা কোন খানে বসিয়ে ছবি তোলা হবে, দৃশ্যগুলি কী ভাবে বিভিন্ন শট্‌-এ ভাগ করা হবে—ইত্যাদি সবই পরিচালকের জানার কথা।

পরিচালকের সঙ্গে তিন চারজন সহকারী থাকে যারা অনেক ব্যাপারেই তাকে সাহায্য করতে পারে।

(২) ক্যামেরাম্যান বা আলোকচিত্রশিল্পী :—

ইনি ছবি তোলেন। এঁকে কোন কোন সময়ে খোলা রাস্তাঘাট বন পাহাড় নদীর ধার ইত্যাদি আসল জায়গায় গিয়ে ছবি তুলতে হয়। আবার কোনো কোনো সময় ষ্টুডিওর ভিতরে নকল ঘর বাড়িতে নকল দিন বা নকল রাতের আলো তৈরি করে ছবি তুলতে হয়। এই দুটো কাজই এর জানা দরকার।

ক্যামেরাম্যানেরও দু একজন সহকারী থাকে।

(৩) শব্দ-যন্ত্রী (Sound Recordist) :—

ক্যামেরাম্যান যেমন দৃশ্যের ছবি তুলে রাখেন, তেমনি শব্দ-যন্ত্রী মাইক্রোফোন দিয়ে একটি দৃশ্যের কথাবার্তা হাঁটা চলা হাঁচি কাশি হাসিকান্না চড় চাপড় পাখির ডাক মেঘের ডাক নাক ডাকানি ইত্যাদি সব কিছু যা কানে শোনা যায় তাই তুলে রাখেন।

এঁরও দু-একজন করে সহকারী থাকেন।

(৪) শিল্প নির্দেশক (Art Director) :—

ইনি ষ্টুডিওর ভেতর ফাঁকি-দেওয়া নকল বাড়ি ঘর তৈরি করেন এমন ভাবে যে ছবিতে তাকে আসল বলে মনে হয়। কাজেই বুঝতেই পারছ যে এর কাজটাও নেহাৎ ফেলনা নয়।

কাজের যোগান দেবার জন্য এরও সহকারী থাকেন।

(৫) সম্পাদক (Editor) :—

মাসিকপত্রের সম্পাদকের সঙ্গে কিন্তু এই সম্পাদকের কোনই মিল নেই। ক্যামেরায় তোলার সময় যে গল্পকে টুক্‌রো টুক্‌রো ভাবে ভাগ করে তোলা হল, তাকে আবার জোড়া দিয়ে গল্পের চেহারায় ফিরিয়ে আনার ভার হল সম্পাদকের উপর। এর কাজেও অনেক ঝামেলা, তাই একেও হয় একটি না হয় দুটি সহকারী নিতেই হয়।

যে সব লোকের কাজের ছাপ ছবিতে থাকে, অভিনেতা বাদে তাদের মধ্যে উপরের পাঁচজনই প্রধান। এদের প্রত্যেকের কাজ সম্বন্ধে আলাদা করে পরে তোমাদের বলব। তার আগে সিনেমা তৈরির যন্ত্রগুলো সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। এই যন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে জরুরী হল ক্যামেরা। আর সব কিছু বাদ দিয়ে ছবি তোলা যায়, কিন্তু ক্যামেরা বাদ দিয়ে যায় না। ক্রমশঃ

‘চট্‌পট্‌’ প্রতিযোগিতা

একটা ধপ্‌ধপে কাগজ আছে হাতের কাছে ? তাতে খস্‌খস্‌ করে কত চট্‌পট্‌ এই প্রতিযোগিতার উত্তর লিখে ফেলতে পার দেখি। ব্যাপারটা খুব সহজ। গুণে গুণে ঠিক ২০০টা শব্দ ব্যবহার ক'রে, একটা বানানো বা সত্যি ঘটনা লেখো—আর এই লেখার মধ্যে যত পার ওই ‘ধপ্‌ধপে’ ‘কুচকুচে’ ‘টক্‌টকে’ ‘প্যাচপ্যাচে’ ‘খিট্‌খিটে’ জাতীয় কথা ব্যবহার কর। ভেবে দেখলে দেখবে যে বাংলায় ও রকম অনেক কথা আছে, আর সেগুলো সব সময়ই আমরা ব্যবহার করি।

তোমাদের লেখা বিচার করার সময় কে কত বেশি ওই রকম কথা ব্যবহার করেছে সেটা যেমন দেখা হবে, সব মিলিয়ে কার লেখা ভালো হয়েছে সেটাও দেখা হবে।

নিয়মাবলী

(১) লেখায় ঠিক ২০০টা শব্দ ব্যবহার করতে হবে।

(২) যত বেশি সংখ্যক সম্ভব ঐ ধরনের শব্দ লিখতে হবে।

(৩) ৩১শে মের মধ্যে গল্পটি পাঠাবে।

(৪) যাদের চাঁদা বাকি আছে, তারা চাঁদাও ৩১শে মের মধ্যে পাঠিও।

(৫) যারা গ্রাহক নও, তারা প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে চাইলে গ্রাহক হয়ে যাও।

(৬) নাম, ঠিকানা, বয়স ও গ্রাহক সংখ্যা স্পষ্ট করে লিখবে। যারা এখনও গ্রাহক সংখ্যা পাওনি তারা লিখবে ‘নতুন’।

(৭) যাদের বয়স ১২র কম, তারা লিখবে ‘ক বিভাগ’, যাদের বয়স ১২ থেকে বেশি কিন্তু ১৭র কম তারা লিখবে ‘খ-বিভাগ’।

(৮) খামের বাঁ দিকের কোণে লিখবে ‘চটপট প্রতিযোগিতা’।

(৯) মোট চারটি পুরস্কার দেওয়া হবে :—

ক-বিভাগ : (যাদের বয়স ১২র কম)
প্রথম পুরস্কার ১০৲, দ্বিতীয় পুরস্কার ৫৲

খ-বিভাগ : (যাদের বয়স ১২র বেশি কিন্তু ১৭র কম)
প্রথম পুরস্কার ১০৲, দ্বিতীয় পুরস্কার ৫৲

প্রোফেসর শঙ্কু ও রক্তমৎস্য রহস্য—সত্যজিৎ রায়।

অষ্টম বর্ষ—দ্বিতীয় সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫ | জুন ১৯৬৮

এই মন যাদু জানে

করুণাময় বসু

এই মন যাদু জানে, আকাশের রূপ কাঠি দিয়ে
স্বপ্নের জরির কোণে ফুল তোলে, ছবি আঁকে বানিয়ে বানিয়ে,
রোদ ভেঙে গুঁড়ো করে চুণী পান্না ঝিলিমিলি কতো রঙ
এঁকে রাখে পাখিদের গায়ে,
যে পাখি বাতাসে ওড়ে, গান গায় বনে বনে বসন্ত জাগায়ে,
বাসা বাঁধে ডালে ডালে সবুজ গাছের :
এই রোদ কখনো বা ভোরের পুকুর-জলে রূপ নেয় রূপালি মাছের।
এই রোদ সোনার জ্যোৎস্না জাল পেতে রাখে শরতের শেষ রাতে
ঘাসের শিশিরে,
শীতের কুয়াসা মাঠে, হেমন্তের চরে বিলে ঝোপঝাপ পদ্মদিঘি তীরে।
এই মনে কে যে আছে রূপকথা আঁকা এক সোনার ঝাঁপিতে,
হঠাৎ মুখটি তোলে চাঁদ ওঠা শুক্লপক্ষে সন্ধ্যা দেখা দিতে ;
চঞ্চল চামেলি বন দোল খায়, ঝিলিমিলি আলোছায়া কাঁপে,
সন্ধ্যার আকাশ যেন জেগে ওঠে ঘুম চোখে ঘরে ফেরা পাখির আলাপে।
দুপুরের শূন্যমাঠ বেতঝোপ পদ্মদিঘি ঘন কেয়াবন
কোজাগরী জ্যোৎস্নারাতে রূপ ধরে রূপকথা পুরীর মতন,

যাদুকাঠি নাড়ে কেউ, নিয়ে আসে স্বপ্ন কিছু, নিয়ে আসে আশ্চর্য বিস্ময়,
জ্যোৎস্না রাতে ঠিক যেন মনে হবে এ পৃথিবী বুঝি আর মানুষের নয়,
এখন মায়ার দেশ, এখন ছায়ার খেলা, সব কিছু স্বপ্ন হয় চোখে,
টুপটাপ থই ফোটে, যুঁই ফুল হয়ে যায় থই থই ভরা জ্যোৎস্নালোকে।
লতাপাতা দুলে দুলে গান গায়, বাগানের ফুলের পাপড়ি
সোনার ওড়না গায়ে উড়ে যায় মনে হবে এক ঝাঁক চিত্রলেখা পরী :—
মাঠে মাঠে হাত ধরে নেচে নেচে গান গায়, হাততালি দেয় তারা এক দুই তিন,
গাছের ছায়ারা সব মনে হবে এক ঝাঁক মায়ার হরিণ !
এই সব পরীদের চিত্রিতা মোমের মুখ, রাঙা ঠোঁট, এলোমেলো চুল,
কখনো কবরী বাঁধে, গুঁজে রাখে সখ করে চাঁপা বেল ফুল।
অর্ধেক মানুষী রূপ, অর্ধেক নাগিনী,
মাধবী পূর্ণিমা রাতে পদ্মঢাকা কালোজলে একদৃষ্টে চেয়ো দেখো,
মনে হবে যেন চিনি চিনি।
মনে হবে এইখানে পাশাবতী মেয়ে কোন পেতে রাখে ফাঁদ,
ধরেছে রাজার ছেলে, পক্ষীরাজ ঘোড়া তার, তারা ফুল, বন লতা চাঁদ ;
কখনো বা পেতে রাখে হীরার ডালিম,
মণি মুক্তা কাজ করা যুঁই ফুল, মীনে করা সোনা হাঁস নিশি পাওয়া
মায়াময় রাত ঝিম ঝিম :
হঠাৎ এসোনা কেউ একা একা আপনার ভুলে,
এ বড়ো মায়ার দেশ, মণিমালা চমকায় পরীদের কালো এলোচুলে।
ঝিকিমিকি জ্যোৎস্না-রাতে কালো জলে জাল পেতে রাখে,
জড়াবে সমস্ত দেহ যদি পায় বেঘোরে বিপাকে।
কখনো ইসারা করে, বলে তারা, নিয়ে যাবে সাগর দ্বীপের
সবুজ লবঙ্গ বনে, ঘর বেঁধে রেখে দেবে, গান গাবে, আবার বসন্ত শেষে
এইখানে এনে দেবে ফের।
কখনো ভুলোনা যেন এই ছলনায়,
কখনো ফেরে না তারা এদের মায়ায় পড়ে সাগরের দ্বীপে যারা যায়।
তারপর জ্যোৎস্না রেখা মুছে যায়, চাঁদ ডোবে দিগন্তরে,
ফুরফুর হাওয়া বয়, ভোর ভোর মাঠ ঘাট দিগন্ত বিসারী,
হঠাৎ পরীর দল মুছে যায়, প্রজাপতি হয়ে যায়,
কেউ বুঝি এক ঝাঁক পাখিদের সারি।

সুবীর চট্টোপাধ্যায়

॥ আগের কথা ॥

উঃ কি মাছের আকাল! সাত সাতখানা বাজারে সকাল থেকে হন্যে হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম, কিন্তু মাছের পাত্তা নেই। যা, দু একটা চুনোপুঁটির দর্শন মিলল, তাতে তো হাত দেবার উপায় নেই। আগুন দাম। শেষে ব্যাজার হ'য়ে মাছ ছাড়াই বাজার করলাম। কুটুর সোনার জন্য এক ভাঁড় রাবড়ি কিনে নিলাম, ভচ্চাজ্যি মশায়ের দোকান থেকে।

বাড়িতে পা দিতেই রোজকার মত লাফিয়ে এল কুটুর। গোঁফ নাচিয়ে বলল, 'মেয়াও ম্যাক্' (কি মাছ আনলে?) 'মাছ পেলাম না। তোর জন্যে রাবড়ি এনেছি।' কথাটা ব'লে মিষ্টি ক'রে হাসতে যাব, কিন্তু, এ কি? কুটুরের মুখ ভার। একটাও কথা না বলে ল্যাজ ফুলিয়ে চলে গেল। খাবার সময় কাছেও এল না। মান ভাঙ্গাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কুটুর আমাকে পাত্তাই দিলে না। সকাল বেলা সময় বেশি নেই। এক্ষুনি ছুটতে হবে বেলগেছের হাসপাতালে। মনে ভাবলাম ফেরার পথে শ্যামবাজার থেকে মাছ নিয়ে আসব—যত দাম লাগে লাগুক।

ইয়া মস্ত একটা গঙ্গার ইলিশ হাতে ঝুলিয়ে রাত্তিরে বাড়ি ঢুকলুম। অন্যদিন পায়ের শব্দ পেলেই কুটুর লাফিয়ে আসে। কিন্তু, কোথায় গেল আজ? কত ডাকাডাকি করলাম, সাড়া নেই। ঘরে ঢুকে দেখি লেখার টেবিলের ওপর সুলেখা কালির দোয়াতটা চিৎপাত হ'য়ে উল্টে পড়ে আছে। প্যাডের পাতায় লাল নীল থাবা আর ন'খ দিয়ে কি যেন সব হিজিবিজি লেখা।

। তারপর ।

খোকনদাদার ওপর অভিমান করে কুটুর সোনা তো পা বাড়ালেন নিরুদ্দেশের পথে—কিন্তু যাবেন কোথায়? অনেক ভেবে চিন্তে তিনি আলিপুরের চিড়িয়াখানায় হানা দিলেন। সেখানে আছেন তাঁর বোনপো, হালুম কুমার। কুটুর ভাবলেন, হালুমটাকেও সঙ্গে নিই। ও বেচারি চিড়িয়াখানায় পেট পুরে খেতে পায় না। দুজনে মিলে একেবারে সগ্‌গে চলে যাব। সেখানে নাকি ভারি আরাম। হালুমকুমার রাতদুপুরে কুটুরকে দেখে, থ।

হালুম— হালুম হালুম হি
রাতদুপুরে জেগে জেগে
স্বপ্ন দেখি কি ?
মাসির মতোই দেখতে। এ কে !
এত রেতে কোথা থেকে ?
চিমটি কেটে দেখি গায়ে
বেঁচেই তো আছি !
পাগল হয়ে গেলাম বুঝি,
যাব কি রাঁচি !!

কুটুর— মেয়াও মেয়াও ম্যাক্
চোখ মটকে ভাল ক'রে
তাকিয়ে এবার দ্যাখ !
আমি তো তোর মাসিমণি
চিনতে করিস ভুল ?

হালুম— মারছ কেন গুল,
হালুম হালুম হুল !
মাসি থাকেন বালিগ্রামে
সুবীরবাবুর বাড়ি।
সুখে আছেন। কোন দুখেতে
আসবেন ঘর ছাড়ি ?

কুটুর— মেয়াও মেয়াও মল,
দুখের কথা বলব কি রে
আসছে চোখে জল॥
বুক ফেটে যায়
হায় হায় হায়
বলব যে তায়
বাক্যি কোথায়
তোদের কবি, সুবীর মশাই
আমার খোকন দাদা।
মুখোশ এঁটে থাকে মুখে
লোকটা তো নয় সাদা॥

হালুম— হালুম হালুম হেই
সে কি কথা, লোক দেখে যে
চেনার উপায় নেই !
ঘুরতে এলে চিড়িয়াখানায়
কত আদর করেন আমায়
বলেন, "হালুম কেমন আছ ?"
পিঠে রেখে হাত।

কুটুর— মেয়াও, মেয়াও, মাত্
ঐ চালে তো চালাক ছেলে
করছে বাজী মাৎ—
মুখে দরদ, লেখায় সোহাগ
সাধে আমার হচ্ছে কি রাগ
কথা যেন মিছরি গলা
কাজের বেলায় কাঁচা কলা
আমায় ভাল বাসে না সে
দেয় না খেতে মাছ।
সেইজন্যেই বোনপো ওরে
এসেছি তোর কাছ॥

হালুম— এই সেরেচে, করেচ কি,
হালুন হালুম হাও,
বাঁচতে হ'লে এখন থেকে
সেরেফ কেটে যাও।
একেবারে জন্ম কাবার
চিড়িয়াখানায় নেইকো খাবার !
পেটটা চেপে ধরতে হবে,
খিদের সাথে লড়তে হবে,
উপোষ ক'রে মরতে হবে
ঘাবড়ে যাবে, আরো ফ্যাচাং
শুনতে সে সব চাও ?

কুটুর— মেয়াও মেয়াও মি,
তুই ভাবছিস, চিড়িয়াখানায়
থাকতে এসেছি ?
আরো রামো, জানিরে ভাই
জুটবে খাবার ধুলো ও ছাই
তিন দিনেতেই পটকে যাব

যমের বাড়ির টিকিট পাব
চিড়িয়াখানার খাবার ?—ছিঃ ছিঃ
ভাবলে মূর্ছা যাই।

হালুম— হালুম, হালুম, হালুম, হালুম,
হালুম, হালুম, হা।
কেন তবে এলে মাসি
বলেই ফেল না॥

কুটুর— বোনপো আমার শোনরে তবে
মেয়াও, মেয়াও, মিক,
তোকে নিয়ে পালিয়ে যাব
এই করেছি ঠিক॥
আয় বেরিয়ে, পা বাড়াব
সগ্‌গোলোকের দিক।
রাস্তা চিনে সেইখানেতে
পৌছে যদি যাই।
রাজার হালে থাকব হালুম
আর ভাবনা নাই।
যত খুসি মাংস খাবি
তিনদিনেতে মুটিয়ে যাবি
হবে শেষে অরুচি তোর
করবিনা খাই খাই॥

হালুম— হালুম, হালুম, হা
শুনেই কেমন লাগছে মজা
তাইরে নাইরে না।
এক দুই তিন, হেঁই মারো টান,
হেঁই মারো টান, লাগাও জোয়ান
লাগাও জোয়ান, আউরে থোড়া
আউর থোড়া, ছাগল ঘোড়া
ছাগল ঘোড়া কড়াৎ কড়্
কড়াৎ কড়্ ঝাপটে ধর
ঝাপটে ধর, খাঁচার গরাদ
খাঁচার গরাদ, শ্রেফ বরবাদ
শ্রেফ বরবাদ ভাঙ্গা খাঁচা
বাইরে এবার এলাম চাচা
চাচা তো নয়, মাসিমণি
সগ্‌গে চল, এই এখনি॥

কুটুর— মেয়াও, মেয়াও, মাস,
বলিহারি বোনপো তোকে
সাবাস রে সাব্বাস্!!
হাত চেপে ধর যাই দুজনে
অনেক অনেক দূর।
এক্কেবারে নতুন দেশে
সেই সগ্‌গোপুর॥

হালুম কুমার খাঁচার গরাদ ভেঙ্গে বেরিয়ে এলেন তাঁর মাসিমনির কাছে। এবার যাত্রা হ'ল শুরু—সগ্‌গোপুরের পথে। ওঁরা চলেছেন তো চলেছেন চলতে চলতে সকাল হ'ল। গড়িয়ে দুপুর হ'ল, এদিকে দুজনের পেটে তো ডজন খানেক ইঁদুর-ছুঁচোয় হা-ডু-ডু খেলছে। কত বন, জঙ্গল, পাহাড় নদী ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে চলেছেন ওঁরা। কিন্তু একটাও লোকালয় নেই। চলতে চলতে যখন প্রায় বিকেল হয় হয়, একটা মস্ত লোহার গেটের সামনে ওঁরা থামলেন। চারদিকে পাঁচিল ঘেরা গেটের মাথায় পেল্লায় একটা নোটিশ।

আর পেট ফাঁসানো! খিদেয় তো নাড়ি ছেঁড়ার উপক্রম। যা থাকে কপালে, ওঁরা দুজন 'জয় মা কালী' বলে ধাঁ করে ঢুকে গেলেন গেটের ভেতরে। ব্যাস্ সঙ্গে সঙ্গে সেপাই কুকুর ভৌ-ভুলো তেড়ে এলেন বল্লম উঁচিয়ে।

ভৌ-ভুলো— ভৌ ভৌ ভৌঁ ভার
লম্ফ দিয়ে ঢুকল কেরে
এত সাহস কার!
গেটের মাথায় ঝুলছে নোটিস্,
সেটা পড়েও! সাহস কি, ইস্!
ভাখরে মজা খপাং করে
ধরছি চেপে ঘাড়।
বল্লমটা বাগিয়েই পেট
ফাঁসাবো এবার।
পাবি মালুম, ভুলোর হাতের
দাওয়াই চমৎকার,
ঘুর ঘুর ঘুর ঘুরবে মাথা
দেখবি অন্ধকার॥

হালুম— হালুম, হালুম, হা
সেপাই সাহেব, কথা শুনুন
রাগ করবেন না,
সাহেব সুবো মহাজনের
রাগ করা কি সাজে!
ঠাণ্ডা করে মাথা, শুনুন,
এসেছি কি কাজে॥

ভৌ-ভুলো (স্বগতঃ)—বুকটা আমার উঠছে ফুলে
ভৌ ভৌ ভৌ ভা।
আমি সাহেব, এ কথা তো
জানাই ছিল না,
দেখছি আলো হাজার বাতির
করছে আমায় রাজার খাতির
আমি সাহেব, সেতো বটেই
সন্দেহ আর নেই।
ইন্‌জিরিটা জানিনে যে
তফাৎ শুধু এই।

কুটুর— ম্যাও, ম্যাও, ম্যাও, মা,
সেপাই সাহেব, কি ভাবছেন
চোখটা খুলুন না॥

ভৌ-ভুলো— ভৌ ভৌ ভেই
আমি সাহেব, সত্যি কথা,
কিন্তু ব্যাপার এই
এটা আজব বিদঘুটে দেশ
মহারাজের কড়া আদেশ
অনুমতি না নিয়ে কেউ
যদি পড়ে ঢুকে,
প্রথমে তার দড়াম করে
মারবে গোঁতা বুকে।
তারপরেতে ঘাড়টা চেপে
করবে মাথা হেঁট।
বল্লমটা উচু করেই
ফাঁসিয়ে দেবে পেট॥

হালুম— ওরে বাবা, হালুম, হালুম
শুনেই মাথা ঘোরে
গেছি গেছি মাসিমণি,
এবার বাঁচাও মোরে॥
সর্ষে ফুলের স্বপ্ন দেখি
নামটা মনেও নেইরে! একি!

মাথাখানা আছে তো ঠিক
নাকি গেছে উড়ে !
ভৌ-ভুলে স্যার, ক্ষমা করুন
পেন্নাম হই খুরে ॥

ভৌ-ভুলো— ভৌ ভৌ ভৌ ভা
না না বাপু, বে-আইনি কাজ
করতে পারি না।
আমি না হয় দিলাম ছেড়ে
চল রাজার কাছে।
শাস্তি পাবে ঠিক যে রকম
ভাগ্যে লেখা আছে ॥

কুটুর (স্বগত)—মেয়াও মেয়াও মে,
এই রে সেরেচে !
কি কুক্ষণে পালিয়েছিলাম
বাঁচবে কি আর জান ?
আজব দেশের রাজার নামেই
কাঁপবে ভয়ে প্রাণ।

ভৌ-ভুলো— ভৌ ভৌ ভৌ ভা
ভাল ছেলের মতন চল
লম্ফ দিয়ো না ॥
চুপটি ক'রে দাঁড়াও এবার
লাগাই হাত কড়া ॥

ভৌ-ভুলো দুজনের হাতে শক্ত ক'রে হাত কড়া লাগিয়ে টানতে টানতে নিয়ে চললেন রাজামশায়ের কাছে। ততক্ষণে সন্ধ্যে হয়ে গেছে। রাজা বড় ভুট্টাস—এই একটুখানি কড়ে আঙুলের মতো একটা নেংটি ইঁদুর, শিরিষ গাছের ডালে চড়ে চা-চা-চা-নৃত্য করছেন। আর মন্ত্রী ছোট ভুট্টাস—ইয়া পেল্লাই পেটমোটা এক ভুঁড়ো শেয়াল উঁচু উইঢিবির ওপর বসে ভাঙা কলসি বাজিয়ে বদ্-খেয়াল গাইছেন।

ভৌ-ভুলো আর তার সঙ্গে দু-দুজন হাত-কড়া-বন্দী আসামীকে দেখে, রাজামশাই ব্যাজার হ'য়ে তরতর করে গাছ থেকে নেমে এলেন। মন্ত্রী বিরক্ত বিরক্ত মুখ ক'রে গান-বাজনা থামালেন।

বড়-ভুট্টাস— চকর, চকর, চি
সেপাই কাদের আনলে ধ'রে
ব্যাপারখানা কি ?
আমার নাচে ঘটলো ব্যাঘাত
শাস্তি দেব জোর।
বল দেখি এরা কারা
ঠ্যাঙাড়ে না চোর ?

ভৌ-ভুলো— ভৌ ভৌ ভৌ ভুক
পেন্নাম হই রাজামশাই
এরা আগন্তুক।
অনুমতি না নিয়ে যে
ক'রেছে প্রবেশ ॥

ছোট ভুট্টাস— হুক্কা হুয়া হুক
আহারে চুক চুক
খতম হ'ল এবার দুজন
জীবন এদের শেষ ॥
সেপাই তুমি দাঁড়িয়ে কেন
বর্শা তুলে নাও,
এক, দুই, তিন—ফচাৎ ক'রে
পেট ফাঁসিয়ে দাও ॥

মন্ত্রীর কথা শেষ হ'তে না হতেই ভৌ-ভুলো বল্লম তুলে, হালুমের পেটের দিকে তাক্ কল্লেন। হালুম কুমার তো ভয়ে কাঁপছেন। কুটুর তার কানে কানে ফিস্ ফিস্ ক'রে কি সব বলেই, চিৎকার ক'রে উঠলেন।

কুটুর— মেয়াও মেয়াও মিক
একটা কথা শোন সেপাই
তাকাও আমার দিক।
আমারই পেট ফাঁসাও আগে
ভাবতে গেলেই মেজাজ লাগে।
সশরীরে সগ্‌গে যাবো
মেয়াও মেয়াও মা।
সেপাই তুমি বর্শা চালাও
দেরি কোর না।

হালুম— হালুম, হালুম হেই
সেপাই সেপাই, এই
কান দিওনা ওর কথাতে
এগিয়ে এস বর্শা হাতে
আমারই পেট আগে ফাঁসাও
কথা রাখ ভাই।
আমিই আগে সগ্‌গে যাব
হালুম হালুম হাই॥

বড়-ভুট্টাস— চকর চকর চে
এ ছুটো কি নিরেট ক্যাপা
ব্যাপার বুঝি নে।
পেট-ফাঁসালে লোকে বুঝি
সগ্‌গে চলে যায়
পাগল ধরে আনল ভুলো
হায়রে হায়রে হায়॥

কুটুর— ম্যাও, ম্যাও, ম্যাও মা,
মিছিমিছি পাগল বলে
গালি দেবেন না॥
ব্যাপারখানা শুনুন এবার,
আজকে শনিবার,
তার ওপরে অমাবস্যা
দারুণ অন্ধকার॥
এখন হ'ল মাহেন্দ্রক্ষণ
এই সময়ে ঠিক,
পেট-ফাঁসা কেউ মরলে পরে
সগ্‌গো পুরীর দিক—
সশরীরেই পাড়ি দেবেন
শাস্ত্রে এমন কয়॥
রাজামশাই শাস্ত্র-বাণী
মিথ্যে হবার নয়॥

বড়-ভুট্টাস— চকর, চকর, চিক্ চিক্ চিক্
চকর চকর চা,
সে তো বটেই শাস্ত্র বাণী
মিথ্যে হবে না॥
সেপাই তুমি এগিয়ে এসে
আমার পেট ফাঁসাও
মন্ত্রী তুমি কানের কাছে
হরিনাম শোনাও॥

ছোট ভুট্টাস— হুক্কা হুয়া হে
নাম শোনাব? কচুপোড়া
বয়েই গেছে রে।
আমিই আগে সগ্‌গে যাবো
মোটেই বোকা নই।
সেপাই তুমি ইধারে আও
বল্লমটা কই?

বড়-ভুট্টাস— চকর চকর চৎ
আরে সেপাই কি হোতা হায়
উধারে যাও মৎ।
আমি রাজা। আমার কথা
না শুনলে পরে
তোমার ফাঁপা মাথাখানা
থাক্‌বে না আর ধড়ে॥

ভৌ-ভুলো— এই সেরেচে একি জ্বালা
ভৌ-ভৌ-ভৌ-ভা।
এধার ওধার ছুটে ছুটে
ছিঁড়লো বুঝি পা!
রাজা মশাই, মন্ত্রী মশাই,
আগে করুন ঠিক,
কে মরবেন। বর্শা নিয়ে
যাবো যে তার দিক।

ছোট ভুট্টাস— হুক্কা হুয়া হর
চোপ্ রও তোম, আবার কথা
বামড়ে দোব চড়,
দু ইঞ্চি নেংটি রাজা
করবে ওটা কি?

বড়-ভুট্টাস— চকর চকর চি
তবেরে দেখবি
দাঁড়া তোরে করছি খতম

জঘন্ত শেয়াল।
মনে করিস বুঝিনেকো
সয়তানি তোর চাল!
তিড়িং করে চড়ব ঘাড়ে
কামড়ে দোব কান।
হেঁড়ে গলায় গাইবি তখন
মরন জ্বালার গান॥

ওমা একি কাণ্ড, কথা বলতে বলতেই নেংটি মহারাজ তিড়িং করে শেয়াল মন্ত্রীর ঘাড়ে উঠে কুটুস্ করে কানে কামড়ে দিলেন। বুড়ো শেয়াল বাজখাঁই গলার আকাশ ফাটা চিৎকার জুড়লেন। ভো-ভুলো, ব্যাপার স্যাপার সুবিধের নয় দেখে, বল্লম ফেলে মার কাটারি।

কুটুর বুঝলেন এই সুযোগ, হালুমের হাত ধরে' এক লাফে আজব দেশের সীমানার বাইরে। পাক্কা সাড়ে সাত ক্রোশ দৌড়ে তবে থামলেন তাঁরা।

হালুম— হালুম হালুম হে
ভাগ্য জোরে খুব বেঁচেছি
খুব বেঁচেছি রে।
মাসিমণি বলিহারি
বুদ্ধি কি তোমার।
লেখাপড়া শিখলে হ'তে
জজ্ বা ব্যারিস্টার॥
খুব শিক্ষে হ'ল আমার
হালুম হালুম হাই।
এক লাফেতে আবার আমি
চিড়িয়াখানায় যাই॥

কুটুর— মেয়াও মেয়াও মা
সত্যি হালুম বাড়ি ছেড়ে
আর পালাব না।
আজব দেশের ব্যপারখানা
ভাবলে মাথা ঘোরে
হাতে নাতে ফল পেয়েছি
বোনপো আমার ওরে।
হেই মা কালী, আর কোনদিন
আসব না ঘর ছাড়ি।
ফিরে চলি বালিগ্রামে
খোকনদাদার বাড়ি॥

বিঃ দ্রঃ—নাটিকাটি অভিনয় করতে হ'লে, আর, জি, কর মেডিকেল কলেজ হোষ্টেল; ১, বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা—৪ (ফোন-৫৫-৭৮-৮৩) এই ঠিকানায়, নাট্যকারের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া আবশ্যক।

হিসাবী

রীণা গোস্বামী

কালকে গেল এক ফাঁড়া,
করেছিল ষাঁড় তাড়া
ছুটতে ছুটতে পৌঁছে গেলাম
গর্চা থেকে পাকপাড়া।
ভাবি মনে ভালোই হলো
বেঁচে গেল বাস ভাড়া।

তুলতুল

অমিতাভ মাইতি

বাড়ি থেকে বেরিয়ে পুবমুখো ফিরে একটু হাঁটলেই কালো পীচের মোটর রাস্তা। তুলতুল সদর দরজা পেরিয়ে সামনের পথটুকু বেয়ে হাঁটছিল।

ওর ছোট ছোট পায়ে হাঁটা। বাড়ি থেকে মোটর রাস্তায় উঠতে ওকে বেশ ক'বার পা ফেলতে হয়েছে। ধবধবে সাদা রং-এর ফ্রক ওর গায়ে। পায়ে সাদা মোজা। সাদা জুতো। মাথার চুলগুলো ঘাড়ের ওপর পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। তুলতুলের রংটিও সুন্দর। টুকটুক করছে। তুলতুল মোটর রাস্তার ওপর এসে দাঁড়াল।

সূর্য উঠেছে আকাশের একটু ওপরে। বেলা সাতটা। কি বড়জোর আধঘণ্টা বেশি। তুলতুলের ঘুম ভেঙ্গেছিল ঠিক ছটা'র সময়। বাবার কাছে ঘুমোয় তুলতুল। বাবার সঙ্গেই বিছানা ছাড়া চাই। চোখে মুখে জল দেবার পরই মা যত্ন করে চোখে কাজল টেনে দেবেন। চুল আঁচড়ে দেবেন। ফ্রক ইজার জুতো-মোজা পরিয়ে ফিটফাট করে দেবেন। সেই যখন আরো ছোট্ট তুলতুল, এক বছর কি সোয়া বছর বয়স, তখন থেকেই এ সব চলে এসেছে।

তারপর বাবার সঙ্গে চা-জলখাবার খেয়েছে তুলতুল। বাবা পড়বার ঘরে গেলেন। মা রান্নার জন্যে। বাবার কলেজের ভাত। তুলতুল একপা একপা করে বেরিয়ে এসেছে।

বাবা আগে ছিলেন কলকাতার এক কলেজে। ওখানেই তুলতুলের জন্ম। এখন এই নতুন দেশে এসে ও কেমন অবাক হয়ে গেছে। কি বিরাট আকাশ। নীল রঙ। কত বড় মাঠ। যে দিকে দু'চোখ যায় শুধু খোলা আর খোলা। সব চেয়ে তাকে টানে ঐ পথটা। কত লম্বা! কত লম্বা! এখানে আসবার পর মার সঙ্গে বিকেলে বেড়াতে বেরিয়েছিল ঐ পথ ধরে। প্রথম দিন বেরিয়েই একটা সুন্দর জিনিস সে দেখেছিল। অনেক গুলি ছেলে মেয়ে, প্রায় তারই মতো তারা। সেই কালো পথটার ওপর লাল রং-এর দাগ টেনে কেমন লাফাচ্ছে। একপা ওপরে তুলে লাফিয়ে লাফিয়ে এগোচ্ছে আবার পেছোচ্ছে।

তুলতুল মার হাতের আঙুল ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

মা বলেছিলেন, না। দাঁড়িয়ে পড়েনা। এসো চলে এসো।

তুলতুল পেছন ফিরে বারকতক তাকিয়েছিল। তারপর মাকে প্রশ্ন করেছিল ওরা কি খেলছে মা?

মা বলেছিলেন, কেন তোমার খেলনা নেই? ওদের সঙ্গে খেলবেনা কোনদিন। ধুলো ঘাঁটলে অসুখ করে।

তুলতুল তখন মনে মনে ভাবছিল, ওরা তবে ধুলো ঘাঁটছে কেন? ওদের যে অসুখ করবে। ওদের মা কেন মানা করে না?

হঠাৎ প্রশ্ন করেছিল তুলতুল, ওদের মা কোথায়, মা ?

মা বলেছিলেন বাড়িতে।

বাড়ি কোথা, মা ?

এরপর একটু চুপ করেছিল তুলতুল। তারপর আবার প্রশ্ন করেছিল। এ রাস্তা কতদূর গিয়েছে মা?

অনেকদূর।

এ দেশ খুব ভালো, না মা।

মা হেসেছিলেন। তোমার খুব ভালো লেগেছে ?

তুলতুল তখন আর কোনো কথা বলেনি। অনেকদূরে একটা বাস আসছিল সেইটা দেখতে পেয়েছে সে।

বাসটা মাও দেখতে পেয়েছিলেন। তুলতুলের হাত ধরে রাস্তার একধারে সরে গেলেন। বাসটা পেরিয়ে যাবার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। একটু পরে বাসটা এল। পেরিয়ে গেল। তুলতুল সেইদিকে তাকিয়ে রইল।

বাসে যাত্রীর ভিড় ছিল না। ভেতরে যাত্রীরা দুলছে। টলছে। বেশ দেখা যাচ্ছিল। তুলতুল বললে, কেমন সুন্দর, না মা ?

মা হাসলেন। এর আগে বাস দেখনি তুমি ? বোকার মতো কথা বলছ কেন ?

কিন্তু তুলতুল কোন কথা বলল না। সে এই বাসের মধ্যে কি দেখেছে সেই জানে। একদৃষ্টিতে দূরে, ক্রমশ দূরে সরে যাওয়া বাসটার দিকে তাকিয়েছিল। তারপর বাসটা যখন অদৃশ্য হয়ে গেল, মার হাত ধরে বলল—বাড়ি চল মা।

মা বললেন, আর বেড়াবেনা ?

তুলতুল মাথা নেড়েছিল না।

ঐ বাসটার দিকেই তার মন উধাও হয়ে গিয়েছিল তখন। তার বিপরীত দিকে এগোতে আর মন চাইছিল না। মার হাত ধরে ফিরে এসেছিল এরপর।

আজ মোটর রাস্তার উপর একটু দাঁড়ালো। তারপর কালো পথটার একদিক ধরে হাঁটতে লাগল।

তুলতুলের বয়স কতো হ'বে ? তিন বছর ? চার বছর ? হয়তো কিছু বেশী। পাঁচ বছর পুরো হয়নি। কিন্তু ও ঠিক পথ হাঁটছিল। মাঝে মাঝে বাস আসছে। তুলতুল ঠিক পথের ধারে সরে যাচ্ছে। পেরিয়ে যাচ্ছে বাস। একটু সময় দাঁড়িয়ে পড়ে বাসটা দেখছে তারপর আবার ধীরে ধীরে হাঁটছে।

পথটা কি সুন্দর ! কি সুন্দর কালো ! কি মসৃন ! রাঙা সূর্যের আলো এসে পড়েছে। চিক্‌চিক্ করছে। দুধারে কি চমৎকার খোলা মাঠ। আর মাঠগুলো কি সবুজ !

তুলতুল দেখছিল। মাঝে মাঝে দাঁড়চ্ছিল। পথ হাঁটছিল।

একজায়গায় একটা ছোট্ট জল নিকাশের খাল। তার উপর বাঁধানো পুল। তুলতুল এসে দাঁড়াল পুলের একধারে জলের কিনারে একটা কি পাখি বসে আছে। তুলতুল এমন পাখি কখনো

দেখেনি। পাখির রং কেমন নীল। ঠোঁট বেশ লম্বা লাল। চুপচাপ বসে আছে পাখিটা। হঠাৎ দেখল তুলতুল, পাখিটা ঝুপ করে জলে পড়ে গেল। তুলতুল বুঝতে পারলো না কেন এমন হ'ল। ঘুমুচ্ছিল কি বসে বসে পাখিটা? পাখিটা মরে যাবে নাকি?

কিন্তু তুলতুল মজা পেল। পাখিটা জলের তলা থেকে হুস্ করে ভেসে উঠল। তারপর উঠে পড়ল জল থেকে। উঠে এসে বসল তার সেই পুরনো জায়গায়। তুলতুল দেখল, পাখিটার সেই মস্তবড় ঠোঁটে একটা চক্‌চকে মাছ। পাখিটা ক'বার তার বসা জায়গাটার ওপর মাছটাকে আছাড় মারল। তারপর মাথাটা বারকতর নাচিয়ে আকাশের দিকে তুলে কুপ করে গিলে ফেলল।

তুলতুল অবাক হয়ে দেখছিল। হঠাৎ শোঁ করে কোথা থেকে কি একটা ছুটে এল। পাখিটার কাছ ঘেঁসে সামনে জলে গিয়ে পড়ল। তুলতুল এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। সে ক'একজনকে দেখল। ঠিক সেদিনের মতো ক'একজন। মার সঙ্গে বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে যেমন দেখেছিল।

পাখিটা উড়ে গেছে। তুলতুল একবার সেই দিকে তাকাল।

নাঃ, পাখিটা আর কোথাও দেখা যাচ্ছে না। সে বাঁধানো পুল পেরিয়ে এগোতে লাগল। ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

প্রায় তুলতুলের বয়সী হ'বে, বা হয়তো কিছু বড় হ'বে, চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে পা ছড়িয়ে বসেছে। তাদের কোলের কাছে সবুজ সবুজ অনেকগুলো কি! সে গুলো থেকে বেছে বেছে তুলে ছাড়িয়ে তারা খাচ্ছে। তাদেরই কেউ একজন বোধহয় পাখিটার দিকে কিছু ছুঁড়েছিল। তুলতুল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দেখতে লাগল।

তুলতুলকে ওরা সবাই দেখেছে। বোধহয় কিছু অবাকও হয়েছে। এই রকম পোষাকপরা একটি মেয়ে এখানে কি করে এল তারা বুঝতে পারল না। তারাও ওকে বেশ একটু দেখছিল। তারপর হঠাৎ একজন বলল, খাবে?

সেই সবুজ সবুজগুলো তুলতুলের দিকে এগিয়ে ধরল।

অমনি হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তুলতুল। তুলতুল হাতে নিয়ে একটু সময় দেখল। সে ওদের খাওয়া দেখছিল। ঐসবুজগুলোর মধ্যে কোন গুলো খেতে হবে বুঝতে পারেনি। একটা গোটা শুঁটি নিয়ে মুখে পুরে দিলে।

ওদের একজন বললে, ও রকম না!

শুঁটি কেমন করে ছাড়িয়ে খেতে হয় দেখিয়ে দিলে।

ওদের শুঁটি বোধহয় ফুরিয়ে গিয়েছিল তাই আবার সবাই মাঠে নামল। তুলতুলও। সে কলাই শুঁটির স্বাদ পেয়েছে। কি মিষ্টি খেতে! আর মাঠে নেমে দেখল সারা মাঠ জুড়ে শুধু কলাই শুঁটি। ওরা দল বেঁধে শুঁটি তুলতে তুলতে এগিয়ে চলল।

প্রিন্সিপ্যাল অনঙ্গমোহনের ঘড়িতে ন'টা বেজে গেছে। সকাল থেকে চা-জলখাবার খেয়ে তাঁকে পড়ার ঘরে বসতেই হয়। তারপর ঠিক ন'টার সময় বাথরুমে ঢুকবেন। দশটার আগে কলেজে যাবেনই।

সময়ের দিকে খুবই নজর তাঁর। অনঙ্গমোহন পড়ার ঘর থেকে বেরোলেন। স্ত্রীকে ডাকলেন।

তুলি কোথা অনু ?

কোথাও খেলছে বোধহয়।

একা একা খেলবে কোথায় ? আমার কাছে তো যায়নি।

ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন অনু। তুলি ! তুলি! তুলতুল !

সদরের দিকে এলেন।

তারপর খোঁজা সুরু হল। অল্প সময়ের মধ্যে হুলস্থূল ব্যাপার।

প্রিন্সিপ্যালের কোয়ার্টার্সসংলগ্ন কলেজের মেয়েদের হোস্টেল। তুলি ওখানে যায়নি। কাছাকাছি আর কারো বাড়ি নেই। সামনে শুধু একটা পুকুর। আর ঐ মোটর রাস্তা।

পুকুরে জাল ফেলা শুরু হয়ে গেল। ছেলেদের হোস্টেল কাছেই—ওরা খবর পেয়েই দৌড়ে এসেছে। জাল সংগ্রহ করেছে। স্থানীয় অধ্যাপকরা এসেছেন সাইকেল-রিক্সা আর মাইক এসেছে মোটর রাস্তা চারদিকে চারটে গেছে। চারিদিকেই লোক ছুটল।

পুকুরে জাল ফেলে কিছু পাওয়া যাচ্ছিল না। মাইক থেকে তুলতুলের বর্ণনা দিয়ে খোঁজ চাওয়া হচ্ছিল পুরস্কার ঘোষণা করা হচ্ছিল।

যতই সময় যাচ্ছিল, অনঙ্গমোহনের মুখ কালো হয়ে উঠছিল। আর অনু—খালি হোস্টেল আর রাস্তা করেছিলেন। তারপর যখন জাল পড়ল ঐ দিকে বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়েছিলেন। তারপর মাইকে ঘোষণা চলতে লাগল। অনু হঠাৎ বিড় বিড় করতে লাগলেন।

…ছেলেধরা…মোটর গাড়ি…তার চাকা…

কলেজের চৌহদ্দি নিয়ে কতকটা শহরের মতো। কিছু ঘড় বাড়ি, দোকান পাট। অধ্যাপকদের কোয়ার্টার্স। হোস্টেল, মেস, বাজার। সব প্রায় তোলপাড় ! না। পাওয়া যাচ্ছে না। কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না তুলতুলকে।

একখানা রিক্সা যাত্রী নিয়ে যাচ্ছিল। গেঁওখালির রাস্তা। সে শুনতে পাচ্ছিল মাইকের তারস্বরে ঘোষণা। প্রিন্সিপ্যালের মেয়ে হারিয়েছে।

…তুলতুল…সাদা পোষাক…সাদা মোজা…সাদা জুতো…কুচকুচে কালো চুল…বয়স…

রিক্সা ওয়ালার দীর্ঘনিশ্বাস পড়লছিল। তারও এক মেয়ে আছে। তুলতুলের বয়সী সুরো। বড় দুষ্টু মেয়েটা। তাদেরও বাড়ি মোটর রাস্তার ধারে। কে জানে কোথা গেল প্রিন্সিপ্যালের মেয়ে।

মাইকের ঘোষণা আর শোনা যাছিল না। ওর সাইকেল রিক্সা তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলছিল আর বেশি দূর নয়। গন্তব্য স্থান প্রায় এঁসে গেল।

সামনে দু'ধারে খোলা মাঠ। সবুজ খেত। কলাই শুঁটির গাছ থই থই করছে। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা মাঠে নেমে পড়েছে। মনের সুখে শুঁটি তুলছে। ছড়াচ্ছে। খাচ্ছে।

রিক্সা পেরিয়ে গেল। তারপর রংপুর। ওখান থেকে ফিরতে হবে তাকে।

মিনিট কুড়ি পরে ফিরছিল আবার রিক্সাওয়ালা। রাস্তার ওপর পুলের কাছে এসে থমকে গেল। বার সময় এখানই মাঠে সে অনেকগুলি বাচ্চাকে দেখেছিল। কিন্তু এখন মাত্র একজন ছিল। মাঠের পর চুপচাপ দাঁড়িয়ে কলাই শুঁটি ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে খাচ্ছিল সে।

রিক্সাওয়ালার সন্দেহ হল। সাদা জামা…পায়েও কি সাদা জুতো? সাদা মোজা?

রিক্সা থেকে নামল। এগিয়ে গেল। পায়ে সাদা জুতো। কিন্তু এ যে অনেক দূর! মাইকও াসেনি.এতদূর।

ওর পায়ের শব্দে মেয়েটি ঘুরে দাঁড়াল। ওকে দেখতে লাগল।

তোমার নাম কি খুকি? রিক্সাওয়ালা জিজ্ঞেস করলো।

তুলতুল।

প্রিন্সিপ্যাল বাবুর মেয়ে?

হাঁ।

ওখানে যে তোমাকে খুঁজছে সবাই। কি দুষ্টু তুমি!

তুলতুল বললে, এগুলো যে খুব মিষ্টি!

রিক্সাওয়ালা হাসল। আচ্ছা এবার চল।

আর একটা তুলে নিই।

আমিই দিচ্ছি। রিক্সাওয়ালা এগিয়ে গেল।

তুলতুল বললে, দাও।

প্রিন্সিপ্যাল অনঙ্গমোহন আর অনু তখন প্রায় সব আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। দু'জনে সেই একই-াবে পাশাপাশি স্থির হয়ে বসেছিলেন। পুকুরে জাল ফেলা বন্ধ। মাইক আর কিছু ঘোষণা করছে না। ধ্যাপকের দল ওঁদের দু'জনকে ঘিরে রয়েছেন। মিথ্যে আশা দিচ্ছেন কেউ কেউ। পুলিশে খবর দেবার ্যবস্থা হচ্ছে। হঠাৎ যেন একটা কলরব কানে এল। তারপরেই কলেজের একটি ছেলে দৌড়ে এল।

তুলতুলকে পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে তুলতুলকে।

পাওয়া গেছে? কই, কোথায়?

অনঙ্গমোহন আর অনু মোটর রাস্তার দিকে দৌড়লেন। রাস্তার ওপর গিয়েই কিন্তু তাঁরা স্থির য়ে গেলেন। এক অদ্ভুত দৃশ্য তাঁদের চোখে পড়ল।

সামনে একটা রিক্সা আসছে। খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। তারওপর তুলতুল। রিক্সার পছনে একটি দল। তুলতুলের বয়সীই সব। যারা ধুলো মাখে। পথের ওপর এক পা তুলে নেচে াচে খেলা করে। নাচতে নাচতে আসছে তারা।

হঠাৎ অনুর চোখ ঝাপ্সা হয়ে উঠল।

তারপর অনু যখন চোখ মুছলো রিক্সা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তুলতুল একাই রিক্সা থেকে নমে পড়ল। তার হাতে এক রাশ কলাই শুঁটি। মাকে দেখিয়ে বলল এগুলো খুব মিষ্টি!

যেমনি গুরু তেমনি শিষ্য

নিখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

এন্ট্রান্স পাসকরা বছর কুড়ি বয়সের একটা ছেলে আর্ট কলেজের ভাইসপ্রিন্সিপ্যাল অবনীন্দ্রনাথের সাথে দেখা করতে এসেছেন ওখানকারই এক ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে। মনের বাসনা শিল্পশিক্ষা করা। অবন ঠাকুরের কাছে যেতেই তিনি দিলেন ধমক—লেখাপড়া কিছু হল না, তাই আর্ট স্কুলে এসেছ?

ধমক দিয়ে বুঝে নিতে চাইলেন ছেলেটির আন্তরিকতা আছে কিনা, তারপর তাকে নিয়ে গেলেন প্রিন্সিপ্যাল হ্যাভেল সাহেবের কাছে। হ্যাভেল সাহেব পরীক্ষা করলেন। পাটনাই শিল্পী ঈশ্বরীপ্রসাদ ছেলেটিকে মন থেকে কিছু আঁকতে বললেন—ছেলেটি আঁকলো সিদ্ধিদাতা গনেশ। তাতেই সিদ্ধিলাভ—তিনি রায় দিলেন—হাত পোক্ত হ্যায়।

এরপর মডেল ড্রয়িং পরীক্ষা করা হ'ল। অন্য এক পরীক্ষক টেবিলের ওপর ঘটি বাটি পিরামিড আর ইজেলের ওপর ঢাউস একখানা কাগজ দিয়ে ঝুলিয়ে দিলেন—সতেরো মিনিট মাত্র সময়, এঁকে ফেলো চট্‌পট্‌।

ছেলেটি পড়ল মহা ফাঁপড়ে! এতো অল্প সময়ে কি বা আঁকবে? চট করে মাথায় ফন্দি খেলে গেলো, বিরাট কাগজের এককোনে দু তিন বর্গ-ইঞ্চি ঘিরে নিয়ে পাঁচ মিনিটে সেরে ফেললো সমস্ত ড্রয়িংটা।

শিক্ষক তো তা দেখে ভারি বিরক্ত।

কর্তা সমস্তই দেখলেন, মিটিমিটি হেসে বললেন—ছোট হোক ঠিকই তো হয়েছে; আর উপস্থিত বুদ্ধিরও পরিচয় পাওয়া গেছে।

এরপর গুরু অবন ঠাকুরের পালা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—কি তুমি শিখবে?

এবারেও ছাত্র ঠকলে না, সে বল্লে—যা আপনি শেখাবেন, তাই শিখবো। প্রথম থেকেই আত্ম সমর্পণ করল ছাত্রটি গুরুর কাছে।

তাজ্জব ব্যাপার। সাত সকালে গুরুই ছুটল শিষ্যের বাড়ি নিজের ভুল শুধরাতে। শিল্পগুরু অবন ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য হয়ে উঠেছে ঐ ছেলেটি। একদিন বিকেলে একটা ছবি এঁকে ঠাকুর বাড়িতে দেখাতে নিয়ে গিয়েছে। ছবির নাম 'উমার তপস্যা' 'চাইনিজ ইঙ্ক' আর 'হালকা লাল' দিয়ে ছবিটি আঁকা। গুরুকে দেখাতেই তিনি বললেন—এতে রঙ কোথায়? ছবিতে রং সবই দেবে অথচ ভাবকে তা ছাপিয়ে উঠবে না, রং দিয়েছ বলে কেউ টের পাবে না। এতে রঙ এর রঙরেজী কোথায়?

ছবিটি নিয়ে ছাত্রতো বিমর্ষ হয়ে ফিরে এল বাড়িতে। সারারাত দুর্ভাবনায় কাটল। ভোরে উঠেই রঙ টঙ নিয়ে ছবি সামনে পেতে ভাবে কোথায় দেবে আবার রঙ। এমন সময় নিচে গাড়ি দাঁড়ানোর শব্দ পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে গুরু ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ওপরে উঠেই প্রশ্ন করলেন ছাত্রকে—নন্দ কি করছ? রঙ দিয়েছ নাকি ছবিটিতে?

উত্তরে ছাত্র বল্লে—এখনও দিইনি, তবে কোথায় দেব তাই ভাবছিলাম।

একটু আশ্বস্ত হয়ে তিনি বললেন—কি সর্বনাশই হত আর একটু হলে! তোমায় কাল ভুল বলেছিলুম। ছবিটিতে রঙ আর কোথাও দিতে হবেনা-ও ছবি ঠিকই আছে। পার্বতী নিরাভরণা—শিবের বিরহের তীব্র বৈরাগ্যের মূর্তি।

এই ছাত্র কলকাতা ছেড়ে তখন সবে শান্তিনিকেতনে এসেছে। কলকাতায় ওরিয়েণ্টাল সোসাইটি প্রদর্শনীর জন্য গুরু ছবি পাঠাবার জন্য লেখাতে ছাত্র—'আনমনী' নামে একটা ছবি পাঠিয়ে দিলে। ছবিটি পেয়ে গুরু লিখলেন—এমনই হবে জানতাম, তুমি ওখানে গিয়ে সব ভুলে গেছ। ছাত্রতো দারুণ আঘাতে মুষড়ে পড়ল। বার বার এই একই কথা মনে আসে সত্যিই কি সব ভুলে গেছে নাকি। ব্যথায় দুঃখে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, সেই সময় একদিন আশ্রমের বৈজ্ঞানিক উৎসবে এক আশ্রম কন্যাকে ভিড়ের মধ্যে দেখলো চিন্তান্বিত অবস্থায়। চিন্তিত মেয়েটির ঘাড়ের বাঁকা ভঙ্গিটি যেন তার দুঃখের ভাবের সবটুকু ফুটিয়ে তুলেছে ঐ ভঙ্গিটা কার্ডে টুকে রেখে দিলে সে। ছবি আঁকা আরম্ভ হল, কুমার সম্ভবের পার্বতীর প্রত্যাখ্যান বিষয়টিকে অবলম্বন করে। দুঃখ বেদনায় ভারাক্রান্ত পার্বতীর মধ্যে অক্ষয় করে দিলে বাঁকা ভঙ্গিটি। সোসাইটির পরের প্রদর্শনীতে পাঠান হল ছবিটা। এবার গুরু ছবি দেখে খুবই খুসি লিখলেন—বকুনি দিয়েছিলাম বলেই অমন ছবি হল।

আর এক বারের কথা। এই ছাত্র তখন গ্রামের বাড়িতে আছেন। সকাল থেকে না খেয়ে-দেয়ে এক জায়গায় বসে ছবি এঁকে চলেছেন। দুধ দোয়াচ্ছে সুজাতা। বৈকাল নাগাদ ছবিটি শেষ হল। ছবিটি গুরুকে দেখাতেই তিনি বললেন—ছবিটি কাগজে মুড়ে দাও।

গুরু আজ্ঞা শিরোধার্য। ছাত্র তাই করল। ওদিকে গুরু করলেন কি ছবিটি হাতে নিয়েই ঝপ্ করে পকেটে পুরে নিলেন, ছাত্র তো আঁৎকে উঠেছেন! এতক্ষণের পরিশ্রম বৃথা।

গুরু বললেন– চোর! এ ছবি আমার, তুমি চুরি করেছ, আমি ঠিক এই বিষয়বস্তু নিয়ে একটি ছবি আঁকবো ঠিক করে রেখেছিলাম।

ছাত্রের চোখ তো ছানাবড়া! এ আবার কি রকম কথা আঁকবেন ঠিক করেছিলন আঁকেননি তো, তাতেই চুরি হয়ে গেল, এ যে কল্পনা চুরির মামলা!

শেষে বোধগম্য হল ব্যাপারটা। পীর পাহাড়ে গিয়ে ভোর বেলায় ধোঁয়া আর কুয়াশার মধ্যে ঠিক এমনই দৃশ্য দেখে এসে গুরু ঘটনাটা বলেছিলেন ছাত্রকে, আর ছাত্র তাই নিয়ে ছবি এঁকে বসে আছে!

এই ছাত্র আবার মাষ্টার মশাই হল শান্তিনিকেতনে। কবিগুরুর খুবই প্রিয়পাত্র। কবিগুরুর সত্তর বছর বয়সে আবার খেয়াল চাপলো, ছবি আঁকা শিখবেন একেবারে রীতি-পদ্ধতি অনুসারে। তিনি বললেন নন্দ মাষ্টারকে তার মনের কল্পনা। নন্দ মাষ্টার ঘাড়টি নেড়ে বললেন—উঁ হু, দরকার নেই, যেমন আঁকছেন এঁকে যান। সত্তর বছরের ছাত্র অন্ততঃ কমপক্ষে কুড়ি বছরের ছোট 'মাষ্টারমশাই'য়ের কথা মেনে নিয়ে এঁকে চললেন তার নিজস্ব রীতি অনুসারে।

গুরুদেবের ওপরও গুরুগিরি!

হম্বার ঘুম-পাড়ানি ছড়া

বিদ্যুৎ মৈত্র

খোকা— শুয়ে পড় চুপ চাপ
নইলে যে ধুপ ধাপ
কিল চড়
পর পর,
ঐ পিঠে পড়বেই।
ফের হাসে ফিক ফিক?
মারবই ঠিক ঠিক,
ছশো চাঁটি
পরিপাটি,
চাঁদি ফেটে মরবেই।
ফের কর ফোঁস ফোঁস?
হতভাগা রোস্ রোস্
ভেবেছ কি ঠাট্টা
দেব কসে গাঁট্টা,
মগজের ঐ খোল
ফুলে গিয়ে হবে ঢোল,
ঠ্যালা কি যে বুঝবেই।
করেছ কি ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ
দুটো কান ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ
গোড়া কেটে
দেব ছেঁটে,
আফশোষ করবেই।
ফের করে মিট মিট—
দুটো চোখ পিটপিট?
দেব রাম চিমটি
বুঝবে কী চিজটি—

দেখনি কি কিচ্ছু
পাহাড়িয়া বিচ্ছু?
সাতদিন জ্বলবেই।
মেরে আছে ঘাপটি
নেই ঘুম নামটি!
এক কিলে
ফেটে পিলে,
ককিয়ে যে কাঁদবেই।
সারারাত ঝুপ ঝুপ
দুই চোখে টুপ টুপ
লোনাজল
কল কল,
অঝোরে সে ঝরবেই।
কোরো নাকো ছটফট
শোও খোকা চটপট
পড়বে যে পাকাতাল
ভিরমি যে লাগবেই।
কেন কর ভ্যান ভ্যান
সারারাত প্যান প্যান
মেরে এক ডাণ্ডা
করবো যে ঠাণ্ডা,
লেংচিয়ে চলবেই।
চিল্লিয়ে বাপ বাপ
করলেও নেই মাপ;
নাম মোর হম্বা
ঠাকুমা ছিড়িম্বা,

মেয়ে বুড়ো মন্দ
শুনলে যে সন্থ
আঁতকিয়ে উঠবেই
হুতুমের কোন বোন
জাননা তো মোরে ধন !
বাড়ি মোর লণ্ডনে
এক ঠ্যাং ঠন্‌ঠনে,
মামদোর নাতনি
শেওড়ার পেতনি,
ঘুম চোখে নামবেই ।
ঘুম যাও ধন ধন
কেন কর জ্বালাতন,
এই দিই সুড়সুড়ি
হাড়গোড় মুড়মুড়ি,
শেষে ঘুম আসবেই ॥

ছোট্ট পাখির ইচ্ছে

কার্তিক ঘোষ

শীত কাতুরে
ছোট্ট পাখি
চুপ্‌টি ব'সে খাঁচায়···
দেখছ কেমন
রোদ এসেছে
সবুজে সীমের মাচায় !
এত্তোটুকুন
চড়ুই পাখি
এদিক উদিক চাইছে···
ওর কি মজা
দিব্যি কেমন
পথের ধুলোয় নাইছে ॥
হলুদ হলুদ
রং মেখে বেশ
হাঁসছে গাঁদার বনটা...
ঐখানেতেই
খেলতে যেতে
চাইছে যে তার মনটা ।
দৌড়ে এসে
ঐতো টুকুন
ছধ-ছোলা সব দিচ্ছে··
কেমন ক'রে
বুঝবে ও আজ
ছোট্ট পাখির ইচ্ছে ॥

(বুনোদের ছেলে মাতো তার কালোয়-খয়েরীতে ছোপ দেওয়া ছাগলছানা 'অর্জুন'কে ছোট্ট থেকে, পলতে করে দুধ খাইয়ে পালন করেছে।

শিবতলায় যে কাপালিক এসেছে সে বলেছে যে সকলের মহাপাপ হয়েছে, ঠিক অমনি একটা ছাগলছানা বলি দিতে না পারলে বন্যায় দেশ ভেসে যাবে।

রাত্রে মাতো চুপিচুপি অর্জুনকে নিয়ে পালিয়ে গেল, সারাদিন লুকিয়ে থেকে সন্ধ্যার সময়ে বহরমপুরের পথে পা দিল, সেখানে আর্মানী গির্জেয় আশ্রয় মিলতে পারে।

এদিকে তাদের ধরবার জন্য একটা মোহর পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে, হাটবারে দশখানা গাঁয়ের লোকে জেনে গেছে, ওদের খুঁজে বেড়াচ্ছে।

মাতোর 'রিদযন্ত্র' দুর্বল, দেহ অবশ হয়ে হাত-পা এলিয়ে আসছে। লাঠি-মশাল হাতে লোকজনের ছুটে আসার শব্দে সে অর্জুনকে নিয়ে 'নাককাটির' খালের জলে নেমে গা ভাসিয়ে দিল।)

মাতো যখন নাককাটির খাল দিয়ে ভেসে চলেছে তখন রাবণ মালাকর আর তার গাঁয়ের লোকের কি হাল ছেড়ে দিয়ে ফিরে গেল? মোটেই না। তারা ঐ খালের ধারে দাঁড়িয়ে জটলা করতে লাগল

একজন বলল 'ছেলাটাকে নিশ্চয় তেনারা ধরেছেন গো! নইলে এমন হঠাৎ কোথা উধাও হচ তাই বল দি নি?'

তেনারা মানে যাদের নাম রাতে করতে নেই। কে না জানে নাককাটির খালের পাড়ে যে তেঁতু গাছটা থাকে সেখানে মেছোপেত্নী আর আলেয়াভূতের বাস। মেছোপেত্নীরা বেজায় ফর্সা কাপড় পর আর পা উল্‌টোবাগে ঘুরিয়ে হাতে পলো নিয়ে মাছ ধরে বেড়ায়। মানুষজন দেখলেই হঠাৎ পেল্লা একটা বেড়াল হয়ে গিয়ে ভুস্‌ করে মিলিয়ে যায়।

আর আলেয়াভূতেরা মুখে আগুন নিয়ে ছুটে ছুটে মেঠো চাষা, হাটুরে মানুষ আর কোম্পানী ডাকপেয়াদাদের ভুলিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে আসে জলের কিনারে। তারপর জলে ডুবিয়ে মেরে রেখে চ

'আর্মানী চাঁপার গাছ' শুরু হয়েছিল ১৩৭৪ এর ফাল্গুন মাসে।

• পুরোন সংখ্যাগুলি এখনও সন্দেশ কার্যালয়ে কিনতে পাওয়া যায়।

যায়। পাড়াগাঁয়ের মানুষদের যে কত বিপদ। সকাল থেকে রাত অব্দি একটার পর একটা ভূতের উপদ্রব। ঠিক-দুপুরবেলা তো এখানে ভূতের খোকাখুকীরা খেলা করে সবাই জানে। তাই সবাই ভাবলে ছেলেটাকে আর ছাগলছানাটাকে বোধহয় ভূতপ্রেত নিয়ে গিয়েছে।

শুধু রাবণ মালাকর গোঁপের গোড়া চুলকে হা-হা করে বিশ্রীমত হাসলে। বললে 'ছেলাটার বুদ্ধি কত রে! দেখ্ দেখ্, বুঝি জলে নেমে পলায়ে গেল।'

ও মশালের আলো দিয়ে দেখিয়ে দিলে। সত্যিই তো জলের ধারে ধারে নরম কাদা, যেমন কাদায় গেঁড়ি গুগলী পাওয়া যায়, তেমন কাদাতে ছোটছেলের পায়ের ছাপ।

রাবণ বললে, বেশ চেঁচিয়েই বললে 'পলাতে তোমায় দেব না হে! আমরাও সাঁকো পেরিয়ে উ-পাড়ে যেলৃছি।' রাবণের এখন আর শহুরে কথা মনে নেই।

একজন উৎসাহী ছেলে অবিশ্যি বললে 'চল না কেনে, আমোরাও সাঁতারিয়ে যাই?' কিন্তু সবাই তাকে থামিয়ে দিলে। নাককাটির খালে এই ভরাভাদ্রমাসে গলায় গলায় জল। জলে আর কিছু না থাক ভীষণ আন্তিকেলে পানা আছে। সে পানাতে পা জড়িয়ে যাবে। আর, গোখরো-কেউটে জল দিয়ে ভেসেও যায়, সাঁতরেও ও পারে যায়। মা মনসার কাছে তো আর চালাকি নেই?

ওরা তাই, মাতোর সন্ধানে ছুটে গেল। সাঁকো পেরিয়ে, মশাল হাতে। সাঁকোর ওপারের খানিকটা জমি ফর্সা। ঝোপজঙ্গল নেই। কিন্তু অন্য জমি জংলা। এই বর্ষার জল পেয়ে ভাঁটিফুল, ঘেঁটুগাছ, ধুতরো, কালকাসন্দী, আর লটকা ফলের গাছ ঘন হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া কেয়াফুলের ঝোপ জলের দিকে ঝুঁকে আছে। যেন ওরা সারি বেঁধে মাছ ধরতে বসেছে। এইসব ঝোপের নিচে নিচে সাপের আস্তানা। ওরা ব্যাং ধরতে আসে। আর জঙ্গল মাঝে মাঝে এমনই উঁচু যে তার নিচে নিচে চিতাবাঘ আর খটাশও আসে। এখানে চুপ করে বসে বসে চিতাবাঘ চেয়ে চেয়ে দেখে তারপর রাখাল-ছেলেদের নজর এড়িয়ে যে ছাগলটা আসে, অথবা গাঁয়ের কুকুর, সেটার ওপর লাফ দেয়। চিতাবাঘ কুকুরের মাংস খেতে বড্ড ভালবাসে।

আমাদের মাতো অবশ্যি রাবণ মালাকরের চীৎকার চেঁচামেচি শুনতে পায়নি। অবসন্ন শরীরে একটু ভেসে যায়, একটু সাঁতারের চেষ্টা করে, এমনি করে ও একসময়ে বুঝতে পারল আর নয়, এবার ডুবে যাবে। আশ্চর্য কি, ডুবে যাবে বলে আর ওর ভয় হল না। যেন ডুবে যাওয়াই ভালো, মাতোর এমনি মনে হল। তাহলে আর ছুটতে হয় না, কোথায় গির্জে, কোথায় বুড়ো পাদরী তা ভাবতে হয় না। গির্জেতে কি মাতো চেয়েছিল? কেন চেয়েছিল বলত? মাতো ডানহাত দিয়ে কি যেন একটা চেপে ধরল। গাছের শেকড় হবে।

চেপে ধরল বটে, কিন্তু তখনো ওর মাথায় যেন সব ভোঁ ভাঁ। হাতে যে কিছু একটা ধরেছে, এখন যে ও আর ভেসে যাচ্ছে না। পিঠের ওপর অর্জুন যে ছোট ছোট খুরে লাথি মারতে চেষ্টা করছে, এর কিছুই মাতোর মাথায় ঢুকল না।

খুব জ্বর হলে যেমন সব গণ্ডগোল হয়ে যায়, ভোরবেলা তালরস চুরি করে খেলে যেমন মাথার

ভেতর সব ফুরফুরে হয়ে যায় মাতোর এখন তেমনি বোধ হচ্ছে। চব্বিশঘণ্টায় ওপর ও কিছুটি খায়নি এই চব্বিশঘণ্টায় সোজা পথে, কাদাইয়ের পথে সৈদাবাদ যাবে না বলে ও প্রায় পাঁচকোশ পথ হেঁটে আর ছুটেছে।

'এখনো দেড়কোশ পথ বাকি!' মাতো আপনমনে বলল। ওর শরীরটা এখন কোমর থেকে জলে ডোবা। ওপরের দিকটা ঘাসের ওপর বেছানো। হাতের মুঠোয় বুড়ো আকন্দগাছের শেকড়খা ধরা। মাতোর ইচ্ছে হল এখানেই ঘুমিয়ে থাকে, যেন জলের ওপর ওর বিছানা পাতা আছে।

কিন্তু মনের ভেতর থেকে কে বলে উঠল আর্মানীচাঁপা যেখানে ফোটে সেখানে যেতে হবে না?

তাইতো? মাতো ঘুম ঘুম চোখে অবাক হয়ে ভাবলে সেই কথাটাই ভুলে গিয়েছি? সে কোথায় যেন আর্মানী চাঁপার গাছে পাতার আড়ালে মুখ লুকিয়ে চাঁপাফুল ফোটে। চারদিক গন্ধে ভু ভুর করে। সেইখানে একবার যদি পৌঁছে যেতে পারে তাহলে মাতোর ভয় নেই, অর্জুনেরও ভয় নেই

এই সময়ে, অর্জুনের কথা ভাববার সঙ্গে সঙ্গে মাতোর ভেতর থেকে যেন হুঁশ ফিরে এল অর্জুনের কি হল? মাতো বুকে টেনে টেনে, শরীর ছেঁচড়ে পাড়ের ওপর উঠল। ওঃ, রাত যেন ভারী বলে মনে হয়। চারদিক সুনসান। মাথার ওপর তারা মিটিমিটি করছে এই যা রক্ষে, তাই এখ একটু আলো আছে। আবার বাতাসে যেন কেমন সোঁদা গন্ধ। কাছাকাছি কোথাও যেন বি হয়েছে। বাতাস সেখান থেকেই ভেসে আসছে। বিষ্টি না হলেও কষ্ট, আবার বিষ্টি বেশী হলে মাতোর মা আকাশের দিকে চেয়ে বলে মা ভাঁজোলক্ষী, কলসী উপুড় করে আর কত ঢালবে মা?

মাতোর মায়া ভাদ্দরে ভাঁজোর পরব করে আর যখন যা হয় তখনই ভাঁজোলক্ষ্মীকে ডেকে নালি জুড়ে দেয়। এখন মাতো, এই নাককাটির খালের উত্তর দিকের আকাশের দিকে তাকাল। উত্তর দিকে লালগোলাঘাটের গায়ে বড়গাঙ্গ বয়ে যাচ্ছে। এই ভাদ্দরে বড়গাঙ্গ রাক্ষুসে হয়ে ওঠে। উত্তর দিকে আকাশে মেঘ পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে দেখ। তারাভরা আকাশখানা ঢেকে ফেলবে বুঝি।

মাতো আস্তে পিঠ থেকে অর্জুনকে খুলল। আহা, চৌপ্রহর মাতোর সঙ্গে খেলাধুলো করে, নেচে নেচে বেড়ায়, এখন আষ্টেপিষ্টে বাঁধা হয়ে থেকে থেকে রীতিমত হাপসে গিয়েছে। মাতো ওর পে আর পিঠে হাত বোলাতে লাগল।

অর্জুন ওর মুখ চেটে দিল। ডাকল আস্তে 'ম্যা!'

একটু প্রশ্ন-প্রশ্ন ভাব। যেন জিগ্যেস করল আমাদের কি হয়েছে। আমরা কোথায় যাচ্ছি এমন সময়ে তো আমি গোয়ালে শুয়ে ঘুমোতাম, তুমি তোমার ঘরে।

'তোরে ওরা মেরে ফেলত অর্জুন!' মাতো আস্তে বললে। অর্জুন যেন বুঝতে পারল সব। এব অন্ধকারে শুঁকে শুঁকে ও ঘাস খেতে লাগল।

সেইজন্যেই রাবণ মালাকর আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা মাতোদের দেখতে পেলে না। ওরা সাঁকে ওপারের সাফজমিতে দাঁড়িয়ে খানিকটা হই চই করলে তারপর চলে গেল রাস্তা ধরে। এই গজাড়জঙ্গ অন্ধকার রাতে সাপের ভয়ে ওরা এমনিতেও ঘেঁষত না।

'আরে, আজ রেতে তারে সবাই খুঁজতেছে, পেলিয়ে যাবে কুন্‌ঠি ?' কে যেন চেঁচিয়ে বলল মাতো শুনতে পেল। এমন নির্জনে জলের কাছাকাছি কথাবার্তা অনেকদূর থেকেও শোনা যায়।

অনেক, অনেকক্ষণ শুয়ে থেকে মাতো উঠে পড়ল। এরমধ্যে সাপে খেলে, বাঘে নিলেও সে কিছু করতে পারত না। কিন্তু এখন তাকে উঠতেই হবে। ভোরের আলো ফুটলে মাতো কেমন করে আর্মানী গির্জেয় পৌঁছবে ? আকাশের দিকে চেয়ে দেখতে পেল কালো, ঘন মেঘের দল সাঁ সাঁ করে উঠে আসছে কে যেন ওদের খবর দিয়েছে চলে এসো, তাই ওরা ছুটে আসছে অমন করে। আর কি ঠাণ্ডা হাওয়া বিষ্টি বুঝি এখনি নামে। মাতো অর্জুনকে তুলে আবার পিঠে বাঁধলে।

হাতের নড়াহুটোয় কি ব্যথা গো ! অর্জুন আবার ছটফট জুড়েছে। ঠাণ্ডা হাওয়া পেয়ে, তাজা ঘাস খেয়ে ও একটুখানি বেঁচেছে। এখনি কি আর বাঁধা পড়তে সাধ যায় ?

'অমন করিসনে অর্জুন !' মাতো খুব আস্তে বললে। তারপর ও আস্তে আস্তে, হোঁচট খেয়ে, কাঁপতে কাঁপতে হাঁটতে সুরু করলে। এখন শরীরে বেজায় কাঁপুনি। যেন জ্বর থেকে উঠেছে মাতো, আবার জ্বর আসছে ! সেবার মাতোর খুব জ্বর হয়েছিল। ওর মা তখন কবরেজবাড়ি থেকে জেনে এসে পাঁচনের শেকড় বাকড় এনে ওকে সেদ্ধ করে খেতে দিত। পাঁচন খেয়ে মাতো আমলকী গালে ফেলে জল খেত, খুব মিষ্টি লাগত। আহা, আমলকী আর হত্তুকি বড় ভাল জিনিস। মা বলে ওসব নাকি ঠাকুর দেবতারা অব্দি খায়।

ততক্ষণে, বহরমপুরের কাছাকাছি, রাস্তার মোড়ে বেশ বিশপঁচিশজনের ভিড় জমে গিয়েছে। ছিবিলেস, জানকী সিংগী, কাপালিক, সবাই দাঁড়িয়ে হইহই করে চেঁচাচ্ছে। ছিবিলেস হাতে মশাল নিয়ে চেঁচাচ্ছে। বলছে 'সবাই একজায়গায় চাক বেঁধে রইলেন কেনে ? একেকজনে একদিকে যেয়ে দেখেন না।'

'তুই দেখ বেটা। তোর ভাই হয় না ?'

'ভাই বলে কি ছেড়ে দিব মাশায় ? উ-রে অব্দি কালীমায়ের সামনে বুকে পাষাণ বেঁধে টেনে বেড়াব !'

'মরে যাবে না ?' কে যেন বললে।

'তা, একজন মরবে মরুক গা ! উ-দিকে মহাপাপ হয়ে যায়, সর্বনাশ হয়ে যায় তার বেবস্থা কি ?'

জানকীসিংগী বললে 'বাপুসকল, সকাল হতে দাও। আমি ঢাকীঢুলী ভাড়া করে, সোহর তুলে তামাম মনিষ্যকে জানিয়ে দিই কথাটি। তখন দেখবে ধরা পড়ে কি না পড়ে !'

'ও: রেতে না বেরোলে ভাল হত গো !' ছিবিলেস বললে। ভিড়ের কয়েকজন লোক হাসলো সবাই জানে সে রাতে ছিবিলেস ডাকাতি করতে গিয়েছিল।

এই সময়ে কাপালিক বললে 'আমি এখানেই বসলাম। তোরা মায়ের বলি খুঁজে আন্‌গা যা ! না যদি পারিস, তা'লে দেখবি আমি এই একাসনে উপোস করে বসে রইব।'

'হেই বাবা !' সবাই ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

উপোস করে করে দেখবি আমার শরীরটা ধু ধু করে জলে উঠবে। আমি সগ্‌গে চলে যাব।'

শুধু মাতোর বন্ধু উদ্ধব বললে 'ওঃ অর্জুনের কচিমাংস না খেতে পেয়ে প্রাণটা বেরোয়ে যাচ্ছে। অর্জুন ওনার কলার ছড়া খেয়েছে, পেটে গুঁতো মেরেছে। অর্জুনের ওপর ওনার বেজায় রাগ।'

কিন্তু ওর কথা কেউ শুনল না। কাপালিককে ঘিরে সবাই জটলা করছে এমন সময়ে ওদিক থেকে হৈ হল্লা উঠল।

'ওরে! ধরা পড়ল বুঝি। চল্‌ রে চল্‌!'

কি হল, কে ধরা পড়ল, কিছু না বুঝে সবাই সেদিকে ছুটে গেল। মাতো কি ওদের হাতে সহজে ধরা দেয়? ও একে বেঁকে ছুটে চলেছে। ওকে ধরতে পারছে না কেউ।

'মাতো ফিরে আয়!'

ছিবিলেস বেদম ধমক দিয়ে বললে কিন্তু মনে মনে বললে বা রে মাতো! দিব্যি ছুটছিস! সবাই দেখুক। সবাই যে বলত তুই রোগা, মেয়েলী তোর হাতে পায়ে জোর নেই।

'মাতো, যাসনে ভাই!'

উদ্ধব মাতোর কোঁকড়াচুলের ঝাপটা দেখতে পেয়েছে। হঠাৎ ওর কান্না পেয়ে গেল। কেন সকলের সঙ্গে হুজুগে মেতে ও চলে এসেছিল কে জানে। এখন ও দেখতে পেল মাতোর মুখ সাদাপানা, চুল জলে ভেজা, কাপড় কাদামাখা। উদ্ধব সেখানেই দাঁড়িয়ে ভ্যাঁ ক'রে কেঁদে ফেললে।

'ধর ধর, ঐ যায়!' জানকী সিংগী চেঁচিয়ে উঠল।

মাতো কুমোরদের প্রতিমা গড়ে রাখবার চালাঘর পেরিয়ে গেল, ফকিরের কবর আর মসজিদ বাঁয়ে রেখে সোজা গোচর নালাটায় নেমে গেল। এখানে এদিকের ডোমপাড়া। ওদের শূয়োরগুলো ঐ নালার পাঁকে পড়ে গড়াগড়ি খায়।

'দে না কেউ একখানা সড়কী ছুঁড়ে।' কে বললে!

'খবরদার! গায়ে চোট লাগলে বলি নষ্ট হয়ে যাবে।' কাপালিক চেঁচালে।

'ধর ধর, ওঃ, ভূতে পাওয়া ছেলে গো! ও কি আর ঠ্যাঙের জোরে দৌড়াচ্ছে? ভূতে ওকে টেনে যাচ্ছে।' জানকী বললে।

ওরা যখন ওকে এই ধরে তো সেই ধরে, সেই সময়ে মাতো গির্জের রেলিং টপকে ঢুকে গেল। যখন উঁচু রেলিং বেয়ে উঠলে, মশালের আলো যখন ওকে ছোঁয় ছোঁয়, সেইসময়ে ছিবিলেস বলিপুজোর ভুলে গিয়ে হাতের মশাল ফেলে দিয়ে গর্জে বললে 'বাঁ ঠ্যাংটা আগে তোল মাতো, তা বাকি ডান ঠ্যা উঁচু করে, নে ঝাঁপ দে!'

ওর কথা না শুনেই মাতো ভেতরে ঝাঁপ দিলে। আর কোথাও নয়, একেবারে গির্জের মধ্যিখানে। দরজার নিচের ফোকর, যেখান দিয়ে সব সময়ে ঢোকা বেরুনো হয়, সেখান দিয়ে মাতো টুপ করে গেল।

তারপর অনেক কিছুই হল। গির্জের সামনে লোকদের গোলমাল শুনে বুড়ো পাত্রী এলেন।

সবকথা শুনে বললেন 'ওকে আমি কিছুতে যেতে দেব না। তা ছাড়া গির্জেয় ঢুকলে তো ওকে দিয়ে আর মায়ের বলি হয় না ? তোমরাই তা বল।'

অনেকক্ষণ ধরে গণ্ডগোল করে তবে ওরা সেখান থেকে সরে গেল।

এই তো হল মাতো আর ওর ছাগলছানা অর্জুনের গল্প।

যদি বল তারপরে কি হয়েছিল, তাহলে বলি অর্জুন ঐ গির্জাতেই থাকতো, বুড়ো পাত্রীর কাছে।

আর সেই বন্যা ? সে বানও হয়নি আর গ্রামের পর গ্রামও ভেসে যায় নি। কাপালিককে না কি মেরে ধরে ঐ ছিবিলেসই তুলে দিয়েছিল গ্রাম থেকে।

গির্জাতে না কি একজন মেয়ে এসেছিল। এই আধবুড়ো মানুষ, মিশমিশে কালো রঙ। বলেছিল 'ও পাত্রীবাবা, আমার মাতোরে তুমি দেখেছ ? এই ধর গা দশবছরের ছেলা, এমন ঝুমরো ঝুমরো চুল। আমার মাতো অক্ত দেখে কাঁদে আর বনে বসে বসে পুতুল গড়ে। সে পুতুল কি আশ্চজ্জ পুতুল গা, অমনটি কেউ দেখে নাঁ।'

'মাতো তোমার ছেলে ?'

'হ্যাঁ গো পাত্রীবাবা, সবাই বলে সে নাকি তোমার মন্দিরে যেমন ঢুকেছিল তেমনি উই যে ঠাকুর গো, মায়ের কোলে ছেলে, উনি নাকি হাত বাড়িয়ে মাতোরে বুকে টেনে নেছে ?'

পাত্রী ওকে ভেতরে ডেকে এনেছিলেন। আর্মানী চাঁপার গাছের নিচে বসিয়ে ওকে কত কথা বলেছিলেন। ঐ গাছের নিচে না কি মাতো ঘুমোতে গেছে, যেমন করে ছোটবেলা মায়ের কোলে ঘুমোত।

'তাই বুঝি ?' মাতোর মা গালে আঙুল রেখে অবাক হয়ে বলেছিল 'ঘরে দেখ গা উর বেছ্‌না পাতা অয়েছে, আমার ঘর ছাওয়ায় ঢাকা। কি ঠাণ্ডা বাতাস। সেখেনে তুই ঘুমোতে নারলি, এই এত্তখানি পথ পেরিয়ে এখেনে এসে···মাতো তুই আমার ছেলে কিন্তু তোকে আমি বুঝতে পারলাম না।'

তারপর মাতোর মা চলে গিয়েছিল।

আর আর্মানী চাঁপার গাছটায় অনেক, অনেকদিন ধরে ফুল ফুটত, ফুল ঝরত। আস্তে আস্তে শহর যখন বড়, ওখানে বাজার বসল, ঘাট বাঁধা হল তখনো ফুল ফুটত।

এখনো ফোটে। মাঝে মাঝে শীতের রাতে জ্যোছ্‌নার সঙ্গে কুয়াশা মাখামাখি হয়ে যখন চারিদিক আবছা হয়ে যায় তখন না কি মনে হয় গাছটা একটি ছোট ছেলের মত। ছেলেটি হাতজোড় করে হাঁটুগেড়ে মুখ তুলে আছে।

কখনো মনে হয় গাছটা একজন বুড়ো পাত্রীর মত। মাথা নিচু করে কার মাথায় হাত রেখে উনি যেন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন।

কিন্তু রোদ উঠলেই দেখা যায় সব ফর্সা, সব অন্যরকম। গাছ শুধু সবুজপাতা আর ফ্যাকাশে হলুদ সাদাটে চাঁপাফুল। সকালের রোদ মেখে গাছটা যেন বাতাসে মাথা দুলিয়ে হেসে কুটিপাটি হচ্ছে। যেন মেঘ আর বাতাস আর রোদ ওর সঙ্গে ভারী ঠাট্টা করেছে তাই এত হাসি।

সমাপ্ত।
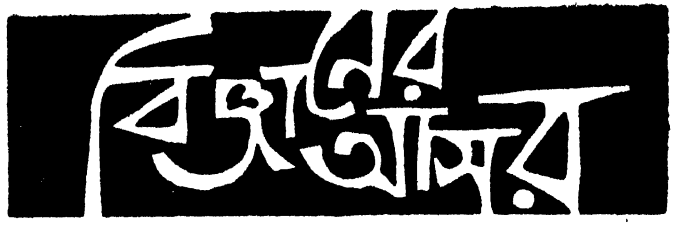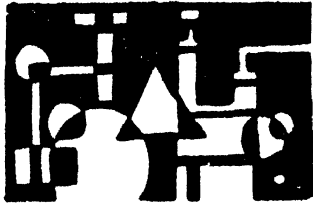
'সমুদ্রের তলায়'

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

মানুষ চাঁদে পাড়ি একদিন দেবেই এরকম একটা দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের প্রত্যেকের গড়ে উঠছে। যে হারে সোভিয়েট ও মার্কিন বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, তাতে করে মানুষ আরোহী নিয়ে চাঁদে পদার্পন করার মত ব্যোমযান তৈরী হতে কয়েক বছর হয়ত লাগতে পারে বলে অনেকেই ভাবছেন।

কিন্তু চাঁদ তারা আকাশের রহস্য জানবার মত মানুষের আর এক কৌতুহলের বিষয় হল সমুদ্র। সমুদ্রের তলায় নাকি লুকিয়ে আছে আর এক পৃথিবী। তাই প্রচেষ্টা চলছে, দুঃসাহসী ডুবুরী নয়, এমন এক সমুদ্রযান তৈরী করার, যা বিনা বাধায় সমুদ্রের রহস্য আমাদের সামনে প্রকাশ করে দেবে। এই বিশেষ ধরনের যানটি কি রকম হবে সে কথায় পরে আসছি।

সমুদ্রের তলায় নানা ধরনের মাছ, অক্টোপাস, হাঙর ইত্যাদির ছবি তোমরা দেখে থাকবে, অক্সিজেন সিলিণ্ডার শুদ্ধ বিশেষ আবরণ দিয়ে শরীর ঢেকে দুঃসাহসিক ডুবুরীদের সমুদ্রের মহার্ঘ মণিমুক্তো সংগ্রহ করতে গিয়ে অক্টোপাস ইত্যাদির আক্রমণে প্রাণসংশয়ের সম্মুখীন হওয়ার রোমাঞ্চকর ছবি তোমরা ছায়াছবির পর্দায় দেখে থাকবে, কিন্তু এই টুকুই ত সমুদ্র নয়। আমাদের এই এতবড় পৃথিবীর শতকরা সত্তর ভাগই হল যেখানে সমুদ্রের তলায়, সেখানে সমুদ্রের তলায় রাজত্বটা কত বড় হতে পারে ভেবে দেখ!

অবশ্য মানুষ যে শুধু জানবার জন্যে বা দুঃসাহসের অভিযানের হাতছানিতে সমুদ্রের তলায় যেতে চায় তা নয়, পৃথিবীর খনিজ সম্পদের মূল কেন্দ্রই হল সমুদ্র। ফসফেট, নিকেল, তামা, ম্যাঙ্গানীজ, কোবাল্ট প্রভৃতি বহু মূল্যবান ধাতু পড়ে আছে সমুদ্রের তলায়। যে পেট্রোল একটা দেশকে স্বনির্ভর করে তোলার সামর্থ্য রাখে, সেই পেট্রোলিয়ামের বহু উৎস আছে সমুদ্রের তলায় নিমজ্জিত পাহাড়ে পাহাড়ে।

সমুদ্রের খুব গভীরে কোন সমুদ্রযানই এখনও যেতে পারে নি। পনেরশো ফিট নিচে সামুদ্রিক জীবজন্তুর সঙ্গে আমাদের এখনও পরিচয় ঘটেনি। অন্ধকার এই সমুদ্রের তলায় যে প্রাণীগুলি পড়ে আছে, তাদের অন্ধকারের সঙ্গে সংগ্রাম করে পড়ে থাকতে হয়েছে। সামান্য আলোকরশ্মি পাবার জন্যে সেই প্রাণীগুলির চোখগুলো বড় বড় হয়ত বটেই, শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, ডানা, শুঁড় সব কিছু দিয়ে তাদের চোখের কাজ করতে হয়।

সমুদ্রের তলায় অন্ধকার বলেই অনেক জন্তুর নিজ দেহের বিচ্ছুরিত আলো দিয়ে কাজ করতে হয়। ১৫০০ ফুট নীচে পরিকল্পিত সেই যন্ত্রযানে চড়ে যদি জানালা দিয়ে দেখ, মনে হবে যেন চারধারে দীপাবলীর রাত্রের আতসবাজি দেখছ।

সমুদ্রের তলায় জল বেশ ভারি তাই এই সব জীবজন্তুগুলির বেড়ে উঠতে অসুবিধে হয় না। আমরা যারা ডাঙ্গায় থাকি, আমাদের হাড়গুলোরই ওজন হয় বেশি কিন্তু ওদের হয় বিপরীত।

একটা উদাহরণ দিই। সমুদ্রের তলায় স্কুইড বলে এক ধরণের প্রাণীর অস্তিত্বের কথা শুনেছ। এই স্কুইডকে

আহত ও মৃত অবস্থায় শুধু দেখা গেছে। এটি ছিল লম্বায় পঞ্চাশ ফুট। এখন জ্যান্ত স্কুইড দেখতে গেলে তাদের রাজ্যে যাওয়া ছাড়া উপায় কি?

হেলিকপ্টারের মতো স্বয়ংচালিত এই যন্ত্রযানে চড়ে মানুষ যখন নিজের খুসি মতো সমুদ্রের তলায় যাবে তখন সে শুধু স্কুইড, ঈল (প্রায় একশ ফুট এদের দেহের মাপ) কেই স্বচক্ষে দেখবে না, মানুষের খাদ্যের প্রয়োজনে নতুন এক ভাণ্ডার খুলে দিতে পারবে। পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কহীন, স্বনির্ভর 'বেস্ স্টেশন' করে রাখতে পারবে, যেখান থেকে সমুদ্রের তলায় কাজকর্ম চালাবে।

পরমাণু চালিত সাবমেরিন সমুদ্রের তলায় মাত্র এক হাজার ফুট যেতে পারে কিন্তু আমেরিকান সরকার পরিকল্পিত এই যানটি (নাম দেওয়া হয়েছে 'মেসোস্কাপ') সমুদ্রের মাঝখানে এসে প্রয়োজন মত কখনও বৈদ্যুতিক শক্তিতে কখনও বা পরমাণুশক্তির ওপর ভর করে যেখানে খুসি চলাফেরা করবে। মেসোস্কাপের প্রপেলার যদি কোন কারণে অচল হয়ে যায় এটা এমনই ভাবে তৈরি যে ভাসমান বয়ার মত সমুদ্রের ওপরে আপনা থেকেই নির্বিঘ্নে ভেসে উঠবে। বর্তমানে সমুদ্রে ভাসমান কোনো জাহাজের সঙ্গে তার বাঁধা অবস্থায় ডুবুরীরা কোন পেটিকার মধ্যে ঢুকে সমুদ্রের তলায় নেমে পড়ে। কিন্তু কোনো কারণে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে কি অবস্থা হয় ভাবতেও ভয় করে না কি?

আচ্ছা, এবারে 'মেসেস্কাপে' চড়ে সমুদ্রের তলায় গেলে কেমন হয়? তোমাদের সঙ্গে অবিশ্যি আমেরিকান এক প্রখ্যাত ডুবুরী রয়েছেন জ্যাকুইস পিকাউ। তিনি তোমাদের গাইড।

ঠিক মেসোস্কাপে চড়তে একটুও ভয় হবার কথা নয়, যদিও সমুদ্রের বিশাল জন্তুদের ভয় খাওয়ানোর জন্যে এর বাইরের আকৃতিটা একটু আধটু নয়, খুব বাড়াবাড়ি রকমের বিদঘুটে, তবু যাত্রীদের জন্যে ভেতরে সুন্দর ঘর আছে।

সমুদ্রের তলায় ছশো ফুট নিচে আসতেই অপূর্ব স্বর্গীয় নীল আলোয় চোখ তোমাদের তৃপ্তিতে ভরে যাবে। সেই নীল আলো কেটে কেটে মেসোস্কাপের তীব্র সার্চলাইটের আলো যখন পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে তখন মনে হবে তোমরা পৌঁছে গেছ বুঝি রূপকথার কোন এক রাজ্যে।

সূর্যের আলো নিবে গেলে যেমন আকাশের চাঁদ তারারা হেসে ওঠে, তেমনি হঠাৎ তোমাদের মনে হবে তোমরা বুঝি এসে পড়েছ হঠাৎ সেই আলোর রাজ্যে। এই তারাগুলো হল 'প্ল্যাঙ্কটন' নামে এক ধরনের ছোট ছোট প্রাণী, এরাই আলো নিয়ে চলে বেড়াচ্ছে নিজেদের দেহে। কে জানে কোন অনাগত ভবিষ্যতের দিনে তোমাদের খাবারের থালায় প্ল্যাঙ্কটনরা ইলিশ মাছের বিকল্প হবে কিনা?

ছশ থেকে আটশ ফুট নিচে এখন তোমরা পৌঁছে গেছ। সামুদ্রিক নানা উদ্ভিদের মেলা এখানে। তারামাছ অদ্ভুত ধরনের চুঁচোল মাছ, জেলি ফিস ইত্যাদিদের তোমরা এখন দেখতে পাচ্ছ কাঁচের জানালা দিয়ে। হঠাৎ হয়তো জানালায় চোখ রেখে ভয়ে চোখ বুজে ফেলতেও পার পঁচিশ ফুট চওড়া ডানা মেলে যদি কোনো বিরাট বাদুড়ের মতো দেখতে নিরীহ জেলিফিস জানালার সামনে উঁকি মারে।

এবারে এক হাজার ফুট নিচে এসে রেখেছে মেসোস্কাপ। হঠাৎ কানের ফোনে একটা গুম গুম ধ্বনি উঠছে মনে হয়। পালাও পালাও, জোরে পালিয়ে সামনের খাড়াই পাহাড়ের, পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাও। ঠিক সময়ে যদি না সরে যেতে, তাহলে পাহাড় তোমাদের যানের ওপরই ভেঙ্গে পড়ত, আর কি পৃথিবীর মুখ দেখবার সুযোগ পেতে?

একটু দূর থেকে দেখতে পাচ্ছ বিরাট পাথরগুলো কি বিরাট প্রচণ্ড শক্তিতে আছড়ে পড়ছে সমুদ্রের তলায়।

কি ব্যাপার, একটা স্কুইড মাছ শুঁড় দিয়ে তোমাদের মেসোস্কাপকে ধরতে এবার চাইছে, ইলেকট্রিক কারেন্ট চালিয়ে দাও, স্কুইড পালাতে পথ পাবে না!

তোমরা অনেকেই জুলে ভার্নের বইয়ে এমনি সব রোমাঞ্চকর বর্ণনা নিশ্চয় পড়েছ, কিন্তু এই ধরনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা শীগগিরই মেসোস্কাপ জাতীয় সমুদ্রতলযান আমাদের দেখাতে পারবে। চাঁদে মানুষ পা দেবার আগেই এটা ঘটবে। কে বলতে পারে যে তোমরাও কেউ কেউ এ অভিযানের অংশীদার হবে না নিকট ভবিষ্যতেই।

* বিদেশী নিবন্ধ থেকে
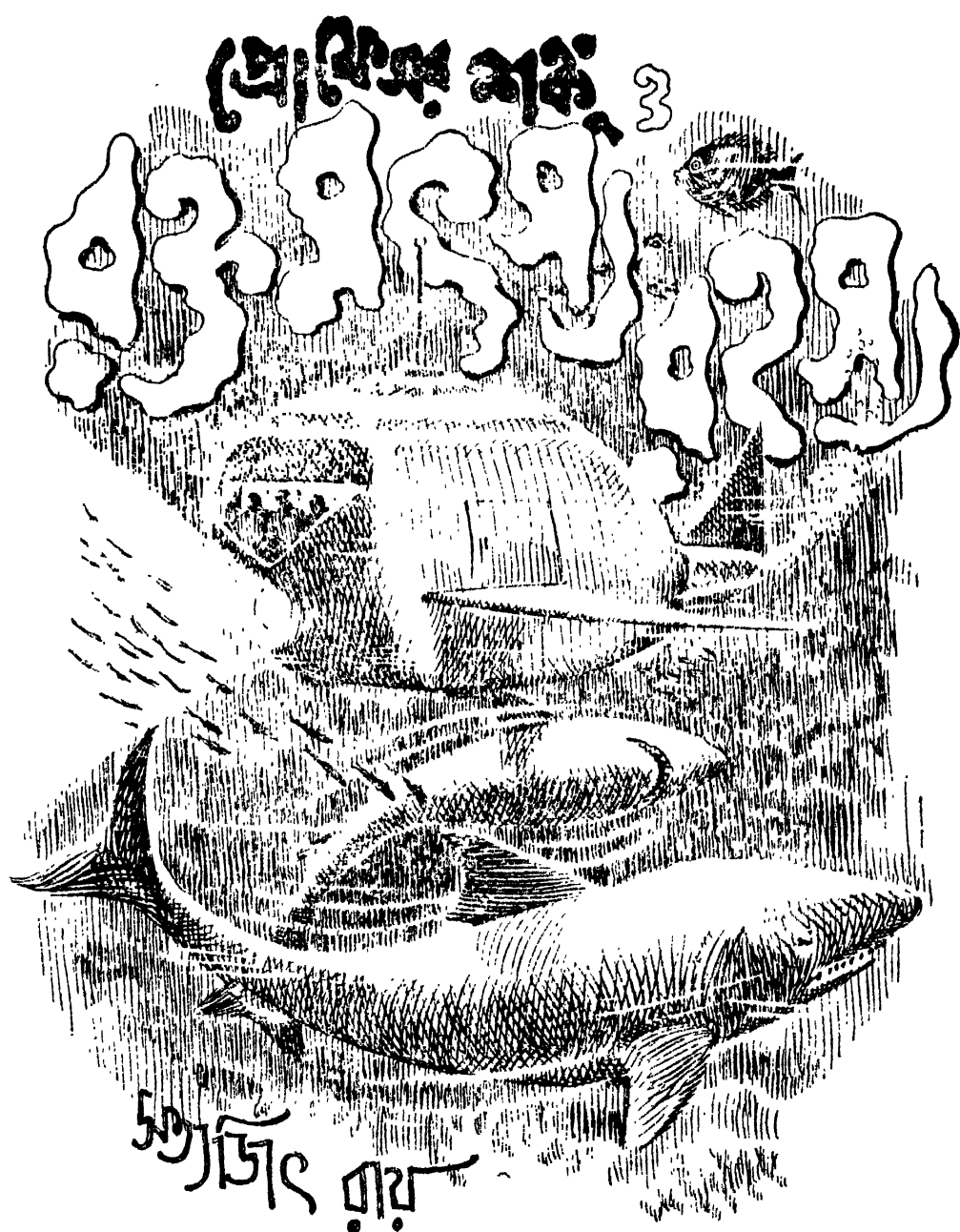
(ওয়ালটেয়ার ও গোপালপুরের সমুদ্রে এক সাংঘাতিক এবং বিচিত্র রক্ত-বর্ণ মৎস্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রোফেসর শঙ্কু সেই সন্ধানে গোপালপুরে এসেছেন। সঙ্গে (বেড়াল) নিউটন এব প্রতিবেশী অবিনাশবাবু।

জাপানী বৈজ্ঞানিক হামাকুরা ও তানাকার সঙ্গে পরিচয় হওয়াতে খুব সুবিধা হয়েছে। তাঁদের সমুদ্র যানে চড়ে সকলে রক্তমৎস্যের সন্ধানে সমুদ্রের তলায় নেমেছেন।)

।জানুয়ারি, সকাল ৮টা

কাল রাত্রের একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা এইবেলা লিখে রাখি।

হামাকুরা আর তানাকা পালা করে জাহাজটা চালায়, কারণ একজনের পক্ষে ব্যাপারটা ক্লান্তিকর আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন ঘড়িতে বেজেছে রাত সাড়ে এগারটা। সাতশো ফুট গভীরে সমু চার হাত উপর দিয়ে চলেছে আমাদের জাহাজ। হামাকুরার হাতে কন্ট্রোল, তানাকা চোখ বুজে ়য়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। অবিনাশবাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন, আর তাঁর নাক এত জোরে ডাকছে যে এক এক চ্ছ তাঁকে সঙ্গে না নিলেই বোধ হয় ভালো ছিল? আমার দৃষ্টি জানালার বাইরে। একটা 'ইলেক্ট্রিক ছুক্ষণ হল আমাদের সঙ্গ নিয়েছে। এমন সময় সার্চলাইটের আলোতে দেখলাম সমুদ্রের মাটিতে কী জিনিস চক্‌চক্ করে উঠল।

হামাকুরার দিকে চেয়ে দেখি সে-ও ওই চক্‌চকে জিনিসটার দিকে দেখছে। তারপর দেখলাম সে স্টীয়া জাহাজটাকে সেই দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এবার জানালার দিকে এগিয়ে যেতেই বুঝলাম সেটা একটা হ লম্বা কারুকার্য করা পিতলের কামান। সেটা যে এককালে কোনো জাহাজে ছিল, আর সেই জাহা সেটা জলের তলায় ডুবেছে, সেটাও আন্দাজ করতে অসুবিধে হল না।

তাহলে কি সেই জাহাজের ভগ্নাবশেষও কাছাকাছির মধ্যেই কোথাও রয়েছে?

ানে মনে বেশ একটা চাপা উত্তেজনা অনুভব করলাম। কামানের চেহারা দেখে সেটা যে অন্তত তিন-চার পুরোন সেটা বোঝা যায়। মোগল জাহাজ, না ওলন্দাজ জাহাজ, না বৃটিশ জাহাজ?

ামাকুরা আবার জাহাজের স্টীয়ারিং ঘোরালো। সার্চলাইটের আলোও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে গেল, অ কোনো এক অতিকায় সামুদ্রিক জীবের কঙ্কালের মতো চোখে পড়ল জাহাজটা। এখান দিয়ে এক ওখানে হালের অংশ, পাঁজরের মতো কিছু খেয়ে যাওয়া ইস্পাতের কাঠামো, এখানে ওখানে মাটি নানান আকারের ধাতুর জিনিসপত্র। প্রাচীন জাহাজডুবির প্রমাণ সর্বত্র ছড়ানো। দুর্ঘটনার কারণ ঝ া জানি না, বা জানার কোন উপায় নেই।

র মধ্যে তানাকাও বিছানা ছেড়ে উঠে এসে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে বাইরের দৃশ্য দেখছে। ামি অবিনাশবাবুকে ঘুম থেকে তুললাম। দৃশ্য দেখে তাঁর চোখ একেবারে ছানাবড়া হয়ে গেল।

ামাকুরা জাহাজটাকে নোঙর ফেলে মাটিতে দাঁড় করাল। অবিনাশবাবু বললেন, 'এ যেন আরব্যোপন্যাসে শ্য দেখছি মশাই! একবার নিজেকে মনে হচ্ছে সিন্ধবাদ, একবার মনে হচ্ছে আলিবাবা!'

ালিবাবার নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমার একটা কথা মনে হল। জাহাজের সঙ্গে কি কিছু ধনরত্ন তলায় তলিয়ে যায় নি? বাণিজ্যপোত হলে স্বর্ণমুদ্রা রৌপ্যমুদ্রা তাতে থাকবেই, আর সে তো জাহাজে ই ডুববে, আর সে জিনিসত নোনা ধরে নষ্ট হয়ে যাবার নয়।

পানীদের হাবভাবেও একটা গভীর উত্তেজনা লক্ষ্য করলাম। দুজনে কিছুক্ষণ কী জানি কথাবার্তা বলল মামার দিকে ফিরে হামাকুরা বলল, 'উই গো আউত। ইউ কাম?'

া শুনে বুঝলাম, আমি যা সন্দেহ করছি, ওরাও তাই করছে। সত্যিই কোন ধনরত্ন আছে কিনা সেটা রে দেখতে চায় ওরা।

অবিনাশবাবু এতক্ষণ আমাদের মধ্যে কী কথাবার্তা হচ্ছিল সেটা ঠিক বুঝতে পারেন নি। হঠাৎ (
করে চোখের পলকে তিনি একেবারে নতুন মানুষ হয়ে গেলাম।

'রত্ন? মোহর? সোনা? রূপো? এসব কী বলছেন মশাই? এও কি সম্ভব? আ
আছে জলের তলায়? নষ্ট হয় নি? ইচ্ছে করলে আমরা নিতে পারি? নিলে আমাদের হয়ে যাবে
বলেন কী মশাই, বলেন কী!'

আমি অবিনাশবাবুকে খানিকটা শান্ত করে বললাম, 'অত উত্তেজিত হবেন না। এ ব্যাপারে গ্যা
নেই। এটা আমাদের অনুমান মাত্র। আছে কি না আছে সেটা এঁরা দুজন গিয়ে দেখবেন।'

'শুধু এঁরা দুজন কেন? আমরা যাব না?'

আমি ত অবাক। কী বলছেন অবিনাশবাবু!

আমি বললাম, 'আপনি যেতে পারবেন? ওই জলের মধ্যে? হাঙরের মধ্যে? ডুবুরির পোষাক

'আলবৎ পারব!' অবিনাশবাবু চীৎকার করে লাফিয়ে উঠলেন। ধনরত্নের লোভে তার মত
ভীতু মানুষের মনে এতটা সাহস আনতে পারে এ আমার ধারণা ছিল না।

কী আর করি? নিউটনকে ফেলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া, সত্যি বলতে কি
আছে কিনা সঠিক জানা ত নেই, আর ও বিষয় আমার তেমন লোভও নেই। হামাকুরাকে বললাম, 'আ
যাবে তোমাদের সঙ্গে। আমি ক্যাবিনেই থাকব।'

দশ মিনিটের মধ্যে ডুবুরির পোষাক পরে তিনজন ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে গেল। কয়েক সেকেণ্ডে
জানালা দিয়ে তাদের ভগ্নস্তূপের দিকে অগ্রসর হতে দেখলাম। তিনজনেরই আপাদমস্তক ঢাকা একই
হওয়াতে তাদের আলাদা করে চেনা মুশকিল, তবে তাদের মধ্যে যিনি হাত পা একটু বেশি ছুঁড়ছেন, ি
অবিনাশবাবু সেটা সহজেই আন্দাজ করা যায়।

আরো মিনিট পাঁচেক পরে দেখলাম তিনজনেই মাটিতে নেমে ভগ্নস্তূপের মধ্যে মাটির দিকে দৃষ্টি রেখে
ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। অবিনাশবাবুকে যেন একবার নীচু হয়ে মাটিতে হাতড়াতেও দেখলাম।

তারপর যে ব্যাপারটা হল তার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। হঠাৎ অনুভব করলাম (
মধ্যে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ জাতীয় কিছু হওয়ার দরুণ আমাদের জাহাজটা সাংঘাতিকভাবে দুলে উঠ
সেই সঙ্গে তিন ডুবুরির দেহ ছিটকে গিয়ে জলের মধ্যে ওলট পালট খেতে খেতে আমাদের জাহাজের দি
এলো। চারিদিকে মাছের ঝাঁকের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য আর দিশেহারা ভাব দেখেও বুঝলাম যে
অস্বাভাবিক একটা কিছু ঘটেছে।

দুই জাপানী, ও বিশেষ করে অবিনাশবাবুর জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বোধ করছিলাম। কিন্তু তারপ
দেখলাম তিনজনেই আবার মোটামুটি সামলে নিয়ে জাহাজের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তখন অনেকটা
হলাম।

হামাকুরা আর তানাকা অবিনাশবাবুকে ধরাধরি করে ক্যাবিনে ঢুকল। তারপর তারা পোষাক
পর অবিনাশবাবুর ফ্যাকাসে মুখ দেখেই তার শরীর ও মনের অবস্থাটা বেশ বুঝতে পারলাম। ভদ্রলোক
বসে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'কুষ্ঠীতে ছিল বটে—যে একষট্টিতে একটা ফাঁড়া আছে, কিন্তু সেটা
ফাঁড়া তা জানতুম না।'

আমার কাছে আমারই তৈরি স্নায়ুকে সতেজ করার একটা ওষুধ ছিল। সেটা খেয়ে পাঁচমিনিটের

বিনাশবাবু অনেকটা সুস্থ বোধ করলেন, আর তারপর জাহাজও আবার চলতে আরম্ভ করল। বলা বাহুল্য, ই অল্প সময়ের মধ্যে ধনরত্নের সন্ধান কেউই পায়নি। তবে সেটা নিয়ে এখন আর কারুর বিশেষ আক্ষেপ বা ;স্তা নেই। সকলেই ভাবছে ওই আশ্চর্য বিস্ফোরণের কথা। আমি বললাম, 'কোন তিমি জাতীয় মাছ কাছাকাছি লেলে কি এমন আলোড়ন সম্ভব?'

তানাকা হেসে বলল, 'তিমি যদি পাগলা হয়ে গিয়ে জলের মধ্যে ডিগবাজিও খায়, তাহলেও তার ঠিক াশেপাশের জলে ছাড়া কোথাও এমন আলোড়ন হতে পারে না। এটা যে কোন একটা বিস্ফোরণ থেকেই হয়েছে াতে কোন সন্দেহ নেই।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'ভূমিকম্পের মতো জলকম্পও হয় নাকি মশাই? আমার ত যেন সেইরকমই নে হল।'

আসলে, কাছাকাছির মধ্যে হলে কারণটা হয়ত বোঝা যেত। বিস্ফোরণটা হয়েছে বেশ দূরেই। অথচ তা ত্ত্বেও কী সাংঘাতিক দাপট! কাছে হলে, অত্যন্ত মজবুত ভাবে তৈরি বলে জাহাজটা যদি বা রক্ষে পেত, মানুষ তন জনের যে কী দশা হতে পারত সেটা ভাবতেও ভয় করে।

জাহাজ ছাড়বার আধ ঘণ্টার মধ্যেই সমুদ্রের জলে বিস্ফোরণের নানা রকম চিহ্ন দেখতে শুরু করলাম। অসংখ্য ছোট মরা মাছ ছাড়াও সাতটা মরা হাঙর আমাদের আলোয় দেখতে পেলাম। একটা অক্টোপাসকে ন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে চোখের সামনে মরতে দেখলাম। এ ছাড়া জলের উপর দিক থেকে দেখি অজস্র জলি ফিশ, স্টার ফিশ, ঈল ও অন্যান্য মাছের মৃতদেহ ধীরে ধীরে নীচে নেমে আসছে। আমাদের আলোর গণ্ডির ধ্যে পৌঁছলেই তাদের দেখা যাচ্ছে।

আমি হামাকুরাকে বললাম, 'বোধ হয় জলের তাপ বেড়েছে, অথবা জলের সঙ্গে এমন একটা কিছু মিশেছে া মাছ আর উদ্ভিদের পক্ষে মারাত্মক।'

তানাকা তার যন্ত্র দিয়ে জলের তাপ মেপে বলল, '৪৭° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড—অর্থাৎ যাতে এসব প্রাণী বাঁচে তার চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ।'

কী আশ্চর্য! এমন হল কী করে? একমাত্র কারণ বোধ হয় এই যে জলের তলায় একটা আগ্নেয়গিরি ছিল যেটার মুখ এতদিন বন্ধ ছিল। আজ সেটা ইরাপ্ট করেছে—আর তার ফলেই এত কাণ্ড। এ ছাড়া ত আর কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি না।

২৬শে জানুয়ারি, রাত ১২টা

আমাদের ডুবুরি জাহাজের রেডিও সন্ধ্যা থেকে চালানো রয়েছে। দিল্লী, টোকিয়ো, লণ্ডন আর মস্কোর খবর ধরা হয়েছে। ফিলিপিনের ম্যানিলা উপকূলে, আফ্রিকার কেপ টাউনের সমুদ্রতীরে, ভারতবর্ষের কোচিন সমুদ্রতটে, রি ও ডি জ্যানিরোর সমুদ্রতটে, আর ক্যালিফর্ণিয়ার বিখ্যাত ম্যালিবু বীচে রক্ত মৎস্য দেখা গেছে। সবশুদ্ধ একশো ত্রিশ জন লোক এই রাক্ষুসে মাছের ছোবলে মারা গেছে বলে প্রকাশ। সারা বিশ্বে গভীর চাঞ্চল্য ও বৈজ্ঞানিকদের মনে চরম বিস্ময় দেখা দিয়েছে। বহু সমুদ্রতত্ত্ববিদ্ এই নিয়ে গবেষণা শুরু করে দিয়েছে। কোথায় কখন এই রক্তখাকী রক্ত মৎস্যের আবির্ভাব হবে, সেই ভয়ে সমুদ্রে স্নান করা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। এমন কি জলপথে ভ্রমণ অনেক কমে গেছে—যদিও নৌকা বা জাহাজের গা বেয়ে মাছ উঠে মানুষকে আক্রমণ করেছে এমন কোন খবর এখনও পাওয়া যায় নি। কোত্থেকে কী ভাবে এই অদ্ভুত প্রাণীর উদ্ভব হল তা এখনো

কেউ বলতে পারে নি। পৃথিবীতে এভাবে অকস্মাৎ নতুন কোন প্রাণীর আবির্ভাব গত কয়েক হাজার বছরের মধ্যে হয়েছে বলে জানা নেই।

আমরা এর মধ্যে বিকেল পাঁচটা নাগাৎ একবার জলের উপরে উঠেছিলাম। গোপালপুর থেকে প্রায় ১০০ মাইল দক্ষিণে চলে এসেছি আমরা। সমুদ্রতট থেকে জলের দিকে বিশ গজ দূরে আমাদের ডুবুরি জাহাজ রাখা হয়েছিল। ডাঙ্গায় কোন বসতির চিহ্ন চোখে পড়ল না। সামনে বালি, পিছনে ঝাউবন, আর আরো পিছনে পাহাড় ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না।

নিউটন সমেত আমরা চারজনই ডাঙ্গায় গিয়ে কিছুক্ষণ পায়চারি করলাম। বিস্ফোরণ নিয়ে আমরা সকলেই ভাবছি, এমন কি অবিনাশবাবুও তাঁর মতামত দিতে কসুর করছেন না। একবার বললেন, 'বাইরে থেকে তাগ করে কেউ জলে বোমাটোমা ফেলেনি ত?'

অসম্ভব নয়! অবিনাশবাবু খুব যে বোকার মতো বলেছেন তা নয়। কিন্তু জলের মধ্যে বোমা কেন? কার শত্রু সমুদ্রের জলে বাস করছে? জলের মাছ আর উদ্ভিদের উপর কার এত আক্রোশ হবে!

আধ ঘণ্টা খোলা হাওয়ায় পায়চারি ক'রে আমরা জাহাজে ফিরে এলাম।

সূর্যের আলো জলের নীচে যে পর্যন্ত পৌঁছায়, তার মধ্যে রক্তমাছের সন্ধান পাওয়া যায়নি বলে এবার আমরা ঠিক করেছি উপকূল থেকে বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে আরো অনেক গভীর জলে নেমে অনুসন্ধান করব। অনেকেই জানেন সমুদ্রের গভীরতম অংশ কতখানি গভীর হতে পারে। প্রশান্ত মহাসাগরের এক একটা জায়গা ছ' মাইলেরও বেশি গভীর। অর্থাৎ গোটা মাউন্ট এভারেস্টটা তার মধ্যে ডুবে গিয়েও তার উপর প্রায় দু হাজার ফিট জল থাকবে।

আমরা অন্তত দশহাজার ফুট—অর্থাৎ প্রায় ২ মাইল নীচে নামব বলে স্থির করেছি। এর চেয়ে বেশি গভীরে জলের যা চাপ হবে, তাতে আমাদের জাহাজকে টিকিয়ে রাখা মুশকিল হতে পারে।

এখন আমরা চলেছি পাঁচ হাজার ফুট নীচ দিয়ে। এখানে চিররাত্রি। দুপুরের সূর্য যদি ঠিক মাথার উপরেও থাকে, তাহলেও তার কণামাত্র এখানে পৌঁছাবে না।

এখানে উদ্ভিদ্ বলে কিছু নেই, কারণ সূর্যের আলো ছাড়া উদ্ভিদ্ জন্মাতে পারে না। কাজেই প্রবাল, প্ল্যাঙ্কটন ইত্যাদির যে শোভা এতদিন আমাদের ঘিরে ছিল, এখন আর তা দেখা যায় না। এখানে আমাদের ঘিরে আছে স্তরের পর স্তর জলমগ্ন পাথরের পাহাড়। এইসব পাহাড়ের পাশ দিয়ে পাশ দিয়ে আমরা চলেছি। নীচে জমিতে বালি আর পাথরের কুচি। তার উপরে স্থির হয়ে বসে আছে, না হয় চলে ফিরে বেড়াচ্ছে—শামুক ও কাঁকড়া জাতীয় প্রাণী। পাহাড়ের গায়ে গায়ে 'ক্ল্যাম' জাতীয় শামুক আঁটকে রয়েছে ঘুঁটের মতো। এক জাতীয় ভয়াবহ কাঁকড়া দেখলাম, তারা লম্বা লম্বা রণ-পার মত পা ফেলে মাটি দিয়ে হেঁটে চলেছে।

এইসব প্রাণীর কোনটাই উদ্ভিদ্‌জীবি নয়। এরা হয় পরস্পরকে খায়, না হয় অন্য সামুদ্রিক প্রাণী যখন ম'রে নীচে এসে পড়ে, তখন সেগুলোকে খায়। যারা এ জিনিসটা করে তাদের সামুদ্রিক শকুনি বললে খুব ভুল হবেনা।

তানাকা এখন জাহাজ চালাচ্ছে। দুই জাপানীকেই এর আগে পর্যন্ত হাসিখুশি দেখেছি; এখন দুজনেই গম্ভীর। সার্চলাইট সব সময়ই জ্বালানো আছে। একবার নেভানো হয়েছিল। মনে হল যেন অন্ধকূপের মধ্যে রয়েছি। তবে, আলো নেভালে একটা জিনিস হয়। অন্ধকারে চলা ফেরা করতে হবে বলেই বোধহয়, এখানকার কোনো কোনো মাছের গা থেকে আলো বেরোয়—আর তার এক একটার রং ভারী সুন্দর। এ আলো

একেবারে 'নিয়ন' আলোর মতো। একটা মাছের নামই ত নিয়ন মাছ। জাহাজের আলো নেভাতে এরকম দু একটা মাছকে জলের মধ্যে আলোর রেখা টেনে চলে বেড়াতে দেখা গেল। এমনিতে, এই গভীর জলের যে সমস্ত প্রাণী, তাদের গায়ের রং-এ কোনো বাহার নেই। বেশির ভাগই হয় সাদা, না হয় কালো।

অবিনাশবাবু মন্তব্য করলেন, 'সমস্ত জগতটার উপর একটা মৃত্যুর ছায়া পড়েছে বলে মনে হয়— তাই না?'

কথাটা ঠিকই। শহর, সভ্যতা, পথ ঘাট মানুষ বাড়ি গাড়ি—এসব থেকে যেন লক্ষ মাইল দূরে আর লক্ষ বছর আগেকার কোনো আদিম বিভীষিকাময় জগতে চলে এসেছি আমরা। অথচ আশ্চর্য এই যে, এ জগত আসলে আমাদের সমসাময়িক, আর এখানেও জন্ম আছে মৃত্যু আছে খাওয়া আছে ঘুম আছে সংগ্রাম আছে সমস্যা আছে। তবে তা সবই একেবারে আদিম স্তরে—যেমন সত্যিই হয়ত লক্ষ বছর আগে ছিল।

তানাকা কী জানি একটা দেখে চীৎকার করে উঠল।

লেখা থামাই।

২৯শে জানুয়ারি, ভোর সাড়ে চারটা

এগারো হাজার ফুট থেকে আমরা আবার উপরে উঠতে আরম্ভ করেছি। আমাদের অভিযান শেষ হয়েছে। আমরা সকলেই এখনো একটা মুহ্যমান অবস্থায় রয়েছি। এটা কাটতে, এবং মনের বিস্ময়টা যেতে বোধহয় বেশ কিছুটা সময় লাগবে। আমার 'নার্ভাইটা' বড়ি খুব কাজ দিয়েছে। আমি যে এখন বসে লিখতে পারছি, সেও এই বড়ির গুণেই।

এর আগের দিনের লেখার শেষ লাইনে বলেছিলাম, তানাকা জানালা দিয়ে কী জানি একটা দেখে চীৎকার করে উঠেছিল। আমরা সবাই সে চীৎকার শুনে জানালার উপর প্রায় হুমড়ি দিয়ে পড়লাম।

তানাকা জাপানী ভাষায় কী জানি একটা বলাতে হামাকুরা জাহাজের সার্চলাইটটা নিভিয়ে দিল, আর নেভাতেই একটা আশ্চর্য দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ল।

আগেই বলেছি আমাদের চারিদিক ঘিরে রয়েছে সমুদ্রগর্ভের সব পাহাড়। এইরকম দুটো পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে বেশ খানিকটা দূরে (সমুদ্রের তলায় দূরত্ব আন্দাজ করা ভারী কঠিন) দেখতে পেলাম একটা অগ্নিকুণ্ডের মতো আলো। সে আলো আগুনের লেলিহান শিখার মতই অস্থির, আর তার রংটা হল আমার দেখা লাল মাছের রঙের মতই জ্বলন্ত উজ্জ্বল।

তানাকা জাহাজের স্টিয়ারিংটা ঘোরাতেই বুঝতে পারলাম আমরা সেই অগ্নিকুণ্ডের দিকেই চালিত হচ্ছি। সার্চলাইট আর জ্বালার দরকার নেই। ওই আলোই আমাদের পথ দেখাবে। তাছাড়া আমাদের অস্তিত্বটা যত কম জাহির করা যায় ততই বোধহয় ভালো।

অবিনাশবাবু আমার হাতের আস্তিনটা ধরে চাপা গলায় বললেন, 'মিলটনের প্যারাডাইজ লস্ট মনে আছে? তাতে যে নরকের বর্ণনা আছে—এযে কতকটা সেইরকম মশাই।'

আমি আমার বাইনোকুলারটা বার করে হামাকুরার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'দেখবে?' ও মাথা নেড়ে বলল, 'ইউ লুক।'

বাইনোকুলারে চোখ লাগাতেই অগ্নিকুণ্ড কাছে এসে পড়ল। দেখলাম—সেটা আগুন নয়, সেটা মাছের মেলা। হাজার হাজার রক্তমাছ সেখানে চক্রাকারে ঘুরছে, পাক খাচ্ছে, উপরে উঠছে, নীচে নামছে। তাদের

রের রং লাল বললে ভুল হবে, আসলে তাদের গা থেকে একটা লাল আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে, যার ফলে তাদের দূরে ক একটা অগ্নিকুণ্ড বলে মনে হচ্ছে।

প্রথমে এ-দৃশ্যের অনেকখানি পাহাড়ে ঢেকে ছিল। জাহাজ যতই এগোতে লাগল, ততই বেশি করে দেখা তে লাগল এই রক্তমৎস্যের জগত।

ঠিক দশমিনিট চলার পর আমরা পাহাড়ের পাশ কাটিয়ে একেবারে খোলা জায়গায় এসে পড়লাম। মাছের ড় এখনো আমাদের থেকে অন্তত বিশ পঁচিশ গজ দূরে, কিন্তু আর এগোনর প্রয়োজন নেই, কারণ আমাদের পথে আর কোন বাধা নেই। তাছাড়া এটাও মনে হচ্ছিল, যে এই বিচিত্র অলৌকিক দৃশ্য যেন একটু দূর থেকে খাই ভাল।

মাছের সংখ্যা গুণে শেষ করার ক্ষমতা নেই—আর তার কোনো প্রয়োজনও নেই। এক মাছ আরেক মাছে নো তফাত নেই—সুতরাং তাদের যে কোন একটার বর্ণনা দিলেই চলবে।

মাছ বলতে আমরা সাধারণত যে জিনিসটা বুঝি, এটা ঠিক সেরকম নয়। এর কাঁধের দুদিকে ডানার য়গায় যে দুটো জিনিস আছে, তার সঙ্গে মানুষের হাতের মিল আছে, আর এরা সেগুলো দিয়ে হাতের কাজই রছে। লেজটা দুভাগ হয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু ভাগ হয়ে সেটা আর ঠিক লেজ নেই, হয়ে গেছে দুটো পায়ের তো। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, এদের চোখ মাছের মতো চেয়ে থাকে না, এ চোখে মানুষের মতো াতা পড়ে।

এদের চাঞ্চল্যেরও একটা কারণ আন্দাজ করা যায়, সেটা পরে বলছি। তার আগে বলা দরকার যে এরা রস্পরের সঙ্গে যে ব্যবহার করছে, তাতে একটা স্পষ্ট ধারণা হয় যে এরা কথা বলছে, অথবা অন্ততপক্ষে এদের ধ্যে একটা ভাবের আদান প্রদান চলেছে।

হাত নেড়ে মাথা নেড়ে এরা যে ব্যাপারটা চালিয়েছে, সেটা কোনরকম জলচর প্রাণী কখনো করে লে আমার জানা নেই। তানাকা আর হামাকুরাকে বলাতে তারাও আমার সঙ্গে এ ব্যাপারে এক ত হল।

এদের সমস্ত উত্তেজনা যে ব্যাপারটাকে ঘিরে হচ্ছে সেটা একটা আশ্চর্য লাল গোলাকার বস্তু। গোলকটা াইজে আমাদের জাহাজের প্রায় অর্ধেক। সেটা যে কিসের তৈরি তা বোঝা ভারী মুসকিল, যদিও সেটা যে ধাতু সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। গোলকটা সমুদ্রের মাটিতে তিনটে স্বচ্ছ তেরচা খুঁটির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করার মতো এই রক্তমাছ ছাড়া আর কোনরকম জ্যান্ত প্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই। যেটা রয়েছে সেটা হল মাছের ভীড়ের কিছুদূরে পর্বতপ্রমাণ একটা কঙ্কাল। বুঝতে অসুবিধা হলনা যে সেটা একটা তিমি মাছের। এই বিশাল মাছের এই দশা হল কী করে? এই প্রশ্নের একটা উত্তরই মাথায় আসে : এই বিঘত প্রমাণ মাছের দলই এই তিমিকে ভক্ষণ করেছে।

রক্তমাছের পিছনে যে পাহাড়, তার চেহারাতেও একটা বিস্ময়কর বিশেষত্ব রয়েছে। অন্যান্য পাহাড়ের গায়ের মতো এর গা এবড়ো খেবড়ো নয়। তাকে নিপুণ কারিগরির সাহায্যে একই সঙ্গে সুন্দর ও বাসযোগ্য করে তোলা হয়েছে। তার গায়ে থাকে থাকে সারি সারি অসংখ্য সুড়ঙ্গ কাটা হয়েছে—যেগুলো পাহাড়ের ভিতর চলে গেছে। এই সুড়ঙ্গের ভিতরটা অন্ধকার নয়। এর প্রত্যেকটার ভিতরে আলোর ব্যবস্থা আছে। এই আলো লাল। অর্থাৎ এ রাজ্যের সবই লাল।

এই সব দেখতে দেখতে আমার মাথার ভিতরটা কেমন জানি করতে লাগল। চোখটা ধাঁধিয়ে গিয়েছিল অবশ্যই, কিন্তু মাথার এ-ভাবটা সে কারণে নয়। একটা আশ্চর্য ধারণা হঠাৎ আমার মনে উদিত হবার ফলেই এই অবস্থা।

এরা যদি পৃথিবীর প্রাণী না হয়? যদি এরা অন্য কোন গ্রহ থেকে পৃথিবীতে এসে থাকে? হয়ত তাদের নিজেদের গ্রহে আর জায়গায় কুলোচ্ছে না। তাই পৃথিবীতে এসেছে বসবাস করতে?

হামাকুরাকে কথাটা বলতে সে বলে উঠল, 'ওয়ান্ডাফুল! ওয়ান্ডাফুল!'

আমার নিজেরও ধারণাটাকে ওয়াণ্ডাফুল বলেই মনে হয়েছিল। শুধু তাই নয়—এটা সম্ভবও বটে। এ প্রাণী পৃথিবীতে সৃষ্টি হতে পারে না। হলে সেটা এতদিন মানুষের অজানা থাকত না। কারণ—বিশেষত—এরা যে শুধু জলের তলাতেই থাকে তাত না, এরা উভচর। ডাঙায় উঠে এরা মানুষ মারতে পারে, ডাঙা থেকে হেঁটে এরা জলে নামতে পারে।

হামাকুরা হঠাৎ বলল, 'ওরা মুখ দিয়ে কোন শব্দ করছে কিনা, এবং সে শব্দের কোন মানে আছে কিনা সেটা জানা দরকার। শুশুক মাছ শিস দেয় সেটা বোটহয় তুমি জান। সেই শিস রেকর্ড করে জানা গেছে যে সেটা একরকম ভাষা। ওরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে, মনের ভাব প্রকাশ করে। এরাও হয়ত তাই করছে।'

এই বলে হামাকুরা ক্যাবিনের দেওয়ালের একটা ছোট দরজা খুলে তার ভিতর থেকে একটা হেডফোন জাতীয় জিনিস বার করে কানে পরল। তারপর টেবিলের উপর অনেকগুলো বোতামের মধ্যে দু-একটা একটু এদিক ওদিক ঘোরাতেই তার চোখে মুখে বিস্ময় ও উল্লাসের ভাব ফুটে উঠল। তারপর হেডফোনটা খুলে আমাকে দিয়ে বলল, 'শোন'।

সেটা কানে লাগাতেই নানারকম অদ্ভুত তীক্ষ্ণ শব্দ শুনতে পেলাম। তার মধ্যে একটা বিশেষ শব্দ যেন বার বার উচ্চারিত হচ্ছে—ক্লী ক্লী ক্লী ক্লী ক্লী ক্লী···এটা কি শুধুই শব্দ—না এর কোনো মানে আছে?

অবিনাশবাবু দেখি এর ফাঁকে আমার লিঙ্গুয়াগ্রাফ যন্ত্রটা বার করে আমার দিকে এগিয়ে ধরে বসে আছেন। এরকম বুদ্ধি নিয়ে ত উনি অনায়াসে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে যেতে পারেন!

কিন্তু কোন ফল হল না। কোনো শব্দেরই কোনো মানে আমার যন্ত্রে লেখা হল না। অথচ যন্ত্র খারাপ হয়নি, কারণ জাপানী ভাষায় অনুবাদ গড়গড় করে হয়ে যাচ্ছে। কী হল তাহলে?

হামাকুরা বলল, 'এর মানে একমাত্র এই হতে পারে, যে ওরা যে কথা বলছে তার কোন প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় নেই। অর্থাৎ ওদের ভাষা আর ওদের ভাব—দুটোই মানুষের চেয়ে একেবারে আলাদা। এতে আরো বেশি মনে হয় যে ওরা অন্য কোন গ্রহের প্রাণী।'

যন্ত্রটা রেখে দিলাম। কী বলছে সেটা জানার চেয়ে কী করছে সেটা দেখাই ভালো।

রক্তমৎস্যের দৃষ্টিশক্তি বোধ হয় তেমন জোরালো নয়, কারণ আমাদের জাহাজটা তারা এখনো দেখতে পায়নি।

তাই কী? না কি, ওদের মধ্যে কোনো একটা কারণে এমন উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে যে ওদের আশে পাশে কী আছে না আছে সেদিকে ওরা ভ্রূক্ষেপই করছে না? বিনা কারণে এমন চাঞ্চল্য কোনো প্রাণী প্রকাশ করতে পারে সেটা বিশ্বাস করা কঠিন।

এটা ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ মাছের হাবভাবে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। তারা হঠাৎ দুই দলে ভাগ

হয়ে গেল; তারপর দুই দল গোলকটার দুদিকে গিয়ে সেটাকে যেন বার বার ধাক্কা মেরে সরাতে চেষ্টা করতে লাগল। তারপর দেখি তারা গোলকটাকে চারপাশ থেকে ঘিরে একই সঙ্গে সেটার দিকে চার্জ করে গিয়ে তাতে ঠেলা মারছে।

এ ব্যাপারটা তারা প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে করল। তার পরেই এক মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটতে দেখলাম। দল থেকে একটি একটি করে মাছ ছটফট করতে করতে যেন নির্জীব হয়ে মাটিতে পড়ে যেতে লাগল। হঠাৎ যেন কিসে তাদের প্রাণশক্তি হরণ করে নিচ্ছে। সেটা কি ক্লান্তি, বা কোন ব্যারাম; বা অন্য কিছু?

একটু চিন্তা করতেই বিদ্যুতের একটা ঝলকের মতো সমস্ত জিনিসটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেলো।

অন্য কোন গ্রহ থেকে এই উভয়চর প্রাণীরা এসেছে পৃথিবীতে বসবাস করতে। জলের ভাগ এখানে বেশি, তাই জলেই নেমেছে—কিম্বা হয়ত জলেই থাকবে বলে এসেছে। তারপর, হয় জলের তাপ, বা জলে কোনো গ্যাস বা ওই জাতীয় কিছুর অভাব বা অতিরিক্ততা এদের জীবনধারণের পথে বাধার সৃষ্টি করেছে। তাই এদের কেউ কেউ জল থেকে ডাঙ্গায় উঠে দেখতে গেছে সেখানে বসবাস করা যায় কিনা। ডাঙ্গায় উঠে দেখেছে মানুষকে। হয়ত ধারণা হয়েছে মানুষ তাদের শত্রু, তাই আত্মরক্ষার জন্য তাদের কয়েকজনকে কামড়িয়ে বা হুল ফুটিয়ে মেরেছে। তারপর তারা জলে ফিরে এসে ক্রমে বুঝতে পেরেছে যে পৃথিবীতে থাকলে তারা বেশিদিন বাঁচতে পারবে না। খুব সম্ভবত ওই লাল গোলকে করেই তারা এসেছিল, আবার ওতে করেই তারা ফিরে যেতে চায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ গোলকটা সমুদ্রের মাটিতে এমন ভাবে আঁটকে গেছে যে সেটাকে ওপরে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। এই মুহূর্তে সে গোলকটাকে আলগা করতে না পারলে হয়ত তাদের সকলেরই সলিল সমাধি হবে।

হামাকুরাকে বললাম, 'ওই গোলকটাকে যে-করে-হোক্ মাটি থেকে আলগা করে দিতে হবে। এদের সাধ্যি আছে বলে মনে হয় না।

হামাকুরা তানাকাকে জাপানী ভাষায় তাড়াতাড়ি কী জানি বলে বলল, 'আমাদের জাহাজটাকে দিয়ে ওটাকে ধাক্কা মারা ছাড়া কোনো উপায় নেই।'

'তবে সেটাই করা হোক্।'

চোখের সামনে একের পর এক মাছ ম'রে পাক খেতে খেতে মাটিতে পড়ছে—এ দৃশ্য আমি আর দেখতে পারছিলাম না।

তানাকা জাহাজটাকে চালু ক'রে খুব আস্তে এবং সাবধানে গোলকটার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। যখন হাত দশেকের মধ্যে এসে পড়েছি তখন আরেক বিদ্ঘুটে ব্যাপার শুরু হল। মাছগুলো হঠাৎ তাদের ভীড়ের মধ্যে জাহাজটাকে ঢুকতে দেখে বোধহয় ভাবল কোনো শত্রু তাদের সর্বনাশ করতে এসেছে। তারা দলে দলে আমাদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে আমাদের ক্যাবিনের তিনকোণা জানালার কাঁচে এসে ধাক্কা মারতে আরম্ভ করল। সে এক দৃশ্য! সমস্ত ক্যাবিনের ভিতরটা লাল আভায় ধক্ ধক্ করছে। মাছের পর মাছ এসে মরিয়া হয়ে জানালায় ঠোকর মারছে—তাদের দৃষ্টিতে একটা হিংস্র অথচ ভয়ার্ত ভাব।

নিউটনের যা দশা হল তা লিখে বোঝান মুশকিল। মুখ দিয়ে ক্রমাগত ফ্যাঁশ ফ্যাঁশ শব্দ, আর সামনের পায়ের দুই থাবা দিয়ে অনবরত কাঁচের উপর আঁচড়। অবিনাশবাবুর দিকে চেয়ে দেখি উনি চোখ বুজে বিড়বিড় করে ইষ্টনাম জপ করছেন—তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে তার উপর মাছের লাল আলো পড়ে এক অদ্ভুত গোলাপী ভাব।

একটা মৃদু ধাক্কা অনুভব করে বুঝলাম আমাদের জাহাজ গোলকের গায়ে ঠেকেছে। তার কয়েক সেকেণ্ড পর তানাকা জাহাজটাকে পিছিয়ে আনতে আরম্ভ করল। খানিকটা পিছোতেই দেখলাম গোলকটা মাটি থেকে

আলগা হয়ে ভাসমান অবস্থায় জলের মধ্যে দুলছে।

এবার এক অভাবনীয় দৃশ্য। গোলকের তলার দিকে যে একটা দরজা ছিল সেটা আগে বুঝতে
যত জ্যান্ত মাছ বাকি ছিল; সব দেখি এবার একসঙ্গে আমাদের জাহাজ ছেড়ে বিদ্যুদ্বেগে গোলকের তল
হুড়মুড় করে দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

তারপর যেটা হল, তার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত ছিল, কিন্তু আমরা ছিলাম না। এ
বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম গোলকটা তীর বেগে উপর দিকে উঠছে। সেই বিস্ফোরণের ফলে জলের
আমাদের জাহাজে মারল ধাক্কা, আর সেই ধাক্কার চোটে জাহাজ ফুটবলের মতো ছিটকে গিয়ে লাগল
পাহাড়ে।

তারপর আমার আর কিছু মনে নেই।

যখন জ্ঞান হল তখন বুঝলাম নিউটন আমার কান চাটছে। ক্যাবিনের মেঝে থেকে উঠে অনুভ
কাঁধে একটা যন্ত্রনা। হামাকুরা দেখি তানাকার মাথায় একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধছে। অবিনাশবাবু ছিটকে গি
বিছানার উপর পড়েছিলেন; তাই বোধহয় ওঁর তেমন চোট লাগেনি। ওঁকে দেখে মনে হল উনি বেশ নিশ্চি
ঘুমোচ্ছেন। কাঁধে একটা মৃদু চাপ দিতেই ধড়মড় করে উঠে বসে চোখ বড় বড় করে বললেন, 'এক্স-
বলছে?' বুঝলাম উনি স্বপ্ন দেখছিলেন যে ওঁর হাড়গোড় সব ভেঙে গেছে।

জাহাজ উপর দিকে উঠছে। কারিগরীর আশ্চর্য বাহাদুরী এই জাপানীদের। এত বড় একটা ধাক্কায়
কিছুমাত্র জখম হয়নি। বাইরে যদি বা কিছু হয়ে থাকে, সেটা নিশ্চয়ই মারাত্মক নয়। আর ভেতরে শু
প্ল্যাস্টিকের গেলাস উলটে গিয়ে খানিকা জল আমার বিছানায় পড়েছে—ব্যাস্।

হামাকুরা বলল, 'প্রথমবার যে ধাক্কাটা খেয়েছিলাম, সেটা বোধহয় অন্য আরেকটা গোলকের বিস্ফোর

আমি বললাম, 'সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমার মনে হয় এরা সবাই, একই সঙ্গে, যেখ
এসেছিল সেখানে আবার ফিরে যাচ্ছে।

কোন্ গ্রহ থেকে এরা এসেছিল সেটা কোনোদিন জানা যাবে কি? বোধ হয় না। তবে বিহ
ভিন্নগ্রহবাসী রক্তমৎস্য যে কতদূর অগ্রসর হয়েছে সেটা ভাবতে অবাক লাগে। তানাকা এ মাছের অ
তুলেছে। আমি যখন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম, সে সময় জাহাজ ছাড়ার আগে হামাকুরা বাইরে বেরি
মরা মাছের নমুনা নিয়ে এসেছে। মোটকথা, আমাদের অভিযান মোটেই ব্যর্থ হয়নি।

অবিনাশবাবুর দিকে চেয়ে দেখি তিনি অন্যমনস্কভাবে জানলার বাইরে তাকিয়ে গুন গুন ক
গাইছেন। আমি বললাম, 'সমুদ্রগর্ভে এই অভিযানটা আপনার কাছে বেশ উপভোগ্য হয়েছে বলে মনে হচ

অবিনাশবাবু বললেন, 'মাছ জিনিষটা যেরকম উপাদেয়; মাছের জগতটা যে উপভোগ্য হবে তা
আশ্চর্য কী।'

'আমার ত মনে হচ্ছে আমার জ্ঞানের ভাণ্ডার আরো অনেক ভরে উঠল।'

'আপনি ভাবছেন জ্ঞান, আর আমি ভাবছি পকেট।'

'কিরকম?' আমি অবাক হয়ে অবিনাশবাবুর দিকে চাইতেই ভদ্রলোক তাঁর পাঞ্জাবীর পকেটে হাত
একটা চাপবাঁধা ডেলা বার করে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। সেটা হাতে নিয়ে ভালো করে আলোতে
আমার চোখ কপালে উঠল।

সেই ডেলার মধ্যে রয়েছে অন্তত দশখানা আরবি ভাবায় ছাপ মারা মোগল আমলের সোনার মোহর

লাগলাগপুর রাজ্যের পাশেই কাটকাটপুর রাজ্য। দুই রাজ্যের রাজাই খুব বীরপুরুষ পাশাপাশি দেশে থেকেও পরস্পরের মধ্যে আলাপ নাই। কেন যে আলাপ নাই, তা কেউ মন্ত্রীদের কাছে পরস্পরের অনেক নিন্দাও শোনেন তাঁরা।

একদিন লাগলাগপুরের রাজা কাটকাটপুরের রাজাকে চিঠি লিখলেন—'আমার এক চাই। তার লালরঙের গা, সবুজ রঙের লেজ। যদি না দিতে পারেন তো—'

কাটকাটপুরের রাজা তো চিঠি পেয়ে ভীষণ চটে গেলেন। একটু বাদে ঠাণ্ডা দিলেন—'ও-রকম ছাগল আমার নাই। আর, যদি থাকতই তাহলে কি—'

লাগলাগপুরের রাজা চিঠির উত্তর পেয়ে তো চটে লাল! বটে! এত বড় আস্পর্ধ করে অপমান করবে? লাগাও লড়াই, সাজাও সৈন্য, আনো হাতিয়ার!

দু'পক্ষে ভীষণ লড়াই সুরু হয়ে গেল। দু রাজাই বড় যোদ্ধা, জয়-পরাজয় কিছুই বলা একমাস যুদ্ধ চলার পরও কারো হারবার লক্ষণ দেখা গেল না।

একদিন কাটকাটপুরের রাজা বসে বসে ভাবলেন—'তাই তো! লাগলাগপুরের রাজ শেষে কি লিখতে চেয়েছিলেন সেটা তো জানলাম না—একবার সেটা জেনেই নেওয়া যাক!'

এদিকে কাটকাটপুরের রাজাও ঠিক সেই রকমের কথাই মনে করলেন।

পরের দিনই লড়াই থামাবার ব্যবস্থা হলো, আর দুই রাজায় সাক্ষাৎ হলো।

পরস্পরের প্রথম আলাপ-পরিচয়ের পর, কাটকাটপুরের রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—'আ চিঠিটার শেষে আপনি কি লিখতে চেয়েছিলেন বলুন তো?'

লাগলাগপুরের রাজা বললেন :—আমি লিখতে চেয়েছিলাম—'আমার একটা ছাগল চাই, তার লালরঙের গা, সবুজ রঙের লেজ। যদি না দিতে পারেন তো যে-কোন একটা সুন্দর ছাগল দেবেন।' আর কি আপনি লিখতে চেয়েছিলেন ?'

কাটকাটপুরের রাজা বললেন—: আমি লিখতে চেয়েছিলাম 'ও রকম ছাগল আমার নাই। আর যদি থাকতই তাহলে কি আপনাকে দিতাম না ?'

তখন দুজনে মিলে এক-চোট বিষম হাসির পালা হলো।

তারপর দু'দলের সৈন্যের উপর হুকুম হল :—আরে থামা, থামা! এক্ষুণি লড়াই থামা!

তারপর থেকে দুজনে গলাগলি ভাব হয়ে গেল। শুধু দুই রাজ্যের মন্ত্রীদের গলা ধাক্কা দিয়ে বিদায় দেওয়া হলো!

খ্যাঁদাপ্যাঁচা

শিমূল রায়

চাঁদের আলোয় ফল্‌সা তলায়
পঁ্যাচার ছানা আদুরে
খেড়ে দাদু প্যাঁচার সাথে
বস্‌ল ছেঁড়া মাদুরে,
সোহাগ ক'রে পাখনা ধ'রে
বল্‌ল দাদু, 'যাদুরে,
কাঠ-কোটরের শুঁটকো মানিক
মিচকে ফেঁচি চাঁদুরে,
ছিচ্‌কে চুরির লোভে কোথায়
নাক গলালি হাঁদুরে,

থাবড়া মেরে থেবড়ে দিল
বানিয়ে দিল খাঁদুরে ;
আয়, ম্যাজিকে লম্বা বানাই,
—লাগ্ ভেল্কি যাদুরে,—
নইলে মুখে মনের সুখে
ঠুক্‌রে যাবে বাদুড়ে।'
'ছিঁচ্‌কে, সিঁধেল বোঝার আগে,'
বলল ছানা, 'দাদুরে,—
আয়না এনে দেখাই তুমি
কোন্ কেলাসের সাধুরে!'

ন্যাশনাল ফরেস্ট ভ্রমণ

গৌতম সেন

গ্রাহক নং ৪৪০—বয়স ১০

এই বছর বার্ষিক পরীক্ষার পর ঠিক হল আমরা ডালটনগঞ্জ যাব। ডেরি-অন-শোন থেকে ট্রেন বদল করে আমরা প্রবল শীতের সন্ধ্যায় ডালটনগঞ্জ পৌঁছলাম। পথে বিরাট শোন ব্রিজ দেখলাম।

এইখান থেকে একদিন পালামৌ ন্যাশনাল ফরেস্ট যাওয়া স্থির হল। বাড়ি থেকে ঠিক সন্ধ্যা সাতটায় জীপে করে রওনা হলাম বনের দিকে। পথে মেদিনী রায়ের পালামৌ ফোর্ট দেখলাম। ফোর্টটি দেখে বারবার অতীতের রাজার কথা মনে হচ্ছিল। এর পর কিছুদূর বনের মধ্যে দিয়ে গিয়ে ডাক বাঙলোতে ফরেস্ট অফিসারের কাছে দুটি টাকা দিয়ে গাইডও একটি সার্চলাইট নিয়ে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করা হল। দুধারে গভীর বন ঘুট্ ঘুটে অন্ধকার। গাইড বারবার চুপ করে থাকবার জন্য নির্দেশ দিতে লাগল। কিছুক্ষণ যাবার পর গাইডের ইশারাতে সার্চ লাইটের আলোতে দেখতে পেলাম নয়টি হরিণ ছানা রাস্তা পারাপার হচ্ছে। ছানাগুলি আলো দেখে হতভম্ব হয়ে গেছিল। আলো সরিয়ে নিলে কেবলমাত্র তাদের চোখগুলি জ্বলজ্বল করছিল। আরও কিছুক্ষণ জীপে করে ঘুরবার পর গাইডের কুশলতায় একটি বাইসন নজরে পড়েছিল। বাইসনটি দূরে জঙ্গলের মধ্যে একবার মাথা তুলছিল আবার নামাচ্ছিল বেশিক্ষণ জঙ্গলেতে জীপ থামা নিরাপদ নয় বলে ড্রাইভার জোরে জীপ চালিয়ে দিল। পথে একটি খরগোস ও আরও একটি হরিণ নজরে পড়েছিল। ফেরার পথে দেখলাম হাতি ডাল গাছপালা ভেঙ্গে স্থানে স্থানে বনের মধ্যে তছনছ করেছে কিন্তু দুঃখের বিষয় হাতি দেখতে পাইনি। রাত ১১ টায় ভীষণ ঠাণ্ডার মধ্যে দিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। ঠাণ্ডায় হাত পা যেন জমে যাচ্ছিল। সেইদিন রাতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কেবলই বন্য জন্তুর কথা মনে হচ্ছিল। এই ভ্রমণে ওখানকার স্থানীয় লোকরা ও আমাদেরই একজন বাঙ্গালী বন্ধু যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

পরিণতি

অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়

বয়স ১০½ বছর—গ্রাহক সংখ্যা ১৬১৯

বানরমশাই হয়েছে রাজা
অত্যাচারে যায় যে প্রাণ,
বাঘ, ভাল্লুক, ইঁদুর-বেড়াল
কারুর তো নাই পরিত্রাণ।
একদিন এক শেয়াল এসে
বানরকে কয়, 'নমস্কার,
তোমার তরে ফলের বাগান
ওই ওখানে চমৎকার।'
ফলের লোভে বানর বলে,
'চলো ভায়া, সেথায় যাই,
তোমার মতো বন্ধু আমার
এ দুনিয়ায় দুইটি নাই।'
শেয়াল জানে, 'ফলের গাছে
ব্যাধ গিয়েছে ফাঁদ পেতে,
বানর চলে মহানন্দে,
ফলের নেশায় খুব মেতে।
বাগানেতে এসে বানর
লাফিয়ে ওঠে গাছে,
শেয়াল তখন দাঁড়িয়ে থাকে
ফলের গাছের কাছে।
উপর থেকে বানর বলে
'ফাঁদে পড়ে গেলাম ভাই,
এবার যে মোর রক্ষা পাবার
আর কোনো উপায় নাই।'
শেয়াল বলে, ঠিক হয়েছে
ছিলি যেমন খল,
আমার কাছে হাতেনাতে
পেলি তেমন ফল॥'

(ঈশপের গল্প)

'মোদের গরব মোদের আশা'

অমিতাভ রায় চৌধুরী

গ্রাহক নং—২৮৭৯ বয়স—১১ বছর

ভাষা নিয়ে আজ ভারতের নানা স্থানে গণ্ডগোল বাদানুবাদ হচ্ছে। আমরা গোয়ালিয়রে থাকি—এদিকে বাঙালী ছেলেরা অনেকেই বাঙলা ঠিক মতো বলতে পারে না। পড়া বা লেখাতো অনেক দূরের কথা।

তিন বছর আগের কথা। আমি বাবার সঙ্গে উজ্জয়িনী গিয়েছিলাম। একটা টাঙ্গায় বসেছি,—হঠাৎ আমাদের নিজেদের কিছু কথা শুনে টাঙ্গাওলা বাঙলায় বাবাকে জিগ্যেস করল—'বাবু আপনি বাঙালী?' আমরা অবাক হলাম। পরে নিজের পরিচয় দিয়ে সে বললে সেও বাঙালী, নাম—মহম্মদ হানিফ। বাড়ি হাওড়া জেলার কোনো এক গ্রামে। তার তিন বছর বয়সের সময়, তার বাবার সঙ্গে

উজ্জয়িনী চলে আসে। তার বাবাই তাকে বাড়িতে বাংলা লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন ভাল করেই। কিন্তু প্রায় পাঁচ বছর হল তার বাবা মারা যাওয়ার পর হানিফ বাঙলা বলতে না পেরে ক্রমশঃ ভুলে যাচ্ছে।

তার টাঙায় আমরা অনেকক্ষণ ছিলাম। সমস্তক্ষণই সে বাঙলায় অনেক কথা বলেছিল। আর আমাদেরও তা খুব ভাল লেগেছিল।

হাস্য কৌতুক

উত্তম কুমার বটব্যাল

বয়স—১১ বছর গ্রাহক নং—১৪৮১

শিক্ষক—(রামায়ণ পড়াতে পড়াতে) বল তো লঙ্কা কিসের জন্য বিখ্যাত ?

ছাত্র—ঝালের জন্য স্যর !

আমাদের মাস্টার মশাই

দেবাশীষ মুখোপাধ্যায়

বয়স—১১½ গ্রাহক নং—১৫৬৭

আমাদের জ্যামিতির মাস্টার মশাই সেদিন আমাদের একটি সুন্দর গল্প বললেন। তিনি সেদিন আমাদের থিওরেম শেখাচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন যে আমাদের হয়তো অনেক সময়েই বন্ধুদের সঙ্গে তর্কাতর্কি হয়ে থাকে। অনেকে জেতে গলাবাজির জোরে, আবার অনেকে প্রমাণ দেখিয়ে অপর পক্ষকে শান্ত করে দেয়। এই প্রসঙ্গে যে গল্প তিনি বললেন তা যতই ছোট হোক না কেন, তবু খুব সুন্দর।

এক দেশে বাস করতেন এক বৈজ্ঞানিক ও একজন ভগবানের অনুরাগী বৃদ্ধ। তাঁরা দু'জনেই খুব বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁদের দু'জনের মধ্যে খুব বন্ধুত্বের পরিচয় পাওয়া যেত। কিন্তু তাদের মধ্যে গরমিল যে কিছু ছিল না—তা নয়। বৈজ্ঞানিক ভগবানকে মানত না। এই বিষয় নিয়েই হত তুমুল তর্কাতর্কি। বৃদ্ধ তাকে কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারেন না যে ভগবান আছেন। অবশেষে বৈজ্ঞানিক বললেন—'ঠিক আছে প্রমাণ কর। যেদিন তুমি সঠিক ভাবে প্রমাণ করতে পারবে—সে দিনই আমি বিশ্বাস করব।' বৃদ্ধ অনেক ভাবলেন—কি করে প্রমাণ করা যায়। শেষে, তাঁর অসামান্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে বৃদ্ধ একটা সুন্দর যন্ত্র তৈরি করলেন। সেটা আর কিছুই নয়—সৌরমণ্ডলীর একটা ছোট সংস্করণ। তাতে দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের পাশ দিয়ে, এবং আকাশে অনেক তারা ইত্যাদি।

যন্ত্রটি তৈরি করা শেষ হলে তিনি সেটাকে চালু করে দিলেন। বিকালবেলায় বৈজ্ঞানিক যখন তাঁর বাড়িতে এলেন তখনই তাঁর যন্ত্রটির উপর নজর পড়ল। তিনি বেশ কিছুক্ষণ যন্ত্রটির উপর এক

দৃষ্টে চেয়ে দেখে তারপর বললেন—'বাঃ বেশ সুন্দর জিনিস তো। চমৎকার দেখতে। কিন্তু এটা তৈরি করল কে?' 'কেউ না।' জবাব দিলেন বৃদ্ধ। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তা বিশ্বাস করবেন কেন? তিনি বললেন—'নিশ্চয় কেউ করেছে। না হ'লে এটা এখানে আসবে কি করে'? 'বললাম তো কেউ করে নি আপনা আপনিই এসে গেছে।' স্পষ্ট অবিশ্বাসের সুরে বৈজ্ঞানিক বললেন—এ হতেই পারে না, নিশ্চয় এটা কেউ করেছে। বল না কে করেছে?—ভগবান। মধুর কণ্ঠে জবাব দিলেন বৃদ্ধ —এঁ্যা, ভগবান। কি ব'লছ তুমি।

—ঠিকই বলছি। এটা কেন, বাস্তব পৃথিবীটাকেই তিনি করেছেন। এটা তো একটা খেলনা মাত্র। এটার যদি একজন স্রষ্টিকর্তা থাকতেই হবে, তা হলে এতবড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, তার একটা স্রষ্টিকর্তা নেই বলতে চাও? কিহে বল বিশ্বাস হয়েছে কি যে ভগবান আছেন? বল, উত্তর দাও।

—হঁ্যা, ভগবান আছেন। গম্ভীর ভাবে উত্তর দেন বৈজ্ঞানিক। এবং তিনি এই পৃথিবীর প্রতিষ্ঠাতা।

'আচ্ছা জব্দ'

সুলেখা ঘোষ

গ্রাহক নং—১২৪৮ বয়স—১২ বৎসর ৯ মাস

টম আর মম। না দুই বোন নয় কিন্তু দুই বন্ধুও নয়। টম হচ্ছে মমের কুকুর। ১০ বছরের ছোট্টমেয়ে মম আর ৫ মাসের খুদে কুকুর টম। খুব ভাব দুটিতে। সব সময় টম আর মম একসঙ্গে থাকে। মম যখন স্কুলে যায় তখন টম মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়ায় আর ভাবে কখন মম বাড়ি আসবে। মমের মা ওদের নাম দিয়েছেন 'মাণিক জোড়'।

সুন্দর দেখতে টম। সাদা ফট্‌ ফটে লোমে সারা শরীর ঢাকা। ঘাড়ের লোমগুলো যখন হাওয়ায় ওড়ে তখন দেখতে ভারি সুন্দর লাগে। তার লম্বা লম্বা কান আর ছোট্ট শরীর। টম যখন চলে তখন মমের ভারী মজা লাগে আর যখন দৌড়ায় তখন তো কথাই নেই। রোজ বিকেলে মম যখন স্কুল থেকে বাড়ি ফেরে টম তখন ফটকের ধারে বসে থাকে। মম আগে তাকে আদর করে তবে বাড়িতে ঢোকে। কোনো রকমে স্কুলের পোশাক ছেড়ে, জল খাবার খেয়েই মম টমকে নিয়ে বেড়াতে যায়। কোন কোন দিন বাগানে গিয়ে বল খেলে। মম বল ছুঁড়ে দেয়, 'টম, ছুটে যাও।' অমনি টম তিন লাফে গিয়ে বল কুড়িয়ে আনে। তখন আর তার বীরত্ব দেখে কে!

সেদিন বিকেলে স্কুল ছুটি হল। মম ভাবতে ভাবতে চল্ল আজ টমকে নিয়ে কোথায় যাওয়া যায়? হঁ্যা, পার্কেই যাবে আজ। ভাবতে ভাবতে মম বাড়িতে এসে গেল। গেটের ধারে টম বসে ছিল। তাকে দেখেই ছুটে গেল। টমকে আদর করে ওকে নিয়ে মম বাড়িতে ঢুকল।

পার্কে ঢুকে মম টমের গলার চেন ধরে আস্তে আস্তে ঘাসের উপর দিয়ে চলতে লাগল। না, ভারি দুষ্টু হয়েছে টম। মোটেই হাঁটতে চাইছে না। 'টম, কি হচ্ছে?' ধমক দিল মম। ধমক খেয়ে

টম আবার গুটি গুটি চলতে শুরু করল। হঠাৎ পেছন থেকে কে ডাকল, 'এই মম।' পিছন ফিরে তাকাল মম। ওমা থুকু যে। 'আয় আয় কখন এলি?' এইত ঢুক্ছি ত। তোর টমের খবর কি?' বলল থুকু। মম বলল, 'দেখকেই তো পাচ্ছিস। তা চল ও বেঞ্চটায় গিয়ে বসি।'

দুই বন্ধু খুব গল্প করতে লাগল। আর এদিকে কখন যে মম গল্পে মত্ত হয়ে টমের চেন ছেড়ে দিয়েছে তা তার খেয়ালই নেই। সন্ধ্যা হয়ে এল। মম উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চল এবার বাড়ি ফেরা যাক।' হঠাৎ তার টনক নড়ল, 'টম! টম কোথায়!' খোঁজ খোঁজ। এদিক, ওদিক, সারা পার্ক তন্ন তন্ন করে খুঁজল তারা, কোথাও টম নেই। অগত্যা মম বাড়িতেই ফিরে এল। গোটা বাড়ি খুঁজে দেখল, কোথাও টম নেই। টমকে ডেকে ডেকে সারা হয়ে গেল মম। বাড়ির কেউ টমের খবর বলতে পারল না। ভাবতে ভাবতে কোনো উপায় না দেখে মম শেষে কান্না শুরু করে দিল, 'বাবা, কাকা, যেখানে পার টমকে খুঁজে আন। তার কান্নায় বাড়ি শুদ্ধ লোক ব্যস্ত হয়ে উঠল। অগত্যা বাবা গাড়ি নিয়ে বেরুলেন, মমও কাকার সঙ্গে স্কুটারে চেপে বেরিয়ে পড়ল টমের খোঁজে। দ্বারোয়ান পাড়ার অলিগলিগুলোতে খুঁজে বেডাতে লাগল। রাস্তায় কোনো কুকুর দেখলেই মম ভাবে এই বুঝি তার টম। কিন্তু না এতো টম নয়, শেষে হতাশ হয়ে তারা রাত্রি সাড়ে দশটার সময় বাড়ি ফিরে এল, এসে দেখে বাবা অনেক আগেই ফিরেছেন, দ্বারোয়ানও ফিরে এসেছে। মম তাই দেখে কাকাকে ধরে বসল, 'ওরা নিশ্চয়ই ভালো করে দেখেনি। তা না হলে ওরা এত তাড়াতাড়ি ফিরল কি করে? চল কাকু আমরা আবার অন্য রাস্তায় খুঁজতে যাই।' অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে কাকু বললেন, 'আজ অনেক রাত হয়ে গেছে। আবার কাল সকালে দেখা যাবে।' মমের কিন্তু মনে মনে ভারি রাগ হল। মা বললেন, 'মম খেতে এস, অনেক রাত হয়ে গেছে', 'না আমি খাব না' বলে মম রাগ করে শোবার ঘরে চলে গেল। আলো না জ্বেলে অন্ধকারেই গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। কিন্তু পাশ ফিরতেই নরম নরম কি যেন পায়ে ঠেকল, যেন কিসের লোম বলে মনে হল। অগত্যা মম বিছানা ছেড়ে উঠে আলোর সুইচ টিপল। আলো জ্বালতেই তো চক্ষু স্থির। সাদা ফটফটে চাদরের উপর সাদা ফটফটে টম কুণ্ডুলি পাকিয়ে শুয়ে মনের সুখে ঘুমাচ্ছে। এতক্ষণে মমের মুখে হাসি ফুটল। খুব জব্দ করেছে টম আজ তাকে।

এসপেরান্তোর কথা

মুকুর দাশগুপ্ত

বয়স—১৭ই। গ্রাহক নং—২১৯৫

উনবিংশ শতাব্দীতে পোল দেশের বিয়ালিস্তক শহরে পাঁচটা ভাষা চ'লত—জার্মান, রুশ, পোলীয়, য়িডিশ ও লিথুয়ানীয় ভাষা। ফলে ভাষা-সমস্যা দেখা দিয়েছিল তীব্ররূপে। প্রায়ই দাঙ্গা-হাঙ্গামা হ'ত, বিশেষ ক'রে য়িডিশ-ভাষী ও পোলীয়-ভাষী অধিবাসীদের মধ্যে।

সেই শহরে ৮৯৫ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে জন্মালেন লাজারুস লুদোভিক জামেনহফ। তিনি নিজের পারিপার্শ্বিক দেখে-শুনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে পৃথিবীর সমস্ত বা বেশীর ভাগ

লোক একটা সাধারণ ভাষা বলতে ও বুঝতে পারলে সবারই বেশ সুবিধে হত। তাই তিনি লেগে গেলেন কাজে—পুরোপুরি নিয়ম-বাঁধা, শ্রুতিমধুর, দ্ব্যর্থব্যঞ্জক নয়, নিরপেক্ষ অথচ শেখা সহজ এমন এক ভাষা উদ্ভাবন করার কাজে—১৮৭৮ সালে। কথাগুলো ধার নিলেন ইংরেজি, ফরাসী, স্পেনীয়, জার্মান ও লাতিন ভাষা থেকে। তাছাড়া উপসর্গ, প্রত্যয় ইত্যাদি দিয়ে কথা তৈরি করার বিষয়ে কোনো নিয়ম না থাকায় মাত্র হাজার-তিনেক "মৌলিক" শব্দ দিয়ে সমস্ত কাজই চলে। "দোকতোরো এসপেরান্তো" ("ডাক্তার আশাবাদী") ছদ্মনামে তাঁর লেখা "একটি আন্তর্জাতিক ভাষা" বইটা প্রকাশিত হল ১৮৮৭ সালের জুলাই মাসে ওয়ারস শহরে।

একটা নমুনা দিচ্ছি :

Jurnalisto iam demandis al Einstein : "Cu vi povas antaudiri, kiajn armilojn oni uzos en tria mondmilito ?" Li respondis : "Ne, sed mi ja povas antaudiri, kiajn armilojn oni uzos en kvark mondmilito—rokojn kaj bastonojn !"

বাঙলা অনুবাদ :

একজন সাংবাদিক একদা আইনস্টাইনকে জিগ্যেস ক'রলেন, "আপনি কি আগে থেকে বলতে পারেন, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে কী ধরনের অস্ত্র ব্যবহৃত হবে ?" তিনি উত্তর দিলেন, "না, কিন্তু আমি নিশ্চিত-ভাবেই আগে থেকে বলতে পারি, চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধে কী ধরনের অস্ত্র ব্যবহৃত হবে—পাথর আর লাঠি !"

জন্মের অব্যবহিত পরেই এসপেরান্তো তার সবরকম প্রয়োজন মেটাবার আশ্চর্য ক্ষমতা দেখিয়ে বিশ্ব স্বীকৃতি পেয়েছে ; আজ পৃথিবীতে এসপেরান্তিস্তদের সংখ্যা নিযুতের ঘরে। বিশ্বের নানা দেশের ১০০টি বেতার-কেন্দ্র থেকে এসপেরান্তো অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। অনুবাদে ও মূলে এসপেরান্তোর সমৃদ্ধিশালী সাহিত্য গড়ে উঠেছে। ইংরেজী, ফরাসী ও অন্যান্য স্বাভাবিক ভাষার মতো এসপেরান্তোয় বানান ও উচ্চারণের মধ্যে কোনো গরমিল নেই। প্রত্যেক দেশে এসপেরান্তো প্রচারের জন্য সংগঠন র'য়েছে।

আমি প্রস্তাব করছি যে "সন্দেশে"র পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে যারা কলকাতায় থাকো এবং এ ব্যাপারে উৎসাহী তাদের নিয়ে একটা ক্লাব সংগঠিত করা হোক। তার উদ্দেশ্য হবে সভ্যদের এসপেরান্তোর ওপর দখল আর বাকি পৃথিবী সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়ানো। এ-কাজ করা হবে সভা-সমিতি ডেকে তাতে এসপেরান্তোয় কথা-বার্তা বলা অভ্যেস ক'রে পৃথিবীর অন্যান্য সংগঠনের মধ্যে দিয়ে জোগাড় করা পত্রবন্ধুদের সঙ্গে চিঠিপত্র চালাচালি করে ইত্যাদি।

চৈত্র মাসের ধাঁধার উত্তর

(১)

তানিয়া দাশ—গ্রাহক নং ১৯২৩, বয়স ৯ বছর ৩ মাস

উত্তর—বেল।

(২)

অনন্যা সরকার—গ্রাহক নং ১৩৬১, বয়স ১১ বছর ৮ মাস

উত্তর—দাঁত।

(৩)

তপন কুমার বসু—গ্রাহক নং ১৫০১, বয়স ১৪ বছর ৬ মাস

(১) প্রথম ৮-সেরি পাত্রে ভর্তী দুধ আছে, দ্বিতীয় ৫-সেরি ও তৃতীয় ৩-সেরি পাত্র খালি।

(২) প্রথম পাত্র থেকে দ্বিতীয় ও দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় পাত্র ভর্তী করলাম—প্রথমে দুধ রইল ৩-সের দ্বিতীয়ে ২ এবং তৃতীয়ে ৩।

(৩) তৃতীয় পাত্রের দুধটা প্রথমে ও দ্বিতীয়েরটা তৃতীয়ে ঢাললাম—এখন প্রথমে দুধ রইল ৬, দ্বিতীয় খালি ও তৃতীয়ে ২-সের।

(৪) প্রথম পাত্র থেকে দ্বিতীয় এবং দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় ভর্তী করলাম—প্রথমে দুধ রইল ১ সের দ্বিতীয় পাত্রে ৪ ও তৃতীয়ে ৩ সের।

(৫) এবার তৃতীয় পাত্রের দুধটা প্রথম পাত্রে ঢাললাম—প্রথম ও দ্বিতীয় পাত্রে দুধ রই চার-সের ও চার সের।

কাক

রবীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য

কাক রে, ওরে কাক,
সাবাশ! কি তোর ডাক!
মিষ্টি করে ডাকলে পরে
কেউ কি কথা শোনে?
থাকুক কাছে, থাকুক পাশে,
থাকুক ঘরের কোণে।

কাক রে, ওরে কাক,
করলি হতবাক!
ছোঁ মেরে না খেলে পরে
দেয় কারে কেউ খেতে?
এ জগতে পায় না কিছুই
রয় যারা হাত পেতে।

কাক রে, ওরে কাক,
ধন্যি হয়ে থাক।
গলার জোরে, গায়ের জোরে
এবং চালাকিতে
হতে পারিস কেওকেটা কেউ
এই দুনিয়াটিতে।

অজয় হোম

কলকাতার মাঠে হকি লীগ শেষ হল। বেটন কাপও শেষ হওয়ার পথে। ফুটবল শুরু হয়েছে পাওয়ার লীগ ও আন্তঃ অফিস লীগ খেলা দিয়ে। মে মাসের মাঝামাঝি থেকে আসল লীগ খেলা শুরু। চায়ের দোকানে, বাড়িতে চায়ের টেবিলে, মাঠে ময়দানে এখন শুধু ফুটবলেরই আলোচনা জল্পনা। ইস্ট্‌বেঙ্গল লীগে খেলবে কি খেলবে না। একক লীগই বজায় থাকবে? না, ফিরতি লীগের ব্যবস্থা হবে। ইস্টবেঙ্গলকে কিভাবে খুশি করে খেলতে রাজি করানো যায় তারই চিন্তা কর্তৃপক্ষের।

সিউলে এশিয়ান যুব ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারত যোগদান করেছে। ভারত 'এ' গ্রুপে তাইওয়ান মালয়েশিয়া ও ইস্রায়েলের সঙ্গে খেলবে। ফাইনাল খেলা ১৬ মে।

দক্ষিণ আফ্রিকা মেক্সিকোতে ১৯তম অলিম্পিক গেমসে যোগদান করতে পারবে না এই সিদ্ধান্তই শেষ পর্যন্ত বহাল হল। বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকার যোগদানের জন্য ৫০টি দেশ এই অলিম্পিক বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তার মধ্যে ভারতও ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার মুরুব্বী ছিলেন স্বয়ং অলিম্পিক সভাপতি আভেরি ব্রাণ্ডেজ। তিনি অনেক চেষ্টা করেও দক্ষিণ আফ্রিকাকে ঢোকাতে পারলেন না। কিন্তু আমেরিকার নিগ্রোরা সাদা-কালোর পার্থক্যে যোগদানে একটু আপত্তি তুলে রেখেছে। নিগ্রো এ্যাথলীট জেসি ওয়েন্স চেষ্টা করছেন সম্প্রতি নিহত নায়ক ডঃ মার্টিন লুথার কিং-এর কথা তুলে। বর্জন করলে কিং-এর আদর্শবিরোধী কাজ হবে।

বিল লরীর নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট দল ইংল্যাণ্ড পৌঁছেছে। গত ৪ঠা মে থেকে খেলা শুরু হয়েছে। ১৯৬৪ সালের পর অস্ট্রেলিয়া আবার ইংল্যাণ্ডে এল।

হকি

কলকাতার হকি লীগের গুরুত্বপূর্ণ খেলায় গত ৩ বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ন বি এন রেল দলকে ২-১ গোলে

হারিয়ে ইস্টবেঙ্গল অপরাজেয় কৃতিত্বের সঙ্গে লীগ বিজয়ী হয়েছে। ইস্টবেঙ্গল একটি পয়েন্ট যে হারিয়েছে তা মোহন বাগানের সঙ্গে অমীমাংসিত ভাবে খেলা শেষ করে। একবার যুগ্মজয়ের (কাস্টমস ১৯৬১) হিসেব নিয়ে চারবারের (১৯৬০, ১৯৬৩ ও ১৯৬৪) লীগ বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল এবার নিয়ে ৫ বার লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করল। ইস্টবেঙ্গল ১৯ খেলা, ১৮ জয়, ১ ড্র, ০ পরাজয়, ৩৪ স্বপক্ষে, ২ বিপক্ষে, ৩৭ পয়েন্ট। মোহন বাগান ১৯ খে, ১৫ জয়, ৩ ড্র, ০ পরা, ৪৩ স্বঃ, ১ বিঃ ৩৫ পয়েন্ট। বি এন আর ১৯ খে, ১৫ জয়, ৩ ড্র, ১ পরা, ৪৫ স্বঃ, ৭ বিঃ, ৩৩ পয়েন্ট। লীগ তালিকায় সর্ব নিম্ন স্থান অধিকার করেছে মেসারাস। একটি খেলাও না জিতে কেবল ড্র করে মাত্র ৬ পয়েন্ট পেয়েছে।

বোম্বাইতে গোল্ড কাপ হকি ফাইনালে গত বারের বিজয়ী এয়ার ফোর্স'কে ৩-১ গোলে পরাজিত করেছে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স। প্রথম বারের খেলাতেও বর্ডার সিকিউরিটি দল ১-০ গোলে জয়ী হয়েছিল। সুতরাং দু বারের খেলায় বর্ডার সিকিউরিটির মোট গোলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪-১ গোল। এয়ার ফোর্স দল তাদের সুনাম অনুযায়ী এবার মোটেই খেলতে পারেনি।

টেনিস

আসামে গৌহাটিতে অনুষ্ঠিত ডেভিস কাপ সেমি ফাইন্যালে ভারত ৩-২ খেলায় সিংহলকে হারিয়ে পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে উঠল। গত বার ভারত সিংহলকে হারিয়েছিল ৫-০ খেলায়। সিঙ্গলস্—জয়দীপ মুখার্জি (ভারত) ৫-৭, ৬-৪, ৬-৩, ৬-২ সেটে পি এস কুমারকে (সিংহল) পরাজিত করেন। শ্যাম মিনোত্রা ৬-২, ৫-৭, ৬-২, ৬-৮, ৮-৬ গেমে ফার্ডিনাণ্ডসকে (সিংহল) হারান। ফার্নানডেজ (সিংহল) ভারতের অমৃত রাজকে হারান ৭-৫, ৬-২, ৪-৬, ১-৬, ৯-৭ গেমে। কুমারা হারান ভারতের শ্যাম মিনোত্রাকে ৬-২, ৬-১, ২-৬, ৬-০ সেটে। ডাবলস্—গৌরব মিশ্র ও আনন্দ অমৃতরাজ (ভারত) ৬-৪, ৬-৪, ৬-৪ স্ট্রেট সেটে কুমারা ও আর ডব্লু ফার্ডিনাণ্ডসকে (সিংহল) পরাজিত করেন।

ব্যাডমিনটন

ইডেনের ইনডোর স্টেডিয়ামে পূর্ব ভারত ব্যাডমিটন চ্যাম্পিয়ানশিপের ফাইনালে সিঙ্গলস ও ডাবলসে জয়লাভ ক'রে দীপু ঘোষ দ্বি-মুকুট লাভ করেন। ভেবেছিলাম দীনেশ খান্না কিছুটা লড়বে। প্রথম গেমে খানিকটা চেষ্টা করলেও দ্বিতীয় সেটে দাঁড়াতেই পারল না। পুরুষ সিঙ্গলস্—দীপু ঘোষ ১৫-১১, ১৫-৩ পয়েন্টে দীনেশ খান্নাকে হারান। পুরুষ ডাবলস্—দুই ভাই দীপু ও রমেন ঘোষ ১৫-১২, ১৫-৯ পয়েন্টে দেওরাশ ও সুরেশ গোয়েলকে পরাজিত করেন। মিক্সড ডাবলস্—সতীশ ভাটিয়া ও দীপা চ্যাটার্জি ১৫-১২, ১৫-৯ পয়েন্টে অনিল সোন্ধী ও তুলসী ব্যানার্জিকে পরাজিত করেন।

কালিফোর্নিয়া ওকল্যাণ্ড-এ বিশ্ববক্সিং অ্যাসোসিয়েশন অনুমোদিত বিশ্ব হেভীওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় কেসিয়াস ক্লে-র লড়াইয়ের সহযোগী জিমি এলিস ১৫ রাউণ্ডের লড়াইয়ে জেরি কোরিকে পয়েন্টে হারিয়েছেন। তোমাদের মধ্যে অনেকের হয়তো মনে আছে যুদ্ধের চাকরিতে যোগদানে রাজি না হওয়াতে বিশ্ব বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন কেসিয়াস ক্লে-র বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান খেতাব কেড়ে নেন। কিন্তু আমেরিকায় এবং তার বাহিরেও অনেকে ক্লে-কে এখনও বিশ্ববিজয়ী বলে ভাবেন।

ক্রিকেট

সি এ বি পরিচালিত সকালবেলায় আন্তঃস্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। গত বছর যোগদানকারী দলের সংখ্যা ছিল ৪০ ; এ বছর ৫টি বেড়ে ৪৫টি। ৯টি বিভাগে ভাগ করে খেলা হচ্ছে।

সিএবি ক্রিকেট লীগ চ্যাম্পিয়ন হল এ বছর স্পোর্টিং ইউনিয়ন ইস্টার্ন রেলকে ৭ উইকেটে হারিয়ে। ৯ বছর পরে স্পোর্টিং ইউনিয়ন এই সম্মান আবার অর্জন করল। ১৯৫৭-৫৮ সালে সর্বপ্রথম চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। ইস্টার্ন রেল—২৯৯ (এডমণ্ড ৮৫, এ ভট্টাচার্য ৫৪ ; সুব্রত গুহ ৮০ রানে ৩, ডি ঘোষ ৫০ রানে ৩ উই:)। স্পোর্টিং ইউনিয়ন—৩ উই: ৩০০ (পঙ্কজ রায় ১২৫ নট আউট, অম্বর রায় ৯১)।

ইডেনে সিএবি নক-আউট ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলায় কালীঘাট ৩১ রানে স্পোর্টিং ইউ-নিয়নকে হারিয়ে দ্বিতীয় বার বিজয়ী হল। ১৯৫৯-৬০ সালে কালীঘাট প্রথম চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে। কালীঘাট —২৬৮ (কে ঘোষ ১০১, পোদ্দার ৪২ ; গুহ ৯৪ রানে ৪, দোশি ৪১ রানে ৪ উই:)। স্পোর্টিং ইউনিয়ন—২৩৭ (অম্বর রায় ৫২, কে গোস্বামী ৩৬, পঙ্কজ রায় ২৪ ; টি জে ব্যানার্জি ২০ রানে ২, ডি সরকার ৮৭ রানে ৩ উইকেট।

একটি খবর

নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি কথা শুনবি টিয়ে ?
একটি শুধু খবর নিয়ে,
পৌঁছে দিবি মায়ের কাছে ?
ঐ আকাশে মা যে আছে।
তোরা তো ভাই অনেক দূরে
আকাশ পথে বেড়াস উড়ে।
আমার যে ভাই বসেই থাকা
তোদের মত নেই তো পাখা।
নয়তো দুটি পাখনা মেলে
তোদের সাথে উড়তে পেলে

নিজেই যেতাম দেখতে মাকে,
নীল আকাশে মেঘের ফাঁকে
ঐ যেটাকে 'স্বগ্‌গো' বলে,
তারারা সব দলে দলে
রাতে যেখানটাতে ফোটে,
ঐ যেখানে চাঁদটি ওঠে
মা তো থাকে ওখানটাতেই।
বলবি গিয়ে কী বলে দেই :
দুষ্টু তোমার ছেলেটি রোজ
ইস্কুলে যায়, নাও তুমি খোঁজ ?

সহস্র বুদ্ধের গুহা

অভু রায়

১৯০৬ সাল। ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের গিরিখাত দিয়ে মধ্য-এশিয়ায় প্রবেশ করে আরল স্টীন তুন্-হোয়াংএর দিকে যাত্রা করলেন। ঠিক তুন্-হোয়াং নয়, তাঁর আসল লক্ষ্য চিয়েন-ফো-তোং অর্থাৎ সহস্র বুদ্ধের গুহা।

অরেল স্টীন একজন পুরাতত্ত্ববিদ। কোনো দেশের হারিয়ে যাওয়া পুরনো ইতিহাসকে খুঁজে বের করাই হচ্ছে পুরাতত্ত্ববিদের কাজ। ভারত সরকার স্টীনকে পাঠিয়েছে মধ্য এশিয়ার প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধানের জন্য।

চীন দেশের পশ্চিম সীমান্তে গোবি মরুভূমির এক ধারে তুন্-হোয়াং একটি বড় মরুদ্যান। প্রাচীন কাল থেকে তুন্-হোয়াং নামকরা বাণিজ্য কেন্দ্র। তুন্-হোয়াং এর কাছেই পাহাড়। এই পাহাড়ে আছে কয়েক শো গুহা। সাধারণ গুহা নয়। এগুলো ছিল বৌদ্ধ গুহা মন্দির। চার থেকে এগারো শতক পর্যন্ত এখানে একটি জমজমাট বৌদ্ধ শিক্ষা কেন্দ্র ছিল। এক হাজার বুদ্ধ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করায় এর নাম হয়—সহস্র বুদ্ধের গুহা।

কি দুর্গম রাস্তা!

শত শত মাইল উঁচু ধু ধু প্রান্তর। গাছ নেই, ঘাস নেই, জল নেই। নেড়া পাহাড়ের সারি। পথে পড়ে দুই ভয়ঙ্কর মরুভূমি—প্রথমে তাকলামাকান, তারপর গোবি। দিনের পর দিন মানুষ জন পশুপাখি কিছুই চোখে পড়ে না। অনেক দূরে দূরে একটা ছোট গ্রাম বা সহর।

মধ্য এশিয়ার এমন দুরবস্থা কিন্তু চিরকাল ছিল না।

প্রায় পনের শো বছর আগে এখানে অনেকগুলি সমৃদ্ধিশালী রাজ্য গড়ে উঠেছিল। তখন এখানকার আবহাওয়াও এত শুকনো হয়ে যায়নি। জল ছিল। ভাল চাষ-আবাদ হত।

এই রাজ্যগুলিতে ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। তাছাড়া ভারতের শিল্প, সাহিত্য ও ভাষাও সেখানে প্রভাব বিস্তার করে। নালান্দা বিক্রমশিলার মতো বৌদ্ধবিহার, অজন্তার মতো গুহামন্দির তৈরি হয়। নগরগুলি ধ্বংস হয়ে যায় দুটি কারণে—তুর্কী মুসলমানদের আক্রমণে এবং মরুভূমি আরও এগিয়ে আসার ফলে। ক্রমে বৌদ্ধ ধর্মও মধ্য এশিয়া থেকে লোপ পেল। বাইরের জগতের কাছে এখানকার সভ্যতার ইতিহাস একেবারে মুছে গেল।

যুগ যুগান্তর পরে আজ স্টীনের এর মতো কয়েকজন এগিয়ে এসেছেন এ দেশের পুরনো ইতিহাস খুঁজে বের করতে। এর আগেও একবার স্টীন মধ্য এশিয়ায় এসেছিলেন।

সহস্র বুদ্ধের গুহা সম্বন্ধে প্রথম তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন খনিজতত্ত্ববিদ প্রফেসর লকজাই। ১৮৭৯ সালে প্রোঃ লকজাই এক অভিযাত্রী দলের সঙ্গে গোবি মরুভূমিতে এসেছিলেন। তিনি সহস্র বুদ্ধের গুহা দেখেছিলেন এবং কয়েকটি গুহার ভিতরে ঢুকেছিলেন। সংখ্যায় নাকি অগুনতি গুহা। প্রতি গুহার দেওয়ালে নাকি অপূর্ব ছবি আঁকা। ভিতরে ছোট বড় মূর্তি। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো পুরাতত্ত্ববিদ সবকটা গুহা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেন নি।

উট আর ঘোড়ার সার এগিয়ে চলেছে। পিঠে জিনিস-পত্র, মানুষ। কয়েকজন লোক যাচ্ছে পায়ে হেঁটে, পথ দেখিয়ে।

খুব সাবধান। একবার পথ হারালে আর রক্ষে নেই। জল আর খাবারের অভাবে নিশ্চিত মৃত্যু। তাছাড়া আছে মঙ্গোল দস্যুদের ভয়। ভাবতে রোমাঞ্চ লাগে একদিন এই পথ বেয়ে যাতায়াত করেছিলেন মার্কো পোলো, ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাংএর মতো কত বিখ্যাত ভ্রমণকারী।

পথে যেতে যেতে কিছু খোঁড়াখুড়ি, অনুসন্ধান চলে। ফলে তুন্ হোয়াং এ পৌঁছতে তাদের বছর গড়িয়ে গেল। সবাই খুব ক্লান্ত। কদিন নরুন্তানের ছায়ায় জিরিয়ে নিয়ে স্টীন সহস্র বুদ্ধের গুহা দেখতে বেরলেন।

মনে মনে স্টীন ভীষণ উত্তেজিত। তুন্ হোয়াংএ একজন মুসলমান ব্যবসায়ী তাঁকে একটা আশ্চর্য খবর শুনিয়েছে। বছর খানেক আগে নাকি স্থানীয় বৌদ্ধপুরোহিত একটি গুহার মধ্যে হঠাৎ এক গুপ্ত কুঠুরীর সন্ধান পায়। ভিতরে দেখা যায় ঘরভর্তি পুঁথি। নানা ভাষায় লেখা। এখন পর্যন্ত পুঁথির স্তূপ কোথাও সরানো হয় নি। পাঠ করাও হয় নি। যেমন ছিল তেমনি রয়েছে। শুধু কুঠুরীর দরজা এঁটে দেওয়া হয়েছে।

খবরটা শুনে পর্যন্ত স্টীনের আর স্বস্তি নেই। ঐ পুঁথির রাশি পরীক্ষা করলে মধ্যএশিয়ার অতীত সম্বন্ধে অনেক কথাই জানা যাবে।

মরুভূমির মধ্যে দিয়ে ন-দশ মাইল হাঁটার পর দূরে দেখা গেল পাহাড়। খাড়া পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য কালো কালো খোপ খোপ, ওপরে নিচে সর্বত্র। যেন একটা প্রকাণ্ড মৌচাক।

আরো কাছে যেতেই গুহামুখগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পাহাড়ের পায়ের কাছ দিয়ে একটি শীর্ণ নদী বয়ে চলেছে। জলের ধারে ধারে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে—এক সারি এল্‌ম্ গাছ। নদীর ধারে একটি ছোট্ট বৌদ্ধ মন্দির। হাল আমলে তৈরি। দরজায় একটা ঘণ্টা ঝুলছে। কেউ থাকে নিশ্চয়। কিন্তু কেউ এগিয়ে এল না তাঁদের দেখে।

সেই নিস্তব্ধ জনশূন্য প্রকৃতির মাঝে দাঁড়িয়ে স্টীন মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে রইলেন—

কাদের, কি বিপুল পরিশ্রমে এই গুহাশ্রেণী তৈরি হয়েছিল? একদিন এই গুহারাজ্যের প্রাণ ছিল। দেশ-বিদেশের বৌদ্ধ ভিক্ষুর পদচিহ্ন পড়ত। তখন ঐ অন্ধকার কক্ষগুলিতে আলো জ্বলত। শাস্ত্রালোচনার মৃদু গুঞ্জন উঠত। কত ধর্মপ্রাণ লোক এখানে জীবনভোর সাধনা করে গেছেন। কিন্তু আজ সব মৃত। অরেল স্টীনের দল ও গুহায় ঢুকে পড়লেন। প্রথমেই নজরে পড়ল দেওয়াল জুড়ে আঁকা ছবি—যাকে বলা হয় ফ্রেস্কো। স্টীন এবং তাঁর সহকারী চিয়াং একের পর এক গুহায় ঘুরতে লাগলেন। বেশীর ভাগ ছবির বিষয়—বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদের জীবনের নানা কাহিনী।

সহস্র-বুদ্ধ অজন্তার সমসাময়িক। এর পিছনে অজন্তার অনুপ্রেরণা ছিল সন্দেহ নেই। অনেক গুহা ধ্বসে পড়েছে। অনেক ছবি নষ্ট হয়ে গেছে। তবুও এখনও যা টিকে আছে তা দেখে শেষ করা যায় না। আনাচে কানাচে বেদির উপর বহু মূর্তি। প্রত্যেক গুহায় একটি উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি দেখা গেল। কোনোটি আকারে বিরাট। এই রকম এক হাজার বুদ্ধমূর্তি ছিল। বুদ্ধকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন বোধিসত্ত্ব এবং ভক্ত শিষ্যরা।

একটী বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলেন স্টীন। ছবি ও মূর্তিতে চীনা, ভারতীয়, পারসিক, তিব্বতী—ইত্যাদি নানা দেশের শিল্পধারা এসে মিশেছে। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বরা কোথাও চীনা কায়দায় ঢিলে-ঢালা পোষাক পরা, কোথাও কুষাণ যোদ্ধার বেশ—গায়ে বর্ম পায়ে বুট। বেশির ভাগ চেহারা মঙ্গোলিও—গোল চাপা মুখ, বাঁকা চোখ। আবার ভারতীয় চেহারা ও পোষাকও দেখতে পেলেন, ছবির রঙ ও রেখা এখনও কি চমৎকার।

হঠাৎ কোত্থেকে এক অল্পবয়সী ভিক্ষু এসে তাঁদের সঙ্গে জুটে গেলেন। তিনি নাকি ছোট পুরোহিত। গুহার সামনে মন্দিরে থাকেন। প্রধান পুরোহিত এখন অনুপস্থিত। ফিরবেন ক'দিন পরে।

স্টীনের মনে কিন্তু সেই গুপ্ত কুঠুরীর কথা ক্রমাগত পাক খাচ্ছে, কিন্তু প্রধান পুরোহিত ফিরে না এলে কোনো উপায় নেই, কারণ তিনিই হচ্ছেন গুহার রক্ষক।

ছোট পুরোহিত বললেন তিনি ফিরে আসুন তখন দেখা যাবে। আপাততঃ স্টীন কাছাকাছি দু-একটা ধ্বংসাবশেষ দেখবেন বলে তুন-হোয়াং ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন।

স্টীন সহস্র বুদ্ধে ফিরে এলেন মাস দুই বাদে।

পাহাড়ের সামনে তাঁদের তাঁবু পড়ল। একটা জিনিস স্টীন স্পষ্ট বুঝেছিলেন পুঁথি পরীক্ষা করা বা সঙ্গে নিয়ে যাওয়া মোটেই সোজা ব্যাপার হবে না। স্থানীয় গোঁড়া বৌদ্ধরা হয়তো বেঁকে বসবে। বিদেশী বিধর্মীকে পবিত্র পুঁথিপত্র হাত দিতে দেওয়াতে আপত্তি জানাবে ; কাজেই খুব সাবধানে এগোনো দরকার।

ইতিমধ্যে প্রধান পুরোহিত ওয়াং ফিরেছেন। স্টীন এবং সহকারী চিয়াং পরামর্শ করতে থাকেন কি কায়দায় পুরোহিতকে ভজাবেন।

ওয়াং ভীতু প্রকৃতির লোক। প্রথমেই সে সরাসরি না করে দিল। পুঁথি দেখানো? ও আমার দ্বারা হবে না। খবরটা কানে গেলে শিষ্যরা ক্ষেপে যাবে। তাছাড়া বিধর্মীকে ঐ সব পবিত্র শাস্ত্র দেখানোও উচিত নয়।

ভেবেচিন্তে স্টীন অন্য পন্থা ধরলেন।

একদিন কথায় কথায় ওয়াংকে বললেন—শুনেছি পুরোহিত নাকি একটা গুহা মেরামত করেছেন। যদি আমাকে গুহাটা একবার দেখাতেন?—

ওয়াং তৎক্ষণাৎ রাজি। এই গুহা সম্বন্ধে ওয়াংএর দুর্বলতার কথা স্টীন জানতেন।

আটবছর আগে দরিদ্র অশিক্ষিত শ্রমন ওয়াং তাও-শি দূর গাঁ থেকে এসে নির্জন সহস্রবুদ্ধে বাসা বাঁধেন। তথাগতের সেবার বাসনায় তিনি একটী গুহা সংস্কার করতে লেগে যান।

নেই লোক বল, নেই অর্থবল, আছে শুধু কঠোর অধ্যবসায়। মাঝে মাঝে শিষ্যদের কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে ভিক্ষে করে কিছু অর্থ যোগাড় করে আনেন, আর সামান্য-কটি মজুর ও ভক্তের সাহায্যে কাজ করে যান। গুহাটা পাথর আর বালিতে একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কয়েক বছর অমানুষিক পরিশ্রম করে সামান্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও মেরামত করা হয়। এই কাজ চলতে চলতেই হঠাৎ এক'দিন আবিষ্কার হয় গুহার দেওয়ালে একটা গুপ্ত দরজা।

এত সাধের গুহাটা নিয়ে ওয়াংএর বেজায় গর্ব। কেউ এ বিষয়ে কিছু উৎসাহ দেখালেই খুশিতে ডগমগ হয়ে পড়েন।

ওয়াং ঘুরে ফিরে গুহাঘরের ভিতরটা দেখালেন। এইখানটা ভাঙ্গা ছিল। এই ছবিগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কত কষ্টে একটু একটু করে সমস্ত সারিয়েছেন। স্টীনের দৃষ্টি বার বার আটতে যাচ্ছে একটা দেওয়ালের গায়ে। পাথরের দেওয়ালে ঐযে বড় ফুটো, ইট গেঁথে বন্ধ করা হয়েছে—ঐ হচ্ছে গুপ্ত কুঠুরীতে ঢোকবার রাস্তা। মাত্র কয়েক হাত দূরে।

হঠাৎ এক ফন্দী জাগে মাথায়। একবার হিউয়েন সাংকে স্মরণ করে দেখা যাক। বহুবার তিনি প্রমাণ পেয়েছেন, এখানকার বৌদ্ধরা বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন-সাংকে অত্যন্ত ভক্তি করে। তার জীবনের কথা

বলতে বা শুনতে ভীষণ ভালবাসে।

কথায় কথায় তিনি হিউয়েন-সাংএর প্রসঙ্গ টেনে আনলেন। ভাঙা ভাঙা চীনায় বললেন—তিনি নিজে হিউয়েন-সাংএর পরম ভক্ত। যে পথে হিউয়েন-সাং ভ্রমণ করেছিলেন সেই পুণ্য রাস্তা অনুসরণ করাই তাঁর জীবনের লক্ষ্য। সেই পথ ধরেই দূর ভারতবর্ষ থেকে কত পাহাড় নদী, মরুভূমির বাধা অতিক্রম করে তিনি আজ এখানে এসেছেন।

শুনতে শুনতে পুরোহিতের চোখ চকচক করে ওঠে। বোঝা গেল ওষুধ ধরেছে।

ওয়াং তাদের গুহার দেয়ালে আঁকা কয়েকটা ছবি দেখালেন। স্থানীয় চিত্রকরকে দিয়ে তিনি ছবিগুলো আঁকিয়েছেন—হিউয়েন-সাংএর জীবনের অনেক অলৌকিক কাহিনীর ছবি।

কোথাও একটা ভয়ঙ্কর ড্রাগন হিউয়েন-সাংএর ঘোড়া আস্ত গিলে ফেলছে—আবার পরক্ষণেই সেই মহাপুরুষ দৈব ক্ষমতাবলে ঘোড়াকে ড্রাগনের পেট থেকে জ্যান্ত টেনে বের করে আনছেন। এমনি সব উদ্ভট ব্যাপার।

স্টীন ঘন ঘন মাথা নাড়লেন। তারিফ জানালেন। ভান দেখালেন যেন এ সব গল্পে তাঁর সত্যিই কত বিশ্বাস।

এতে ওয়াংএর হৃদয় কিঞ্চিৎ ভিজেছে বলে মনে হল।

এইবার তৎক্ষণাৎ চিয়া তাঁকে ধরে বসলেন—পুঁথি দেখাতে হবে। বেশ দরজা না খোলেন, অন্ততঃ বাইরে তাঁর নিজের কাছে যে কয়েকটা পুঁথি আছে সেগুলো দেখান।

পুরোহিত মহা সমস্যায় পড়েন। আজ নয় কাল বলে দিন নিচ্ছেন। শেষটায় রাজী হন।'

গভীর নিস্তব্ধ রাত। তাঁবুতে শুয়ে স্টীন ছটফট করছেন। কি জানি দেবে তো শেষ পর্যন্ত? সহসা পর্দা ঠেলে ঢুকলেন চিয়াং—বগলে এক পুঁথির তোড়া। রাতের আঁধারে ওয়াং তাঁর হাতে পুঁথিটা লুকিয়ে এনেছেন।

চীনা অক্ষরে লেখা। চীনা ভাষায় স্টীনের জ্ঞান অতি সামান্য। সুতরাং চিয়াংকে দিলেন সেটি পড়তে।

পরদিন সকালে চিয়াং এসে হাজির। তার চোখ মুখ জ্বল জ্বল করছে।

—কি হে, পারলে পড়তে?

কিছুটা। একটা বৌদ্ধ শাস্ত্রের অনুবাদ। কিন্তু অনুবাদক কে জানেন? স্বয়ং হিউয়েন-সাং! শেষ পৃষ্ঠায় অনুবাদক হিউয়েন-সাং এর নাম লেখা রয়েছে।

—অসম্ভব নয়। হিউয়েন-সাং ভারতবর্ষ থেকে একগাদা বৌদ্ধশাস্ত্র নিয়ে আসেন। হয়তো চিয়েন-ফো-তোংয়ে বসে কিছু বই অনুবাদ করেন। তারই একটা পাওয়া গেছে।

এমন অদ্ভুত যোগাযোগটা কাজে লাগাতে হয়। ওয়াং নিশ্চয় দেখে শুনে দেননি। এ বস্তু পড়ার বিদ্যে তাঁর নেই। দৈবাৎ হাতে উঠে এসেছে। চিয়া তাই তৎক্ষণাৎ ছুটলেন খবরটা জানাতে।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এলেন—ব্যস্, কেল্লা ফতে। ওয়াংএর দ্বিধা সঙ্কোচ সব উবে গেছে। চিয়াংএর কথায় তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে এর পিছনে নির্ঘাৎ মহাপুরুষ হিউয়েন সাংএর নির্দেশ আছে। তাঁর ইচ্ছে তথাগতের দেশ থেকে যে ভক্ত এসেছে তার সামনে রুদ্ধদ্বার খুলে দেওয়া তাকে দেখতে দেওয়া সমস্ত পুঁথি পত্র।

এই অমোঘ নির্দেশ অমান্য করবেন তেমন বুকের পাটা ছিল না ওয়াংএর। তিনি দরজার ইট খুলতে শুরু করে দিলেন।

নিচু সুড়ঙ্গ পথ। সামনে চলেছেন ওয়াং, হাতে প্রদীপ। ছোটঘর, গহ্বরই বলা যায়। মৃদু আলোর

ভিতরে উঁকি মেরে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

অসংখ্য পুঁথি ক হাজার কে জানে। গোল করে গুটোনো, সরু মোটা বাণ্ডিল। মেঝের ওপর যেমন তেমন করে টাল করা, ছাদ অবধি উঁচু। এ রকম পর্বত প্রমান সংগ্রহ দেখবেন স্টীন কল্পনাও করেন নি।

কিন্তু কেবল চোখে দেখে কি হবে। হাতে নিয়ে পরীক্ষা করা চাই। অনেক ধরাধরির পর ওয়াং বললেন, দেখতে পারো, তবে নিয়ে যাওয়া চলবে না। পাশের কামরায় বস, আমি নিজের হাতে একটা একটা করে এনে দিচ্ছি।

বেশ, তাই সই।

বেশিরভাগ পুঁথি চীনাভাষায় বৌদ্ধধর্মগ্রন্থের অনুবাদ। লম্বা কাগজ বা কাপড়ের উপর লেখা মাদুরের মতো করে গুটোনো। শুকনো বালির রাজ্যে বন্ধ থাকায় খাসা মজবুত রয়েছে। চিয়াংএর বিদ্যেবুদ্ধির দৌড়ে পুথির পাঠ বেশিদূর এগোল না। সুতরাং স্টীন আপাতত এদের নাম, মূল না অনুবাদ ইত্যাদি যেটুকু বোঝা গেল তার ফিরিস্তি বানাতে লাগলেন।

শুধু পুঁথি নয়। কাগজ বা কাপড়ের ওপর আঁকা প্রচুর সুন্দর সুন্দর ছবিও আছে।

ওয়াং এক চালাকি খেললেন। তাঁর কাছে চীনা ধর্মগ্রন্থ ছাড়া ছবি বা অন্য ভাষার পুঁথির কোন দাম নেই। তিনি এইসব বাজে মাল গছিয়ে স্টীনের হাত থেকে পবিত্র চীনা বইগুলি বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। স্টীনের সামনে হাজির হতে থাকে যত প্রাচীন আমলের বুনো অজানা বিচিত্র লিপির নমুনা। তাঁর তো সোনায় সোহাগা। পুরাতত্ত্ববিদের কাছে এসব দুর্লভ জিনিসের কদর চীনা অনুবাদের চেয়ে ঢের ঢের বেশি।

দিন শেষে রাত্রি নামে। গুহার মধ্যে নিবিড় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। প্রদীপের সামান্য আলোয় আর কাজ করা যায় নি। গুহার বাইরে বেরিয়ে স্টীন ফের হিউয়েন সাংকে টেনে আনিলেন। তারপর একটি ভাব গম্ভীর বক্তৃতা দিলেন।—পুরোহিত কি সেই মহান সন্ন্যাসীর আদেশ শুনতে পাচ্ছেন না। দূর ভারতবর্ষ থেকে এক ভক্ত এসেছে এই পবিত্র পুঁথিপত্র পাঠ করতে। পৃথিবীর কাছে সে কথা শোনাতে। মন্দিরের রক্ষক ভক্ত ওয়াং কি তাকে এ বিষয়ে সাহায্য করবেন। না বাধা দেবেন।

বুদ্ধি করে কিঞ্চিৎ ঘুষের লোভও দেখালেন। কিছু পুঁথি সঙ্গে নিয়ে যেতে দিলে তিনি ওয়াংএর গুহা সংস্কার ফাণ্ডে মোটা চাঁদা দিতে প্রস্তুত।

বেচারা ওয়াং ভারি দো-টানায় পড়লেন।

দিয়ে দেবেন নাকি? তাহলে মন্দির তহবিলে মোটা চাঁদা। এ সব ছাই বোঝার বিদ্যেও তাঁর নেই। স্রেফ অন্ধকূপে পচবে। নয়তো, সরকারী গুদামে মজুত হবে। এ লোকটা পণ্ডিত, হিউয়েন সাংএর ভক্তও বটে। হয়তো দেশে নিয়ে গিয়ে যত্ন করে পড়বে। কিন্তু জানাজানি হলে লোকে কি বলবে? শেষে যদি ধনে প্রাণে মারা যান?

চিয়াংকে আরো খানিকটা বোঝাবার ভার দিয়ে স্টীন তাঁবুতে ফিরলেন।

রাতে শুয়ে শুয়ে তিনি ভাবছেন। ঘুম নেই চোখে। অধীর আগ্রহে প্রতিক্ষা করছেন চিয়াংএর। শেষ রাতের দিকে তাঁবুর বাইরে কার সতর্ক পায়ের আওয়াজ।

—কে?—'আমি চিয়াং।' নিচু গলায় উত্তর আসে।

তাঁবুর চারদিক ঘুরে আবার পদক্ষেপ মিলিয়ে যায়। বোধহয় দেখে নিল ধারে কাছে কেউ আছে কি না।

ইছামতী

জীবন সর্দার

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি পথঘাট জলে থৈ থৈ : সারারাত বৃষ্টি হয়েছে। সারাদিন হল। যখন বৃষ্টি থামল তখন সূর্য পশ্চিমে।

পা না ডুবিয়ে পথে বেরবার উপায় ছিল না। তবুও, কালো জলে ঢেউ তুলে চলাচল শুরু হয়েছে। সেই কালো জলের স্রোতে, কে জানে কে, একটি কাগজের নৌকো ভাসিয়ে দিয়েছে। জলে ডোবা ছোট গলিগুলো যেন খাল, বড় রাস্তা যেন নদী। নদীর জল কালো। কেন, নদীর জল কালো কেন? কেননা, সহরের ময়লা বৃষ্টির জলে মিশেছে বলে। বর্ষার জলে ভরা সহরের পথঘাট বাদ দিয়ে সত্যিকারের নদীর কথাই ধরা যাক।

প্রাকৃতিক সব খবরাখবর যার কাছ থেকে আমি পেয়ে থাকি তার নাম নীলাঞ্জন। আমরা দুজন, একবার বৃষ্টি মাথায় করে নদীর জলের রং দেখতে বেরিয়েছিলাম। বললে কি বিশ্বাস করবে, বৃষ্টির পর সব নদীর জলের রং এক রকম হয় না। মানে, অজয়ের জল, রূপনারানের জল, আর ইছামতীর জলের রং এক রকম দেখিনি। দেখলাম লালচে, হলদে আর ছাই ছাই কালচে হয়েছে তিন নদীর রং। এর কারণ, আমার চেয়ে ভাল বোঝে নীলাঞ্জন। সে বললে, যে নদী যেমন 'দেশের মাটির' মাঝ দিয়ে পথ করে নিয়েছে, মাটির রংএর জন্য, বর্ষায় তার জলের রং অমনি হয়ে যায়।

নদীর রূপ দেখব বলে আমরা দু'জন দু'টি নদীর উৎস দেখে এলাম,—নর্মদা আর শোন; দুটি নদীর ধার ধরে বহু পথ ঘুরে এলাম—অজয় আর রূপনারাণ আর একটি নদীর ঘাটে ঘাটে ঘুরে বেড়ালাম—ইছামতী। বলতে ইচ্ছে করে সব নদীই ইছামতী—ইচ্ছেমত চলে, সহজে তাদের ভাব বোঝা যায় না।

গামছা মাথায় হালের মাঝি হাল ধরে বসে। 'গলুই' এ আমি। 'ছৈ' এর ভেতর নীলাঞ্জন। একদিনের কথা বলছি। ইছামতীর ঘাটে নৌকো বাঁধা। হঠাৎ মেঘ করে বৃষ্টি এলো। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। জলে ডাংগায়। ঘাটের কাছে মাটি ঘাসে ঢাকা ছিলনা। একটু বৃষ্টিতেই সে মাটি ভিজে গেল, তারপর ঢালু তীর বেয়ে জল গড়িয়ে নাবার সময় মাটি 'ধুয়ে' নিয়ে নাবল। এই একই ব্যাপার ঘটছে নদীর সারাটি তীর জুড়ে। দুই তীর জুড়েই। সব নদীরই। সব দেশে।

ইছামতী ধরে 'যত দূরেই যাই' উত্তরে বা দক্ষিণে, তার তীর পলি মাটির। বৃষ্টি যেমন নদীর জোয়ার ভাঁটাও তেমনি নরম মাটি খসে খসে ক্ষয় করছে। এই মাটির বেশিটাই জমছে নদীর মুখে। গড়ছে ব-দ্বীপ। ইছামতীকে হারিয়ে ফেললাম সুন্দরবনের ব-দ্বীপে। সেখানে কালিন্দী নদীর শুরু। উত্তরে নদীয়া জেলায় ঢুকে তবে ইছামতী, তারও উত্তরে তার নাম 'ভৈরব'। যে নামেই ডাকি নদীর কাজ নদী করে যায়।

কাজের মিল থাকলেও সব নদীর জন্ম মেলেনা। মানে, সব নদীর জন্ম একরকম নয়। 'সহজে উৎস-মুখে যেতে পারি এমন একটি নদীর নাম বলত'? অনেক ভেবে নীলাঞ্জনই বললে, নর্মদা। যার উৎস মুখের নাম কপিল-ধারা। বিন্ধ্যপর্বতের কাঁধে ভারি সুন্দর একটি জায়গা,—অমরকণ্টক। বনে ঘেরা, প্রায় সমতল, সাড়ে তিন হাজার ফুট উঁচু। জায়গাটির মাঝখানে একটি মন্দির, তার ভেতর এক কুয়ো। লোকে বলে ওটাই নর্মদার উৎস। কিন্তু এখানেই শেষ নয়।

মন্দিরের কাছ থেকে দুটি নালা বেরিয়ে, দুইদিকে গেছে। ভাল করে দেখ, নীলাঞ্জন বললে। দেখলাম নালা দুটোর ধার পুবে-পশ্চিমে কেমন ধীরে ধীরে উঠে গেছে। জল গড়িয়ে নালায় পড়তে বাধা নেই—মাটির তলা দিয়ে হোক বা উপর দিয়ে হোক। অমরকণ্টকে যখন বৃষ্টি নামে মন্দিরের কুয়ো জলে ভরে যায়, নালায় তোড়ে স্রোত বয়। নালা ধরে ধরে, দক্ষিণে মাইল ছয় হেঁটে, হঠাৎ নামতে হল। ছোট ধারাটি লাফিয়ে হাজার ফুট নীচে পড়েছে। এটাই কপিলধারা। ধার বেয়ে নীচে নেবে গেলাম। কপিলধারা, একটি ঝর্না। এমনটি হত না যদি পাহাড়টি এখানে বসে না যেত। দুপাশে পাহাড়ের সারির মাঝখানটাই নেই। নর্মদা এখান থেকে ধাপে ধাপে দক্ষিণ থেকে পশ্চিমে নেবে গেছে। কী আনন্দ জান, নদীটির পাশে বসতে পারলাম—সমান আসনে।

ছোট্ট একটি নুড়ি গড়িয়ে দিলাম স্রোতে। নীলাঞ্জন বললে, স্রোতের টানে পাথরে ঘসে নুড়িটি একদিন বালুকণা হয়ে যাবে। অজয় নদের ধার ধরে হাঁটতে হাঁটতে এই কথাটিই উল্টো ভাবে তাকে বললাম, বালুকণা গুলো একসময় বড় পাথর ছিল। এই কথাটি নতুন করে বলার নয়, তোমরাও জান। কিন্তু আমি জানতুম না, অজয় আর রূপনারানের জলের রং কেন এক হল না। দুজনেরই জন্ম বাংলার পশ্চিমে পাহাড়ী দেশে। খুঁজে দেখি অজয়ে মিশেছে বীরভূমের লালমাটি ধোয়া জল। আর রূপনারানের চড়ায় নৌকো আটকে যায়, জোয়ার এলে নৌকো ভাসে। রূপনারানে জোয়ার-ভাঁটা খেলে; হাওড়া মেদিনীপুরের নরমমাটি ধোয়া জল তার সাথে মেশে। দুই নদীর দুই রং হবেই ত'।

ইছামতীতে ভাঁটা লেগেছে, নৌকো খুলে দিলাম। ইছামতীকে জানা হয়নি এখনো। সব নদীই কি 'ইচ্ছামতী'! ভাবছি। বাংলা দেশে কত নদী কিলবিল করছে। বাংলায় জলহাওয়ার উপর এদের প্রভাব রয়েছে। তেমনি জলহাওয়ার প্রভাব কি নদীগুলোর উপর নেই? নদী যে লুকিয়ে যায়, নতুন পথে বাঁক নেয়, কেন? সাগর যদি সরে যায় নদীর স্রোত কি তবে একাই থাকবে? দেশের মানুষ, তাদের হাবভাব, দেশের ফলমুল, গাছ পাখি পশু পোকা মাকড় নদীর প্রভাব এদের উপর কতখানি, কেমন? এমন করে নদী নিয়ে আগে ভাবিনি। আমার ভাবনার ভাগ তোমরাও কিছু নাও। উত্তর খুঁজে দেখে ভেবে জানাও।

* **প্র.প. ২১ : অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিনলিপি থেকে ঃ** দিল্লিতে একটি ঘুঘুপাখি আমায় বেশ বোকা বানিয়েছিল। একদিন ছাতের সিঁড়িতে একটি লালচে-গোলাপী পাখি ধরলাম। মাসি সেটাকে চিনতে পেরে বললেন, কণ্ঠীঘুঘু। ঘুঘুটাকে জাল চাপা দিয়ে রেখে কিছু চাল আর জল দিলাম। কিন্তু খেলনা। ঘরের সব দরজা জানলা বন্ধ করে জালটা তুলে নিলাম। ঘুঘুটা উড়ে গিয়ে কাঁচের বন্ধ জানালায় ধাক্কা খেল। কাঁচের ভেতর দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছিল। ওটা পায়চারি করতে লাগল। দাদা ওকে হাতের ওপর বসাল, ও চুপ করে বসে রইল যেন পোষা পাখি। আমি ঘুঘুটাকে হাতে নিয়ে বারান্দায় বসলাম। পাখিটা কেমন যেন উশখুশ করে উঠল। আমি সাবধান হলাম। এবার পাখিটা যেন পিছ্‌লে বেরিয়ে গেল। আমি চেপে ধরতে গেলাম। তবু পাখিটা হাত থেকে বেরিয়ে গেল, আমি অবাক হয়ে দেখলাম তার গোটা লেজটাই আমার হাতে রয়ে গেছে। ওকে শেষবারের মত দেখা গেল দূরের তিনতলা বাড়িটার পিছনে আড়াল হবার আগে।

পাখির পরিচয়ঃ

দুধরাজঃ কোথাও বলে শাহ্‌ বুলবুল। ধবধবে সাদা গা। চকচকে নীলচে কালো গলা আর ঝুঁটিগুলা মাথা। ডানা আর লেজের ধার কালো। লেজের মাঝের দুটি পালক লম্বা, পাখিটির চেয়েও। শিশু আর মেয়ে পাখিদের পিঠ বাদামী। বুক পিঠ ছাই ছাই সাদাটে। মাথা কালচে। ঝুঁটি আছে। মেয়ে পাখির লেজ ফিতের মত নয়। পাখিগুলোর দেখা পাবে ঝোপে ঝাড়ে ছায়ায় ঢাকা নালানর্দমার ধারে। যেখানে পোকামাকড় প্রচুর থাকে, আর কাছাকাছি থাকে লুকিয়ে থাকার মত ডালপালাওয়ালা গাছ—দুধরাজ সেখানেই। উড়তে উড়তেই পোকা ধরে তারপর ডালে বসে খায়। মাটিতে ভাল চলতে পারেনা —পাদুটো ছোট। লম্বা লেজ ঝুলিয়ে ওড়ার সময় কীযে সুন্দর দেখায়।

কোলা বুলবুল, সাদাগাল বুলবুল, সিপাই বা পাহাড়ী বুলবুল চেন? দুধরাজের সাথে ওদের কোথায় মিল বা গরমিল দেখে জানাও। সব গুলোই বাংলাদেশে দেখা যায়।

(আমার নাম পানু, বয়স বারো বছর। বাস থেকে পড়ে গিয়ে আমার শিরদাঁড়া জখম হয়ে গিয়েছে বলে হাঁটতে পারি না, একটা ছোট গাড়ি চড়ে বাড়ির মধ্যে ঘুরে বেড়াই আর তেতলার জানালা দিয়ে চারিদিকে দেখি।

ভজুদা সকালে আমাকে তিন ঘণ্টা পড়ান, আমি বাড়িতে বসেই বার্ষিক পরীক্ষা পাশ করেছি।

বড় মাস্টার প্রতি রবিবারে আমাকে গল্প বলতে আসেন। গুপি আমার বন্ধু, সেও গল্প শোনে।

তিনি লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা করেছেন, সারা পৃথিবী ঘুরে সাংঘাতিক, রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। ঝড়ের মধ্যে জাহাজডুবি হয়েছিল, হাঙরে একটা পা কামড়ে টেনে নিয়েছিল, এখন কাঠের পা। অগ্নিকাণ্ডে বৌ-এর মুখ পুড়ে গিয়েছিল। এখন সব ছেড়ে ছুড়ে সামান্য টাকায় ছাপাখানার প্রুফ দেখেন আর নাইট স্কুল চালান।

গুপি তার ছোট মামার কাছ থেকে নানা বই আনে, মঙ্গলের মানুষ, চন্দ্রনাথের চন্দ্রযাত্রা—এই সব। আমরা ঠিক করেছি বড় হয়ে চাঁদে যাব। গুপির ছোট মামা মহাকাশ-যান বানাবে।)

দুই

এর মধ্যে একটা রবিবার গুপির জন্মদিন করা গেল। আমার ঘরে; ভজুদা আর বড় মাস্টার মশাইকে নেমন্তন্ন করা হল। সেদিন ছিল রবিবার, আমাদের বাড়ির সবাই বিকেলে চা খাবার পর অন্যান্য রবিবারের মতো দাদুর বাড়ি চলে গেল। খুব ভালো চা হয়েছিল; কোকা-কোলা, ছাঁচি পান,

মাংসের সিঙ্গাড়া, আলু নারকোলের ঘুগনি, আইসক্রীম। গুপিদের বাড়িতে কারো জন্মদিন হয় না। গুপির দাদু বলেন জন্মদিন নাকি করলেই লোকেরা মরে যায়। অথচ ওঁরা কারো জন্মদিন করেন না, তবু ওঁদের পূর্বপুরুষেরা কেউ বেঁচে নেই।

ভজুদার অনেক দেরি করে আসার কথা। প্রথমে গুপি এসেই 'চাঁদের যাত্রী' বলে দু' টাকা দামের একটা চমৎকার বই আমার হাতে দিল। আমি ঐ বইটা আর বালিশের তলা থেকে দুটো টাকা নিয়ে গুপিকে দিলাম। ওর জন্মদিনের উপহার। প্রথম পাতায় লিখে দিলাম, 'চাঁদের যাত্রীকে জন্মদিনে 'চাঁদের যাত্রী' দিলাম, ইতি, চাঁদের যাত্রী।' বেশ হল না?

গুপির ঠাকুরদা এসব বইয়ের উপর হাড়ে চটা। তিনি এক সময় জাহাজে চাকরি করতেন। গুপি বলে পৃথিবীতে হেন সাগরতীর নেই যেখানে ওর ঠাকুরদা যান নি। এমন সব অদ্ভুত জিনিস তাঁর নিজের চোখে দেখা যে তিনি আর কল্পনায় বিশ্বাস করেন না। অবিশ্যি অত বড় চাঁদকে কিছু কল্পনার জিনিস বলা যায় না। আবহমান কাল থেকে লোকে তাকে দেখে আসছে, তার টানে সমুদ্রে জোয়ার উঠছে; রাশিয়ানরা আমেরিকানরা সেখানে রকেট নামিয়েছে পর্যন্ত; এই সব ছবি দিয়েই 'চন্দ্রযাত্রা' বইটার পাতার পর পাতা ভরতি। যেখানে গাড়ি ঘোড়া নামানো যায়—আর রকেটকে গাড়ি ঘোড়া ছাড়া আজকাল আর কি বলা যায়? যেখানকার ডাঙ্গায় যন্ত্র নামিয়ে ফটো তুলে পাঠানো যায়, সে এই পৃথিবীটার চেয়ে কোন দিক দিয়ে বেশি কাল্পনিক হল তা ভেবে পাওয়া যায় না।

সমস্ত বইটা গুপি এর মধ্যে একবার পড়ে ফেলেছে। অদ্ভুত জীবনযাত্রা ওখানকার। নাকি মহাকাশ-ট্রাকে করে মাটি নিয়ে গিয়ে তবে ধান-গম ফলাতে হবে। এক ফোঁটা জল নেই, দু-ভাগ হাইড্রোজেন আর এক ভাগ অক্সিজেন মিলিয়ে জল তৈরি করতে হবে। সে একেবারে বোতলে পোরা বিশুদ্ধ জল, খেলে কারো অসুখ করবে না। অক্সিজেন ও ওখানে পাওয়া যাবে না, সম্ভবতঃ হাইড্রোজেন-ও না। সব পৃথিবীতে থেকে নিয়ে যেতে হবে। বাঁচতে হলে সবাইকে বোতলে ভরা

অক্সিজেন শুঁকতে হবে। গুপির ছোট মামা তার মস্ত ব্যবসা করে, দেখতে দেখতে ফেঁপে উঠবে। যাঁরা প্রথম চাঁদে জমি কিনবে, গুপির ছোট মামা তাদের মধ্যে একজন। এই ব্যাপারে সে আমেরিকায় এরি মধ্যে একটা দরখাস্ত পর্যন্ত দিয়ে রেখেছে।

অবিশ্যি ওদের বাড়িতে এ বিষয়ে কেউ এখনো কিছু জানে না। কারণ গত বছর সামান্য কয়েকটা নম্বরের জন্যে বি-এস্-সি পাশ করতে না পারায় বাড়িতে তাকে উদয়াস্ত যা নয়-তাই শুনতে হয়। তাতে অবিশ্যি তার চাঁদের ব্যবসা কিছু উঠে যাচ্ছে না, ছোট মামা গুপিকে বলেছে।

গুপি বইটাতে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'আমরাও ঐ ব্যবসায় ঢুকে পড়ব। ছোট মামার চাঁদের বাড়িতে থাকব, ওর কাজটাজ করে দেব, তুই তো খুব ভালো মাংস রেঁধেছিলি সেবার যখন ডায়মণ্ড হারবারে পিকনিক হয়েছিল। আর ছ্যাখ্ নেপোকেও নিয়ে যাওয়া যাক। দেখিস্ কেমন দেখতে দেখতে এই বিরাট বাঘের মতো হয়ে যাবে। ওখানে বাতাসের প্রেসার প্রায় নেই বলে সবাইকে প্রেসার স্যুট পরতে হবে। নেপোকে পরাব না। বাতাসের চাপ না থাকায় ব্যাটা এই এত উঁচু হয়ে উঠবে, বেশ আমাদের বাড়ি পাহারা দেবে। ওদিকে প্যাণ্টের মধ্যে পুরে লুকিয়ে নিয়ে যেতে পারব, কেউ টের-ও পাবে না। নইলে বেড়ালদেরো চাঁদে যেতে মোটা টাকা দিয়ে টিকিট কিনতে হবে।

বড় মাস্টার সঙ্গে করে তাঁর নতুন ছোট মাস্টারকে নিয়ে এসেছিলেন। রোগা, ফরসা, খোঁচা খোঁচা করে চুল কাটা, নাকি সবে টাইফয়েড থেকে উঠেছে। দু জনে হাঁ করে গুপির কথা শুনছিলেন আর একটার পর একটা অনেকগুলো মাংসের সিঙ্গাড়া খাচ্ছিলেন। ভজুদা তখনো আসেন নি।

গুপি বলে চলল, 'ওখানে খুব রোবো ব্যবহার হবে। তারাই চাষ করবে, কারখানায় কাজ করবে। নইলে অত অক্সিজেন কে জোগাবে? তাছাড়া রোবোদের খিদেও হয় না, অসুখও হয় না, ভারি সুবিধা। নইলে চাঁদে গোরু নিয়ে গেলে, সেগুলো তো দেখতে দেখতে আট নয় ফুট উঁচু হয়ে উঠবে। তাদের খাবার জোগাতেই ট্যাক গড়ের মাঠ হবে। সেলোফেনের খাঁচায় থাকবে, তাতে অক্সিজেন ভরা থাকবে। রোবোরা তাদের দুইলে মণ মণ দুধ পাওয়া যাবে। কে জানে ছোট মামাও হয়ত একঠা গোরু কিনে ফেলতে পারে। পায়েস আর রসগোল্লা করাটা ইতিমধ্যে শিখে নিস, পানু।'

বড় মাস্টার একটু চা খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে এতক্ষণে কথা বললেন, 'অত অক্সিজেন কোথায় পাবে?'

গুপি খুব হাসতে লাগল, 'ছোটমামা বলেছে যে সব কারবন ডায়োক্সাইড্ আমরা নিশ্বাস ফেলব, সেগুলোকে আবার অক্সিজেন বানাবার কল তৈরি হচ্ছে শীগগির্।'

নতুন মাস্টার এবার বললেন, 'কিন্তু বন্ধ বালতিতে দুধ দুইতে হবে, নইলে ছল্‌কিয়ে সব বেরিয়ে আসবে। হাওয়ার চাপ নেই তো।'

বড় মাস্টার মাথা মাড়তে লাগলেন। উনিও গুপির ঠাকুরদার সঙ্গে এক মত। এই পৃথিবীটারি সব কিছু দেখার সময় হয় না, তা আবার চাঁদে যাওয়া। গুপি বিরক্ত হয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আমি বললাম, 'চাঁদে যাওয়াটাই আসল কথা নয়, মাস্টার মশাই। চাঁদটা হবে একটা ছোট স্টেশন। সেখানে মহাকাশের আপিস থাকবে; অন্যান্য গ্রহে যাবার টিকিট কাটা যাবে। কারখানা থাকবে,

মহাকাশ-যান মেরামত হবে। চাঁদে আমরা চিরকাল থাকব না।'

মাস্টার মশাই হঠাৎ গুপির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বর্মা গিয়েছ কখনো?' গুপি মাথা নাড়ল। মাস্টার বললেন, 'আমি বর্মায় থাকতাম। সালওয়েন নদীর ধারে সেগুনকাঠের মস্ত ব্যবসা ছিল। আমার বাবা অনেক টাকা করেছিলেন। আমাদের নিজেদের এরোপ্লেন ছিল, নৌকো ছিল, মাঝ সমুদ্রে যাবার বড় বড় মোটর বোট ছিল। সমুদ্রের ঝড় দেখেছ কখনো?'

গুপি একটা চেয়ারে বসে পড়ে, সেটাকে টেনে মাস্টারের খুব কাছে নিয়ে গেল। ততক্ষণে আমাদের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে, বাড়ির সবাই দাছুর বাড়ি চলে গেছে। ক্রমে অন্ধকার হয়ে আসছে, তবু আমার ঘরে আলো জ্বালা হয় নি, ভজুদাও আসেন নি। মাস্টার বললেন, 'একবার দারুণ ঝড়ে পড়েছিলাম। তখন আমার কুড়ি বছর বয়স। রেঙ্গুনের কলেজ থেকে সবে বি এ পাশ করে বেরিয়েছি। মাঝিদের সঙ্গে মাঝ সমুদ্রে মাছ ধরতে গেছিলাম। ওখানে ওরা প্রকাণ্ড সব মাছ ধরে, এক মণ, দেড় মণ, পর্যন্ত। সমুদ্রের জলটা এত পরিষ্কার যে অনেক নিচে অবধি দেখা যায়। কোথাও কোথাও তলা অবধি দেখতে পাচ্ছিলাম। হয়ত সমুদ্রের নিচে সেখানে চড়া পড়েছিল। সূর্যের আলো সেখানে ফিকে সবুজ হয়ে পৌঁছচ্ছিল। দেখলাম বড় বড় সমুদ্রের আগাছা, জলের নিচে বালির উপর একটু একটু ছুলছে। মাঝে মাঝে ঝাঁকে ঝাঁকে ছোট রঙিন মাছের দল ভেসে যাচ্ছে। থেকে থেকে বড় বড় কালো ছায়ার মতো কি যেন এগিয়ে আসছে। তাই দেখে মাঝিরা কথা বন্ধ করে একেবারে চুপ; নোঙর ফেলা নৌকোটাও স্থির, শুধু ঢেউয়ের দোলায় একটু একটু ছুলছে। একবার মনে হল জলের নিচে মস্ত একটা চোখ আমার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। বুকটা ঢিপঢিপ করে উঠল। গাটাও কেমন সির সির করতে লাগল।

মাঝিদের দিকে তাকিয়ে দেখি, তারাও কেমন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। নোঙর তুলে, ডাঙ্গায় ফেরার দিকে তাদের মন। নাকি ঝড় উঠছে। হাওয়া পড়ে গেল, পশ্চিম দিকে মেঘ জমা হতে লাগল। তার পরেই সূর্যটা একেবারে মুছে গেল, দোতলার সমান উঁচু কালো ঢেউ আমাদের উপর লাফিয়ে পড়তে লাগল। ছোট্ট একটা খেলনার মতো আমাদের নৌকোও একবার ঢেউয়ের মাথায় ওঠে, তার পরেই ঝপাস করে পড়ে। মাঝিরা ওস্তাদ, তারা ঠিক রইল। পরে জানতে পেরেছিলাম যে ঢেউয়ের ঝাপটা খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত তারা পরদিন ভোরে আধমরা অবস্থায় নিরাপদ ডাঙায় পৌঁছতে পেরেছিল। কিন্তু ঝড়ের গোড়ার দিকেই একটা মস্ত ঢেউ আমাকে ভাসিয়ে নিল।

খানিকটা হাঁসফাঁস করলাম, তারপর আর কিছু মনে নেই। যখন জ্ঞান হল দেখি মহাসাগরের মাঝখানে একটা অজ্ঞাত দ্বীপের বালির তীরে পড়ে আছি। সে কি দ্বীপ! সত্যি বলছি তোদের, পৃথিবীতে যদি কোথাও স্বর্গ থাকে, তবে সে সেইখানে। মানুষের বাস নেই; বনমানুষেরা উঁচু গাছে রাত কাটায়। শিম্পাঞ্জীকে বনমানুষ বলে তা জানিস্ তো? আর গাছে গাছে যত ফুল তত ফল। কত যে পাখি তার ঠিকানা নেই। উড়ে এসে কাঁধে বসে, হাত থেকে ফল খায়। ঘাসের উপর খরগোশরা লাফিয়ে বেড়ায়, আমাকে দেখেও এতটুকু ভয় পায় না। দলে দলে হরিণ চরে বেড়ায়। গাছের কোটরে এত বড় বড় মৌচাক।

সারাদিন গাছের পাতার মধ্যে সমুদ্রের হাওয়ার শব্দ, পাখির গান, ঝরণার জল পড়ার আওয়াজ। চোখের সামনে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রজাপতি ওড়ে; তার পিছনে হলদে বালির তীরে সমুদ্রের সবুজ ঢেউ সারাক্ষণ আছড়ে পড়ে।'

মাস্টার মশাইয়ের কথা শুনতে শুনতে আমার চোখের সামনে থেকে অন্ধকারে ভরা নিজের ঘরটা কোথায় মুছে গেল, ফুটপাথের চায়ের দোকানের ধোঁয়া ধোঁয়া গন্ধ আমার নাক অবধি পৌঁছল না, গা সির সির করতে লাগল। গুপি ব্যস্ত হয়ে বলল, 'তারপর সেখান থেকে ফিরে এলেন কি করে? কেন এলেন? ই-স্, সেখানে নিশ্চয় গাছে চড়লেই পাখির ডিম! আর হরিণ মারা আর খাওয়া! আচ্ছা, মাস্টার মশাই খরগোশের মাংসও—'

মাস্টার মশাই হঠাৎ কর্কশ গলায় বললেন, 'চুপ! ঢিল ছুঁড়ে একটা সবুজ পায়রাকে জখম করেছিলাম। মাটিতে পড়ে সেটা ছট্‌ফট্ করছিল; চোখের কোণা দিয়ে একটু রক্ত গড়াচ্ছিল। অমনি শিম্পাঞ্জীর দল আমার ঘাড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, নারকোল গাছের গুঁড়ি পড়েছিল, তাতে চাপিয়ে, ঠেলে ঠেলে ঢেউ পার করে দিয়ে এল। ভাঁটার টানে কোথায় যে ভেসে গেলাম তার ঠিক নেই। ভাগ্যিস একটা জাপানী সদাগরী জাহাজের চোখে পড়ে গেলাম, নইলে সে যাত্রা হয়েছিল আর কি! মাস্টার মশাই হঠাৎ কাঠের পা ঠুকে উঠে পড়লেন। গুপি বলল, 'এক্ষুণি চলে যাবেন না, মাস্টারমশাই, কি করে বর্মা ছেড়ে চলে এলেন, বৌঠানের কি করে মুখ পুড়ল, সেসব কথা—।'

মাস্টারমশাই বেজায় রেগে গেলেন। আমাকে বললেন, 'তোরা বড় বেশি কথা বলিস্। অন্য লোকের দুঃখ কষ্ট নিয়ে খুব মজা পাস্, না?'

আমি বললাম, না, মাস্টারমশাই, না। আমাদেরো দুঃখ হয়, মজা পাই না।

মাস্টারমশাই বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, থাক্ এখন। আরেক দিন বলব। উঠি। আমার নাইট স্কুলের ছেলেরা এক্ষুণি আসবে। তলাপাত্র রইল, ওর সঙ্গে গল্প কর।'

মাস্টারমশাই চলে গেলেই ছোট মাস্টার মোড়া থেকে উঠে সেই চেয়ারে বসে বললেন, 'আমার মহাকাশ-যাত্রা সম্বন্ধে অনেক ভালো ভালো ইংরিজি বই আছে।'

গুপি হঠাৎ মুখের উপর আঙুল রেখে বলল, চুপ করে শুনুন।' ঠক্-ঠক্-ঠক্ শব্দ শুনতে পাচ্ছেন না? স্পেস্‌শিপ বানাচ্ছে।'

ছোটমাস্টার চমকে গিয়ে আরেকটু হলে চেয়ার থেকে পড়ে যাচ্ছিলেন। আমি বললাম, 'আঃ, গুপি! সবাইকে সব কথা বলা কেন?' কিন্তু ছোট মাস্টারও কিছুতেই ছাড়বেন না 'কি স্পেসশিপ, কে বানাচ্ছে, বলতেই হবে! আমাকে না বলা'র কারণ নেই। আমি তো আর কাউকে বলতে যাচ্ছি না!

তখন আমি বললাম, 'সরকারি ছাপাখানার ওপাশে চার বছর ধরে ঐ যে মস্ত বাড়িটা তৈরি হচ্ছে, গুপি বলে ওখানে মহাকাশ-যান তৈরি হচ্ছে।' ছোট মাস্টার তো অবাক। 'সে কি? শুনলাম ওটা ঠাণ্ডাঘর। ওখানে আলু পেঁয়াজ জমা থাকবে। ও-পাশেই গঙ্গা। লম্বা চোঙাপথ দিয়ে একেবারে জাহাজের খোলে, মাল বোঝাই হয়ে বিদেশে যাবে। বড় মাস্টার তো তাই বললেন।'

গুপি কাষ্ঠ হেসে বলল, 'ঠাণ্ডাঘর করতে কখনো চার বছর লাগে?'

ক্রমশঃ

(১)

বারো মাস একই কথা একই সুর শুনি তার,
তবু তারে হাতে ধরে মুখ দেখি বারে বার।

(২)

দুই বন্ধু—বন্দনা বড় চন্দনা কিছু ছোট। কার কত বয়স জিজ্ঞাসা করাতে চন্দনা বলল : একই দিনে আমাদের জন্মদিন। আমাদের দুজনেরই বয়স ২০ থেকে ২৯ এর মধ্যে।

বন্দনা আরো একটু বিশদভাবে বলল : যখন আমার বয়স চন্দনার দ্বিগুণ ছিল, তখন চন্দনার যা বয়স ছিল, যখন আমার বয়স তার তিন গুণ ছিল, তখন চন্দনার যা বয়স ছিল, আমার বয়স তার চার গুণ!

বলতে পার এখন এদের কার কত বয়স?

(৩)

(বাংলা লেখার মধ্যে অজস্র ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করেন মিঃ ডাটা। আপত্তি জানালে তিনি ইংরাজি শব্দ ও শব্দাংশগুলির বাংলা প্রতিশব্দ বসিয়ে দেন, কিন্তু তাতে ব্যাপারটা অনেক সময়ে আরো দুর্বোধ্য হয়ে যায়—যেমন, butter cup (ফুল) তখন হয়ে দাঁড়ায় মাখন পেয়ালা!

দেখ ত তাঁর এই লেখাটার প্রকৃত অর্থ তোমরা বার করতে পার কিনা? বাংলা কোন শব্দের বদলে ইংরাজি কোন শব্দ বসা উচিত ছিল লিখে দিও)।

গত কাল ভাঙ্গা ক্রুতর পরে আমাদের পরবর্তী দরজা বড় বাড়ির কচি আগন্তুক বাবু রশ্মির কাছে ডাকা করেছিলাম।

প্রথমেই নহে বরফ করলাম তাঁর হস্ত কতিপয় বাগানটি, নানা রঙ্গের ঔষধ বিশেষ, তপন কুসুম ও অন্যান্য সমুদ্রপুত্রের ফুলের বাহার, ঝকঝকে তকতকে, কোথাও কোন পরিচ্ছদ বয়স নাই। আকর্ষণ করা ঘরে দামী শকট প্রিয়পাত্র পাতা, দেওয়ালে প্রভুখণ্ডগুলি টাঙ্গানো।

হেসে সমুহ বাবু রশ্মি আমাদের বসতে দিলেন। বালি ডাইনিগুলি এবং মানুষ যাও বরফ ননী খেতে দিলেন।

শুনেছিলাম যে বাবু রশ্মি একজন আমদানা পিঁপড়ে পাতলা পরদা নক্ষত্র। কিন্তু তিনি বললেন সে সব নাকি মোরগ এবং ষাঁড় গল্প!

বড় মৃত হয়ে যাচ্ছিল তাই সাক্ষাৎ করা খেঁকী কুকুর পুচ্ছ করে বাড়ি ফিরে এলাম।

চৈত্রমাসের ধাঁধার উত্তর

(১) পেনসিল।

(২) এক তিন-সাত চার = ১৩৭৪ (সাল)

(৩) কিশোর কান্তি কুশারি উকিল, খগেন্দ্রনাথ খাসনবিশ নাস্তিক, গগনচন্দ্র গাঙ্গুলি অধ্যাপক, ঘনশ্যাম ঘোষ ডাক্তার।

উত্তর দাতাদের নাম—

যাদের সব কয়টি উত্তর ঠিক হয়েছে—

৫৭ শাশ্বতী দত্ত, ৫৪৯ ইন্দ্রাণী ও বনানী দাশগুপ্ত, ৮৯৪ তপন ঘোষ, ৯৩৮ আলোকময় দত্ত, ১০৯৮ তারা চন্দ, ১১৭৪ মধুমিতা মুখার্জী, ১২১৩ সুগত, স্বাতী ও সোমা ঘোষ, ১২৩১ নন্দিনী দত্ত মজুমদার, ১৪৬৪ পুরবী গুপ্ত, ১৪৮৪ রঞ্জনা দে, ১৫৩৬ বাপ্পাদিত্য দেব, ১৭৪৪ শিঞ্জিতা সেন, ১৬০১ হার্দিক মজুমদার, ১৬৯৩ শ্যামল কুমার পাইন, ১৭৯০ জয়িতা ও সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৩৮ লানা মিত্র, ১০১৪ সুব্রত ঘটক; ২৩০৫ অরূপ দত্তগুপ্ত, ২৮৬৩ ঝিনুক চৌধুরী।

যাদের দুটো উত্তর ঠিক

৬৩ অনিরুদ্ধ রক্ষিত, ১৮১ মিষ্টি ও বাসবেন্দু গুপ্ত, ১১৬ জয়ন্ত ও প্রবাল রায়, ৬০১ অনন্যা ও বন্দিতা ঘোষ ৮৩৮ সুপ্রতীক বাগচী, ৮৪৯ স্মরণ দাশগুপ্ত ৮৯০ কাকবাকা দত্ত, ৮৯৮ হিমাদ্রি ও দোলন চাঁপা চৌধুরী, ১১২৬ অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী ১৫৬০ কেয়া বসু, ১৬১৫ পথিকৃৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬৭৫ শ্বশন্তী পাল, ৬৫৮ শাশ্বতী মিত্র, ১৭২৫ রঞ্জন রায়, ১৭৫০ পূরবী মুখোপাধ্যায়, ১৮৯৭ সুস্মিতা কাঞ্জিলাল, ১৯২০ রজত রায়, ১৯৭০ রীতা, নন্দা ও চন্দন দাশ, ১১৯৫ মুকুর দাশগুপ্ত, ১৩৫৭ অমিয় কুমার রায়, ২৫৪৪ মণিকা ও সান্ত্বনা রায় চৌধুরী, ২৭৪৭ প্রসেনজিৎ ও মৈত্রেয়া বসু, ১৮৩৭ অর্পিতা রায় চৌধুরী আর একজন নাম-নম্বরহীন।

যাদের একটি উত্তর ঠিক হয়েছে—

২৮৪ নূপুর ও মিঠু দাশগুপ্ত, ১২০৯ সুপর্ণ চৌধুরী, ১১২৯ সুনন্দা সিংহ, ১৩৪৭ মলয়বীজন ও অরূপরতন ভট্টাচার্য, ১৫২৪ শুভাশীষ ও প্রেমাশীষ বরাট, ১৫৬৭ দেবাশীষ মুখার্জী ১৮০৫ দেবাশীষ রক্ষিত ১৮৪০ অনুরাধা ও অদিতি ঘোষ, ১৮৬৩ সোনালী লাহিড়ী, ১৮৭৯ অমিতাভ দে, ১৯১৯ মাধুরী রক্ষিত, ১৩৩৮ শুভ্রাংশু শেখর মান্না, বি ২৭ সেক্রেটারি, শোনপুর সিদ্ধেশ্বরী পাঠাগার।

বিশেষ কনসেশন

পুরোন সন্দেশের দাম আরো কমিয়ে দেওয়া হল।
এই বেলা সংখ্যাগুলি সংগ্রহ করে রাখো, নইলে পরে এগুলিও আর পাবে না।

মূল্য :—প্রতি সংখ্যা

১৩৬৮, ১৩৬৯, ১৩৭০এর সাধারণ সংখ্যা	৪০ পয়সা
১৩৭১, ১৩৭২, ১৩৭৩এর সাধারণ সংখ্যা	৫০ পয়সা
১৩৭৩এর সাধারণ সংখ্যা	৭০ পয়সা
১৩৬৮, ১৩৬৯, ১৩৭০এর শারদীয়া সংখ্যা	৫০ পয়সা
১৩৭১এর শারদীয়া সংখ্যা (শোভন সংস্করণ)	২.৫০ টাকা
১৩৭২, ১৩৭৩এর শারদীয়া সংখ্যা	১৲ টাকা
১৩৭৪এর শারদায় সংখ্যা	১.৫০ টাকা

সম্পূর্ণ বছর	সাধারণ	বাঁধানো
১৩৬৮ (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্র নাই)	১.৫০	২.৭৫ টাকা
১৩৬৯ (বৈশাখ নাই)	২.৭৫	৪৲ টাকা
১৩৭০ (সম্পূর্ণ বৎসর)	৩.৭৫	৫৲ টাকা
১৩৭১ (আষাঢ় নাই)	৬৲	৭.২৫ টাকা
১৩৭২ (কার্ত্তিক নাই)	৬.৫০	৭.৭৫ টাকা
১৩৭৩ (সম্পূর্ণ বৎসর)	৮৲	৯.২৫ টাকা
১৩৭৪ (সম্পূর্ণ বৎসর)	৯৲	১০.২৫ টাকা

দুই, তিন, চার, পাঁচ ছয় বা সাত বৎসরের সন্দেশ এক সঙ্গে নিলে এক, দুই, তিন, চার পাঁচ বা ছয় টাকা রিবেট পাওয়া যাবে। ক্রেতার অনুরোধে ভি. পি. যোগে অথবা (ডাক-মাশুল সহ মূল্য পাঠিয়ে দিলে) রেজিস্টার্ড ডাকে বই পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

সন্দেশ কার্যালয়ের ঠিকানা

১৭২/৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯

(ত্রিকোণ পার্কের দক্ষিণে)

ফোন নং—৪৬-৪৯১৯

অশোকানন্দ দাশ কর্তৃক ৩ টেম্পল রোড, কলিকাতা ২৯ থেকে প্রকাশিত ও
কালিকা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড ২৫ ডি. এল্. রায় স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত
সন্দেশ কার্যালয় : ১৭২/৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ কলিকাতা—২৯

'—হঁ—ম্রা—ম্রা ও!' করে বিকট চিৎকার! নেপোর বই।

অষ্টম বর্ষ—তৃতীয় সংখ্যা আষাঢ় ১৩৭৫ | জুলাই ১৯৬৮

ভালবাসেন

সুখলতা রাও

রাত পোহালে, নিতুই এসে
আকাশ পারে মধুর হেসে
বলছে শোন রবির আলো
'তিনি মোদের বাসেন ভালো।'

বলছে ধরা 'যতন করে
সাজালেন গো তিনিই মোরে।
ঘর বানিয়ে আমার কোলে
তোমরা সুখে থাকবে বলে।'

নদীরা গায় ছলাৎ ছল—
'বইয়ে তিনি দিলেন জল,
—জুড়ায় জীবে, শীতল করে,
অমল করে. তৃষ্ণা হরে।'

দখিন বাতাস কানে কানে
বলছে—'আছেন সকল খানে,
গড়েছেন এই জগৎ যিনি,
সবার মাঝে আছেন তিনি।'

ঋষি অগস্ত্য। তপস্যায় তাঁর দিন কাটে ; পরণে বল্কল— গাছের ছাল, মাথায় পিঙ্গল চুলে জটা। খান বনের ফলমূল। পরম শান্তিতে আছেন অগস্ত্য।

একদিন তিনি দেখতে পেলেন তাঁর পূর্বপুরুষেরা নিচের দিকে মুখ ক'রে ঝুলে আছেন। দেখে অগস্ত্য ব্যথা পেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন আপনারা কেন এরকম করে আছেন ?

তাঁরা উত্তর দিলেন—বংশ লোপ হবার জোগাড় হয়েছে। তুমি মরে গেলে আমাদের বংশে আর কেউ থাকবে না। তাই আমাদের এ অবস্থা।

—কি করলে আপনাদের এ কষ্ট দূর হবে ? অগস্ত্য দুঃখিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

—তোমার পুত্র হলেই আমরা এ নরক থেকে মুক্তি পাব।

অগস্ত্য তখন বংশধারা বজায় রাখার জন্য খুঁজতে লাগলেন এমন একটি মেয়েকে যে তাঁর স্ত্রী হবার উপযুক্ত—যাঁর গর্ভে জন্মাবে উপযুক্ত সন্তান। কিন্তু তেমন কোন মেয়েকে তিনি খুঁজে পেলেন না।

তখন অগস্ত্য ঋষি যে যে প্রাণীর যা যা সুন্দর তাই নিয়ে মনে মনে একটি সুন্দরী মেয়ে সৃষ্টি করলেন। এদিকে বিদর্ভদেশের রাজা সন্তানের জন্য কঠোর তপস্যা করছেন। ঋষি মনে মনে তাঁর কাছে মেয়েটিকে পাঠিয়ে দিলেন।

রাণীর একটি অতিসুন্দরী সুলক্ষণা মেয়ে হ'ল। আনন্দে উৎফুল্ল রাজা কন্যার জন্মের কথা পণ্ডিতদের জানালেন। তাঁরা মেয়েটির নাম দিলেন লোপামুদ্রা।

জন্মেই মেয়েটি খুব তাড়াতাড়ি বাড়তে লাগল। একটুখানি আগুন যেমন মস্ত শিখায় বেড়ে যায় তেমনি একরত্তি মেয়ে দেখতে দেখতে বড় হয়ে গেল।

বিদর্ভরাজ আদরিনী কন্যার জন্য একশ'জন দাসী রেখে দিলেন যেন মেয়ের কুটোটিও নাড়তে না হয়। আরও দিলেন সমান বয়সী একশ'টি সখী। বিদর্ভরাজ ছিলেন খুব বীর। তাঁর ভয়ে এমন সুন্দরী মেয়েকেও বিয়ে করতে এলো না কোনো রাজপুত্র। অথচ কন্যার যেমন স্বভাব, তেমন গুণ আর তেমনই রূপ। রাজা ভাবেন এমন মেয়েকে আমি কার হাতে তুলে দিই ?

অগস্ত্য লোপামুদ্রার কথা সবই জানতে পারলেন। যখন ভাবলেন এবারে ওঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছে,

সংসারের কাজকর্ম করতে পারবেন তখন তিনি একদিন রাজার কাছে গিয়ে বললেন—আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি রাজা, লোপামুদ্রাকে আমায় দান করুন। রাজার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল, তিনি হাঁ-না কিছুই বললেন না। এমন সুন্দর ফুলের মত মেয়েকে বুড়ো ঋষি অগস্ত্যের সঙ্গে বিয়ে দিতে তাঁর মন চাইল না অথচ যদি কথা না শোনেন তবে ঋষি শাপ দিয়ে সর্বনাশ করে দিতে পারেন। নিরুপায় রাজা রাণীর পরামর্শ চাইলেন। রাণীর মুখে কথা ফুটল না।

তখন লোপামুদ্রাই তাঁদের কাছে এসে বললেন—বাবা, আমায় অগস্ত্যকেই দান করুন। আমার বদলে আপনারা বেঁচে যাবেন, রাজ্য বাঁচবে, প্রজারা বাঁচবে।

রাজা আর কি করবেন ? মহা জাঁকজমক করে বুড়ো ঋষির সঙ্গেই আদরের দুলালী লোপামুদ্রার বিয়ে দিলেন। অগস্ত্য লোপামুদ্রার দামী শাড়ী আর অলঙ্কারের দিকে চেয়ে বললেন—এগুলি ছেড়ে এস। লোপামুদ্রা সন্ন্যাসী স্বামীর সন্ন্যাসিনী স্ত্রী হয়ে গেলেন। বল্কল পরলেন—গায়ে জড়ালেন হরিণের ছাল। লম্বা তেলচুকচুকে সুন্দর চুলগুলি রুক্ষ করে মাথায় জটা ধারণ করলেন।

তারপর অগস্ত্য গঙ্গাদ্বারে এসে ডুবে গেলেন তপস্যায়। লোপামুদ্রাও তপস্যা করে, স্বামীর সেবাশুশ্রূষা করে, ঋষি বউয়ের মত ফলমুল খেয়ে দিন কাটাতে লাগলেন।

হঠাৎ একদিন অগস্ত্যের মনে পড়ল পিতৃপুরুষদের কথা। সন্তান চাই, নইলে পিতৃপুরুষদের উদ্ধার হবে না। কিন্তু লোপামুদ্রা বললেন—আমি রাজকন্যা, আমি চাই না যে আমার ছেলে ঋষির গরীব অবস্থার মধ্যে জন্ম নেয়। অগস্ত্য বললেন—তোমার পিতা রাজা, তাঁর অনেক ধনসম্পদ রয়েছে। আমি তপস্বী, আমি ধন কোথায় পাব ?

লোপামুদ্রা বললেন আপনি এত বড় তপস্বী যে, এই সংসারে যত ধন ঐশ্বর্য আছে তা নিমেষেই এনে ফেলতে পারেন। অগস্ত্য উত্তরে বললেন—সে কথা সত্য। কিন্তু এতে তপস্যার শক্তি ক্ষয় হয়।

তখন ভেবে চিন্তে অগস্ত্য রাজা শ্রুতর্বার কাছে গিয়ে কিছু টাকা পয়সা চাইলেন। শ্রুতর্বা বিনয় ক'রে বললেন—আমার রাজ্যে আয় ব্যয় সমান। যদি বেশী অর্থ থেকে থাকে আপনি তা অনায়াসে নিতে পারেন। অগস্ত্য দেখলেন রাজার কথাই ঠিক। সেখান থেকে কিছু নিলে প্রজাদের কষ্ট হবে।

তখন তিনি গেলেন রাজা ব্রধ্নশ্বের কাছে। তাঁর সঙ্গে শ্রুতর্বাও গেলেন। ব্রধ্নশ্বও একই কথা বললেন তাঁকে। তারপর অগস্ত্য, শ্রুতর্বা আর ব্রধ্নশ্ব গেলেন রাজা ত্রসদস্যুর কাছে। সেখানেও সেই একই অবস্থা।

তিন ধনী রাজা, তিনজনেই কিছু দিতে পারলেন না অগস্ত্যকে। অবশেষে তাঁরা তিনজনে আলোচনা করে অগস্ত্যকে জানালেন যে ইল্বল নামে যে দৈত্য আছে তার কাছে অনেক ধনদৌলত রয়েছে, তখন সবাই মিলে ইল্বলের কাছে যাওয়াই স্থির হল।

ইল্বলের রাজ্যের সীমান্তে তাঁরা পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীদের নিয়ে ইল্বল এগিয়ে এল অগস্ত্যকে অভ্যর্থনা করতে। সঙ্গে সঙ্গে তিন রাজাও আদর অভ্যর্থনা পেলেন।

ইল্বল একটা মন্ত্র জানত। সে যার নাম ধরে ডাকত সে যমের মৃত্যুপুরী থেকেও চলে আসত।

ইল্বল ছোট ভাই বাতাপিকে কেটে রেঁধে কোনো ব্রাহ্মণকে খাওয়াত। তারপর বাতাপির নাম ধরে ডাকত। বাতাপি সেই ব্রাহ্মণের গা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসত। ব্রাহ্মণ যেত মরে। এমনি করে ইল্বল অনেক ব্রাহ্মণকে মেরেছে। ব্রাহ্মণের উপর যে তার বিশেষ রাগ ছিল তার কারণও একটা ছিল। সে এক মুনির কাছে একটি ছেলে বর চেয়েছিল। মুনি তা দেন নি।

বাতাপি কখনও হয়ে যেত ছাগল, কখনও ভেড়া। সেদিন বাতাপি একটা ভেড়া হয়ে গেল। অতিথি সৎকারের জন্য সেই ভেড়াটিই কাটা হল দেখে ভয়ে রাজা শ্রুতর্বা, রাজা ব্রধ্নশ্ব আর রাজা ত্রসদস্যুর মুখ শুকিয়ে গেল। অগস্ত্য তাঁদের অভয় দিলেন। তিনি সব চেয়ে ভাল আসনে বসলেন খেতে। বাতাপি হেসে হেসে নিজের হাতে মাংস পরিবেষণ করল আর অগস্ত্য খেয়ে চললেন। সমস্ত মাংসটা তিনি একাই খেয়ে ফেললেন।

—বাতাপি, চলে এসো—বাতাপি বেরিয়ে এসো, বার বার ইল্বল ডাকতে লাগল। অগস্ত্য বললেন—বাতাপি আর আসে কি করে? তাকে যে আমি হজম করে ফেলেছি। ভাইয়ের কথা শুনে দৈত্য ইল্বলের খুব দুঃখ হ'ল। কিন্তু কি আর করবে? একে নিজে অপরাধী, তার উপর বোঝা গেল অগস্ত্যও সামান্য নন। তাই দুঃখ মনে চেপে হাত জোড় করে জিজ্ঞেস করল—আপনারা কেন এসেছেন? বলুন আমি কি করতে পারি আপনাদের জন্য।

অগস্ত্য বললেন—তোমার অনেক ধন আছে। এই রাজাদের টাকাকড়ি বেশী নেই অথচ আমার অনেক টাকার দরকার। দিলে অন্য লোকে যাতে কষ্ট না পায় এমনভাবে আমাদের কিছু ধন দান কর।

মুনির ক্ষমতা পরীক্ষা করার জন্য ইল্বল বলল—আমি মনে মনে যা দিতে চেয়েছি তা যদি আপনি বলতে পারেন তবেই আপনাকে অর্থ দান করতে পারি—।

অগস্ত্য বললেন—অসুর, তুমি প্রত্যেক রাজাকে দশ হাজার গরু আর দশ হাজার করে মোহর দিতে চেয়েছ। আর আমাকে তার দ্বিগুণ গরু আর ধন, একখানা সোনার রথ আর দু'টি ঘোড়া দিতে চেয়েছ—যে ঘোড়া মনের চেয়েও আগে চলে। আচ্ছা, রথটাই দেখ না—সোনার নয়?

ইল্বল ভাল করে চেয়ে দেখে সত্যি রথটা সোনার হয়ে গিয়েছে।

তারপর ঋষি যা বলেছিলেন ইল্বল তার চেয়েও বেশী ধনসম্পদ দিল তাঁকে। আর সেই সোনার রথে দুইটি ভাল ঘোড়াও জুড়ে দিল—ঘোড়া দুটির নাম বিরাব আর সুরাব। অগস্ত্যকে নিয়ে, রাজাদের নিয়ে, ধন নিয়ে নিমেষেই রথ চলে এল আশ্রমে। সেখান থেকে রাজারা চলে গেলেন যে যার রাজ্যে অগস্ত্যের অনুমতি নিয়ে। ধন পেয়ে লোপামুদ্রা সন্তুষ্ট হলেন।

এবারে ঋষি বললেন—তোমার কেমন ছেলে পছন্দ—এক হাজার পুত্র? না একশ'টি পুত্র যারা প্রত্যেকে দশটি পুত্রের সমান? না দশটি পুত্র যারা প্রত্যেকে একশ'টি পুত্রের সমান? না কি সহস্র পুত্রকে জয় করতে পারে এমন একটি পুত্র?

লোপামুদ্রা বললেন—আপনার আশীর্বাদে আমার হাজার ছেলের মত একটি ছেলেই হ'ক। কারণ, একটি বিদ্বান্ ছেলে অনেক মূর্খ ছেলের চাইতে ভাল। ঋষি বললেন—তাই হবে। সাত বৎসর পরে লোপামুদ্রার একটি তেজস্বী পুত্র হল। তার নাম রাখা হ'ল দৃঢ়স্যু। সে হ'ল যেমন কবি, তেমন পণ্ডিত আর তেমনই বড় তপস্বী। ছেলেবেলা থেকেই সে বন থেকে কাঠের বোঝা বয়ে এনে বাবা অগস্ত্যকে সাহায্য করত সেজন্য তার আর এক নাম হল—ইধ্মবাহ অর্থাৎ কাঠ বয়ে আনে যে।*

বনবাসের সময়ে যুধিষ্ঠিরকে লোমশ মুনি এ গল্পটি শুনিয়েছিলেন

ময়না

প্রণব দাসগুপ্ত

ছোট্ট পাখি ময়না
কেষ্ট কথা কয়না—
মিটিমিটি রয় সে চেয়ে
মোটেই দাঁড়ে রয়না।

নীল আকাশে উড়বে,
বনে বনে ঘুরবে,
ডালে বসে টুকুসটুকুস
মুখেতে ফল পুরবে।

(আমার নাম পানু, বয়স বারো বছর। বাস থেকে পড়ে গিয়ে আমার শিরদাঁড়া জখম হয়ে গিয়েছে বলে হাঁটতে পারি না, একটা ছোট গাড়ি চড়ে বাড়ির মধ্যে ঘুরে বেড়াই আর তেতলার জানালা দিয়ে চারিদিকে দেখি।

ভজুদা সকালে আমাকে তিন ঘণ্টা পড়ান, আমি বাড়িতে বসেই বার্ষিক পরীক্ষা পাশ করেছি।

বড় মাস্টার প্রতি রবিবারে আমাকে গল্প বলতে আসেন। গুপি আমার বন্ধু, সেও গল্প শোনে।

তিনি লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা করেছেন, সারা পৃথিবী ঘুরে সাংঘাতিক, রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। ঝড়ের মধ্যে জাহাজডুবি হয়েছিল, হাঙরে একটা পা কামড়ে টেনে নিয়েছিল, এখন কাঠের পা। অগ্নিকাণ্ডে বৌ-এর মুখ পুড়ে গিয়েছিল। এখন সব ছেড়ে ছুড়ে সামান্য টাকায় ছাপাখানার প্রুফ দেখেন আর নাইট স্কুল চালান।

গুপি তার ছোট মামার কাছ থেকে নানা বই আনে, মঙ্গলের মানুষ, চন্দ্রনাথের চন্দ্রযাত্রা—এই সব। আমরা ঠিক করেছি বড় হয়ে চাঁদে যাব। গুপির ছোট মামা মহাকাশ-যান বানাবে।

সরকারি ছাপাখানার ওপাশে চার বছর ধরে যে বাড়িটা তৈরি হচ্ছে, ছোটমাস্টার শুনেছেন যে ওখানে ঠাণ্ডাঘর হবে। আলু পেঁয়াজ থাকবে। ঠাণ্ডাঘর বানাতে কখনও চার বছর লাগে? গুপি বলেছে যে ওখানে স্পেস-শিপ বানাচ্ছে।)

তিন

ঠিক এই সময় কলেজের বিকেলের ক্লাস সেরে ভজুদা এসে উপস্থিত হলেন। মুখে শুধু এক কথা। ওঁদের কলেজের প্রিন্সিপ্যালের নতুন গাড়ি দিন দুপুরে, কলেজের গেটের ভিতর থেকে, একরকম দরোয়ানের নাকের

ডগার তলা দিয়ে, চুরি গেছে। এই অবধি শুনে ছোটমাস্টার সুড়সুড় করে সরে পড়লেন। মা-বাবাও তখনি বাড়ি এলেন। সিঁড়িতে ছোটমাস্টারের সঙ্গে দেখা।

ঢুকেই বাবা আমাকে বললেন, 'কে ঐ স্লিপারি কাস্টমারটি? সোজা তাকায় না কেন?' মা-ও বললেন, 'যাকে তাকে ঘরে ঢোকাস্‌নি বাবা, কতবার বলেছি।' আমি রেগে গেলাম, কিন্তু কিছু বলার আগেই গুপি আস্তে আস্তে বলল, 'না মাসিমা, উনি ভালো লোক, বড় মাস্টারমশাইয়ের নতুন অ্যাসিস্টেন্ট। ওঁর নাম তলাপত্র, এম্‌-এ পাশ।'

বাবা বসে পড়ে বললেন, 'কোত্থেকে ধরে আনে এসব লোক? যেমন করে মাথা নিচু করে পাশ কাটিয়ে হন্‌ হন্‌ করে নেমে গেল, আমি ভাবলাম নির্ঘাৎ কিছু সরিয়েছে। কেমন আছ ভজু?'

আমি বললাম, 'ভজুদাদের প্রিন্সিপ্যালের নতুন গাড়ি হাওয়া!' বাবা চমকে উঠলেন! 'আরে, মেজকাকুর গাড়িও যে পোস্টাপিসের সামনে থেকে ঠিক সাত মিনিটের মধ্যে ডিস্যাপিয়ার্ড!'

মা বললেন, 'কাল সন্ধ্যেবেলায় গেছে আর আজ দুপুরে চিড়িয়া মোড়ে পাওয়া গেল। সুখের বিষয়, পাঁচটা টায়ার, ব্যাটারি, যন্ত্রপাতির বাক্স আর হেডলাইট ছাড়া কিচ্ছু হারায়নি। থানার ওঁরা নাকি বলেছেন, পুরনো হলে নাকি এইভাবে পাওয়া যায় আর নতুন হলে বেমালুম উধাও। আসবে ঠাকুরপো একটু বাদেই, তার কাছেই শুনো সব কথা।'

বাবা কাষ্ঠ হেসে বললেন, 'স্রেফ বিদেশে পাচার। বিদেশ তো এখন বেশি দূর নয়। পদ্মাও পার হতে হয় না। তারপর ভজুদার কাছে শুনলাম যে এই গাড়ি চুরির ব্যাপারেও একটা ভালো দিক আছে। গড়ে নাকি এই কলকাতা শহর থেকেই রোজ একটা করে গাড়ি চুরি থানায় রিপোর্ট হয়। নাকি বেশ কয়েক হাজার বেকার লোক এই দিয়ে করে খাচ্ছে। সেটাকে খুব খারাপ বলতে পারলাম না। তবু একটু সাবধানে থাকাই ভালো। ভাগ্যিস্‌ দাদুর দেওয়া আমার এই দু চাকার গাড়িটা তিনতলা থেকে নামে না। তবু আজ রাত থেকে ওটাকে আমার পায়ের বুড়ো আঙুলের সঙ্গে বেঁধে রাখব। এতটুকু টান পড়লেই চোর বাছাধন হাতেনাতে ধরা পড়বেন। হতে পারে আমি চলতে পারি না, কিন্তু হাতে আমার খুব জোর। তাছাড়া রাতে আমার ঘরে রামকানাই শোয়। সে রোজ ভোরে উঠে আদা দিয়ে ছোলা ভিজে খেয়ে আধ ঘণ্টা বুক-ডন করে আর মুগুর ভাঁজে। খুব ঘামে।

গুপি বাড়ি যাবার জন্য উঠেছিল এমন সময় মেজকাকু একজন মোটা বেঁটে লোককে নিয়ে উপস্থিত। লোকটাকে আগেও কাকুর বাড়িতে দেখেছি। ওঁর নাম নিতাই সামন্ত। মেজকাকু বলেছেন নাকি দুঁদে ডিটেকটিভ, ওঁর ভয়ে অনেক ঘাটে বাঘে গোরুতে এক সঙ্গে জল খায়। গাড়ি চুরির কথায় বললেন, 'ওরা জানে না কিন্তু ওদেরো এবার হয়ে এসেছে। যে সে নয় এবার বাছাধনরা বিনু তালুকদারের পাল্লায় পড়েছে। দিল্লীর পুলিসের বিখ্যাত গোপন গোয়েন্দা বিনু তালুকদার। এদিকে অক্সফোর্ড থেকে বি-এ পাশ। দেখে মনে হয় রোগা লিকলিকে নিরীহ মাস্টারমশাই, ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। ওদিকে স্রেফ ম্যাজিশিয়ান!'

গুপি, বলল, 'ও মোটর চোরদের ধরে দেবে?'

'দেবে না তো কি! এদের ঘাঁটিসুদ্ধ বের করে দেবে।'

বিনু বলে গাড়িগুলো একবার গেল তো গেল! যতক্ষণ না চোররা ইচ্ছা করে পথের ধারে ফেলে রাখছে, ততক্ষণ তাদের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। তার মানেই এইখানে এই কলকাতা শহরের মধ্যেই ওদের কোনো লুকানো আস্তানা আছে। সেখানে চোরাই গাড়ির রং পালটানো হয়, নম্বর বদলানো হয়, চেহারা এমনি করে দেওয়া হয় যে তাদের আসল মালিকের নাকের সামনে দিয়ে চলে গেলেও মালিকরা টের পায় না। শুধু

তাই নয় যারা এই চোরাই ব্যবসায় পাণ্ডা তারাও ভোল বদলে এমনি ভালো মানুষ সেজে থাকে যে তাদেরো চেনা যায় না। এখানে ওখানে ভালো ভালো চাকরি বাকরি করে, গাড়ি হাঁকায়। মাঝে মাঝে ওদের গাড়িও চুরি যাওয়া বিচিত্র নয়। একটা পান দিন তো।'

এই বলে নিতাই সামন্ত খুব হাসতে লাগলেন। তারপর পান খেয়ে আরো বলতে লাগলেন।

'এবার হয়েছে যেমন কুকুর তেমনি মুগুর। বিগুর দলের টিকটিকিরাও শহরের চারদিকে চারিয়ে আছে। তাদের টিকিটি চিনবার জো নেই কারো। চোর ছ্যাঁচড় ধরবার জন্যে তারা চোর ছ্যাঁচড় সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে! একেবারে ওদের দলের ভেতরে সেঁদিয়ে তারা সমস্ত ব্যাপারটাকে নস্যাৎ করে দেবে।'

মেজকাকু জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এখানকার আশে-পাশেই কোথাও ওদের ঘাঁটি হয় তো। ঐ তো গঙ্গার ঘাটে মাল বোঝাই নৌকোর ভিড়। ঐ কয়লা আর খড়ের তালের মধ্যে দিব্যি একটা করে আস্ত মোটর গুঁজে পাচার করে দেওয়া যায়। আরে, আমারি যে—' এই অবধি বলে আমার আর গুপির দিকে তাকিয়ে মেজকাকু চুপ করলেন।

নিতাই সামন্ত তাড়াতাড়ি বললেন—'এই রকম জায়গাতেই আইনভঙ্গকারীরা থাকে। উঃ, তাদের মধ্যে দিব্যি আছেন, দাদা, জানলায় একটা শিক্ পর্যন্ত নেই!' বাবা একটু অপ্রস্তুত হলেন—ইয়ে তিনতলার উপর সে-রকম—শুনে নিতাই সামন্তর সে কি কাষ্ঠ হাসি!

'ঐ আনন্দেই থাকুন, স্যার! আপনার বাড়িটাকে চোরদের সোনার খনি বানিয়ে রাখুন! জানেন, ওরা টিকটিকির মতো দেয়াল বেয়ে ওঠানামা করে! ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়। আচ্ছা ঐ সরকারি ছাপাখানার শেডে কারা সব গুল্তানি করছে?'

আমি বললাম,—'বড় মাস্টারের নাইট স্কুলের ছাত্ররা রবিবার ওখানে মিটিং করে।'

নিতাই সামন্ত তো অবাক! 'তাই নাকি! বাঃ, বেড়ে আছে তো, দিনের বেলায় ছাপাখানায় ভালো মাইনের চাকরি, তেওয়ারির দোকানে চারবেলা পাতপাড়া, সন্ধ্যেবেলায় মিটিং আর রাতে—' এই বলে নিতাই সামন্ত উঠে পড়লেন। মেজকাকুও উঠলেন, 'চলি রে পানু, নিতাইয়ের আবার নাইট-ডিউটি আছে।' ওঁরা দরজার কাছে যেতেই বাবা গুপিকে বললেন—'কিরে, তোর বাড়িঘর নেই নাকি? যা, ওদের সঙ্গেই যা।' তারপর দমাস্ দমাস্ করে আমার জানলা দুটো বন্ধ করে ছিটকিনি এঁটে দিলেন। হাসি পেল। যে কেউ ইচ্ছা করলেই পাশের বাড়ির ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে রাস্তা থেকে উঠে এসে, একটা তক্তা ফেলে আমাদের ঘোরানো সিঁড়িতে উঠতে পারে। রাতে রান্নাঘরের দরজা বন্ধ থাকে বটে, কিন্তু কার্নিশ দিয়ে দু হাত হাঁটলেই আমাদের পিছনের বারাণ্ডায় ওঠা যায়। তারপর দরজার খড়খড়ির ভিতর দিয়ে হাত গলিয়ে খাবার ঘরের দরজা খুলে ফেলা যায়। রামকানাই নিজে একবার দেরি করে ফেলে বাইরে বন্ধ হয়ে গিয়ে, ঐ রকম করে এসেছিল।

পরদিন ভজুদার কাছে কথাটা তুললাম।

'ভজুদা, রাতে রোজ ঠক্ ঠক্ শব্দ শুনি।'

ভজুদা চোখ পাকিয়ে বললেন, 'ভূতে বিশ্বাস আছে নাকি?' 'না না, ভূত না, কিন্তু কিছু হয় তো তৈরি হচ্ছে ওখানে।' 'কোথায়? ঐ ছাপাখানার পিছনে, নতুন ঠাণ্ডা-ঘরে? ও তো এখনো শেষই হয় নি। সব বিষয়ে যুক্তি দিয়ে ভাবতে চেষ্টা করবে।'

'না ভজুদা ভিতরটা হয়ে গেছে, শুধু সামনের দিকটাই চার বছর ধরে তৈরি হচ্ছে। গুপি বলে—'

ভজুদা বললেন, 'লেখো, একটা বাঁদর একটা তেল তেলা বাঁশ বেয়ে এক মিনিটে—কি হল?'

'ভজুদা, বড়মাস্টারমশাই নাকি ভূত দেখেছেন। এখানে সব্বাই ভূতের ভয় পায়। সন্ধ্যার পর কেউ ঘাটের গলির দিকে যাবে না। রেলের লাইনে পা দেবে না। রামকানাই বলেছে রাতে ও-লাইনে যে-সব গাড়ি আসে তারা কোনো মালগুদোম থেকে আসে না।'

ভজুদা বিরক্ত হয়ে উঠলেন, 'তা হলে কি বুঝতে হবে যে শুধু মানুষ মলেই ভূত হয় না, রেলগাড়িদেরো ভূত হয়? নাও, চটপট অঙ্কটা টুকে ফেল। তাছাড়া একটু হাঁটাচলা করতে অভ্যাস কর এবার। যত সব আজগুবি চিন্তা? ভূতফুত নেই। এক্সারসাইজ্‌ করলেই টের পাবে।'

অঙ্ক কষা হয়ে গেলে, বললাম, 'আচ্ছা, ভূত না থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে যে কেউ লুকিয়ে স্পেস্-স্টেশন বানাবে না, তাইবা কি করে বলা যায়?' ভজুদা অবাক্ হয়ে আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'এ বিষয়ে কয়েকটা বৈজ্ঞানিক বই এনে দেব। তাহলেই বুঝবে যে স্পেস-স্টেশন চাট্টিখানিক কথা নয় যে গুদোম ঘরে লুকিয়ে বসে রাতে হাতুড়ি পিটে অমনি বানানো যাবে। আর বড় মাস্টার ভূত দেখেছেন না হাতি দেখেছেন! ওসবে কান দিতে হয় না।' ভজুদা চলে গেলে মনে হল কথাটা না তুললেই পারতাম। গুপি বারণ করেছিল।

সব শুনে, পরের রবিবার বড় মাস্টার বললেন, ভূত নেই বলেছে ভজু? চব্বিশ বছর বয়স না হতেই সব জেনে ফেলেছে নাকি? আমার আটষট্টি বছর বয়স। যতই দিন যায় ততই বুঝি কিছু জানা হয় নি, আসল জিনিসই সব বাকি আছে। শোন্ তবে। জইন্তিয়া পাহাড়ের নাম শুনেছিস্? এখনকার জইন্তিয়া কি রকম জানি না, কেঠো পা নিয়ে কোথায়-ই বা যেতে পারি বল্? তবু মনে হয় মাঝে মাঝে দুটো পার তলায় যেন জইন্তিয়া পাহাড়ের স্প্রিংএর মতো ঘাস এখনো টের পাই। মাইলের পর মাইল শুধু ঘাস আর বড় বড় পাথর। পাথরের যে দিকটাতে রোদ পড়ে না, সেদিকে নরম নরম শ্যাওলা হয়ে থাকে। তাতে শীতের আগে ছোট্ট ছোট্ট হলদে আর গোলাপি ফুল ফোটে, খুদে খুদে ফল ধরে। ঘাসজমির পাশেই হয়তো বাঁশবন। সে রকম বাঁশবন তোরা দেখিস নি। গাঢ় কালচে সবুজ, আমার পায়ের তিনগুণ মোটা গুঁড়ি থেকে সরু হতে হতে ষাট ফুট উঁচুতে উঠে, কচি কলাপাতা রঙের একগুছি পাতা আর কড়ে আঙুলের মতো সরু একটা কুঁড়িতে গিয়ে শেষ হয়েছে। গুঁড়ির গায়ে পুরু একটা খাপের মতো জড়ানো। তাতে মিহি রোঁয়া, ছুঁলেই আঙুলে লেগে যায় আর জ্বালা করতে থাকে। তার পাশে দিন রাত ঝর ঝর করে পাহাড়ের অনেক উঁচু থেকে জল পড়ে।

পাহাড়ের উপরে দেবদারুর বন। একবার আমার বন্ধু হরিদাস আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল। সবুজ পায়রা শিকার করার ইচ্ছা তার। ওখানকার লোকরা অনেক বারণ করেছিল, ও পাহাড়ে নাকি কেউ চড়ে না; পাহাড়ের 'দেউ' ভারি রাগী; কেউ তাঁর জানোয়ার মারলে তাকে নাকি হাতেনাতে সাজা দেন। জিনিস বইবার জন্তে পর্যন্ত একটা লোক পাওয়া গেল না। শেষটা নিজেরাই ব্যাগে করে খাবার, জলের বোতল, টোটা আর কাঁধে বন্দুক নিয়ে চললাম। সারাদিন ঘুরে ঘুরে একটা চড়াইপাখি পর্যন্ত দেখতে পেলাম না। হরিদাসের কি রাগ। এ বনে জানোয়ার গিজগিজ করে, পাহাড়ের তলা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে সবুজ পায়রা উড়তে দেখা যায়, অথচ একটা কাঠবেড়ালি পর্যন্ত দেখা গেল না। বিরক্ত হয়ে আমাকে বলল, 'তুমি বড় খড়মড় করে হাঁট, তারি জন্যে জানোয়ার পালায়।' শেষে ক্লান্ত হয়ে, একটা বনের মধ্যে ছোট একটা ঝিলের ধারে বসে খাওয়া দাওয়া করলাম। তারপর হরিদাস শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল। আমার কেমন বুক ঢিপঢিপ করছিল, চোখে আর ঘুম আসছিল না।

এখানে বনের গাছগুলো যেন অন্য ধরনের, বড় বেশি লম্বা, বড় বেশি ঘন, পাতাগুলো বড় বেশি বড়।

হঠাৎ চমকে দেখি বড় বড় গাছের গুঁড়ির সঙ্গে মিলিয়ে আছে অনেক হাতির পা; তাদের মস্ত কান নাড়াও দেখতে পাচ্ছিলাম। তাকিয়ে তাকিয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিতে লাগল। জঙ্গলের ভেতরকার অন্ধকারে যেই চোখ সয়ে গেল, দেখি হাজার হাজার জানোয়ারের ভিড়, ছোট বড় মাঝারি, বাঘ ভালুক, হরিণ, ভাম, খরগোশ গাছের ডালে ডালে পাখি। অথচ এতটুকু শব্দ নেই। হাতি দেখেই বন্দুক তুলে নিয়েছিলাম। এবার সেটা হাত থেকে খসে ঝিলের জলে পড়ে গেল। চারদিকে কেমন একটা থমথমে ভাব। তারি মধ্যে হরিদাস উঠে বসে পাগলের মতো এপাশে ওপাশে তাকিয়ে দেখে, বন্দুক সেইখানেই ফেলে রেখে উল্টো দিকে টেনে দৌড়। ঐ যে একটু শব্দ, নড়াচড়া, অমনি দেখি চারদিক ভোঁ ভাঁ কেউ কোথাও নেই। আমার শরীর কাঁপছিল, তবু এক পা দু পা করে বনের মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম। গাছের নিচে পা দিতেই একটু হাওয়ায় ডালপালা দুলে উঠল আর আমার গায়ে মাথায় টুপটাপ করে সাদা সাদা বড় বড় ফুল ঝরে পড়তে লাগল। দেখলাম বনের মধ্যে একেবারে অন্ধকার নয়, গাছের ফাঁক দিয়ে পড়ন্ত রোদ ঢুকছে। কি জানি মনে হল, দুমুঠো ফুল ছড়িয়ে বনের দেউকে মনে করে একটা গাছের গুঁড়িতে ছড়িয়ে দিলাম।

তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে পাহাড় থেকে নেমে এলাম। কত হরিণ, কত পাখি, কত সবুজ পায়রা দেখলাম, দিনের শেষে বাসায় ফিরছে। ডেরায় ফিরতেই দেখি হরিদাস তল্পিতল্পা বেঁধে যাবার জন্যে তৈরি। বললে—'জায়গাটা সত্যি ভালো না।' সেইদিন-ই ফিরে এলাম।'

মাস্টারমশাই থামলে গুপি বলল—'এ আবার কিরকম ভূতের গল্প?' বড় মাস্টার হেসে বললেন, 'ভূতের গল্পের আবার এ-রকম সে-রকম হয় নাকি? যেমন দেখেছিলাম, বললাম। তলাপত্রকে কেমন লাগল?'

আমি বললাম, 'ভালো। কিন্তু বাবা বললেন—সোজা তাকায় না কেন? মা বললেন,—যাকে তাকে ঘরে ঢুকতে দিস্ না। আচ্ছা, মাস্টারমশাই, আমার পা দুটোতে কি কোনো তফাৎ দেখতে পাচ্ছেন? আমি স্বপ্নে খুব দৌড়ই।' মাস্টারমশাই বললেন, 'সে আর এমন কি। আমার নেই-পাটাতে যখন চুলকোয়, তখন কি করে আরাম পাই বল্ দিকিনি?'

গুপি তখন কথা পালটে বলল, 'জানেন মাস্টারমশাই, মহাকাশযানগুলো যখন অনেক উপরে, অনেক দূরে চলে যায় তখন আর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কাজ করে না। কোনো জিনিস নিচের দিকে যায় না, সব উপরে উঠতে থাকে। আমার চন্দ্র-যাত্রার নতুন বইটাতে আছে যাত্রীরা যদি নানান উপায়ে নিজেদের নিচে আটকিয়ে না রাখে, সবাই বেলুনের মতো উড়ে গিয়ে, আকাশযানের ছাদের কাছে ঝুলে থাকবে।'

বড় মাস্টার মহাকাশযাত্রার কথা শুনলে চটে যান। বিরক্ত হয়ে বললেন, 'নিশ্বাস ফেলবার বাতাস নিয়ে যেতে হয় না বোতলে ভরে? যাত্রীরা উড়ে বেড়াবার জায়গা কোথায় পাবে?'

গুপি বলল, 'আমার চন্দ্রযাত্রার বইয়ের লোকরা একরকম আগাছা নিয়ে গেছিল, তারা যাত্রীদের নিশ্বাস ফেলা কার্বন ডায়োক্সাইডগুলোকে আবার অক্সিজেন বানিয়ে দিত। বোতলে করে কত বাতাস নেবে? আর শুধু চাঁদে গেলেই তো হল না, চাঁদটা খালি একটা টিকিট কাটার স্টেশনের মতো—।'

বড় মাস্টার উঠে পড়ে, ঠুক ঠুক করে কাঠের পা ঠুকতে ঠুকতে যেই এক পা পেছু হটেছেন অমনি 'হঁ—য়া—য়া—ও' করে সে কি বিকট চিৎকার!. তাকিয়ে দেখি কেঠো পা ঠিক পড়েছে নেপোর বেঁড়ে ল্যাজের ডগায়! পাটা তুলতেই এক ঝিলিক বিদ্যুতের মতো নেপো জানলা টপকে ধনে পাতার গাছ মাড়িয়ে কার্নিশ পেরিয়ে, পাশের ফ্ল্যাটের কালো মেমের জানলা গলে হাওয়া!

মাস্টারমশাই কাঁপতে কাঁপতে আবার চেয়ারে বসে পড়লেন। মুখটা একেবারে সাদা, চোখদুটো জলজল করছে, ভাঙা গলায় বললেন,—'নেপোর গলা থেকে ঐ শব্দ বেরুল! আশ্চর্য! ওকে একটু ধরা যায় না?' আর ধরা! ততক্ষণে মেমের রান্নাঘর থেকে ঝন্-ঝন্ ক্যাঁও ম্যাও, তারপর সব চুপ। ক্রমশঃ

ছোটদের জন্য ছোট্ট গল্প
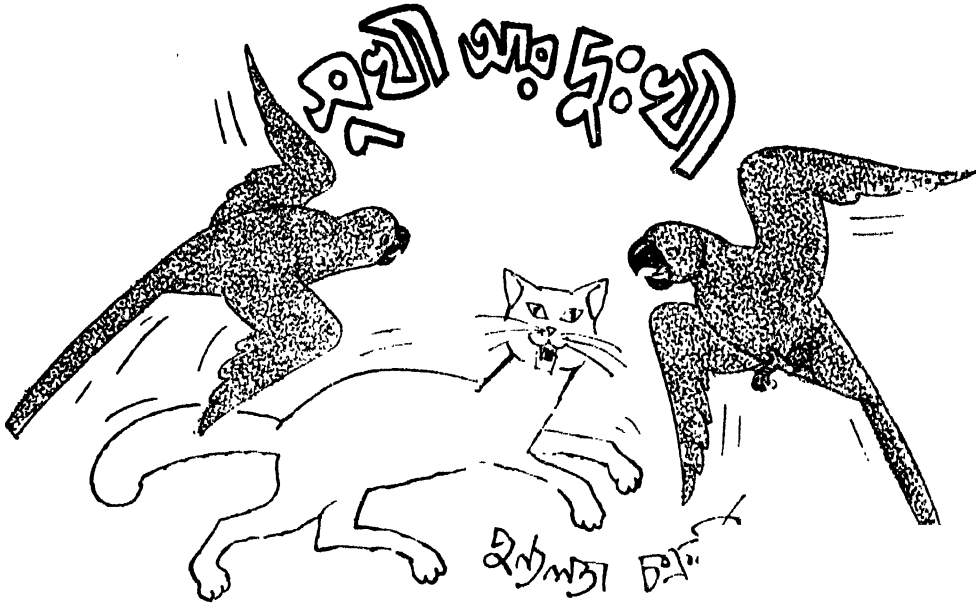
দুটো টিয়াপাখির ছানা—বাসা থেকে পড়ে গিয়ে একটার খুব লেগেছে। বীণা গাছতলা থেকে তাদের তুলে আনল। নিজে খেতে পারে না, বীণার মা জল দিয়ে ছাতু মেখে, ছোট্ট ছোট্ট গুলি পাকিয়ে, তাদের হাঁ করিয়ে খাইয়ে দিলেন।

এখন ছানারা বড় হয়েছে—কথা বলতে, শিষ দিতে শিখেছে। একটা মোটাসোটা, তার নাম সুখী। অন্যটা রোগা, কাণা, ডানা-ভাঙা—তার নাম দুঃখী।

সকাল হলেই তারা ডাকে—'বীনু-মা, ও-ও-ও বীনু-মা!' অমনি বীণা ছোলা নিয়ে ছুটে যায়। দাঁড়ে বসে দুই পাখি ভিজা-ছোলা খুঁটে খায়, বীণার ভারি ভাল লাগে দেখতে!

পাশের বাড়ির হল্‌দে বেড়ালটাও রোজ তাকিয়ে দেখে, আর ভাবে 'একবার ধরতে পারলে হয়।' নাম তার 'সোনালী।'

একদিন সোনালী বীনুদের বাড়িতে এসে এক লাফে দুঃখীর লেজ ধরে ফেলল। অমনি সুখী দাঁড় থেকে ঝুলে পড়ে তার কান কামড়িয়ে ধরল—'ক্যাঁ-ক্যাঁ, ঝট্-পট্, ফ্যাঁস্-ফ্যাঁস্, ম্যাও-ম্যাও'—বিষম ব্যাপার!

পট্‌পট্ পালক ছিঁড়ল, ঝর্‌ঝর্ রক্ত ঝরল, পালক মুখে নিয়ে সোনালী পালাল—তার কানের ডগাটা সুখীর মুখে রয়ে গেল।

শ্যামাপ্রসাদ

তমাল চট্টোপাধ্যায়

জননীর তুমি গর্ব হে বীর
গৌরব চিরদিন
জনম তোমার শুভ কোন্ ক্ষণে
রহিতে মৃত্যুহীন !

পৃথিবীর বুকে আদিযুগ হ'তে
মানুষ এসেছে কত
মৃত্যুরে ঠেলি কেবা আজও হেথা
রয়েছে তোমার মত !

মুক্তির পথে স্বদেশের লাগি
হৃদয় করেছ দান
রাজশক্তিরে দিয়েছ বিদায়
রেখেছ মোদের মান ।

তোমার মন্ত্রে দীক্ষা নেব
আমরা তরুণ দল
দেশের মুক্তি রইবে অটুট
থাকলে আত্মবল ।

সন্দেশ নিয়মিত পাচ্ছ ত ?

* প্রতি ইংরাজি মাসের ২৯।৩০ তারিখে পরবর্তী মাসের সন্দেশ under certificate of posting পাঠান হয় ।

* তবু কিছু সন্দেশ ডাকে হারায় ।

* ইংরাজি দশ তারিখের মধ্যে সন্দেশ না পেলে ২০ তারিখের মধ্যে আমাদের জানাবে তখনই আর এক কপি পাঠিয়ে দেব ।

* ঠিক সময়ে না জানালে দ্বিতীয় কপি পাঠাতে অসুবিধা হয় । অবশ্য নিজে এসে নিয়ে গেলে, অথবা '৩৫ ডাক খরচ পাঠালে পরেও দ্বিতীয় কপি দেওয়া যায় ।

মুসুরিয়ার চিতা

সৌরেন্দ্র কুমার পাল

শিকার আমার পেশা নয়। নেশা বলতে পারা যায়। নইলে, ডাক পড়লেই বা নিশির ডাকে সাড়া দেওয়ার মত ছুটে যাই কেন সব কিছুকে পিছনে ফেলে। এমনি ধারা কত ডাকে কত জায়গায় গিয়েছি। কোথাও পেয়েছি শিকারের কিছু খোরাক, আবার কোথাও বা বিফল হয়ে ফিরেছি। কিন্তু, বিফলতা কোনো ক্ষেত্রেই আনন্দকে মলিন করতে পারেনি। কারণ, জঙ্গলে যাওয়া মানে শুধুই যে শিকার তা নয়; প্রকৃতির যে অপূর্ব শোভা সেখানে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন রূপে পরিবেশিত হচ্ছে তাকে দেখা, তাকে মন প্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করা আর সেই রূপের ফল্গু ধারায় নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার এক অনাবিল আনন্দ আছে। সেই অনবদ্য রূপ মোহের ইন্দ্রজাল সতত মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। যত দূরেই থাকি আর যেথানেই থাকি সেই সৌন্দর্যের ডাকের ইসারা মানস চোখে দেখতে পাই।

তাছাড়া আছে বনচারিণীর দল; আছে কত রকমের পাখি ও কীট-পতঙ্গ। সেখানে স্বাধীন এবং নিজস্ব সত্তা নিয়ে তারা জীবন যাপন করে।

সৃষ্টির এই পরিবেশের মাঝে আছে মানুষ। ছোট বড় কয়েক ঘর বসতি নিয়ে জঙ্গলের আশে-পাশে অথবা মধ্যে ছোট ছোট গ্রাম গড়ে উঠেছে। এই সব গ্রামের অধিবাসীরা প্রধানতঃ চাষাবাদের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। কেউ কুমোর বা কামার, বা অন্য পেশাও অবলম্বন করে জীবন কাটায়। মানুষের সংসারে এ সবেরও ত প্রয়োজন।

তারা দীন, গরীব। অনাড়ম্বর জীবন ধারা তাদের। তারা খাটে, ক্ষেতের ফসল তুলে ঘরে আনলে তাদের খোরাকি আসে। সারাদিন কাজ করে এসে প্রতি সন্ধ্যায় তারা গান গায়, নাচে; আবার মজলিস বসিয়ে পুরাণের কথা বা কোনো ঘটনা নিয়ে আলোচনা করে। এ সবের মধ্যে তারা আনন্দ পায়, তাদের পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি দূর হয়। বিশেষ পালা পার্বণে আনন্দের মাত্রা অনেক বেড়ে যায়। এই আনন্দের অন্যতম প্রধান অঙ্গ হচ্ছে বন্য পশু শিকার। শিকার করে হরিণ, বরাহ, খরগোশ এবং সজারু। শিকারে মারা জন্তুর মাংস আর হাঁড়িয়া বা দেহাতী মদ আনন্দের প্রধান উপকরণ।

আবার এই বন্য জন্তুরাই তাদের জীবনে পরম ক্ষতি সাধন করে। বিশেষ করে বরাহের দল। এরা রাতের আঁধারে পাকা ফসলের ক্ষেতে দলে দলে ঢুকে খাবে যত, তার বেশি খুঁড়ে নষ্ট করে দিয়ে যাবে। সম্বর এবং চিত্রল হরিণের দলও অত্যাচার থেকে রেহাই দেয় না।

এ তো গেল ফসলের ক্ষতি। আর গৃহপালিত গরু, মহিষ কি ছাগল এ সবও মাঝে মাঝে বাঘের কবলে খোয়াতে হয়। এত অত্যাচারের পরে সেই দুর্ভাগা গ্রামবাসীদের অবস্থা কি হয় তা অনুমান করা কঠিন নয়।

সেবার আমার ডাক এসেছিল এমনি ধারা অত্যাচারিত লোকদের কাছ থেকে এবং এক জায়গা নয় দু জায়গা থেকে।

রাঁচী জেলার অন্তর্গত চেনপুর জঙ্গলে প্রথমে গেলাম। সেখানে বন্য বরাহকুলের উপদ্রবে ফসলের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। বরাহ শিকারের যে আনন্দ সেটা মিটিয়ে নিলাম। কদিন সেখানে থেকে যতগুলি মারলাম তাতে স্থানীয় ওরাঁও এবং মুণ্ডা অধিবাসীদের মধ্যে বিরাট ভোজপর্ব হল। আর চলল আনন্দের হুল্লোড়।

তারপর রওনা হলাম দ্বিতীয় ডাকের পথে। হাজারিবাগ জেলার চাতরা জঙ্গলে।

একশ' দশ মাইল পথ বাসে পেরিয়ে আসতে পুরনো পরিচিত জায়গাগুলো আর একবার দেখতে দেখতে এলাম। ঘাঘরা, লোহারডাগা, কুরু, চান্দোয়া, টোরি, বালুমাৎ। এসব জায়গায় আমি পূর্বে বেড়াতে বা শিকারে এসেছি।

চাতরা সহরে ডি, এফ, ওর অফিস থেকে পারমিট নিয়ে গেলাম আমার গন্তব্য স্থানে। প্রায় আট মাইল পথ। কিছুটা সাইকেল-রিক্সায় এবং বাকিটা হেঁটে যখন আমার গন্তব্যস্থানে পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে চাতরার অন্তর্গত সিমারিয়ার জঙ্গলে।

এ বাঙলার পল্লী নয় যে, তুলসীতলায় সাঁঝের প্রদীপ দিতে পল্লীবধূ ঘর থেকে বাইরে যাবে। এখানে সেই শূন্যস্থান পূরণ করে জোনাকির মিট মিট আলো। কখনো বা কোনো বন্য জন্তুর চোখের আলো।

শুভেচ্ছা ও নমস্তের পালা শেষ করে খাটিয়ার উপর বসে গা এলিয়ে দিলাম। একটু পরে দেহাতী ঢংএর গরম চায়ের গ্লাস এল। এক চুমুক খেতেই আপনা হতে মুখ থেকে অস্ফুট শব্দ বেরল—আঃ! সারাদিনের ক্লান্তির পর দূরে ফেলে আসা সংসার পরিজন, বন্ধু বান্ধব সব ভুলে গিয়ে এই জঙ্গলের মাঝে এক গণ্ডগ্রামে কোন এক অখ্যাত দেহাতীর সেবায় সত্যি যেন মৃত সঞ্জীবনী সুধার আস্বাদ এনে দিল।

সে রাতটা ঘুমিয়ে নিলাম। সকালে উঠে মনে হল দেহে এতদিনে যত ক্লান্তি ও অবসাদ জমে ছিল, সে সব দূর হয়ে দেহ ও মন ঝর ঝরে হয়েছে। নতুন জায়গায় সেদিন প্রভাতের সূর্য আমার চোখে যেন নতুনত্বের পরিচয় নিয়ে উদ্‌ভাসিত হয়ে জঙ্গলের অপরূপ রূপ-মহিমাকে সোনালি আলোয় ঝল্‌মলিয়ে দিল।

গ্রামের ছেলে মেয়েরা রাতের আঁধারে আসা আগন্তুককে সকালে দেখতে এসেছে। নগ্ন অর্দ্ধনগ্ন ধূলো মাখা দেহ নিয়ে তারা চারিধারে ঘিরে বিস্ফারিত চোখে দেখছে শিকারী সাহেবকে। শিকারে যে আসে সেই সাহেব ওদের কাছে। সুতরাং, আমিও ব্যতিক্রম নই।

শিকারের সন্ধান নেওয়া হল আমার প্রথম কাজ। কিন্তু, এ জঙ্গল আমার অপরিচিত থাকায় আমি সাহায্যের মুখাপেক্ষি হয়েছিলাম বারহণ সিং চোধুরীর কাছে। সিংজী স্থানীয় ভূমিহার ব্রাহ্মণ এবং শিকারে দক্ষতার জন্য তিনি সুপরিচিত। কোনো সূত্রে আমার সঙ্গে তাঁর পূর্বে পরিচয় হয়েছিল।

বার্ধক্য ছাপিয়ে জরা তাঁর দেহে এসে গেছে। কিন্তু, চোখ দুটোর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি সহরের যুবকদের ঈর্ষা জাগাবে। কান এত প্রখর যে, রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় বাড়ির বাইরে শেয়াল বা বরাহ হেঁটে গেলে ওঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়।

তফাৎ থেকে আমায় দেখে হাসতে হাসতে অভিবাদন করলেন—নমস্তে, নমস্তে সাহাব।

আমিও তাঁকে নমস্কার জানিয়ে স্বাগত জানালাম।

খুব খুসি হলেন আমায় দেখে। বললেন—আপনি যে একাই আসবেন এত কষ্ট করে ভাবতে পারিনি। আপনার আসার খবর পেয়েই ছুটে আসছি।

কিছুক্ষণ আলাপ ও কথাবার্তার পর স্থানীয় বর্দ্ধিষ্ণু কৃষক রূপন সাহুর সঙ্গে শিকারের ব্যাপারে পরামর্শ করলাম। কিন্তু, কোনো সঠিক খবর না পাওয়ায় আমি আপাততঃ হাঁকোয়া শিকারের ব্যবস্থা করতে বললাম। হাঁকোয়া অর্থে—জঙ্গলের একটা এলাকা বেছে নিয়ে এক প্রান্তে লোকজন সাজিয়ে দিতে হয়। সেই এলাকার দুইধারে 'রোকয়া' যাকে ইংরাজীতে stopper বলে। তাদের কিছুটা অন্তর গাছে বা নিরাপদ স্থানে রাখতে হয়, যাতে হাঁকোয়ার দ্বারা তাড়ানো জানোয়ার ধার দিয়ে না পালাতে পারে। আর শিকারীকে বসতে হবে হাঁকোয়াদের মুখোমুখী বিপরীত দিকে।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আমার প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ হল এবং দিনের শেষে দুটো বন্য বরাহ ছাড়া আর কিছু জুটল না।

পরদিনও যখন অনুরূপ শিকারের তোড়জোড় করছি তখন একটি দেহাতী এসে আমায় এক প্রত্যাশিত খবর দিল। আভূমি সেলাম করে বলল—'সাহাব! বাঘ কাল রাতকো এক ভঁয়েস অউর লেড়ু মারা হ্যায়।'

বাঘ কাল রাতে একটা মহিষ আর গরুর বাছুর মেরেছে। কি খবর! মেঘ না চাইতেই জল। রূপন সাহুকে তৎক্ষণাৎ পাঠালাম খবরটার সত্যাসত্য জেনে আসতে। ঘণ্টা দুয়েক পরে ফিরে এসে সে জানাল যে ঘটনাটা সত্যি এবং ঘটেছে মুমুরিয়ার জঙ্গলে।

ইতিমধ্যে আমি প্রস্তুত হয়েছিলাম এবং সাহু ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমি অকুস্থলের পথে রওনা হলাম। সংবাদদাতা যুবক এবং বারহণ সিং সঙ্গে চলল।

চৈত্রের প্রথম দিক তখন। ঝরাপাতায় বনভূমি ভরে গেছে। পলাশের পাতাহীন ডালে লাল ফুলের সমারোহ। মহুয়ায় গাছ ছেয়ে গেছে, আর তার গন্ধে বাতাস ভরে সুমধুর মাদকতার সৃষ্টি করেছে। কত জানা অজানা পাখি আনন্দে সেই সব ফোটা ফুলের মধু খাচ্ছে, আবার এ গাছ থেকে অন্য গাছে উড়ে যাচ্ছে আরও অধিক মধু পাবার লোভে। কোথাও বা তাদের বিচিত্র কলরবে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠেছে। মৌমাছির ঝাঁক গুণ গুণ রবে উড়ছে আর ব্যস্তভাবে এ ফুল ও ফুল থেকে মধু আহরণে মত্ত। প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে বসন্তের সেই বাহারের মাঝে আমি চলেছি মুমুরিয়ার পথে।

সেখানে পৌঁছে ঘটনাটা শুনলাম। ছোট্ট বসতি, কয়েক ঘর নিয়ে যা গড়ে উঠেছে তাকে গ্রাম বলা চলে না। অধিবাসীরা জাতে গোর্কী, স্থানীয় সমাজে অস্পৃশ্য বলে মনে করা হয়। স্থানটি ঘিরে

আছে ছোট বড় টিলা জাতীয় পাহাড় এবং চারিদিকে ঘন জঙ্গলাকীর্ণ। বাঘের অত্যাচারে তারা যত না ভয় পেয়েছে তার চেয়ে বেশি চিন্তিত হয়েছে ক্ষতির জন্য। ইতিপূর্বে অনেক গরু মহিষ বাঘের উদরস্থ হয়েছে।

যাই হোক, যা শুনলাম বাঘ মহিষটাকে মেরেছিল বনের ধারে এবং এদের ঘর থেকে প্রায় একশ গজ দূরে। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মহিষটা বোধহয় জঙ্গল থেকে চরে খোঁয়াড়ে ফিরছিল এবং জঙ্গল পার হবার মুখে বাঘ অতর্কিতে তাকে আক্রমণ করে। তার কাতর গোঙানি শুনে গোর্কীরা চেঁচামেচি করে সেইদিকে গেল। বিপদ বুঝে বাঘ সরে পড়েছিল, কিন্তু হতভাগ্য মহিষটার তখন অন্তিম ক্ষণ উপস্থিত। ফলে তার মৃত্যু নিশ্চিত বুঝে গোর্কীরা কেটেকুটে মহিষটাকে আত্মসাৎ করেছে।

বাঘ তার শিকারে বঞ্চিত হওয়ায় এবং অভুক্ত থাকায় সেইদিনই তার প্রতিশোধ নিল। সেই রাত্রেই একটা ঘরের উঠোনে বাঁধা বাছুর নিয়ে গেছে।

কোন পথে বাঘ বাছুরটাকে নিয়ে গেছে কেউ দেখেনি। তাই রক্তের দাগ বা আক্রমণকারীর পদচিহ্ন খুঁজতে লাগলাম।

একটু খোজাখুজি করতেই আঙিনার অদূরে নরম মাটির উপর পাঞ্জার ছাপ পেলাম। পরীক্ষা করে দেখলাম চিতাবাঘের পায়ের দাগ। এখন চিন্তা হল মহিষটাকে কে মেরেছে! যদি বড় বাঘ অর্থাৎ রয়াল টাইগার হয় তবে বুঝব দুটো বাঘ এখানে অত্যাচারের রাজত্ব চালাচ্ছে এবং আমার কর্ম পদ্ধতিও সেইভাবে ঠিক করতে হবে। সুতরাং, মহিষটা যেখানে মরেছিল সেখানে গেলাম।

মাটিতে প্রচুর রক্তের চাপ চাপ দাগ যা শুকিয়ে দুর্গন্ধ হয়েছে এবং মাটিতে নানা প্রকারের দাগ ও

ঘসার চিহ্ন দেখলাম। গোর্কীরা যখন মহিষটাকে কেটেছে সেই সময় রক্ত চারিদিকে ছড়িয়েছে এবং অনেক লোক সে কাজ করার জন্য মাটিতে অত দাগ পড়েছে। ফলে বাঘের পায়ের দাগ কাছাকাছি কোথাও পেলাম না।

অগত্যা চিতা বাঘটার পিছু নেওয়া উচিত মনে করে আগের জায়গায় ফিরে এলাম। পায়ের দাগ ধরে এগোতে এগোতে রক্তের দাগ পেলাম। সঙ্গে চারজন রয়েছে। সেই দাগ অনুসরণ করতে করতে এসে পড়লাম সংকীর্ণ এক নদীর ধারে। বাঘ নদী পার হয়েছে বটে, কিন্তু ওপারে সে কোন্ পথে গেছে তা অনেক খুঁজেও পাথর এবং শক্ত জমিতে তার কোনো চিহ্নই পেলাম না। অবশেষে আরো ভিতরে প্রবেশ করে একটা নালায় এলাম। সেখানে নরম বালিতে পাঞ্জার দাগ দেখা গেল। কিছুটা এগিয়ে দেখি অনেকটা জমাট বাঁধা রক্তের দাগ। বুঝলাম বাঘ এখানে বাছুরটাকে মুখ থেকে নামিয়েছিল, যার ফলে বাছুরটার ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণ হয়েছে। পায়ের দাগ ধরে নালায় এগিয়ে চলেছি সন্তর্পণে। মাঝে মাঝে রক্তের ফোঁটার দাগও সুস্পষ্ট পাওয়া যাচ্ছিল। মুখে আমরা কেউ কোনো শব্দ করছিলাম না। শুধু প্রয়োজনমতো ইঙ্গিতে কথার আদান প্রদান চলছিল।

বেশ কিছুটা যাবার পর নালাটা এক জায়গায় হঠাৎ বেঁকে গেছে। বাঁকটার বাঁ ধারে একটা ঘন ঝোপ ছিল। আর নালাটা বেঁকেছে ডানদিকে। বাঁকের ও ধারে বা ঝোপের আড়ালে কি আছে কিছুই নজরে পড়ছিল না। এ সব ক্ষেত্রে বিপদ অনেক সময় ওৎ পেতে অপেক্ষা করে অনুমান করে, সবাই কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইলাম। সামনে কিছু নড়তে না দেখে সঙ্গীদের স্থির হয়ে দাঁড়াতে বলে, একা বন্দুক তৈরি রেখে খুব সন্তর্পণে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম, চোখ এবং কানকে যথাসম্ভব সজাগ রেখে।

সাবধানে বাঁকটা পার হয়ে এলাম। মাত্র কয়েক পা এগিয়ে যেতেই মাছির ভন্ ভন্ শব্দ কানে এল। একটা দাঁড় কাক কাছের একটা গাছ থেকে উড়ে গেল। বুঝলাম বাঘটা কাছাকাছি নেই। ইসারায় সঙ্গীদের ডেকে নালা থেকে উঠে এলাম।

মাটিতে শুকনো পাতায় রক্তের চিহ্ন পেলাম কিন্তু মড়ী কোথায়? মানে, মরা বাছুরের কিছুই তো দেখছি না। অবশেষে সবাই খোঁজাখুঁজি করে একটা ঠ্যাংএর টুকরো আর ইতস্ততঃ কয়েকটা হাড়ের টুকরো ছড়ান দেখতে পেলাম।

নালার ওপারে একটা বড় মহুয়া গাছ ছিল। তার কাছাকাছি দেখি অনেক শুকনো পাতা জড়ো করার মত রয়েছে। সন্দেহ হওয়ায় পা দিয়ে সরাতেই মরা বাছুরের দেহটা বেরিয়ে পড়ল। অর্ধেকের বেশি বাঘ খেয়েছে। বাকিটা খাবার আশায় পাতা দিয়ে সযত্নে সে ঢেকে রেখে গেছে। এ কাজ চিতা বাঘ এত সূক্ষ্ম ভাবে করে যে খুব সামনে থেকেও সহজে মড়ী খুঁজে পাওয়া যায়না।

সঙ্গের দুজনকে দেহটাকে লতা দিয়ে শক্ত করে অন্য একটা গাছের গোড়ায় বেঁধে দিতে বললাম। তারপর মাত্র দশ গজ দূরে একটা ঘন পাতাবিশিষ্ট বটগাছে উঠে প্রায় আট দশ ফুট উঁচুতে বসলাম। এখান থেকে বাছুরটাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। বাঁধার কাজ হয়ে যাওয়ায় আমার ইঙ্গিত পেয়ে

পূর্ব নির্দেশমত কথা বলতে বলতে ওরা চলে গেল। আমি একা রয়ে গেলাম বাঘের প্রতীক্ষায়। বেলা তখন দেড়টা।

শুকনো পাতা হাওয়ায় ঝরে পড়ছে। চারিদিকে শুধু পাতা ঝরার খস্ খস্ শব্দ। হঠাৎ ঠাণ্ডা হাওয়া এল। গরম জামা গায়ে না থাকায় শীত করতে লাগল। এল বৃষ্টি। এক পশলা হয়ে যাবার পর মেঘ কেটে গেল, আর আমি আধ ভেজা হয়ে গেলাম। কোথা থেকে একটা মহিষ চরতে চরতে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে এসে থমকে দাঁড়িয়ে বাতাসে শুঁকতে লাগল এবং বিপদের আশঙ্কা বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল। এর পর একটা দাঁড় কাক এল মহুয়া গাছের ডালে এবং বসে—আ, কা—আ রবে ডাকতে লাগল। মাঝে মাঝে সে মড়ীটাকে দেখছিল। আবার এধার ওধারও দেখতে লাগল। আরও দুটো দাঁড় কাক এল এবং ডাকতে লাগল। কিন্তু, ওদের কেউ গাছ থেকে নামল না।

হঠাৎ পিছনে আওয়াজ শুনে তাকিয়ে দেখি একটা বার্কিং ডিয়ার (কোট্‌রা) আসছে। ওটা ঠিক আমার নিচে এসে দাঁড়াল। সামনের দিকে কয়েকবার গন্ধ শুঁকে ভয়ে দৌড়ল যে পথে এসেছিল সেই পথেই। স্বাধীন পরিবেশে ওকে দেখতে এত সুন্দর লাগছিল যে মনে হোল সত্যি 'বন্যেরা বনে সুন্দর।'

এল আবার কালো মেঘ। সূর্য ঢেকে গেল। কড়্ কড়্ করে দু একবার কাছেই কোথাও বাজ পড়ল। তারপর ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে এল মুষল ধারে বৃষ্টি। বেশিক্ষণ নয়, মিনিট পনেরো হবে। কিন্তু, এই দ্বিতীয় বারের বৃষ্টিতে আমার ভিজতে যতটুকু বাকি ছিল তা সম্পূর্ণ হল এবং শীত ও কাঁপুনিতে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। রেনপ্রুফ্ গরম জার্কিন্‌টা সঙ্গে না আনার জন্য অত্যন্ত আফশোষ করতে লাগলাম। একটু পরে দম্‌কা হাওয়ায় আবার মেঘ কেটে গিয়ে রোদ ঝলমল করে উঠল। ভারি ভাল লাগছিল প্রকৃতির এই আলো আঁধারি খেলা।

হঠাৎ একটা বার্কিং ডিয়ারের তীব্র ডাকে আমার অন্যমনস্কতা ভাঙ্গল। একটানা ডেকে চলেছে আমার সামনের দিকে প্রায় আধমাইল দূরে। বুঝলাম বাঘ যে বেরিয়েছে ও তারই সঙ্কেত দিচ্ছে। প্রায় দু-তিন মিনিট ডেকে চুপ করে গেল। জঙ্গলে স্তব্ধতার মাঝে কেবল ঝরা পাতা আর বৃষ্টির জল টুপ্ টাপ্ করে গাছের পাতা থেকে ঝরে পড়ে চলেছে।

তিনটে দাঁড় কাক উড়ে এসে বসল একটু দূরে একটা গাছের মাথায়। ওরা কেউ ডাকল না বরং মড়ীটার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। বার্কিং ডিয়ারটা আবার ডেকে উঠল সামনে পাহাড়ের গায়ে, মনে হল চার পাঁচশ' গজের মধ্যে এবং নালা বরাবর। সম্ভবতঃ ও মাঝে মাঝে অন্য দিকে মুখ ফেরানোর জন্য ওর ডাক তেমন জোর শোনাচ্ছিল না, এতে অনুমান করলাম যে বাঘটা জলার পথে আসছে এবং বার্কিং ডিয়ারটা ওকে দেখে সমস্ত জঙ্গলকে সাবধান করে দিচ্ছে। কিছু পরেই আবার সে ডেকে উঠল খুব কাছ থেকে এবং কয়েকবার ডেকেই চুপ হয়ে গেল। আর ঠিক সেই সময়ে দাঁড়কাক তিনটে উড়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই একটা বনমুরগী তীক্ষ্ণ স্বরে ভয়ার্ত ভাবে ডেকে উঠল, আর তার পর মুহূর্তে একটা

ক্যাঁ···কোঁ, ক্যাঁ···কোঁ রবে ডেকে উঠল। জঙ্গলের সমস্ত সংকেত আমার অনুকূলে হওয়ায় আমি নিশ্চিন্ত হলাম যে বাঘের দেখা পেতে আর দেরি নেই। এই ফাঁকে বন্দুকের সেফ্‌টি উঠিয়ে বট গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে আমার দৃষ্টি প্রতিটি সম্ভাব্য পথে খুঁজতে লাগল কোনো কিছু চলমানকে দেখতে পাওয়ার আশায়।

বনভূমিতে বিকেলের সোনালি রোদ গাছের ফাঁকে ফাঁকে এসে পড়েছে শুকনো ঝরা পাতার উপর, মাটিতে। সেই আলো ছায়ার মাঝে চোখে পড়ল প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে সোনালী রঙের চামড়ায় কালো চক্রের জন্তুটি। চিতা। আমার প্রতীক্ষিত শিকার আসছে অতি ধীরে ও সন্তর্পণে। নিঃশব্দে এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে তন্ন তন্ন করে দেখে নিচ্ছে। এমনকি শুকনো পাতার উপর ভুল করেও ওর পা পড়ছিল না। ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াল আমার একটু বাঁদিকে নালার ওপারে। কি চমৎকার সে দৃশ্য! সঙ্গে ক্যামেরা থাকলে এ দৃশ্য হয়তো ক্যামেরায় ধরে রাখতে লোভ সম্বরণ করতে পারতাম না।

বাঘটা সোজা চেয়ে দেখল বাছুরটার দিকে। ওর খাবার স্থানচ্যুত দেখে একটু বিরক্তি প্রকাশ করল মৃদু আওয়াজ করে গ···র্‌···র···র···। সন্দেহ হওয়ায় বেশ ভালভাবে চারিদিক দেখে নিল, এমনকি আমার গাছটার দিকেও। এমনিভাবে কয়েক মিনিট পর্যবেক্ষণ করে বিপদের কোনো আভাস না পেয়ে নিঃসংশয়ে নালায় নেমে নালাটা পার হয়ে উঠল। সহসা গাছটার পিছন দিয়ে আসবার সময় ওর দেহটা আড়াল হয়ে গেল এবং আমি সেই সুযোগে বন্দুক তুলে ওর হৃদপিণ্ড নিশানা করে নিলাম। যেই ও ঝাঁ করে এসে মড়ীটা মুখে তুলে টান মারল চলে যাবার জন্য, সঙ্গে সঙ্গে আমার বন্দুক গর্জে উঠল। চিতাটা মাটিতে পড়ে একবারও পা ছোঁড়েনি, শুধু ওর মুখ থেকে একটু গোঙানির শব্দ বেরিয়েছিল মাত্র। দ্বিতীয় গুলি মারার প্রয়োজন ছিলনা, কারণ স্পষ্ট দেখতে পেলাম জিভটা বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

ঘড়িতে তখন বেলা সাড়ে চারটে।

বন্দুকের আওয়াজ শুনে আমার সঙ্গীরা এসে পড়লে তাদের সাহায্যে বাঘটাকে গ্রামে আনা হল। মরা বাঘটাকে দেখে একটি মাঝ বয়সী বৌ ঝাঁটা দিয়ে এক ঘা মারল বাঘটার পিছন দিকে। ওকে নাকি গতকাল সন্ধ্যায় নদীর ধারে দেখতে পেয়ে গর···র, গর···র আওয়াজ করে ভয় দেখিয়েছিল। তাই বৌটির অত রাগ। তবুও মরা বাঘের মুখের কাছে যাবার সাহস হল না।

গোর্কীরা বলল যে, প্রায় পাঁচ-ছ বছর ধরে বাছুর ছাগল এই বাঘটা অনেক মেরেছে, এমন কি বড় মহিষ পর্যন্ত। গত এক মাসের মধ্যে সাতটা মেরেছে। যাই হোক্ ওদের পুরনো শত্রু এই চিতাবাঘটাকে মৃত দেখে তারা আমায় কৃতজ্ঞতা জানাল। আর ওদের এই উপকার করতে পারায় এবং নিজের সাফল্যে মনে মনে বেশ তৃপ্তি অনুভব করলাম।

গোত্রহীন গণ্ডগ্রাম মুসুরিয়ার গরীব অধিবাসীরা তাদের গবাদি পশু হত্যার ঘাতকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিল বটে, কিন্তু প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে যে সৌন্দর্যের গরিমায় চিতাটা সেদিন পর্যন্ত শোভিত হয়েছিল, ভাগ্যদোষে চিরকালের মত তার স্থান হয়েছে সহরের এক বাড়িতে শো-কেসের মধ্যে।
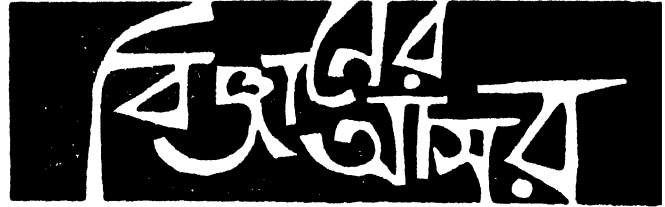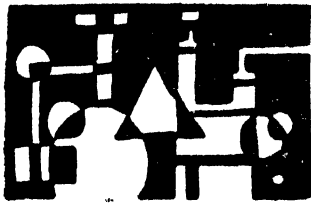
মেছো মাকড়সা

গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য

মাকড়সা তোমাদের অচেনা নয়—সবাই তোমরা কোন না কোন রকমের মাকড়সা দেখে থাকবে! ছোট-বড় নানা রকমের ঘরো মাকড়সা এবং জাল-বোনা মাকড়সাই সাধারণতঃ নজরে পড়ে বেশী। কিন্তু আমাদের দেশে বিভিন্ন জাতের ছোট, বড় ও মাঝারী আকারের অনেক রকমের মাকড়সা দেখা যায়। এদের মধ্যে কতকগুলি জাল বোনে, কতকগুলি পাতা মুড়ে বাসা তৈরি করে, কতকগুলি গাছের ফাটলে বা মাটির নীচে গর্তে বাস করে। অনেকের আবার নির্দিষ্ট বাসস্থল নেই—শিকারের সন্ধানে সারাদিনই এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। এ ছাড়া আরও কয়েক জাতের মাকড়সা দেখা যায়, যারা জলাশয়ের আশে পাশে বা জলের উপর ঘুরে বেড়ায়। এই ধরনের এক জাতের মাকড়সার কথাই আজ তোমাদের কাছে বলবো।

দম দম বিমানঘাঁটির কাছে একদিন একটা বদ্ধ জলাশয়ের পাশ দিয়ে যাবার সময় হিঞ্চে ও কল্মির দল সংলগ্ন ছোট একটা শালুক পাতার উপর নজর পড়লো। পাতাটার ধার ঘেঁষে মাঝারী গোছের একটা মাকড়সা চুপ করে বসেছিল। মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে দেখে আপন কাজে চলে গেলাম। মিনিট কুড়ি বাদে আবার ঘুরে এসে দেখি—মাকড়সাটা সেই একই জায়গায় বসে আছে। একই জায়গায় এতক্ষণ ধরে চুপ করে বসে থাকবার কারণ কি—জানবার জন্যে কৌতূহল হলো।

যেখানটায় দাঁড়িয়ে ছিলাম, সেখান থেকে পাতাটার দূরত্ব খুব বেশী নয়—সব কিছুই পরিষ্কার দেখা যায়। আরও কিছু সময় কেটে গেল—অবস্থার পরিবর্তন নেই। পাতাটার খানিকটা দূরে কয়েকটা তেচোকো মাছ দল বেঁধে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছিল। মাছগুলি এক-একবার পাতাটার কাছে এসে পড়ে আবার দূরে চলে যায়, মাঝে মাঝে পাতাটার তলায়ও ঢুকে পড়ে। মাছগুলিকে এভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে মনে হলো—তবে কি মাকড়সাটা ওদের আনাগোনা লক্ষ্য করছে? কিন্তু মাকড়সা তো কেবল ছোট ছোট কীট-পতঙ্গই শিকার করে থাকে। কাজেই মাকড়সাটা মাছগুলির উপর নজর রেখেছে কিনা, সন্দেহ হলো। যা হোক, শেষ পর্যন্ত অবস্থাটা কিরূপ দাঁড়ায়, দেখবার জন্যে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করাই স্থির করলাম।

আরও প্রায় মিনিট দশেক কেটে গেল। মাছগুলি তখন পাতাটার খুবই কাছে এসে পড়েছে।

দুই-একটা মাছ পাতাটার প্রায় ধার ঘেঁষে যাচ্ছিল। মুহূর্তের জন্যে একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলাম। ঝুপ্‌ করে ছোট্ট একটু শব্দ কানে যেতেই চেয়ে দেখি—মাকড়সাটা ছোট্ট একটা মাছকে কামড়ে ধরে পাতাটার উপর টেনে তুলছে। পাতার মাঝখানটায় টেনে নিয়ে এসে মাকড়সাটা বেশ কিছুক্ষণ মাছটার ঘাড় কামড়ে রইলো। মাছটা কয়েক বার দাপাদাপি করে অবশেষে নিস্তেজ হয়ে পড়লো। কামড় ছেড়ে দিয়ে মাকড়সাটা তখন বিজয়োল্লাসেই যেন অদ্ভুত ভঙ্গীতে মাছটার চারদিকে বার কয়েক ঘুরে এসে চুপ করে একপাশে বসে রইলো। তারপর ধীরে ধীরে সুরু হলো ভোজন-পর্ব।
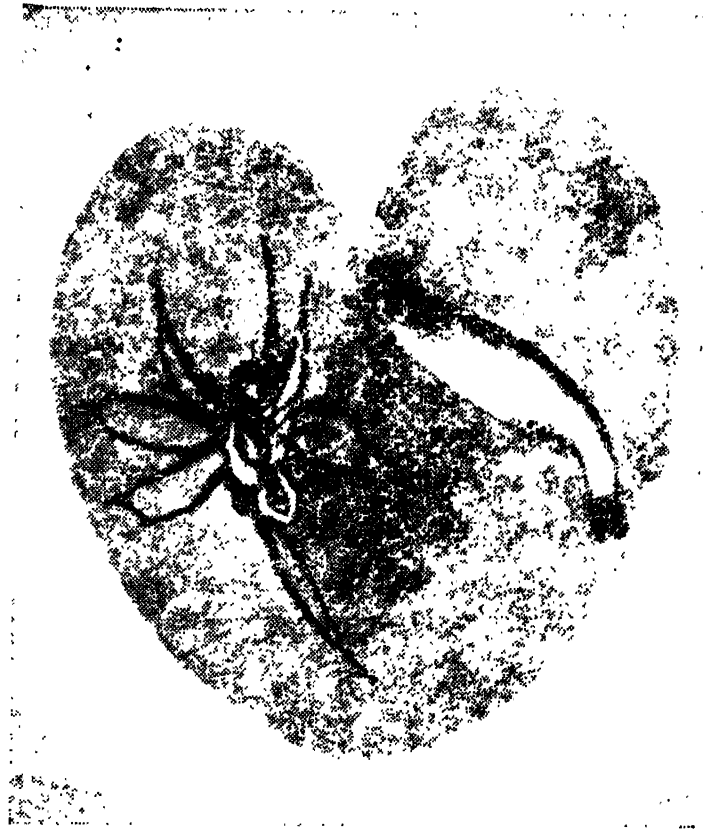
মাকড়সা জল থেকে মাছ ধরে খায়, এমন কথা আমার জানা ছিল না। কাজেই এই ব্যাপারটা দেখে বিস্ময়ের আর সীমা রইলো না। মনে হলো—এটা কি নিয়মের ব্যতিক্রম—না, মাছ ধরে খাওয়াটাই এদের স্বভাব? এই সন্দেহ দূর করতে হলে অনুকূল পরিবেশে এই মাকড়সাগুলিকে পর্যবেক্ষণাধীনে রাখা দরকার।

নালা-ডোবা, খাল-বিলে এই মাকড়সাগুলিকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। উত্তর কলকাতায়

একটা এঁদো পুকুরে একদিন কয়েকটা মাকড়সাকে ঘুরে বেড়াতে দেখে দুই-একটাকে ধরবার উপক্রম করতেই চোখের নিমেষে তারা যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল, তার কোন হদিসই মিললো না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর খানিকটা দূরে উলুঘাসের উপর সেগুলিকে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেল। খুব সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে ধরবার চেষ্টা করেও কোন ফল হলো না—সবগুলিই হঠাৎ কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। যেমন করেই হোক, ওদের ধরতেই হবে, স্থির করে জলে নেমে গেলাম। কিছুটা তফাতেই জলঘাসের উপর দুই তিনটা মাকড়সা বসেছিল। একটাকে ধরবার জন্যে এগিয়ে যেতেই সবগুলিই বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেল। এমন পরিষ্কার জায়গায় কোথায় আত্মগোপন করতে পারে—জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভাবছি। এমন সময়ে জলের নিচ থেকে একটা মাকড়সা হঠাৎ আমার সামনে ভেসে উঠলো। অদৃশ্য হবার রহস্যটা বুঝতে আর বাকী রইলো না। ভয় পেলেই এরা জলজ লতাপাতার গা বেয়ে জলের নীচে গিয়ে আত্মগোপন করে এবং ভয়ের কারণ দূর হয়েছে বুঝতে পারলেই সোজাসুজি জলের উপরে ভেসে ওঠে।

এর পর থেকে মাকড়সাগুলিকে ধরবার জন্য বিশেষ বেগ পেতে হয় নি। লেবরেটরীর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে খুব বড় একটা কাঁচের জলাধারে জলজ ঘাসলতা দিয়ে ওদের স্বচ্ছন্দ বিচরণের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে তার মধ্যে কতকগুলি তেচোকো মাছ ও মাকড়সা ধরে এনে ছেড়ে দিলাম। কিছুকাল সতর্ক দৃষ্টি রাখবার পর এই কৃত্রিম জলাশয়ে মাকড়সার মৎস্য-শিকারের কৌশল প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ ঘটেছিল। এই মাকড়সার আরও কতকগুলি অদ্ভুত স্বভাব দেখা যায়, যা দেখলে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেতে হয়। ইচ্ছা করলে অনায়াসেই তোমরা এদের অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা প্রত্যক্ষ করতে পারবে।

এই প্রজাতির মাকড়সার বৈজ্ঞানিক নাম 'লাইকোসা অ্যানাগেুলী'। আমাদের দেশে এদের কোন বিশেষ নাম প্রচলিত নেই ; কাজেই এগুলিকে 'মেছো মাকড়সা' নামে অভিহিত করেছি।

কোনটা চাই

তুষার আদক

বেলফুলের মালা চাই ? বকুল ফুলের হার?
সূর্যমুখীর ডালি চাই ? রক্ত গোলাপ আর ?
রজনীগন্ধার তোড়া চাই
ঘর সাজাতে ?
চাঁপা ফুলের সৌরভ চাই
মন মাতাতে ?
রাত্রের হাস্নুহানা, যুঁই, মালতী, চন্দ্রমণি
কন্যা, কোনটা চাই বল দেখি তুমি ?
ময়না পাখি বায়না ধরে, টিয়া পাখি কয়না
কাকাতুয়া বাজে বকে, পাপিয়া রয়না
চড়ুই পাখি ধানের মাঠে
চাষী ভায়ের গলা কাটে
হলুদপাখি, পাণকৌটি, বাবুই পাখি, টুনটুনি ?
(কন্যা); এদের মধ্যে কোনটা চাই বল দেখি তুমি ?

চোর ধরা

মোহিনী মোহন গাঙ্গুলী

রাত বারোটা স্তব্ধ নিঝুম, কেউ কোথা নেই জেগে :
মেঘলা আকাশ, দমকা বাতাস বইছে বিষম বেগে।
এমন সময় টুং টুং টুং আওয়াজ হল জোর—
বাড়ির ভেতর চোর ঢুকেছে—কাটলো মাসির ঘোর।
বিছনা ছেড়ে খ্যান্ত মাসি লাফিয়ে হঠাৎ উঠে—
স্তব্ধ নিঝুম চারদিকে আজ আঁধার বিদ্‌ঘুটে।
ঘুমিয়ে ছিল ক্যাব্‌লা হারু—আস্তে মাসি গিয়ে
বলল—'ওরে ওঠরে চোরে যায় যে সবই নিয়ে।'
ক্যাবলা হারু চোরের ভয়ে থর থরিয়ে কাঁপে—
খাটের তলে লুকিয়ে সারা গায়ে চাদর ঝাঁপে।

ঠুং ঠুং ঠুং আবার আওয়াজ—প্রমাদ গুণে মাসি—
নিল বুঝি নগদ টাকা বাসন রাশি রাশি।
গতিক মোটেই সুবিধে নয়—ভেবেই মাসি সারা—
'চোর এসেছে, চোর এসেছে' চেঁচিয়ে ওঠান পাড়া।
গাঁ গেরামের ঘুমন্ত লোক বিছনা ছেড়ে উঠে—
মাসির ডাকে শড়কি হাতে এল সবাই ছুটে।
শুনল সবাই আবার আওয়াজ টুং টুং টুং টুং—
শব্দ শুনে সবার হল মুখ যে ভয়ে চুন।
কেউ বা বলে, 'লাঠি লে আও—বর্শা ধনুক ছুরি ;'
'কামান দাগো' বলে বা কেউ করছে বাহাদুরি।
সিঁদ কেটে চোর ঘরে ঢুকে নিচ্ছে বুঝি সব
বাইরে তারই আসছে ভেসে টুং টুং টুং রব।
ঘরে আছে শেকল দেওয়া বীর সাহসী কে ?
এগিয়ে গিয়ে খুলবে শেকল চমকে পিলে যে।

বুক ফুলিয়ে এগিয়ে গেল মুখুজ্জ্যেদের ভুলো—
খুলতে শেকল 'মিউ' করে এক বেরিয়ে এলো হুলো।
চোর কোথারে ? বেড়াল এ যে, উঠলো হাসাহাসি—
বেড়ালটাকে ঘরের ভেতর শেকল দিয়ে মাসী
ঘুমিয়ে ছিলেন রাত্রিবেলা—নেইকো মনে তাঁর,
বন্দি হুলো চাইছিলো যে হতে ঘরের বার।
আঁচড় কামড় দিচ্ছিল সে বাসন গুলোয় যত
টুং টুং টুং বাইরে আওয়াজ আসতে ছিল তত !!

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

* সন্দেশের সডাক মূল্য ৯'৫০ এবং ষাণ্মাসিক ৪'৭৫ হয়েছে এটা সব গ্রাহক লক্ষ্য করনি। সুতরাং কেউ কেউ পুরোন হিসেবেই চাঁদা পাঠিয়েছ।

* যারা কম পাঠিয়েছ, তারা বাকি চাঁদাটুকু পাঠিয়ে দিও, নইলে শেষ সংখ্যাটি পাঠাতে অসুবিধা হবে।

* অথবা তারা চাঁদা ফুরোবার একমাস আগেই নতুন চাঁদা পাঠিও আর তার সঙ্গে বাড়তি চাঁদাটুকু জুড়ে দিও।

ডাকমাশুল বৃদ্ধি

* ১৫ মে ১৯৬৮ থেকে রেজিঃ ডাকের খরচ '৬০ থেকে বেড়ে '৭০ হয়ে গেল।

* সুতরাং যারা রেজিঃ ডাকে শারদীয়া সন্দেশ চাও তাদের এবছর থেকে '৭০ দিতে হবে।

* যারা আগেই '৬০ পাঠিয়েছ তারা আরো '১০ বা সেই মূল্যের ডাক টিকিট পাঠিয়ে দিও।

'কফির চোরা চালান'

(মূল জার্মান থেকে অনুবাদ)

কল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়

ট্রেনটি ধীরে ধীরে সীমানার কাছে এসে পৌঁছল। ট্রেনের কামরার মধ্যে যাত্রীরা ঐ দেশের শুল্ক বিভাগের নিয়ম কানুনের কড়াকড়ি সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করে দিল। একটি সুন্দরী মেয়ে বলল—'আমার সঙ্গে দু পাউণ্ড কফি আছে; আশাকরি শুল্কের জন্যে কোনো টাকাকড়ি না দিয়ে লুকিয়েই আমি কফিটা নিয়ে যেতে পারব। কিন্তু আমি শুনেছি এখানকার আবগারী বিভাগের কর্মচারীরা খুব কড়া।'

মেয়েটির সামনে একটি মোটাসোটা, হাসিখুশি দেখতে ভদ্রলোক বসেছিলেন। তিনি মেয়েটিকে পরামর্শ দিলেন—'আপনি বরং কফিটা আপনার টুপির বাক্সর মধ্যে লুকিয়ে রাখুন। যিনি মালপত্র পরীক্ষা করতে আসবেন তিনি ও জায়গা নিশ্চয়ই খুঁজবেন না। আমি এই পথে প্রায়ই যাতায়াত করি, তাই শুল্ক বিভাগের কর্মচারীদের সঙ্গে আমার বেশ জানাশোনা আছে। আপনি এদের যত কড়া মনে করছেন, আসলে কিন্তু তা নয়। বেশীর ভাগ সময়ই এরা কামরার ভেতরেও আসে না। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে শুধু পাসপোর্ট আর ভিসা দেখে চলে যায়। আপনার ভিসা আছে তো'—'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' মেয়েটি তাড়াতাড়ি উত্তর দিল—'কনস্যুলেট থেকেই আমাকে ভিসা দিয়েছে। কিন্তু যদি শুল্ক বিভাগের লোকেরা ভেতরে এসে মালপত্র পরীক্ষা করে দেখে তখন আমি কি করব?'

'মালপত্র নামিয়ে ওরা কখনই দেখবে না! আপনি টুপির বাক্সর মধ্যেই কফিটা লুকিয়ে রাখুন,' এই বলে ভদ্রলোক মেয়েটিকে আশ্বস্ত করলেন। সুন্দরী মেয়েটি ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানিয়ে ওঁর কথা মতো কফিটা টুপির বাক্সর মধ্যেই লুকিয়ে রাখলে।

অল্প কিছুক্ষণ পরে ট্রেন সীমানার শেষ স্টেশনে এসে থামল। যাত্রীরা দেখল শুল্ক বিভাগের কর্মচারীরা ব্যস্ত হয়ে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছে। একটু পরে শোনা গেল—'পাসপোর্ট এবং ভিসা ইত্যাদি এক্ষুনি পরীক্ষা করা হবে। দয়া করে যাত্রীগণ নিজ নিজ কামরায় থাকুন।' এর পরে একজন কর্মচারী ঐ কামরার মধ্যে এসে যাত্রীদের পাসপোর্ট ও ভিসা পরীক্ষা করে চলে গেলেন। একটু পরে অপর আর একজন কর্মচারী এসে হাসিমুখে অভিবাদন জানিয়ে বললেন—'শুভদিন ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ। আপনাদের কারো কাছে কি শুল্ক দেবার মতো কোনো জিনিসপত্র আছে?' কোনো যাত্রীই এ কথার উত্তর দিল না। তখন কর্মচারীটি যাত্রীদের মালপত্র দেখতে দেখতে বললেন—'ভীষণ কফির গন্ধ বেরোচ্ছে। আপনাদের সকলের মালপত্র আমাকে পরীক্ষা করতে হবে।'

এমন সময় সেই মোটা ভদ্রলোকটি কর্মচারীকে ইসারা করে সেই টুপির বাক্সটি দেখিয়ে বললেন—'আপনি ঐ ভদ্রমহিলার ও দিকটা একটু দেখুন তো! মনে হল একটু আগে উনি যেন ওঁর টুপির বাক্সর

মধ্যে কিছু একটা লুকিয়ে রাখলেন।' এই শুনে লজ্জায় ও রাগে মেয়েটির চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল। একটু পরেই কর্মচারীটি টুপির বাক্স থেকে লুকিয়ে রাখা কফি বার করে ফেলে মেয়েটিকে বললেন—'আপনাকে তো এই কফির জন্য ট্যাক্স দিতে হবে। কোনো রকম শুল্ক না দিয়ে মাত্র এক পাউণ্ড কফি আপনি সীমানার ওপারে নিয়ে যেতে পারেন। আমার সঙ্গে একবার শুল্ক বিভাগের অফিসে আপনাকে আসতে হবে।'

মেয়েটি তখন সেই মোটা ভদ্রলোকটির দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে তিক্ত স্বরে বলল—'এই ভাবেই মানুষকে চেনা যায়! আপনি আমাকে নিজে কফিটা ওখানে লুকিয়ে রাখতে বলে তারপর এইভাবে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন!' মোটা ভদ্রলোক কোনো কথা না বলে মেয়েটির কথাগুলো চুপচাপ হজম করলেন।

কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি আবার কামরার মধ্যে ফিরে এল। ট্রেন চলতে শুরু করে কয়েক মিনিটের মধ্যেই সীমানা পার হয়ে গেল। তখন সেই মোটা লোকটি হাসিমুখে মেয়েটির কাছে এগিয়ে এসে বললেন—'ফ্রয়লাইন আমাকে ক্ষমা করুন। আমি সত্যই আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাইনি। কিন্তু বিশ্বাস করুন এছাড়া আমার আর কোনো উপায়ই ছিল না।' মেয়েটি ভীষণ রেগে গিয়ে উত্তর দিল—'আপনার সঙ্গে কথা বলার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই।' ভদ্রলোক হেসে বললেন—'বেশ তো, কথা না হয় নাই বললেন। কিন্তু আমার কথা আপনাকে শুনতেই হবে। কর্মচারীটি যখন এই কামরার মধ্যে কফির গন্ধ পেল, আর আমার স্যুটকেসের মধ্যেই যখন শুল্ক না দেওয়া পনেরো পাউণ্ড কফি রয়েছে তখন আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা ছাড়া আমার আর অন্য কোনো উপায়ই ছিল না। এই নিন আমার স্যুটকেস থেকে এক প্যাকেট কফি আপনাকে দিচ্ছি।' এই বলে সেই মোটা ভদ্রলোক মেয়েটিকে পাঁচ পাউণ্ড ওজনের একটি কফির বাক্স বার করে দিলেন।

অগস্টের সেই দুটো দিন

অতসি সেন

(পৃথিবীর দুটি ধ্বংসলীলার সত্য কাহিনী)

সে আজ অনেক, অনেকদিন আগেকার কথা। ইতালীর ভিসুভিয়াস পাহাড়ের তলায়, সারনুস হ্রদের বুকে ছিল পম্পেই বলে এক বিরাট সহর। নগরের চারি পাশ ঘিরে ছিল প্রায় সোয়া মাইল লম্বা প্রকাণ্ড প্রাচীর। তাতে ছিল আটটি বিশাল সিংহ দরজা। গ্রীক ইহুদী মিলে প্রায় হাজার দুয়েকের বাস ছিল সেখানে। বিরাট বিরাট প্রাসাদ অট্টালিকায় সাজান ছিল সুন্দর সহরখানি।

উনআশী খৃষ্টাব্দের ছাব্বিশে অগস্ট। কালো রাতের গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সবাই। হঠাৎ এমনি সময়ে সজোরে নড়ে ওঠে পৃথিবীটা। আকাশে বাতাসে শোনা যায় তার দীর্ঘশ্বাসের ফোঁস ফোঁসানী। শ্বাসরুদ্ধ বদ্ধবাতাসে দমটা বন্ধ হয়ে আসে!

ঘুম ভাঙ্গে সকলকারই, কিন্তু অনেকেরই তা চিরকালের মত ঘুমিয়ে পড়বার জন্যেই। রাশীকৃত পাথর আর ছাইয়ের স্তূপ ঝরে পড়ে আকাশ ভেঙ্গে আর সেই সঙ্গেই নেমে আসে আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোত। অবিরাম, অবিশ্রাম।

প্রথম আঘাতটা যারা কোন রকমে সামলে উঠতে পারে তারা পালিয়ে চলে বাড়িঘর ছেড়ে। সারা আকাশ জুড়ে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। কেউ কেউ ছুটে যায় সমুদ্রতটে। কিন্তু সেখানেই বা ভরসা কোথায়! চারিদিকেই উত্তাল, উদ্দাম তরঙ্গ, প্রলয়নাচনে মত্ত।

দূরে নিকটে, চারিদিকে চারিপাশেই আগুন আর গন্ধকের ঝাঁজ। যারা এতক্ষণও বেঁচে ছিল, তারাও আর পারে না। জমাট ধোঁয়ায় বুকটা হাপরের মত হাঁপাতে থাকে। বাতাসের রেশটুকুও খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রতিবেশী হারকুলিয়ম সহরটিরও একই ভবিতব্য। সেখানে আবার জলে ভিজে জমাট বাঁধতে থাকে আবর্জনার ভার। ধ্বংস স্তূপের তলায় চাপা পড়ে, নিভে যায় হাজার দুয়েক জীবনের জ্বলন্ত দীপ। শিখাটিও আর চোখে পড়ে না।

* * *

ঠিক এমনি আর এক ঘটনা ঘটেছিল এই সেদিন। প্রায় উনিশশো বছর পরে। ইওরোপে নয় এশিয়ার পূর্বপ্রান্তে। আগেরটি ছিল প্রকৃতির ধ্বংসলীলা আর এটি মানুষেরই হানাহানির ফল।

সেদিন পাঁচই অগস্ট। উনিশশো পঁয়তাল্লিশ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষদৃশ্য। হিরোশিমার আকাশে কোথাও মেঘের চিহ্নমাত্রও নেই। ফুরফুরে হাওয়া বইছে দক্ষিণ সাগর থেকে। হিরোশিমা অর্থে প্রশস্ত দ্বীপ। যুদ্ধরত জাপানের সপ্তম সহর। জনসংখ্যা আড়াই শো হাজার। এ ছাড়া প্রায় দেড়শো হাজারের এক সৈন্যবাহিনীরও ঘাঁটি ছিল সেখানে।

সকাল সাতটা বেজে নয়। বিমান আক্রমণের সতর্কীকরণ ধ্বনিত হল। আকাশে দেখা গেল শত্রু বিমানদের। সহরের মাথার ওপর বার কয়েক পাক মেরেই বিদ্যুৎগতিতে মিলিয়ে গেল তারা।

নিশ্চিন্ততার নিঃশ্বাস ফেলে বেরিয়ে আসে সবাই। হঠাৎ একটা অদ্ভুত চোখ ধাঁধানো আলোয় ভরে ওঠে আকাশটা। পৃথিবীটাও কেঁপে ওঠে সেই সঙ্গে। অসহ্য উত্তাপে আর ঝড়ো হাওয়ায় ভাসিয়ে নিয়ে যায় সকলকে।

দিকে দিকে হাহাকার জেগে ওঠে। হাজার হাজার নরনারী এক জ্বলন্ত অগ্নিস্রোতে ঝলসাতে থাকে। যা কিছু তার সামনে পড়ে, মুহূর্তে অস্তিত্ব লোপ পায়। ট্রামগুলো লাইন ছেড়ে ছিটকে পড়ে খেলনার গাড়ীর মত। জীবজন্তু প্রত্যেকেরই এক অবস্থা। গাছপালাগুলোও রক্ষা পায় না। ঘাস গুলো জ্বলতে থাকে শুকনো খড়ের মত।

তিন মাইল অবধি হাল্কা বাড়িগুলো তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়ে এ ওর গায়। হতাহতদের মধ্যে যে কটি 'রক্ষা' পায় তারাও এক জাতের ক্ষয়কারী আলোয় ঝলসে জ্বলে পুড়ে মরে বিশ ত্রিশ দিন ধরে।

আধঘণ্টা পরেই নেমে আসে এক পশলা বৃষ্টি। সুরু হয় ভীষণ ঝড়। কাঠের আর খড়ের বাড়িগুলোয় আগুন দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বিকেলে যখন আগুন নেভে তখন আর কিছুই বাকি নেই। হিরোশিমার অস্তিত্বটাই যেন মুছে গেছে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে!

জ্যান্ত ভূত

অঞ্জন সেনগুপ্ত

আগে হ'তে করছি মানা
বলছি কানে কানে,
পড়বে নিজে এ'সব কথা
কেউ যেন না জানে॥
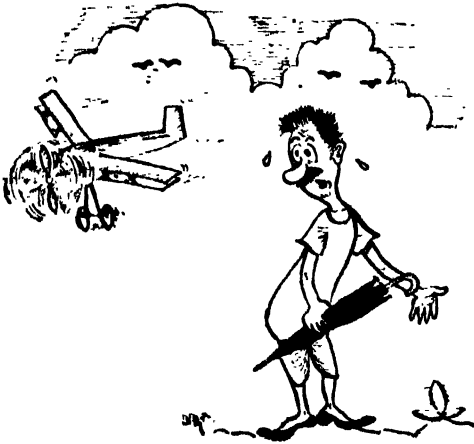
সত্যি কথা বলছি দাদা
ষোল আনাই সত্যি,
ওজন করা এ' সব কথা
ভেজাল নেই একরত্তি॥

আকাশ পানে তাকিয়ে দেখি
বনবনিয়ে ঘুরচে একি,
মাথার উপর মেলে ডানা
জ্যান্ত ভূতের বিরাট ছানা!!

সেরা আশ্রয়

অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়

ভয় পেয়ে'না, মেঘরা যখন গুড়ুম-গুড়ুম ডাকে
বিজলী সাপের ঝিলিক ওঠে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
তখন গিয়ে খোলা হাওয়ায় দাঁড়াই
অট্টহাসে মেঘগুলিকে তাড়াই,

ভয় পেয়োনা, দত্যিদানা যদিও এখন আছে,
জারিজুরি ফাঁসবে তাদের এলে আমার কাছে,
জোর গলাতে যেই না দেব হাঁক,
দত্যিদানার লাগবে তখন তাক।

ভয় পেয়োনা, যাও যদি পথ ভুলে,
জোনাক পরী পথ দেখাবে ছোট্ট প্রদীপ তুলে,
আঁধার যদি গিলতে কভু চায়,
বুক ফুলিয়ে হটিয়ে দেব তায়।

ভয় পেয়োনা, অন্ধকারে শেয়াল যদি ডাকে
কালো বাহুড় উড়ে বেড়ায় অশথগাছের শাখে
তখন আছে সব সেরা আশ্রয়
মায়ের কোলে নাইকো কোনো ভয়।

গ্রাহক কার্ড পেয়েছ কি ?

যদি না পেয়ে থাক, তাহলে এখনই সম্পাদককে চিঠি লেখো—

'আমি গ্রাহক কার্ড এখনও পাইনি। ইতি—নাম.........., গ্রাহক সংখ্যা..........
ঠিকানা..............(যদি গ্রাহক সংখ্যা না পেয়ে থাক তাহলে লেখো নতুন গ্রাহক)

চিঠিপত্র

(১) শ্যামাদীপেন্দ্র সেন, ১৪৩১, বয়স ১৫

ভাই তোমার ধাঁধাটি কিন্তু আমাদের পছন্দমতো নয়। নিজেই বলেছ যে দশ টাকার নোট নিয়ে লোকটি যে দোকানেই যায়, টাকা পিছু চার আনা সুদ নেয়। ওকে সুদ বলে না, বাটা বলে। যাই হোক, তারপর লিখেছ লোকটি আট আনা খাবার পর সাড়ে নয় টাকা ফেরত পেল। তার মানে বাটা দিতে হল না। তা হলে নিশ্চয় একটা পাঁচ টাকার নোট, চারটে এক টাকার নোট ও পঞ্চাশটা পয়সা পেয়েছিল। এবার যদি সে পাঁচ টাকার নোটটা দিয়ে আরো আট আনার খায়, তাহলে ফেরত পাবে চারটে এক টাকার নোট ও পঞ্চাশটা পয়সা। অর্থাৎ নোট ভাঙ্গিয়ে হাতে এল আটটা এক টাকার নোট ও এক টাকার ভাঙ্গানো পয়সা। ও স্বচ্ছন্দে মুনিবকে ঐ ন'টা টাকা দিয়ে দিতে পারত। মিছিমিছি সুদ দিতে হত না। অথচ এক টাকার খাওয়া হত। অত চালাক লোকের নিশ্চয় এই বুদ্ধিটা হত।

ইংরেজি ধাঁধাটাও চলবে না ভাই। আর তৃতীয়টি লিখতে ভুলই করেছ 50 after O and 5 after E না হয়ে 50 before O and 5 before E হবে না? ধাঁধা লিখতে হয় খুব সাবধানে।

(২) রীতা রায়, ১৩৪৮, বয়স ১৫,

ঐ 'রমাকান্ত কামার' ধাঁধাটা বড়ই পুরনো। নতুন কিছু দিও।

(৩) দেবযানী চোংদার, ১৬৫৪, বয়স ১৩,

'সন্দেশ' বেরোয় ১৯১৩ সালে, বৈশাখে। প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী। তোমাদের বর্তমান সম্পাদক সত্যজিৎ রায়ের ঠাকুরদা ও সম্পাদিকার জ্যাঠামহাশয়। খুব একটা সঙ্গীন অবস্থায় এনে 'ক্রমশঃ' দিতে হয়, তাহলে তোমরা পরবর্তী সংখ্যার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকবে। সম্পাদিকা মোটেই ডুব মারেন নি, প্রত্যেক সংখ্যায় তাঁর হাত আছে, খুঁজে দেখো। আর বৈশাখে তো কথাই নেই। শার্লক হোমসের গল্পও এর আগে দেওয়া হয়েছে বৈ-কি।

(৪) ত্রিদিবনাথ ও অলোকনাথ মিত্র, ১৯৯৬, বয়স ১৬ ও ১৪।

তোমরা আলাদাভাবে সব কিছুতেই যোগ দিতে পার। দেখি ছোটখাটো ঘটনা আর কি সংগ্রহ করা যায়।

(৫) অভিজিৎ চৌধুরী, ১৯০২, বয়স ১২

না ভাই হাত পাকাবার আসরে ধারাবাহিক গল্প ছাপা হয় না স্থানাভাবে।

(৬) শিখর রায়, ২৭০৬, বয়স ১২২

অত উত্তেজিত হবার বাস্তবিক কোনো কারণ নেই। আমাদের সুবীর চট্টোপাধ্যায়ই বীরভদ্র নাম নিয়ে ঐ কবিতা লিখেছিলেন।

(৭) সংহিতা দত্ত মজুমদার, ১২৯৫, বয়স ১১।

'প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর' উপরে এই কথাগুলি লিখে, সোজা আমাদের আপিসের ঠিকানায় জীবন সর্দারকে চিঠি দিয়ে সব জেনে নিও। নাটক তো মাঝে মাঝেই দিই, আরো দেব। তোমার ধাঁধার একটা এই সঙ্গে দিচ্ছি, বন্ধুরা তাদের চিঠিতে আমাকে উত্তর পাঠাতে পারে। এমন একটা জায়গার নাম কর যেখানে তেল পাওয়া যায়। প্রথম দুই অক্ষরের বাংলা মানে খোঁড়া। শেষ দুই অক্ষরের বাংলা মানে ছেলে।

(৮) বাসবেন্দু গুপ্ত ১৮১, বয়স দাও নি বলে ছবি ছাপা গেল না, ভাই। (৯) চিত্রা সহায়, ১৮৭৪, বয়স ?

(১০) পত্রবন্ধু চাই :—(ক) তপন কুমার বসু, ১৫০১, বয়স ১৪

শখ—জীববিদ্যা, রসায়ন, স্কাউটিং, গল্প লেখা, ছবি আঁকা।

(খ) সুপ্রতিম লাহিড়ী ১৫৫২, বয়স ১৫ শখ—ডাকটিকিট সংগ্রহ, খেলাধুলা, বইপড়া।

(গ) মোঃ রেজাউল কবীর, ১৬৫৯, বয়স ১৩ শখ—ডাকটিকিট জমানো, ফুটবল, ডিটেকটিভ, বই পড়া।

জান কি ?

॥ নেহেরু পুরস্কার ॥

চুনীলাল রায়

পৃথিবীর শান্তির জন্য যুগে যুগে যাঁরা চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন ভারতের পরলোকগত প্রিয় প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাঁদের মধ্যে একজন। বিশ্বে সংগ্রাম বন্ধ হয়ে শান্তি আসুক এই কামনাই তিনি করেছেন সারাজীবন। তাঁর কর্মের মধ্যেও এই সত্যটিকেই পরিস্ফুটিত দেখতে পাওয়া যায়।

যাতে এ পথে নির্ভীক যোদ্ধার অভাব না ঘটে, যাতে আরও অনেকে শান্তির কাজে আত্মনিয়োগ করে বিশ্বমানবতার মহামিলনের মহৎকার্যে যোগদান করেন সেজন্য নেহেরুর নামে একটি পুরস্কারের কথা ভারত সরকার ঘোষণা করেছেন।

বিশ্বশান্তি এবং আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া বৃদ্ধিতে যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পূর্ববর্তী বছরে সবচাইতে বেশি উল্লেখযোগ্য কাজ করবেন তাঁদেরই এই পুরস্কার দেওয়া হবে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে যে কেউ এই পুরস্কারের জন্য মনোনীত হতে পারেন। এই পুরস্কারের আর্থিক মূল্য হ'ল ১,০০,০০০ টাকা, তা'ছাড়া এই সংগে একটি পদকও দেওয়া হবে পুরস্কার প্রাপক-কে। ১৯৬৭ সনে এই পুরস্কার প্রথম দেওয়া শুরু হয়েছে। প্রতি বছরই এই পুরস্কার দেওয়া হবে।

প্রথম বছরের পুরস্কারটি পেয়েছিলেন রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থাণ্ট। ইনি বার্মার নাগরিক।

বর্তমান বছরে অধুনা-নিহত, মার্কিন নাগরিক নিগ্রো-ধর্মযাজক মার্টিন লুথার কিংকে এই পুরস্কার দেওয়া হবে স্থির হয়েছে। নিগ্রোদের নাগরিক অধিকারের জন্য ইনি অহিংস আন্দোলন চালিয়ে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিলেন এবং নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছিলেন। সঃ সঃ

কংকালীতলা

করবী গুপ্ত

শান্তিনিকেতনে বড় পিসির বাড়িতে বসে কথা হচ্ছিল। মেজো পিসি বলল মাকে, ৭ই পৌষের ঝামেলা তো মিটল, এবার চল ক'দিন আমার বাড়িতে থাকবে। মেজোপিসির বাড়ি বোলপুর কলেজটার কাছে। সেখান থেকে কয়েক মাইল দূরে একটা জায়গা আছে কংকালীতলা বলে। এটা সতীর পীঠস্থান শুনেছি।

ঠিক হল একদিন দেখতে যাব। মা বলল তীর্থতে পুণ্যও হবে আর ভ্রমণ কাহিনী লিখবার রসদও জুটবে। সত্যি তাই একদিন রওনা হলাম। বড়পিসি, মেজোপিসি, মা, পিসিমনি, ছোটপিসে, রাংগাদি, রুবীদি, বুদ্ধ আর আমি বাসে চেপে বসলাম। বাস তীর্থস্থানের উদ্দেশ্যে ছুটতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর গাড়ি এসে থামল। সেখান থেকে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে সরু হাঁটা পথ চলে গেছে। হাঁটতে লাগলাম সবাই। রুবীদির গানের গলা ভালো, গান ধরল। পৌষমাস তাই সকাল ১০টার রোদ্দুরটা নেহাত খারাপ লাগছিল না। হাঁটতে হাঁটতে কখন যে আমরা দুদলে ভাগ হয়ে গেছি, টেরই পাইনি। তিন পিসি আর মা এক দলে আর আমরা চার ভাইবোন ও পিসে এক দলে। বড়দের আগে হাঁটতে বলে আমরা ইচ্ছে করেই পেছনে রইলাম। এমন সময় বুদ্ধ আবিষ্কার করল একটা আখক্ষেত। রাংগাদির তো জিভে জলই এসে গিয়েছিল, পিসে বলল তীর্থ করতে এসে চুরি, ভালো হবে? মালিককে না বলে নিলে তো চুরি করা হবে। যাই হক নসীব আমাদের ভালো, কাছেই মালিককে পাওয়া গেল এবং আমরা কোলকাতা থেকে তীর্থ করতে এসেছি শুনে ও কয়েকটা আখ দিয়ে দিল। এর পর কি হল বুঝতেই তো পারছ। আখ খাচ্ছি, হাঁটছি আর পিসের গল্প শুনছি।

জংলী পথ, আমি কতগুলো ছোট ছোট গাছ আর তার ফলটা দেখে বললাম পিসে দেখ, ঠিক কুলের মত। রাংগাদি আড় চোখে পিসের দিকে তাকিয়ে বলল, ছোট মেসো তোমরা এগোও আমি একটু আসছি। তুমি একা কাজ করবে কেন, আমরাও তোমার সাথে হাত মেলাব। পিসেকে দেখলাম কথা বলতে বলতেই সেই কুলের মত ফলগুলো পকেটে পুরছে (মুখেও যাচ্ছে)। পরে বুঝতে পারলাম ওগুলো বুনো কুল গাছ। বুনো কুল গাছ বা কুল এর আগে দেখবার ভাগ্য আমার হয়নি। এবার আখ বাদ দিয়ে কুলের দিকে মন দিলাম।

আঁচল ভর্তি করে কুল নিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালালাম। অবশেষে এসে দেখি আমাদের দেরী দেখে মা'রা ভাবছে। তাতো হল, কিন্তু বেলা হয়ে যাওয়াতে পুরুত ঠাকুর পুজো দিয়ে বাড়ি চলে গেছেন। পিসে আমাদের দাঁড়াতে বলে ঠাকুরের বাড়ির খোঁজ করতে লাগল। তারপর ঠাকুরমশাইকে খুঁজে টুঁজে আনা হল।

যা ভেবেছিলাম, তা কিছুই নয়। মানে দেখবার কিছুই নেই। একটা বাঁশের কুঁড়ে ঘর। তার পাশে বাঁধানো একটা ছোট ডোবাজাতীয় পুকুর। ঘরটাতে কিছু ফুল দেখতে পেলাম আর ধুপ-ধুনো জ্বলছে। পুকুরটাতেও তাই। মানে জলে ভাসছে কয়েকটা ফুল। শুনলাম পুকুরটার পাড়ে বসে পুজো করা হয়। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, সতীর কোমরটা পড়েছিল এই পুকুরটাতে, তাইতে পুকুরটাও বাঁকানো। আর পুকুরের জলেই পুজো করা হয়। ভারী অবাক লাগল শুনে। একটা প্রশ্ন মনে জাগল, কে দেখেছে সতীর কোমর পুকুরে আছে? তবে মনের কথাটা মা পিসিদের বলিনি, বললে ওঁরা বকুনিও দেবেন আর উপদেশও দেবেন। তাই সতী সেখানে থাকুন বা কৈলাসে থাকুন সেটা না ভেবে একটা প্রণাম করে বিকেলের দিকে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। এবার পথে সেই লোকটা আরো দুটো আখ পিসেকে দিয়ে দিল আর ফুল তো এনেছিলামই!

মনে রেখো

* সমস্ত লেখা চিঠি, ছবি ধাঁধার উত্তর ইত্যাদি পাঠাবার সময়ে নিজের নাম, গ্রাহক সংখ্যা, ও বয়স স্পস্ট করে লিখো। গ্রাহক সংখ্যা না পেয়ে থাকলে লিখো 'নতুন' *
* সব সময় কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করে লিখো।*
* সাদা কাগজে, কালো কালিতে ছবি এঁকো—চাইনিজ ইঙ্ক হলেই ভালো হয়।*

হাত পাকাবার আসর

ছাপার ভুল সংশোধন

মুকুর দাশগুপ্ত—(এসপেরান্তোর কথা—জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫) পৃ ১২৭—তলার থেকে দ্বিতীয় লাইন। '৮৯৫ সালের পরিবর্তে হবে '১৮৫৯ সাল।' পৃ ১২৮—পঞ্চম লাইন—'নিয়ম না থাকায়'র বদলে পড় 'নিয়ম সর্বত্র প্রযোজ্য হওয়ায়'।

কোপাইয়ের সন্ধ্যা

জয়িতা বন্দোপাধ্যায়—গ্রাঃ নং ১৭৯০ বয়স—১৬

(গদ্য কবিতা)

সূর্য তখন হেলেছে পশ্চিম প্রান্তে,
সারা আকাশে চলছিল হোলিখেলা।
রক্তাভ আকাশের প্রতিচ্ছবি পড়ে কোপাইয়ের জল রাঙা হয়ে উঠেছিল।
—আমি দাঁড়িয়েছিলাম কোপাইএর চরে,
মুগ্ধ চোখে তাকিয়েছিলাম জলের অবিশ্রাম প্রবাহের দিকে।
ঝাঁক বাঁধা মাছগুলো রূপোলী ঝিলিক লাগাচ্ছিল।

দূরে বহুদূরে—
ঘন শ্যামল বনানী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।
দিনের শেষ আলোটুকু নিঃশেষে দুই পাখায় মেখে নেবার প্রয়াসী হয়েছিল দুটো গাংচিল।
কোপাইএর জলে পড়েছিল
বিষণ্ণ সন্ধ্যার গাঢ় ছায়া।
ছোট ছোট ঢেউ মৃদু শব্দে প্রবাহিত হচ্ছিল
শান্ত সন্ধ্যা নামছিল প্রকৃতির বুকে,
আমি দেখছিলাম সীমার মাঝে অসীমের রূপ,
মন ভরে যাচ্ছিল এক অনির্বচনীয় আনন্দে॥

হেলিকপটারে কলিকাতা ভ্রমণ

অনিরুদ্ধ চক্রবর্ত্তী, বয়স—৮, গ্রাঃ নং ১১২৬

'আগেরবারে পূজোর ছুটিতে আমরা হেলিকপটারে চড়েছিলাম তার গল্প বলি শোন।' হেলিকপটারটা উঠেছিল 'ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ড' থেকে আমি যখন উঠে বসলাম তখন একটু নড়ল। নড়েই উঠে গেল। তারপর দেখতে দেখতে অনেক উঁচুতে উঠে গেলাম। তারপর দেখি ময়দানটা ঠিক কার্পেটের মতো। তার ওপর কতগুলো গরু, ভেড়া ছিল তাদের দেখে মনে হচ্ছিল কার্পেটের উপর নক্সা কাটা। তারপর গেলাম ঘোড় দৌড়ের মাঠ। তারপর আলিপুর, কালীঘাট হয়ে চিড়িয়াখানা গেলাম তারপর খিদিরপুর, রবীন্দ্র সরোবর, বাড়িগুলো দেশলাইএর বাক্স, তারপর গেলাম গঙ্গা পার হয়ে হাওড়া ব্রিজ, রেল গাড়িগুলোও দেশলাইএর বাক্স। নদীর ওপর দিয়ে যখন যাচ্ছিলাম তখন আমার একটু একটু ভয় করছিল, তারপর শিবপুর বোটানিকেল গার্ডেন, শুধু গাছ, তারপর দক্ষিণেশ্বর বেলুড় মঠ হয়ে বালী ব্রিজ হয়ে মনুমেণ্টে এলাম যেন ঠিক মোমবাতি। গাড়িগুলো যেন খেলনার গাড়ি তারপর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল হয়ে আবার নেমে গেলাম, পাইলট আমাকে চিনিয়ে দিচ্ছিলেন।

একটি মজার গল্প

কুণাল চট্টোপাধ্যায়, বয়স—৮ বৎসর ৯ মাস, গ্রাঃ নং ২৫৫৮

ইংলণ্ডে গোলটেবিল বৈঠক চলছে। বিখ্যাত কবি ও দেশনেত্রী সরোজিনী নাইডু একসময় বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। একটি ছোট ইংরেজ ছেলে তাঁর অটোগ্রাফ চাইল। তিনি অটোগ্রাফ দিয়ে বললেন, 'তুমি আমার কোনো কবিতা পড়েছ ?' সে বলল, 'আমি তো আপনার কোনো কবিতা পড়িনি।' সরোজিনী বললেন, 'তবে কেন আমার সই নিলে ?' ছেলেটি বলল, 'গত বছরে আপনার স্বামীর ক্রিকেট খেলা দেখেছি। কি চমৎকার চার আর ছক্কা তিনি মারেন। তাঁর সই তখন নিতে পারিনি, তাই আপনারটা নিলাম।' সরোজিনী বুঝলেন যে ছেলেটি তাঁকে বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় সি-কে নাইডুর স্ত্রী ভেবেছে। তিনি ছেলেটিকে কিছু বললেন না। পরে দেশে এক ভোজসভায় সিকে নাইডুর উপস্থিতিতে গল্পটি মজা করে বললেন। সবাই খুব হাসল।

হাসির গল্প

শশাঙ্ক শেখর সেন। বয়স ১০, গ্রাহক নং—১৯৯

(১) মা—খোকা ! ভাঁড়ার ঘরে সকালে দুটো সন্দেশ রেখে গেলাম, এখন একটা হল কি করে ? খোকা—বিয়োগটা ঠিক মত শিখেছি কিনা তাই হাতে নাতে পরীক্ষা করে দেখলুম।

(২) এক ব্যক্তি বাগানে ঘুমোচ্ছিলেন, মশার কামড়ে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়, মশার কামড় থেকে বাঁচবার জন্য তিনি আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে শুলেন, কোন ফাঁকে একটি জোনাকি চাদরের মধ্যে

প্রবেশ করে। জোনাকির বাতি দেখে সেই লোকটি সখেদে বললেন, 'হে ভগবান, এখন আমি কোথায় যাই? মশারা তো আমাকে টর্চ নিয়ে খুঁজছে।'

(৩) খুকু—মা, কাল থেকে আমি আর স্কুলে যাবনা, দিদিমণি কিছু জানেন না!

মা—সে কি রে?

খুকু—হ্যাঁ, রোজ ক্লাসে এর মানে কি, ওর অর্থ কি জিজ্ঞাসা করে করে দিদিমনি সব শিখে নেন!

(৪) মা—খুকু! বোতলের গলাটা ভাঙলো কি করে?

খুকু—বোধহয় দৈ কিংবা টক বেশি খেয়েছে।

(৫) এক রাজা তাঁহার মন্ত্রীর সহিত খেজুর খাইতেছিলেন। রাজা খেজুরগুলি খাইয়া আঁটিগুলি মন্ত্রী সম্মুখের মাটিতে ফেলিতেছিলেন। খাওয়া শেষ হইলে রাজা মন্ত্রীর সহিত রসিকতা করিয়া বলিলেন, 'তুমি বড় পেটুক! তোমার সম্মুখের ঐ আঁটিগুলিই ইহার প্রমাণ।'

জ্ঞানী মন্ত্রী মৃদু হাসিয়া কহিলেন, 'আপনি আমার চেয়েও বড় পেটুক! কারণ আপনার সম্মুখে আঁটিও নাই। অর্থাৎ খেজুর ও আঁটি সবই খাইয়াছেন।'

সন্দেশ

তানিয়া দাশ বয়স ৯½ বৎসর গ্রাহক নং—১৯২৩

চিনি নেই তবু কেন
মিঠে লাগে 'সন্দেশ'
চুপি চুপি দিয়েছে কি
'মধুরিমা' 'সুইটেক্স'?
ও দুটোই মিঠে বটে
তবু লাগে তেতো

চিনির বদলে দিলে
ধরা পড়ে যেত।
ভেবে দেখি হল একি
ঘোর অনাছিষ্টি
শুধুই হাতের গুণে
হল কিরে মিষ্টি?

ব্যাণ্ডেল চার্চ ভ্রমণ

সোনালী বন্দ্যোপাধ্যায় বয়স ১১½ বছর গ্রাঃ নং ২৭৪০

আমরা একবার ব্যাণ্ডেল চার্চ দেখতে গিয়েছিলাম। আমরা বলতে মামু, দিদা, ছোটমাসি, মা ও আমার ছোট দুই ভাইবোন ছোটন ও কাকলি, আর আমি। গত ১১ই জানুয়ারি বেলা দু'টোর সময় আমরা বাসে চেপে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে সেখান থেকে ইলেকট্রিক ট্রেনে সোজা ব্যাণ্ডেল গিয়ে পৌঁছলাম। স্টেশন থেকে দু'টো রিক্সা করে আমরা ব্যাণ্ডেল চার্চে গিয়ে পৌঁছলাম। বড় গেট দিয়ে ঢুকে আমরা দেয়ালে দেয়ালে অনেক ছবি দেখতে পেলাম। আমরা আমাদের সঙ্গে একজন গাইডও নিয়েছিলাম। তিনি দেয়ালের ছবিগুলির মানে বলা ছাড়াও চার্চের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যে সব কিংবদন্তী

প্রচলিত আছে তা বলছিলেন। এর পর আমরা চার্চের প্রধান উপাসনা ঘরে গেলাম। এই ঘরের মাঝখানে বেদীর উপরে যীশুকে কোলে মাতা মেরীর মূর্ত্তি রয়েছে। তারপর আমরা চার্চ থেকে বেরিয়ে গঙ্গার তীরে এসে বসলাম। কাছেই একজন চীনাবাদামওয়ালা বসেছিল। তার কাছ থেকে চীনাবাদাম কিনে ও বাড়ি থেকে আনা বিস্কুট, কমলালেবু ও চকলেট দিয়ে আমরা ভোজনপর্ব সমাধা করলাম।

ব্যাণ্ডেল চার্চ দেখার পর আমাদের ইমামবাড়া দেখতে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দেরী হয়ে যাবার ভয়ে আর দেখা হয় নি।

সঃ সঃ—এই ব্যাণ্ডেল গির্জা প্রথমে তৈরি হয়েছিল ভারতে ইংরেজ–শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই। পর্তুগিজ নাবিকরা প্রথমে উপাসনা করে জাহাজে চড়ত। এই মা মেরির নাম Our Lady of Happy Voyage তিনি ছিলেন নিরাপদ যাত্রার দেবী।

এস্কিমো ভাইবোনের গল্প (অনুবাদ)

অর্পিতা রায়চৌধুরী। বয়স ১০ বছর—গ্রাহক নং ২৮৩৭

স্যালিক ও আরনারা দুটী ছোট্ট ভাইবোন ছিল। তাদের মা, বাবা কেউ ছিল না। এক প্রতিবেশী দয়া করে তাদের আশ্রয় দিয়েছিল। শীতের দিনে পাড়ার সবাই জিনিস-পত্র নিয়ে পাড়া ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু খাবার, জল, জ্বালানী তেল দিয়ে প্রতিবেশীটি আরনারা আর স্যালিককে তাদের বাড়িতেই রেখে গেল। বলে গেল, কয়েকদিনের মধ্যেই ফিরবো কিন্তু দরজার সামনে একটা ভারী ও বড় পাথর দিয়ে গেল যাতে তারা পিছু নিতে না পারে। আরনারা আর স্যালিকের মজা দেখে কে? আর তো বকুনি খেতে হবে না!

হঠাৎ একদিন তাদের খাবার আর তেল ফুরিয়ে এল। তখন তাদের খুব চিন্তা হল। অনেক ভেবে আরনারা একটা উপায় বার করল। সে মাছের কাঁটা একজায়গায় জড় করল, তার ওপর উঠে ছাদের চিমনীর গর্তটাকে বড় করে বেরিয়ে গেল। তারপর ছোট্ট ভাইটিকেও তুলে নিল। বেরিয়ে, দেখল পাড়ায় কেউ নেই। খাবার, তেল কিছুই নেই। তখন তাদের খুব জল তেষ্টা পেয়েছে আর ক্ষিদেয় তাদের পেট জ্বলে যাচ্ছে! খুঁজতে খুঁজতে তারা একটা সীলমাছের চামড়া পেল। আরনারার মনে পড়ে গেল মায়ের শেখানো মন্ত্র। আরনারা তখন সেই চামড়াটায় মন্ত্র পড়তে পড়তে হাত বুলোতে লাগল। চামড়াটা বড় হয়ে গেল। স্যালিক সেই চামড়াটা গায়ে দিয়ে সমুদ্রে নেমে গেল। কিছুক্ষণ বাদে কিছু মাছ নিয়ে ফিরে এল। এই ভাবে খাবার ও জলের ব্যবস্থা হয়ে গেল। কিন্তু আরনারার একা একা থাকতে ভাল লাগত না সেই কথা সে স্যালিককে বলল। তখন স্যালিকের মনে পড়ে গেল মায়ের শেখানো সেই ঝড়ের মন্ত্র, সে মন্ত্র পড়ে ঝড় তুলল। তারপর ঝড়ে উড়ে গেলো জেলেদের একটা নৌকো ডুবি করে নিয়ে এল। তখন থেকে তাদের দিন বেশ সুখেই কাটতে লাগল।

এইভাবে গরমের দিনও চলে গেল। আবার শীতের দিন এসে গেল। জল আবার ঠাণ্ডা হয়ে

জমে গেল। আর তাদের শিকার জোটে না। শীতের জামাকাপড়ও নেই। একদিন দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে শরীর গরম করার চেষ্টা করতে লাগল। আর ভগবানকে ডাকতে লাগল।

তাদের মনে হল বাইরে কার পায়ের শব্দ! উঠে দেখে দরজার সামনে কে যেন কিছু মাছ রেখে গেছে, আগুনের অভাবে তারা কাঁচা মাছই খেল। পরদিন তারা দরজার কাছে মাছ ও কিছু শস্যের দানাও পেল। আগুনের কথা চিন্তা করতেই তারা দেখল যে ঘরের মধ্যে কে একজন একটি বাতি এবং কিছু জামাকাপড় নিয়ে এসেছেন। তিনি তাদের বললেন যে এই বাতির আগুন কখনও নিভবে না। ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে তারা দেখল যে ঘরে কেউ নেই।

তারা মাছ আর শস্যের দানা গুঁড়ো করে রুটি তৈরি করত। একদিন তারা ঠিক করল যে কে তাদের খাবার দিয়ে যায় তা দেখবে। তারা দরজার পেছনে লুকিয়ে রইল। দেখল যে একটা সীল মাছ এসে দরজার সামনে মাছ রেখে গেল আর আগুসতি পাখির একটা ঝাঁক থেকে প্রত্যেকটি পাখি এক এক দানা শস্য দরজার সামনে রেখে চলে গেল। আরনারা আর স্যালিক তাদের মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানাল। এই ভাবে শীতের দিন দেখতে দেখতে চলে গেল।

গরমের প্রথমে একদল শিকারী এসে তাদের দেখতে পেল। তাদের সমস্ত কাহিনী শুনে একজন শিকারী তাদের দুজনকে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে গেল। তাদের ছেলেমেয়ে না থাকায় তারা খুব খুশি হয়ে এদের মানুষ করতে লাগল। বড় হয়ে তারা নিজেদের গ্রামে ফিরে এল।

যারা আলো ছড়ায়

দীপঙ্কর চক্রবর্তী

গ্রাহক নং ১৯০০—বয়স ১২½ বছর

যে সব জীবের দেহ থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয়, তাদের মধ্যে জোনাকি আমাদের অতি পরিচিত। জীবদেহ থেকে যে আলো বিচ্ছুরিত হয়ে থাকে তাকে বৈজ্ঞানিকেরা বলেন জৈবদ্যুতি। বৈজ্ঞানিকদের মতে জোনাকি ছাড়াও আরও প্রায় চল্লিশটি প্রাণী গোষ্ঠী আলো ছড়ায়।

সমুদ্রের অতি গভীরে ও বিস্তৃত জলে কত রকমের যে সামুদ্রিক প্রাণী আছে তা' আজও সম্পূর্ণ জানা যায়নি। সমুদ্রের জলে নক্‌টিলুকা নামে এক রকমের এককোষী প্রাণীর দেহ থেকে আলো ছড়ায়। সমুদ্রতরঙ্গে এই নক্‌টিলুকা যখন ঝাঁকে ঝাঁকে ভেসে বেড়ায়, তখন নাবিকেরা একে বলে 'সমুদ্রে আগুন লাগা'। জৈবদ্যুতি বিশিষ্ট প্রাণীদের যারা জলে বাস করে, তাদের বেশির ভাগই থাকে লোনা জলে, অর্থাৎ সমুদ্রে, কেবল নিউজীল্যাণ্ড অঞ্চলের কয়েক জাতীয় শুককীট ও লিম্পেট নামক প্রাণী পরিষ্কার জলে বাস করে ও আলো ছড়ায়।

কখনো কখনো রাত্রিতে বনের মধ্যে মরা গাছের উপর আলো দেখে পথচারীরা ভীত হন। মাইসেলিয়া নামক এক রকমের ছত্রাক মরা গাছের উপর অবস্থান করে আলো ছড়ায়, পচা মাছ, মাংস-খণ্ড প্রভৃতির উপর এক ধরণের জৈবদ্যুতি সম্পন্ন ছত্রাক জন্মায়। এই ছত্রাকগুলি কিন্তু বিষাক্ত নয়।

পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কাছে ফোটোব্লেফ্যারন ও অ্যানোম্যালপ্‌স্‌ নামক মাছরা এক অদ্ভুত

উপায়ে আলো ছড়ায়। এই জাতীয় মাছেদের নিজেদের কোন আলো নেই, এরা নিজেদের চোখের মধ্যে জৈবদ্যুতি সম্পন্ন এক ধরণের ব্যাকটিরিয়া একটি বিশেষ গ্রন্থিতে পোষে। দেখলে মনে হয় যেন মাছদুটোর চোখ আপনা থেকেই জ্বলছে। এই ব্যাকটিরিয়াগুলো মাছের দেহ থেকে তাদের প্রাণধারণের উপাদান গ্রহণ করে ও বিনিময়ে তাদের আলো ব্যবহার করতে দেয়। এই ধরণের পারস্পরিক সহযোগিতায় দুটি ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর একত্রিত হয়ে বসবাস করাকে জীববিজ্ঞানে বলা হয় মিথোজীবিতা বা সহযোগিতামূলক সহবাস।

এছাড়া 'হ্যাচেট মাছ' নামক আর এক রকম মাছও আলো ছড়ায়। এদের দেহে লম্বালম্বি সারিবদ্ধভাবে উজ্জ্বল আলোর ব্যবস্থা আছে। এগুলি খুব ছোট ছোট বাতির মতো। এগুলোকে হঠাৎ দেখলে চোখে একটা বৈদ্যুতিক ধাক্কা অনুভূত হয়। রাত্রিতে খাবার সংগ্রহের জন্য এই ব্যবস্থা। আবার শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য এই চোখ ধাঁধানো আলো প্রয়োজন হয়। হ্যাচেট সাধারণতঃ সাড়ে তিন ইঞ্চি লম্বা হয়। এর পিছনের দিক বা লেজের কাছটা বেশ চাপা। হ্যাচেট গভীর সমুদ্রের বিষাক্ত পোকা প্রাণী খেতে ভালবাসে।

এছাড়া কোম্ফিস, কাট্‌ল্‌ফিস, স্পঞ্জ, ডাক্‌টিলাস, ফোলাস, সী-পেন, জেলিফিস, প্রবালকীট, মাইসেনা, সাইপ্রিডিনা প্রভৃতি প্রাণীদের দেহ থেকেও আলো বেরোয়।

'হেড এণ্ড টেল লাইট্ ফিস' নামক এক জাতীয় ছোট রঙীন মাছের চোখ ও লেজের কাছে দুটি জায়গা জ্বলজ্বল করে দেহের রঙের চেয়ে এই দুই অংশের রঙ অনেক উজ্জ্বল ও লাল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় আমাদের দেশের কয়েকটি প্রাণী যেমন, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতির রাত্রিকালে অন্ধকারে চোখ জ্বলে, তাদের এই চোখ জ্বলা কিন্তু জৈবদ্যুতি নয়। এদের চোখ খুব সুন্দর প্রতিফলকের কাজ করে। দূরাগত ক্ষীণতম রশ্মিও এদের চোখে প্রতিফলিত হয়। তখনি এদের চোখ জ্বলে, যখন এদের চোখ জ্বলে তখন বুঝতে হবে কোথাও না কোথাও ক্ষীণতম রশ্মি আছে, সম্পূর্ণ অন্ধকারে এদের রাখলে এই চোখের দীপ্তি দেখা যায় না।

জৈবদ্যুতি সম্বন্ধে অনেক গবেষণা এখন চলছে। আশা করি, আমরা যখন বড হব তখন আরো বেশি জৈবদ্যুতি ও জৈবদ্যুতি সম্পন্ন প্রাণীদের কথা জানব।

ধাঁধা

দেবাশিষ মুখার্জী

গ্রাহক নং ১৫৬৭—বয়স ১১২

চাটনি দিয়ে খেতে চাই প্রায়ই মজা করে,
মাথা কেটে নিয়ে যাই মোরা শ্মশানঘাটে—
লেজ যদি ছেঁটে দাও—খাও গ্রীষ্মকালে,
বলতো 'হে গ্রাহক ভাই'—কি নাম দেব তারে?

মরু সাগরের পুঁথি

অজেয় রায়

মরুসাগর অর্থাৎ ডেড সী। বিশাল লোনা জলের হ্রদ। কাছেই পবিত্র নগরী জেরুসালেম। মরুসাগরের চারপাশ ঘিরে ছিল প্যালেস্টাইন রাজ্য। ভারতবর্ষের মতোই প্যালেস্টাইনের সভ্যতা বহু প্রাচীন। এই দেশ হচ্ছে ইহুদীদের আদিভূমি আর জেরুসালেম ছিল তাদের রাজধানী। জেরুসালেমে যীশুখৃষ্টের মৃত্যু হয়—তাই এই নগরী খৃষ্টানদেরও প্রধান তীর্থক্ষেত্র। প্যালেস্টাইন থেকেই প্রায় শুরু হয় খৃষ্টধর্মের প্রচার।

এখন অবশ্য প্যালেস্টাইন বলে কোনো দেশ নেই। মরুসাগরের একপারে ইসরাইল। অন্যপারে জর্ডন রাজ্য। এ কাহিনীর যখন সূত্রপাত তখনও কিন্তু প্যালেস্টাইন ভাগ হয়ে যায় নি।

মরুসাগরের উত্তর পশ্চিম তীর ঘেঁষে নিচু পাহাড়ের সারি। পাহাড়ের পর মরুভূমির বালুরাশি।

১৯৪৭ সাল। কয়েকটি বেদুইন বালক ভেড়ার পাল চরাচ্ছিল পাহাড়ের গায়ে। হঠাৎ একটা ভেড়া পাহাড়ের একটা গুহার মধ্যে ঢুকে পড়ল: ধর ধর করে তাড়া করতে করতে ভেড়াটা অদৃশ্য হল গুহার অন্ধকারে। ঐ পাহাড়ে এ রকম অজস্র গুহা আছে। গুহার মধ্যে বন্যজন্তুর বাস, তাই পারতপক্ষে কেউ ঢোকে না ভিতরে।

যার ভেড়া, সেই মহম্মদ আদিব একটা পাথর ছুঁড়ল গুহার মধ্যে—ভেড়াটাকে নাড়িয়ে বের করে আনতে।

ঠং! আওয়াজটা শুনে সে আশ্চর্য হয়। কঠিন পাথরের গায়ে ঢিল লাগলেতো এরকম শব্দ হওয়ার কথা নয়। কৌতুহলী হয়ে সে উকি মারল—

অবাক ব্যাপার! গুহার মেঝেয় খাড়া করে বসানো রয়েছে কয়েকটা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাটির কলসি। কলসির গায়ে সুন্দর নক্সা কাটা। বেশির ভাগ কলসিই ফাটাফুটা, কানা ভাঙা। আর একটা আস্ত কলসির মুখ থেকে বেরিয়ে আছে কাপড় না কিসের যেন কয়েকটা বাণ্ডিল।

আদিব কাছে গিয়ে দেখে কাপড় নয় চামড়ার বাণ্ডিল, ওপরে পাতলা কাপড় দিয়ে জড়ানো। ডাক শুনে সঙ্গীরাও এসে পড়ে। তারা বাণ্ডিলগুলো বাইরে টেনে আনে।

বাব্বাঃ, রীতিমত ভারি দেখছি। লম্বা লম্বা চামড়ার টুকরো গুটিয়ে অনেকগুলো স্ক্রোল, বানিয়ে কলসির মধ্যে সযত্নে রেখে দেওয়া হয়েছে। গুটানো বা পাকানো লম্বা কাগজ বা চামড়াকে ইংরেজিতে স্ক্রোল বলে।

—দেখ দেখ একটা অদ্ভুত জিনিস' চামড়ার ওপর কি জানি সব লেখা।

মহম্মদ আদিব এবং তার সঙ্গীরা লেখাপড়ার ধার ধারে না। অক্ষর পরিচয়ই হয়নি কস্মিনকালে। তবে যথেষ্ট বুদ্ধি আছে ঘটে। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল এগুলো নিশ্চয় পুঁথি জাতীয় কিছু হবে। কেউ লুকিয়ে রেখে গেছে। চামড়াগুলো কি রকম শক্ত মুড়মুড়ে হয়ে গেছে—বোধহয় অনেক পুরনো। চল নিয়ে যাই গ্রামে। সবাইকে তাক লাগিয়ে দেব। তাছাড়া শুনেছি অনেক বিদেশীলোক এমনি পুরনো লুকনো জিনিস খুঁজে বেড়ায়। পছন্দ হলে ভাল দাম দিয়ে কিনেও নেয়।

সুতরাং মহম্মদ আদিব ও তার সঙ্গীরা সবকটি স্ক্রোল বগলদাবা করে তাদের গ্রামে নিয়ে গেল।

মহম্মদ আদিবদের পুঁথি নিয়ে কয়েকজন বেদুইন গেল বেথেলহামে এক শেখের কাছে। শেখ আরবী ভাষা জানে। দেখে শুনে ঘাড় নেড়ে বলল—'উঁহু এতো আরবী নয়, বোধ হয় সিরিয়াক্। তোমরা আমার দোস্ত খলিল ইস্কান্দারের কাছে যাও, সে সিরিয়াক জানে।

কিন্তু ইস্কান্দার সাহেবও কোনো কূল কিনারা করতে পারলেন না। তখন সে তার দোস্ত জেরুসেলেমের জর্জ ইসায়ার সঙ্গে পরামর্শ করল। তারপর দুজনে একখণ্ড পুঁথি নিয়ে গেল জেরুসালেমের সেন্টমার্ক মঠে। মঠের প্রধান যাজক আর্কবিশপ স্যামুয়েল পণ্ডিত মানুষ, হয়তো এই বিচিত্র লিপির মর্ম উদ্ধার করতে পারবেন।

ইতিমধ্যে বেদুইনরা নাকি গোপনে হাজির হয় এক পুরনো জিনিসের কারবারীর কাছে। মাত্র কুড়ি পাউণ্ডে সব চেয়ে মোটা আর সব চেয়ে পুরনো দেখতে পুঁথির স্ক্রোলটা বিক্রি করতে চায়। ভারি ভারি চামড়ার বাণ্ডিলগুলো বয়ে সাত জায়গায় ঘুরে ঘুরে তারা বিরক্ত। আপাততঃ যা হোক কিছু পকেটে এলেই বোঝামুক্ত হতে রাজি।

দুঃখের বিষয় ব্যবসায়ীটির মোটেই পুঁথি দেখে পছন্দ হল না। দূর দূর কি হাবিজাবি লেখা। পাহাড়ের গুহা না হাতি। যত সব বানানো গল্প। এর জন্যে নাকি কুড়ি পাউণ্ড? কমে হয়তো বল—

বেদুইনরা কিন্তু একটি পয়সাও কমে ছাড়বে না! কত কষ্টে এত দূর বয়ে এনেছি, চালাকি। তারা রেগে মেগে মালসমেত ফিরে গেল।

আর্চবিশপ দেখেই বললেন—আরে এতো হিব্রু লিপি। মনে হচ্ছে বেশ পুরনো আমলের লেখা। তিনি সবকটি পুঁথি কিনতে চাইলেন। কথা হল বেদুইনরা আবার বেথ্‌লেহামে এলেই আর্চবিশপকে খবর দেওয়া হবে।

মাসখানেক বাদে বেথ্‌লেহাম থেকে খলিল ইস্কান্দারের টেলিফোন এল—তিনজন বেদুইন পুঁথি নিয়ে এসেছে। আমি তাদের জেরুসালেমে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

জেরুসালেমে এসে বেদুইনরা জর্জ ইসায়াকে সঙ্গে করে সেন্টমার্ক মঠে উপস্থিত হল। কিন্তু দুঃখের কথা তারা আর্চবিশপের দেখাই পেল না। গেটের মুখেই অন্য এক যাজক তাঁদের পথ আটকাল—কি চাই? তাদের পোষাক-আষাক হাবভাব দেখে তার ধারণা হল—নির্ঘাৎ বাজে লোক। হয়তো চোর-ছ্যাচড় হবে। কোনো কথায় কান না দিয়ে চারজনকে সে দরজা থেকেই হাঁকিয়ে দিল।

আর্চবিশপের কানে খবরটা পৌঁছতে তিনি তো হায় হায় করতে লাগলেন। তৎক্ষণাৎ ফোন করলেন ইস্কান্দারকে। শুনলেন—বেদুইনরা নাকি হতাশ হয়ে ফিরে গেছে গ্রামে। তবে সুখের বিষয় দু-জন তাদের পুঁথিগুলো বেথলেহামেই জমা রেখে গেছে। কিন্তু তৃতীয়জন তার ভাগের পুঁথি নিয়ে উধাও—যদি কোনো খরিদ্দার মেলে এই ভরসায়।

কিছু দিনের মধ্যে আর্চবিশপ বেদুইনদের কাছ থেকে পুঁথির মোট পাঁচটি স্ক্রোল কিনে ফেললেন। নিজে গিয়ে মরুসাগরের তীরে সেই গুহাটা একবার স্বচক্ষে দেখেও এলেন।

এইবার পুঁথিগুলি পাঠ করা দরকার। জানা দরকার এদের বিষয়বস্তু, তারিখ, প্রকৃত মূল্য।

প্রাচীন হিব্রুভাষায় আর্চবিশপের বিদ্যে অতি সামান্য। তিনি তাই হিব্রু জানা কোন পণ্ডিতের সন্ধান পেলেই তাকে পুঁথি দেখাতে ছোটেন। মতামত জিজ্ঞেস করেন। তবে এটুকু বিশ্বাস তাঁর জন্মেছিল যে পুঁথি খুবই প্রাচীন।

পর পর কয়েকজন তাঁকে হতাশ করলেন। তাঁরা ভুরু কুঁচকে বললেন—হিব্রু বটে কিন্তু মাথা-মুণ্ডু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। খুব সম্ভব জাল। বাজারে এ রকম জাল পুঁথি হরদম পাওয়া যায়। এ সব হচ্ছে ধূর্ত পুরনো জিনিসের কারবারীদের কারসাজি। শুধু একজন ওলন্দাজ পণ্ডিত সব চেয়ে মোটা স্ক্রোলটা পরীক্ষা করে জানালেন—এটা মোটেই যা তা বস্তু নয়। পুঁথিটা নকল করা হয়েছে ওল্ডটেস্টামেণ্টের অন্তর্ভুক্ত 'ইসায়ার কাহিনী' থেকে। ইনিই প্রথম 'মরুসাগরের পুঁথি'র রহস্যে ক্ষীণ আলোকপাত করলেন।

ওল্ডটেস্টামেণ্ট হচ্ছে হিব্রু বা ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ। শুধু ধর্ম-কথা নয়, আইন কানুন, উপদেশ, কাব্য, নানা কাহিনী, রাজনীতি ইত্যাদি কত কি আছে এই বিখ্যাত বইটির মধ্যে। খৃষ্টানরা একে ওল্ডটেস্টামেণ্ট বা হিব্রু-বাইবেল বলে থাকেন।

নানা মুনির নানা মত। বেচারা আর্চবিশপ মহা ধোকায় পড়লেন। একবার তো নিজেই পুঁথি পড়ার চেষ্টায় প্রাচীন হিব্রুলিপি সম্বন্ধে কয়েকখানা বই জোগাড় করে পড়াশুনা শুরু করে দিলেন। কিন্তু অচিরেই টের পেলেন—এ বড় কঠিন কর্ম, বহু সময় দরকার।

সেণ্টমার্ক মঠের একজন আর্চবিশপকে বুদ্ধি দিলেন—আপনি বরং জেরুসালেমে আমেরিকার প্রাচ্য বিদ্যা-গবেষণা কেন্দ্রে'র সঙ্গে যোগাযোগ করুন। মরুসাগরের পুঁথির রহস্য ভেদ করতে এদের চেয়ে যোগ্য কাউকে পাবেন না।

পরামর্শটা আর্চবিশপের মনে ধরল।

গবেষণা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ মিলার বারোজ তখন বিদেশে। তাই সহকারী অধ্যক্ষ ডঃ ট্রেভারের কাছে পুঁথি নিয়ে যাওয়া হল।

ট্রেভার খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন। সব চেয়ে মোটা স্ক্রোলটা থেকে কয়েকটা লাইন টুকেও নিলেন। তারপর তিনিও গবেষক ছাত্র ব্রাউনলি মিলে লেগে গেলেন পুরনো হিব্রু ভাষার অন্যান্য নমুনার সঙ্গে তুলনা করে এর প্রকৃত তারিখ ইত্যাদি নির্ণয় করতে।

লাইন কটি দেখে ব্রাউনলি বললেন—এটা ওল্ডটেস্টামেণ্টের 'বুক অফ ইসায়া'র অংশ। তারিখ সম্বন্ধে তাঁরা স্থির করলেন, এ লেখা অতি প্রাচীন, খুব সম্ভব খৃষ্টপূর্ব প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীর রচনা।

দুজনেই ভীষণ উত্তেজিত। তাঁদের সন্দেহ সত্যি হলে এ একটা দারুণ আবিষ্কার। আপাতত: অন্যান্য বিশেষজ্ঞদেরও দেখানো দরকার।

বিভিন্ন পুঁথি থেকে কিছু কিছু অংশের ফটো তুলে নিয়ে সেগুলি তাঁরা পাঠিয়ে দিলেন আমেরিকায় লিপিবিশেষজ্ঞ প্রফেসর এলব্রাইটের কাছে। পাঁচটির মধ্যে তিন গোছা গুটানো পুঁথির রহস্য তাঁরা মোটামুটি সমাধান করে ফেললেন—তিনটিই ওল্ডটেস্টামেণ্টের বিভিন্ন অংশ। অধ্যক্ষ মিলার বারোজ জেরুসালেমে ফিরে এলেন। বাকি দুটি স্ক্রোলের বিষয় তিনি উদ্ধার করলেন—প্রত্যেকটির পাণ্ডুলিপি ওল্ডটেস্টামেণ্ট থেকে নকল করা।

প্রফেসর এলব্রাইটের উত্তর এল। ডঃ ট্রেভর ও ব্রাউনলির সন্দেহ ঠিক। পুঁথির রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব—প্রথম বা দ্বিতীয় শতক অথবা আরও আগে।

সবাই আনন্দে দিশেহারা। ইদানীং কালে এত বড় মূল্যবান পুঁথি আবিষ্কার আর হয়নি। ওল্ডটেস্টামেণ্টের এত পুরনো পুঁথি আর কোথাও পাওয়া যায়নি।

আর একটা মজার ব্যাপার।

এতদিন গবেষণা কেন্দ্রের ধারণা ছিল মঠের প্রাচীন লাইব্রেরীতেই বুঝি পুঁথি আবিষ্কার হয়েছে। আর্চবিশপ এবং মঠের অন্যান্যরা পুঁথি কোথা থেকে পাওয়া গেছে সে খবরটা স্রেফ চেপে গিয়েছিলেন। হঠাৎ অধ্যক্ষ বারোজ জানতে পারলেন মরুসাগরের তীরে সেই গুহার কথা।

তৎক্ষণাৎ গবেষণা কেন্দ্রের সকলে স্থির করলেন গুহাটা একবার দেখে আসবেন। কিন্তু মাত্র কিছু দিন আগে প্যালেস্টাইন ভাগ হয়ে গেছে। ইহুদীদের নতুন রাষ্ট্র ইসরাইলের সৃষ্টি হয়েছে। জেরুসালেম দুভাগ। আরব ও ইহুদীদের মধ্যে সংঘর্ষ আরম্ভ হয়েছে। জেরুসালেমে তখন ভীষণ অরাজকতা। যেখানে সেখানে যখন-তখন গুলিগোলা চলছে। রাস্তায় বের হওয়াই বিপদজনক। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য তাঁদের গুহা দেখার প্ল্যানটা ভেস্তে গেল। পুঁথিগুলিও জেরুসালেম থেকে সরিয়ে ফেলা হল। এর কদিন পরেই সেণ্টমার্ক মঠে বোমা পড়ল।

ক্রমে জেরুসালেমে অরাজকতা চরমে উঠল। গবেষণা কেন্দ্রের অধ্যাপক ও ছাত্ররা দেশে ফিরতে লাগলেন। যাবার পথে জাহাজ জেনোয়ায় থামলে মিঃ বারোজ এক দৈনিক সংবাদ পত্রে একটি আশ্চর্য খবর পড়েন—হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুকেনিকের কাছেও নাকি এক খণ্ড মরু-সাগরের পুঁথি রয়েছে। কিন্তু গেল কি করে ?

পরে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সেই যে তিননম্বর বেদুইন, যে আর্চবিশপের দেখা না পেয়ে নিজের ভাগের পুঁথি নিয়ে হাওয়া হয়েছিল, তার পুঁথি নানা হাত ঘুরে সুকেনিকের হস্তগত হয়েছিল। এটা যে 'বুক অফ ইসায়া'র অংশ তাও সুকেনিক বের করতে পেরেছিলেন। অবশ্য কেবল ঐ অবধি, তারিখ-টারিখ নয়।

দেখতে দেখতে এই আবিষ্কারের ঘটনা চারদিকে জানাজানি হয়ে গেল। পুঁথিগুলি কেন্দ্র করে পণ্ডিত মহলে আরম্ভ হল তুমুল তর্ক। কেউ কেউ চ্যালেঞ্জ করলেন—এ সব পুঁথি খাঁটি নয়। অত পুরনো কিনা, তাই ঘোরতর সন্দেহজনক। লেগে গেল কলমের লড়াই। পরে অবশ্য আরও নিখুঁত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হল মরু-সাগরের পুঁথি ভেজাল নয়, খাঁটি।

বিভিন্ন পুঁথির বিষয়বস্তু, তাদের ব্যাখ্যা নিয়েও প্রচণ্ড বাদ-প্রতিবাদ শুরু হল। এ সব তর্ক আজও থামে নি।

মরুসাগরের পুঁথি নিয়ে এত হৈ চৈ এর কারণ কি?

মরু-সাগরের পুঁথি পড়ে খৃষ্টের আবির্ভাবের ঠিক আগের যুগে ইহুদীদের ভাষা, ধর্ম, আচার-আচরণ সম্বন্ধে অনেক নতুন কথা জানা গেছে। পাওয়া গেছে ইহুদী বাইবেলের কয়েকটা লুপ্ত কাহিনী। খৃষ্টধর্ম এবং খৃষ্টানদের বাইবেল নিউটেস্টামেণ্টের উপর ওল্ড টেস্টামেণ্টের কি কি প্রভাব পড়েছে সে, সম্পর্কেও সংগ্রহ হয়েছে অনেক নতুন তথ্য।

১৯৫২ সালে আরব ইহুদী দ্বন্দ্ব শান্ত হলে মরুসাগরের তীরে পাহাড়ের গুহায় গুহায় ভাল করে খোঁজা খুঁজি করা হয়। উনচল্লিশটি গুহাতে পাওয়া যায় পুঁথির চিহ্ন। ইতিমধ্যে দুর্মূল্য পুঁথির সন্ধানে বহু লোক পাহাড়ের গুহা-কন্দর তছনছ করেছে। পুঁথির রাখার পাত্র ভেঙ্গেছে, জরাজীর্ণ পুঁথিগুলি অসাবধানে ছিঁড়ে নষ্ট করেছে। সারা দেশে অসংখ্য খণ্ড খণ্ড পুঁথি ছড়িয়ে পড়েছে। মাত্র দু তিনটি গুহায় পাওয়া গেল অনেক গোটাগোটা পাণ্ডুলিপি। কাগজ বা চামড়ার উপর লেখা।

একটা বিরাট লাইব্রেরী। কারা যেন গোপনে লুকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু কারা? কেন? কোথায় বসেই বা লেখা হয়েছিল, এই পুঁথির রাশি? গুহাগুলো তো মোটেই মানুষের বাসের যোগ্য নয়।

এ সব প্রশ্নের উত্তর মিলল যখন পাহাড়ের ধারে মাটির তলা থেকে আবিষ্কৃত হল এক অতি প্রাচীন ইহুদী মঠের ধ্বংসাবশেষ। বোঝা গেল এই মঠেই ওল্ড টেস্টামেণ্টের নকল করা হয়েছিল। অনেকের মতে এই মঠেই নাকি স্বয়ং যীশুখৃষ্ট কিছুদিন পড়াশুনা করেন।

এই প্রসঙ্গে একটা আশ্চর্য খবরের উল্লেখ করছি। স্ক্রোলগুলির মধ্যে 'হাবাক্কুক্' নামে একটা পুঁথিতে আছে—মানুষকে মুক্তি দিতে নাকি এক ত্রাণকর্তার আবির্ভাব হবে। অনেকের বিশ্বাস এই হচ্ছে যীশু-জন্মের ভবিষ্যত বাণী। অথচ অবাক কাণ্ড, পুঁথিগুলি লেখা হয়েছিল—যীশুখৃষ্টের জন্মের ঢের আগে।

খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে রোমান সেনাপতি পম্পি প্যালেস্টাইন আক্রমণ করে। সম্ভবতঃ রোমানদের ভয়ে মঠবাসীরা মরুভূমির মাঝে নির্জন জায়গায় তাদের লাইব্রেরী লুকিয়ে রাখে। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে কেউ আর ফিরে আসে নি পুঁথিগুলি উদ্ধার করে নিয়ে যেতে। হয়তো মঠে যারা পুঁথির কথা জানতো, তারা সবাই রোমানদের হাতে প্রাণ হারিয়েছিল।

পঙ্গপালের পাল্লায়

জীবন সর্দার

২৭° উত্তর অক্ষরেখা আর ৭২° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা সেখানে ছেদ করবে, থর মরুর একদম ভেতরে, সেখানে একটি গ্রাম, নাম—ভাপ। বিকানীর থেকে জয়শালমীর যাবার পথে, যেতে যেতে যেতে, ভাপ এসে রাত হল। খেয়ে নিলাম পথের পাশের দোকান থেকে। রাতের আস্তানা করে নিলাম দোকানেরই ভেতর একপাশে।

কলকাতা থেকে এতটা পথ এসেছি শুধু মরুভূমি দেখতে শুনে, দোকানী কিষাণ ভ্যাস অবাক হলেন। ঘরে বাতি ছিল না, একটি লণ্ঠন নিয়ে এলেন। আর একটি খাটিয়া পেতে বসলেন। বাতিটা নিয়ে আসার সাথে সাথেই কাছে পিঠের অন্ধকার কোণ থেকে উইচিংড়ীর দল এল লাফিয়ে লাফিয়ে। বাতিটার সাথে কয়েকটি মথ আগেই এসেছিল। ওটার চারপাশে ওরা নাচানাচি করলে আমার আপত্তির কিছু থাকত না। ওরা কখনো আমার কাঁধে লাফিয়ে উঠল কখনো মাথায়। 'রাত ভোমরা' একটি বোঁ করে ঘরে ঢুকে এক চক্কর দিয়ে বাতিটার কাছে যাবার আগেই দেয়ালে ঠোক্কর খেয়ে আমার কোলে এসে পড়ল। 'গন্ধ পোকার' গন্ধে 'রাত ভোমরার' দিক থেকে নজর ফেরালাম। কিষাণ ভ্যাস বুঝেছিল আমি কি ভাবছি। বলল, এ আর কি পোকা দেখছেন, কখনো পঙ্গপালের পাল্লায় পড়েছেন?

না। বললাম ওঁকে। একবার দেখেছি মাত্র।

বাতি নিবেয়ে দিলেন ভ্যাসজী। আমি পরদেশী। গল্প করার লোক পেলেন অনেকদিন পর।

বুঝলেন। ভ্যাসজী শুরু করলেন—রাজস্থানের এই মরুভূমিটা মনে হয় পঙ্গপালের আড্ডা। চলতে চলতে আপনি, মরুভূমির অনেক গ্রাম বা শহরে দেখবেন পঙ্গপাল নজরে রাখবার চৌকি বা ফাঁড়ি। পঙ্গপালের খোঁজখবর ঐ সব চৌকিতে দেয়া-নেয়া হয়।

কোনদিন, আকাশের কোনো কোনো কালো মেঘের টুকরোর মত পঙ্গপালের ঝাঁক হঠাৎ দেখা দেয়। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ে খেত-খামারে। যেমনি হঠাৎ আসে তেমনি চলে যায়। কিন্তু যাবার আগে খেতের ফসল গাছপালা উজাড় করে দিয়ে যায়। আগে আমরা জানতুম না কোথা থেকে ওরা আসে। কোথায় ওদের বাসা, কি তাদের স্বভাব। কিছুই জানতুম না। তাই ওদের সাথে লড়াই করে খেতের ফসল বাঁচাতে পারতুম না।

আর এখন ? আমার ছোট্ট প্রশ্ন ।

মনে কর এই ছবিটি : ধূ ধূ মরুভূমি । কতরাত কে জানে । পাশাপাশি খাঁটিয়ায় শুয়ে এক দোকানী এক ভবঘুরেকে বলছে :

এখন আমরা পঙ্গপালের হাবভাব অনেকটা জেনেছি । ঘাসফড়িং চেনেন ? পঙ্গপাল দেখতে বড় মাপের ঘাসফড়িংএর মতো । কিন্তু দাঁড়া দুটো সে তুলনায় ছোট । তিন জোড়া পায়ের মধ্যে পেছনের পা' জোড়া সবচেয়ে বেশি শক্ত সমর্থ । তাই পেছনের পায়ে ভর করে লাফাতে পারে অনেকটা । ডানা চারটেরও জোর আছে বলতে হবে । সামনের ডানা দুটি বেশ পোক্ত, তার নীচে পেছনে ডানা দুটি ভাঁজ করে রেখে দেয় । দশ বিশ মাইল উড়ে যেতে পঙ্গপালের তেমন কষ্ট হয় বলে মনে হয় না । পঙ্গপালের বাসা কোথায় বলুন ত'—হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন ভ্যাসজী ।

ভ্যাসজীর প্রশ্নের জবাব দিলুম না । মনে হল অমনি চুপ থাকলেই উনি ঠিক বলে যাবেন । ঠিক তাই । খানিক বাদে বলতে শুরু করলেন :

মরুভূমির মধ্যে এখানে ওখানে অনেক পুকুর আছে, আর মরুভূমির দক্ষিণ-কোণে আছে কচ্ছের রণ । মনে হয়, ঐগুলোর কাছাকাছি ভেজাভেজা নরম মাটিতে গর্ত করে পঙ্গপাল ডিম পাড়ে । একটা গর্তে গোটা পঞ্চাশ ডিম পেড়ে গর্তটি বুজিয়ে দেয় । তারপর, মাস ছয় পর কোনদিন, ঘাসফড়িংএর মত দেখতে শ' শ' পঙ্গপালের ছানা ডিম ফুটে বেরিয়ে আসে । মায়ের মতই তাদের হাবভাব চালচলন । শুধু ডানা থাকে না, তাই তখন উড়তে পারে না । কিন্তু খাবারের খোঁজে যেতে পারে অনেক দূর । ধারে কাছের ঘাসপাতা তখন যা পায় তাই খায় । যত খায় তত বড় হয়, আর যত বড় হয় তত খাওয়া বাড়ে । মাঝে মাঝে খোলস পাল্টায় । কয়েকবার খোলস পাল্টাবার পর একবার ডানাসহ বড় পঙ্গপাল বেরিয়ে আসে । ধারে কাছে তখন খাবার পেলে ভালই, নয়ত, ডানা হবার পর ঝাঁক বেঁধে আকাশ কালো করে উড়বে কোনো কিষাণের সর্বনাশ করতে ।

ভ্যাসজীর কথা হয়ত এইখানেই শেষ হয়েছিল, কিংবা হয় নি । এরপর আমার আর কিছু মনে নেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ।

পরদিন বাসে বসে দুপাশ দেখতে দেখতে যাচ্ছি আর ভাবছি, বর্ষাকালে বাংলাদেশে কত না পোকা ভিড় করে আমাদের ঘরে বাইরে । সবগুলো পোকার নাম জানি না । ভ্যাসজী যেমন পঙ্গপালের খবর রাখেন তেমন করে পোকাগুলোর খবরও রাখি না । ভ্যাসজীর খেতের ফসল পঙ্গপাল একবার এসে সাবাড় করে গিয়েছে বলে, আরবার যাতে পঙ্গপালের পাল্লায় না পড়তে হয়, তাই ওদের সব খবর নিয়ে রেখেছেন । পঙ্গপাল না হতে পারে, কিন্তু হাজার রকম পোকা রয়েছে যার পাল্লায় পড়ে হাজার ভাবে নাজেহাল হচ্ছে চাষী । বরবাদ হচ্ছে খেতের ফসল । বিজ্ঞানীরা সে খবর রাখেন, আরও অনেক খবর খুঁজছেন । প্রকৃতি পড়ুয়া যারা একদিন বিজ্ঞানী হয়ে উঠবে, তারা এখন কি করতে পারে ?

(১) যত বেশী সম্ভব পোকার নাম জানার চেষ্টা করতে পারে ।

(২) ঐ পোকাগুলোর হাবভাব স্বভাবের খোঁজ নিতে পারে ।

(৩) ওরা আমাদের কাজে আসে কি আসে না সে খোঁজ নিতে পারে।

(৪) তারপর, নিজে যা জানবে, দেখবে তা কারো না কারো কাজে আসবে মনে করে, আর সবাইকে জানাবার জন্য, প্র. প. দপ্তরে জানিয়ে দিতে পারে। কী রাজী!

প্র. প. ২২ ঃ অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিনলিপি থেকে

৪. ৭. ৬৭ ঃ—আজ জলজমা বৃষ্টির মধ্যেও স্কুলে গিয়ে একটা মজার ঘটনা ঘটল।

বৃষ্টির ফলে খুব কম শিক্ষক এসেছেন, এক সময় আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে দেখলাম কিছু ছেলে প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে ছাতা, রেনকোট নিয়ে একটা জিনিসকে তাড়া করছে। সেখানে বারান্দার তলার নর্দমা ও রাস্তা জলে ভরে গেছে, ভাল করে দেখলাম একটা পানকৌড়ি নর্দমার ঢালু জায়গা দিয়ে প্রাণপণে সাঁতরাচ্ছে। নর্দমা দিয়ে সিঁড়ির তলায় ঢুকল, আমরা খুব অবাক হলাম যে, পানকৌড়ির মত চালাক পাখি এখানে এলই বা কি করে। ছেলেরা সিঁড়ির উল্টোদিকের মুখটা ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল।

এদিকে পানকোড়িটা ডুব সাঁতারে একদম মাঠের ধারে চলে গেছে। হঠাৎ দেখতে পেয়েই ছেলেরা গিয়ে তাড়া করে ওটাকে ধরল। একজন শিক্ষকের অনুরোধে তাকে টিচার্স-রুমে নিয়ে যাওয়া হল। পানকৌড়ির রঙ পুরো কাল, ঠোঁটের সামনেটা বাঁকান, পা হাঁসের মত পাতলা চামড়া দিয়ে জোড়া, জলে থাকলে পানকৌড়ির পুরো দেহ ভিজে যায়।

টিচার্স-রুমের টেবিলে তাকে শোয়ান হল, সে নির্জীব হয়ে পড়ে রইল। হঠাৎ একটা তেলাপিয়া মাছ উগরে দিয়েই, চারদিক দেখে নিয়ে সামনের খোলা দরজা দিয়ে উড়ে আকাশে মিলিয়ে গেল।

ওই কাঁটাসমেত মাছটা গলায় আটকে ছিল বলেই হয়ত সে অস্বস্তিতে নীচে নেমেছিল। ছেলেরা না ধরলে মরেও যেতে পারত।
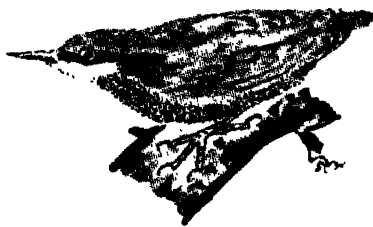
পাখির পরিচয়

চোর পাখি। মাপে চড়ুই পাখির মত। একটু ছোট হতে পারে। পিঠ লালচে। পেট ঘন বাদামী রংএর। লেজ ছোট। ঠোঁট লম্বা ছুঁচল, দেখে মনে হয় বেশ শক্ত। পোকামাকড়ের খোঁজে গাছে গাছে এই পাখিটির চলাফেরা খুব গোপন হয়ত তাই তার এই নাম। কোথাও বলে কাঠফোরা। পায়ে ভর করে ডালের উপর ডাইনে বাঁয়ে উপর নীচে তরতর করে চলে বেড়ায়। পাখি বলে তখন মনে হয় না। নীচের দিকেও মাথা করে পাখিটিকে ডালে ডালে পোকা খুঁজতে দেখেছি। বাকলের তলা থেকে পোকা আর তাদের ডিম ছুঁচলো ঠোঁট দিয়ে টেনে বের করে খায়। কাঠঠোকরার মত ঠোকরায় না। শুধু পোকা নয় ফুলফলের বিচিও খায়। গাছের কোটরে মাটি শ্যাওলা ঝরা পালক এইসব দিয়ে বাসা বানায়। শীতের শেষে বর্ষার আগে (ফেব্রুয়ারি-মে) লাল ছিট্ ছিট্ সাদা রংএর কয়েকটি ডিম দেখতে পাবে ঐ বাসায়। [জীঃ সঃ]

(উত্তর দেবার শেষ দিন ১৫ই জুলাই)

(১)

কালাধলা দুই ভাই ছিল দুই খানে,
সংসারে বোবা দোঁহে, কিছু নাহি জানে।
ধলা সে সরল অতি আছে চুপে চুপে,
কালা সে কেমন জানি, বাস করে কূপে.
একদিন কালা বীর বাহনেতে চড়ে,
ধলার উপরে গিয়ে নামে তার ঘাড়ে!
অমনি গভীর জ্ঞানে ভাষা যায় খুলি,
দোঁহে মিলে নানা কথা, কহে নানা বুলি!

(২)

তিন বন্ধু, সোহিনী, মোহিনী আর রোহিনীর পদবী হল সেন, মিত্র ও রায়, তবে, কার কি পদবী সেটা জানা নেই।

একটা দোকানে ঢুকে টুকিটাকি জিনিস কিনলেন তিন বন্ধু। রোহিনী খরচ করলেন মোহিনীর দ্বিগুণ আর মোহিনী সোহিনীর তিনগুণ। হিসাব করে দেখা গেল যে শ্রীযুক্তা সেন শ্রীযুক্তা রায়ের চেয়ে ঠিক ৩৮৫ বেশি খরচ করেছেন।

বল ত এঁদের কার কি পদবী?

(৩)

(প্রত্যেক লাইনের শূন্যস্থান এমন একটি তিন অক্ষরের শব্দ দিয়ে পূর্ণ কর যেটা সামনে ও পিছন থেকে পড়লে ঠিক একই হয়, যেমন মলম, সমাস, বাহবা ইত্যাদি। এক শব্দ দুবার ব্যবহার করবে না।)

——বাগানে আমার সাথে ?
——উদয় দেখিবে প্রাতে ?
——সুখের, হাসির কথা,
——বেদনা, দুখের গাথা।
——জানাব তোমার দুখে,
——হরষ জানাব সুখে।
——ভুলানো সবুজ ঘাসে
——দুজনে দীঘির পাশে।
——ফুলের মোহন ছবি।
——বরণ উদিবে রবি ॥

জ্যৈষ্ঠ মাসের ধাঁধার উত্তর :—

(১)

হাতঘড়ি।

(২)

বন্দনার বয়স ২৪ আর চন্দনার ২১ বছর।

(৩)

'গতকাল breakfast এর পরে আমাদের next door বড় বাড়ির new comer Mr. Rayর কাছে call করেছিলাম।

প্রথমেই notice করলাম তাঁর handsome বাগানটি নানারঙের balsam, sunflower ও অন্যান্য season এর ফুলের বাহার, ঝকঝকে তকতকে কোথাও কোনও garbage নাই। Drawing room এ দামী carpet পাতা, দেওয়ালে masterpieces টাঙ্গানো।

হেসে host Mr Ray আমাদের বসতে দিলেন। Sandwiches এবং mango ice cream খেতে দিলেন। শুনেছিলাম Mr Ray একজন important film star কিন্তু তিনি বললেন সে সব নাকি cock and bull story !

বড় late হয়ে যাচ্ছিল তাই visit curtail করে বাড়ি ফিরে এলাম।'

জ্যৈষ্ঠ মাসের ধাঁধার উত্তর-দাতাদের নাম

(তিন নম্বরের ধাঁধার ২/১টি ভুল থাকলেও সেটাকে মোটামুটি ঠিক বলে ধরা হয়েছে)

যাদের সব উত্তর ঠিক হয়েছে ঃ—

৪৯ শর্মিষ্ঠা সেন, ৩৯৩ নন্দিতা, দেবাশীষ ও বন্দনা বরাট, ৮৩৮ সুপ্রতীক বাগচী, ১১২৬ অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী, ১২৩২ নন্দিনী দত্ত মজুমদার, ১৩২০ বিজলী ঘোষ, ১৪৮১ উত্তমকুমার বটব্যাল, ১৬১৫ পথিকৃৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৬১৯ অঞ্জন ও অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৬৫১ হাম্বির মজুমদার, ১৬৫৫ শৃঙ্খবস্তী পাল, ১৭৮৮ পলাশবরণ পাল, ১৯৩৮ লীনা মিত্র, ২০৮২ দেবাশিষ রায়, ২৫৪৪ মণিকা ও সান্ত্বনা রায়চৌধুরী, ২৮৩৭ অর্পিতা রায়চৌধুরী, ২৮৬৩ ঝিনুক চৌধুরী, ২৭০১ মধুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০২৮ সুব্রত ঘটক, ২৮১৬ তপতী দাশগুপ্ত, একজন নাম নম্বর হীন।

১৫২৪ শুভাশীষ ও প্রেমাশীষ বরাট, ২২৪৮ মিহিরকুমার, দেবকুমার ও শৈবাল গুহ।

দুটো উত্তর ঠিক হয়েছে ঃ—

৫৭ শাশ্বতী দত্ত, ১৩৪২ অভিজিৎ ভট্টাচার্য, ১৩৬৫ জয়ন্তী রায় চৌধুরী, ১৪৬০ কেয়া বসু, ২০২৯ শুভ্রা বিশ্বাস, ২০৫৭ কমলেশ দাশগুপ্ত, ২০৯৬ রাহুল ঘোষ, ২০৯৭ প্রসূন রায়, ২১৯০ সুস্মিতা ও বন্দনা মজুমদার, ২১৯৫ মুকুর দাশগুপ্ত, ২৫১৯ জুলু সেন, ২৬৩৮ সৌমিত্র ভট্টাচার্য, ২৫৪৭ প্রসেনজিৎ ও মৈত্রেয়ী বসু, ১৮৭৯ অমিতাভ দে।

২৮৪ নূপুর ও মিঠু দাশগুপ্ত, ১৬৭৫ প্রদীপ কুমার মাজী, ১৭০৬ বন্দন হালদার, 2159—স্বাহা বাগচী।

একটি উত্তর ঠিক :—

২৯৫ শম্পা ও শর্মিলা দত্ত, ১২৭৯ পঙ্কজা ব্যানার্জি, ১২৯৫ সংহিতা দত্ত মজুমদার, ১২৯৮ রুদ্রনাথ ঘোষদস্তিদার ১৭০৫ কৃষ্ণকলি ও চন্দ্রাবলী বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৬৩ সোনালী লাহিড়ী।

১৮২৭ আশুতোষ ও অশোক চটোপাধ্যায়, ২৮৫০ শ্যামলী চক্রবর্তী।

পুস্তক পরিচয়

কল্যাণী কার্লেকার

আষাঢ়ে ভূতের গল্প—পরিচয় গুপ্ত।

দাম চার টাকা। রূপা এণ্ড কোং।

ভূত, ভূতী আর তাদের ভূতুড়ে বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে অনেকগুলি গল্প আছে। গল্পগুলো মজার, কিন্তু ভয়ের নয়। ভূতেরা সবাই নিরীহ, তারা মানুষের অনিষ্ট তো করেই না, বরংচ চালাকি করতে গিয়ে বোকা বনে যায়। প্রায় প্রত্যেক পাতায় অনেক মজার ছবি আছে, কিন্তু চিত্রকর বোধহয় ভুলে গেছেন যে ভূতের পা উল্টো দিকে।

ক্রীড়াজগৎ

অজয় হোম

ফুটবল

অন্য ডিভিসনের খেলা কলকাতার মাঠে চালু হলেও প্রথম ডিভিসনের খেলা শুরু না হলে ময়দানের আবহাওয়া কেমন যেন সরগরম হয় না। কলকাতার সমস্ত পাড়ার রক, চায়ের টেবিল, রেস্তরাঁর সঙ্গে একটা নাড়ির যোগ থাকে এই সিনিয়র ডিভিসনের খেলার। প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগ কি ভাবে হবে তা নিয়ে গত এক মাস ধরে কম যুদ্ধ হল না। শেষ পর্যন্ত একটা ফয়সালা হয়ে আজ ৮ই জুন থেকে শুরু হল মোহনবাগান (৬) বনাম জর্জ টেলিগ্রাফ (২), ইস্টার্ন রেল (১)-ওয়াড়ী (১), রাজস্থান (১)-বাটা (০) খেলা দিয়ে।

কলকাতার ফুটবলে এবার কতকগুলি নতুন নিয়ম চালু হচ্ছে। তার মধ্যে দুটি নিয়ম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমটি হল খেলার যে কোন সময়ে যে কোনো দুজন খেলোয়াড়কে বদল করা যাবে। আগের নিয়মে গোলরক্ষককে যে কোন সময়ে এবং অপর একজনকে দ্বিতীয়ার্ধের আরম্ভ পর্যন্ত বদল করা যেত। নতুন নিয়মে বদলি হিসেবে যাঁরা খেলায় যোগ দেবেন খেলার আগেই অন্য খেলোয়াড়দের নামের সঙ্গে তাঁদেরও নাম রেফারির কাছে পেশ করতে হবে। দুজন খেলোয়াড় বদলের পর গোলরক্ষক যদি আহত হন তখন আর বদল চলবে না।

দু' নম্বর হল গোলরক্ষকের স্টেপিং সম্পর্কে। বল ধরা অবস্থায় গোলরক্ষকের ৪ পায়ের বেশি যাবার আইন নেই। কিন্তু বল মাটিতে 'বাউন্স' করিয়েও গোলরক্ষক ৪ পায়ের বেশি যেতে পারবেন না। ৪ স্টেপের মধ্যেই গোলরক্ষককে বল মুক্ত করতে হবে।

রেফারি সংক্রান্ত আইনে রেফারির উপর আরও বেশি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। বদলি হিসেবে যেসব খেলোয়াড়ের নাম দেওয়া হবে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার ছাড়াও রেফারিরা মাঠের চৌহদ্দির মধ্যে সভ্য, সমর্থক ও দর্শকদের অশালীন আচরণের বিরুদ্ধেও কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করতে পারবেন।

গত বছর কলকাতার ফুটবল লীগে কোনো ডিভিসনেই ওঠা-নামা ছিল না। এ বছর ওঠা আছে, নামা নেই। দ্বিতীয় ডিভিসন থেকে বেঙ্গল সকার এবং অ্যালেন লীগ পর্যন্ত দুটি করে দল উঠবে।

এবার প্রথম ডিভিসনে ১৫টি দল প্রথমে একটি করে ম্যাচ খেলবে। সেই খেলায় শীর্ষস্থানের অধিকারী প্রথম চারটি দল চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের জন্যে আবার লীগ প্রথায় প্রতিযোগিতা করবে। এই চতুর্দলীয় লীগ প্রতিযোগিতায় যে দল প্রথম স্থান অধিকার করবে সে হবে চ্যাম্পিয়ন। শেষ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল এই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়াতে কলকাতার মাঠে খেলা শুরু হয়েছে। ফুটবলহীন বাঙালির মৃতপ্রাণ আবার পুনরুজ্জীবিত হল।

অমৃতবাজার পত্রিকার শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ভারতের অতি জনপ্রিয় ৩টি দল মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিংকে নিয়ে ইডেনে ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। এই ত্রি-দলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় মোহনবাগান। সুখ হয়েছিল মহমেডান স্পোর্টিং বনাম মোহনবাগানের খেলা দেখে। বহুদিন বাদে কলকাতার মাঠে একটা উচ্চাঙ্গের ফুটবল খেলা হল। দু' গোল খাবার পর মোহনবাগান দু' গোল শোধ দিয়ে ফলাফল ড্র করে। ভালো খেলে ইস্টবেঙ্গলকেও দু' গোলে হারিয়ে মোহনবাগান শতবার্ষিকী ট্রফি লাভ করলেও খেলা হিসেবে মহমেডানের বিরুদ্ধে খেলাটাই উৎকর্ষের হয়। প্রদর্শনী খেলাতেও মোহনবাগান আই-এফ-এ-কে এক গোলে হারায়।

সিউলে ভারত গত ৪ বারের চ্যাম্পিয়ন ইসরাইলের কাছে ২ গোলে হেরে এশীয় যুব ফুটবল প্রতিযোগিতায় সেমিফাইনালে উঠতে পারে না। ফাইনালে ব্রহ্মদেশ ৪-০ গোলে মালয়েশিয়াকে শোচনীয় ভাবে হারিয়ে এই নিয়ে ৫ বার টুঙ্কু রহমান কাপ জয়ী হয়। হাবিবের নেতৃত্বে ভারত 'এ' গ্রুপে খেলে এবং মাত্র ২ পয়েন্ট সংগ্রহ করে। ভারত যে এত খারাপ খেলবে তা আমরা ভাবিনি। হারার কারণের খবর পেলাম—এক নং মন্দ ভাগ্য, দুই রেফারির খারাপ সিদ্ধান্ত এবং তিন খেলোয়াড়দের পায়ের মার। তরুণ উদীয়মান খেলোয়াড়রা পা বাঁচিয়ে খেলার চেষ্টা করার ফলেই নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারে নি। সীতেশ, কানন, অশোক ও হাবিব ভারতে যা খেলে তার অর্ধেকও যদি ওখানে খেলতে পারতো তবে ট্রফিটা আমরা ঘরে নিয়ে আসতে পারতাম।

পুরস্কার

এবার অর্জুন পুরস্কার পেলেন এ্যাথলেটিকসে পারভীন কুমার ও ভীম সিং, ভারোত্তলনে সবরী বুথু ও জন গ্যাব্রিয়েল, মল্লযুদ্ধে মুক্তিয়ার সিং, সাঁতারে অরুণ সাহা, গলফে আর কে পীতাম্বর, বাস্কেটবলে খুসীরাম, টেনিসে প্রেমজিৎ লাল, হকিতে হরবিন্দর সিং, জগজিৎ সিং ও মহীন্দর লাল, ক্রিকেটে অজিত ওয়াদেকার, ফুটবলে পিটার থঙ্গরাজ।

হকি

১৯৬৮ সালের বেটন কাপ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে মোহনবাগান ১-০ গোলে বি এন আর দলকে হারিয়ে এই নিয়ে ৬ বার বেটন কাপ জয়ের গৌরব লাভ করল। প্রথমার্ধের ২৭ মিনিটে মোহনবাগানের ইনসাইড-রাইট বেণী বুডল জয়সূচক গোলটি দেয়। খেলার মান উচ্চাঙ্গের হয়নি বটে কিন্তু খেলার গতি ছিল দ্রুত এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বেস্ট প্লেয়ার হিসেবে প্রতীপ মেমোরিয়াল কাপ পান রেলদলের লেফটব্যাক সেলিম বেগ।

কলকাতার মাঠে হকির অন্যান্য খেলায় এবারের ফল—লক্ষ্মীবিলাস কাপের বিজয়ী মহমেডান স্পোর্টিং, রানার্স রেঞ্জার্স। ল্যাগডেন শীল্ড—বিজয়ী রেঞ্জার্স, রানার্স এন্টালি এ সি। কাইভান কাপ—বিজয়ী বেঙ্গল ইউনাইটেড, রানার্স রিভার সাইডার্স। প্রথম ডিভিসন লীগ—ইস্টবেঙ্গল, রানার্স মোহনবাগান। দ্বিতীয় ডিভিসন

লীগ—অ্যালেকজাণ্ডার রেমণ্ড, রানার্স আর্মেনিয়ানস। তৃতীয় ডিভিসন লীগ—ব্রিটিশ পেণ্টস্, রানার্স হাওড়া পুলিস।

ক্রিকেট

ইংল্যাণ্ডে ওলড ট্রাফোর্ডের মাঠে ইংল্যাণ্ড অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট ম্যাচ শুরু হয়েছে। ইংল্যাণ্ড ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে হারিয়ে এসে ভেবেছিল অস্ট্রেলিয়া জয় কিছুই নয়। কিন্তু বর্তমানে দেখছে অতটা সোজা নয়। বৃষ্টিভেজা উইকেটে স্বয়ং ইংল্যাণ্ডই বিপর্যয়ের সম্মুখীন। প্রথম ইনিংস শেষ করেছে মাত্র ১৬৫ রানে। অস্ট্রেলিয়া শেষ করেছিল ৩৫৭ রানে। উচিত ছিল তাদের কমপক্ষে ৫০০ রান করা। তবে ক্রিকেটের কথা কিছুই বলা যায় না।

কোকিল

গৌরী ধর্মপাল (চৌধুরী)

এক কোকিল আর এক কোকিলনী।

বসন্তকাল এসেছে। কোকিল আমগাছের ডালে বসে গান গাইছে কু-উ কু-উ কু-উ। আর মাঝে মাঝে কোকিলনীকে বলছে, কোকিলনী, তুই ডিম পাড়বি না ?

তিনবার চারবার এইরকম বলার পর কোকিলনী মাথা ঝাঁকিয়ে বলছে, ডিম আমার পাড়া হয়ে গেছে।

—কোথায় পাড়লি ? কখন পাড়লি ?

—ঐ তালগাছের মাথায় কাকেদের বাসায় কাল মাঝরাতে চুপিচুপি পেড়ে এসেছি।

শুনে তো কোকিল খুব রেগে গেছে, আর বলছে,

এঁটো কাঁটা বাসি পচা ধসা ছাড়া খায় না
গান যদি সুরু করে কান পাতা যায় না

একটি মাত্র চোখ—

অতি অভদ্র লোক—সেই তাদের বাসায় তুই ডিম পেড়ে এলি ? ঐ নোংরা কাক-বৌয়ের তা-য় ফুটবে আমার ছানা ? তা-ও যদি দাঁড়কাক হত। যা, ডিম ফেরৎ নিয়ে আয়।

শুনে তখন কোকিলনী বলছে,

ডিম ফুটনোর কী-ই বা আমি জানি ?
যা করেছে মা-ঠাকুমা, তাই করেছি আমি।

তখন কোকিল বললে,

তা হলে আর মিথ্যে কেন ঘামি ?
যা করেছে বাপ-পিতামো তাই করি গে আমি।

বলে গাছের উঁচুডালে গিয়ে বসল আর গলা ছেড়ে গান গাইতে লাগল—কু-উ কু-উ কু-উ কু-উ।

'পাথরের চোখে জল'

গৌরীশ সরকার

[একাংকিকা]

(স্থান :—কোনো একটি রাস্তার 'মাইল পাথরের' নিকটবর্তী।

কাল :—কোনো এক বিকেল।

পূর্বাভাষ :—জনৈক পথিক পথ চলতে চলতে একটা লোহার টুকরোর সংগে হোঁচট খেয়ে কিছুক্ষণের জন্য থমকে দাঁড়ায়। পর মুহূর্তে লোহার টুকরোকে জুতো দিয়ে দূরে ঠেলে দেয়। লৌহপিণ্ডটি পথের ধারে আর একটি ছোট লৌহপিণ্ডের সংগে ঠোক্কর খেয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়।)

বড় লৌহপিণ্ড। মাপ কর ভাই—সত্যি বলছি, আমি ইচ্ছে করে তোমাকে ধাক্কা দিই নি। দেখলে না, ঐ যে পথচারী যারা আজ শ্রেষ্ঠ জীব বলে দাবী করে সে অনায়াসে আমাকে কেমন করে পা দিয়ে ঠেলে দিলে। অথচ, আমারও একদিন ছিল যখন ওরা আমাকে নিয়ে কত মাতামাতি করেছিল। কতদিন, কতদিন কেন, কত যুগ ধরে ওদের সেবায় নিয়োজিত ছিলাম—তখন আমার কত কদর। হায়! ওরা আমায় চিনতে পারে না। আমাকে দেখলে নাক সিঁটকায়। সে দুঃখের কথা কাকেই বা বলব আর কেই বা শোনে! তা ভাই—তোমার পরিচয়?

ছোট লৌহপিণ্ড। আজ আমার পরিচয় ইতিহাসের পাতায়। পরিচয় দিতে গেলে জন্মের থেকে বলতে হয়। আমার জন্ম হয়েছিল খাস ইংলণ্ডে। আমার পূর্ব পুরুষদের সৃষ্টি করেছিল টমাস এডিসন নামে এক ব্যক্তি। আমার জন্মের সন তারিখ মনে নেই। জন্মের পর থেকেই সাগর পাড়ি দিয়ে এ দেশে আসি। কিছুদিন বড় শহরের সৌখীন দোকানে শো-কেসে আশ্রয় মিলল। এর কিছুদিন বাদে বড় জমিদারের বাড়িতে বসবাস শুরু হল। যৌবনের মাঝামাঝি পথেই আমাকে তারা দূরে ঠেলে দিল।

বড় লৌহপিণ্ড। কেন?

ছোট লৌহপিণ্ড। মার্কনী নামে এক বিজ্ঞানী 'বেতার যন্ত্র' সৃষ্টি করেন। সেই থেকে বড়লোকেরা ঐ 'বেতার যন্ত্রের' উপর ঝুঁকে পড়ে। মধ্যবিত্ত এক সংসারে ঠাঁই পেলাম। অনেকদিন অকেজো হয়ে পড়েছিলাম। অবশেষে আমি বিক্রিত হলাম।

বড় লৌহপিণ্ড। এবার কার কাছে?

ছোট লৌহপিণ্ড। এক বাউণ্ডেলের কাছে। ওর সামান্য জমিটুকু বিক্রি করে দিয়ে আমাকে কিনেছে। প্রথমতঃ ও আমাকে ব্যবহার করার নিয়মকানুন কিছুই জানত না। সারাদিন নাওয়া খাওয়া বন্ধ করে আমাকে নিয়ে পাগল হয়ে ছিল। একদিন আমিই অসুস্থ হয়ে পড়লাম। বেচারা আমাকে নিয়ে বেশ অসুবিধায় পড়ে—রাগ করে এক মেকারের কাছে বিক্রি করে দেয়। 'মেকার' ভদ্রলোক আমাকে অস্ত্রোপচার করে অকেজো অংশগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আর তারপর থেকেই কতজনের পায়ের গুঁতো খেয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। আজতক্ কত রোদ-বৃষ্টি-ঝড় পুইয়েছি। যাক্‌…দুঃখের কথা ব্যক্ত করতে পেরে নিজেকে যেন হাল্কা বোধ করছি। এবার তোমার পরিচয় বল ভাই।

বড় লৌহপিণ্ড। আমার পূর্বসূরীদের জন্ম হয়েছিল তোমার মত ইংলণ্ডে। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে স্টিফেনসন নামে এক ইংরেজ সৃষ্টি করেছিল। সেই থেকে আজ অবধি এই ব্রহ্মাণ্ডে নানান জায়গায় নানান আকারে আমাদের বিচরণ। তবে আমার কিন্তু ভাই জন্ম হয়েছে পাহাড়ঘেরা দ্বীপপুঞ্জ জাপানে।

ছোট লৌহপিণ্ড। তাহলে তুমি ইউরোপীয় নও।

বড় লৌহপিণ্ড। না ভাই, আমি পুরোপুরি এশীয়। দেখ, এই মানবজাতির জন্য আমি কী না করেছি। নদী-নালা পাহাড় অতিক্রম করে প্রায় দেড় শ' বছর ধরে ওদের যা উপকার করেছি! কোটী কোটী টন মাল বহন করেছি—কোটী কোটী জনগণকে এক স্থান থেকে আর স্থানে পৌঁছে দিয়েছি। বড় বড় বাঁধ, ইমারত, পুল, রাস্তা গড়তে অনলস ভাবে কাজ করেছি। দু' দুটো মহাযুদ্ধে কত রসদ না যুগিয়েছি। ওরা সে সব দিনের কথা ভুলতে বসেছে।

ছোট লৌহপিণ্ড। তোমার কথা বিস্মরণ হল কী করে?

বড় লৌহপিণ্ড। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর ডিজেল নামক এক ভদ্রলোক ডিজেল মোটর সৃষ্টি করেন। এর পর থেকেই বাষ্পীয় ইঞ্জিন বিলুপ্ত হতে চলেছে।

ছোট লৌহপিণ্ড। আচ্ছা—ডিজেলে ওদের লাভ?

বড় লৌহপিণ্ড। যত দূর শুনেছি—পৃথিবীতে যে পরিমাণ কয়লা মজুত রয়েছে তা নাকি কিছু দিনের মধ্যে ফুরিয়ে যাবার সম্ভাবনা। তাই ওরা বাষ্পীয় ইঞ্জিন তুলে দিতে চায়। তাছাড়া ডিজেলের শক্তি বা গতি আমার চাইতে বেশী। এ ছাড়া আমি যে পরিমাণ ধোঁয়া ছাড়ি তা নাকি ওদের স্বাস্থ্যের পরিপন্থী। এর মধ্যে আর একজন এসে পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে।

ছোট লৌহপিণ্ড। সে আবার কে?

বড় লৌহপিণ্ড। ফ্রাঙ্কলিন নামে এক ভদ্রলোক বিদ্যুতের সৃষ্টি করেছিলেন। আজকাল ঐ বিদ্যুতের দ্বারা 'ডিজেল' বা বাষ্পীয় ইঞ্জিনের কাজ চালাতে প্রয়াসী হয়েছে। ডিজেলের চাইতেও এর কাজ দ্রুততর।

ছোট লৌহপিণ্ড। এতে বুঝি ওদের খুব সুবিধা হয়েছে।

বড় লৌহপিণ্ড। হ্যাঁ। নদীতে বাঁধ দিয়ে জল-বিদ্যুত সৃষ্টি করেছে আর সেই বিদ্যুতের দ্বারাই সব রকম কাজ চলেছে। মোদ্দা কথা, আমাদের নতুন করে বংশবৃদ্ধি হবে না। বরং এখন যারা টিকে রয়েছে এদেরকে অনুন্নত এলাকায় পাঠিয়ে দেবে। আমার বয়স বাড়ার সাথে সাথে খারিজ করে দিয়েছে। রোদ-জলে বহু দিন পড়েছিলাম—শেষ অংশটুকু কালক্রমে ইতস্তত: ঘুরতে ফিরতে আজ ঐ লোকটার পায়ের ধাক্কা খেয়ে তোমার কাছে এসে পড়েছে বলেই না এত কথা বলার সুযোগ পেলাম। দুর্ভাগ্য নিয়ে চললেও তোমাকে পেয়ে সৌভাগ্য মনে করছি।

ছোট লৌহপিণ্ড। ঠিক বলেছ। (উভয়ে দুঃখের হাসি হাসতে থাকে। একটি জীর্ণ তারের অংশ বিশেষ ঝড়ো হাওয়ায় উড়ে এসে মাইল পাথরে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে লৌহখণ্ডদ্বয়ের মাঝে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।)

জীর্ণ ছেঁড়াতার। তোমাদের হাসি দেখে মনে হচ্ছে আনন্দের নয়—বিষাদের—

বড় লৌহপিণ্ড। কি করে বুঝলে?

ছোট লৌহপিণ্ড। হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসে আমাদের আনন্দের ব্যাঘাত ঘটালে—কে হে বাপু তুমি? ভারী বেয়াদপ তো! তোমার অনধিকার-চর্চায় বিস্মিত হয়েছি।

জীর্ণ ছেঁড়া তার। হেঁ—হেঁ—হেঁ—তা অন্যায় হয়েছে বৈ কি? ক্ষমা চাইছি।

বড় লৌহপিণ্ড। তোমার পরিচয় ?

জীর্ণ ছেঁড়া তার। (গলা খাঁকারি দিয়ে) মহাশয়, আমি নিবেদন করছি, শ্রবণ করুন। ১৮৯৬ খৃঃ ইটালীর মার্কনী সাহেব আমার পূর্বপুরুষদের সৃষ্টি করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে ঐ ভদ্রলোকের আগে ভারতীয় তথা বাঙালী জগদীশ বাবুর অবদান কম নয়। ঈথারে শব্দ ভাসে এ কথা তিনি সর্বাগ্রে ঘোষণা করেছিলেন। যাই হোক, বেশ সুখেই আমার দিন কাটছিল। হঠাৎ বাদ সাধলেন ১৯২৫ খৃঃ ইংলণ্ডের বেয়ার্ড সাহেব টেলিভিসন তৈরী করলেন। সেই থেকে আমার আদর এবং চাহিদা কমতে লাগল। যদিও ঐ যন্ত্র যথেষ্ট পরিমাণে সব জায়গায় ব্যবহৃত হচ্ছে না।

ছোট লৌহপিণ্ড। তা হলে আর তোমার ভাবনা কিসের ?

জীর্ণ ছেঁড়া তার। ভাববার আছে মশাই—আছে। কিছুদিন হল ট্রানজিস্টর বেরিয়েছে আর সেই সংগে রেডিওর কদর কমেছে। আমি যদিও একেবারে লুপ্ত হইনি তবুও আমার বংশ বিশেষ বৃদ্ধি হচ্ছে না।

ছোট লৌহপিণ্ড। বুঝলে, অতীতের একটা কথা মনে পড়ে গেল। একদিন তোমার আবির্ভাবে আমি কিন্তু ভাই ভীষণ রুষ্ট হয়েছিলাম। সেদিনের হিংসার কথা মনে পড়ায় খুব লজ্জা লাগছে। মিথ্যে অভিমান করে-ছিলাম তোমার উপর। তুমি আমারই মতো সর্বহারা পথিক।

বড় লৌহপিণ্ড। আমি ভাবছি—ভবিষ্যতে আমাদের অস্তিত্ব থাকবেই না বরং আমাদের কথা ওদের স্মৃতিপটে দাগ কাটবে কিনা সন্দেহ।

জীর্ণ ছেঁড়া তার। হেঁ—হেঁ—হেঁ—ঠিক বলেছেন। আমিও তো ঐ কথা ভাবতে ভাবতে জীর্ণ-শীর্ণ হয়েছি।

(একজন ঠেলাওয়ালা ভাঙ্গা টুকরো কুড়োতে কুড়োতে মাইল পাথরের নিকটবর্তী হতেই লৌহখণ্ডদ্বয় দেখতে পেয়ে কুড়িয়ে নিয়ে গাড়িতে ছুঁড়ে ফেলে, গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে চলে যায়।)

একি ! আপনারা সত্যি সত্যি চলে গেলেন যে ? আবার দেখা হবে তো ?

বড় লৌহপিণ্ড। দেখা হবে কিনা বলতে পারছি না। জানি না এবারে স্থান কোথায় হবে। নিজের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে হয়তো বা নতুন খোলসে আশ্রয় পেতে পারি। আমাদের কথা মনে রেখ ভাই। (ধীরে ধীরে পর্দার আড়ালে চ'লে যায়)।

জীর্ণ ছেঁড়া তার। নিশ্চয়ই রাখব। (একটু হেসে) কিন্তু আমার কথাই বা কে মনে রাখে।

মাইল পাথর। তোমাদের কথা আর কেউ মনে না রাখলেও আমি কিন্তু স্মরণে রাখব। আমি সেই অশোকের সময় থেকে এই পথের পাশে রয়েছি। আমাকে ওরা ছাড়তে পারবে না। রোদ-বৃষ্টি-জল মাথায় নিয়ে যুগ যুগ ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। মাঝে মাঝে ওরা আমায় রং করে দিয়ে যায়। তোমাদের সাক্ষ্য আমি নীরবে বহন করব। তোমাদের জন্ম আমার ভীষণ কষ্ট হয় কিন্তু আমি যে নিরুপায়। ভয় কি—জন্ম হলে মরতে হয়। আবার তোমাদের নবজন্ম হবে।

যবনিকা পতন
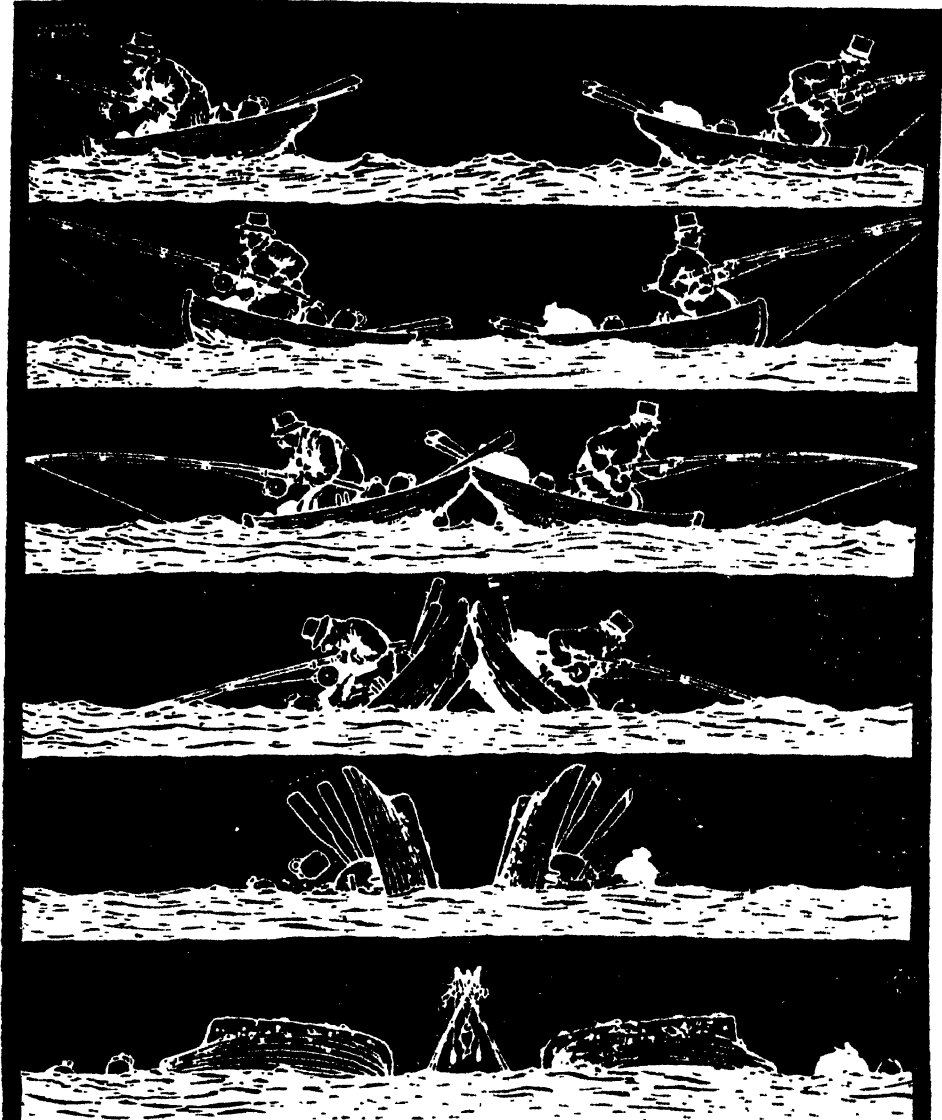
বিখ্যাত দুটি মৎস্য-শিকারী, যদু বোস আর মধু সেন,
বড় গাঙে দুই নৌকা ভাসিয়ে দুটি বড় মাছ গেঁথেছেন।
এত জোরে টানে! কত বড় মাছ? রাঘব বোয়াল মনে হয়,
মারো জোরে টান! গেল!—গেল!!—গেল!!! তরী উল্টাবে নিশ্চয়!
তবু মারো টান! যায় যাক প্রাণ! খ্যাতি রয়ে যাবে এ-ধরায়।
জোড়া ছিপে গাঁথা চুণো পুঁটি কাঁদে 'মোরও প্রাণ গেল—হায়, হায়।'

অষ্টম বর্ষ—চতুর্থ সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৭৫ | অগস্ট ১৯৬৮

বাঘ বেরোচ্ছে

নির্মলেন্দু গৌতম

বাঘ বেরোচ্ছে রটছে খবর,
বনের মধ্যে সাড়া !
শিরশিরিয়ে বাতাস কেবল
পাতায় দিচ্ছে নাড়া !
বাঘের খবর চতুর্দিকে
কেউ রটাচ্ছে হেঁকে !
সমস্ত বন নিঝুম কেবল
ঝিঁ ঝিঁ উঠছে ডেকে !

বনের মধ্যে কেউ রটাচ্ছে
বাঘ বেরোচ্ছে নাকি,
শুনতে পেয়েই বাঘ বললে,
'সমস্তটাই ফাঁকি !
বিচ্ছিরি এই অন্ধকারটা
ভয় জাগাচ্ছে মনে,
কাজেই একা কিচ্ছুতে আজ
বেরোচ্ছিনা বনে !'

বাড়ির সকলে দুপুরবেলা ঘুমিয়েছে কিন্তু সঞ্জুর চোখে ঘুম নেই। বাড়ির পাশে ছোট্ট নদীটা তাকে কাল সন্ধ্যেবেলা গ্রামে এসে পৌঁছন থেকে টানছে। সে দাদার কঞ্চির ছিপটা কাঁধে তুলে বেরিয়ে পড়ল।

নদীর নির্জন আঘাটায় একটা হাঁসের ছানা বসে বড়দিনের রোদ পোয়াচ্ছিল। সঞ্জুর পায়ের শব্দে পিছন ফিরে একটা ছোট্ট মানুষ দেখে সে ভয় পেয়ে প্যাঁক প্যাঁক ক'রে উড়ে গিয়ে খানিকটা দূরে বসে সঞ্জুকে ভাল ক'রে দেখতে লাগল।

সঞ্জু আসার সময় এঁটোপাত কুড়িয়ে চাট্টি ভাত একটা কাগজে মুড়ে এনেছিল। একটা ভাত তুলে বঁড়শিতে গাঁথতে গিয়ে তার আঙুলে লাগল খোঁচা। সেখানে একটা বড় রক্তবিন্দু লাল-মণির মত জলজল ক'রে উঠল। সে তাড়াতাড়ি আঙুলটা মুখে পুরে চুষতে শুরু করল। হাঁসের ছানা সঞ্জুকে নিজের আঙুল খেতে দেখে অবাক হয়ে গেল। ভয় পেয়ে ডানা মেলে প্যাঁক-প্যাঁক করতে করতে সে ছপাৎ ক'রে জলে উড়ে গিয়ে পড়ল।

সঞ্জু ছিপটা জলে ফেলে ফাৎনার দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে বসে রইল। হাঁসের ছানাটা দূর থেকে খানিকক্ষণ তাকে ঐ ভাবে ব'সে থাকতে দেখে ঘাবড়ে গেল। ভাবল, ছেলেটা নিজের আঙুল কামড়ে খেয়ে মরে গেল না তো? অন্য কেউ এসে যদি আঙুলটা কাটা দেখে তাহলে নিশ্চয় ভাববে দুষ্টু হাঁসের ছানাটাই ছেলেটার আঙুলটা কুট ক'রে কেটে নিয়ে ওকে মেরে ফেলেছে। তারপর কি হবে? যদি সন্ধ্যেবেলায় মা ফিরে এলে কেউ তার নামে নালিশ ক'রে দেয়?

হাঁসের ছানার ভারি রাগ হ'ল সঞ্জুর উপর। এভাবে নিজের আঙুল খেয়ে মরবার কি দরকার ছিল ছেলেটার? নিশ্চয় ও পরীক্ষায় পাস করতে পারেনি, তাই বকুনির ভয়ে এই কাণ্ড করেছে। সারাবছর পড়াশুনো করবে না, মাঝখান থেকে নিজের বকুনি বাঁচিয়ে বেচারা হাঁসের ছানার মার কাছে বকুনি খাবার ব্যবস্থা ক'রে রেখে গেল।

হাঁসের ছানা ভাবল—এক যদি সে অন্য কোথাও উড়ে চলে যায় তাহলে কেউ তাকে দুষতে

পারবে না ; কিন্তু মা যেখানে থাকতে ব'লে গেছে সেখান থেকে উড়ে চলে গেলে মা কি তার একটাও পালক আস্ত রাখবে ?

হাঁসের ছানা নানারকম ভাবতে-ভাবতে সঞ্জুর কাছে এল। সঞ্জু একমনে ফাৎনাটাকে দেখছিল, তাই হাঁসের ছানাকে দেখতে পেল না। হাঁসের ছানা তখন সঞ্জু বেঁচে আছে কিনা ভাল ক'রে জানবার জন্য পাখায় ক'রে অনেকটা জল ছিটিয়ে দিল তার মুখে। সঞ্জু ছিপসুদ্ধু লাফিয়ে উঠে বলল—ভারি দুষ্টু তো তুমি !

হাঁসের ছানাটা সঞ্জু বেঁচে আছে বুঝতে পেরে আনন্দে প্যাঁক-প্যাঁক করতে-করতে এলোমেলো সাঁতার কাটতে লাগল। সঞ্জুর উপর খুব খুশি হ'ল সে।

অনেকক্ষণ পরে ফাৎনাটা নড়ে উঠতে ছিপটাকে শক্ত হাতে ধরল সঞ্জু। হঠাৎ উল্টোদিকের একটানে সে পড়ল জলে। দম বন্ধ ক'রে ছিপটাকে আঁকড়ে ধরে রকেট বাজির মত সোঁ সোঁ ক'রে ছুটে চলল মাছের টানে।

জলে পড়বার সময় ভয়ে সঞ্জু চোখ বন্ধ ক'রে নিয়েছিল। এখন কানের কাছে নানারকম শব্দ শুনে কৌতূহলে সে অল্প-অল্প তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করল। বাঃ বেশ দেখা যাচ্ছে তো ! আর কি আশ্চর্য ! নিশ্বাস না নিয়েও তো কোনো অসুবিধে হচ্ছে না !

ইস কত বড় মাছটা তার ছিপ গাড়িখানা টানছে ! এতক্ষণে সঞ্জুর চোখ পড়ল মাছটার দিকে। মিশকালো রং, এক-একটা আঁশ সঞ্জুর এক-এক হাতের মাপে ! একখানা মাছের মত মাছ ধরেছিল সে। বেচারীর ভাগ্য খারাপ, তাই এমন শিকারটা তার বাড়ির লোককে দেখাতে পারল না। উল্টে শিকারটাই শিকারীকে ধরে নিয়ে চলেছে বাড়ির লোককে দেখাতে।

মাছটা হঠাৎ হুস্ ক'রে একজায়গায় থেমে গেল। সঞ্জু দেখল সে একেবারে নদীর তলায় নেমে এসেছে। পায়ের নিচে বালি আর পাথর দেখে সে ছিপটা ছেড়ে দাঁড়াল। মাছটা তার মাথার উপর ভারী লেজখানা চাপিয়ে দিল যাতে সে ভেসে উপরে উঠে যেতে না পারে। তারপর হাঁক-ডাক শুরু করল মাছের ভাষায়। সঞ্জুর কিন্তু সেই ভাষা বুঝতে একটুও অসুবিধে হ'ল না।

মাছটা ডাকল—ও গুরুমশাই, গুরুমশাই ! শিগ্‌গির বেরিয়ে এস !

সঞ্জুরা যেখানে দাঁড়িয়েছিল তার পাশেই কয়েকখানা বড় বড় পাথর সাজিয়ে একটা ঘরের মত তৈরী করা ছিল। সেই ঘর থেকে কে যেন সাড়া দিল—এখনও বলি হ'ল না। সেই সকাল থেকে উপোস করে আছি। এই বুড়োবয়সে এত ধকল সয়ে কি চটপট কাজ করা যায় রে বাপু !

মাছটা বলল—আসার সময় অমনি প্রবালটাও এন ! একেবারে বলি দিয়ে, প্রসাদ খেয়ে উপোস ভেঙে নিও।

ভেতর থেকে চট ক'রে এক বুড়ো মাছ একটা প্রবাল মুখে ক'রে বেরিয়ে আসতে-আসতে বলল—বলির জোগাড় এনেছিস, আগে বলতে হয়। তাহলে কি এত দেরি করি ?

সঞ্জুর তো ভয়ে বুক ঢিপ ঢিপ করছিল। এ আবার কি বিপদ রে বাবা ! কত লোকে তো মাছ

ধরে ; মাছেও যে কাউকে ধরে নিয়ে গিয়ে বলি দেয়, এমন তো কখনও শোনেনি সঞ্জু।

যে মাছটা তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল সে এবার সঞ্জুর মাথার উপর লেজটা নাড়তে-নাড়তে এক ধমক দিয়ে বলল—হাঁ ক'রে দেখছ কি বোকা ছেলে ? গুরুমশাইকে প্রণাম কর।

সঞ্জু দুহাত তুলে নমস্কার করল সেই বুড়ো মাছটাকে। তারপর মিহি সুরে প্রশ্ন করল—কিন্তু, তুমি তো নমস্কার করলে না ?

মাছটা হেসে উত্তর দিল—আমাদের লেজ আছে, আমরা লেজ নেড়ে প্রণাম করি ; তোমাদের লেজ নেই তাই তোমরা হাত নেড়ে প্রণাম কর।

তারপরেই মাছটা ব্যস্ত হয়ে বলল—ইস্ সকাল থেকে উপোস ক'রে আছেন আপনি, আর দেরী করবেন না। বড্ড রোগা দেখাচ্ছে আপনাকে, তাড়াতাড়ি একটু প্রসাদী মুখে দিয়ে সুস্থ হ'ন।

বুড়ো মাছটাকে এবার ভাল ক'রে দেখল সঞ্জু। তাকে একটুও রোগা মনে হ'ল না। বুড়ো মাছটা যেমন লম্বা তেমনি মোটা। একে বলে কিনা রোগা দেখাচ্ছে ! কথাটা ভেবে এত ভয়ের মধ্যেও সঞ্জুর হাসি পেল।

গুরুমশাই খানিকক্ষণ গাঁই-গুঁই করলেন—বড় ছোট হয়ে যাচ্ছে এবারের বলি, বড় ছোট হয়ে যাচ্ছে ! তারপর শিষ্যকে হুকুম করলেন—মৎস্য-ধর্ম অনুযায়ী ওকে বলির আগে ব্যাপারটা ভাল করে বুঝিয়ে দাও।

শিষ্যকে একটু গোঁয়ার-গোবিন্দ বলে মনে হ'ল সঞ্জুর। সে সঞ্জুর মাথার উপর লেজের চাপ বাড়িয়ে দিয়ে বলল—শুনছ খোকা ! তোমাকে এখন বলি দেওয়া হবে। প্রতি মাসে একবার আমাদের মৎস্যদেবতার কাছে আমরা একটি করে নরবলি দিয়ে থাকি। তোমাদের মত খাঁড়া দিয়ে আমরা বলি দিই না। আমরা সোজাসুজি একটা প্রবাল মানুষের বুকে ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে মেরে ফেলি। ওই প্রবালটা দেখছ, সেটি আবার সাধারণ প্রবাল নয়। মাঝ সমুদ্রে যে প্রবাল দ্বীপে আমাদের দেবতা থাকেন সেই দ্বীপের নৈঋত কোণ থেকে ওটা ভেঙ্গে আনা হয়েছে।

বুড়ো মাছটা শিষ্যের প্রত্যেকটা কথা মন দিয়ে শুনছিল আর মস্ত মাথাটা নেড়ে সায় দিচ্ছিল। শিষ্যের কথা শেষ হলে সে বলল—এবার ওকে জিজ্ঞেস কর ওর কোথাও কাটাকুটি নেই তো ?

বুড়ো মাছের মাথা-নাড়া দেখতে-দেখতে আর গোঁয়ার-গোবিন্দর ধর্ম ব্যাখ্যা শুনতে-শুনতে সঞ্জুর বার-বার বাবা-মা আর দাদার কথা মনে পড়ছিল। সঞ্জুকে ফিরে না পেয়ে তাঁরা নিশ্চয় খুব কান্নাকাটি করবেন। কত জায়গায় হয়ত খুঁজে বেড়াবেন তাকে। এই সমস্ত ভেবে সঞ্জুর চোখ জলে ভরে গেল।

শিষ্য মাছটা তার মাথার লেজের এক ঝাপট মেরে বলল—বুড়ো লোকের আবার কান্না হচ্ছে ! আগে বল্ তোর কোথাও কাটা আছে কিনা, পরে কাঁদিস !

গোঁয়ার গোবিন্দের রুক্ষ ব্যবহারে সঞ্জু একেবারে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।—দোহাই তোমাদের, আমাকে মেরো না। তাহলে আমার মা বড় কাঁদবে।

গুরুমশাই কেমন মুখ-বাঁকা করে হাসলেন আর শিষ্য জোরে একটা 'ফুঃ' ক'রে বলল—মানুষের মায়ের আবার পুত্রশোক।

কথা শেষ করেই সে লেজের আর একটা ঝাপট মেরে বলল—আগে কথার জবাব দে ছোঁড়া! তোর কোথাও কাটা-কুটি নেই তো?

সঞ্জুর হঠাৎ মনে পড়ল মাছ ধরতে ব'সে আঙুলে বঁড়শি ফুটে গিয়েছিল। সেই আঙুলটাকে অন্য আঙুলগুলো দিয়ে টিপে জোর করে রক্ত বার করে সে দেখাল। বলল—এই দেখ বঁড়শি ফুটে গিয়েছিল একটু আগে, এখনও রক্ত বেরুচ্ছে।

গুরুমশাই শিষ্যকে একটা ধমক দিয়ে বললেন—কি আক্কেল! পুজো বলে কথা! বলির জিনিসটা অন্তত একটু দেখে-শুনে আনতে হয়।

শিষ্য লজ্জায় মাথা নিচু ক'রে রইল।

গুরুমশাই বললেন—থাকগে, যা হবার তা হয়েছে। এখন একে একটা শ্যাওলার দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখ। পালাতে না পারে। আমি ততক্ষণে একটা ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছি। ঘণ্টাখানিকের মধ্যে কাটা জায়গা জুড়ে যাবে।

সঞ্জুর হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে বুড়ো মাছ—তার ঘর না মন্দির কে জানে—সেই পাথর ঘেরা খুপরিতে ঢুকে পড়ল। গোঁয়ার গোবিন্দও অন্য কাজে চলে গেল।

ভয়ে-ভাবনায় বেচারী সঞ্জুর এক-এক মিনিটকে এক-এক ঘণ্টা মনে হচ্ছিল। সে শুয়ে-শুয়ে শুধু বাড়ির কথা ভাবছিল আর কাঁদছিল। অনেকক্ষণ পরে কানের কাছে হঠাৎ প্যাঁক প্যাঁক ডাক শুনে সে তাড়াতাড়ি উঠে বসল। দেখল সেই দুষ্টু হাঁসের ছানা তার ঠোঁট দিয়ে শ্যাওলার দড়িটাকে টেনে-টেনে ছিঁড়ছে। একটু পরে বাঁধন খুলে যেতে সঞ্জু দাঁড়াল। হাঁসের ছানা তার লাল টুকটুকে ঠোঁট দিয়ে সঞ্জুর সবুজ জামাটাকে কামড়ে তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে চলল উপর দিকে। তারপর তাকে ডাঙ্গায় তুলে দিয়ে মনের আনন্দে গাইতে লাগল—প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক।

আরে! আরে! তাড়াতাড়ি জলে পড়তে-পড়তে ছোট্ট সঞ্জু তার ছোট্ট হাত দিয়ে আঘাটার একটা পাথর ধরে নিজেকে সামলে নিল আর একটু হ'লে কি সর্বনাশটাটাই হত! ঘুমের ঘোরে সে ঢলে পড়ে যাচ্ছিল জলের মধ্যে। ভাগ্যিস হাঁসের ছানা ঠিক সময়ে ডেকে তার ঘুম ভাঙিয়ে দিল। নইলে এক্ষুনি সে স্বপ্নে যেখানে গিয়েছিল, সেইখানে পৌঁছে যেত। সত্যি সত্যি হয়তো গোঁয়ার গোবিন্দ আর তার গুরুমশাই মিলে সঞ্জুর বুকে ছুঁচ্‌ল প্রবালটা ঢুকিয়ে দিত। চোখ রগড়াতে-রগড়াতে স্বপ্নের কথা মনে ক'রে তার হাসি পাচ্ছিল। হঠাৎ তার মনে হ'ল স্বপ্নের সবটা কিন্তু মিথ্যে নয়। শেষদিকটা সত্যি হয়েছে। হাঁসের ছানাই তো সত্যি সত্যি তাকে বাঁচিয়ে দিল। হাঁসের ছানাকে একটু আগে দুষ্ট বলেছিল বলে ভারি দুঃখ হ'ল সঞ্জুর। সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল—তুমি খুব ভাল।

সেয়ানা ছেলে

শৈলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

এক বুড়ি। দুই ছেলে তার। বড় ছেলে মারা গেছে অনেক দিন। আর ছোট ছেলে চাকরির খোঁজে গেছে বিদেশে।

একদিন বুড়ির বাড়িতে এসে হাজির হ'ল এক সৈনিক। বুড়িকে দেখেই বলল,—'দিদিমা, এক রাত কাটাতে দেবে তোমার ঘরে?'

'দিদিমা' ডাকে বুড়ি যেন গলে যায়। বলে,—'এসো বাবা এসো। তা আসছ কোথা থেকে? কি নাম গো তোমার?'

: 'আমি হলুম নিখোঁজ দিদিমা। থাকি সেই পরলোকে, সেই দূরে।' বলল সৈনিক।

: 'এই দেখেছ সোনা আমার,'—বুড়ি আহ্লাদে আটখানা—'কি যে বলি, এই ত্থাখ আমার ছেলেটিও মারা গেছে। তাকে চেন নাকি?'

: 'তা আবার চিনি না?' জানাল সৈনিক,—'ও আর আমি—আমরা তো একই ঘরে থাকি সেখানে।'

: 'বলো কি'—বুড়ি এবার আহ্লাদে ফেটেই পড়ল' তা, বাছা-আমার কেমন আছে? কাজ কর্ম-ই বা কি করে?'

: 'দিদিমা, কাজ কম্মের কথা? আহা, ছেলে তোমার সারস চরায়।'

: তাই নাকি? বোধ হয় খুব-ই কষ্টের কাজ? মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ানো। তা, জামা কাপড়ের অসুবিধা নেই ত?'

: নেই আবার! একেবারে লক্ষ্মীছাড়া অবস্থা।' ছেলের দুরবস্থা! দিদিমা বললে, 'বাবা, আমার কাছে খান দুই কাপড়, আর শ'খানেক টাকা আছে। কাল তুমি নিয়ে যাবে? ছেলেকে দিও। কেমন?'

: 'তা দেব।'

পরের দিন কাপড় আর টাকা নিয়ে বিদায় নিল সৈনিক।

* * * * *

দিন কয়েক পর বুড়ির ছোট ছেলে ফিরল ঘরে। কেমন আছো মা?

বুড়ি জানাল,—'বাবা, তুই যখন বিদেশে ছিলি নিখোঁজ এসেছিল পরলোক থেকে। তোর দাদার কথা শুনলাম ওর কাছে। বড় দুরবস্থায় আছে। ওর হাতে দুখান কাপড় আর তোর সেই এক শ' টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি।'

ছেলে মায়ের কথা শুনল। গম্ভীর হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল,—'এই বুঝি ব্যাপার। মা, আমি চললাম। দুনিয়া ঘুরে তোমার চেয়েও বোকা যদি চোখে পড়ে তবেই ফিরব। নয়তো আর দেখা হবে না।'

বলেই ছেলে বেরিয়ে পড়ল পথে।

চলতে চলতে ছেলে এসেছে জমিদারের গাঁয়ে। জমিদারের বাড়ির সামনে, উঠোনে চরছে একটা শুয়োর তার কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে। তাই দেখে ছেলে শুয়োরের সামনে হাঁটু গেড়ে সেলাম করতে লাগল। জমিদার-গিন্নী জানলা দিয়ে ব্যাপারটা দেখলেন। ঝিকে ডেকে বললেন,—'যা তো, জিজ্ঞেস করে আয় তো ছেলেটা শুয়োরটাকে সেলাম করছে কেন?'

ঝি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করে এসে বলল,—'মা, তোমার ঐ শুয়োরটি নাকি ঐ ছেলেটির শ্যালী। কাল ওর ছেলের বিয়ে, তাই নেমন্তন্ন করতে এসেছে। শুয়োর হবেন বরকর্ত্রী আর বাচ্চাগুলো বরযাত্রী। তোমার কাছে ওদের যাবার জন্যে অনুমতি প্রার্থনা করেছে ছেলেটি।'

জমিদার গিন্নী শুনল। হাসল। তারপর বলল, 'আচ্ছা বোকা তো. শুয়োরকে কিনা নেমন্তন্ন করছে বিয়েতে। লোকে শুনলে-ও যে হাসবে। শোন ঝি এক কাজ কর। শুয়োরটাকে আমার লোমের কোটটা পরিয়ে দে, আর দু'ঘোড়ার গাড়িতে ওদের বসিয়ে দে। বিয়ের আসরে যাবে, নৈলে জমিদারের মান থাকবে কেন। লোকে খুব হাসবে ওর কীর্তি দেখে।'

বেছে দুটো ঘোড়াকে যুতে দেওয়া হল গাড়িতে। কাচ্চা-বাচ্চা সমেত তুলে দেওয়া হ'ল

শুয়োরটাকে। তারপর ওদের পৌঁছে দেওয়া হল ছেলের কাছে। ছেলে-ত গাড়ি পেয়ে আপন গাঁয়ের পথে গাড়ি হাঁকাল।

ক্ষণিক পরেই জমিদার মশাই বাড়ি ফিরলেন শিকার করে। কর্তাকে দেখেই গিন্নী হেসে ফেটে পড়লেন : 'ওগো শোন, শোন। কি যে মজা—তুমি তো দেখলে না। এক ছেলে তোমার শুয়োরের সামনে বসে সেলাম করছিল। বলল কিনা তোমার শুয়োর তার শ্যালী। হা, হা, হা। আবার বলে কিনা ওর ছেলের বিয়েতে শুয়োর হবে বরকর্ত্রী, আর ঐ শুয়োরের বাচ্চাগুলো বরযাত্রী। হি হি হি। তুমি ত দেখলে না! কি বোকা!'

জমিদার বলল,—'তা ত বুঝলাম, কিন্তু শুয়োর আর বাচ্চাগুলো দিয়ে দিয়েছ নাকি?'

গিন্নি বলল,—'না দিয়ে আর কি করি বল! বোনপোর বিয়েতে মাসি যাবে না! তবে তুমি ভেব না কিছু, তোমার অসম্মান করিনি, আমার নতুন লোমের কোটটা গায়ে চাপিয়ে দিয়েছি, আর পাঠিয়েছি দু'ঘোড়ার গাড়িতেই।'

জমিদার আরও গম্ভীর হলেন। জানতে চাইলেন—'তা কোথায় থাকে ছেলেটা?'

'তা তো জানি না' বলল গিন্নী।

এবার জমিদার রেগে ফেটে পড়লেন। বললেন,—'তোমার মত মহামূর্খ বোধ হয় আর দুনিয়াতে নেই। ছেলেটা যে তোমায় ঠকিয়ে গেল তা তুমি বুঝলে না। আবার ওকে বলছ বোকা!'

বলেই ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে পড়লেন জমিদার ছেলেটার খোঁজে। ঘোড়া ধেয়ে চলেছে ছেলেটার পেছনে। ছেলেটার কানে আসছে ঘোড়ার পায়ের শব্দ। বুঝল ছেলেটা জমিদার আসছে তাকে ধরতে। অমনি গাড়িটা পাশের ঘন বনের মধ্যে সেঁধিয়ে দিয়ে ছেলেটা পথের ধারে মাথার টুপিটা মাটিতে উপুড় করে রেখে বসে রইল।

একটু পরেই ছুটে এল জমিদারের ঘোড়া। জমিদার শুধালে : 'ওহে ভাল মানুষের পো, দেখেছ নাকি এ পথে এক ছেলেছে যেতে, সঙ্গে তার ঘোড়ার গাড়িতে শুয়োরের ছানা?'

ছেলে বলল,—'দেখিনি আবার, সে ত অনেকক্ষণ চলে গেছে ঐ দিকে।'

: কোন দিকে বলত? ধরতে হবে শয়তানটাকে।

: 'ধরা কঠিন, এদিকের পথ ঘাট কি তুমি চেন?'

জমিদার দেখল, সত্যিই তো, সামনে ঘন জঙ্গল, বন-বাদাড় তার মধ্য দিয়ে রাস্তা। ছেলেটাকেই বলল জমিদার : 'ওহে ভাল মানুষের পো! তুমি ত চেন পথ ঘাট। আমায় একটু সাহায্য কর না। ধরে এনে দাও না ছেলেটাকে। আমার ঘোড়াটাতেই চড়ে যাও না হয়।'

ছেলেটা বলল,—'না হে তা হয় না। আমার টুপির নিচে বাজপাখি আছে যে।'

: 'আরে আমি-ই না হয় দেখছি ওটাকে।'

: 'না গো না, সে হয় না। দামী পাখি কখন ছেড়ে দিয়ে বসবে। মনিব তা হ'লে আমায় আর আস্ত রাখবে না।'

জমিদার বললে, 'না হয় পাখিটার দাম-ই বল না। উড়ে গেলে দাম দিয়ে দেব।'

ছেলেটা বলল,—'না বাপু বিশ্বাস কি! পাখিটার দাম ৫০০'০০ টাকা। এখন বলছ, পরে দেবে কিনা কে জানে।'

: 'ও বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি' বলল জমিদার—'বেশ এই নাও ৫০০'০০ টাকা, এবার বিশ্বাস হল ত?'

টাকা পেয়ে জমিদারের ঘোড়ায় চেপে, আঁকা বাঁকা জঙ্গল ঘেরা পথে মিলিয়ে গেল ছেলেটা, আর জমিদার পাহারা দিতে লাগল ওর শূন্য টুপিটা। এদিকে কিছুক্ষণ পরে সূর্য প্রায় অস্ত যায়, কিন্তু কৈ ছেলেটার তো আর দেখা নেই। শেষে জমিদার ভাবলে, দেখি তো টুপির নিচে সত্যাই পাখি আছে ত! যদি থাকে তবে ছেলেটা নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। —এই ভেবে জমিদার টুপি তুলে দেখে, সেখানে কিছুই নেই।

এতক্ষণে জমিদারের চমক ভাঙ্গে,—'ওরে শয়তান! তাহলে তুমিই বেকুব বানিয়েছ আমার গিন্নীকে।'—বলে সে রেগেই অস্থির। কিন্তু ছেলে তো ততক্ষণে জঙ্গলের অন্যদিক দিয়ে ঘুরে এসে সেখান থেকে গাড়ি নিয়ে নিজের বাড়ি গিয়ে পেঁৗছেছে। মাকে বলছে,—'মা, দেখে এলাম দুনিয়ায় তোমার চেয়েও অনেক বোকা আছে। এই দেখ ওদের বেকুবিতে পাওয়া গেছে এই তিনটে ঘোড়া, একটা গাড়ি, লোমের কোট আর বাচ্চা সমেত এই একটা শুয়োর আর এই দেখ ৫০০'০০ টাকা।

* রাশিয়ার রূপকথা।

ভালো লাগে

সুধীর কাব্যশ্রী

ভালো লাগে ফুলের মেলা
নদীর জলে ঢেউয়ের খেলা,
ভালো লাগে মেঘের ঘুড়ি
প্রজাপতির লুকোচুরি।
ভালো লাগে বৃষ্টি-ঝরা
বন্ পাখিদের নামতা পড়া,
ভালো লাগে মিষ্টি গলা
মৌমাছিদের কথা বলা।
ভালো লাগে চাঁদের আলো
শিশুর হাসি খুবই ভালো।

যদি পার

অনুপম দত্ত

কখনো কখনো ভাল না লাগলে যদি যেতে পারো
ঘরবাড়ি গ্রাম নয়তো শহর ছেড়ে দূরে আরো—
মাঠময়দান যেখানে স্তব্ধ আকাশ গভীর,
কিংবা কাছাকাছি একটি নদীর বালুময় তীর
গাছে গাছে আঁকা দিগন্তরেখা দূর বৃত্তে যার—
দেখবে তখন মন থেকে গেছে বেদনা পাথার।
কখন হঠাৎ হাসিতে ভরেছে মুখের আদল
রৌদ্রছড়ানো শাওন দিনের খুশির বাদল!

কখনো কখনো ঘুম না আসলে উঠে আস যদি,
সামনে আকাশ তারার চুমকি জ্যোৎস্নার নদী,
চারপাশে তার ছায়া দিয়ে ঘেরা যেন অন্যদেশ।
একলা দাঁড়িয়ে সব ভুলে যেতে লাগে যদি বেশ
তাহলে তখন ঘুমের দুয়ার আপনি খুলবে,
দেখতে দেখতে চোখের পাতারা সহসা ঢুলবে।
ঘুম নিয়ে বোনা গায়ের কাঁথায় আলোর প্রভাত,
হঠাৎ তাকাও রোদ্দুরে চোখ জলপ্রপাত!

চারা

অশোক ভট্টাচার্য

বলি না কিছু বাড়িয়ে—
ছোঁয় না মুঠো আকাশ;
মাটির দিকে তাকিয়ে
জীবনরস মাখাস্
পাতায় ডালে শিকড়ে
তরতরিয়ে ওঠা নামা
কি ক'রে রে কি ক'রে!

জিনিসটা তো একফোঁটা—
ছাগলে দেয় মুড়িয়ে:
দেখিস নি তো জেগে ওঠা
পাতায় পাখি উড়িয়ে।
রোদে জলে সবুজ হওয়া,
হাওয়ায় হাওয়ায় কথা কওয়া,
কি করে রে কি করে

এক রাজপুত্তুরের গল্প

মোহিত রায়

তোমরা নিশ্চয়ই গল্প শুনতে ভালবাস। এক যে ছিল রাজপুত্তুর আর—ঠিক এমনতর গল্প—কি বল? আজ তোমাদের কাছে এক রাজপুত্তুরের গল্প বলব। কিন্তু আমার গল্পের রাজপুত্তুর পরে হয়েছিলেন মহর্ষি। ইনি কে জানো?—ইনি হলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রাজপুত্তুর কেমন করে মহর্ষি হলেন—শোন মন দিয়ে।

কলকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের নাম তোমরা সকলেই শুনেছ। সেকালে ধনে মানে জ্ঞানে গুণে সব বিষয়েই তাঁরা ছিলেন বড়।

এই পরিবারের দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন অতিশয় ধনী। বিলেতে তাঁর জাঁক দেখে ইংরাজেরা অবাক্ হয়ে গিয়ে তাঁকে উপাধি দেয়—প্রিন্স—মানে রাজপুত্র।

দ্বারকানাথের তিন ছেলের বড় ছেলে দেবেন্দ্রনাথ! আজ থেকে ঠিক দেড়শো বছর আগে কলকাতায় তাঁর জন্ম হয়।

দেবেন্দ্রনাথ দেখতে ছিলেন খুব সুন্দর, ঠিক রাজপুত্তুরটি। বড় বড় টানা চোখ, চওড়া কপাল, ফরসা গায়ের রং।

সেকালের কলকাতার ধনী লোকেরা বাড়িতে পাঠশালা বসাতেন। ঠাকুরবাড়িতেও এই রকম একটি পাঠশালা ছিল। এখানেই ছোটবেলায় দেবেন্দ্রনাথ লেখাপড়া সুরু করেন। বাড়িতে তাঁকে বাড়ির মাস্টার মশাইরা পড়াতেন বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজী, ফার্সী এমনি আরও দেশী-বিদেশী বই। তার ওপর ছিল গানবাজনা আর নিয়মিত ব্যায়াম।

ছাত্র হিসেবেও তিনি ছিলেন মেধাবী। বার্ষিক পরীক্ষার কৃতিত্ব দেখিয়ে পেয়েছেন অনেক পুরস্কার।

তিনি যখন তোমাদের মতোই ছোট তখন হঠাৎ একদিন পণ্ডিত শ্যামাচরণকে জিজ্ঞাসা করে বসলেন—ভগবানের কথা কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারেন।

সেদিন থেকে তিনি মন দিয়ে মহাভারত পড়তেন। তোমাদের নিশ্চয়ই মহাভারতের গল্প খুব ভাল লাগে। তাঁর কিন্তু একটি কথা মনে বেশ দাগ কেটেছিল। সেটি হল: তোমাদের ধর্মে মতি হোক।

দিনে দিনে দেবেন্দ্রনাথের ধর্মভাব বাড়তে লাগল। তিনি ভগবানকে জানতে চাইলেন, বুঝতে চাইলেন, পেতে চাইলেন। কিন্তু ধর্মে মতি দেখে তাঁর বাবা পনেরো বছর বয়সেই তাঁর বিবাহ দিয়ে সংসারী করলেন। আর দিলেন একটি চাকরী। তাও যেমন তেমন নয়, ব্যাংকের টাকা-পয়সার বড় বড় হিসেব রাখতে হত তাঁকে।

এমন সময়ে একটি ঘটনা ঘটল।

একদিন তাঁর সামনে দিয়ে উপনিষদের এক ছেঁড়া পাতা উড়ে যাচ্ছিল। তিনি সেটাকে ধরলেন, পড়লেন। কিন্তু মানে কিছুই বুঝলেন না। অথচ, মানে তাঁর বোঝা চাই। জিজ্ঞাসা করলেন অনেককে। শেষে ব্রাহ্মসমাজের রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মশায় তাঁর মানে বুঝিয়ে দিলেন। শোনো সেই উপনিষদের শ্লোকের মানে: ভগবান সব কিছুতেই আছেন, তিনি যা দেবেন, তাই ই খুসি হয়ে নেবে। অপরের ধনে লোভ কর না—সব কিছু ছেড়ে ভগবানকে নিয়ে থাক।

এর পরেই এল তাঁর মনের জগতে বিরাট পরিবর্তন। ভুলে গেলেন বিষয়-আশয়ের কথা। উপনিষদ হল তাঁর দিনরাতের সঙ্গী।

নিরাকার ভগবানের উপাসনা করতেন ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা। সেই ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন দেবেন্দ্রনাথ।

জীবনে যে কোন বড় কাজ বা বড় আদর্শের পথে বিপদ-বাধাও অনেক। সেগুলি পেরিয়ে যাবার ক্ষমতা যাদের আছে তাঁরাই মহৎ। দেবেন্দ্রনাথের জীবনেও এমনি একের পর এক কত বাধাই না এসেছিল।

দ্বারকানাথ দেবেন্দ্রনাথকে সংসারের ভার দিয়ে চলে গেলেন বিলেতে। ব্যবসা-বাণিজ্য আর জমিদারীর ঝুঁকি এসে পড়ল তরুণ যুবক দেবেন্দ্রনাথের ওপর। কিছুদিন পরেই বিলেতে দ্বারকানাথ মারা গেলেন। আর, বিপদও এল পায়ে পায়ে।

তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাই বাবার শ্রাদ্ধও করলেন সেই ধর্মমতে। অমনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা রেগে গিয়ে তাঁকে ত্যাগ করলেন। দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু একটুও দমলেন না। যা তিনি সত্য বলে গ্রহণ করেছেন, কোনো বাধাই তাঁকে সে পথ থেকে সরাতে পারবে না। আরও বিপদ, এমনি সময় তাঁদের ব্যাংকটি উঠে গেল। আর ব্যবসাও ধীরে ধীরে গুটিয়ে এল। দেবেন্দ্রনাথের বয়স তখন সবে ত্রিশ। মাথার ওপরে অনেক ঋণের বোঝা। পাওনাদারেরা আসতে শুরু করল: টাকা চাই। কিন্তু টাকা কোথায় পাবেন দেবেন্দ্রনাথ? আর সে তো এক আধ টাকা নয়, ধারের পরিমাণ সাতাশ লক্ষ টাকা। তবু বিচলিত হলেন না দেবেন্দ্রনাথ। এমন বিপদের দিনেও ভগবানকে ডাকা ছাড়লেন না। এমন সময় বিষয়ী আত্মীয়-স্বজনেরা এসে তাঁকে বোঝালেন: এ ঋণ শোধ না করলেও চলে। ঋণের কথা অস্বীকার করলে বিষয়-সম্পত্তির কোন ক্ষতিই পাওনাদারেরা করতে পারবে না। পাওনাদারেরা আগে কিছুই জানত না, যখন এ কথা শুনল, তখন তারা হায় হায় করে উঠল।

কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ কি করলেন? তিনি স্থির করলেন, যে করেই হক, বাবার ঋণ তিনি শোধ করবেনই। এর জন্যে যে কোনো দুঃখকষ্ট মেনে নিতে তিনি প্রস্তুত হলেন।

একদিন তিনি পাওনাদারদের ডেকে বললেন: আপনাদের সব টাকা আমি শোধ করে দেব। কিন্তু আমার তো টাকা নেই। তাই আমার বিষয়-সম্পত্তি আপনারা গ্রহণ করুন। আমি সব কাগজপত্র ঠিক করে রেখেছি।

যাঁরা টাকা পাবেন তাঁরা তো অবাক্। বিষয় সম্পত্তি তাঁরা নিলেন না, ধীরে ধীরে ঋণশোধের সময় দিলেন।

এরপর সুরু হল তাঁর দুঃখকষ্টের জীবন। রাজার হালে যিনি মানুষ, তাঁকে রাতারাতি সব পালটে ফেলে সাধারণের মত চলতে হল। এ কত কঠিন।

যাঁরা বড়, তাঁরাই তো বড় দুঃখ সইতে পারেন। আর মহৎ মানুষ দুঃখের দিনেও মহৎই থাকেন। দেবেন্দ্রনাথের জীবনই তার প্রমাণ।

বাবার উইলে একটি লাভজনক ব্যবসা দেবেন্দ্রনাথের নামে থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজে সবটুকু না নিয়ে তিন ভাই-এর মধ্যে সেটি সমান ভাগ করে নিলেন। আঙুলের আংটিটিও তালিকায় লেখাতে ভুললেন না।

এমন কি বাবার দেওয়া কথা রাখবার জন্যে লক্ষাধিক টাকার চাঁদা তিনি ধার মনে করেই দিয়ে দিলেন।

তোমরা হয়তো ভাবছ, দেবেন্দ্রনাথ ধর্মের কথা নিয়েই দিন কাটিয়েছেন। না, তা নয়। তাঁর মনটা যেমন বড় ছিল, তাঁর সেই মনটি মানুষের জন্য নানা কাজেও তেমনি মেতে উঠেছে। তিনি সংসারী হয়েও ছিলেন ঋষির মতন,—তাঁর সাধনা ছিল আরও কঠিন।

উপনিষদই ছিল তাঁর কর্ম ও ধর্মজীবনের মূল ভিত্তি। সত্যধর্ম প্রচারের ইচ্ছাকে রূপ দেবার জন্য তিনি তত্ত্ববোধিনী সভা নামে এক সভা গড়লেন। সেকালের অনেক গুণীলোক এই সভায় যোগ দিয়েছিলেন। সেকালের নামকরা পত্রিকা তত্ত্ববোধিনী দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগে প্রকাশ হল।

তাঁরই সাহায্যে কত পাঠশালা আর উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হল নানা জায়গায়। হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় তাদের একটি।

তখনকার দিনে মেয়েরা বাড়িতে আটকে থাকতেন। তাঁদের লেখাপড়ার কোনো সুযোগ ছিল না। করলে হত লোকনিন্দা। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মশাই মেয়েদের স্কুল খুললেন। দেবেন্দ্রনাথ বড় মেয়ে সৌদামিনীকে পাঠিয়ে দিলেন পড়তে সেই স্কুলে। সেদিনের সমাজে এ কম সাহসের কাজ নয়।

কত সৎকাজেই না দেবেন্দ্রনাথ মুক্ত হস্তে দান করেছেন তার হিসেব নেই। একবার যশোরের সীতারাম ঘোষ তাঁর কাছে এসে হাজির। ব্যাপার কি?—না—অর্থাভাবে তিনি বিদ্যুৎচালিত তাঁত বিষয়ে গবেষণা করতে পারছেন না। দেবেন্দ্রনাথ নিজে বিজ্ঞানের অনুরাগী। অমনি তাঁকে সাত হাজার টাকা গবেষণা করবার জন্যে দান করলেন।

ক্রমে দেবেন্দ্রনাথ হলেন ব্রাহ্মসমাজের আচার্য। কিন্তু তাই বলে গোঁড়ামি তাঁর ছিল না। তখনকার হিন্দুসমাজের নেতা নদীয়ার মহারাজা শ্রীশচন্দ্র ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এ ছাড়াও, তাঁর কাছে আসতেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ।

এমনি আরও কত ঘটনা আছে তাঁর সম্পর্কে।

তিনি স্বদেশী ভাষা এবং দেশবাসীকে খুব ভালবাসতেন। তাই এক আত্মীয় তাঁকে ইংরেজীতে

চিঠি লিখেছিল বলে তিনি তখুনি সে চিঠি ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন।

এমন পিতার সুযোগ্য সন্তান হবেন রবীন্দ্রনাথ-এতে আর আশ্চর্য কি? মাথা ন্যাড়া, পৈতে হয়েছে, স্কুলে যাওয়া নেই। তাই রবীন্দ্রনাথকে হিমালয় ভ্রমণের সঙ্গী করে নিলেন দেবেন্দ্রনাথ। সেখানে পাহাড়ে চড়া, আপন খুসিতে চলা। কি মজা বলত? খুব ভোরে উঠে দেবেন্দ্রনাথ দিতেন উপনিষদের পাঠ। রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করতেন আর উপাসনায় সঙ্গী হতেন।

সুকণ্ঠ রবীন্দ্রনাথের গান প্রথম পুরস্কৃত করলেন দেবেন্দ্রনাথ। বললেন: রাজা যখন দেশের ভাষা জানে না, তখন কবিকে মর্যাদা দেবেন তিনিই। ছেলের হাতে সেদিন তিনি পাঁচশো টাকার চেক্ উপহার দিয়েছিলেন। আর সেই থেকেই তিনি নানা কাজে সাহিত্যরচনায় প্রেরণা দিয়েছেন ছেলেকে। তাই তো একদিন রবীন্দ্রনাথ হয়েছেন জগদ্বিখ্যাত কবি।

বৃষ্টি

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বৃষ্টি!
ভাল লাগে আকাশের
মেঘে-ভেজা দৃষ্টি।
বৃষ্টি!
মমতার মোম যেন
গলে গলে পড়ছে
টুপটাপ ঝরছে…
ঝরছে…ঝরছে

ঝরঝর ছন্দে
ভোর থেকে সন্ধ্যে!
জল ছড়া দিয়ে যায়
পথে ঘাটে বনেতে,
ঝিরঝির
মঞ্জীর
বেজে ওঠে মনেতে॥

বন মানুষের খেল

রাম রতন চৌধুরী

একজন বড় জমিদার। মহারাজা উপাধিধারী তাঁর বিশাল জমিদারীতে বাঘে গরুতে এক ঘাটেই জল পান করত। এমনি ছিল তাঁর শাসন। তিনি খুব কম কথা বলতেন। সব সময়ই গরীব ও দুঃখী দিগকে অকাতরে ধন দান করতেন। তাদের দুঃখের কথা শুনতে শুনতে তাঁর চোখ জলে ভরে উঠত। গাঁয়ের সবাইকে তিনি ভালবাসতেন। গাঁয়েই তিনি বাস করতেন।

কখনও কখনও তিনি সহরে যেতেন তবে অধিক দিন কোন সময়েই তিনি সেখানে থাকতেন না। চিরকালই গাঁয়ে বাস করতে তিনি ভালবাসতেন। যদিও তাঁর গাঁয়ের বাড়ি ছিল সহর থেকে তিন চার মাইল দূরে। নিজ গাঁয়ের বাড়িতে বিজলিবাতি ও কলের জলের সুখ সুবিধা করে নিয়েছিলেন। লোকজন ও গাড়ির সুবিধা থাকায় সহরের সব সুখই তিনি নিজ গাঁয়ে বসে পেতেন।

তাঁর নিজ সখের আর তুলনা ছিল না। গাঁয়ের ও আসে পাশের লোকদের দেখবার মত করে, ছোট হলেও বেশ সবরকম জীব জানোয়ার নিয়ে চিড়িয়াখানা করেছিলেন।

সে চিড়িয়াখানায় তিনি রেখেছিলেন বাঘ, ভালুক, হরিণ, বাঁদর, হনুমান, সারস ও নানা রকমের পাখি। টিয়া, কাকাতুয়া, ময়না ছাড়াও নানা রকমের ছোট বড় ও নানা রঙের দেশী বিলাতী পাখি ছিল। অনেক ময়ূরও ছিল। আর ছিল নানা জাতীয় সাপ। আর তাঁর হাতি সে কত কয়টি ছিল কেউই সঠিক বলতে পারে না। হাতির পীলখানা ভরা হাতি ছিল। যেন অগুনতি। তাঁর আরও অনেক সখের ভিতর হাতি খেদা করার একটা খুব সখ ছিল।

এ ভাবে তাঁর হাতিশালে হাতির আর অবধি ছিল না।

সেবার আষাঢ় মাস ও পৌষ মাসের মাঝামাঝি গভীর রাতে খুব ঝড় হয়েছিল। সেই ঝড়ে সহরের সারকাস দলের তাঁবু ছিঁড়ে যায়। বাঘ বনমানুষ ও আরও কয়েকটি জীব, তাদের খাঁচা ভেঙে যায়। ছাড়া পেয়ে সবাই পালাতে সুরু করে। কে কোন দিক দিয়ে রওনা হল তার কোনো হদিস নেই। বাঘ কোথায় হারিয়ে গেল। সে খবর আজো কেউ রাখে না।

এই ঝড়ে দৌড়ুতে দৌড়ুতে একটা বন মানুষ রাজবাড়ির হাতির পীলখানায় এসে হাজির। তার পরের ঘটনা…।

অতি ভোরে দেখা গেল একটি খেলোয়াড় বন মানুষ দুই তিন লাফে একটা বড় হাতির কাঁধে চেপে, হাতিকে তাড়না করছে। মনের অভিলাষ মতো হাতির পিঠে চেপে কোথাও চলে যাবে। হলে কি হবে—হাতির তো পা মোটা লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা।

হাতি বুঝতে পেরে খুব ডাক ছাড়ছে। আর আর হাতিগুলোও ভয় পেয়ে গেছে। তারা সবাই এক সময়েই শিকল ছিঁড়ে পালাবার তাগিদে খুব লোহার শিকলের আওয়াজ তুলছে। সেও যেন

আওয়াজের ঝড়। এ আওয়াজ মহারাজ বাহাদুরের কানে পৌঁছে গেছে। তিনি আর বৈঠকখানায় থাকতে পারলেন না। পীলখানায় এসে হাজির হলেন।

হাতিটা না করল কি শুঁড় দিয়ে বনমানুষটাকে জড়িয়ে ধরে দূরে ছুঁড়ে মারল। বনমানুষটাও খেলোয়াড় তাই দুই তিনটা ডিগ্‌বাজি খেয়ে—সামনেই মহারাজকে দেখে এক সেলাম।

মহারাজা বুঝলেন এ জীব কারো অপকার করবে না।

এ সব রকম সকম দেখে তাঁর মনটা খুসিতে ভরে উঠল। তিনি তাঁর লোক জনকে ডেকে হুকুম দিলেন—তাঁর বাগান বাড়ির পূব দিকের জায়গাতে মোটা বড় লোহার শিক দিয়ে ঘিরে দিতে। একখানি বড় লোহার দরজা কিনে আনতে। এক পাশে একটা ছোট ঘর করে দিতে ও গাছের বড় ডালের সঙ্গে মোটা শেকল দিয়ে খুব মজবুত দোলনা করে দিতে।

ভিড়ের ভেতর থেকে একজন শুধাল যাদের জিনিস তারা খবর পেয়ে যদি নিয়ে যেতে চায়?

মহারাজা বললেন আমি পরিমাণ মতো টাকা দেব। অথবা ছোট একটা কিনে এনে তাদের দেব, তারা শিখিয়ে নেবে—তার সব খরচ আমি দেব।

আমার পশুশালায় একটা জীব বেশি হল। ভালই হল। বিকাল বেলা খবর পেয়ে সারকাসের দলের মালিক এলো। অনেক টাকায় রফা করে বনমানুষটি মহারাজার হাতে তুলে দিল। মহারাজা ভাঁড়ার থেকে অনেক কলা ও আপেল আনিয়ে বনমানুষটার হাতে দিলেন। বনমানুষ খেতে লেগে গেল। শিশুরা এসব দেখে আমোদে আটখানা হয়ে হাসতে লাগল। মহারাজা ও মালিক মিলে, মহারাজার নাতির সাথেও ভাব করিয়ে দিল। সব সময়ই বনমানুষটা নতুন জায়গা পেয়ে ও ছাড়া পেয়ে খুসিতে ঘুরে বেড়াতে লাগল। গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা মহারাজার নাতি রঘুনাথ ও তার সমবয়সীরা খুব আমোদ পেয়ে গেল।

একদিন হল কি এক বড় জোতদার তার মোটর সাইকেল চড়ে কাছারিতে কি জরুরী কাজে এসেছে। মোটর সাইকেলখানা বাইরে রাখা ছিল।

বনমানুষ রঘুনাথকে ধরে পিছনে বসিয়ে নিজে চড়ে মটর সাইকেলের ভট্ ভট্ আওয়াজ তুলে একেবারে উধাও।

জোতদার তো একদম অবাক। তার মুখ দিয়ে আর কথা বেরুল না।...

সবাই অবাক মানল। অবিশ্যি রঘুনাথকে নিয়ে বনমানুষ আবার ফিরে এসেছিল।

শট্কের সন্দেশ

সুধীর চট্টোপাধ্যায়

কৈফিয়ৎ—সে এক ভারি দুষ্টু ছেলে। কিছুতেই পড়াশোনা করতে চায় না, দিনরাত্তির ঘুরে বেড়ায় মাঠ ঘাট আর বন বাদাড়ে। দাদুমনি যেই বলেন, 'মানিক ধন আমার, শট্কে পড়'—অমনি সে সেখান থেকে সট্‌কে পড়ে।

মানিক সন্দেশ খেতে খুব ভালবাসে। দাদু একদিন লোভ দেখিয়ে বললেন, 'যদি শট্‌কে পড়িস তো জলভরা তালশাঁস সন্দেশ খাওয়াব।' সন্দেশের নাম শুনে, মানিকের নোলায় জল জমল, সে খুসি মনে পড়ছে—

একক দশক শতক আর সহস্র অযুত লক্ষ,
মা লক্ষ্মীর বাহন হ'ল কালো পেচক পক্ষী ॥
কাক পাখি, বক পাখি,
শকুন পাখি কাঁদে,
কার্ত্তিক ঠাকুর বসে থাকেন
ময়ুর পাখির কাঁধে।
কার্ত্তিক মাস, অঘ্রান মাস, আর পোষ, মাঘ
সবাই পোষ মানে, কেবল পোষ মানে না বাঘ ॥
বাঘ প্রাণী, ছাগল প্রাণী
আর প্রাণী হাতি,
হাতির সাথে আমি দাদু
করব হাতাহাতি।
হাত অঙ্গ, পা অঙ্গ আর অঙ্গ মুখ,
মুখ দিয়ে খাবার খেতে বড়ই লাগে সুখ ॥
দুধ খাবার, ভাত খাবার
খাবার জিবে গজা,
সন্দেশটা খেতে আমার
বড়ই লাগে মজা।
সবার সেরা সন্দেশ যে তালশাঁস জল ভরা,
দাদুমনি তাকিয়ে দেখ শেষ হয়েছে পড়া ॥
শটকে শুনে দেখছি দাদু
বেজায় খাবি খাও
গড়গড়াটা ভাঙ্গব, যদি,
সন্দেশ না দাও ॥
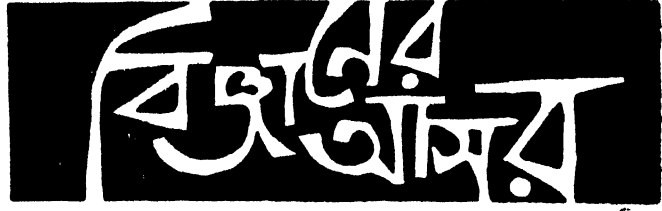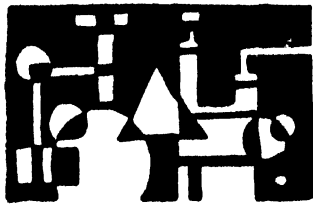
জৈব বিদ্যুৎ ও তার ব্যবহার

সুনীল সরকার

জীবন্ত প্রাণীসমূহের দেহে জীবন প্রবাহের স্বাভাবিক গতি থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয়—সেই বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে বৈজ্ঞানিকদের মনোযোগ আকৃষ্ট করেছে। মানুষ অন্যান্য প্রাণী এবং গাছের জীবন্ত কোষসমূহের জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কি ভাবে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় সেই রহস্য উদ্‌ঘাটনের পথে গবেষকগণ অনেকখানি অগ্রসর হয়েছেন। এখন চেষ্টা চলছে, কি উপায়ে এই বিদ্যুৎকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

পেনসিলভানিয়ার ভ্যালি ফোর্জ নামক স্থানে, জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানির বৈজ্ঞানিকগণ তাঁদের মহাকাশ বিজ্ঞান গবেষনাগারে গত বছর—এই জৈব বিদ্যুতের ব্যবহার হাতে কলমে দেখান। গবেষণাগারের একটি ইঁদুরের উপর এই পরীক্ষা চালানো হয়েছিল। ইঁদুরটির তলপেটের গর্তে একটি তড়িৎদ্বার বা ইলেকট্রোড ঢুকিয়ে দেবার ফলে দেখা গেল—তার শরীর থেকে ১৫৫ মাইক্রোওয়াটস শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হচ্ছে। ইলেকট্রোডস থেকে একটি খুব সরু তারের সাহায্যে এই বিদ্যুৎ প্রবাহ নিয়ে একটি রেডিও ট্রান্সমিটার চালু করা সম্ভবপর হয়েছিল।

আশা করা যাচ্ছে. এই পরীক্ষার ফলে একদিন জৈব বিদ্যুৎ প্রয়োগের এমন যন্ত্র আবিষ্কার হবে যার দ্বারা ক্ষুদ্রাকৃতি ট্রান্সমিটার সহ মানবদেহে সেই যন্ত্র বসানো চলবে এবং তখন ডাক্তাররা এই যন্ত্রের সাহায্যে নিদ্রিত রোগীর দেহের অভ্যন্তরের কাজকর্ম কেমন চলছে—তারও খবর সংগ্রহ করতে পারবেন।

ওয়াশিংটন সহরের ডাঃ ফ্রেডারিক সিসলার একটি টেস্ট্ টিউবে সমুদ্রের জল ভরে তাতে এক ধরনের কিছু জীবাণু ছেড়ে দেন এবং সেগুলিকে শর্করা জাতীয় খাদ্য খেতে দেন। তারপর তার মধ্যে একজোড়া ইলেকট্রোড নামিয়ে দিতে দেখা গেল—সেই টেস্ট্ টিউব থেকে বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি হচ্ছে—যদিও তা খুব ক্ষীণ অথচ স্থির।

ওয়াশিংটনের জেনারেল সায়েন্টিফিক কর্পোরেশনের ডঃ রবার্ট আই সারকচ এর থেকে আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়েছেন। তিনি এই জীবাণুচালিত ব্যাটারি দিয়ে পরীক্ষামূলক ভাবে একটি ছোট বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালাচ্ছেন এবং একটি ছোট রেডিও ট্রান্সমিটার চালাচ্ছেন। এখন বৈজ্ঞানিকরা চেষ্টা করছেন যাতে এই ধরনের আরো শক্তিশালী ব্যাটারি তৈরি করা যায়—যার দ্বারা নৌ চলাচল পথে

বয়াগুলিতে আলো জ্বলবার মতো বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যেতে পারে অথবা বৈদ্যুতিক আলো এবং বাড়ির শীততাপ নিয়ন্ত্রণ বা বিভিন্ন শিল্পের যন্ত্রপাতি চালানোর জন্য বিদ্যুৎপ্রবাহ পাওয়া যেতে পারে। এই ধরনের ব্যাটারিগুলি কত বড় হবে—কতদিন চলবে তার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। এই পরীক্ষামূলক ব্যাটারিগুলিতে দেখা গেছে দুই ভোল্টের বিদ্যুৎপ্রবাহ দু' মাস ধরে চালু রাখতে হলে ব্যাকটেরিয়াগুলির জন্য মাত্র এক গ্রাম পরিমাণ শর্করা জাতীয় পদার্থের দরকার হয়। কারণ ব্যাকটেরিয়াগুলি প্রায় সব রকম জৈব পদার্থ খেতে পারে।

জৈব বিদ্যুৎকে মানবকল্যাণে নিয়োজিত করার জন্য বৈজ্ঞানিকদের চেষ্টার কোনো ত্রুটি নেই। তাই তো সারা বিশ্বে চলছে ব্যাপক গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা। সম্প্রতি সোভিয়েত বিজ্ঞানী ইন্‌জিনিয়ার ও চিকিৎসাবিদ্‌রা এমন একটি সক্রিয় নকল অথচ জৈব বিদ্যুৎ চালিত হাতের উদ্‌ভাবন করেছেন, যার সাহায্যে হাত খোয়ানো মানুষ নিজ-নিজ বৃত্তিতে ফিরে যেতে সমর্থ হবেন।

এই সক্রিয় নকল হাত এক ধরনের নরম প্লাসটিকে তৈরি এবং যদি সেটিকে কানের কাছাকাছি আনা যায় তাহলে শুনতে পাওয়া যাবে খুদে একটি বৈদ্যুতিক মোটরের সুস্পষ্ট গুঞ্জন। এই মোটর আঙুলগুলিকে চালনা করে। একটি সিগারেট প্যাকেটের আকারের স্টোরেজ ব্যাটারি মোটরটিকে চালনা করে।

কনুইয়ের গোড়ার কাছের স্নায়ুগুলি থেকে উৎসারিত জৈব বিদ্যুৎ প্রবাহের দ্বারা কৃত্রিম হাতটি নিয়ন্ত্রিত করা হয়। এই কনুয়ের গোড়ার অংশের চারদিকে সাধারণ একটি তামার আংটি পরিয়ে দিয়ে সেই জৈব বিদ্যুৎ প্রবাহকে ধরা হয়। খানিকটা অংশ কেটে বাদ দেবার ফলে হাতখানার অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও—এবং সেই জন্যেই সাধারণ রকমের কোনো নড়ন চড়ন সম্ভব না হলেও—হাত দিয়ে কাজ করার ইচ্ছেটা তবুও মস্তিষ্ক থেকে কনুইয়ের গোড়াতে প্রেরিত হয় জৈব বিদ্যুৎ প্রবাহরূপে। এর শক্তি ও ফ্রিকোয়েনসি সুনির্দিষ্ট। একটি শক্তি-বিবর্ধক যন্ত্র কিংবা অ্যামপ্লিফায়ার একাধিক বিদ্যুৎ পরিবাহী কনডাকটরের সাহায্যে নির্দেশগুলি বৈদ্যুতিক মোটরে প্রেরিত হয়। এভাবেই শক্তি বিবর্ধক যন্ত্রটি কাজ করে। ফলে সক্রিয় নকল হাতটি যে কোন কাজে পারদর্শী হয়ে ওঠে।

জৈব বিদ্যুৎ চালিত কৃত্রিম হাত তৈরি করে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা যেমন তাঁদের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তেমনি দেশের হাজার হাজার হাত খোয়ানো মানুষের মর্মান্তিক জীবনের অবসান ঘটিয়েছেন। সত্যি কিনা বলো?

টেক্সাসের স্যান অ্যান্টিনিউস্থিত ইলেট্রন মোলিকিউল রিসার্চ কোম্পানিও জৈব বিদ্যুৎচালিত অভিনব একটি ব্যাটারি তৈরি করেছেন। এই জৈব বিদ্যুতের উৎস হল জীবাণু। জীবাণু থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি মোটর ও ট্র্যানজিস্টার রেডিও চালানো ও ছোট্ট একটি বাল্‌ব জ্বালানো যায়। এই ব্যাটারির নাম দেওয়া হয়েছে 'বায়োলজিক্যাল ফুয়েল সেল।'

উল্লিখিত রিসার্চ কোম্পানি ঐ ইঞ্জিন দিয়েই বহনযোগ্য এবং আরো শক্তিশালী একটি ব্যাটারি তৈরির পরিকল্পনা করেছেন। এ ছাড়া বিভিন্ন এলাকায়, ঘরবাড়িতে, বিমানবন্দরে, রেলওয়ে সিগ্‌ন্যালে,

বৈদ্যুতিক তারের বেড়ায়, জলপথে যাতায়াত এবং মহাকাশ যাত্রায় এই ইন্ধন থেকে প্রাপ্ত বৈদ্যুতিক শক্তিকে যাতে কাজে লাগানো যায়—তার জন্যে বিভিন্ন কাজের উপযোগী বহু রকমের ব্যাটারির নক্সা তৈরি করা হয়েছে।

বারোটি প্লাসটিক নির্মিত আধার দিয়ে এই ব্যাটারিটি তৈরি। এদের প্রত্যেকটির আকৃতি হল ছোট্ট ওষুধের শিশির মত। প্রত্যেকটি শিশি তুষের গুঁড়া আর এক পুঁটুলি জীবাণু দিয়ে ভর্তি। এই সব জীবাণু অনেকটা ছত্রাক জীবাণুর মত। জীবাণুগুলোকে জল দিয়ে তুষের সঙ্গে মেশানো হয়। জীবাণুগুলি তুষ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ তুষ বিভিন্ন উপাদানে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায় এবং তার ফলে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হয়। ঐ শক্তি এক টুকরো তামার পাত কিংবা এ্যালুমিনিয়াম পাতের মাধ্যমে গৃহীত হয়। এদের রেডিও বাল্ব বা মোটরের সঙ্গে সংযোগ করে দিলেই ঐ সব বস্তুতে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রবাহিত হয়।

এই ব্যবস্থাটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। বাইরের কোন কিছুর সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজন এতে নেই। তবে প্রত্যেকটি ব্যাটারির মধ্যে যাতে বাতাস যেতে পারে তার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

একবার জীবাণু ও তুষ দিয়ে সেলগুলিকে ভর্তি করে দিলে আর বিশেষ কিছু করবার থাকে না। কেবল মাঝে মাঝে এদের জল আর তুষ দিলেই চলে। তারপর এই সকল জীবাণু তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে চলে এবং বিদ্যুৎশক্তি সৃষ্ট হতে থাকে। সেগুলো খেয়ে বিনাখরচে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত এই ব্যাটারি থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি পাওয়া যায়।

শ্রাবণ।

তমাল কুমার চট্টোপাধ্যায়।

করুণানিধান
ওগো ভগবান
তোমাকে সদাই
প্রণতি জানাই।
তোমার আশীষে
নেমে যেন আসে
বাধা বন্ধ হারা
শ্রাবণের ধারা

অশ্রান্ত নির্ভিক
ধুয়ে মুছে দিক
পৃথিবীর গ্লানি
আছে যতখানি।
পরশে তোমার
করুণা অপার
তায় যেন ঝরে
সব হৃদি ভরে।

ভারতীয় বাইসন

সলিল মিত্র

বাইসনের নাম তোমরা নিশ্চয় শুনেছ? উত্তর আমেরিকার জঙ্গলের বুনো মোষকেই বলে 'বাইসন'। এদের দেখলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সামনা-সামনি হলে বাঁচবার পথ পাওয়া দায়। বাঁকা-বাঁকা দুটো শিং দিয়ে এক মুহূর্তে সমস্ত দেহটাকে ওরা ক্ষত বিক্ষত করে দিতে পারে। যেমন উগ্রমূর্তি ওদের, তেমনি ওরা হিংস্র। মাথার কাছে আছে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া লোম, আর চোখ—বড় বড় ভাঁটার মত—সব সময়ই লাল হয়ে আছে। দেখলে সত্যি ভয়ে বুক শুকিয়ে যায়।

আমাদের দেশে ওই বাইসনের মতই এক জাতের জন্তু আছে তারা কিন্তু ওদের মতো হিংস্র নয়। স্বভাবটি বেশ ভালই, একা একা থাকে না, থাকে দল বেঁধে। হঠাৎ কাউকে আক্রমণ করার মত স্বভাব এদের নয়, তবে কেউ যদি এদের আক্রমণ করে তখন ওরা ভয়ানক উগ্র হয়ে ওঠে, প্রতিআক্রমণ করে।—এদের বাংলা নাম 'গৌর', গেরি গাইও বলে। অনেকে আবার এদের বলে 'ভারতীয় বাইসন'।

এই গৌর নামের জন্তুদের কোথায় পাওয়া যায় জানো? কেপকমোরিন থেকে হিমালয়ের উত্তর পূর্ব প্রদেশের নেপালের, আবার ওখান থেকে ব্রহ্ম দেশ পর্যন্ত অনেক পার্বত্য অঞ্চলগুলোয় এই জন্তুদের পাওয়া যায়।

এদের চেহারা ঠিক মোষের মতোই। গায়ের রঙ কালো, গো-বংশীয়দের মধ্যে এরাই নাকি বড়। উচ্চতায় এরা প্রত্যেকেই তিনহাত থেকে চারহাত। শুধু শিং দুটোই আবার দু'হাত করে লম্বা।

এই গৌরদের পায়ের নিচের দিকটা শাদা রঙের। গরুর যেমন গলায় চামড়া ঝুলে পড়ে—এদের কিন্তু তেমন গলার চামড়া ঝুলে পড়ে না।

পার্বত্য অঞ্চলে যে তৃণ আর লতাগুল্ম হয় তাই খেয়ে এরা বেঁচে থাকে।

বাইসনদের মত এদের চোখ অমন লাল নয়। কিন্তু চেহারায় বাইসনদের সঙ্গে অনেকখানি মিল আছে বলেই এদের নাম হয়েছে 'ভারতীয় বাইসন'।

খুকু

ঝুমুর চৌধুরী

খুকু যেই ঘুম ভেঙ্গে ওঠে
বনে বনে ফুল সেই ফোটে:
পাখি সেই গান ধরে কুঞ্জে
ফুলে ফুলে মৌমাছি গুঞ্জে॥
খুকু চায় আকাশের দিকে:
সেথা কি যে কে দিয়েছে লিখে:

খুকু হাসে তাই দিনও হাসে,
বাতাসে মেঘেরা তাই ভাসে॥
কার সাথে খুকু বলে কথা
পৃথিবীর ভাঙ্গে নীরবতা।
কুলুকুলু সুর তোলে ঝর্ণা
প্রজাপতি রামধনুবর্ণা॥

বাদল দিনে

নোটুবিহারী চট্টোপাধ্যায়

সারাদিন, সারারাত, ঝরছেই বৃষ্টি,
মেঘভরা আকাশের ঘুম-ঘুম দৃষ্টি
খানা ডোবা, পথ ঘাট,
ডুবে গেল সারা মাঠ,
পথ চলা বিভ্রাট,—গেল বুঝি সৃষ্টি।
টিপ্ টিপ্, টিপ্ টিপ্ ঝরছেই বৃষ্টি।
শীত শীত হাওয়াটা কী চোঁখা তীর ছুঁড়ছে !
লোমকূপ দিয়ে যেন হাড়ে গিয়ে ফুঁড়ছে !
আম, জাম, বটগাছে
পাখিরা কুলায়ে আছে ;
কিছু দূরে আকাশেতে চিল এক উড়ছে,
ঝড়ো কাক পাকশালে ঠুক্‌রে কী চুঁড়ছে
রবিবার ছুটি আজ, তাই ওই বৃষ্টি
লাগছে তো অপরূপ, ভারি মধু মিষ্টি।
আজ সারা দিনটাই
আলসে কাটাতে চাই
মন তবু কী যে চায় দেব নাকি লিষ্টি ?
বলবো এ বাদলায় কি লাগিবে মিষ্টি ?
খিচুড়ির সাথে দিও ক্যাঁকড়ার বুকটা
ভাজা ইলিশের পেটি বদ্‌লাবে মুখটা।
তারও আগে তেলে ভাজা
বেগুনি পেঁয়াজি তাজা
প্লেটভরা অমলেট পেলে হবে সুখটা
আজ এই বাদলে কি বদলাবে মুখটা।

নূপুর ভট্টাচার্য

গ্রাহক সংখ্যা ১৮৫১—বয়স ৮ বছর

নূপুর পায়ে ঝমঝমিয়ে নেমেছে আজ বৃষ্টি,
তাহার জলের ধারায় ধরায় ফসল হবে সৃষ্টি।
দুষ্টু মেয়ে, মিষ্টি মেয়ে, বৃষ্টি আমার ভালো,
বৃষ্টি ধারায় স্নান করে ভাই ঘুচবে সকল কালো।
ঘন মেঘের আড়ালে ওই বিদ্যুতেরই নাচন,
হঠাৎ আলোর চমকানিতে মনে জাগে মাতন।
আকাশ পানে অন্যমনে তাকিয়ে থাকা ছাড়া,
এমন দিনে লক্ষ্মী হয়ে যায় কি গো ভাই পড়া!

দিল্লী ভ্রমণ

অনসূয়া বসু, গ্রাহক নং ১১৯৭—বয়স ১০ বছর

১৯৬৭ সালের পূজার ছুটিতে আমাদের দিল্লী বেড়াতে যাবার কথা হল। আমার বাবা ঐ সময় চাকরী নিয়ে দিল্লীতে চলে এসেছিলেন, ১৯৬৮র গোড়ায় আমাদেরও যাবার কথা ছিল। আমি প্রত্যেক বছর পূজার সময় কলকাতাতেই থাকি, এবারও তার ব্যতিক্রম করতে ইচ্ছা হল না। তোমরা বোধহয় ভাবছ—এ আবার কি রকম মেয়ে রে বাবা, নতুন জায়গা দেখবে তার জন্য আনন্দ হচ্ছেনা! আনন্দ হচ্ছিল ঠিকই, তবু কলকাতার পূজার জন্য মন খারাপও লাগছিল। কিন্তু যেতেই হল, ঐ সময় আমার একজন মাসিও যাচ্ছিলেন। তাই মা আরো উৎসাহী হয়ে উঠলেন। ৩রা অক্টোবর মহালয়ার দিন আমরা ভেস্টিবিউল এক্সপ্রেসে চড়ে চললাম। আমার মাসি আর তাঁর দুই ছেলেমেয়েও সঙ্গে রইলেন।

পথে আমি আমার মাসতুতো ভাইবোনদের সঙ্গে খুব মজা করতে করতে এলাম। তবে এটা বলতেই হবে যে ১৯৬৭ সালের লাল নীল আর সবুজ মলাটের পূজাসংখ্যা সন্দেশটিও আমার আনন্দ দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। আসানসোলের পর থেকেই বাঙলা দেশ শেষ হয়ে বিহার শুরু হল এবং এইভাবে আমরা উত্তর-প্রদেশের মধ্যে দিয়েও এলাম।

সূর্যোদয়ের সময় আকাশটা এত সুন্দর দেখাচ্ছিল এবং লাল আলো পড়ে মাঠ ঘাট সবই এমন অদ্ভুত দেখাচ্ছিল যে আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম। দিল্লীর আগের স্টেশন থেকে দিল্লী পর্যন্ত ট্রেন যখন আস্তে আস্তে থেমে থেমে চলছিল তখন ভীষণ অধৈর্য লাগছিল। অবশেষে আমরা রাজধানীতে পৌঁছলাম। আমাদের নিতে বাবা আর মাসিকে নিতে আরেকজন মাসি এসেছিলেন স্টেশনে। আমি, বাবা আর মা মালপত্র নিয়ে হোটেলে পৌঁছলাম। সেদিন আর কোথাও যাওয়া হল না। পরের দিন বাইরে থেকে 'পার্লামেণ্ট ভবন', 'রাষ্ট্রপতি ভবন' আর 'সেন্‌ট্রাল সেক্রেটারিয়েট' দেখলাম।

৮ই রবিবার বাবার ছুটি ছিল। সেদিন মাসিদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে আমরা কুতব মিনার, লালকেল্লা, যন্তর মন্তর, হুমায়ুনের সমাধি ইত্যাদি দেখলাম। লালকেল্লার ভিতরের দেওয়ান-ই খাস, দেওয়ান-ই আম, শীষ-মহল প্রভৃতি দেখে আমার খুব ভালো লাগল। তবে সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল বলে কুতব মিনারে ঢোকা বা চড়া হল না।

যন্তর মন্তরে বিভিন্ন আকৃতির কয়েকটা বাড়ি দেখলাম। এই বাড়িগুলোর গায়ে দাগ কাটা আছে, সেই দাগের উপর সূর্যের ছায়া পড়তে দেখে আমাদের গাইড ঠিক সময়টা বলে দিল।

পরদিন আমরা বিরলা মন্দির ও জুম্মা মসজিদে গেলাম। এই জুম্মা মসজিদটি দেখলে বোঝা যায় একসময় তা কি রকম সুন্দর ছিল। কিন্তু বস্তির নোংরায় ও অযত্নে এটি এখন অত্যন্ত শ্রীহীন। অষ্টমীর দিন আমরা ওখানকার কালীবাড়িতে গেলাম, এই কালীবাড়িতে খুব ঘটা করে দুর্গা পূজা হয়।

ওখান থেকে ফেরবার সময় তিন মূর্তি মার্গ ও ইন্দিরা গান্ধীর বাসভবন দেখলাম। পরের দিন আমরা দিল্লীর চিড়িয়াখানা, ইণ্টার ন্যাশনাল ডলস মিউজিয়াম আর রাজঘাটে গেলাম। গান্ধীজীকে এই রাজঘাটে দাহ করা হয়েছিল। এখানে একটি কালো মার্বেলের চৌকো ফলক আছে। নানারকম ফুলও আছে। পরিবেশটা আমাদের বেশ গাম্ভীর্যপূর্ণ আর সুন্দর লেগেছিল। সেবার সময়ের অভাবে আমাদের আগ্রা যাওয়া হয়নি। আমরা মাত্র এগারো দিন দিল্লীতে ছিলাম। ১৫ই অক্টোবর আমরা ঐ ভেস্টিবিউল এক্সপ্রেসেই কলকাতায় ফিরে এলাম। ঐ বছর পুজোয় আমার মাত্র তিনটি ঠাকুর দেখা হয়েছিল! এই ভ্রমণ আমার বেশ ভালো লেগেছিল।

চলতি ট্রামে

(সত্য ঘটনা)

মিহির কুমার গুহ, বয়স ১২, গ্রাহক নং ২২৪৮

একদিন স্কুলের ছুটির পর আমি আর আমার এক বন্ধু হেয়ার স্কুলের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম ট্রামের আশায়। ছেলেটি খুব কথা বলতে পারে। আমরা দাঁড়িয়ে গল্প করতে লাগলাম।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর একটা বেলগাছিয়ার ট্রাম এল। কিন্তু ট্রামে ভীষণ ভিড়, একটু পা রাখবারও জায়গা নেই। তবু উপায় নেই, উঠতেই হবে। আমরা কোনো রকমে ঠেলাঠেলি করে উঠে পড়লাম।

আমার বন্ধুটি আগে ছিল। তাড়াহুড়ো ক'রে এগোতে গিয়ে, সে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের পা মাড়িয়ে ফেলল। কিন্তু তখন কি আর এক জায়গার দাঁড়িয়ে থাকবার উপায় আছে! সে ঠেলাঠেলি ক'রে আরও এগিয়ে চলল, আর আমিও তার পেছন পেছন চললাম। এদিকে সেই ভদ্রলোক অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে বললেন,—'হিন্দুর ছেলে হ'য়ে একটা নমস্কার করতেও শেখনি।'

আমার বন্ধুটি সপ্রতিভভাবে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল,—'না দাদু, আমরা হেয়ারের ছেলে।'*

সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে হাসির রোল উঠল। সেই ভদ্রলোকও হেসে ফেললেন।

চাঁদ

সোমেশ্বর ভৌমিক, বয়স—১২ বৎসর, গ্রা: নং ৯৩৪

সৌরজগতে আমাদের সবচেয়ে নিকট প্রতিবেশী চাঁদ। এই চাঁদ বহুদিন থেকে পৃথিবীর মানুষকে আকর্ষণ করেছে। বর্তমান শতকে মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে তার সম্পর্কে জানবার জন্য বহু চেষ্টা করেছে। কিছুদিন আগে লুনা—৯-এর ঐতিহাসিক সাফল্যে পৃথিবীর অধিবাসীরা তার সম্বন্ধে এমন অনেক তথ্য জানতে পেরেছে যা আগে সম্পূর্ণ অজানা ছিল এবং চাঁদে সেইসব জিনিসের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনোরকম আভাসও পাওয়া যায় নি। এই অজানা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করার আগে চাঁদের গঠন সম্বন্ধে জানা দরকার।

চাঁদের ব্যাস ৩৪৭৬ কি: মি: অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের $\frac{১}{৪}$ অংশ। চাঁদের নিজের অক্ষকে কেন্দ্র করে একবার আবর্তন করতে লাগে ২৭$\frac{১}{৩}$ দিন। আবার চাঁদের পৃথিবী প্রদক্ষিণেও ঠিক ঐ ২৭$\frac{১}{৩}$ দিন লাগে। তাই আমরা চাঁদের একটা দিকই কেবল পৃথিবী থেকে দেখি।

চাঁদ জলশূন্য। অনেক সময় শোনা যায় যে, চাঁদে সাগর ও মহাসাগর আছে, কিন্তু তথাকথিত এইসব সাগর বা মহাসাগর জলহীন। অবনমিত সমতল ভূমিকে পাহাড় অথবা উচ্চস্থানের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কালো দেখায় বলেই তাদের সাগর বলা হয়।

আমরা পৃথিবী থেকে চাঁদের যে দিক দেখি তার সম্বন্ধে বহু কথাই আমাদের জানা বটে, কিন্তু অদৃশ্য দিক সম্বন্ধে আমরা বহুকাল অজ্ঞাত ছিলাম। লুনা ৩ এবং জণ্ড ৩ চাঁদের ঐ অদৃশ্য দিকের ছবি তুলে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিল। বিজ্ঞানীরা সেইসব দেখে চাঁদের অদৃশ্য দিক সম্বন্ধে জানতে পারেন এবং ঐ দিকের একটি মানচিত্র অঙ্কন করতেও সক্ষম হন। পরে দুই দিকের প্রাকৃতিক চরিত্র পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, দৃশ্য গোলার্ধে ৪০ ভাগ সাগর, কিন্তু অদৃশ্য গোলার্ধে সাগর মাত্র ১০ ভাগ, আর দৃশ্য গোলার্ধের উত্তর ভাগে যে ক্ষেত্রে সাগরের প্রাধান্য সে ক্ষেত্রে অদৃশ্য গোলার্ধের উত্তর ভাগে এমন

* সবাই মজাটা বুঝলে কি? হেয়ার স্কুল আর হিন্দু স্কুল সামনাসামনি দুটি নামকরা পুরনো স্কুল। সঃ সঃ।

বিরাট এক মহাদেশের প্রাধান্য যা দক্ষিণ দিকের মহাদেশের চেয়ে বড়। অদৃশ্য গোলার্ধে দৃশ্য গোলার্ধের চেয়ে গহ্বর বেশি। এছাড়া অদৃশ্য গোলার্ধে অসংখ্য ছোট ছোট গহ্বর মালার মত ছড়িয়ে আছে। এই বৈশিষ্ট্য দৃশ্য গোলার্ধে দেখা যায় না।

চাঁদের সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গের উচ্চতা ৯ কি: মিটার এই উচ্চতা এভারেস্টের প্রায় সমান, আর চাঁদের গহ্বরগুলির ব্যাস ২০০ কি: মি: থেকে আরম্ভ করে ১ মি:-এর থেকেও কম হয়।

চাঁদের জমির উপরের স্তর ছিদ্রবহুল স্পঞ্জের মত, আবহমণ্ডল না থাকায় উল্কাসমূহ এসে চন্দ্রপৃষ্ঠে আঘাত করে। চন্দ্রপৃষ্ঠে অতি বেগনী এবং মহাজাগতিক রশ্মির অবারিত দ্বার। এছাড়া চন্দ্রে আগ্নেয় গিরি থেকে অগ্ন্যুদগার ঘটে। এইসব মিলিয়ে চাঁদের উপরের জমি এত ছিদ্রবহুল।

চন্দ্রপৃষ্ঠ কি পদার্থ দিয়ে গঠিত সে সম্পর্কে অধ্যাপক ভি ট্রইটসি বলেন যে—বেতার পর্যবেক্ষণ থেকে অনুমিত হয় যে, চন্দ্রে সাগর এবং মহাদেশগুলি একই ধরনের রাসায়নিক বা অনুরূপ পদার্থে তৈরি তাঁর মতে চন্দ্রপৃষ্ঠের সর্বোচ্চ স্তরটি ধুলা বা এক ধরনের সছিদ্র পদার্থ। তিনি আরও বলেছেন যে, চন্দ্র পৃষ্ঠের পদার্থ মোটামুটি আগ্নেয়গিরির ভস্ম, ব্যাসাল্ট ও এই জাতীয় শিলা।

চাঁদে ৬০—৬৫% ভাগ হল সিলিকন অক্সাইড, ২০% পটাসিয়াম, সোডিয়াম, লৌহও ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড। এছাড়া, চন্দ্রপৃষ্ঠের রেডিও অ্যাকটিভ বা তেজস্ক্রিয় পদার্থের ঘনত্ব পৃথিবী পৃষ্ঠের তেজস্ক্রিয় ঘনত্বের চেয়ে ৫/৬ গুণ বেশি, চাঁদে আগ্নেয়গিরির সক্রিয়তা পৃথিবীর তুলনায় বেশি।

বিগত কয়েক বছর ধরে রাশিয়ার গোর্কি ইনস্টিটিউটের জ্যোতির্বিদরা চাঁদ থেকে আসা বেতার-তরঙ্গগুলি ২০টি বিভিন্ন তরঙ্গমালায় পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন : এদের দৈর্ঘ্য ০-১ থেকে ৭০ সেন্টিমিটার এরকম ৩০,০০০ তরঙ্গমালা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন, যাঁরা চাঁদের মাটিতে আগে পা দেবেন তাঁদের পক্ষে এই সমস্যার সমাধান আগে করা সম্ভব। রাশিয়া ও আমেরিকা —এই দুই দেশই সমস্যাটির সমাধানের পথ খুঁজছেন এবং দুজনেই চাঁদের মাটিতে আগে পা দেবার প্রবল প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। আমেরিকার সঙ্কল্প তাঁরা ১৯৭০ এর আগে চাঁদে মানুষ নামাবেন। দেখা যাক কি হয় ?

বৃষ্টি এলো

কেয়া বসু

গ্রাহক নং ১৪৬০—বয়স ১২ বছর ১১ মাস

ইলশে গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ে, বাইরে ছুটে আয়না।
ইলিশমাছের ডিমের তরে করছে খুকী বায়না।
ঝির্ ঝির্ ঝির্ বৃষ্টি ঝরে বকুলগাছের ফাঁকে,
লাল বাড়িটার পায়রাগুলো ফিরছে ঝাঁকে ঝাঁকে।
ঝর্ ঝর্ ঝর্ নামল বাদল তপ্ত দিনের পরে,

কুঁড়েঘরের ছেলেগুলো রইল না কেউ ঘরে।
ঝম্ ঝম্ ঝম্ মল বাজিয়ে বৃষ্টি নেচেই চলে,
কালো কালো মেঘ শিশুরা চলছে দলে দলে।
রিম্ ঝিম্ ঝিম্ সুরটি শুনে মনটা নেচে ওঠে,
বৃষ্টিপরীর মিষ্টি ছোঁওয়ায় কদম কেয়া ফোটে।
বৃষ্টি যখন থামল তখন রাস্তা জলের তলে,
কাগজ গড়া জাহাজ ভাসাই পথের নদীর জলে।

পিণ্টুর মহাকাশ ভ্রমণ

তাপসী নিয়োগী, বয়স ১৩, গ্রাহক নং—১৫০৯

আনন্দবাজার পত্রিকার ৫নং পৃষ্ঠায় ছোট একটা খবর পড়ে অবধি পিণ্টুর মনটা কেমন করছে। ঈস্ একবার যদি সে ওদের দেখতে পারত। একটা অজানা জগৎ থেকে উড়ন্ত পিরীচ করে যারা নেমে এসেছিল—যারা চাষীটাকে একটা অদ্ভুত ধাতুর টুক্‌রো দিল, তারা কেমন জীব, কেমন তাদের আচার ব্যবহার—এসব জানতে খুব ইচ্ছে করছে পিণ্টুর। এসব ভাবতে গিয়ে কিছুই আজ পড়া হয়নি বরং অন্যমনস্কতার জন্য দু'দুবার বকা খেয়েছে। আর মুড়ির বদলে বাজার থেকে ঘুড়ি ও কিনে ফেলেছে এইসব ভাবতে গিয়ে।

রাতে ভাত খাবার পর বিছানায় শুয়েও এই কথাই ভাবছিল পিণ্টু। ভাবতে ভাবতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছে। বাবার নাক ডাকার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। পুসিটা গোল হয়ে পাপোষের উপর শুয়ে আছে। পিণ্টু পাশ ফিরে শোয়। জানালা দিয়ে বাইরের নীল আকাশের দিকে তাকায়। একটা কাল্‌চে নীল মখমলের উপর তারাগুলি হীরের টুকরোর মত চক্‌চক্ করছে। হঠাৎ একটা স্থির আলো দেখতে পায় পিণ্টু। ওকি ওটা আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে কেন? হ্যাঁ সত্যিই তো, ওটা দেখি আবার এদিকে আসছে। আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে আলোটা, ক্রমশঃ বড় হতে হতে নেমে আসে অনেক নিচে পিণ্টুদের বাগানের মধ্যে, পিণ্টু ছুটে জানালার ধারে যায়। বাইরে তাকায় অবাক হয়ে। সত্যিই কি ওটা…? চোখ রগড়ে আবার তাকায় পিণ্টু। হ্যাঁ ওটা একটা উড়ন্ত পিরীচ। একটা হলুদ আলো ওটার জানালা দিয়ে বেরিয়ে আসছে। চ্যাপটা—অনেকটা লুচির মত দেখাচ্ছে পিরীচটাকে। ওটার গা থেকে একটা বেগুনী আভা বেরোচ্ছে। পিণ্টু অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কোন নড়াচড়াই নেই। কেউ বেরোচ্ছে না ওটা থেকে ওদিকে ক্রমশঃ ভোর হয়ে আসে। পিণ্টু এবার সাহস করে দরজা খুলে বাগানে নেমে আসে। পায়ে পায়ে পিরীচটার দিকে এগিয়ে যায়। বেশ বড় এটা, পিণ্টুদের সমস্ত পপি, ডালিয়া আর গন্ধরাজ গাছ চাপা পড়েছে এটার তলায়। পিণ্টু একবার ঘুরে আসে ওটার চারিদিকে। হঠাৎ দেখে পিরীচটার একটা জায়গা একটু চিড় খেয়ে গেল। আর তারপরেই ফাঁক হতে লাগল। পালাবার মতলব আঁটে পিণ্টু, কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে

একজন আবিষ্কর্তা মনে করে দাঁড়িয়ে যায়। তাকিয়ে দেখতে থাকে ফাঁক হয়ে থাকা পিরামিডটার দিকে, একটা আংটা বেরিয়ে আসে চেইন শুদ্ধ। আংটাটা মাটির সঙ্গে আটকে গেল। একটা, অনেকটা মানুষের মত দেখতে ছোট আকৃতির জীব ক্ষিপ্রগতিতে চেইন বেয়ে নেমে এল। আশ্চর্য ওদের ঠোঁট, মুখ, নাক, কান সবই আছে কিন্তু চোখ নেই। জীবটা এগিয়ে এল পিন্টুর দিকে। কি জানি একটা অদ্ভুত ভাষায় প্রশ্ন করল পিন্টুকে। কিছু বুঝল না পিন্টু। লোকটা হঠাৎ চেইন বেয়ে ওপরে উঠে ভেতরে চলে গেল। যাঃ! ওরা চলে যাবে নাকি? পিন্টু হতাশ হয়, আবার লোকটা বের হয়ে এল হাতে একটা ছোট বাক্সের মতন, অনেক তার জড়ানো। লোকটি নেমে এসে একটা তার ওর মাথার সঙ্গে জড়াল অন্য একটা তার পিন্টুর কানে হেডফোনের সঙ্গে লাগিয়ে দিল। একটা সুইচ টিপে দিয়ে লোকটা ঠোঁট কাঁপাতে থাকল। হেডফোনটায় টিক টিক আওয়াজ হয়ে হঠাৎ বাংলা কথা বেরোতে থাকল। পিন্টু মনোযোগ দিয়ে শুনল। কিছুক্ষণ বাদে লোকটা ঠোঁট নাড়ানো থামাল আর সঙ্গে সঙ্গে হেডফোনের কথাও বন্ধ হল। পিন্টু এবার বুঝতে পারল যে লোকটা তাকে জিজ্ঞেস করছে, 'তুমি কি পৃথিবীর লোক? এটা কি পৃথিবী? তুমি কি আমাদের সঙ্গে আমাদের গ্রহে যাবে? অবিশ্যি ভয় নেই তোমায় আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাব।' এবার লোকটা পিন্টুর মাথায় তারটা জড়িয়ে নিজে হেডফোন কানে দিল। পিন্টু এবার ব্যাপারটা বুঝতে পারল ও সঙ্গে সঙ্গে লোকটির প্রশ্নের উত্তর দিল—'হ্যাঁ এটা পৃথিবী আর আমি পৃথিবীর ছেলে। আমি যেতে পারি তবে মা বাবার কাছে জিজ্ঞেস করে আসি।' লোকটি এই পর্যন্ত শুনে মাথা নাড়ল। পিন্টু ছুটে গেল বাড়ির ভিতর। মা তখন ঠাকুর পুজো করছিলেন। কথাটা বলতেই উনি, 'ওমা, তুই যাবি কি। না যেতে দেব না—' বলেই চেঁচাতে লাগলেন আর বাবা শুনেই লাফ মেরে উঠলেন, 'না কিছুতেই নয়। যেতে পারবি নে।' কিন্তু পিন্টু কারো কথা শুনল না। ভিন্ন গ্রহে যাবার নেশায় সে পাগল। বেরিয়ে গিয়ে সোজা চেইন বেয়ে ঢুকে পড়ল উড়ন্ত পিরামিডটার ভিতর। জানালা দিয়ে দেখল মা কাঁদছেন, বাবা বাগানের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন আর তিন বছরের ছোট বোনটা কিছু বুঝতে না পেরে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদছে। পিন্টুর কিছু খারাপ লাগল। পিরামিডের দরজা বন্ধ হয়ে শূন্যে উঠে পড়ল। আস্তে আস্তে ছোট হয়ে হয়ে মিলিয়ে গেল পিন্টুদের বাড়ি—সারা কলকাতা শহরটাই, ক্রমশঃ পৃথিবীর পুরোটা দেখা যেতে লাগল। তারপর পৃথিবীটা এক সময় দু' মেরু চাপা প্রকাণ্ড একটা বল-এ পরিণত হল।

এদিকে চাঁদের পাশে এসে পড়ল তারা। দূরবীণটা চোখে লাগিয়ে চাঁদের দিকে তাকাল পিন্টু। এ বাবাঃ, এ যে কেবল বালি আর পাথর। এর থেকে এত রূপালি আলো বেরোয় কেন? পিন্টু অবাক হল। আস্তে আস্তে চাঁদও ছোট হয়ে গেল। উঃ কত জোরে ছুটছে এটা? মেশিনের মিটারটির দিকে তাকাল। সংখ্যাগুলি বোধগম্য হল না। একটা লাল তারা দেখা যাচ্ছে; বেশ বড়। দূরবীণটা ওদিকে ঘোরাল পিন্টু। ওকি, খাল, নদী, পাহাড় সবই দেখা যাচ্ছে, ব্যাপার কি, পৃথিবী নাকি? কিন্তু নাঃ। কোথাও কোনো প্রাণের স্পন্দন দেখতে পেল না পিন্টু। তবে বোধ হয় এটা মঙ্গল—ভাবে সে।

অবাক দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে। ঠিক করে যে, বাড়ি ফিরে সব বন্ধুদের অবাক করে দেবে। সমস্ত দেশের বৈজ্ঞানিকরা ডাকবে তাকে। ওঃ—। ক্রমশঃ বৃহস্পতি, শনি, ইত্যাদি গ্রহগুলি পার হয়ে গেল। বৃহস্পতি পার হবার সময় ভীষণ গণ্ডগোল হচ্ছিল। ক্রমশঃ পিরীচটা বৃহস্পতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সে যাত্রায় কোনো রকমে বেঁচে গেল। এখন নেপচুনের পাশ দিয়ে যাচ্ছে ওরা। পিন্টু ছিল দূরবীণ চোখে লাগিয়ে। হঠাৎ চমকে ওঠে ও। ওটা কি? একটা আলোর পিণ্ড, পেছনে বিরাট আলোর লেজ। ভীষণ জোরে তাদের দিকে ছুটে আসছে। ধূমকেতু নিশ্চয়ই। কিন্তু যেভাবে আসছে তাতে তো ধাক্কা লাগবেই। পিন্টু অজানা লোকটির দিকে তাকায়। লোকটার চোখ না থাকায়, ব্যাপারটা ওকে বিচলিত করছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু লোকটা খুব তাড়াতাড়ি কাজ করছে। পিন্টু আবার বাইরে তাকায়। নাঃ ভীষণ জোরে আসছে ঠিক ধাক্কা লাগবে। আর কয়েকটা মুহূর্ত। ক্রমশঃ বড় হচ্ছে ধূমকেতুটা। পিন্টু চোখ বুজল। কয়েকটা মুহূর্ত। এক প্রচণ্ড ধাক্কায় পিরীচটা ভেঙ্গে গেল।

মহাশূন্যে ভাসতে থাকল পিন্টু। একটা ধূসর রংএর অজানা গ্রহ দেখা গেল। পিন্টুর শরীর হঠাৎ সে দিকেই এগোতে লাগল। গ্রহটা ক্রমশঃ বড় হয়ে কাছে এগোতে থাকে। আবার ধাক্কা খাবার ভয়ে পিন্টু অস্থির হয়ে উঠল। কিন্তু না, গ্রহটার আবহাওয়া বোধহয় খুব ভারি। কারণ, পিন্টু যত জোরে পড়বে ভেবেছিলো তত জোরে পড়ল না। বালি ভরতি গ্রহটার মধ্যে সে ধপাস্ করে পড়ে গেল। এমন সময় হঠাৎ কিরকম একটা অদ্ভুত লোমওয়ালা জন্তু বেরিয়ে এসে পিন্টুর মুখে শরীর ঘষতে লাগল। পিন্টুর ভীষণ হাঁচি পেয়ে যায়। হাঁ চ-চো ও-ও প্রচণ্ড এক হাঁচি দিয়ে পিন্টু তাকায়! একি! তার ছোট বোন দাঁড়িয়ে একটা পালক নিয়ে তার নাকে ঢোকাচ্ছে। পিন্টুকে তাকাতে দেখে মা বললেন, '—যা অনেক বেলা হয়েছে। উঠে, মুখ ধুয়ে, খেয়ে, পড়তে বস।' পিন্টু মুখ ধুতে চলে গেল। খেয়ে দেয়ে পড়তে বসে সে ভাবল —'ঈস্ এটা যদি স্বপ্ন না হয়ে সত্যি হত।'

কামনা

শম্পা দত্ত, বয়স ১৪২—গ্রাহক সংখ্যা ২৯৫

চাইনা গো হতে মৌসুমী ফুল
রঙে রঙে ভরা দল,
রঙের খেলায় নয়নাভিরাম,
বাহারী সে—উজ্জ্বল।
বিচিত্র তার রঙের নেশায়
মুগ্ধ যে হয় চোখ,
তবুও—সুরভি থেকে বঞ্চিত
তার অন্তরলোক।
নাহি হতে চাই গরবী গোলাপ
সকল ফুলের রাণী।
রঙে, রূপে সে তো অপরূপা ওগো,
সৌরভে শ্রেয়া জানি।

উজ্জ্বল তার পেলব পাপড়ি
মধুর গন্ধে মাখা,
সেই দর্পেতে রেখেছে নিজেকে
ধারালো কাঁটায় ঢাকা।
আমি শুধু হতে চাই বেল ফুল—
ছোট্ট দেহটি তার।
শুভ্র, কোমল পাপড়িগুলিতে
নেই তো রং-বাহার।
ঢেকে সে নিজেকে রাখেনি কাঁটায়
উদ্ধত গৌরবে,
হাসিমুখে শুধু চারিদিক ভরে
দেয় মধুসৌরভে।

যেমন কথা তেমনি কাজ

শিখর রায়

গ্রাহক সংখ্যা—২৭০৬ বয়স—১৩½ বছর

পাত্রগণ—মা—তপনের মা, তপন—তাঁর খুব বোকা ছেলে

সময়—দুপুর। স্থান—একটা বাড়ির ভিতর।

[মা শুয়ে শুয়ে বই পড়ছেন, তপন কাছেই খেলা করছে। এমন সময় মা বললেন,—]

মা।—এই তপু, কি করছিস্! যাতো চট্ করে একবার চিঠির বাক্সটা দেখে আয়।

তপন।—আমি এখন খেলছি! যেতে পারব না।

মা।—যা না বাবা, একবার চট্ করে দেখে আয় না! আমি শুয়ে পড়েছি, আবার উঠব!

তপন।—[বিরক্তি ভরে] আচ্ছা, যাচ্ছি।

[ছুটে বেরিয়ে গেল, খানিক পরে আবার ঢুকল]

মা।—দেখেছিস্?

তপন।—হ্যাঁ।

মা।—কোনো চিঠি-টিঠি আসে নি?

তপন।—তা তো দেখিনি। তুমি বললে চিঠির বাক্সটা দেখে আসতে। আমি তাইতো দেখে এলাম। বাক্সটা ভালই আছে।

মা।—নাঃ তোকে নিয়ে আর পারা গেলনা। যা, এবার দেখে আয় কোনো চিঠিপত্র এসেছে কি না।

[তিনি আবার বই-এ মুখ গোঁজেন। তপন আবার বেরিয়ে যায় এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসে।]

মা।—কিরে, চিঠি এসেছে?

তপন।—হ্যাঁ, একটা খাম, দুটো পোস্টকার্ড।

মা।—কই দে?

তপম।—দেবো কোত্থেকে! আমি কি এনেছি নাকি! তুমি দেখে আসতে বললে, আমি দেখে এলাম যে,·········

মা।—থাক, থাক, আর বলতে হবে না। হাঁদা কি আর সাধে বলে তোকে। দেখে আসতে বললাম বলে শুধু দেখেই এলি! অন্য ছেলে হলে,···নাঃ, [বইটা পাশে দুম্ করে ফেলে দিয়ে, উঠে বসে, চীৎকার করে,—] লেটার বাক্সটা খুলে চিঠিগুলো এবার নিয়ে আয়।

[তপনের প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ]

তপন।—এই নাও তুমি যা বলেছিলে ঠিক করেছি কিনা? খালি খালি বকবে কেবল!

মা।—[চোখ কপালে তুলে] ওঃ—মাঃ—চিঠির বাক্সটাই খুলে নিয়ে এলি ! তোকে বললাম না……

তপন।—ঠিকই তো বললে,—চিঠির বাক্স খুলে চিঠি আনতে, তাইতো,—বাক্সটাই খুলে আন্‌লাম।

হীরা

কাঞ্চন সেনগুপ্ত বয়স ১৬ বছর—গ্রাহক সংখ্যা ২৩৪৫

প্রাচীনকালে রাজারাজড়াদের যাঁরা সৌখিন ছিলেন—তাঁরা তাঁদের ব্যবহারের জিনিসপত্রগুলিকে নানারকম মূল্যবান ধাতু এবং পাথর দিয়ে আরো উজ্জ্বল করে তুলতেন। তাঁদের টুপীগুলি হত দামী রেশমী কাপড়ে মোড়া—আর তাতে থাকত সোনার সুতোর নানারকম নকশার কাজ—তার মধ্যে থাকত বহুবিধ মূল্যবান পাথর। হীরা, পান্না, চুণি, পোখরাজ, মণি প্রভৃতি রত্ন বসাত রাজ্যের সেরা জহুরীরা। আর পাথরগুলি আনত পৃথিবীর সেরা সেরা খনি থেকে। তাঁদের পোষাক হীরা আর সোনায় ঝলমল করত। গলার হারটি ষোলআনা হীরের না হলে চলত না। আর নাগরাটা হওয়া চাই সামুদ্রিক রত্নে মোড়া, কোমরে একটি রূপাবাঁধান খাপে থাকত তলোয়ার--তার হাতলে শোভা পেত উজ্জ্বল হীরা। আজ এই হীরা সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্যে কলম ধরেছি।

হীরা খনিজ পদার্থ হিসাবে পাওয়া যায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রেজিল, রাশিয়ার ইউরাল পর্বতমালায়, আমেরিকায় ও ভারতবর্ষের গোলকুণ্ডায় পান্না ও হীরার খনি আছে। তবে পৃথিবীর শতকরা ৯৬% হীরা দক্ষিণ আফ্রিকার খনি খুঁড়েই পাওয়া যায়। খনিজ হীরা সাধারণতঃ অষ্টতল বিশিষ্ট বা বর্গাকৃতি কেলাসরূপে পাওয়া যায়। হীরা অনেক রঙের হয়ে থাকে—অনেক হীরায় ঈষৎ হরিদ্রাভ বর্ণের আভাস পাওয়া যায়, সময় সময় নীলাভ রঙেরও হয়ে থাকে, আবার লাল, ঘাসের মত সবুজ ও গোলাপী রঙের হীরেও মাঝে মাঝে দেখা যায়। কৃষ্ণবর্ণ হীরা মাঝে মাঝে খনিতে পাওয়া পাওয়া যায়, এতে নানারকম অশুদ্ধ পদার্থ থাকে। একে বলে কার্বনেডো বা বর্ট। রত্ন হিসাবে কোন দাম এর না থাকলেও এটা আমাদের বহু কাজে লাগে। পাথর কাটবার যন্ত্র হিসাবে এবং পালিশের কাজে দরকার হয়ে থাকে। সাধারণ হীরাকে মসৃণ করার কাজেও এটার প্রয়োজন।

হীরা বহু মূল্যবান রত্ন। এর আকৃতি, প্রকৃতি, স্বচ্ছতা এবং ওজন ভেদে এর মূল্য নির্ধারণ হয়। হীরা যত বর্ণহীন হবে তত এটা দামী হবে। হীরা কাটার ওপর এর উজ্জ্বলতা নির্ভর করে। তাই হল্যাণ্ডে হীরা কাটবার ব্যবসা প্রচলিত হয়েছে। পৃথিবীবিখ্যাত ভারতীয় হীরা 'কোহিনুর' এখন দ্বিখণ্ডাকারে ব্রিটিশ মুকুটে, এটি ছিল ১৮৬ ক্যারেট ওজনবিশিষ্ট। পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ হীরা কুলিনান ৩০৩২ ক্যারেট। এই হীরকখণ্ডটি ১৯০৫ সালে প্রিতোরিয়ায় পাওয়া গিয়েছিল। 'দি হোপ' এবং 'পিট' নামে দুটি হীরার ওজন ৪৪·৫ ক্যারেট এবং ১৩৬·২ ক্যারেট। এই হীরাগুলো পৃথিবী বিখ্যাত।

দক্ষিণ আফ্রিকার হীরাগুলি সাধারণতঃ পাথরের সঙ্গে মিশে থাকে কাজেই খনি থেকে বড় বড় পাথর মিশ্রিত হীরা তুলে যন্ত্রের সাহায্যে ছোট করা হয়—তারপর জলের সঙ্গে মিশিয়ে চর্বিমাখানো টেবিলের উপর দিয়ে চালনা করলে ছোট ছোট ভারী হীরার টুকরাগুলি জলের নীচে থিতিয়ে পড়ে এবং চর্বিতে আটকে যায় এইভাবে পাথরমিশ্রিত অবস্থা থেকে হীরাকে বার করে নেওয়া হয়।

এই হীরাকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরী করা যায়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বিজ্ঞানী মঁয়সা সর্বপ্রথম কৃত্রিম হীরা তৈরী করেন। তিনি সুগার চারকোল লোহার সঙ্গে নিয়ে একটি পাত্রে বৈদ্যুতিক চুল্লীতে ৩০০০°C উষ্ণতায় উত্তপ্ত করেন—ফলে লোহা গলে যায় এবং বিশুদ্ধ সুগার চারকোলকে দ্রবীভূত করে। এই দ্রবীভূত মিশ্রণকে হঠাৎ ৩২৭°C তাপমাত্রা বিশিষ্ট তরল সীসার সংস্পর্শে আনেন। প্রচণ্ড তাপমাত্রায় গলে যাওয়া লোহা হঠাৎ শীতল সীসার স্পর্শে আসে—গলিত লোহার উপরিস্থিত অংশ শীতল হয়ে জমে কঠিন হয়ে যায়। (জল যখন বরফে রূপান্তরিত হয় তখন বরফের আয়তন বৃদ্ধি হয়।) তেমনি তরল লোহা কঠিনে রূপান্তরিত হতে গেলে আয়তনে বাড়তে চায়—কিন্তু পাত্রের উপরিস্থিত লোহা তখন কঠিনে পরিণত হয়েছে তাই ভিতরের তরল লোহা কিছুতেই আয়তনে বাড়তে পারে না—ফলে ভিতরে এক প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি হয়। এই চাপে দ্রবীভূত সুগার চারকোল ছোট ছোট হীরক কণায় পরিণত হয়। ফুটন্ত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে কঠিন লোহা দ্রবীভূত হয়—তখন কৃত্রিম হীরা সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক হীরার থেকে এই হীরার দাম অনেক বেশি পড়ে—সেইজন্য এই হীরার প্রচলন এখনও হয় নি। তবে আমেরিকায় বিদ্যুতের দাম কম—তাই সেখানে গবেষণা হয়েছে।

হীরক রত্ন হিসাবে যেমন রাজকীয়—তেমনি এর অনেক রাজকীয় ধর্ম আছে। হীরা সব পদার্থের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠিন—এর আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific gravity) ৩·৫২। প্রতিসরাঙ্ক ও খুব বেশী ২·৪২।

আসল হীরার মধ্য দিয়ে রঞ্জনরশ্মি যেতে পারে। হীরা কোনো রাসায়নিক তরলে দ্রবীভূত হয় না। তবে বায়ুতে 800C তাপমাত্রায় পোড়ালে হীরা কার্বন ডায়অকসাইডে পরিণত হয়।

(প্রবন্ধটি লিখবার জন্যে শ্রীপতি দের 'রসায়নের গোড়ার কথা' এবং—'Children's Encyclopedia' থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে।)

ক্রীড়াজগৎ

অজয় হোম

ফুটবল

কলকাতায় ফুটবলের আসর এখন জমজমাট। বর্ষা আর ফুটবলে একটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে। একটা শুরু হলেই আর-একটার অতি অবশ্য চাহিদা হয়।

সব দলেরই শক্তিসামর্থ্যের একটা আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে বটে কিন্তু দলগত সংহতির বড়ই অভাব ব্যক্তিগত নৈপুণ্য থাকলেও। বড় দলগুলির চেয়ে আমার মনে মাঝারি দলরাই কিন্তু খেলছে ভালো। তাদের খেলার মধ্যে একটা আন্তরিকতার সুর দেখতে পাই যা বড় দলে বড়ই অভাব।

এই মাঝারি দলগুলিকে মুশকিলে পড়তে হয় প্রতি বছর। যেসব খেলোয়াড়রা একটু নাম করেন তাঁদের বড় দল টোপ ফেলে নিয়ে যান। কাউকে কাজে লাগান কাউকে লাগান না। এতে মাঝারি দলগুলি যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তেমনি হন খেলোয়াড়রা। বড় ক্লাবের মোহে যাঁরা যান অনেকে আবার ফিরেও আসেন, কিন্তু এক বছরে তাঁদের খেলার অনেক ক্ষতি হয়ে যায়।

প্রতি বছর লোকসানে পড়তে হয় সবচেয়ে বেশি এরিয়ানস্‌কে! এ বছরেও পড়েছেন। মনে হয় দলত্যাগী গোলরক্ষক কানাই সরকার ও ইনসাইড বিমান লাহিড়ী ফিরে আসায় একটু সুরাহা হয়েছে। এরিয়ানসের খেলায় একটা দলগত সংহতির পরিচয় পাওয়া যায় সে কারণে বড় দলের বিরুদ্ধে চিরকালই তাঁরা ভালো খেলে এসেছেন। এমন কি অপ্রত্যাশিত জয়লাভও করেছেন।

আশা করছি বাটা এ বছর গতবারের চেয়ে ভালো খেলবে। বাটার সুবিধে আছে চাকরির সুযোগ দিয়ে খেলোয়াড় যোগাড় করার। এ বছর ইস্টবেঙ্গলের সঞ্জীব বসু, প্রণব সরকার, দুলাল মণ্ডল ও সন্তোষ চ্যাটার্জি, মোহনবাগানের বিমল চক্রবর্তী, বি এন আর-এর পরিমল দাস প্রভৃতিকে দলে এনেছেন। কিন্তু দলগত সংহতি গড়ে তুলতে না পারলে খেলোয়াড় এনেও কোনো ফল হবে না।

রাজস্থানও কয়েকটি বেশ উঠতি খেলোয়াড় জোগাড় করেছে। বালীপ্রতিভা গতবছরের মতো এবারও ভালো খেলতে পারবে কিনা সন্দেহ হচ্ছে। কালীঘাট তরুণ ও অল্পনামী খেলোয়াড় দিয়েই দল গঠন করে। এবার রণজিৎ দে, স্বরাজ দত্ত, বাবু মিত্র, এ সিংহ, এন গাঙ্গুলী ও জি গুহঠাকুরতাকে পেয়েও খুব সুবিধে করতে পারছে না, বর্তমানে ৭টি খেলায় ৫টিতে হেরেছে। হাওড়া ইউনিয়ন, উয়াড়ি, খিদিরপুর, জর্জ টেলিগ্রাফ ও স্পোর্টিং ইউনিয়ন নিচের দিকের দল। এবারও দু'চারজন খেলোয়াড় হারিয়েছে, নতুনও এসেছে।

জুনিয়র ডিভিসন লীগ শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। দ্বিতীয় ডিভিসনে পোর্ট কমিশনার চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছে। পুলিস দ্বিতীয়। এরাই এবার প্রথম ডিভিসনে উঠবে। তৃতীয় ডিভিসনে ঐক্য সম্মিলনী ও ভ্রাতৃসঙ্ঘের মধ্যে জোর লড়াই চলছে কে প্রথম স্থান অধিকার করবে তাই নিয়ে। চতুর্থ ডিভিসনে প্রতিযোগিতা আরও তীব্র। চারটি দল, যথাক্রমে মির্জাপুর ইউনাইটেড, কাস্টমস, চৈতালী ও চন্দ্র মেমোরিয়ালের মধ্যে কে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে তৃতীয় ডিভিসনে উঠবে তা আজ লিখতে বসে বলা অসম্ভব।

হারাটাকে খেলোয়াড়ি মনোভাবে নিতে না পারাটা খুবই দুর্ভাগ্যের। সমর্থকদের অশালীন উচ্ছাস বেদনাদায়ক। ইস্টবেঙ্গল-মহমেডান স্পোর্টিং খেলায় যা ঘটল তা আর কোনো খেলায় না ঘটলে আমরা খুশি হব।

ক্রিকেট

গত মাসে অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যাণ্ডের প্রথম টেস্টের আধখানা খবর দিয়ে থামতে হয়েছিল। তোমরা খবরের কাগজে দেখেছ ১৫৯ রানে অস্ট্রেলিয়া জেতে। এর পরে দ্বিতীয় টেস্টও লর্ডস মাঠে অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে। প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়া যেমন ক্রিকেটের সব বিভাগেই প্রাধান্যের পরিচয় দিতে পেরেছিল, দ্বিতীয় টেস্টে ইংল্যাণ্ড তেমন দেয় পাল্টা জবাব। স্রেফ বৃষ্টির জন্যেই অস্ট্রেলিয়া হারতে হারতে বেঁচে যায়। পাঁচদিনে প্রায় ১১ ঘণ্টার মতো খেলা বন্ধ ছিল। এই পরিবেশে এমন বৃষ্টির মধ্যে অস্ট্রেলিয়া খেলায় অভ্যস্থ নয়। তবু ফলো অন করেও যে দৃঢ়তার পরিচয় তারা দিয়েছে তা খুবই প্রশংসনীয়। এখন তৃতীয় টেস্টের প্রস্তুতি চলছে। অস্ট্রেলিয়া ইংল্যাণ্ডের মাঠে এ বছর প্রথম হারল এক ইনিংস ও ৬৯ রানে ইংল্যাণ্ডের কাউন্টি চ্যাম্পিয়ন ইয়র্কশায়ারের কাছে। এই জয়লাভে ইংল্যাণ্ডের মনোবল যে বাড়বে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

শোনা যাচ্ছে আগামী শীতে অস্ট্রেলিয়া দলের ভারত সফরের খুবই সম্ভাবনা আছে। চেষ্টা চলছে ৫টি টেস্টযুক্ত পূর্ণাঙ্গ সফরের।

টেনিস

৭২তম উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতা শেষ হল। পুরুষদের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ন হন অস্ট্রেলিয়ার পেশাদার খেলোয়াড় রড লেভার, আর মহিলাদের হন আমেরিকার বিলি জিন কিং। এবারকার

প্রতিযোগিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল পেশাদার খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণ। কারণ, এর আগে কোনও পেশাদার খেলোয়াড়কে খেলার সুযোগ দেওয়া হয় নি।

প্রতিযোগিতার ৮১ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম। এবারকার এই ঐতিহাসিক খেলায় ভারতও অংশগ্রহণ করে কিন্তু কোনও জুটি প্রথম রাউণ্ড পার হতে পারে না। পেশাদারদের পাওয়ার টেনিসের কাছে দাঁড়াবার ক্ষমতা ভারতের কোনো খেলোয়াড়ের বর্তমানে নেই। নিষ্ঠা, ঠিকমত অনুশীলন, মানসিক প্রস্তুতি, শরীরের প্রতি লক্ষ্য সবই আজ আমরা হারিয়েছি। সে কারণে এই প্রতিযোগিতায় ভারতের অংশগ্রহণ না করাই উচিত ছিল।

উইম্বলডন প্রতিযোগিতায় একমাত্র ভারতীয় খেলোয়াড় কৃষ্ণানই সেমি-ফাইনাল খেলার গৌরব লাভ করেন ১৯৬০ ও ১৯৬১ সালে। ১৯৬০ সালে হেরেছিলেন সে বছরের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার নীল ফ্রেজারের কাছে। ১৯৬১ সালে সেই বছরের চ্যাম্পিয়ন অস্টেলিয়ার রড লেভার কৃষ্ণানকে হারান। কৃষ্ণানের খেলায় সে জৌলুস আর নেই, বয়সও হয়েছে। অবসর গ্রহণ করা উচিৎ। কিন্তু খেলবে কে?

"এক ঝাঁক কবুতর"

ঝুমুর চৌধুরী

এক ঝাঁক কবুতর ঐ দেখ' উড়ছে
পাক খেয়ে পাক খেয়ে শূন্যেতে ঘুরছে।
সাদা, কালো, চকোলেট, কোনটা বা বাদামী
ঝুঁটি বাঁধা দামী কেউ কোনটা বা না-দামী।
পাখা দুটি চঞ্চল, নাড়ে এক ছন্দে,
ফিরে আসে ঘরটিতে যেই নামে সন্ধে॥

আলোয় অন্ধকারে

জীবন সর্দার

এখন কটা বাজে বল তো !

জানি তুমি তোমার ঘড়ি দেখে সময় বলবে। আমি তাহলে আবার জিগগেস করব—সূর্য এখন আকাশে কোথায় বলতো !

এখন দিন না হতেও পারে। যদি রাত হয় আমাদের এই আকাশে সূর্য দেখা যাবে না। সূর্য এখন, আকাশের কোন কোণে, একটু ভেবে বলতে হবে ! সূর্য কোথায়—একটুও না ভেবে বলা যেত বারঘণ্টা আগে। বারঘণ্টার হেরফেরে আলো অন্ধকারের এক বিরাট পালাবদল। ঠিক কথা বলতে চাইলে, চব্বিশ ঘণ্টার—মানে পৃথিবীটার নিজেই নিজের অক্ষে একপাক ঘুরে নিতে যে সময় লাগে তাতে কত কিছুই যে হেরফের হয়ে যাচ্ছে, শুধু কি আলো অন্ধকার ! বাতাসের গরম ঠাণ্ডাভাব, চাপ। বাতাসে জলের ভাগ তাও। আরও কত কি যে।

দিনরাত্রি, আলো আর অন্ধকার এই ছন্দে আসে যায়। সূর্য ওঠা থেকেই দিনের শুরু। কিন্তু পূবের আকাশ ফর্সা হবার আগেই ভোরের পাখির ডাকাডাকি শুনেছ নিশ্চয়। সূর্য ওঠার আগে দিগন্তে আলোর আভা দেখে ওরা কলরব শুরু করে, না ওদের কোন বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারে অন্ধকার দূর হল, এবার আলো। একটির পর একটি পাখি জেগে উঠবে, ডাকবে—আলো যতই ফুটবে। যদি বুঝতে পার, তবে বলতে পারবে কোন পাখির পর কোন পাখি ডেকে যাচ্ছে।

রোদ উঠছে। কদিন আগে সূর্যমুখী ফুলের বীজ ছড়িয়েছিলাম বাগানে। আজ দেখি দুটি পাতা মাটি থেকে মাথা তুলেছে। মাটির তলায় গিয়েছে তার শেকড়। আলো থেকে দূরে যাওয়া শেকড়ের নিয়ম। পাতা আলো থেকে রোদ থেকে গাছের খাবার বানিয়ে নিল। শেকড় মাটির তলার অন্ধকার থেকে রস পাঠাল ডালে পাতায়। একজনের কাজ আলোতে, একজনের অন্ধকারে। যে চারাগাছগুলো বেশী সময় রোদ পেল সেগুলো বেড়ে গেল তর তর করে। ফুল হল তাতে বড় বড়। ফুটবার আগে পাপড়িগুলো ফুলের বুকে নুয়ে থাকে। তারপর বেলা বেড়ে ওঠার সাথে সাথে টান টান হতে লাগল। কোনদিন দেখেছি দুচারটে পাপড়ি টান হয়ে মেলে যায়নি, নুয়ে ছিল কিছুক্ষণ। বেলা বাড়ল, হাওয়া গরম হয়ে গেল। টান হয়ে মেলে গেল সব পাপড়িগুলো। পোরটুলিকা ফুলগুলিও বেলা একটু বাড়লে পর ফুটছে। সকালের হাওয়া তাদের কাজে কম আসে।

আলো প্রখর হবার আগেই, হাওয়া তেতে ওঠার আগেই ফড়িং প্রজাপতি আর ফুলফলের পোকাগুলি গুটি ছেড়ে ডানা মেলে দিল। সকালের আলোয় আর বিকালের আলোয় এই সব পোকাদের দেখা মেলে এখানে ওখানে সেখানে। দুপুরের রোদে ওড়াফেরা বন্ধ। অনেক পাখিরও ঐ নিয়ম। ভোরে ডাকাডাকি সকালে খাবার খোঁজা, দুপুরে দেখা নেই তাদের। কিন্তু আকাশে ভাসা চিলশকুনের

ওড়া থামে না দুপুরে। দুপুরে আলো জলজলে, ছায়া ছোট।

নিঝঝুম দুপুর। চোখ ধাঁধাঁন আলো। হাওয়া সকালের চেয়ে গরম। সকালের চেয়ে শুকনো। গাছপালা পশুপাখির কাজ কিছু কম। চলাচল কম। আলোর সাথে 'প্রাণের' সোজাসুজি সম্পর্ক। হয় সে আলোর দিকে ফিরবে, নয় সে আলো থেকে সরবে। নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে তারা এটা বুঝেছে। বাঁচবার জন্যে খাবার খুঁজতে গিয়ে তারা আলো অন্ধকারের সাহায্য পেয়েছে নিয়েছে। বেলা যখন পড়ে যায়, ঝোপঝাড় গর্ত থেকে তখন বেরিয়ে আসে দুপুরে লুকিয়ে থাকা পোকামাকড় পশুপাখি।

দিন ফুরিয়ে গেল। আকাশে জলজলে আলো আর নেই। ভিন্ন জাতের কিছু ফুল বুজে ছিল সারাদিন। একে একে ফুটছে সে সব। বেল যুঁই এর গন্ধ পাচ্ছি। সন্ধ্যামালতীকে ফুটতে দেখলাম। অন্ধকার যত ঘন হবে, বাইরের কোলাহল কলরব থেমে আসবে। তারপর এক সময় সব চুপ। চুপ সবাই নয়, সব কিছু নয়।

ঘরে ঘরে বাতি জ্বলে উঠলেই, মাঠে ঘাটের অন্ধকার থেকে পোকাগুলি ছুটে আসবে। নিঃশব্দে বাদুড় ডানা মেলবে। গর্ত ছাড়বে পেঁচা। জোনাকি জ্বলবে ঝিকমিক। হাওয়ায় গরম নেই দিনের মত। চোখে ভাল দেখছি না। কান খাড়া রাখলে প্রহরে প্রহরে ডাক শুনতে পাবে রাতের পাখিদের পশুদের।

মনে হচ্ছে পৃথিবীটা এক নাট্যশালা। আলো অন্ধকারের ভেতর গাছপালা পশুপাখিরা কি এক নাটকের অভিনয় করে চলেছে। আমাদের তা দেখে বুঝতে হবে। আমাদের দেখতে হবে গাছের শেকড় মাটির তলার অন্ধকারে কেমন থাকে, কি করে। ফুল ফোটা, পাতানড়া পাতাঝরা পশুপাখির ঘুমিয়ে পড়া ঘুম ভাঙ্গার সাক্ষী থাকতে হবে আমাদের। এমনও হতে পারে, আলো অন্ধকারের হের-ফেরের জন্য যাযাবর পশুপাখিদের সাথে আমাদের উধাও হতে হবে দূর দেশে। এই অভিনয় শুধু প্রকৃতি পড়ুয়াদের নিয়েই দেখতে চাই, কেননা, তারাই শুধু বুঝতে পারে আলো অন্ধকারের ছন্দ জীবনে কী দোলা দেয়।

পাখির পরিচয়ঃ
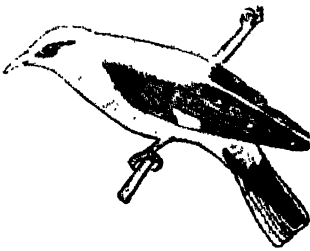
কাজল গৌরী, তার সারা গা আর মাথা হলদে। ডানা প্রায় সবটা আর লেজের মাঝটা কাল। ঠোঁটের কাছ থেকে চোখের পেছনে খানিকটা 'কাজল কাল'। আর একটি নাম হলদে পাখি।

ঘন পাতাওয়ালা গাছে গরম কালে আম বাগানে, বড় রাস্তার ধারের উঁচু গাছের ডালে দেখা পেতে পার। মাটিতে পাবেই না। একদমে কিছুটা উড়ে গিয়ে ডালে বসে ডাকে। বেশ মিষ্টি স্বর। মনে হয় যেন বলে, কি-নি-ল বা কে-নি-ল। পোকা মাকড়, ফল আর মধু খায়। বাসা বানায় পাতার আড়ালে, ছোট্ট দুই ডালের মাঝে, মাটি থেকে বেশ উঁচুতে। ঘাসপাতা বাকল দিয়ে তৈরী করে, বাটির মত দেখতে হয়। গরমের মাঝামাঝি থেকে বর্ষাকালের ভেতর বাসা বানিয়ে ডিম দেয়। দু'তিনটি কাল বা বাদামী ছিটওয়ালা সাদা ডিম।

বলতে পার, বেনেবৌ বা ইষ্টিকুটুম—যাদের কালো মাথা কালো ডানা হলদে গা গোলাপী ঠোঁট, সেই পাখিদের সাথে কাজলগৌরীর কোন মিল আছে কিনা ?

(১) শিখা লাহিড়ী, ১০৬৫, বয়স ১৬

গ্রাহিকা থাকার সঙ্গে তো বয়সের কোনো সম্পর্ক নেই। ষাট বছরের বুড়োরাও গ্রাহক হতে পারে। তবে প্রতিযোগিতা, ধাঁধাঁ, চিঠিপত্র এই সব বিভাগে যোগ দিতে হলে বয়স হওয়া চাই ১৭ বছরের নিচে। অর্থাৎ জুন ১৯৫১ এর আগে জন্মালে ও সবে অংশ নিতে পারবে না। তখন যদি লেখা পাঠাও, সাধারণ বিভাগে ছাপার যোগ্য হলে, ছাপানো হবে।

সবার লেখাই আমরা ছাপতে ভালোবাসি, ভাই, কিন্তু সব তো আর এক সঙ্গে ছাপা যায় না। ডিটেকটিভ গল্প ছাপি না বললে তো চলবে না। গোয়েন্দা গণ্ডালু, ফেলুদা ইত্যাদি ভুলে গেলে নাকি? সায়েন্স ফিক্‌শন্‌ ছাপি বৈ-কি, প্রঃ শঙ্কুর গল্প, অন্য গ্রহের আমি, বিশেষ সংখ্যার অতিথি, ইত্যাদি নিশ্চয় পড়েছ?

(২) জয়ন্ত রায়, ২০৫৩ সর্বদা বয়স দিতে হয় কিন্তু। তোমার লেখা কি আঁকা ছবি নিশ্চয়ই পাঠাতে পার। ভালো হলেই ছাপা হবে। সে বিষয়ে কিছু জানানো হবে না; ছাপা হলে দেখতেই পাবে। কোনো কিছুর জন্যে আলাদা পয়সাকড়ি লাগে না। তোমার গ্রাহক চাঁদা পাঠিয়েছ তো? একটা নম্বর সুদ্ধ গ্রাহক কার্ড ও পাবে। সেটি যত্ন করে রেখো।

(৩) উৎপল ভট্টাচার্য, ২৭৩৫, বয়স? ভুল ধরতে গিয়ে যে বয়স দিতে ভুলে গেলে। ওটা ৪২° হবে।

(৪) অনুরাধা সিংহ, ১৪৪৬, বয়স ১১½ এই তো চিঠির উত্তর পেলে, এবার খুসি তো? ছবিতে গল্প আমাদেরো ভালো লাগে এবারের প্রথম ছবিটা দেখো।

(৫) জয়ন্তী রায় চৌধুরী, ১৩৬৫, বয়স? একবার পড়া হয়ে গেলে আরেকবার পড়, দেখবে আবার নতুন কিছু পাবে।

(৬) তপন ঘোষ, ৮৯৪, বয়স ১৪½ আগের মাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তুমি নিজে লিখে হাত পাকাবার আসরে দাও না কেন?

(৭) তারা চন্দ, ১০৯৮, বয়স ১১ বছর ৯ মাস। ভাই, লেখা যথেষ্ট ভালো হলেই ছাপানো হয়। আরো চেষ্টা কর, হঠাৎ একদিন দেখবে ছাপা হয়েছে।

(৮) আলোকময় দত্ত, ৯৩৮, বয়স দাও নি কেন? আঁকতে হবে অন্ততঃ পোস্টকার্ডের মাপে ও কালি বা চাইনিজ ইঙ্কে।

(৯) মাণিকলাল দাশ, ১১৩৩ বয়স ১৫ প্রবন্ধ আমরাও ভালোবাসি। কম থাকে বলছ কেন? তিনটে কি চারটে প্রায় প্রত্যেক মাসেই থাকে। সব-ই বিজ্ঞান বিষয়ক নয়, নানান্ বিষয়ে। তাছাড়া প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তরের সব কিছুই তো জীব বিজ্ঞান বিষয়ক। আরো দিতে আপত্তি নেই।

তোমাদের সম্পাদকদের মধ্যে সত্যজিৎ রায় হলেন সন্দেশ প্রতিষ্ঠাতা ৺উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর নাতি ও ৺সুকুমার রায়ের ছেলে আর লীলা মজুমদার হলেন উপেন্দ্র কিশোরের কনিষ্ঠ ভাই ৺প্রমদারঞ্জনের কন্যা। এক সময় সুকুমারও সন্দেশের সম্পাদক ছিলেন। প্রায় প্রতি মাসে তাঁর আবোল তাবোলের কবিতা কিম্বা পাগলা দাশুর গল্প বেরুত। প্রমদারঞ্জনের বনে বনে ঘোরার অভিজ্ঞতা 'বনের খবর' নাম দিয়ে ধারাবাহিক ভাবে বেরুত। সন্দেশকে এঁরা বড় ভালোবাসতেন।

শ্রাবণে

আশা দেবী

আজ আকাশের সেতারটাতে কাজরী সুর তুলল কে,
তার ছোঁয়াতে মেঘপুরীতে রুদ্ধ দুয়ার খুলল যে,
লক্ষ হাতে ঐ যে কারা
মেঘ মাদলে দিচ্ছে সাড়া
হাজার তারা মন্দিরাতে সুরের সাগর দুলল রে—
নাগ মানিকের আলোয় হ'ল কেয়ার কলি ফুল্ল রে।

সেই সুরেতেই শিউরে ওঠে কদম্বেরি অঙ্গ যে,
গন্ধ মাতাল মৌমাছিরা মাতল একি রঙ্গতে
জুঁই-চামেলীর হাজার মেয়ে
রিক্ত কানন ফেলল ছেয়ে
কোমল কিশলয়ের হ'ল সুপ্তি-কারা ভঙ্গ যে
পূবের হাওয়া আজকে নিলো কাজ্‌লা মেঘের সঙ্গ যে

সিক্ত মাটির প্রাণের থেকে খুসির জোয়ার উঠছে যে,
প্রকাশ-ব্যাকুল নবাঙ্কুরের অচল বাঁধন টুটছে যে,
মেঘ মৃদঙের ছন্দ সনে
বাজছে বাঁশি বাঁশের বনে
আপন হারা কামিনী ফুল দেউলে হয়ে লুটছে যে,
শ্রাবণ-সুরে মাতাল পরাণ নিরুদ্দেশেই ছুটছে যে।

বিলিতি নাচ

সমীরকুমার চট্টোপাধ্যায়

এক ছিল ছোট্ট পুষি। আর ছিল তার এক মাসি। মাসি বড় চালাক চতুর। সে অনেক দূর দূর বেড়িয়ে বেড়ায়। এ পাড়ায় সে পাড়ায় আর এক পাড়ায়।

একে মাসি তায় আবার চালাক চতুর। বয়সেও সে বেশ বড় সড়। তাই কথা একটু বড় বড়ই বলে। তার সোঁটা সোঁটা গোঁপ ফুলিয়ে গোল গোল চোখ ঘুরিয়ে পাকা গিন্নীর মত ছোট্ট পুষিকে শিক্ষা দেয়, ছাখো খুকি, একা যেন কোথাও বেরিও না। পথে ঘাটে অনেক বিপদ। যাবে ত আমার সঙ্গে যাবে।

ছোট্ট পুষি অবাক দৃষ্টি মেলে চায়। ভাবে, মাসি যেন কত কিই না জানে। জড়সড় হয়ে বসে। একটু কাসে। কি যেন বলতে ইচ্ছে করে। এমন সময় ফঁ্যাস ফঁ্যাস…ফঁ্যা…স করে শব্দ হয়। পুষি ভালো করে চেয়ে ছাখে মাসি একটা ইঁদুর ধরেছে।

ছোট্ট পুষির আনন্দ ধরে না। সে তানা না না করে নাচ সুরু করে দেয়। ছোট ইঁদুর ছানা। কি মজা…। কি মজা…।

মাসি বলে সে একেবারে গড়িয়ে পড়ে। মাসি তখন বলে, আহা বাছা আমার। কিন্তু খুকি যদি তুই একবার আমার সঙ্গে যাস ও পাড়ার বামুন বাড়ি, তবে দেখবি। আহা সে কি সমস্ত খাবার দাবার ঘরে ঘরে সাজান হাঁড়ি হাঁড়ি! তাই বুঝি…? ছোট্ট পুষি মুখ তুলে চায়। তার মাসি তখন মাথা নেড়ে বলে, তাই নাতো কি। চল যাবি একদিন। তখন পুষি আর তার মাসি মতলব করে। একদিন যাবে ও পাড়ার বামুন বাড়ির ভাজা মাছ খাবে।

যেইনা ভাজা মাছের কথা ভাবে অমনি ওদের নোলা দিয়ে টসটসিয়ে জল ঝরতে থাকে। মাসি ছাখে বোনঝিকে—বোনঝি ছাখে মাসিকে।

চমকে ওঠে ছোট্ট পুষি। মনে মনে ভাবে বাজ পড়ল নাকিরে বাবা!

ম্যাঁও—ম্যাঁও—ম্যাঁও। কে কাঁদে। কে কাঁদে অমন করে? পুষি কান খাড়া করে শোনে। একটানা কান্নার শব্দ। পুষি ভাবে, হয়েছে! গিন্নী মাসি বুঝি ধরা পড়েছে! ওমা ওই যে। গলায় দড়ি দিয়ে টানতে টানতে হিঁচড়োতে হিঁচড়োতে নিয়ে আসছে মাসিকে খিড়কির দিকে। তাইনা দেখে পুষির আত্মারাম খাঁচা ছাড়া। মাসি মিউ মিউ করে বলে, ও খুকি দাঁড়া মা একটু দাঁড়া। আবার দাঁড়া? ল্যাজ তুলে পুষি চোঁ চা দৌড় দেয়। মিস্তিরদের পেয়ারা তলায় এসে একটু দাঁড়ায়। ঘন ঘন নিঃশ্বাস নেয়। মনে মনে ভাবে, এবার কি হবে রে বাবা! বামুনদের ছেলেগুলো কি ঠ্যাঙ্গাড়ে গো। মাসিকে ধরে কঞ্চিপেটা করছে। আহা, মাসিগো…পুষির ছোট্ট দুটি গোল গোল চোখ ভরে এলো জলে।

একটু পরে ছোট্ট পুষি আনমনে বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। মনটা তার তখনও মাসির জন্য হায় হায় করতে থাকে। পুষি কেঁদে ওঠে, মাসি আমার মাসি কোথায়…।

কিন্তু হটাৎ সে চমকে ওঠে। চেয়ে ভাখে। চোখ দুটো বড় বড় করে ঠায় চেয়ে থাকে আর মনে মনে ভাবে, এ আবার কি…। মাসি তখন মুখ মুচকে একটু হাসে। বলে, ও আর কি খুকি। ও কিছু নয়। বামুনদের ছেলেগুলো আমায় বড্ড ভালোবাসে কিনা। তাই মাঝে মাঝে গলায় দড়ি বেঁধে একটু নাচতে বলে। ছোট্ট পুষি সাত পাঁচ ভেবে মরে। সারাটা বুক তার আঁকুপাঁকু করতে থাকে। ভাবে, এ আবার কেমন কথা। মাসির ঠোঁট দুখানা থেঁতলানো। মুলোটা মোচড়ানো। অমন খুরো খুরো গোঁফ তাও কিনা একেবারে বেবাক সাফ।

মাসি তখন বোনৃঝিকে বোঝাতে থাকে। বলে, ও তুমি বুঝবে না খুকি। বিলিতি নাচ কিনা। ও নাচ নাচতে গেলে এমনই হয়। চল, বাড়ি চল। পা চালা। তোকে তোর মায়ের কাছে পৌঁছে দিই।

জ্যোতিষী

নগেন্দ্রকুমার মিত্র মজুমদার

ফুটপাতে বসে এক জ্যোতিষী,
ভাঁজপড়া কপালের
চন্দন রেখা দেখে
মনে হয় মনীষী।

খড়ি দিয়ে ছক কত এঁকেছে,
মানুষের ভাগ্যের
অতীত ও অনাগত
কুণ্ডলী লেখে যে।

বই, খাতা যত কিছু রেখেছে,
বহুকেলে উই ধরা
থরে থরে চারিধারে
ফুটপাত ঢেকেছে।

চৈতনে চাঁপাফুল ঝুলছে,
দড়ি বাঁধা চশমাটা
কানের দু'পাশ থেকে
অবিরত দুলছে।

কাছাকাছি পাখি আছে খাঁচাতে,
আশপাশ ভরে আছে
জড়ি বুটি ডাল মূল
মাদুলী ও গাঁজাতে।

যদি কেউ আসে হাত দেখাতে,
দর্শক দশ গুণ
জুটে গিয়ে ভিড় করে
কে পারে তা ঠেকাতে ?

দেখায় হাতটি বসে যাহারা,
ট্যাঁক হতে দক্ষিণা
দিয়ে নেয় নির্দেশ
হাতে হাতে তাহারা।

হাতে পেয়ে টাকা, সিকি, আধুলি
খুসি মন জ্যোতিষী
গুণে দেখে বেচেছে সে
আজ মেলা মাদুলী।

প্রতিযোগিতার ফলাফল

নববর্ষ সংখ্যার চটপট প্রতিযোগিতায় যদিও খুব বেশি সংখ্যায় গ্রাহক গ্রাহিকা যোগ দাওনি কেবল ৬০ জন দিয়েছ, কিন্তু অনেকের লেখা খুব ভাল হয়েছে।

এছাড়াও অনেকে বেশ সুন্দর গল্প লিখেছ কিন্তু সর্তগুলি রক্ষা না করতে পারায় তাদের লেখা বাতিল হয়েছে। ছয়জনকে ভাগাভাগি করে প্রত্যেককে ৫৲ টাকা হিসাবে পুরস্কার দেওয়া হবে।

ক-বিভাগে :—১৭২—মাল্যশ্রী চৌধুরী, ২০৭৮ সত্যজিৎ সেনগুপ্ত আর ২১৯০ বন্দনা মজুমদার।

খ-বিভাগে :—১৪৬০ কেয়া বসু, ১৬১৩ অভিজিৎ দে আর ১৭৮৮ পলাশবরণ পাল।

এ-ছাড়াও যাদের উত্তর খুব ভাল হয়েছে তাদের নাম নিচে দেওয়া হল :—

ক-বিভাগে—২৯৫ শর্মিলা দত্ত, ৮৯০ কাকবাকী দত্ত, ১৫৮৮ শিঞ্জিতা সেন, ১৬১৫ পথিকৃৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৬৫১ হাম্বির মজুমদার. ২০০১ বুবুন, ২৬৫১ গৌতম রায়, ২৭৩৫ উৎপল ভট্টাচার্য, ২৮৩৭ অর্পিতা রায়চৌধুরী।

খ-বিভাগে—১২৯২ সুজাতা ঘোষ, :৫০৯ তাপসী নিয়োগী, ১৭৯০ জয়িতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১৯ শুভ্রা বিশ্বাস, ২০৫৭ কমলেশ দাশগুপ্ত, ২১৪৭ কল্পনা মজুমদার, ২৫১৯ জুলু সেন, ২৭০১ মধুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, আর ২৭০৩ বিশাখা ঘোষ।

তোমরা সবাই আমাদের অভিনন্দন জেনো।

চটপট প্রতিযোগিতা

'ক' বিভাগ

১৭২—মাল্যশ্রী চৌধুরী—বয়স ১০ বছর

ছোট্ট ঝকঝকে গ্রাম, এক স্যাতস্যাতে বাড়িতে টুলটুল—এক ফুটফুটে মেয়ে। ধবধবে তার রং, তুলতুলে গড়ন, টুকটুকে ঠোঁট, খিল খিলিয়ে হাসি ভরা মুখ। তার সৎমা বড় খিটখিটে। টুলটুল রোজ চটপট ঘরদোর ফিটফাট, বাগানটি ছিমছাম করে, গোয়ালটি খটখটে নিকোয়, এমন মুচমুচে মুড়ি কেউ ভাজে না, তবুও সৎমা খনখনে গলায় কেবলই বকতো টুলটুলকে, তার বিড়বিড়, গজগজ শেষ হয় না।

এক শীতের রাতে বুড়ি শাস্তি দিল বাইরে শুতে হবে, টুলটুল তাই প্যাচপ্যাচে উঠানে শুয়ে কনকনে ঠাণ্ডায় উঁকিঝুঁকি মারা ঝিকমিকে তারাদের দেখে ঘুমিয়ে পড়লো। মটমট ডালের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে পিটপিটিয়ে দেখে এক পরী চুপিচুপি ফিনফিনে পাখা মেলে এলো, ফিসফিসিয়ে কি বললো, ঝিমঝিমে ঘুমে, সেই ঘুটঘুটে রাতে টুকটুক করে চললো ঝলমল ঝকমকে এক দেশে। সেখানে পিলপিল করে পরীরা চিকমিকে ডানায় মিটমিটে আলোর ফুরফুরিয়ে নাচছে রুণুঝুনু নূপুর বাজিয়ে, রিণরিণে গলায় গান গেয়ে। টুলটুলও ধিনধিন নাচল, ফুরফুরে নাচতো সে শেখেনি!

পরীরা দীঘির টলটলে জলে ডোবাতেই টুলটুল হল কুচকুচে কালো বুলবুলি। খুলখুলে হালকা খাঁচায়

ঘুরে পরীরানী তাকে দিয়ে এলো বুড়ির ঘরে। টরটরে বুলবুলি গায়—

'টুলটুল পরী হল ফুটফুটে
মা তার চিড়বিড়ে খিটমিটে,
মামণি মিন্‌মিনে মিষ্টি হও
কটকটে কথা বলা ভুলে যাও।'

এমনি নানান গানে ঘ্যানঘ্যানে বুড়ির প্যানপ্যানে স্বভাব ভাল হল। এক টিপটিপে, ঝিরঝিরে বর্ষারাতে পরীরা চটপট বুলবুলিকে টুলটুলি বানিয়ে গেল। মা মেয়ের ঘর এবারে হাসি খুসিতে মোমো করতে লাগলো।

লটপটের 'কলকাতা ভ্রমণ'

২০৭৮—**সত্যজিৎ সেনগুপ্ত**—বয়স ১০ বছর

লটপট নতুন কলকাতায় এসেছেন। তিনি ফুটফুটে ফিট বাবু। বিকাল হতেই ধপধপে জামাকাপড় পরে চটপট বেড়াতে গেলেন। ঝরঝরে ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়া খটখট করে চলেছে, আর গাড়ি করছে ক্যাঁচ ক্যাঁচ, ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ, খ্যাঁচ খ্যাঁচ, পাশ দিয়ে হুস হুস করে মোটর, ঘ্যাচাং ঘ্যাচাং করে ট্রাম আর প্যাঁক প্যাঁক হর্ণ দিয়ে বাস চলেছে। লটপট প্যাট প্যাট করে চারিদিক দেখছেন, তাঁর চকচকে ঝকঝকে জামাকাপড় ফুরফুরে হাওয়ায় উড়ছে। হঠাৎ কাপড় চাকায় আটকে ফর ফর করে ছিঁড়ে গেল। লটপট হায় হায় করতে লাগলেন। আবার ঝুপঝুপ করে বৃষ্টিও শুরু হয়ে গেল। টিমটিমে গ্যাসের আলোয় লটপট দেখেন রাস্তার ধারে কটকট মটমট চানা বিক্রী হচ্ছে। লটপট চটপট নেমে পড়ে ঝটপট চানা কিনে নিয়ে কটকট করে চিবিয়ে খেলেন। আর কল থেকে চকচক করে জল খেলেন। হঠাৎ এক টকটকে লাল কুকুর খ্যাঁক খ্যাঁক করে তেড়ে এলো। চটি ফট-ফট করে লটপট দুমদাম পা ফেলে দৌড়ালেন। জলে আর প্যাচ প্যাচে কাদায় তার ধবধবে কাপড় আর কড়কড়ে জামা স্যাঁত স্যাঁতে হয়ে গেল। খিটাখিটে মেজাজে ফিরে এসে লটপট ধপধবে কাগজে চটপট তার ভ্রমণ খসখস করে লিখতে লাগলেন ও খকখক করে কাশতে লাগলেন। পাখা বন বন ঘুরছে, মাথা ভন ভন করছে আর পেট চোঁ চোঁ করছে কিন্তু লটপট লিখেই চলেছেন, চটপট প্রতিযোগিতায় তাঁর জেতা চাই। হঠাৎ দুপদুপ শব্দে ভয়ে গা শিরশির করে উঠল। কুচকুচে কালো বিড়ালের ম্যাও-ম্যাও ডাকে লটপট ভয় পেলেন। সুটসুট করে উঠে এসে ঝটপট শুয়ে পড়ে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমিয়ে পড়লেন।

বন্দনা মজুমদার বয়স ১১ গ্রাহক সংখ্যা ২১৯০

ফুরফুরে হাওয়া বইছে শন্‌শন্‌ করে, মধুমিতা তার ধপধপে পা দুটিকে চটপট চালাল। কাঁধের ব্যাগে তপতপে আম মুচমুচে বিসকুট আর কচকচে পেয়ারা। রাস্তায় টিমটিমে আলো জলছে, গাছের পাতায় মরমর কটকট শব্দ। টুকটুকে আমে ভর্তি গাছ থেকে টুপটাপ করে আম পড়ছে। রাস্তাটা খুব চুপচাপ। মিশমিশে অন্ধকারে নড়নড়ে বাড়িটা চাঁদের আলোয় চকচক করছে, ভেতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। জামাটা প্যাচপ্যাচে গরমে ভিজে সপসপ করছে। মশমশ জুতোর আওয়াজ তুলে গট্‌গট করে বাড়িটার স্যাঁতস্যাঁতে বারান্দা ঝটপট বসে পড়ল ও। কিন্তু ক্যাঁসফ্যাসে গলায় কে ডাকল? খটখটে খড়ম পরে খন্‌খনে গলায় কাশতে কাশতে থপথপিয়ে কে আসছে? গাটা ছমছম করে উঠল বুক দুর্‌দুর্‌ করে উঠল। ভগবান! ঝমঝমে মল বাজিয়ে ফিনফিনে শাড়ী পরে গুটিগুটি আসছে, ফুটফুটে একটি মেয়ে না? ছিপছিপে চেহারা, কুচকুচে কালো চুলে চক্‌চকে ফিতে শির্‌শিরে হাওয়ায় পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। তুলতুলে হাতে চল্‌চলে চুড়ি ঝিক্‌ঝিক্‌ করছে, মিটমিট করে তাকিয়ে ফিকফিকিয়ে হেসে ফিস্‌ফিস্‌ করে

কি বলল ও? হঠাৎ ধুপধাপ শব্দ!! ঢ্যাংঢ্যাঙে লম্বা লিকলিকে পা কুচ্‌কুচে চোখ টকটকে লাল, মেজাজটা খিটখিটে মনে হয়। ড্যাবড্যাবে চোখে তাকায় ঘড়ঘড়ে গলায় হুংকার দিয়ে উঠল—তুমি কে????

মধুমিতার মাথা ঝিমঝিম করে উঠল, বুক ধড়ফড় করে উঠল, চোখের চিক্‌চিক্ করা টলটলে জল ঝরঝরিয়ে নেমে এল। মেয়েটি খিলখিলিয়ে হেসে উঠল। মধুমিতা চকচকে মেঝের খস্‌খসে মাদুর থেকে তড়তড়িয়ে দুম্‌দাম করে ছুটে পালাতে চাইল—কিন্তু একি!!!! এযে ঝকঝকে তক্‌তকে বিছানা!!!! তবে কি এ স্বপ্ন!!!!

খ-বিভাগ

টিঙটিঙে ভূত

কেয়া বসু গ্রাহক নং ১৪৬০ বয়স ১২ বছর ১১ মাস

'তৈরী? চট্‌পট্ গট্‌গট্ করে আয়', দাদু ডাকলেন। পুরীতে এসেছি, শুনেছিলাম পাথরকুটিতে ভূত আছে। ভূত দেখার ইচ্ছা ফিস্‌ফিস্ করে দাদুকে বলায় এই ব্যবস্থা। ঝির্‌ঝিরে বৃষ্টি হয়েছে, প্যাচ্‌প্যাচে কাদা নেই। থম্‌থমে আকাশ, গুরুগুরু মেঘ ডাকছে, ঘুটঘুটে অন্ধকারে ধপধপে ঢেউগুলো কলকল করে আছড়াচ্ছে, ঝুরঝুরে বালির ওপর হাঁটছি। সমুদ্রতীরে ঝরঝরে দোতলা প্রাসাদ—ভেতরে ঢুকলাম দাদু, আমি, টিমটিমে লণ্ঠনহাতে লিকলিকে চেহারার ভীম। ঘুমিয়েছি, খট্‌খট্ শব্দে জেগে দেখি, ভীম থরথর কেঁপে মিনমিনে গলায় বলছে,—'মুই থাকিব না।' কটমটে চোখে তাকিয়ে দাদু লণ্ঠন নিয়ে সিঁড়ির দিকে গেলেন, পেছনে আমরাও। কে যেন নামছে থপ্‌থপ্—ঘট্‌ঘট্। রেলিংগুলো আর্তনাদ করছে মট্‌মট্। দাদু গমগমে গলায় বল্লেন, 'কে?' কে হাসল খলখল করে। হুড়্‌হুড়্ টানার শব্দ—ঝট্‌পট্ চামচিকের আওয়াজ, সর্‌সর্ করে' কি গেল। গা ছমছম্ করছে, ভেতরটা শিরশির, না এলেই হত। কিন্তু মেয়েরা ভীতু? কক্ষনোনা। দাদু হাঁকলেন, 'কেরে মিটমিটে শয়তান, নেমে আয়।' খসখসে গলায় বলল, 'আমি ভূত।' দাদুর মেজাজ চড়ল চড়্‌চড়্ করে'—'আমি অদ্ভুত।' সে নামল তর্‌তর্ করে'—হুড়মুড় করে সরলাম। মিশমিশে কালো টিঙটিঙে লোকটা, টকটকে লাল নেংটিপরা, লটপটে জটা, জ্বলজ্বলে চোখে, কচ্‌মচ্ করে' কি চিবোচ্ছে। দাদু চিনলেন, 'বেরো হতভাগা।' ম্যাটম্যাটে সাদা দাঁতে হেসে সুড়সুড় করে' সে পালাল। দাদু বল্লেন—'ও অঘোরী পাগ্‌লা, লকলকে চিতার ধারে ঘোরে, বোধহয় ঘুমায় এখানে টিঙটিঙে ভূতটা।' সত্যি ভূত না দেখলেও কেউ বলবে কি ভূত দেখার সাহস আমার নেই?

বাদলা রাতের ছম্‌ছমানি

অভিজিত দে গ্রাহক নং ১৬১৩ বয়স ১৫

ঝির্‌ঝির্ টুপ্‌টাপ্ বৃষ্টির শব্দকে ছাপিয়ে হঠাৎ দুড়্‌দাড়্ একটা শব্দে ধড়্‌মড়্ ক'রে উঠে ব'সতেই হুড়্‌মুড়্ ক'রে ঘরে ঢুকলো ক্ষ্যাপ্‌লা, গুগ্‌লি, টুপি। সারা গা দিয়ে ঝর্‌ঝর্ দর্‌দর্ ধারায় জল পড়ছে; ঢুকেই টুপি ঢক্‌ঢক্ ক'রে একগ্লাস জল খেয়ে ফিকফিক্ ক'রে হাসলো, 'এই গমগমে ওয়েদারে চুপচাপ্ শুয়ে আছিস!' ক্ষ্যাপ্‌লা খট্‌খটে ধব্‌ধবে বিছানাটাকে জল-কাদায় জব্‌জবে ম্যাট্‌ম্যাটে ক'রে খিট্‌খিটে টোন-এ বললো, 'নে, চট্‌পট্ উঠে পড়্।' গুগ্‌লি মুচ্‌মুচে মুড়িগুলো গপগপ্ শব্দে কড়মড় ক'রে চিবিয়ে হাসলো।

তর্‌তর্ ক'রে সিঁড়ি বে'য়ে বাইরে এলাম; বৃষ্টির ঝম্‌ঝম্ রম্‌রম্ আর বাজের গুমগুম্ গুড়্‌গুড়্ শব্দে চমকে চমকে উঠছিলাম। প্যান্‌প্যানে গলায় গুণ্‌গুণ্ ক'রে ক্ষ্যাপ্‌লা গলা সাধলো। শন্‌শনে হাওয়ায় থম্‌থমে মেঘমেঘ আকাশটাকে দেখে ভয়ে প্রাণটা ধুক্‌ধুক্ ক'রে উঠলো। হঠাৎ চারিদিক ঝক্‌মক্ ক'রে বিদ্যুতের চক্‌মকে তলোয়ার

ঝিলিক দিলো ; আর কড়কড় চড়্‌চড়্‌ শব্দে বাজ পড়লো। সামনের তালগাছটা থর্‌থর্‌ ক'রে কেঁপেই মড়্‌মড়্‌ শব্দে ভেঙ্গে প'ড়লো। হঠাৎ পায়ের কাছে সড়্‌সড়্‌ ক'রে কি চ'লে গেল ; গা'টা সির্‌সির্‌ ক'রে উঠলো। থপ্‌থপ্‌ ক'রে দুটো ব্যাং ঝপাঝপ্‌ জলে পড়লো। পায়ের নীচে ঠাণ্ডা কন্‌কনে অনেকটা জল জমে ছল্‌ছল্‌ কল্‌কল্‌ শব্দ হচ্ছে। ভয়ে আর ঠাণ্ডায় দাঁতে দাঁত লেগে ঠক্‌ঠক্‌ শব্দ হচ্ছে।

চ্যাট্‌চ্যাটে কি একটা হাতে লাগতেই চিড়বিড়্‌ ক'রে উঠলাম। কুচ্‌কুচে ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকারে না দেখতে পেয়ে রাগে গর্‌গর্‌ ক'রে টুপিকে হিড়হিড়্‌ করে টানলাম। প্যাচপ্যাচে কাদায় ছপছপ্‌ ক'রতে ক'রতে খটাখট্‌ শব্দে তড়্‌বড় ক'রে উপরে এসে ব'সে পড়লাম।

ওস্তাদের মার

পলাশ বরণ পাল গ্রাহক নং ১৭৮৮ বয়স ১২½

চৌকাঠের বাইরে পা বাড়াতেই—টিক্‌টিক্‌, টিক্‌টিক্‌। ঘড়ি না টিকটিকি বোঝা গেল না।

জিরজিরে ঘোড়ায় চড়ে খট্‌খটিয়ে চললেন লটপট্‌ সিং। ডিগ্‌ডিগে চেহারা ; কুটকুটে কালো মুখে খব্‌খবে মোচ। ক্যাট্‌ক্যাটে নীল স্যুট, কালো কুচকুচে জুতো। নড়বড়ে ঘোড়াটাকে সপাসপ্‌ চাবুক কষালেন লটপট। পাঁইপাঁই করে ছুটল পক্ষীরাজ।

হিল্‌হিলে নলখাগড়ার বনে ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। গট্‌মটিয়ে চলেছেন ঘোড়সওয়ার শিকারী লটপট্‌। চলেছেন বাঘ মারতে। এই নট্‌খটে বাঘটা কী যে না করতে পারে কে জানে! ধ্যাড়ধেড়ে গোবিন্দপুরের ছল্‌ছলে খালের ধারে সেই যে দর্শন দিলেন বাবাজী—সেই থেকেই গ্রামের গরু-বাছুর—টুকটুক-হাওয়া। মিন্‌মিনে লোকগুলোর ভীতুমি-ও অসহ্য। ফাঁকা বন্দুকে দুম্‌দুম্‌ দুটো আওয়াজ করলেই ঝটপট্‌ মিটে যায়। সবেতেই পুতুপুতু লটপট্‌ সইতে পারেন না।

টিম্‌টিমে চাঁদের আলোয় মচমচিয়ে মাচায় উঠলেন লটপট্‌ সিং। ঝিরঝিরে হাওয়া। কুলকুলে খালের জল চিক্‌চিক্‌ করছে ম্যাড়মেড়ে জ্যোৎস্নায়। দূরে থম্‌থম্‌ করছে গ্রাম। চোখ কচলে টান্‌টান্‌ হয়ে বসলেন শিকারী। ঢুল্‌ঢুল্‌ চোখে নামছে ঘুম্‌ঘুম্‌ আমেজ। কিন্তু পুন্‌পুন্‌ করছে মশা আর ফড়ফড় করছে পোকা। রাগে গড়গড় করছেন লটপট্‌। ওদিকে বাঘের-ও ঠিকঠিকানা নেই। গবগব্‌ করে খাবারটা খেয়ে বন্দুকটাকে পাশবালিশ করে চট্‌পট্‌ শুয়ে পড়লেন লট্‌পট্‌।

একটা খড়খড় শব্দে ধড়মড় করে উঠে পড়লেন শিকারী। জল্‌জলে চোখে কট্‌মট্‌ করে তার দিকেই তাকিয়ে আছে—স্বয়ং বাঘ। ঘাবড়ে গিয়ে থর্‌থর্‌ করে কাঁপছেন লটপট্‌। তারপর পটপট্‌, মট্‌মট্‌, হুড়মুড় দড়াম্‌ আর কিছু মনে নেই।......পরে শুনলেন, মাচার চাপেই বাঘের প্রাণটা খাঁচাছাড়া হয়েছিল!!

(উত্তর দেবার শেষ দিন ১৬ই অগস্ট।)

(১)

সার বেঁধে দুই দল আছি মুখোমুখি,
প্রতিদিন বারবার চলে ঠোকাঠুকি।
একবার পড়ে পড়ে উঠি ফের তেড়ে
আবার পড়িলে যাব রণভূমি ছেড়ে!

(২)

ট্রেনের জানলার ধারে মুখোমুখি বসে দুই বন্ধু, তরুণ আর বরুণ, তাদের তৃতীয় বন্ধু অরুণের বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে চলেছে।

তরুণ বসেছে এঞ্জিনের দিকে মুখ করে আর বরুণ এঞ্জিনের দিকে পিছন ফিরে। ইলেকট্রিক ট্রেন নয়, কয়লার গাড়ি—তাই রাশি রাশি ধোঁয়া এসে জানলা দিয়ে কামরার ভিতর ঢুকছে।

গন্তব্যস্থানের কাছাকাছি এসে বরুণ উঠে গিয়ে মুখ ধুয়ে এল কিন্তু তরুণ মুখ ধুল না।

কেন বল ত?

(৩)

নিচের পদ্যে প্রত্যেক লাইনের দুটি শূন্য স্থানে এমন দুটি শব্দ বসাবে যেগুলির বানান ঠিক এক কিন্তু অর্থ আলাদা। যেমন কর (হাত) আর কর (রাজস্ব)।

— রাজা মহারাজা তাঁর গৃহে মজা — !
সারি সারি, শত শত, — — হয় রোজ।
রুই-মুড়ো— ঝাল, ভেটকির ভাজা — ?
ধনে — দিয়ে — মাছ ও ইলিশ দৈ!
— বাটা দিয়ে — কুমড়োর ফালি ভাজা।
— কাঁঠালের কোয়া, আম আর গজা —
— পাক সন্দেশ, — ভরা ক্ষীর পাই।
মিঠা জল — করি আর মিঠা — খাই।

আষাঢ় মাসের ধাঁধার উত্তর

(১)

কালি আর কাগজ

(বাহন কে বুঝেছ ত? কালি কোন বাহনে চড়ে কাগজের উপর জ্ঞানের কথা লেখে সবাই জানো)

(২)

সোহিনী রায়, মোহিনী মিত্র আর রোহিনী সেন

(৩)

বেড়াবে বাগানে আমার সাথে ?
রবির উদয় দেখিবে প্রাতে ?
বলিব সুখের, হাসির কথা।
মরম বেদনা, দুখের গাথা।
দরদ জানাব তোমার দুখে।
সহাস হরষ জানাব সুখে।
নয়ন ভুলানো সবুজ ঘাসে,
বসিব দুজনে দীঘির পাশে।
জলজ ফুলের মোহন ছবি।
কনক বরণ উঠিবে রবি।

(যারা সর্ত ঠিক রেখে একটু অন্য শব্দ ব্যবহার করেছে, তাদের উত্তরও ঠিক ধরা হয়েছে, যেমন ষষ্ঠ লাইনে **সরস**)

জ্যৈষ্ঠ মাসের ধাঁধার দেরিতে পাওয়া উত্তর।

জ্যৈষ্ঠমাসের ধাঁধার উত্তর দেবার শেষ দিন ছাপতে ভুল হয়েছিল তাই কয়েকজন গ্রাহক দেরী করে উত্তর দিয়েছে। আরো পরে পাওয়া উত্তরদাতাদের নাম ছাপা যাবে না। এবার থেকে দিন দেওয়া না থাকলেও তোমরা ১৫ তারিখের মধ্যে উত্তর পাঠিও, কেমন ?

সব ঠিক : ১৯২ অন্তরা ও কুন্তরা সেন, ৮৯০ কাকবাকী দত্ত, ২২৯৭ প্রদীপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৭০৫ উৎপল ভট্টাচার্য।

দুটো ঠিক : ৩৮৬ রবীন্দ্র শংকর সেন, ৪০৩ বুদ্ধদেব নিয়োগী, ৮০৭ অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় ৯৬২ অঞ্জন ও কুমকুম ভট্টাচার্য, ১৩৪৪ মলয় বীজন ও অরূপরতন ভট্টাচার্য ১৭০৫ রঞ্জন রায়।

একটা ঠিক : ৩২১ অজন্তা ও বন্দিতা ঘোষ, ১১৯৪ সুগত ও সুপ্রতিম লাহিড়ী, ১৫৮৩ অঞ্জন চ্যাটার্জি।

আষাঢ় মাসের ধাঁধার উত্তর দাতাদের নাম :—

যাদের সব কটি উত্তর ঠিক হয়েছে—

৫৭ শাশ্বতী দত্ত ১১৫ অর্পিতা কিশলয় ও কিশোর চক্রবর্তী, ১৮১ মিষ্টি ও বাসবেন্দু গুপ্ত, ২১২ মধুশ্রী চৌধুরী, ২৮৪ নূপুর ও মিঠু দাশগুপ্ত, ৩২১ অজন্তা ও বন্দিতা ঘোষ, ৬১৬ ভারতী মিত্র, ৭০৭ মন্দিরা দেব, ৮৫১ সোনালী সেনগুপ্ত, ৯৩৮ আলোকময় দত্ত, ১১০৯ সন্দীপ নান, ১১৫৪ কেকা চৌধুরী, ১২১৩ সুগত, স্বাতী ও সোমা ঘোষ, ১৪৮১ উত্তম কুমার বটব্যাল, ১৭৩৫ রঞ্জন রায়, ১৭৫৩ মীনাক্ষী ও উদয়ন সেন, ১৮৪০ অনুরাধা ও অদিতি ঘোষ, ১৯৩৮ লীনা মিত্র, ২০২৯ শুভ্রা বিশ্বাস, ২০৫৬ নীতা ও নন্দিনী চৌধুরী, ২৬৩৮ সৌমিত্র ভট্টাচার্য, ২৬৯৭ প্রতাপ নারায়ণ চক্রবর্তী।

১৯২ অন্তরা ও ফুল্লরা সেন, ৩৯৩ নন্দিতা, বন্দনা ও দেবাশীষ বরাট, ৪০৩ বুদ্ধদেব ও পারমিতা নিয়োগী, ৮৩৩ সুনীলকুমার ও প্রদীপকুমার দে, ৮৩৮ সুপ্রতীক বাগচী, ১২২১ স্বাতী ঘোষ, ১২৩২ নন্দিনী দত্ত মজুমদার, ১২৯৮ রুদ্রনাথ ঘোষ দস্তিদার, ১৩২৩ অনিরুদ্ধ বিশ্বাস, ১৩৫৯ পার্থসারথি মুখার্জি, ১৪৬০ কেয়া বসু, ১৫৬৭ দেবাশীষ মুখার্জী, ১৬১৯ অঞ্জন ও অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়' ১৬৫৫ শৃন্বন্তী পাল, ১৮০৪ স্বাতী সেনগুপ্তা, ১৮৭৯ অমিতাভ দে ২২৫২ স্বরূপকুমার ও শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায়, ২২৯৭ প্রদাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৫৪৭ মৈত্রেয়ী ও প্রসেনজিৎ বসু, ২৭০১ মধুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৭৩৭ রীতা ও রীণা বসু।

যাদের দুটো উত্তর ঠিক ঃ—

৭৫৭ ভোম্বল, পাপুন ও টিঙ্কু, ৮১৪ সুস্মিতা দত্তগুপ্ত, ৮৭১ শম্পা মুখোপাধ্যায়, ১৫৮২ জবা রায়, ১৬৫১ হাম্বির মজুমদার, ১৭০৫ কৃষ্ণকলি, চন্দ্রাবলী ও ত্রিপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৬৩ সোনালী লাহিড়ী, ২৩০৫ অরূপ দত্তগুপ্ত, ২৫৪৪ সান্ত্বনা রায় চৌধুরী।

৩৭৯ অঞ্জনা সেন, ৩৮৬ রবীন্দ্র শংকর সেন রায়, ৯৮৩ জ্যোতির্ময় মজুমদার, ১১৯৪ সুগত ও সুপ্রিয় লাহিড়ী, ১২৯৫ সংহিতা দত্ত মজুমদার, ১৫২৪ শুভাশীষ বরাট, ১৬৭৫ প্রদীপকুমার মাজী, ১৭৯২ মলয়া পাল, ১৮৭৭ নরঘাট লবণ সত্যাগ্রহ স্মৃতিপীঠ পাঠাগার, ১৮৯৪ সুস্মিতা কাঞ্জিলাল, ২০৮৫ পুষ্পল মিত্র, ২১২২ অনীশ দেব, ২১৭৪ শিবরঞ্জনী মাইতি, ২৭৬১ ঋতা মিতা ইন্দ্রাণী সেনগুপ্ত, ১৩৪৪ মলয় বীজন ও অরূপরতন ভট্টাচার্য, ১৭৯০ জয়িতা বন্দোপাধ্যায়, ২০২৮ সুব্রত ঘটক।

একটি উত্তর ঠিক :—

১৯০২ অভিজিৎ চৌধুরী, ২১ ২ সুরজিৎ কর।

২২৬ জয়ন্ত ও প্রবাল কুমার রায়, ১৫৮৩ অঞ্জন চ্যাটার্জি, ১৬০৩ নিশীথরঞ্জন, নীতীশরঞ্জন ও সমীর গুহ ২১৪৮ সুশান্ত চৌধুরী, ২৪১৫ সুশান্ত বোস ১২২৪ সমীর কুমার সাহা।

মহাবীর শরণ

আজ থেকে প্রায় সাড়ে তেরশো বছর আগেকার কথা। ভারতবর্ষে তখন স্বর্ণযুগ। সমস্ত পৃথিবী এই দেশের মনীষা, ধর্ম, দর্শন, জ্ঞান ও বিজ্ঞান সাধনার দিকে চেয়ে আছে।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় তখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানপীঠ। নালন্দায় ছাত্র, গবেষক, অধ্যাপক পাঠ নিতে এসেছেন মহাচীন, তিব্বত, কোরিয়া থেকে, আরব, পারস্য, রোম, গ্রীস, মধ্যএশিয়া, আশিরিয়া, মিশর থেকে। পাঠ নিয়েছেন হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ধর্ম, দর্শনের, বিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, চিকিৎসা, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতির। নালন্দার ভারতীয় অধ্যাপক, গবেষক সারা পৃথিবীতে পৌঁছে দিয়েছেন ভারতের মর্মবাণী, তুলে ধরেছেন তার শাশ্বত আত্মাকে।

যে সময়ের কথা বলছি তখন নালন্দার জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রবীণ অধ্যাপক আচার্য ব্রহ্মগুপ্তের মনীষার খ্যাতি সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে। দেশ বিদেশের বহু ছাত্র গবেষক তাঁর কাছে এসেছেন দুর্জ্ঞেয় মহাকাশ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য ও জটিল উচ্চতর গণিতের রহস্যের সন্ধানে।

যথেষ্ট বৃদ্ধ হয়েছেন আচার্যদেব। বয়স আশি পার হয়ে গেছে। কিন্তু আজীবন বিজ্ঞানের সাধনা করে জীবনের সায়াহ্নে এসেও ব্রহ্মগুপ্তের বড় দুঃখ মহাকাশ ও তার লক্ষ কোটি গ্রহনক্ষত্রের রহস্যের মূলসূত্রটি তখনও তিনি আবিষ্কার করতে পারেন নি। সারাজীবনব্যাপী উচ্চগণিতের গবেষণায় তিনি দেখেছেন তখনকার দিনের প্রচলিত গণিত পদ্ধতির সাহায্যে মহাকাশ সম্বন্ধে গবেষণায় একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করার পর আর এগিয়ে যাওয়া যায় না। আরও উচ্চ গবেষণার জন্য চাই নূতন কোন গণিত পদ্ধতি, যার সন্ধান পৃথিবী তখনও খুঁজে পায় নি। সারাজীবন সেই নূতন গণিতের সন্ধান করে আসছেন আচার্য ব্রহ্মগুপ্ত। বহু অনুসন্ধান করে তিনি, বেদের জটিল মন্ত্রের মধ্যে, প্রাচীন ঋষিদের গ্রন্থে, মিশরীয় পেপিরসে, আরব ও আশিরিয়ার গণিত শাস্ত্রের মধ্যে, কিন্তু কোথাও খুঁজে পাননি সেই নূতন গণিতের ইঙ্গিত।

সেবার কড়া শীত পড়েছে নালন্দায়। বৃদ্ধ বয়সে মানুষের এমনিতেই শীত বেশী লাগে, শীর্ণকায় আচার্যদেবের তো কথাই নেই। এমনিতেই তিনি শীতে একটু বেশী কাতর হয়ে পড়েন।

সেদিন আচার্য তাঁর ঘরের সামনে রৌদ্রে বসে তেল মাখছিলেন। গায়ে শীতের রোদের মিঠে আমেজটুকু তাঁর ভালই লাগছে। তেলমাখা তাঁর একমাত্র বিলাস। এতে প্রথমতঃ শরীরটাও ভাল থাকে আর দ্বিতীয়তঃ তেল মাখতে মাখতে গভীর চিন্তায় মনোনিবেশ করতে পারেন তিনি। সেদিনও সেই একই কথা ভাবছিলেন ব্রহ্মগুপ্ত। ভগবান তথাগথের আশীর্বাদে দীর্ঘজীবন লাভ করেছেন তিনি কিন্তু জীবন তো শেষ হ'য়ে এল। আজও খুঁজে পেলেন না তিনি সেই দুর্জ্ঞেয় গণিত রহস্যের সন্ধান। কি দিয়ে যাবেন তিনি তাঁর শিষ্য, ছাত্র ভাবীকালের গবেষক অধ্যাপকদের হাতে। তাঁর ছাত্র নালন্দায় অধ্যাপক আচার্য শ্রীধর, ধর্মকীর্তি। প্রগাঢ় তাঁদের মনীষা। নালন্দায় আচার্য শ্রীধরের স্থান ব্রহ্মগুপ্তের পরেই। তাঁর ছাত্র বিক্রমশীলায় আচার্য প্রদীপবুদ্ধ, তক্ষশীলায় আচার্য স্থিরভদ্র। জ্যোতির্বিজ্ঞান, উচ্চগণিতের দিক্‌পাল অধ্যাপক এঁরা। সকলেই তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছেন। চিন্তায় গভীর সমুদ্রে তলিয়ে গেলেন ব্রহ্মগুপ্ত।

আচার্যের চিন্তায় ছেদ পড়ল সেবক শান্তশীলের ডাকে। শান্তশীল সুদূর গান্ধারের ছেলে। তক্ষশীলায় আচার্য স্থিরভদ্রের কাছে গণিতের পাঠ শেষ করে নালন্দায় এসেছে উচ্চগণিত ও মহাকাশ রহস্য নিয়ে গবেষণার আশায়। সে আচার্য শ্রীধরের ছাত্র আর বৃদ্ধ ব্রহ্মগুপ্তের সেবক। নালন্দায় ভৃত্যের পাঠ নেই, ছাত্রদেরই প্রাচীন অধ্যাপক গবেষকদের সেবা করতে হয়। কিন্তু কি করে জানা যাবে কে সেবক ছাত্র, কে গবেষক, অধ্যাপক? সকলেরই তো একই বেশ, গৈরিক অথবা বৌদ্ধ শ্রমণের চীবর। যে সব সৌভাগ্যবান ছাত্র অধ্যাপকের সেবার ভার পেত তাদের হাতে একটা ছোট দণ্ড থাকত। অনেকটা আজকালকার পুলিসের হাতের বেটনের মত।

শান্তশীল আচার্যকে বলতে এসেছে তাঁর স্নানের জল গরম হয়েছে। কিন্তু আচার্য চিন্তার রাজ্যে ডুবে আছেন, তেলমাখার হাতটি এমনিতেই থেমে গেছে। এখন কেউ ডাকাডাকি করলে তিনি অনেক সময় বিরক্ত বোধ করেন। কিন্তু শান্তশীলের তাড়া, স্নানের জল ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। তার বয়স অল্প আর এমনিতেই সে একটু চঞ্চল প্রকৃতির। সে আচার্যদেবের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আর হাতের ছোট্ট দণ্ডটা আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে অবিরাম ঘুরিয়ে চলেছে। দণ্ডটা খুব দ্রুত ঘুরছে আর মাটিতে তার বিচিত্র ছায়াটা বদলে বদলে যাচ্ছে।

দণ্ডটা ঘোরাতে ঘোরাতেই শান্তশীল ডাকল 'আর্য'।

'আঁা' চমক ভাঙল আচার্য ব্রহ্মগুপ্তের।

'আপনার জল গরম হয়েছে, স্নান করবেন চলুন।'

'এই যাই।'

চঞ্চল শান্তশীল হাতের দণ্ডটা ঘোরাতে ঘোরাতেই বলল 'আপনার পিঠে একটু তেল লাগিয়ে দেব কি?'

'দিবি? তা দে। তুই তো একটা আস্ত শাখামৃগ। একটু আস্তে দিস বাপু। তোদের গান্ধারের লোকেদের হাত বড় কড়া। সেদিন আমার ব্যথা লেগেছিল।

শান্তশীল তাঁর ছাত্র আচার্য শ্রীধরের ছাত্র। সেই সম্পর্কে ব্রহ্মগুপ্ত মাঝে মাঝে শান্তশীলের সঙ্গে রহস্য করে থাকেন।

হঠাৎ ব্রহ্মগুপ্তের দৃষ্টি পড়ল শান্তশীলের হাতের ঘূর্ণায়মান দণ্ড আর তার দ্রুত আবর্তনশীল ছায়াটার উপর। আচার্য দেখছেন দ্রুততালে ঘুরে চলেছে শান্তশীলের হাতের লাঠি আর কেমন সুন্দর বিচিত্রভঙ্গীতে ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে তার ছায়া।

হঠাৎ তাঁর চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল। ছায়াটার মধ্যে একি দেখছেন তিনি! ঐ তো রয়েছে শান্তশীলের দণ্ডের ছায়ার মধ্যে তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার পরম আকাঙ্ক্ষার ধন। ঐ তো সেই নূতন গণিতের পরশমণি, মহাকাশ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্যের চাবি কাঠি। ব্রহ্মগুপ্ত বিস্ফারিত চক্ষে দেখতে লাগলেন শান্তশীলও ততক্ষণ বৃদ্ধ আচার্যের ভাবান্তর লক্ষ্য করছে। তার ভয় হল তিনি হয়ত এইবার বাচালতার জন্য তিরস্কার করবেন। সে লজ্জায় তার লাঠি ঘোরান বন্ধ করল।

'থামাস না লাঠিটা,' চিৎকার করে উঠলেন ব্রহ্মগুপ্ত, 'ঘোরা ঘোরা আরও তাড়াতাড়ি ঘোরা।' অবাক হয়ে গেল শান্তশীল। আচার্য পাগল হয়ে গেলেন নাকি।

উত্তেজনায় অধীর আগ্রহে বৃদ্ধ ব্রহ্মগুপ্ত তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন। খসে পড়েছে তাঁর কটিবাস, আচার্যের ভ্রূক্ষেপ নেই।

হঠাৎ শান্তশীলের হাত থেকে দণ্ডটা কেড়ে নিয়ে তিনি নিজেই ঘোরাতে আরম্ভ করলেন আর দেখতে লাগলেন মাটির উপর তার ছায়ার খেলা। দণ্ডটা ঘোরাতে ঘোরাতে কখনও একবারে মাটির কাছে নিয়ে আসছেন, কখনও সামান্য উপরে, কখনও একেবারে মাথার উপর। ততক্ষণে হতবুদ্ধি শান্তশীল দৌড়ে অন্যান্য আচার্যদের ডাকতে গেছে, ব্রহ্মগুপ্তের নিশ্চয় মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে।

লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে এক সময় ব্রহ্মগুপ্ত উন্মাদের মত ডাকাডাকি সুরু করে দিলেন, 'শ্রীধর,

ধর্মকীর্তি, মহীধর, দেবভূতি।'

আচার্য শ্রীধর কাছেই কোথাও ছিলেন, ছুটে এসে ব্রহ্মগুপ্তকে ধরে ফেললেন। 'কি ব্যাপার গুরুদেব, অত অস্থির হয়ে উঠেছেন কেন? ধর্মকীর্তি দেবভূতি অধ্যাপনায় ব্যস্ত ছিলেন, তাঁরাও তৎক্ষণে শান্তশীলের ডাকে ছুটে এসেছেন।

দণ্ড ঘোরাতে ঘোরাতেই আচার্যদেব বললেন, 'দেখছ না দণ্ডের পাতন আর নিয়ত পরিবর্তনশীল ঐ ছায়া। ওর মধ্যে আমি এতদিনে খুঁজে পেয়েছি নূতন গণিতের মূলসূত্র। হাতের মুঠির মধ্যে আমলকি বীজ অথবা আমার সামনে ঐ তৈল ঘটের অস্তিত্ব যেমন নিশ্চিত, ঐ নূতন গণিতের সমাধানও আমার কাছে তেমনি নিশ্চিত।

'সামান্য ছায়ার মধ্যে কি এমন জিনিস পেলেন যা দিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত রহস্যের সমাধান হবে?' প্রশ্ন করলেন, আচার্য ধর্মকীর্তি।

'লক্ষ্য করছ না দণ্ডের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার অবস্থান, আবর্তন আর তাদের পরস্পর সম্বন্ধ, যে সম্বন্ধ প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তন হচ্ছে? দাঁড়িয়ে দেখছ কি তোমরা, লেখনী আন, ভূর্জপত্র আন, লিখে নাও সেই রহস্যের সমাধান।'

'নিশ্চয়ই লিখে নেব কিন্তু তার আগে আপনি স্নান করে পূজা শেষ করুন! আপনার আহারের সময় পার হয়ে যাচ্ছে। তারপর আমরা নেব গণিতের নূতন পাঠ।' বললেন আচার্য্য শ্রীধর।

'মূর্খ, বাতুল। এই বুদ্ধি নিয়ে মহাকাশ গবেষনার ভার নেবে? জীবন অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর, কখন শেষ হবে কেউ জানে না। তোমাদের পাঠ নেবার আগেই যদি আমার এই নশ্বর জীবনের সমাপ্তি ঘটে?'

'তা নিশ্চয়ই হবে না। ভগবান তথাগত কখনই এত নিষ্ঠুর নন। আপনি নিশ্চিন্তে স্নান, পূজা আহার শেষ করুন।"

ধীরে ধীরে স্নান, পূজা, আহার শেষ করে ভগবান বুদ্ধের নাম স্মরণ করে নূতন গণিতের পাঠ দিতে বসলেন। গণিত ব্যসকলন আধুনিক জগতে যার নাম ক্যালকুলাস।*

* সপ্তম শতকে নালন্দা মহাবিহারের আচার্য ব্রহ্মগুপ্ত ব্যসকলন গণিত পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। আধুনিক ক্যালকুলাসের অনেকগুলি জটিল সূত্রও তাঁর আবিষ্কার। ব্রহ্মগুপ্তের পর নালন্দার আচার্য শ্রীধর ও তাঁর শিষ্যরা ব্যসকলন গণিত আরও বহু দূর এগিয়ে নিয়ে যান। মহামনীষী আলবেরুনি এই গণিত পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং অন্যান্য অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের সঙ্গে ব্যসকলন পদ্ধতিও আরবিতে অনুবাদ করেন। পরবর্তীকালে নালন্দা তক্ষশীলা ও বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ থেকে এই গণিত পদ্ধতিও লুপ্ত হয়ে যায়। মধ্যযুগে খৃষ্টীয় ধর্মযাজকদের মধ্যে গণিতশাস্ত্রবিদরা ব্যসকলন গণিত আরবি থেকে ল্যাটিনে অনুবাদ করেন। সে যুগে উচ্চশিক্ষা গবেষণা ও অধ্যাপনা প্রধানতঃ ধর্মযাজকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। আধুনিক ক্যালকুলাসের জনক মহামনীষী জর্মান অধ্যাপক লাইব্‌নিৎস্‌ ও ইংরাজ স্যার আইজাক নিউটন প্রাচীন ল্যাটিন গ্রন্থের মধ্যে এই ক্যালকুলাসের সন্ধান পান। আজকের ক্যালকুলাস গণিত প্রধানতঃ এই দুই ঋষির গবেষণার দান।

(আমার নাম পান্নু, বয়স বারো বছর। বাস থেকে পড়ে গিয়ে আমার শিরদাঁড়া জখম হয়ে গিয়েছে বলে হাঁটতে পারি না, একটা ছোট গাড়ি চড়ে বাড়ির মধ্যে ঘুরে বেড়াই আর তেতলার জানালা দিয়ে চারিদিকে দেখি। ভজুদা বলেন—হাঁটতে চেষ্টা কর!

ভজুদা সকালে আমাকে তিন ঘণ্টা পড়ান, আমি বাড়িতে বসেই বার্ষিক পরীক্ষা পাশ করেছি।

বড় মাস্টার প্রতি রবিবারে আমাকে গল্প বলতে আসেন। গুপি আমার বন্ধু, সেও গল্প শোনে।

তিনি লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা করেছেন, সারা পৃথিবী ঘুরে সাংঘাতিক, রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। ঝড়ের মধ্যে জাহাজডুবি হয়েছিল, হাঙরে একটা পা কামড়ে টেনে নিয়েছিল, এখন কাঠের পা। অগ্নিকাণ্ডে বৌ-এর মুখ পুড়ে গিয়েছিল। এখন সব ছেড়ে ছুড়ে সামান্য টাকায় আমাদের বাড়ির পাশের ছাপাখানার প্রুফ দেখেন আর নাইট স্কুল চালান। তাঁর নতুন এসিস্টান্ট তল্পাপত্র আমাদের বাড়ি এসেছিলেন।

গুপি তার ছোট মামার কাছ থেকে নানা বই আনে, মঙ্গলের মানুষ, চন্দ্রনাথের চন্দ্রযাত্রা—এই সব। আমরা ঠিক করেছি বড় হয়ে চাঁদে যাব। গুপির ছোটমামা মহাকাশ-যান বানাবে।

ভজুদাদের কলেজের প্রিন্সিপ্যালের নতুন গাড়ি চুরি হয়ে গেছে মেজোকাকুর গাড়িও। আজকাল হরদম গাড়ি চুরি হচ্ছে। কিন্তু এবার বিখ্যাত গোয়েন্দা কানু সামন্ত তাঁর দলবল নিয়ে আসরে নেমেছেন। মোটর চোরদের ঘাঁটিশুদ্ধ নাকি তাঁরা বের করে দেবেন।)

চার

তার পরের রবিবারে গুপি এসেই বলল, 'একটা মুস্কিল হচ্ছে স্পেসস্টেশনটাকে নিয়ে। ছোটমামা বলছে নাকি মাধ্যাকর্ষণের এলাকা ছাড়বামাত্র ওটাকে তিন সেকেণ্ডে একবার করে পাক খেতে হবে। নইলে ধপাস্ করে

পড়ে যাবে। তা হলে তো জিনিসপত্র ভেঙেচুরে মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি খেয়ে একাকার। মহাকাশযানগুলোই বা সারানো হবে কি করে?' আমি আঁৎকে উঠলাম।

'এ্যাঁ, তা হলে আমাদের বাতাসের বোতলের ব্যবসার কি হবে?' গুপি বিরক্ত হয়ে বলল, 'এই বিদ্যে নিয়ে হয়েছে তোর চন্দ্রযাত্রা! বাতাসের বোতল প্যাৎলা প্ল্যাস্টিকের হবে, তাও জানিস না? কাঁচ তো বেজায় ভারি। কিন্তু মিনিটে কুড়িবার ঘোরালে বাতাস থেকে মাখন-টাখন না উঠলে বাঁচা যায়। ছোটমামা এই নিয়ে এত বেশি ভাবছে যে এবারও পরীক্ষায় কি হয় কে জানে।'

ছোট মাস্টার সেদিন আগেই এসেছিলেন। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ধনে পাতা চিবুচ্ছিলেন আর তেওয়ারির দোকানের বুড়িকে অবাক হয়ে দেখছিলেন। এবার তিনি হঠাৎ পকেট থেকে সবুজ মলাটের একটা বই বের করে বললেন, 'ছোটমামাকে ভাবতে বারণ কর। বরং পড়াশুনো করুক। এই বইতে লেখা আছে কি করে কলকজার সাহায্যে বাইরের খোলটা পাক খাবে, অথচ ভিতরকার জিনিসপত্র শূন্যে ঝুলে থাকবে, এতটুকু নড়বে না। এই দেখ ছবি, এই লোকগুলো সাতঘণ্টা পাক খেয়েছে, মাখন-টাখন কিচ্ছু ওঠে নি।'

গুপি আমার দিকে ফিরে বলল, 'ও কি, তোর চোখ লাল কেন?'

রামকানাই মাছের কচুরি এনেছিল। আমার গোল টেবিলে সেগুলোকে নামিয়ে রেখে, ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছেড়ে বলল, 'লাল হবে না তো কি। দুদিন ধরে পাতি বেড়ালের শোকে কান্নাকাটি হয়েছে যে।'

তাই শুনে গুপি আর ছোট মাস্টার দুজনেই অবাক। সে কি নেপোর সাংঘাতিক কিছু হয়েছে নাকি? রামকানাই বলল, 'হবে আবার কি! পেয়ারের বেড়াল হাওয়া। আজ তিন দিন সে বাড়ি আসে নি।'

ছোট মাস্টার বললেন, 'গেল কোথায়?' শুনে রামকানাইয়ের কি হাসি! 'গেছে কার বাড়ির পাত-কুড়ুনি খেতে।' ভারি রাগ হল। চেঁচিয়ে বললাম, 'মোটেই না। নেপো কারো পাতকুড়ুনি খায় না। বিদ্‌ঘুটে ওকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে।'

ছোটমাস্টার বললেন, 'বিদ্‌ঘুটে আবার কে?' আমি কিছু বলার আগেই রামকানাই সর্দারি করে বলল, 'ঐ যে নটে-কান কেঁদো হুলো। তাছাড়া আবার কে। শুধু কি ডাস্ট-বিন ঘেঁটে ওর অমন গতর হয়েছে নাকি? গোলগাল বেড়াল দেখলেই তাকে ভুলিয়ে অন্ধকার গলিতে নিয়ে গিয়ে কপ্‌। নেপো হতভাগাকে পই-পই করে মানা করেছি, ওর সঙ্গে মিশিস্‌ নে, তা কে কার কথা শোনে। এখন বোঝ ঠ্যালা! কোথায় ঠ্যাং ছড়িয়ে—' রামকানাই চুপ করল।

আমি বললাম, 'এই পাড়া থেকে গত ছয় মাসে একত্রিশটা বেড়াল নিখোঁজ। কালো মেমের হলদে ট্যাবি পর্যন্ত। বিদ্‌ঘুটে কিন্তু অত বেড়াল খায় নি। আর খাবেই যদি তো আমার নতুন খাতা নিয়ে গেছে কেন?'

ছোটমাস্টার বললেন, 'কানু সামন্তকে বললে হয় না? যে চোরাই গাড়ি খুঁজে দেবে, সে একটা সামান্য বেড়াল খুঁজে দিতে পারবে না?' এ কথা আমার আগে মনে হয় নি। গুপি বলল, 'আমার ছোটমামাকেও বললে হয়, তার খুব বুদ্ধি। সে বলেছে চাঁদে মাটি নিয়ে যেতে হবে। ওখানকার মাটিতে ফসল হবে না। তাছাড়া কেঁচোও নিয়ে যেতে হবে। তারা তলার মাটি উপরে তোলে। তাহলে ভারি ভারি ট্র্যাক্টর নিতে হবে না।।'

বড়মাস্টার ঠিক সেই সময় এসে ঘরে ঢুকলেন। বড় দেরি হয়ে গেল, পানু। ঐ রাখেশ আর বকু ভূতের ভয়ে আজ কিছুতেই বাড়ি থেকে বেরুবে না! শেষ পর্যন্ত নিজে গিয়ে টেনে বের করে আনতে হল।

নাকি মোড়ের ঐ কোম্পানির আমোলের গুদোম বাড়ির দেয়াল থেকে ভূত নামতে অনেকে দেখেছে। সাহেব মেম ভূত। সেজেগুজে, নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে চলে যায়, কারো দিকে তাকায় না।'

গুপি বলল, 'কিছু বলে না তো ওরা ভয় পায় কেন?'

বড় মাস্টার বললেন, 'সে কথা কে বলে!'

ছোট মাস্টার বললেন, 'পানুর অমন ভালো বেড়ালটাকে পাওয়া যাচ্ছে না।' 'তাই নাকি? রামকানাইকে দিয়ে পাড়া খোঁজাও। ঐ চীনে হোটেলের পেছনে ঠাণ্ডাঘরের কাঠের সিঁড়িতে রোজ রাতে বেড়ালদের সভা বসে আমি নিজের চোখে দেখেছি। তাদের মধ্যে নেপো আছে কি না একবার দেখে আসুক।'

রামকানাই ঝুরিভাজা এনেছিল। সে বললে, সে কি আর বাকি রেখেছি, মাস্টারবাবু। সিঁড়িতে থিক্‌থিক্‌ করছে বেড়াল; কোন সময় হোটেল থেকে চিংড়িমাছের খোলা বাইরে পড়ে সেই আশাতেই বসে আছে। কিন্তু তার মধ্যে নেপো নেই। তিনি কাঁটা কি খোলা খান না। পানুদাদা মাছ বেছে দিলে তবে তিনি মুখে তোলেন।'

বড় মাস্টার চেয়ারে বসে বললেন, 'খায় না আবার! তেমন অবস্থায় পড়লে, না খায় এমন জিনিস থাকে না। একবার আমরা বড় বোট নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের ছোট ছোট দ্বীপে গুয়ানো খুঁজছিলাম। সমুদ্রের পাখিদের ময়লা জমে থাকে, তাকেই গুয়ানো বলে, বাজারে চড়া দামে বিক্রি হয়।

একটা ছোট্ট দ্বীপে উঠেছি, সমুদ্রের তীরে অনেকটা বালি, দ্বীপটা কিন্তু পাথরে তৈরি, ওপরটা চ্যাপ্টা, পাথরের খাঁজে খাঁজে যেখানে মাটি একটু পুরু, সেখানেই বেঁটে বেঁটে গাছপালা, ঝরণাও আছে নিশ্চয়। ভাবলাম এখানে নোঙর করে দুদিন বিশ্রাম করা যাবে। দেখে মনে হল মাছের আর পাখির ডিমের অভাব হবে না। নৌকোর ক্যাপ্টেন আর আমি আর আমার পোষা বেড়াল 'ম্যাও' আগে নামলাম। আমরা দেখে এলে অন্যেরা নামবে।

তবে অনেকেরি খুব রাগ, 'ম্যাও' নামছে অথচ তাদের অপেক্ষা করতে হচ্ছে? যাই হক, আমরা বালি পেরিয়ে হাঁচড় পাঁচড় করে দ্বীপের পাথুরে গা বেয়ে উঠতে লাগলাম। দেখতে দেখতে নৌকো আমাদের চোখের আড়াল হয়ে গেল।

আগে আগে ক্যাপ্টেন, তার পর আমি, আমার কাঁধে ম্যাও বসে। ক্যাপ্টেন বলল, দ্বীপটা যেন একটু অদ্ভুত ঠেকছে। পাখির ডাক নেই কেন?' সত্যি, এমন চুপচাপ দ্বীপ কখনো দেখি নি। সমুদ্রের শব্দ ছাড়া কিছু শোনা যায় না। গুয়ানো ছেড়ে দিলাম, একটা জন্তুজানোয়ার বা পাখি, কিছু দেখতে পেলাম না। তার উপর ম্যাও ঘাড়ের লোম ফুলিয়ে কেবলি রেগে গর-গর করতে লাগল।

যাকে গাছগাছড়া ভেবেছিলাম তাও দেখলাম কাঁটাঝোপ ছাড়া কিছু নয়। অনেক খুঁজে ছোট্ট একটা ঝরণা পেলাম। আরেকটু রোদ উঠলে কি সাংঘাতিক গরম হবে ভেবে তাড়াতাড়ি পাথর বেয়ে নামতে লাগলাম। ঐ ন্যাড়া পাথর তেতে উঠলেই হয়েছে আর কি! খানিকটা পথ বাকি থাকতে অবাক্‌ হয়ে চেয়ে দেখি সমুদ্রের তীর চাঁছাপোঁছা, দূরে জলের উপর একটা কালো দাগ, ক্রমে ছোট হতে হতে শেষটা মিলিয়ে গেল। নাবিকদের নামতে দেওয়া হয় নি বলে তারা রেগেমেগে আমাদের ফেলে চলে গেছে।

হতাশ হয়ে যে যেখানে ছিলাম, বসে পড়লাম। অমনি ম্যাও এক লাফে আমার ঘাড় থেকে নেমে, রেগে তিনগুণ বড় হয়ে গর-র গর-র করতে লাগল। দেখি পাশেই একটা গুহার মুখ।

রোদ থেকে আশ্রয়ের আশায় ঢুকে পড়লাম তার ভিতর। খানিকদূর গিয়ে দেখি ঘুটঘুটে অন্ধকারে এখানে

ওখানে জোড়া জোড়া সবুজ চোখ জলছে। টর্চের আলো ফেলে দেখি পাথরের থাকে থাকে বেড়াল। কালো, হলদে, সাদা, ছাই, পাটকিলে। বোধ হয় ম্যাওকে দেখেই, তারা সব উঠে দাঁড়িয়ে, চার পা এক জায়গায় জড়ো করে, পিঠ কুলোর মতো বাঁকিয়ে, পাথরের উপর নখ ঘষতে লাগল। তার খড় খড় শব্দে আমাদের গায়ে কাঁটা দিল। ম্যাও একেবারে কাঠ!

কোনোমতে হোঁচট খেতে খেতে পড়িমরি করে গুহা থেকে বেরিয়ে বাঁচলাম। অবাক হয়ে দেখি আমাদের নৌকো আবার ফিরে আসছে। আমরা নিচে পৌঁছবার আগেই ম্যাও গিয়ে নৌকোয় উঠে পাটাতনের তলায় গুটিগুটি হয়ে বসে পড়ল। বেড়ালের খাদ্যের কথাই যদি বল, ঐ দ্বীপে তারা খেত কি? পাখি নেই, প্রাণী নেই, গাছপালা নেই। হয়তো পরস্পরকেই—'

ছোটমাস্টার বললেন, 'না, না, নিশ্চয় সমুদ্রের মাছ ধরে খেত। ঢেউয়ের সঙ্গে যে-সব ঝিনুক, শামুক, তারা-মাছ, সমুদ্রের ঘোড়া, জেলিফিস্ এসে বালির উপর পড়ে, তাও খেত।'

বড় মাস্টার বললেন, 'পরে শুনেছিলাম এক জাহাজের ক্যাপ্টেনের দুটো বেড়াল ছিল। তাদের উৎপাতে টেকা দায় হয়ে উঠেছিল বলে নাবিকরা লুকিয়ে ওদের ওখানে ফেলে দিয়ে গেছিল। ওরা নাকি টিনের মাছ ছাড়া কিছু খেত না। এদিকে নাবিকরা শুকনো মাংস পেত।'

ঠিক এই সময় ঠাণ্ডাঘরের দিক থেকে খুব জোরে কতকগুলো ঠক-ঠক শব্দ, তার পরেই এমনি ঝন্‌ঝন্ যে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। বড় মাস্টার ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লেন। কি জানি ওঁর বাড়িতেই কিছু হল না তো। পঙ্গু বৌ একলা আছে।

ছোট মাস্টার বললেন বরফ ফাটলে ঐ রকম শব্দ হয়। রাখেশ আর তার বন্ধুরা বলছিল যে ঘর এত বেশি ঠাণ্ডা করে ফেলেছে যে কয়েকটা পেঙ্গুইন পাখি দেখা দিয়েছে।' গুপি বলল. 'ওরা তো ভূতও দেখে।'

সেদিন সবাই একটু তাড়াতাড়ি চলে গেল। রামকানাই ঘরে এসে বলল, 'তিনজনে এসে পঁচিশটা কচুরি সাঁটাল, অথচ বেড়ালের একটা গতি করতে পারল না। আমার কিন্তু বুড়ি মেমকেই সন্দেহ হয়।'

আমি বললাম, 'ওর বেড়াল-ও তো গেছে। তুমি সবাইকে সন্দেহ কর।'

'সবাইকে সন্দেহ না করেই বা করি কি। তুমি তো তেওয়ারির দুঃখে গলে যাও। আহা, বেচারা, রোদে বৃষ্টিতে চাটাইয়ের ছাউনির নিচে বসে চা জলখাবার তৈরি করে আর বিক্রি করে। রাতে শোবার একটা ভালো জায়গা পায় না, হেনা তেনা কত কি বল। জান ঐ চারতলা ঠাণ্ডা ঘরটার মালিক কে? ঐ তেওয়ারি ছাড়া আর কেউ নয়। তোমার বাবাকে তেওয়ারি কিনে ফেলতে পারে, তা জান?'

ভীষণ রেগে গিয়ে গড়গড় করে গাড়িটা চালিয়ে জানলার কাছে গেলাম। দেখলাম বুড়ি ভিকিরি তেওয়ারির সঙ্গে কি নিয়ে ঝগড়া করছে। রামকানাই-ও জানলার ধারে এসে বলল, 'ঐ আরেক জন। আমার হাতে দিয়ে ওর জন্যে কত পয়সাই না পাঠিয়েছ তুমি। তোমার মার কাছ থেকে চেয়ে খদ্দরের চাদর পর্যন্ত ওকে দিয়ে আসতে হয়েছে। আর তেওয়ারি তো প্রত্যেক দিন সন্ধ্যেবেলায় দোকান বন্ধ করার আগে, শালপাতার ঠোঙা ভরে ওকে ঝড়তিপড়তি খাবার দেয়। তাই নিয়েই আবার ঝগড়া করে বুড়ি। আর ঐ যে মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে একটা বুড়ো ভিক্ষে করে, চোখে দেখে না। মুখে কথা নেই, শুধু হাতটা পেতে দেয়। ওকে দেখে সকলের দয়া হয়, সবাই পয়সা দেয়। দুজনার তফাৎটা দেখেছ তো?'

আমি বললাম, 'তা দেখেছি। তাই বলে ঝগড়াটে বুড়িকে চাদর দেব না কেন? ওর-ও তো ঠাণ্ডা লাগে।'

রামকানাই বলল—'তা লাগে বৈকি। তাছাড়া দুজনে একলোক। শুনে আমি হাঁ।

ক্রমশঃ

বন্‌বন্ করে বিজলীপাখা ঘুরছে, ভন্‌ভন্ করে একটা গুবরেপোকা উড়ছে। হঠাৎ ঠকাস্ করে পাখার ঠোক্কর লাগল, ধপাস্ করে পোকাটা মাটিতে পড়ল।

মাথাটা ঝন্‌ঝন্ করছে, পিঠটা টন্‌টন্ করছে, চিৎপাত হয়ে গুব্‌রেপোকা শুধু পা ছুঁড়ছে আর শুঁড় নাড়ছে—কিছুতেই সোজা হতে পারছে না।

দুটো পিঁপড়ে সেখানে ঘুরছিল, ছুট্টে গিয়ে বাসায় খবর দিল—অমনি একদল পিঁপড়ে এসে হাজির!

ছয়টা মোটা ডেঁয়ো পিঁপড়ে গুবরের ছয় পা কামড়িয়ে ধরল, দুজনে দুটো শুঁড় ধরল, আর যে যেখানে পারে কাঁধ লাগাল, তারপর—"মারো ঠেলা, হেঁইয়ো!"—ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে বেচারাকে ওরা বাসায় নিয়ে চল্‌ল।

অসহায় গুব্‌রেকে দেখে রানুমিনুর দুঃখ হ'ল, দুটো কাঠি নিয়ে দুইবোনে পিঁপড়ে ছাড়াতে বসল। সহজে কি ছাড়ে? অনেক কষ্টে সবগুলো ছাড়ান হ'লে, পোকাটা কাঠি আঁক্‌ড়িয়ে সোজা হয়ে বসল।

পিঁপড়েরা ভীষণ রেগেছে, কিছুতেই ছাড়বেনা—আবার তখনি তারা গুব্‌রেকে ঘিরে ফেলল—এই বুঝি ধরল!

হঠাৎ গুব্‌রের পিঠের খোলাটা দু-ফাঁক্ হ'ল, ভিতর থেকে একজোড়া ডানা বেরোল—ফু-ড়ু-ৎ করে সে উড়ে পালাল—পিঁপ্‌ড়েরা হাঁকরে চেয়ে রইল।

ছোটদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

ষাণ্মাসিক সূচীপত্র

অষ্টম বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড

কার্ত্তিক—চৈত্র ১৩৭৫ | নভেম্বর ১৯৬৮—এপ্রিল ১৯৬৯

অপূর্ব সর্প দর্শন (সত্য ঘটনা) যোগেশ চন্দ্র মজুমদার	৬৫২
আম-চোর (ছোট্টদের জন্য ছোট্ট গল্প) পুণ্যলতা চক্রবর্তী	৭৫৬
আম যদি নাই খাস (কবিতা) ঝুমুর চৌধুরী	৭৩৫
আমাদের দেশ (ভ্রমণ কাহিনী) সুবোধ কুমার চক্রবর্তী	৫২৪, ৬০৩, ৬৬৩
আমেদ মুচি (পারস্য দেশের গল্প) প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত	৭৬০, ৭৭৬
আরোগ্য (গল্প) নীহার বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৩১
উড়নচণ্ডী যুবকদের গল্প (ব্রহ্মদেশের উপকথা) প্রদোষ চন্দ্র রায় চৌধুরী	৪৬৬
উত্তুরে হাওয়া (গল্প) অসীম বর্ধন	৫১১
এ-ও-সে-তা (গল্প) গৌরী ধর্মপাল (চৌধুরী)	৭২৪
একটি গাছ (কবিতা) অশোক ভট্টাচার্য	৬৮০
এম্ এম্ লাওস (ভ্রমণ কাহিনী) সুনীল রঞ্জন দত্ত	৫১৪
কিষ্কিন্ধ্যা থেকেএল স্কন্ধ কাটা (কবিতা) ঝুমুর চৌধুরী	৬৬২
কুট্টী পিসি (কবিতা) চুনী দাশ	৭৩৯
কৃষকের পুজা (গল্প) নির্মল চক্রবর্তী	৫৫২
ক্রীড়া জগৎ—অজয় হোম	৫০৭, ৫৬১, ৬২৪, ৬৭৭, ৭৪০, ৭৯০
গাছে গাছে যদি ডিম ধরে (কবিতা) ঝুমুর চৌধুরী	৪৭৪
গুবরে ও পিঁপড়ে—(ছোট্ট গল্প) পুণ্যলতা চক্রবর্তী	৮২১
ঘুড়ি (কবিতা) সান্ত্বনা ঘোষ	৫০২
ঘুড়ির জবানী (কবিতা) মসা ভট্টাচার্য	৫০১

চিঠিপত্র ৫০৩, ৫৭৪, ৬৩১, ৬৮১, ৭৫৩, ৮১৫
চাঁদের হাট (ছোটদের জন্য ছোট্ট কবিতা) অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫৭৩
ছড়া—অতীন মজুমদার ৬০২
ছবি (কবিতা) সত্যানন্দ মণ্ডল ৪৯০
ছোট্ট খুকুর খেলা ঘরে (কবিতা) শৈলেন দত্ত ৭৮৯
ছোটদের জন্য ফিল্ম তোলা (গল্প) ভি পত্তানকভ ৫২০
জেনে রেখো (কবিতা) প্রীতি ভূষণ চাকী ৭২৩
টুনটুনি (কবিতা) কমল গুপ্ত ৮২০
টুটুল কোথায় (কবিতা) প্রভাকর মাঝি ৪৬৫
ঠোঁট কাটা (কবিতা) প্রভাকর মাঝি ৫৬৬
ডাকটিকিটের মজার মজার গল্প (সত্য ঘটনা) শুভঙ্কর ঘোষ ৫১৭
ডারলিং পুরস্কার (বিজ্ঞানের আসর) চুনীলাল রায় ৭২৬
তখন মাছেরা কথা বলত (জার্মান উপকথা) উৎপল চক্রবর্ত্তী ৬১৫
তিনটি প্রশ্ন (গল্প) লিও টলস্টয় : অনুবাদ—অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ৭১১
তেকলের ছাগল (ইথিওপিয়ার গল্প) দেবব্রত ঘোষ ৭৭২
থিসিউস (গ্রীক পুরাণের গল্প) অরুণ সেন ৫৯৬
দুটি ছড়া (ছড়া) চম্পক কুমার দাস ৭১০
দুই শেয়াল (গল্প) গৌরী ধর্মপাল (চৌধুরী) ৭৯৯
ধাঁধা ৫১০, ৫৭৭, ৬৩৩, ৬৯৬, ৬৫৭, ৮১৮
নেপোর বই (উপন্যাস)—লীলা মজুমদার ৪৮৯, ৫৪৫, ৬১৯, ৬৭১, ৭২৯, ৭৮৪
নোবেল পুরস্কার ও বার্থাভন সাটনার (জীবনী) রমা মজুমদার ৬৫৬
প্রকৃতি পড়ুয়া—জীবন সর্দার ৪৮৬, ৫৬৫, ৬২৭, ৬৮২, ৭৪০, ৮০৫
প্রগতি (কবিতা) সুখলতা রাও ৬৪১
প্রথম চন্দ্রযাত্রা (খবর) অমিতানন্দ দাশ ৬৯৯
প্রেমের জয় (গল্প) ময়ূখ দত্ত ৪৮২
প্রোফেসর শঙ্কু ও কোচবাম্বার গুহা (উপন্যাস) সত্যজিৎ রায় ৭০২, ৭৯৩
ফুলহারা (কবিতা) শুক্লা চক্রবর্তী ৪৭৮
ফুলের ছড়া (কবিতা) সুধীর কাব্যশ্রী ৪৮১
বলতে পারো ? (কবিতা) শৈলশেখর মিত্র ৬২৩
বিচার (কবিতা) অতীন মজুমদার ৭৬৩
বিজ্ঞানজননী মাদাম কুরি (বিজ্ঞানের আসর) তরুণ কুমার রায় ৪৭৯
বিদেশবাসী নাতি আর নাতনীকে ঠাকুরদার চিঠি (কবিতা) সুলতা সেনগুপ্ত ৫৮১
মরু অভিযান (ভ্রমণ কাহিনী) দ্বিজেন গুহ বক্সী ৪৭০
মাছি (কবিতা) দীপকরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (বহুব্রীহি) ৫৯৫

মানুষ না উটপাখি ? (সত্য ঘটনা) বিশ্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৫৮
মাইথন ড্যাম (কবিতা) চন্দ্রশেখর গোস্বামী ৮০৭
মেয়েটির নাম ফ্র্যাঙ্কি (সত্য ঘটনা) বন্দনা গুপ্ত ৬৬৯
মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ৬১৮
ম্যারাকট দ্বীপ (উপন্যাস) স্যার আর্থার কনান ডয়েল
অনুবাদ : জ্যোতিরিন্দ্র মোহন জোয়াদ্দার ৫৮২, ৬৪২, ৭১৪, ৮০৮
যাত্রা (কবিতা) বিবেকানন্দ সেনগুপ্ত ৬৬৪
যে বুড়ো দাঁড়িয়ে থাকে আর কান পেতে শোনে
(এস্কিমোদের উপকথা) মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ ৫৪১
যেমন কাজ তেমনি সাজা (গল্প) গৌরী বালা সেন ৪৭৫
যুক্তির যাদু (প্রবন্ধ) মণীন্দ্রনাথ দাস ৫৫০
রতন পেতে হলে (লাওসের উপকথা) সঞ্জীব কুমার নন্দী ৬১০
রাখাল ছেলে (কবিতা) সুশীলকৃষ্ণ সেনগুপ্ত ৭৭৫
রাজা আর রানী (ছোট্টদের জন্য ছোট্ট গল্প) পুণ্যলতা চক্রবর্তী ৬১৮
রাজার পরীক্ষা (কবিতা) রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ৫৫৪
রামমোহনের ছোটবেলা (জীবনী) স্বপন বুড়ো ৫৯১
রেডিও টেলিফোন ও মহাকাশ (বিজ্ঞানের আসর) অমিতানন্দ দাশ ৫৬৮
শীত আসে (কবিতা) প্রভাকর মাঝি ৫১৯
শেয়াল পণ্ডিত (কবিতা) চণ্ডী রায় ৫২৩
শেয়াল পণ্ডিতের পাঠশালা (নাটিকা) প্রদীপকুমার রায় ৭২৩, ৭৬৭
সবার চেয়ে (কবিতা) শিমূল রায় ৫৩০
সংকল্প (কবিতা) সুকৃতি রায় চৌধুরী ৫০৯
সাপ মানুষের শত্রু ও বন্ধু (বিজ্ঞানের আসর) প্রোফেসর এম্‌ পিগুলেভ্‌স্কি ৬৫৯
সাহিত্যিকের অন্তর্দৃষ্টি (সত্য ঘটনা) ভাগবত দাস বরাট ৬৬৭
সাত বৌ (ছোট্টদের জন্য ছোট্ট গল্প) পুণ্যলতা চক্রবর্তী ৬৮৫
সিঙ্গাপুরে যে ম্যাজিক দেখেছি (ম্যাজিক) যাদুকর এ. সি. সরকার ৭৮৩
সীয়ারাম (গল্প) নির্মলেন্দু গৌতম ৭৬৪
সোনার দোলা (তেলগু ছড়া) সুকমল দাশগুপ্ত ৬১৩
হাতপাকাবার আসর ৪৯৫, ৫৫৫, ৬৩৬, ৬৮৬, ৭৪৬, ৮০০
হিংসুটে (কবিতা) অমিয় কৃষ্ণ রায়চৌধুরী ৪৮৪

চক্র-ক্রিকেট !

একজন শুধু দেয় বল,
একজন ব্যাট দিয়ে মারে,
এরকম ক্রিকেটে কি ফল—
জমে নাক খেলা একেবারে !

মোর হাতে দিত যদি ভার,
সাজাতাম মাঠ গোল করে—
একসাথে দশটি 'বোলার'
দশ দিকে বল দিত জোরে !

অষ্টম বর্ষ—সপ্তম সংখ্যা কার্ত্তিক ১৩৭৫/নভেম্বর ১৯৬৮

টুটুল কোথায় ?

প্রভাকর মাঝি

ব্যস্ত সবাই, টুটুলমণির পরীক্ষা যে আজ !
হৈ হৈ ব্যাপার, সকাল থেকে বিয়ে বাড়ির সাজ ।
কাগজপড়া ফেলে বাবা বাজার ছুটেছেন,
তিন রকমের কালি ভরা তিনটে করে পেন ।
ক্লাস ওয়ানে পড়ছে টুটুল অর্থাৎ সুব্রতা ।
আজই প্রথম পরীক্ষা তার···চাট্টি খানি কথা ?
মা ভোলাকে তাগাদা দেন—সাড়ে আটটা বাজে,
লক্ষ্মীছাড়া, এখনও দই আনতে গেলি না যে ।
না—আজকে ডিম হবে না, ডিম পাবে ডিম খেলে,—
বামুন-মা আজ ডিমের কথা তুললে কি আক্কেলে ?
কোথায় জামা মোজা, জুতো, কুঙ্কুম টিপ, ফিতে,
ক্ষ্যান্তি তোকে বলেছিলাম গুছিয়ে রেখে দিতে ।
এই গুছানো ?   দিদিমণির পরীক্ষাটা হোক—
তাতেই বাগড়া পড়ে, বাপু, যায় না দেবো চোখ ।
টেবিলে সব সাজিয়ে রেখেছিস তো রে রামদিনু,
তিনটে কলম, পেনসিল, নিব, রবার ও আলপিন ?
তুলে দিয়েছিস গাড়িতে তো টিফিন ক্যারিয়ার ?
ভয় কিছু নেই—আচ্ছা টুটুল তৈরী হও এইবার ।
টুটুল কোথায় ? মিললো হদিস অনেক খোঁজার পরে,
মেয়ে তখন খুকুর বিয়ে দিচ্ছে খেলাঘরে ।

[ব্রহ্মদেশের রূপকথা]

ব্রহ্মদেশের কোন এক গ্রামে চারজন অপদার্থ ভবঘুরে যুবক ছিল। তাদের মধ্যে খুব ভাব। চারজনই বড়লোকের উড়নচণ্ডী বেকার ছেলে। তারা দামী পোষাক ও গহনা পরে গ্রামের মধ্যে যেখানে সেখানে আড্ডা দিয়ে বেড়াত আর লোকজনকে অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য গল্প বলে তাক লাগিয়ে দিত। বড় বড় সভাসমিতি বা অনুষ্ঠানে তাদের খুব আদরের সঙ্গে নিমন্ত্রণ করা হত কারণ তাদের অদ্ভুত গল্প শুনে সে সব অবিশ্বাস্য জেনেও সকলে আমোদ পেত।

একদিন সকালে চার বন্ধু গ্রামের বড় সরাইখানার সামনে বেড়াতে যাবার সময়ে সেখানে সুন্দর পোষাক পরা এক যুবককে বসে থাকতে দেখল। দেখেই বোঝা গেল যে যুবক নিশ্চয়ই খুব ধনী। চার বন্ধু তার সুন্দর ও দামী সিল্কের পোষাক ও মূল্যবান গহনা দেখে খুব অবাক হয়ে গেল। নিজেদের মধ্যে তার সম্বন্ধে কথা বলতে বলতে তাদের ভীষণ হিংসা হল। কিছুক্ষণ পরামর্শ করে তারা সেই সুন্দর পোষাক ও দামী গহনাগুলো চালাকি করে ফাঁকি দিয়ে কেড়ে নেবার মতলব করল। তারা ঠিক করল তাদের অদ্ভুত অবিশ্বাস্য গল্প দিয়ে যুবককে বোকা বানিয়ে পোষাক ও গহনা আদায় করবে!

চার বন্ধু সরাইখানাতে গিয়ে যুবকটির সঙ্গে আলাপ করে নানারকমের গল্প করতে লাগল। কিছুক্ষণ গল্প করার পর এক বন্ধু বলল, 'এই রকম গল্প করতে বেশ লাগে। আচ্ছা আমরা একে একে আমাদের জীবনের সব চেয়ে অদ্ভুত ঘটনার গল্প বলি।' দ্বিতীয় বন্ধু প্রস্তাব করল, 'কেউই কিন্তু সেই ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে পারবে না।' তৃতীয় জন একটু টিপ্পনি কেটে বলল, 'যদি কেউ গল্পের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করে তবে তাকে গল্প-বলিয়ের দাস হতে হবে।' চতুর্থ বন্ধু বলল, 'এতে আমরা সবাই একমত। আমাদের নতুন বন্ধু আপনি কি বলেন?' একটু দ্বিধা না করে যুবক উত্তর করল, 'নিশ্চয়ই, এ বিষয়ে আমরা পাঁচ বন্ধু একমত।'

যুবকের কথা শুনে চার বন্ধু খুব অবাক হয়ে এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে

লাগল। তারা ভাবল লোকটা নিশ্চয়ই খুব বোকা। তার বোকামির শাস্তি খুব শীঘ্রই পাবে। অবিশ্বাস্য গল্প শুনে সে নিশ্চয়ই একবার বলে উঠবে যে গল্পটা সত্যি হতে পারে না। অমনি তাকে গল্প-বলিয়ের দাস হতে হবে। আর তার পরনের পোষাক ও গহনা, টাকাকড়ি সব দিয়ে দিতে হবে।

প্রথম বন্ধু বলল, 'তাহলে আমাদের একজন বিচারক ঠিক করতে হবে যিনি বিচার করে কে হেরে গেছে বলবেন।' এই বলে সে তাড়াতাড়ি গ্রামের প্রধানকে ডেকে আনতে ছুটল। তিনি এলে তাঁকে সব বুঝিয়ে বলা হোল যে পাঁচজনে একটা একটা গল্প বলবে। কেউ যদি সেই গল্পের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে তাহলে সে গল্প বলিয়ের দাস হবে। তার সমস্ত সম্পত্তি গল্প বলিয়ের হবে। প্রধান প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল যে ঐ প্রস্তাবে পাঁচজনই রাজী।

প্রথম বন্ধু তার জীবনের সব চেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা বলতে আরম্ভ করল, 'আমি যখন মার পেটে ছিলাম সে সময়ে একদিন মার কুল খেতে খুব ইচ্ছা হল। তিনি বাবাকে ডেকে বাড়ির সামনের কুলগাছ থেকে কুল পেড়ে আনতে বললেন। বাবা জানালেন যে গাছটা এত উঁচু যে তিনি চড়তে পারবেন না। মা তখন দাদাদের কুল পেড়ে আনতে অনুরোধ জানালে তারাও সেই একই ওজর দিল। কুল খেতে না পারলে মার মন খুব খারাপ হবে বলে আমার খুব দুঃখ হল। আমি টপ্ করে মার পেট থেকে বেরিয়ে গাছে চড়ে পড়লাম। অনেক কুল পেড়ে জামার পকেটে রাখলাম। তারপর গাছ থেকে নেমে রান্নাঘরের টেবিলে কুলে পকেট ভরা জামাটা রেখে আবার মায়ের পেটে ঢুকে পড়লাম। বাড়ি শুদ্ধ কেউই জানল না কুলগুলো কি ভাবে এল। মা মনের সাধে কুল খেলেন। বাড়ির লোকদের ও পাড়াপড়শীদের প্রত্যেককে দশটা করে কুল দেবার পরেও এত ছিল যে আমাদের বাড়ির সামনে স্তূপ করে রাখা ছিল—রাস্তা থেকে দরজা দেখা যাচ্ছিল না।' এই বলে সে তাদের নতুন বন্ধুর দিকে তাকালো। ভাবল সে কোনও সন্দেহ জানায় কিনা। সেই যুবক শুধু মাথা নেড়ে জানাল যে সে গল্পটা বিশ্বাস করেছে। অন্য তিন বন্ধুও মাথা নোয়াল।

তখন দ্বিতীয় বন্ধু গল্প বলতে আরম্ভ করল, 'আমার বয়স যখন মাত্র এক সপ্তাহ, তখন এক বিকেলে একাই বেড়াতে বের হলাম। জঙ্গলের কাছে গিয়ে একটা মস্ত বড় তেঁতুল গাছ দেখতে পেলাম। গাছে গোছা গোছা পাকা ফল ঝুলছে দেখে খাবার লোভ হলো। তাড়াতাড়ি গাছে চড়ে মনের সাধে তেঁতুল খেলাম। পেট ভরে তেঁতুল খাওয়াতে খুব ঘুম পেল। একটা ডালে ভাল করে বসে ঘুম দিলাম। কয়েক ঘণ্টার পর গাছ থেকে নামতে গিয়ে দেখি পারছি না। পেট ও পা ভার হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি গ্রামে গিয়ে একটা সিঁড়ি খুঁজে নিয়ে আসা ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। ভাগ্যক্রমে শীঘ্রই একটা সিঁড়ি পেয়ে গেলাম। সেটা এনে গাছে লাগালাম। তারপর সিঁড়ি দিয়ে গাছ থেকে নেমে পড়লাম। ভাগ্যিস্ সিঁড়িটা পেয়েছিলাম নইলে এখনও গাছে বসে থাকতে হত!' গল্পটা বলে সেই নতুন বন্ধুর দিকে তাকাল। বন্ধু মাথা নেড়ে পরের গল্প আরম্ভ করতে ইঙ্গিত করল। উড়নচণ্ডী যুবকেরা খুব দুঃখিত হল। তাদের নতুন বন্ধু এখনও বোকামি করছে না বলে তারা সবাই বিরক্ত হল।

এবার তৃতীয় বন্ধুর পালা। সে তার সব চেয়ে অদ্ভুত দুঃসাহসিকতার গল্প আরম্ভ করল, 'এক বৎসর বয়সের সময়ে আমি প্রায়ই জঙ্গলের ধারে একা বেড়াতে যেতাম। একদিন জঙ্গলের মধ্যে বড়াচ্ছি, এমন সময়ে মনে হল যেন একটা খরগোস একটা ঝোপের মধ্যে। আমি তাড়াতাড়ি ঝোপের ধ্যে ঢুকে দুই হাতে ডাল পালা সরিয়ে দেখি সেটা ছোট খরগোস নয়। সেটা একটা মস্ত বড় বাঘ। াঘ আমাকে দেখে ভীষণ তর্জন-গর্জন করে উঠল। তারপর মস্ত বড় হাঁ করে আমাকে খেতে এগিয়ে এল। আমি আপত্তি করে বললাম, 'দেখুন এটা কিন্তু আপনার বড় অন্যায় হচ্ছে। আমি খরগোস খোঁজার জন্য ঝোপে ঢুকেছিলাম। আপনি এখানে আছেন জানলে কখনোই আসতাম না। আপনি আমাকে মাপ করুন।' বাঘ আমার আপত্তি ও অনুরোধ কানে না নিয়ে মস্ত হাঁ করে আমার দিকে এগিয়ে এল। আমি ভীষণ চটে মটে এগিয়ে গিয়ে আমার বাঁ হাত দিয়ে তার উপরের চোয়াল ও ডান হাত দিয়ে নিচের চোয়াল চেপে ধরলাম আর প্রাণপণে চোয়াল দুটো দুই দিকে ফাঁক করে দিলাম। সেই বয়সেই আমার গায়ে এত জোর হয়েছিল যে চোয়ালদুটো সজোরে দুই দিকে ফাঁক করতে অত বড় বাঘ দুই টুকরো হয়ে ছিঁড়ে গেল আর গ্যাঁ গ্যাঁ করে মরে গেল।' এই বলে খুব আগ্রহের সঙ্গে নতুন যুবকের দিকে তাকাল – যুবকও মাথা নেড়ে জানাল যে সে গল্পটা বিশ্বাস করেছে এবং পরের ঘটনা শুনবার জন্য খুব ব্যস্ত। অন্য বন্ধুরাও মাথা নেড়ে তাদের মত দিল।

এখন চতুর্থ বন্ধুর গল্প বলার কথা। নতুন বন্ধুর ব্যবহারে খুব অবাক হয়ে সে একটু মন-মরা ভাবে তার জীবনের ঘটনার বর্ণনা আরম্ভ করল, বছর দুই তিন আগে আমি নৌকায় ভিন্ন ভিন্ন নদীতে মাছ ধরে বেড়াচ্ছিলাম। একদিন একটা বড় নদীতে এক ঘণ্টা ছিপ ফেলে রাখা সত্ত্বেও একটাও মাছ ধরা পড়ল না। আসে পাশে যারা মাছ ধরছিল তাদের জিজ্ঞেস করাতে তারাও জানাল যে অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও তারা একটাও মাছ ধরতে পারেনি। এইভাবে কয়েক ঘণ্টা চলে গেল, তবু একটা মাছেরও দেখা নেই। তখন জলের মধ্যে কি হচ্ছে জানার জন্য আমি নৌকা থেকে লাফ দিয়ে নদীতে মস্ত এক ডুব দিলাম। তিনদিন তিনরাত সাঁতরে আমি নদীর তলায় পৌঁছলাম। সেখানে দেখলাম একটা পাহাড়ের মতন মস্ত বড় মাছ সমস্ত ছোট ছোট মাছদের খেয়ে ফেলছে! আমার ভীষণ রাগ হল। আমি বললাম, 'না এসব আর হতে দেওয়া চলে না।' এই বলে মাছের মাথায় এক ঘুঁসি মারলাম, মাছটা মরে গেল। তিনদিন তিনরাত নদীর ভিতরে সাঁতার কেটে তারপর পাহাড়ের মতন মাছের সঙ্গে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে জিতে আমার ভীষণ খিদে পেয়ে গেল। নদীর তলাতেই মস্ত বড় আগুন জ্বেলে তাতে সুন্দর করে ঐ মাছ রান্না করে সবটাই আমি খেয়ে ফেললাম। তারপর তাড়াতাড়ি সাঁতরে জলের উপরে উঠে নৌকায় গিয়ে বসলাম। আমার মনে হল যেন কিছুই ক্লান্তি নেই, কিছুই হয়নি। ঐ নদীতে মাছ ধরতে আর কোনো ঝামেলা হয়নি। নদীর দুই ধারের লোকেরা সহজেই মনের সুখে মাছ ধরছে।' সেই যুবকের দিকে তাকালে মনে হল যেন যে খুব আগ্রহের সঙ্গে সব ঘটনাগুলি শুনেছে ও প্রত্যেকটি ঘটনার সত্যতা বিশ্বাস করেছে।

এখন ঐ যুবকের জীবনের সব চেয়ে অভাবনীয় ঘটনার বিষয় বলার পালা। সে খুব উৎসাহের

রঙ্গে বলতে আরম্ভ করল, 'আমার একটা মস্ত বড় তুলোর বাগান আছে। সেখানে প্রতিবৎসর হাজার টাকার তুলো হয়। বৎসর খানেক আগে সেই বাগানে একটা গাছের জন্য আমার ভীষণ দুশ্চিন্তা হয়েছিল। সেই গাছটা অন্যসব তুলো গাছের চেয়ে বড় ও টকটকে লাল রঙের। বহুদিন তাতে কোনো ডাল বা পাতা গজায়নি।

আমি কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। অনেকদিন পরে তাতে বেগুনী রঙের বড় বড় চারটে ডাল বের হল। সেই ডালে একটাও পাতা ছিল না কিন্তু প্রত্যেকটাতে একটা করে মস্ত বড় নীল রঙের ফল হলো। ফলগুলো ক্রমশঃ ফুলতে আরম্ভ করল। একদিন হঠাৎ ফলগুলো ফেটে গেল আর প্রত্যেকটা থেকে একটি হলদে রঙের নাকখ্যাঁদা যুবক লাফিয়ে পড়ল।

সেই যুবকগুলো আমার তুলোগাছের ফল থেকে বের হয়েছে সুতরাং তারা আমার সম্পত্তি। আইনতঃ তারা আমার দাস। সেইজন্য আমি তাদের ঐ বাগানের কাজে লাগিয়ে দিলাম। কিন্তু তারা হদ্দ কুঁড়ে ও হতভাগা—মোটেই ভালো ভাবে কাজ করত না। তবু আমি তাদের কিছু বলিনি কারণ তারা একাজে একেবারে নতুন। কিন্তু তারা এত অলস ও অপদার্থ ছিল যে কয়েকমাস কাজ করার পর পালিয়ে গেল। আমি কিন্তু নাছোড়বান্দা। তাই ঠিক করলাম যেমন করেই হক, তাদের খুঁজে বার করব। আমার তুলোর বাগান ও ব্যবসায়ের ভার উপযুক্ত লোকের হাতে দিয়ে তাদের খুঁজতে বের হলাম। কত মাস ধরে অনেক সহর ও গ্রামে তাদের খুঁজেছি। আজ আমি খুব খুসি। আজ সেই চারজন হতভাগা অপদার্থের খোঁজ পেয়েছি।' এই বলে সে খুব খুসির হাসি হেসে বলল, 'কিহে, তোমরা খুব ভালো করেই জান তোমরা সেই চার অপদার্থ হতভাগা আর তোমরা আমার দাস। তোমাদের হুকুম করছি তোমরা এখনি আমার সঙ্গে ফিরে চল আর নিজের কাজে লেগে যাও।'

সেই চারজন উড়নচণ্ডী যুবকরা ভয়ে ও অপমানে জর্জ্জরিত হয়ে এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল। তারা বুঝতে পারল যে তারা ভীষণ বিপদে পড়েছে। যদি তারা বলে 'এই ঘটনা সত্যি', তাহলে তার মানে হবে যে তারা এই যুবকের পালিয়ে যাওয়া দাস। আর যদি বলে যে তারা এই গল্প বিশ্বাস করে না তাহলে নিজেদেরই বাজির সর্তে তারা যুবকের দাস হবে। এ ওর মুখ চেয়ে তারা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

তখন বিচারক গ্রামের প্রধান প্রত্যেক উড়নচণ্ডী যুবককে আলাদা আলাদা তিন তিনবার জিজ্ঞেস করলেন তারা এই ঘটনা বিশ্বাস করে কিনা। তারা মাথা নিচু করে মুখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল। তখন প্রধান ঘোষণা করলেন যে যুবক বাজি জিতেছে সুতরাং চারবন্ধু তার দাস হল।

যুবক ইচ্ছা করলে তাদের দাস রাখতে পারত কিন্তু সে খুব উদার। তা না করে সে বলল যে সে তাদের বেশি শাস্তি দেবে না। কিন্তু 'যে হেতু তোমরা আমার দাস সেজন্য তোমরা যে সব সুন্দর পোষাক ও গহনা পরে আছ সে সব আমার। তাই আমি হুকুম করছি তোমরা সে সব খুলে আমাকে—তোমাদের মনিবকে দেবে। তাহলে তোমাদের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেব।' চার বন্ধু সমস্ত সুন্দর পোষাক ও গহনা যুবককে দিয়ে শুধু পাজামা পরে বোকার মতন গ্রামের ভিতর দিয়ে বাড়ি যেতে বাধ্য হল। আর যুবক তার গল্প বলার চালাকিতে চারটা নূতন ও সুন্দর পোষাক ও গহনা নিয়ে অন্য দেশে চলে গেল।

মরু অভিযান

দ্বিজেন গুহ বক্সী

এক্স্প্লোরার্স ক্লাব অব ইণ্ডিয়ার (Explorers Club of India) তরফ থেকে থর মরুভূমি ও কচ্ছের রাণ অভিযানে গিয়েছিলাম আমরা চারজন। নেতা হিসাবে ছিলেন সংঘের কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুগভানু সিংদেও, (ওর ডাক নাম জিমি) এবং সেরাইকেল্লার রাজকুমার। আমি ছিলাম সহকারী নেতা ও উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানী, ভূগোলকার ও নৃতত্ত্ববিদ্ হিসেবে ছিলেন শ্রীঅসিত বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের গড়পড়তা বয়স ছিল ২৯ বৎসর, সব চাইতে বড় ছিলাম আমি ও সব চাইতে ছোট অসিত।

এবার আমাদের সংঘ এবং অভিযানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তোমাদের কিছু বলছি। ক্লাবটি অল্প কিছু দিন আগে সংগঠিত হয়েছে পদ্মভূষণ বিশ্ববিখ্যাত সাঁতারু শ্রীমিহির সেনকে সভাপতি করে, উদ্দেশ্য ভারতের যুব এবং কিশোর সম্প্রদায়কে নানা দেশাত্মবোধক সাহসিক কাজে অনুপ্রাণিত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে জলে, স্থলে, ও অন্তরীক্ষে যে সমস্ত জায়গা অচেনা ও অজানা আছে, সে গুলোর বৈজ্ঞানিক কোণ থেকে অনুসন্ধান করা, এই ক্লাবের সঙ্গীত হ'ল নজরুলের বিখ্যাত কবিতা 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার, লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁসিয়ার!' কি সুন্দর বলো তো?

আজকাল পাহাড় পর্বত অতিক্রম করা এবং সমুদ্রে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করা একটা ফ্যাসান হয়ে গেছে। মেয়েরাও এগিয়ে এসেছেন এদিকে। বাকি ছিল মরুভূমি পায়ে হেঁটে পার হওয়া। সেটাই বা বাকি থাকবে কেন? আমাদের চোখ পড়লো সেদিকে।

আমাদের এই অভিযান সম্বন্ধে এবার তোমাদের কিছু জানাচ্ছি। তোমরা অনেকেই মহেঞ্জদারো ও হরপ্পার সভ্যতার নাম জানো। সেগুলি প্রসার লাভ করেছিল সিন্ধু ও পশ্চিম রাজপুতানায়. কিন্তু কালের করালগতিতে সিন্ধু ও সরস্বতী নদী যায় একেবারে শুকিয়ে, জলের অভাবে দলে দলে লোক পালিয়ে যায় এবং ক্রমে ক্রমে এই বিরাট সভ্যতায় ভাঙ্গন আসে এবং শেষ পর্যন্ত একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। ঐতিহাসিকগণ এ সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন অনেক। কিন্তু ভারতীয় ইতিহাসে খৃষ্টপূর্ব ১৬০০ সাল হতে ৬০০ সাল পর্যন্ত যে অধ্যায় আছে সেটা সম্বন্ধে এখনও আলোক-পাত করতে পারেন নি বলে একে ইতিহাসে অন্ধকারময় যুগ বলে! আমাদের অভিযানের প্রধান লক্ষ্য ছিল এই যুগ সম্বন্ধে নূতন কিছু জানা। এর নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব ও উদ্ভিদ্জাত যদি কিছু সন্ধান মেলে। এবং বর্তমান মরুভূমির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা। আমাদের আর এক উদ্দেশ্য ছিল বাঙ্গালীর ভীরুত্ব ঘোচানো, এবং জগতের সামনে দেখিয়ে দেওয়া যে বাঙ্গালী কারু চেয়ে তো হীন নয়ই, বরঞ্চ অনেকে জাতের চেয়ে সাহসী, কারণ ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায় যে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কেউ কোন মরুভূমি একপ্রান্ত থেকে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পায়ে হেঁটে পার হয় নি।

এবার মরুভূমির রূপ ও বর্ণনা মোটামুটি জানাচ্ছি। তোমরা জানো আরাবল্লী পর্বত রাজস্থানের ভেতর দিয়ে গেছে। তার পশ্চিম দিক্‌কে মোটামুটিভাবে থর মরুভূমি বলে। একদিকে হরিয়ানা, অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্থান, আর একদিকে গুজরাট। আয়তন কমবেশী ২ লক্ষ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রতি বর্গ মাইলে ৪'১১ জন, বৎসরে বৃষ্টিপাত ৫"-২০" পর্যন্ত, আর বালির পাহাড় আছে ঢেউএর মত। একের পর এক। শুধু বালি আর শুকনো গাছ, কোথাও বা পশুপাখি পর্যন্ত দেখা যায় না। মাঝে মাঝে গ্রাম আছে—কোথাও ৫ মাইল দূরে কোথাও বা ২৫ মাইল দূরে, মানে যেখানে পানীয় জল পাওয়া যায় মোটামুটি সেই ভিত্তিতেই গ্রাম গড়ে। আর আছে অজস্র পোকা-মাকড়, বিষধর সাপ, ইঁদুর প্রভৃতি।

কচ্ছের রাণের নাম তোমরা অনেকেই জানো। থরের পর আমাদের অভিযান এখানে হোল। প্রায় ৯০০০ বর্গমাইল এর আয়তন। শুধু নুনে ভরা এবং মাঝে মাঝে চোরাকাদা ও আঠাল মাটি, কোন লোকজন ও গাছপালা নেই, দেখ্‌লেই ভয় করে।

এবার আমাদের অভিযানে আবার ফিরি। আমাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজ্যপাল শ্রী ধরমবীর, ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেন, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন ভারতীয় সমীক্ষা দপ্তর এবং অন্যান্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও আরো অনেকে।

২৫শে জানুয়ারী, ১৯৬৮ সালে জিমি, অসিত ও আমি বিপুল সম্বর্ধনার মধ্যে তুফান মেলে রওনা হলাম। পরে গেল সুভাষ, আমাদের সঙ্গে বিকানীরে মিলিত হ'ল। আমরা আগ্রা হয়ে রাজস্থানের রাজধানী জয়পুরে গেলাম ও ওখানকার পদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে পরামর্শ করে গেলাম যোধপুরে। যোধপুরে মরুভূমির গবেষণাগার আছে এবং আরো আছে সীমান্ত নিরাপত্তাবাহিনীর প্রধান কার্যালয়। এদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে আমরা বিকানীর হয়ে একেবারে রাজস্থানের প্রান্তিক জেলা গঙ্গানগরে এলাম, সেখানে আমাদের সঠিক রাস্তা ও কর্মসূচী তৈরী হল। আমরা সুরথগড়, হনুমানগড়, রংমহল প্রভৃতি জায়গাগুলি দেখে, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সকাল ৯টার সময় রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী, গঙ্গানগরের জেলাশাসক এবং অন্যান্য সবার সামনে আমাদের পদযাত্রা আরম্ভ করলাম।

আমাদের পরনে ছিল সার্ট, প্যাণ্ট, সাদাটুপি, সোয়েটার বা লেদার জ্যাকেট (কারণ রাত্রে ওখানে খুব ঠাণ্ডা), পি, টি, সু ও গগলস্‌। সঙ্গে ফ্লাস্কে ও ক্যানভাসের ব্যাগে জল, প্রথম চারদিন বিশেষ কোন অসুবিধে হয় নি। আমি ছাড়া ওদের প্রত্যেকেরই পায়ে খুব ফোস্কা পড়েছিল। ক্রমে ক্রমে আমরা রাইমিনগর নামে এক জায়গায় গেলাম। এর মধ্যে রাজস্থানের খবরের কাগজগুলো এবং রেডিও আমাদের অভিযান সম্বন্ধে খুব প্রচার করেছিল। মানে আমরা হিরো হয়ে গিয়েছিলাম তখন, রাইমিনগরের স্কুলের ছাত্ররা দলে দলে রাস্তায় এসে আমাদের অভিনন্দন জানালো।

রাইমিনগর থেকে পাকিস্থান সীমান্ত খুব কাছে। পশ্চিম পাকিস্থান কখনও দেখিনি। দেখবার জন্য খুবই ব্যস্ত ছিলাম। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর প্রধানের কাছে অনুরোধ জানাতেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে একজন অফিসার, দুজন রাইফেলধারী জওয়ান দিয়ে এক বিরাট গাড়ী পাঠিয়ে দিলেন, পাকিস্থান দেখে

নয়ন ও মন সার্থক হ'ল। পাশাপাশি ভারত ও পাকিস্থান চলছে মাঝে শুধু একটি পিলার, একদিকে ভারত ও অন্যদিকে পাকিস্থান লেখা, দু'দেশ দেখতেও একই রকম শুকনো, বালির পাহাড়, গাছ-পালা নেই বললেই চলে। এক পোস্টে গিয়ে শুনলাম একজন জওয়ান রাস্তা হারিয়ে পথে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। তিনদিন পরে তাকে পাওয়া গেছে। আমাদের অবস্থা তখন বোঝ! সেইদিন ভ্যানে করে বহু জায়গা দেখলাম এবং দেখলাম আসল মরুভূমি কি। ফেরবার সময় রাত্রি করে তো driver রাস্তা ভুল করেই বস্‌লো, অনেক রাস্তা কানামাছির মত ভোঁ ভোঁ করে ঘুরে রাত্রি প্রায় ১২টার সময় রাইমিনগরে পৌঁছালাম।

পরের দিন থেকে আসল মরুভূমি আরম্ভ হ'ল, গাছপালা আস্তে আস্তে কমতে লাগ্‌লো, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি-ঘরও। গাইড্ হিসেবে এলো উট। গাইড ছাড়া এখানে পদে পদে বিপদ, একবার রাস্তা হারিয়ে গেলে নির্ঘাত মৃত্যু। ঢেউএর পর ঢেউএর মত এখানে বালিয়াড়ি। আর রাস্তা বলতে শুধু উটের পায়ের ছাপ। ঠিক নদীতে নদীতে যেমন 'কূল নেই কেনারা নেই, নেইকো দরিয়ায় পারি' এখানেও মাইলের পর মাইল গেলে তবে মাঝে মাঝে লোকজন, বাড়িঘর দেখা যায়, আর আছে মরীচিকা, দেখলেই ভয় করে, মনে হচ্ছে সামনে নদীর মত; এমন কি ঢেউ পর্যন্ত দেখা যায়। এগিয়ে যাও দেখবে একফোঁটাও জল নেই। পেছনে, পাশে যেদিকে তাকাও ঠিক দেখবে যেন কত জল, আবার মাইলের পর মাইল জল পাবে না, এমন কি পশু পাখিও দেখা যায় না অনেক সময়। মরুভূমির এই যে নির্জনতা মাঝে মাঝে বেশ ভাল লাগে। রাত্রে যেমন সীমান্ত রক্ষীদলের পোস্টে থাক্‌তাম, জ্যোছনার আলোয় মনে হ'ত যেন জাহাজের ডেকে বসে আছি। আস্তে আস্তে আমরা বেদের যুগের সরস্বতী নদীর পারে এলাম, এখানে প্রায় সাড়ে তিনহাজার বৎসর আগে হরপ্পার সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। অবাক বিস্ময়ে দেখতে দেখতে এবং অতীতের কথা ভাবতে ভাবতে অনুপগড়ে পৌঁছালাম। মাঝে বিগতদিনের সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ স্তূপ দেখতে পেলাম এবং সেখান থেকে কিছু পৌরাণিক নিদর্শন নিয়ে আমরা ঘরসানা নামে এক জায়গায় গেলাম। এখানে খুব সুন্দর সুন্দর হরিণ ঝাঁকে ঝাঁকে দেখতে পাওয়া যায় আর দেখা যায় রঙ্‌বেরঙ্‌এর ময়ুর।

গঙ্গানগর জেলার পর আরম্ভ হল বিকানীর জেলা। এখানে জীপগাড়ী একেবারেই অচল। বালিয়াড়ির আদিঅন্ত কিছুই নেই। আর আছে সমস্ত জায়গা জুড়ে ইঁদুরের গর্ত, ইঁদুরের গর্তে আবার সাপ ভর্তি, আমাদের খুব সাবধানে যেতে হত।

যেদিন কাকরানা থেকে পুগল যাচ্ছিলাম, সেদিন তো আমি দলছাড়া হয়ে পাগলের মত অনেক ঘুরে বেড়িয়েছি, ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, সেদিন খুব কুয়াসা ছিল, আমরা চারজনে গাইড ছাড়াই রওনা হলাম রাস্তা কোনদিকে জেনে। কুয়াসায় কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, আমি গাছ সংগ্রহ করতে করতে প্রায় আধমাইলের মত এগিয়ে গেছি, তখন আমার সঙ্গীরা আমাকে ডাক্‌লো। গাইড ততক্ষণে এসে গেছে, আমি সঙ্গে সঙ্গেই ফিরলাম, কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলাম না। এইভাবে আধঘণ্টার উপর ঘুরে ঘর্মাক্ত কলেবরে নিরাশমনে কি করবো ভাবছি, তখন দেখি গাইড ছোটাছুটি করে আমার দিকে আসছে।

একদিন আমাদের নায়ক জিমিও হারিয়ে গিয়েছিল, তার পায়ের চিহ্ন দেখে খুঁজে খুঁজে অনেক কষ্টে বের করেছি তাকে। তোমরা যদি কেউ কোনদিন মরুভূমিতে যাও, তবে অনেক জল ও গাইড নিয়ে যাবে। এই কথাটি সব সময়ই মনে রাখবে।

বিকানীর জেলায় বালিয়াড়ি খুব বেশী, ঠিক ঢেউএর পর ঢেউএর মত, আর এত বেশী যে দেখ্‌লেই ভয় করে। একটি বালিয়াড়ি দেখ্‌লে মনে হত পৃথিবী বা বুঝি ওখানেই শেষ হয়ে গেছে। এখানে চোরাবালিও আছে। আমাদের খুব সাবধানে চলতে হত। একবার চোরাবালির মধ্যে পড়লেই 'সলিল সমাধি'।

এদিকে গরমও আস্তে আস্তে দিনের বেলায় বাড়তে লাগলো, জানো তো মরুভূমিতে রাত্রিতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, আর দিনে ভীষণ গরম। এই ভাবে বিকানীর জেলা শেষ করে জয়শালমীর জেলায় ঢুকলাম। শেষ দিন রঞ্জিতপুরা থেকে যখন রাইচাঁদওয়ালা যাচ্ছিলাম, দারুণ বৃষ্টির মধ্যে পড়লাম। মরুভূমিতে বৃষ্টি ঠিক যেন 'সোনার পাথরবাটি' মনে হয়। এত বেশী বৃষ্টি যে কোথাও আশ্রয় না পেয়ে একেবারে ভিজে গেলাম, শীতে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে গাজেয়ালা পৌঁছালাম। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে রাইচাঁদওয়ালা যখন গেলাম আমাদের ফুর্তি দেখে কে? কারণ সেদিন ২৯ মাইল হেঁটে আমরা মরুভূমিতে এক নুতন রেকর্ড করেছি।

রাইচাঁদওয়ালা থেকে পশ্চিম পাকিস্থানের সীমান্ত তিন মাইলের মধ্যে। আমরা উটে করে পাকিস্থান দেখতে গিয়ে একেবারে পাকিস্থানের ভেতরে ঢুকে গিয়েছিলাম, ভাগ্য ভাল ছিল, তখন সেখানে কোন প্রহরী ছিল না সেই জন্য ধরা পড়ি নি।

আবার চলা সুরু হল, গরম আস্তে আস্তে বাড়তে লাগলো। খাবার কষ্ট, জলের কষ্ট, এর মধ্যে পর পর ২২ দিন হেঁটে আমরা জয়শালমীরে পৌঁছালাম—৪৬৭ মাইল অতিক্রম করে। এই জায়গাটি বালি ও পাহাড়ের সমাবেশে অপূর্ব দেখতে, যে সব গাছ আছে খুব সুন্দর দেখতে,। একেবারে মরুভূমির মাঝখানে। খুব আঁধি (ধূলি-ঝড়) হয় রোজই দুপুরে। ঢুকতেই বিরাট এক দুর্গ। এখানে ৫ দিন বিশ্রাম নিলাম, দেখা হল শ্রীযুক্ত সত্যজিৎ রায় ও তোমাদের 'গুপী গায়েন বাঘাবায়েনে'র কর্মকর্তা ও নায়কদের সঙ্গে! বেশ হৈ চৈ করে কয়েক দিন কাটিয়ে আবার যাত্রা সুরু হল।

এবার বেশ দুর্গম জায়গা, বালি খুব বেশী, মাঝে মাঝে চোরাবালিও আছে, আর বালিয়াড়ির তো কোন অন্ত নেই, কোনটা ৫০ ফিট, কোনটা বা ৩৫০ ফিট্। আবার পাথুরে রাস্তাও বেশ ছিল। Hunting shoe পরতাম। এখানে এক বর্গমাইলের মধ্যে দুজন লোক থাকে, অবস্থা বুঝতেই পারছো! আর ভীষণ ইঁদুরের ও মাছির উৎপাত। সাপ ভর্তি, সব বিষাক্ত। বালির নীচে যুদ্ধের সময় পাকিস্থানীরা মাইন পেতে গেছে, ১২৫ মাইলের মত এই বিপজ্জনক রাস্তা পেরিয়ে আমরা মুনাবো পৌঁছালাম, দর্শনা বেনাপোলের মত মুনাবো-কোকরাবা—করাচী যাবার পথ।

মাঝে তো আমাদের সীমান্ত রক্ষীদল রাইফেল উঁচিয়ে আমাদের পাকিস্থানী মনে করে আটকে রেখেছিল। মুনাবো থেকে গেলাম গাড্রারোডে—এই ২৫ মাইলে এক ফোঁটা জল নেই। এইখানেই

থর মরু প্রকৃতপক্ষে শেষ হল। এরপরও ছিল—সেটা শুকনো জায়গা, ৩৬ দিনে ৬০০ মাইল হেঁটে গুজরাট প্রান্তে বাকাসার পৌঁছে আমাদের থরমরু অভিযান শেষ হল।

এইবার আমাদের দ্বিতীয় অভিযান আরম্ভ হল, এটা আরও সুন্দর ও ভয়ঙ্কর। এটি হল কচ্ছের রাণ, আগে বহু লোক এখানে মারা গেছে চোরাকাদার মধ্যে। একে নুনের মরুভূমি বলতে পারো। নুন আর শুধু নুন, মাঝে মাঝে আঠাল মাটি ভর্তি। সমুদ্র দেখেছো তো? মনে কর সমুদ্র শুকিয়ে গেছে। কোনদিকেই কিছু নেই। শুধু শোঁ শোঁ করে হাওয়া বইছে। গাছ-পালাও নেই, মাঝে মাঝে দেখা যায় দাগ দাগ হরিণ, বুনো গাধা, নীলগাই বড় বড় কাক, আর নাম না জানা নানা পাখি। এটা গুজরাটের মধ্যে। সেখানকার সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা আমাদের খুব সাহায্য করেছিল। সে সব জায়গায় চোরাকাদায় হেঁটেছি, নেহাতই ভগবানের আশীর্বাদে বেঁচে গেছি, বড় হয়ে তোমরা আরও জানতে পারবে এ সম্বন্ধে, এখানে সাপ ও সাদা খরগোশ খুব বেশী।

শেষ দিন আমরা এক নাগাড়ে ৪৩ মাইল হেঁটে দশ দিনে ২৩৮ মাইল গিয়ে আমাদের অভিযান ভুজে শেষ করেছি। অনেক সুন্দর সুন্দর গাছ, প্রস্তর, প্রস্তরীভূত গাছ ও সামুদ্রিক জীব আমরা সংগ্রহ করেছি। আরও যদি কিছু জানতে চাও ৪·৮ টার মধ্যে সন্ধ্যের দিকে আমাদের সঙ্গে কারনানা ম্যানসনে ৮৭ নং ঘরে আসবে লোয়ার সার্কুলার রোডে, কেমন?

শেষ করি। জয়হিন্দ।

গাছে গাছে যদি ডিম ধরে

ঝুমুর চৌধুরী

গাছে গাছে যদি ডিম ধরে
ভাল লাগত কি লাগতনা বল।
নদীতে যদি গো ক্ষীর ঝরে
ভাল লাগত কি লাগত না বল।
যদি ইচ্ছায় সব কিছু হয়—
শূন্য পকেটে টঙ্কি এসে রয়,
বোলতার চাক হয় মধুময়,
যদি বৃষ্টির সাথে মাছ পড়ে,
ভাল লাগত কি লাগত না বল॥

মানুষ করেছে কত কিছু—
এসব পারে নি তবু কেন বল।
লিচু গাছে তবু ধরে লিচু
ধরাতে পারে নি প্যাঁড়া কেন বল।
পরশমণি কি হয়েছে উধাও
নিয়মের বেশি দেবে নাকি ফাউ?
ভাবতে কেন যে ভালো লাগে তাও
যদি মাটিতে টাকার গাছ ধরে
ভাল লাগত সত্যি তবে বল॥

যেমন কাজ তেমনি সাজা

গৌরীবালা সেন

কোনও এক দেশে এক ধর্মপরায়ণ রাজা ছিলেন। তিনি প্রজাদের পুত্রের ন্যায় পালন করতেন। ঐ দেশের রাজার সুশাসনের ফলে সকলেই সুখে শান্তিতে ছিল। কিন্তু রাজার এক কূটপ্রকৃতি মন্ত্রী ছিল। সে যেমন খল, তেমনি হিংসুক ও নিষ্ঠুর। রাজার সামনে রাজাকে খোসামোদে ভুলিয়ে রাখত, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে রাজার সর্বনাশের চেষ্টা করত। কোনও প্রকারে রাজার কিছু অনিষ্ট করতে অবশ্য পারত না। রাজার একমাত্র পুত্র, সেও তার বাবার মতো! মন্ত্রী সুযোগ খুঁজতে লাগল কি করে রাজা ও রাজকুমারকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করবে। মন্ত্রীর একটি চেলা ছিল, সেও রাজঅন্তঃপুরে কাজ করত। সে অন্তঃপুরের সমস্ত খবর মন্ত্রীকে বলত। এইভাবে দিন যাচ্ছিল। কিছুদিন পরে মন্ত্রীর এক সুযোগ এল।

রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে বাঘের উপদ্রব হওয়াতে সীমান্তের প্রজারা রাজার কাছে এসে বলল,—'মহারাজ, দু'টো বাঘ এসে আমাদের গ্রামের উপর অত্যাচার করছে; গরু, বাছুর, ছাগল, মোষ এমন কি মানুষকেও রেহাই দেয়না। দিনের বেলাতেও আমাদের প্রাণ হাতে করে নিয়ে মাঠে ঘাটে বেরুতে হয়। হরি বাগ্দীর বৌটাকে সেদিন মেরে ফেলল। সনাতন খুড়োকে জখম করে গেছে। আমরা অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু বাঘ দু'টোকে মারতেও পারিনি, তাড়াতেও পারিনি। তাই আপনার কাছে এলাম, আপনি আমাদের রক্ষা করুন।'

এইসব শুনে রাজা বললেন, 'বৎসগণ, তোমরা নিশ্চিন্ত হও। আমি আজই তোমাদের সঙ্গে তোমাদের গ্রামে যাব এবং ঐ নরখাদক বাঘ দু'টোকে শেষ করব। তোমাদের কোনও ভয় নাই, আমি আমার জীবন দিয়েও তোমাদের বিপদ থেকে রক্ষা করব।'

এই বলে রাজা হাতি, ঘোড়া ও কিছু সৈন্য নিয়ে সীমান্তের প্রজাদের সঙ্গে বাঘ শিকারে চলে গেলেন। মন্ত্রীর উপর সমস্ত রাজ্যের ভার দিয়ে বললেন,—'আমার ফিরতে দশ বারো দিনের বেশি দেরি হবে না।'

মন্ত্রী রাজার পায়ের ধুলো নিয়ে সজল চোখে রাজাকে বলল,—'মহারাজ, আপনি যত শীঘ্র পারেন ফিরবেন।'

কিন্তু দুষ্ট মন্ত্রী মনে মনে বলতে লাগল, 'হে ভগবান, রাজাকে যেন বাঘে খায়, আর যেন ফিরে না আসে।'

অতঃপর রাজার অনুপস্থিতিতে মন্ত্রী রাজ্য চালনা করতে লাগল এবং রাজকুমারকে হত্যা করবার ফন্দী আঁটতে লাগল।

রাজকুমারকে যদি মারতে পারে, আর রাজা যদি বাঘ মেরে ফিরেও আসেন, তবে একমাত্র পুত্রের শোকে রাজা পাগল হয়ে যাবেন। তখন রাজাকে শেষ করতে বেশি বেগ পেতে হবে না। এই সব ভেবে মন্ত্রী তার অনুচরের সঙ্গে শলাপরামর্শ করতে লাগল। কিন্তু রাজকুমারকে হত্যা করে তার লাস কোথায় রাখবে, সেই সমস্যা দেখা দিল। অনুচর বলল,—'তাইতো! লাস যদি কেউ দেখে ফেলে তবে আর রক্ষা থাকবে না।' কিছুক্ষণ ভেবে মন্ত্রী বলল—'দেখ, এই রাজধানী থেকে দশ ক্রোশ দূরে যে জঙ্গলটা আছে তার ভিতরে একটা আধভাঙ্গা মন্দির আছে। সেখানে গিয়ে রাজকুমারকে হত্যা করলে কেউই জানতে পারবে না।' রাজধানীর দক্ষিণে যে নদীটি আছে সেটি দক্ষিণ সীমান্ত দিয়ে গিয়েছে এবং ঐ নদীটির ধারেই আছে ঐ জঙ্গল ও মন্দির। দু'জনে খুব খুসি হয়ে চলে গেল।

তারপর মন্ত্রী জঙ্গলে গিয়ে চারহাত লম্বা বেশ সুন্দর একটি বাক্স তৈরি করল, কোথাও কোন ফাঁক নাই। শুধু উপরের দিকে একটি চোঙ রাখল নিশ্বাস নেবার জন্য। তার চাবি দেবার জায়গায় পর্যন্ত ফাঁক নাই। ঐ বাক্সটি তৈরি করে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখে রাজধানীতে ফিরে এল।

ঐদিন রাত্রিতে মন্ত্রীর অনুচরটি রাজকুমারের শোবার ঘরে খাটের তলায় লুকিয়ে রইল। অন্তঃপুরের সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ল এবং রাজকুমারও ঘুমিয়ে পড়ল, তখন অনুচরটি আস্তে আস্তে খিড়কির দরজা খুলে দিল। কালো পোষাকে মন্ত্রী অন্তঃপুরে ঢুকল। তারপর রাজকুমারের ঘরে গিয়ে রাজকুমার চিৎকার করবার আগেই তার মুখ কষে বেঁধে দিল। পরে হাত পা বেঁধে মন্ত্রী ও তার অনুচর রাজকুমারকে কাঁধে করে খিড়কি দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর জঙ্গল থেকে আনা সেই চার হাত লম্বা বাক্সে রাজকুমারকে রেখে বাক্সটি চাবি বন্ধ করে দিল এবং নদীর জলে ভাসিয়ে দিল।

নদীটি চওড়ায় প্রায় পনেরো হাত, লম্বায় বহুদূর বিস্তৃত। পাহাড়ে নদী সোজা দক্ষিণ দিকে বয়ে গেছে। বাক্সটি হেলে দুলে সোজা দক্ষিণ দিকে ভেসে যেতে লাগল। এদিকে বাক্সটি ভাসিয়ে ফিরে আসতে প্রায় ভোর হয়ে গেল। মন্ত্রী ও অনুচরটি যে যার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। সকাল হতেই রাজকুমারকে দেখতে না পেয়ে চারদিকে খোঁজাখুজি পড়ে গেছে। দুষ্ট মন্ত্রী খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি সমস্ত রাজধানী খুঁজতে লাগল। কিন্তু রাজকুমারকে কোথায় খুঁজে পাবে? সে তখন হাত পা মুখ বাঁধা অবস্থায় নদীতে ভেসে যাচ্ছে!

মন্ত্রী তখন সমস্ত রাজকর্মচারী ও অন্তঃপুরের সকলকে ডেকে বলল—'তোমরা রাজধানীতে খোঁজাখুজি কর, আমি জঙ্গলে ঘোড়া নিয়ে খুঁজতে যাচ্ছি। এই বলে সে তার অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে শাণিত ছোরা হাতে ঘোড়ায় চড়ে সেই ভাঙ্গা মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল।

এদিকে হয়েছে কি! রাজা বাঘ শিকার করে ফিরে আসছেন। একটা বাঘকে মেরে ফেলেছেন, অন্যটাকে জ্যান্ত ধরে লোহার খাঁচায় পুরে যে নদীতে রাজকুমারসহ বাক্সটি ভেসে যাচ্ছে সেই নদীর ধার দিয়ে তিনি যাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে সৈন্য সামন্ত হাতি ঘোড়া সবই আছে। সকলেই খুব আনন্দিত, কারণ বাঘিনীটাকে মেরে বাঘটাকে কৌশলে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। রাজাও খুব খুসি। নদীতে ঐভাবে বাক্সটা ভেসে যেতে দেখে রাজার সৈন্যরা হৈ হৈ করে উঠল। বাক্সটাকে ধরার জন্য সকলে গোলমাল করতে

লাগল। রাজা গোলমালের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সৈন্যরা বাক্সটা দেখাল।

বাক্সটি দেখে সৈন্যগণ এবং রাজা আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তিনি সৈন্যদের বললেন, 'ঐ বাক্সের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আছে। তোমরা ঐ বাক্সটি তুলে নিয়ে এস।'

স্রোতের টানে নদীতে নামা বিপজ্জনক। যাই হোক, সৈন্যদের কাছে বিপদ বলে কিছুই নাই। একজন কোমরে দড়ি বেঁধে জলে নেমে গেল এবং দড়ি দিয়ে বাক্সটাকে ডাঙায় টেনে নিয়ে এল।

'বাক্সটা উপরে তুলতেই সৈন্যরা ও রাজা সকলে বাক্সটাকে ঘিরে ফেলল। বাক্সটার কাছে যেতে ভিতর থেকে গোঁ গোঁ করে একটা শব্দ শুনতে পেল। সেনাপতি রাজার মুখের দিকে চাইলেন। রাজা বললেন, 'চাবি ভেঙ্গে দেখ ভিতরে কি আছে। তবে অস্ত্রও ঠিক রাখ কারণ হিংস্র জীবজন্তুও থাকতে পারে।' বাক্সটার চাবি ভেঙ্গে খুলে ফেলা হল।

কিন্তু একি! এযে রাজকুমার হাত পা বাঁধা অবস্থায় আছে। সৈন্যসহ রাজা ভয়ে আঁৎকে উঠলেন। সবাই সমস্বরে বলল, 'কি সর্বনাশ, কে এমন কাজ করল!' তাড়াতাড়ি রাজকুমারকে বাক্স থেকে বের করে সব বাঁধন খুলে দিল। সৈন্যরা রাজকুমারের সেবা করতে লাগল।

রাজকুমার সুস্থ হতে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে তোমার সঙ্গে এরকম নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে?'

রাজকুমার বলল, 'আমি রাত্রে শোবার ঘরে ঘুমিয়ে ছিলাম। কে বা কারা কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে আমাকে বেঁধে ফেলল। তারপর বাক্সে ভরে জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। আর আমি কিছুই জানি না।' রাজা বললেন যে এটা কোনো জানা লোকের কাজ। কিন্তু তিনি তো কারও অনিষ্ট করেন নি!

রাজা সেনাপতিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে এই শত্রু?' সেনাপতি বলল, 'মহারাজ, আমার মনে হয় এ কোন বন্ধুবেশী শত্রুর কাজ। সে রাজকুমারকে নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে গুম্ খুন করত।' রাজা শিউরে উঠলেন, বললেন—'রাজধানীতে ফিরে মন্ত্রীর সঙ্গে যুক্তি করে ঐ দোষীকে ধরবো।' সেনাপতি মন্ত্রীকে দু'চক্ষে দেখতে পারত না। সে বলল, 'মহারাজ, সে পরে হবে। আমি একটা কথা বলছি। ঐ বাক্সটাতে বাঘটাকে বন্ধ করে জলে ভাসিয়ে দেওয়া যাক। কুমারকে নিয়ে বাক্সটা যেখানে যাচ্ছিল সেখানেই যাবে। যে দোষী সে ঠিক সাজা পাবে।' এই শুনে কুমারসহ সকলেই সমস্বরে বলে উঠল, 'ঠিক ঠিক'। রাজাও বললেন, 'হাঁ, যুক্তিটা মন্দ নয়, তাই করো।'

তখন সৈন্যরা অতি সাবধানে বাঘটাকে বাক্সে বন্ধ করে নদীতে ভাসিয়ে দিল। বাক্সটা ভেসে যেতে লাগল। রাজা ও রাজকুমার সৈন্য সামন্তসহ রাজধানীতে ফিরে গেলেন।

অন্যদিকে মন্ত্রী ও তার অনুচর নদীর ধারে অপেক্ষা করে বসে আছে। বাক্সটা ভেসে ভেসে মন্ত্রীর সামনে এল। মন্ত্রী ও তার অনুচরটি বাক্সটিকে দড়ি দিয়ে টেনে ডাঙায় তুলল। পরে দুজনে ধরাধরি করে বাক্সটাকে ভাঙ্গা মন্দিরে নিয়ে গেল।

মন্দিরের দরজা বন্ধ করে ছোরা হাতে নিয়ে মন্ত্রী বাক্সের তালা খুলে ফেলল। তালা খুলে উপরের ডালাটা যেই খুলেছে, অমনি বাঘটা লাফ দিয়ে বেরিয়ে মন্ত্রীর ঘাড় মটকে দিয়ে খেয়ে ফেলল।

অনুচরটি ভয়ে নদীর জলে ঝাঁপ দিল এবং একটা ঘূর্ণাবর্তে পড়ে অতলে তলিয়ে গেল।

ভালোর ভালো সর্ব ভালো
মন্দের মন্দ আগে।
রাজার কুমার ঘরে গেল
মন্ত্রীকে খেল বাঘে।

ফুলহারা

শুক্লা চক্রবর্তী

বল্লে সেদিন সাধু
'সন্ধ্যামণি গাছটা এবার তুলেই ফেলি, কাকু।

ফুটল না তো একটি ফুলও তবে,
মিথ্যা ওকে রেখে কি আর হবে?'
পড়ল মনে সে সব কথা, যবে
বয়সটা মোর এম্‌নি কাঁচা সাধুর মতই হবে।

পদ্য লেখা ছিল গভীর নেশা,
সাদা পাতা কালো ক'রে শংকা আশায় মেশা।

সে ছিল মোর মনের কোণের ধন,
ব্যস্ত ছিলুম সদাই তারে ক'রতে সংগোপন।

পাঠিয়ে ছিলুম একটি লেখা কতই চুপে চুপে,
প্রখ্যাত কোন্ সাপ্তাহিকে দুরু দুরু বুকে,
রোজ ভেবেছি কত কথা গোপন ভীরু সুখে।

ফি'রে এল ডাকে,
আমার লেখা আমার কাছেই দু একমাসের ফাঁকে।

অন্ধকারে বারান্দাতে দুখের সে পাঠ শেখা
চোখের জলে ভিজিয়ে দিনু ফিরিয়ে দেওয়া লেখা।

রুদ্ধ কোন্ এক ক্ষোভে,
সকল লেখা আপনি ছিঁড়ে সঁপে ছিলেম স্টোভে।

ফুল না ফোটা সন্ধ্যামণি গাছ,
আবার ফিরে সেই ব্যথাটি স্মরিয়ে দিলে আজ।

ছেঁড়া লেখায়, ফুলহারা এ গাছে,
মনের অগোচরে যেন কোথায় মিলে গেছে।

হঠাৎ আমায় সাধুর ডাকে চমক্ আসে ফিরে,
জবাব আমি দিলেম তারে ধীরে,
'ফুলফোটাতো শেষ কথাটি নয়,
চলার পথে তোমায় হবে শেষের পরিচয়।"

বিজ্ঞান জননী মাদাম কুরি

(তরুণ কুমার রায়)

১৮৬৭ সালের ৭ই নভেম্বর, পোল্যাণ্ডের ছোট্ট একটি গ্রামে মানিয়ার জন্ম হয়. বাবা ভ্লাদিস্লাভ্ সক্লোড্ভস্কি ছিলেন ইস্কুলের শিক্ষক। মা মানাম সক্লোড্ভস্কাও আগে এক মেয়ে ইস্কুলের প্রধানা শিক্ষিকা ছিলেন। মানিয়ার জন্মের পর, তাঁর মা ছোঁয়াচে ও দুরারোগ্য যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন। তাই মাতৃস্নেহে বঞ্চিত মানিয়ার ছেলেবেলার বেশির ভাগ সময়ই তাঁর বাবার সঙ্গে অতিবাহিত হয়। দশবছর বয়সে মানিয়া ইস্কুলে ভর্তি হন। পাঠ্য পুস্তক ছাড়া, পদ্য ও রূপকথার বই পড়তে মানিয়ার খুব ভালো লাগত। ইস্কুলের পড়া তৈরীর সময়, মানিয়া এমন তন্ময় হয়ে যেতেন যে, অন্য কোনদিকে তাঁর খেয়াল থাকত না। একদিন, মানিয়া যখন গভীর মনোযোগের সাথে পড়া তৈরী করছেন, তখন তাঁকে জব্দ করার জন্য, তাঁর ভাইবোনেরা মাথার ওপর কতগুলো চেয়ার সাজিয়ে রাখে। পড়া শেষ করে উঠতে গেলে, চেয়ারগুলো তাঁর মাথায় উল্টে পড়ে। কি আশ্চর্য মনোযোগ, এত হৈ চৈ, চেয়ার টানাটানি, কিছুই মানিয়া শুনতে পাননি।

মায়ের মৃত্যুর পর, চরম অর্থসঙ্কটের মধ্যেও মানিয়ার বাবা তাঁকে সরকারী ইস্কুলে ভর্তি করে দিলেন। ষোল বছর বয়সে, ১৮৮৩ সালের ১২ই জুন, মানিয়া স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষায় প্রথম হয়ে পাশ করলেন। কিন্তু তখন পরাধীন পোল্যাণ্ডে মেয়েদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা ছিল বন্ধ। সেই সময়, পোল্যাণ্ডের দেশপ্রেমিকরা গোপনে স্থাপন করেছিলেন 'ভাসমান বিশ্ববিদ্যালয়।' এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের একদিকে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দেওয়া হত, অন্যদিকে দেশের যাবতীয় কুসংস্কার, অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাও দেওয়া হত। মানিয়া ও তাঁর মেজদি ব্রোনিয়া এই ভাসমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। কিন্তু, অর্থসঙ্কট ক্রমেই বাড়তে থাকে। এই সময়, অনেক ভাবনা চিন্তার পর, মানিয়ার পরামর্শে সামান্য কিছু টাকা যোগাড় করে ডাক্তারি পড়ার জন্য ব্রোনিয়া প্যারিস যাত্রা করলেন। আর, মানিয়াকে মাত্র সতেরো বছর বয়সেই চাকরীর চেষ্টায় বেরোতে হল। এই ভাবে যখন নিদারুণ হতাশার মধ্যে মানিয়ার দিন কাটছিল, তখন হঠাৎ, ব্রোনিয়ার কাছ

"প্রেমের জয়"

ময়ূখ দত্ত।

শীতের রাত। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া ছুঁচের মত এসে গায়ে বিঁধছে। পথে ঘাটে লোক চলাচল নেই বললেই চলে।

খেয়া ঘাটে। নদীর কিনারে ঘন অন্ধকারে ঢাকা পড়ে আছে যাত্রীবাহী নৌকাটা। রাত ন'টা বেজে গেছে। আর হয়ত ভাড়া আসবেনা। এই ভেবে নৌকার মাঝি শেরবাহাদুর রান্না চড়িয়েছে।

শেরবাহাদুর শেরই বটে। দু-তিনটে লোককে সে একা ঠাণ্ডা করার বল রাখে। যেমনি লম্বা তেমনি মোটা। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। গায়ের রং কুচকুচে কালো। গাঁজার গুণে চোখ দুটি সবসময়ই লাল থাকে।

শেরবাহাদুরের প্রকৃতিও নরখাদক বাঘের মত। মানুষ হত্যা করতে একটু দ্বিধা হয়না শের-বাহাদুরের। এ পর্যন্ত মানুষও সে কম হত্যা করেনি। রাতে একজন দুজন যাত্রী পেলে আর তাদের কাছে টাকা পয়সা আছে সন্দেহ হলে শেরবাহাদুর আর তাদের প্রাণ না নিয়ে ছাড়ে না; কেউ টেরও পায় না। লুঠ করা মাল নিয়ে বিজয়ীর মত ফিরে আসে শেরবাহাদুর। তারপর হয়তো দু-তিন দিন খেয়া ঘাটে আর পাত্তাই পাওয়া যায় না তার। সে চলে যায় তার গাঁয়ে।

গাঁয়ে সে একটি বাড়ি করেছে। অবশ্য লগিঠেলা পয়সা দিয়ে সে বাড়ি করতে পারেনি, করেছে লগির খোঁচা দিয়ে রোজগার করা পয়সা দিয়ে। সে বাড়িতে থাকে তার বিবি মমতাজ আর মমতাজের বুড়ী মা।

মাঝিপাড়ার মধ্যে শেরবাহাদুরের অবস্থা সকলের চেয়ে ভাল। পাড়ার মধ্যে একমাত্র শের-বাহাদুরের বাড়িতেই টিনের ঘর। বাড়িতে গরু আছে, ছাগল আছে আর আছে একপাল হাঁস-মুরগী। শেরবাহুরের বিবি মমতাজ রঙবেরঙের শাড়ী পরে। সোণার অলংকারও দুয়েকটা পরে। শের-বাহাদুরের এই সচ্ছল অবস্থা নির্মম দস্যু-বৃত্তির দ্বারাই সম্ভব হয়েছে।

শেরবাহাদুর পাকা ডাকাত। ডাকাতি ব্যবসাটা সে কৈশোর থেকে শিখেছে। শেরবাহাদুরের যখন এগারো বছর বয়স তখন তার মা মারা যায়। শেরবাহাদুরের বাবা করিম মিঞার ছিল ধান-চালের কারবার। পয়সার অভাব ছিল না করিম মিঞার। তাই অল্প কিছুদিনের মধ্যেই করিম মিঞা আবার সাদী করল।

প্রথম তিনটে বছর কোন রকমে কেটে গেল। শেরবাহাদুরের সৎমা শেরবাহাদুরকে ভালো না বাসলেও তার উপর অত্যাচার করত না কিন্তু চারবছরের মাথায় নিজের কোলে একটি ছেলে এলে নির্মম অত্যাচার শুরু করল শেরবাহাদুরের উপর।

বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে এই ঘাটেই বসেছিল শেরবাহাদুর। তখন এই ঘাটের খেয়া নৌকার

মাঝি ছিল গফুর। লোকে জানত গফুর নৌকার মাঝি কিন্তু আসলে গফুর ছিল ডাকাত। মাঝ নদীতে গিয়ে সুযোগ বুঝে যাত্রীদের আক্রমণ করে তাদের সর্বস্ব ছিনিয়ে নিয়ে, তাদের কেটে টুকরো টুকরো করে নদীর জলে ফেলে দিত।

ঘাটে পনর বছরের হৃষ্টপুষ্ট ছেলে শেরবাহাদুরকে দেখে গফুরের খুব ভালো লেগেছিল। শেরবাহাদুরকে বলেছিল 'ছোঁড়া কোথায় যাবি ?'

শেরবাহাদুর একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, 'যাবো না কোথাও. তোমার নায়ে আমায় চাকর রাখবে চাচা।'

গফুরের শেরবাহাদুরকে খুব ভালো লেগেছিল তাই এক কথায় রাজী হয়েছিল। গফুর শের-বাহাদুরকে বলেছিল, 'খাওয়া পরা সব পাবি আর সব সময় আমার কাছে থাকবি কেমন ?'

শেরবাহাদুর মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে ছিল।

শেরবাহাদুরের দৈহিক শক্তি, বুদ্ধি আর কাজ করার দক্ষতা দেখে গফুর মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই বছর তিনেক যেতে না যেতেই তার একমাত্র সন্তান মমতাজের সঙ্গে শেরবাহাদুরের সাদী হয়ে গেল। এসব অনেক দিন আগের কথা। গফুর এখন আর বেঁচে নেই। তবে গফুরের নৌকাটা এখনও আছে। এখন সেই নৌকারই মাঝি শেরবাহাদুর।

শেরবাহাদুর ভাত চড়িয়েছে। এমন সময় ঘাটের উপরে কে একজন ডাকল, 'ও মাঝি ভাই ভাড়া যাবে ?'

এত রাতে আর ভাড়া যাওয়ার ইচ্ছা শেরবাহাদুরের ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাঁচা পয়সার লোভ ও সামলাতে পারল না। আলোটা তুলে নিয়ে নৌকার ভেতর থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল সে।

ঘাটের উপরে দাঁড়িয়ে ছিল লোকটি। ফিটফাট বাবু। পরণে-গায়ে ধবধবে ধুতি পাঞ্জাবী। চোখে চশমা, হাতে বাঁধা ঘড়ি, ডান হাতের আঙুলে তিনটে ঝকমকে সোনার আংটি। লোকটির কাছ থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল তাঁর স্ত্রী। তার গা ভরা গহনা। এবার শের বাহাদুরের দৃষ্টি পড়ল লোকটির স্ত্রীর উপর। গা ভরা গহনা দেখে শের বাহাদুরের রক্তের ভেতরে পাক খেতে লাগল। তার ভেতরের ঘুমন্ত হিংস্র জন্তুটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

শের বাহাদুর 'আসুন' বলে গিয়ে নৌকায় উঠল। লোকটা আর তার স্ত্রীও আস্তে আস্তে এগিয়ে নৌকায় উঠল। ভাতটা হয়ে যাওয়ার আর তর সইল না শের বাহাদুরের। তাড়াতাড়ি উনুনের উপর থেকে ডেকচিটা নামিয়ে রেখে দিয়ে নৌকা ছেড়ে দিল।

লোকটি হেসে বলল, 'ও ভাই, রান্না শেষ হলো বুঝি ?

শের বাহাদুর বলল, 'না, আপনাদের পৌঁছে দিয়ে এসে আবার রাঁধব।'

পৌষ মাসের কৃষ্ণপক্ষের রাত। আকাশে তারাও নেই চাঁদও নেই। আকাশ ঢাকা মেঘ ডাকছে গুড় গুড় করে। নদীর বুকের উপর ঘন অন্ধকার।

ঘন অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে নৌকাটা। নৌকার এক দিকে বসে

শের বাহাদুর দাঁড় টানছে আর সেই লোকটি আর তার স্ত্রী বসে আছে। লোকটি তার স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'বেচারা আমাদের জন্য রান্নাটা পর্যন্ত করতে পারল না। ফিরে গিয়ে আবার রান্নাইবা করবে কখন? হয়ত না খেয়েই পড়ে থাকবে।' লোকটির স্ত্রী বলল, 'আমাদের সঙ্গে তো ভালো চিঁড়ে আর নতুন পাটালী গুড় আছে, ওকে কিছু দিলে হয় না?'

স্ত্রীর যুক্তিটা লোকটির মনে লেগে গেল। তাই লোকটি কিছু চিঁড়ে আর গুড় একটা পুঁটলিতে বেঁধে একটু এগিয়ে এসে নৌকার পাটাতনের উপর রেখে শের বাহাদুরকে ডেকে বলল, 'মাঝি ভাই, ফিরে গিয়ে হয়ত আর রান্না করবার ইচ্ছে হবে না তোমার। এই পুঁটলির মধ্যে ভালো চিঁড়ে আর নতুন পাটালী গুড় আছে, ফিরে গিয়ে খেয়ো'। শের বাহাদুর চমকে উঠল। কারণ সে যাকে হত্যা করার মতলব আঁটছে সে-ই তার কষ্ট দূর করবার চেষ্টা করছে। শের বাহাদুরের মনটা হঠাৎ কেমন যেন হয়ে গেল। লোকটির কথায় 'হুঁ' দিয়ে অন্য দিকে মুখ ফেরাল সে।

নৌকাটা প্রায় মাঝ নদীতে এসে গিয়েছে। এমন সময় কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া ছুটে আসতে লাগল উত্তর দিক থেকে। সে কি হাওয়া! মনে হচ্ছে বুকের পাঁজরা বুঝি ভেঙ্গে দেবে। লোকটি আর তার স্ত্রীর শীতনিবারণের উপযুক্ত পোষাক ছিল। তাই এদের বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে না। কষ্ট হতে লাগল শের বাহাদুরের। কারণ তার গায়ে এই প্রচণ্ড শীত নিবারণের উপযুক্ত পোষাক নেই। তাই ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে দাঁড় টানছে শের বাহাদুর।

শের বাহাদুরের কষ্ট দেখে লোকটির মায়া হলো। তার সাথে ছিল একটা ভালো কম্বল। সে সেখানা শের বাহাদুরের কাছে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'ও-ভাই এটা গায়ে জড়িয়ে বোস। কষ্ট হবে না তা হলে।'

শের বাহাদুরের মুখখানা পাণ্ডুর হয়ে গেছে। হাত-পা গুলি যেন অবশ হয়ে আসছে আস্তে আস্তে। তার ভেতরের যে পশুটার প্রেরণায় সে নরহত্যায় মেতে ওঠে সেটা যেন আজ আস্তে ঘুমিয়ে পড়ছে লোকটির মমতায় ঝরে পড়া মিষ্টি সুন্দর কথা গুলির ঘা খেয়ে। লোকটির দয়ার দানও উপেক্ষা করতে পারছে না সে। আস্তে আস্তে সে হাত বাড়িয়ে কম্বলখানা তুলে নিয়ে গায়ে জড়ালো।

এক সঙ্গে এতগুলি গহনা দেখেও আজ আর শেরবাহাদুর কিছুই করতে পারল না। মন্ত্রমুগ্ধের মত আজ সে নৌকা বেয়ে এসে ঘাটে ভিড়ালো।

লোকটি ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে তার স্ত্রীকে নিয়ে নৌকা থেকে নেমে গেল। শের বাহাদুর হঠাৎ নৌকা থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুটে গিয়ে তার পা দুটো জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল। লোকটি বিস্মিত হয়ে বলল, 'কি হয়েছে তোমার?'

শের বাহাদুর কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'সোনা দানার লোভে আমি আপনাদের শেষ করতে চেয়েছিলাম। আমায় রক্ষা করুন। আমায়...... ।'

লোকটি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'তোমায় ক্ষমা করলুম, এখন ওঠ।'

শের বাহাদুর তবু পা ছেড়ে ওঠে না দেখে লোকটি দু-হাত দিয়ে ধরে শের বাহাদুরকে দাঁড়

করিয়ে বলল, 'সিগারেট খাও।'

এই বলে সিগারেটের প্যাকেট থেকে দুটো সিগারেট বের করে নিজে একটা নিয়ে শের বাহাদুরকে দিল আর একটা। দেশলাই জেলে নিজের সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে আগুনটা শের বাহাদুরের মুখের কাছে নিয়ে গেল। সেই মৃদু আলোয় সে দেখলো শের বাহাদুরের চোখের জল তখনও শুকোয়নি। দৃষ্টি নত।

হিংসুটে

অমিয়কৃষ্ণ রায় চৌধুরী

পাড়ার হারু চণ্ডী দে-কে বললে, 'জগুর সেজো ছেলে
পরীক্ষাতে প্রথম হয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি পেলে।'
চণ্ডী বলে—'যথা-তথা
রটাও কেন গুজব কথা?'
পকেট থেকে অমনি হারু গেজেটখানা ধরলো মেলে।
চণ্ডী বলে, 'চাকরি পেলেও, পাবে না সে মাইনে জেনো।'
হারু বলে, 'তাও পেয়েছে,—জানে পাড়ার হরে, পেনো।
আগামী কাল নিমন্ত্রণে
খাওয়াবে তার বন্ধু জনে;
চাকরি পেয়ে আনন্দে সে ভোজ দেবে খুব টাকা ঢেলে।'
চণ্ডী শুনে কাষ্ঠ হেসে, একটু কেসে, বললে 'আরে
পাক্‌না যতই,—জান্‌বি সে সব অচল টাকা একেবারে!
মেকি যদি যায় চালাতে
পড়বে ধরা হাতে-নাতে;
চাকরি যাবে বাছাধনের,—পাঁচটি বছর থাকবে জেলে।'

চিল, চাঁদিয়াল আর আমি

জীবন সর্দার

নীলাঞ্জন ঘুড়ি ওড়াতে পারে না। আমিও পারি না। আমরা দুজনেই ঘুড়ি ওড়ানো দেখতে ভালবাসি। কেননা, ঘুড়ি উড়তে দেখলেই একটি পাখির কথা মনে পড়ে।

একদিন কি সখ হল, একটি ঘুড়ি লাটাই আর অনেকখানি সুতো কিনে, ছাদ থেকে উড়িয়ে দিলাম ঘুড়িটাকে। চিল ওড়া দেখে দেখে ওড়ার কায়দা আমরা কিছু বুঝে নিয়েছিলাম। দেখেছি, চিল উড়ছে উঁচুতে—ভেসে ভেসে। লেজের এককোণা একটু কাত করে দিল, অন্যদিকে কাত হয়ে সরে গেল সে। কখনো মাথাটা ইচ্ছেমত ঘুরিয়ে বা একটি ডানা একটু বাঁকিয়ে চিল দিক পালটায়। কার্নিশে বা ডালে বসে থাকা চিল প্রায়ই হাওয়ার মুখোমুখি ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, তারপর যেদিকে খুশি মোড় নেয়। সুরুতে একটু ডানা ঝাপটায় তারপর উঁচুতে উঠে ডানা মেলে দিয়ে ভাসতে থাকে।

হাওয়া যেদিক বইছে আমরা সেদিকেই ঘুড়িটাকে উড়িয়ে দিয়ে সুতো ছাড়তে সুরু করলাম। সুতোটা ডিগবাজি খেতে খেতে দূরে সরে যেতে লাগল। কিন্তু আমরা চাইছিলাম ওটা চিলের মত ভাসুক আকাশে। তা কি হয়, ঘুড়ি ত আর পাখি নয়! পাখিদের দেহের গড়ন এমন যে উড়তে গেলে যা দরকার সবই ঠিকঠাক রয়েছে:

তার হাড়ের কাঠামো হাল্‌কা কিন্তু মজবুত, ডানায় আর শরীরে পেশী আর পালকগুলো এমন করে সাজানো যে উড়তে হাওয়ায় বাধা পায় না বরং বাতাসে ভাসার জন্য ওর চেয়ে চমৎকার আর কোন যন্ত্রের কথা ভাবা যায় না।

এত সুবিধে থাকতেও সব পাখি একই ভাবে ওড়েনা। ওড়ার সহজ উপায় বাতাসে ডানা মেলে ভেসে পড়া। বটের তিত্তির যেভাবে ওড়ে। কোন উঁচু জায়গা থেকে, বাতাস যেদিকে বইছে সেদিকে ডানা মেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে যতদূর যাওয়া যায়। অমনি করে সব পাখি ওড়েনা। কিন্তু জলে বা স্থলে উড়ে এসে বসার আগে, অনেক পাখিই তাই করে! ওড়ার আর একটি কায়দা ডানা ঝাপটানো। প্রায় সব পাখিই দেখি ডানা ঝাপটে উড়ে যায়। ফিঙ্গে খঞ্জন পাখিরা ডানা খুলে, ঝাপটে বন্ধ করে ওড়ে। মনে হয় ঢেউ খেলে উড়ছে।

লাটাইটি আমার হাতে দিয়ে নীলাঞ্জন বললে, নাও ধর, কি ভাবছ এত। সেই মুহূর্তেই একটি কাণ্ড ঘটে গেল। ঘুড়িটি পাক খেয়ে উড়ছিল—সুতো ছাড়ছিলাম তাই। হাত বদলের সময় পাক খেয়ে ওঠার মুখে টান পড়তেই ঘুড়িটা সোঁ করে অনেকটা উঠে গেল। একবার সুতো ছেড়ে পাক খাইয়ে ঘুড়িটির মুখ নীচের দিকে হতেই সুতো ছাড়া বন্ধ করে টান দিলাম—গোত্তা খেল ঘুড়িটি। লাটাই নীলাঞ্জনকে দিয়ে আমি আবার চিল দেখতে সুরু করলাম:

একটি চিল সোজা মাটির সমান্তরাল উড়ছে। ডানা মেলে ভাসতে ভাসতেই লেজটা যতটা পারে ছড়িয়ে দিল, মাথাটি নেমে এল নীচের দিকে। চিলটি ঐভাবে গোত্তা খেল। ওঠার সময় লেজ গুটিয়ে নিল, মাথা উঠে গেল উপরের দিকে। ওড়ার কাজে হাওয়াকে কি চমৎকার কাজে লাগিয়ে নিল। পাখির ডানাগুলো কব্জীর কাছে বাঁকা আর ডানার উপরদিকে উঁচু, ডানার ডগা আমাদের আঙুলের মতো ছাড়াছাড়া। তাতে, ডানা তুললে বাতাস পাশ কাটাতে বাধা কম পায়। আবার ডানা নামাবার সময় ডানার তলায় বাতাস চাপড় খায়। সে সময়, যে পাখিরা 'ডানা-ঝাপটে' ওড়ে, তারা, ডানা সবটা মেলে দেয়। কিন্তু ডানার পালকগুলো আরও ঘন হয়ে আঁকড়ে থাকে। এই সব মিলিয়ে এমন একটি ঘটনা ঘটে যাতে পাখিটি একটু একটু করে ওপরে উঠে যায়। ডানা ঝাপটে ওপরে না হয় উঠল, কিন্তু সামনে এগোয় কি করে ?

খালি চোখে ব্যাপারটা বোঝা যায়না বটে, কিন্তু ভাল করে দেখে বলা যায় : পাখিরা ডানা উপরে তুলে পিছিয়ে নেয় তারপর নীচে নামিয়ে সামনে ঠেলে। ডানা নামিয়ে সামনে আনার সময় ওঠার সামনের ধার একটু ঝুঁকে যায়, ফলে বাতাস চলে যায় পেছনে। তাই পাখিটি নীচের আর পেছনের বাতাসকে ঠেলে সামনে, আরও সামনে এগিয়ে চলে। ওড়ার এই কাজটি এত তাড়াতাড়ি ঘটে যে আমরা তা' দেখেও বুঝতে পারিনা। ওড়ার আরও কত যে কায়দা আছে ! তালচোঁচ একে বেঁকে উঠে পড়ে নানান কায়দায় ওড়ে। মৌচুষি ফুলের মধু খেয়ে নেয় উড়ে উড়েই, পাতার তলা থেকে পোকা খায় সোজা পাতার তলায় উড়ে গিয়ে। 'নানা কায়দায়' ওড়ার জন্য ডানার গড়নেও নানা কায়দা আছে বৈকি।

ঘুড়িটিকে সুতো ছাড়তে ছাড়তে সব সুতো ফুরিয়ে গেল। নীলাঞ্জন বললে, এবার ! আমি লাটাইটি এরিয়েলের বাঁশের সাথে বেঁধে রেখে বললাম, দেখি চিলেরা কি করে। ওড়ার যত কায়দাই থাক, অনেক উঁচুতে উঠে, ডানা না ঝাপটে, বাতাসে ভেসে ভেসে ঘুরে বেড়ানোই সব ওড়ার সেরা ওড়া। ঠিক জায়গাটিতে উঠে গেলে ডানা আর ঝাপটাতে হয়না, শুধু আকাশে ভেসে থাকা—যেমন আমাদের ঘুড়িটি এখন উড়ছে। সুতো ছাড়তে হচ্ছেনা। কিন্তু এই কায়দায় উড়তে পারে সেই পাখিরাই যাদের ডানা বেশ বড় ; তা, সরু লম্বা হতে পারে দূর সমুদ্রের আলবাটারস পাখিদের যেমন, কিংবা চওড়া খাটো ডানা হতে পারে চিলশকুনের ডানার মত। বাতাসের স্রোতকে এই সব পাখিরা এমন করে নিজের ওড়ার কাজে লাগিয়ে নেয় ভাবতে অবাক লাগে। ডানা ছাড়া ওড়ার কাজে আর যা কিছু সবচেয়ে দরকার তা' পাখির লেজ। পাখিদের লেজের গড়নই কত রকম : লম্বা লেজ, খাটো লেজ, চেরা লেজ, জোড়া লেজ। লেজ যে ওড়ার কোন না কোন কাজে লাগে, শুধু বাহারের জন্য নয় তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। চড়ুই পায়রা শালিকের লেজ, ফিঙের লেজ, মাছরাঙার লেজ, কাঠঠোকরার লেজ, হাঁসের লেজ, টিয়া চাতকের লেজ, চিল, বাজ, শকুনের লেজ—লেজের কত রকমফের।

বুকে চাঁদ আঁকা আমাদের চাঁদিয়াল ঘুড়িটির লেজ ছিল না। লেজ থাকলেও আমাদের ইচ্ছেমত তাকে দিয়ে সব রকম কায়দায় ওড়াতে পারতুম না ! ঘুড়ি ওড়ানোর কৌশল সুতোয় আর হাওয়ায় !

পাখিরা ওড়ার জন্য হাওয়া আর ডানাকে কত ভাবে কাজ লাগায়। হাঁসেরা ডানা ঝাপটে ওড়ে, তার লেজ এমন যে এদিকে সেদিকে তাড়াতাড়ি বাঁক নিতে পারে না কিন্তু জলে নামার সময় ঐ লেজটিই 'ব্রেকের' কাজ করে। গাছের ডালে বা মাটিতে উড়ে এসে বসার সময় প্রায় সব পাখিই হাওয়ায় লেজ দিয়ে 'ব্রেক' করে।

হাওয়া পড়ে গিয়েছিল, আমাদের চাঁদিয়াল নেতিয়ে গেল। সুতো গুটিয়ে গুটিয়ে তাকে তুলতে লাগলাম—কাঠঠোকরা যেমন গাছ বেয়ে বেয়ে উঠে যায়। মাটি থেকে ওঠার সময় শকুনকে এর চেয়েও বেশী কষ্ট করতে হয়—ডানা মেলে দিলেই আর উড়তে পারে না। থপ্ থপ্ করে কিছুটা জোড় পায়ে লাফিয়ে গতি পেলে তাঁরপর সাঁই সাঁই করে ডানা ঝাপটে উঠে পড়ে। খুব উঁচুতে উঠে তারপর ডানা মেলে শুধু ভেসে থাকে।

উঁচু আকাশে ভেসে থাকা পাখি দেখে দেখে সময় কাটাচ্ছিলাম। ঝকমক রোদে বিন্দু বিন্দু দেখাচ্ছে সে কোন উঁচুতে একঝাঁক শকুন, কিংবা একটি দুটি চিল। কোথায় কি দেখল কে জানে শোঁ শোঁ করে নেমে গেল—তীর ধনুক এক সাথেই যেন! আকাশ নীল। সাদা মেঘের সাথে সাথে চিল শকুনগুলিও সরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের চাঁদিয়াল যেখানে ছিল সেখানেই। খেয়াল করিনি কখন এক পঙ্খীরাজ ঘুড়ি চাঁদিয়ালের উপরে উঠে গিয়েছে। গোত্তা খেয়ে পঙ্খীরাজ চাঁদিয়ালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর শুনলাম—ভোঁ-কা টা! কী বীভৎস চিৎকার। আমরা দুজন সুতো গোটাতে ভুলে গিয়ে তাকিয়ে রইলাম—চাঁদিয়াল টলে টলে হাওয়ার বেগে মাটির টানে ঝরাপাতার মত কোথায় চলে যাচ্ছে।

পাখির পরিচয়ঃ মৌচুষি

ফুলে ফুলে মধু খায় বলে হয়ত ঐ নাম। কেউ বলে মধুকুয়া, কোথাও বলে দুর্গাটুনটুনি। দেখতে টুনটুনির সমানই হবে। ঠোঁট সুঁচলো, লম্বা আর বাঁকা। ছেলে পাখির রং চকচকে কালো। মেয়ে মৌচুষিদের পিঠ আর ডানা বাদামী, বুক আর পেট হলদেটে। ছেলে পাখির রং বর্ষার শেষ থেকে শীতের শেষ পর্যন্ত (সময়ের হেরফের হতে পারে একটু) মেয়ে পাখির রংএর মতই। তবে, সে সময়ে তাদের থুতনি থেকে তলপেট পর্যন্ত একটি বেগুনি রেখা দেখবে। ফুলের মধু পোকামাকড় সব খায়। খাবার খুঁজতে আর খেতে ওড়ার নানা কসরৎ করে, দেখাতে পারে। চুল, ঘাস, পাতা, কাঠি, বাকল, বাদামের খোসা, কাগজের টুকরো, বিশেষ করে শুঁয়োপোকার লাদা—এ সব দিয়ে বাসা বানায়। বাসাটা গোল বা পেয়ারার মত দেখতে—একপাশে ফুকর থাকে ঢুকবার। একটি ফিতে মত কিছু বাসা থেকে ঝুলবেই। আমাদেরই ঘরের আশেপাশে বাসা বোনে কোথাও নীচু কাঁটা গাছে, কোথাও ঘরের বারান্দায় বাসায় দুতিনটি সবজে ছাই ছাই ডিম দেখবে। মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে খুঁজে দেখো।

(আমার নাম পানু, বয়স বারো বছর। বাস থেকে পড়ে গিয়ে আমার শিরদাঁড়া জখম হয়ে গিয়েছে বলে হাঁটতে পারি না, একটা ছোট গাড়ি চড়ে বাড়ির মধ্যে ঘুরে বেড়াই আর তেতলার জানলা দিয়ে চারদিকে দেখি। ভজুদা বলেন—হাঁটতে চেষ্টা কর! এক্সারসাইজ কর্। আমার পোষা বেড়ালের নাম নেপো।

ভজুদা সকালে আমাকে তিন ঘণ্টা পড়ান, আমি বাড়িতে বসেই বার্ষিক পরীক্ষা পাশ করেছি।

বড় মাস্টার প্রতি রবিবারে আমাকে গল্প বলতে আসেন। গুপি আমার বন্ধু, সেও গল্প শোনে।

তিনি লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা করেছেন, সারা পৃথিবী ঘুরে সাংঘাতিক, রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। ঝড়ের মধ্যে জাহাজডুবি হয়েছিল, হাঙরে একটা পা কামড়ে টেনে নিয়েছিল, এখন কাঠের পা। অগ্নিকাণ্ডে বৌ-এর মুখ পুড়ে গিয়েছিল। এখন সব ছেড়ে ছুড়ে সামান্য টাকায় আমাদের বাড়ির পাশের ছাপাখানার প্রুফ দেখেন আর নাইট স্কুল চালান। তাঁর নতুন এসিস্টান্ট তলাপত্র আমাদের বাড়ি এসেছিলেন।

গুপি তার ছোট মামার কাছ থেকে নানা বই আনে, মঙ্গলের মানুষ, চন্দ্রনাথের চন্দ্রযাত্রা—এই সব। আমরা ঠিক করেছি বড় হয়ে চাঁদে যাব। গুপির ছোটমামা মহাকাশ-যান বানাবে। এখন থেকে লোহা পেরেক জমাচ্ছে।

ভজুদাদের কলেজের প্রিন্সিপ্যালের নতুন গাড়ি চুরি হয়ে গেছে মেজকাকুর গাড়িও। আজকাল হরদম গাড়ি চুরি হচ্ছে। কিন্তু এবার বিখ্যাত গোয়েন্দা বিনু তালুকদার তাঁর দলবল নিয়ে আসরে নেমেছেন। মোটর চোরদের ঘাঁটিশুদ্ধ নাকি তাঁরা বের করে দেবেন! কানু সামন্তর মুখে খালি সেই কথা।

কদিন থেকে নেপোকে পাওয়া যাচ্ছে না। গতমাসে এই পাড়া থেকে ছত্রিশটা বেড়াল নিখোঁজ।

বাড়ির পেছনের 'ঠাণ্ডাঘরটা' থেকে দারুণ খটখট, ঝনঝন আওয়াজ আসছে। ঠিক যেন বরফ কাটার শব্দ। ঘরটা এত বেশি ঠাণ্ডা করেছে যে ওখানে নাকি পেঙ্গুইন গজিয়েছে। ওখানে নাকি গোপনে স্পেস শিপ তৈরি করছে।

বুড়ি ভিখিরিটা চা-ওয়ালা তেওয়ারির সঙ্গে ঝগড়া করছে। রামকানাই বলে যে ঐ বুড়ি, আর যে বুড়ো দাঁড়িয়ে হাত পেতে ভিক্ষে চায়, তারা দুজনে নাকি একই লোক।

হঠাৎ কানু সামন্তকে নিয়ে বাবা এসে খবর দিলেন যে পড়াশুনা না করার জন্য তার বাবার কাছে বকুনি খেয়ে গুপির ছোট মামা বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে।

ওদিকে তার ঘরে জমানো লোহা লক্কড়ের মধ্যে দুটো চোরাই গাড়ির নাম্বার-প্লেট পাওয়া গেছে।

পরে গুপি এসে আমাকে গোপনে খবর দিল যে ছোটমামা দাড়ি-টাড়ি লাগিয়ে, ঠাণ্ডাঘরের 'বদলি' নাইট-ওয়াচম্যানের চাকরি নিয়ে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে।)

ছয়

আজকাল ছোট মাস্টার-ও রোজ আসেন। ডাক্তারবাবু বাবাকে বলেছেন যে আমাকে নানা রকম ভালো ভালো হাতের কাজ শেখালে মনটন ভালো থাকবে, তা হলে ঠ্যাং দুটোও তাড়াতাড়ি সারবে। নাকি রোগটা ঠ্যাংএর নয়, মনের। মনের জোর হলেই পায়ের জোর হবে। কিছু বললাম না, কারণ হাতের কাজ শিখতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

আপত্তি তো নেই-ই, বরং আগ্রহ আছে বলা যায়। বড় মাস্টার বাবাকে বললেন 'তলাপত্র যন্ত্রপাতি গাড়ি ইত্যাদির ছোট ছোট মডেল তৈরি করতে ওস্তাদ। আমাদের নাইটস্কুলের বড় ছেলেদের দিয়ে রেলগাড়ি আর এঞ্জিনের যে খাসা মডেল করিয়েছে, দেখলে অবাক হয়ে যাবেন।'

বাবাকে দেখাবার জন্যে মডেলটা আনলেনও বড় মাস্টার। দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। অবিকল একটা রেলগাড়ি। দরজা, জানলা, স্প্রিং, চাকা, আলো, পাখা, জলের ট্যাঙ্ক, লাইন, ব্রেক, অ্যালার্ম সিগ্‌নেল, ইলেকট্রিক ইঞ্জিনের যাবতীয় কিছু, একেবারে হুবহু সত্যিকার গাড়িতে যেমন থাকে। রং টং দিয়ে তৈরি। আমার ঘরের মেঝেতে লাইন বসিয়ে, প্লাগ্ লাগিয়ে সেই গাড়ি চালানো হল। তার বাঁশিটি পর্যন্ত অবিকল। কি বলব, গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল।

সেদিন রাতে মা-বাবার মুখে ছোট মাস্টারের প্রশংসা আর ধরে না। এত দিন চোর-চোর চেহারা, সোজা তাকায় না কেন, ইত্যাদি কি না বলেছেন সবাই। আজ একেবারে উল্টো কথা। তখনি ঠিক হয়ে গেল ছোট মাস্টার রোজ বিকেলে নাইটস্কুলে যাবার আগে আমাকে ঘণ্টা দুই হাতের কাজ শেখাবেন। ভালোই হল; ঐ সময়টাই আমার ভালো কাটত না। রোজ চারটে থেকে ছটা যদি মডেল তৈরি করা যায়, বিশেষতঃ ছোট মাস্টারের সঙ্গে, তাহলে মন্দ কি। তাছাড়া আমার আরেকটা মৎলবও আছে।

প্রথম দিন ছোট মাস্টার এসে কিছু বলবার আগেই আমি বললাম, 'স্পেসশিপের মডেল করা যায় না?' ছোট মাস্টার একটু হকচকিয়ে গেলেন। 'একেবারে স্পেস্‌শিপ দিয়েই শুরু করবে নাকি? আগে ছোটখাটো দুটো একটা জিনিস করলে হয় না?'

আমি বললাম, 'বেশ তো, আগে ছোটখাটো জিনিস দিয়েই না হয় শুরু করা যাবে। ঐ যে সেদিন পাক-খাওয়ার মেশিনের কথা বলছিলেন, তাই দিয়েই আরম্ভ করা যাক। ঐ বইটাতে তার ছবিও আছে।'

অন্য কেউ হলে হয়তো বকাবকি করত। কিন্তু ছোট মাস্টার বললেন, 'আচ্ছা, তাই হবে। তা হলে বইটা থেকে ঐ যন্ত্রটার পার্টগুলোর ছবি আগে এঁকে নিতে হবে। কাগজ পেনসিল রবার সব-ই তো আছে। মাপ নেবার জন্য কম্পাস্ ইত্যাদিও লাগবে। ঐ মাপেই এঁকো।'

তারপর একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সত্যি সত্যি যাবার ইচ্ছা আছে দেখছি। কাগজে দেখলাম রাসিয়ানরা সম্ভবতঃ আসছে বছর চাঁদে মানুষ নামাবে।'

আমি আরেকটু হলে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েই উঠছিলাম। পিছনটাকে চেয়ার থেকে খানিকটা বোধ হয় তুলেই ফেলেছিলাম। কিন্তু সে কথা মনে হতেই ধপ্ করে আবার চেয়ারের উপর পড়ে গেলাম। ছোট মাস্টার সব দেখলেন। বললেন, 'লাগে নি তো? চাঁদে যাবে বলে যে সবার আগে যেতে হবে তার কোনো মানে নেই। তা ছাড়া নিজেদের স্পেসশিপে করে যেতে হলে একটু দেরি তো হবেই। বৈজ্ঞানিকরা আগে গিয়ে দেখেই আসুক না সেখানকার অবস্থাটা কি রকম। কি বল? সেই বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।'

আমি বললাম; 'বাবা বলছিলেন, এর মধ্যে রাসিয়ানদের একটা 'জণ্ড-পাঁচ' চাঁদের চারদিকে ঘুরে ফিরে এসেছে। এর আগে চাঁদে রকেট নেমেছে বটে, কিন্তু একবার নেমে, আবার উঠে ফিরে আসে নি। বোধ হয় মানুষ না গেলে, সেটা খুব শক্ত কাজ। ইস্, পাছুটোর উপর এমনি রাগ হয়!' এই বলে পাছুটোকে শক্ত করবার চেষ্টা করলাম। কেমন যেন ঝিঁ ঝিঁ ধরার মতো মনে হল।

ঠিক সেই সময় একটা ছোট বাণ্ডিল হাতে নিয়ে গুপি এসে উপস্থিত। স্কুলের জন্মদিন বলে সেদিন নাকি একটায় ছুটি হয়ে গেছে। পুঁটলিতে কি?

গুপি একটু লজ্জা পেল। খিদিরপুর ডকের কাছে নাকি সস্তায় খুব দরকারী সব পুরনো জিনিস বিক্রী হচ্ছিল। তারি কিছু কিনে এনেছে। খুলে দেখলাম নাইলনের হাওয়া বালিশ, হাওয়া না থাকলে রুমালের মতো ছোট করে ভাঁজ করে ফেলা যায়। নাইলনের জলের বোতল আর খাবার রাখার থলি। হাঁ করে ছোট মাস্টার গুপির দিকে চেয়ে রইলেন। গুপি বলল, 'হ্যাঁ স্যার, আগে থাকতেই বন্দোবস্ত করা দরকার। বেশি দিন তো আর নেই। নিজেদের খাবার-দাবার নিজেরা নিলেই ভালো। শুনলাম পাঁচ দিনের ওয়াস্তা; পাঁচদিন! মানে, খালি রকেট সাত দিনে গিয়ে ফিরতে পারে বটে, কিন্তু লোকজন জিনিসপত্র থাকলে নিশ্চয় কিছু বেশি সময় লাগবে। হয়তো যেতে আসতে পাঁচ-পাঁচ মোট দশ দিন।'

আমি বললাম, 'চোঙা মতো ওটা কি?' গুপি হেসে বলল, 'ঐটাই তো আসল জিনিস। চাঁদ দেখার টেলিস্কোপ। কোনো জাহাজের খ্যাপা ক্যাপ্টেন নাকি ওটাকে বন্ধক দিয়ে টাকা নিয়েছিল, আর ছাড়াতে আসে নি।'

'টেলিস্কোপ? টেলিস্কোপ দিয়ে কি হবে?' ছোটমাস্টার লাফিয়ে উঠলেন, 'আকাশ দেখার টেলিস্কোপ নাকি? সে তো অন্য রকম দেখতে হয়।' তারপর টেলিস্কোপটা বের করে বললেন, 'না, আকাশ দেখার নয়। কিন্তু খুব পাওয়ারফুল। সমুদ্রে দূরে দেখার জন্যে ব্যবহার হয়। আকাশে এরোপ্লেন ইত্যাদি-ও দেখা যায়। দেখবে নাকি, পানু?'

ছোটমাস্টার টেলিস্কোপের লেন্স পরিষ্কার করে দিয়ে, ফোকাস ঠিক করে, আমার হাতে দিলেন। আমি জানলা দিয়ে চারিদিক দেখতে লাগলাম। সব অন্যরকম লাগল। ঠাণ্ডা ঘরটাকে ভালো করে দেখলাম। মনে

চল ছাদে কি সব পাইচারি করছে, ছোটোমতো, সাদা কালো। আলো কম বলে ভালো করে বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ একটা সন্দেহ হল, 'গুপি, নিশ্চয় পে—উঃ!' গুপি আমার হাঁটুর উপরে খুব জোরে চিমটি কাটল। আমি টেলিস্কোপ নামাতেই, ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে কিছু বলতে মানা করল। মুখে বলল, 'চাঁদ উঠেছে, ছাখ্ ভালো করে।'

চাঁদের দিকে টেলিস্কোপ ফেরালাম। অদ্ভুত লাগল। অবিশ্যি পাহাড়-পর্বত এটা দিয়ে দেখা গেল না। কিন্তু আরেকটা জিনিস দেখে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। স্পষ্ট দেখলাম, জিনিসপত্রে বোঝাই ডানাওয়ালা একটা নৌকোর মতো কি যেন, চাঁদের মুখের উপর দিয়ে আস্তে আস্তে ভেসে গেল। কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে তার কুচকুচে কালো আকৃতি পূর্ণিমার চাঁদের সোনালি গায়ের উপর পরিষ্কার ফুটে উঠল। তারপরেই চাঁদ পেরিয়ে এক টুকরো কালচে মেঘের পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমার মুখ দেখে ওরা দুজন চ্যাঁচাতে লাগল। 'কি হল? কি হল? শরীর খারাপ হল নাকি?' আমি বললাম, 'না। চাঁদে যাবার প্রথম নৌকোটাকে বোধহয় দেখলাম। লটবহর নিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, গুপি, ছোটমামা কি—' গুপি বলল, 'চোপ।'

ছোটমাস্টার তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন, 'আচ্ছা, আমি তা হলে আসি। আমি থাকলে তোমাদের কথা-বার্তার অসুবিধা হয়। তাছাড়া, নাইট ক্লাসের আর বেশি দেরিও নেই।' বলেই, বোধ হয় একটু রেগে হন্‌হন্ করে চলে গেলেন। খুব খারাপ লাগল। কিন্তু গুপি খুসি হয়ে বলল, 'যাক্, বাঁচা গেল, লোকটা ঠিক ছিনে জোঁক, কিছুতেই তোকে ছাড়তে চায় না।' আমি বললাম, 'না রে গুপি। উনি রবিবার ছাড়া রোজ আমাকে দু'ঘণ্টা করে হাতের কাজ শেখাবেন। প্রথমেই আমরা স্পেসশিপের মডেল বানাব। তারপর সেটাকে বড় করে বানাতে কতক্ষণ!' শুনে গুপিরো কি উৎসাহ!

আমি বললাম, 'আচ্ছা, ছোটমামাকে তো আর একদিন-ও দেখতে পেলাম না, গুপি। চাকরি গেল নাকি?' গুপি বলল, 'আরে, না, না, তাই যায় কখনো! ছোটমামা ভয়ঙ্কর চালাক, প্রেসের ভিতরে আজকাল ওর দিনের বেলায় ডিউটি। বড় সাহেবকে পটিয়েছে। ক্যান্টিন দেখে। তার জন্যে পয়সা নেয় না, কিন্তু দুবেলা খাবার পায়। বড় সাহেবরা যা খায়, ও-ও, তাই খায়। চপ, কাটলেট, মুরগির ভিন্দালু, পুডিং।'

দুজনেই খানিকক্ষণ চুপ করে সে-সব কথা ভাবতে লাগলাম। তারপর গুপি বলল, 'কিন্তু বড় মাস্টারের কি রাগ! ওকে চেনেন না, জানেন না, তবু কেবলি ছোট সাহেবের কান ভাঙাতে চেষ্টা করবেন। স্রেফ্ হিংসে। ছোটমামা খাবে ক্যান্টিনে, আর বুড়ো খাবে তেওয়ারির দোকানে, এই আর কি! সমস্তক্ষণ ছোঁকছোঁক করে ছোটমামার পিছনে ঘোরেন, প্রুফ দেখেন না হাতি! একটু যে তদন্ত করবে, ছোটমামার সে জো নেই।'

আমি বললাম, 'কেন, রাতে তদন্ত করলেই হয়।' শুনে গুপির কি হাসি, 'তাহলেই হয়েছে! ছোটমামার যা ভূতের ভয়! ও রাতে গলি দিয়ে নামল আর কি!'

আমি অবাক হয়ে গেলাম। 'তবে না নাইট ওয়াচ ম্যানের বদলির কাজ নিয়েছিল বলেছিলে?' গুপি বলল, 'তাতে কি হয়েছে! সব নাইট ওয়াচম্যানরা ভূতের নামে জুজু! ছোটমামা সিঁড়ির মাথা থেকেই চৌকিদারি করত। আগের ওয়াচ্‌ম্যান্-ই তাই বলে দিয়েছিল। সে-ও তাই করত। এখানকার সব রাতের পাহারাওয়ালারাই তাই করে। আর যারা ভূতে বিশ্বাস করে না, তারা দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমোয়। মোট কথা ঠাণ্ডা ঘরে কি রকম স্পেসশিপ তৈরি হচ্ছে, আর কারাই বা তৈরি করছে, এ বিষয়ে এতটুকু তদন্ত করার সময় পাচ্ছে না ছোটমামা। তাছাড়া ঐ সরকারি ছাপাখানাটা কি কম পুরনো ভেবেছিস্ নাকি। কোম্পানির আমোলে

ওটা এদিককার সবচেয়ে বড় গুদোমঘর ছিল। মোটে আশী বছর হল ছাপাখানা হয়েছে। ভূতভূত থাকলে ঐখানেই থাকা কিছু বিচিত্র নয়। ছোটমামা রাতে শুয়ে শুয়ে হাঁচড়পাঁচড় উঁয়া-উঁম্বা শব্দ শোনে। কোনদিন না আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যায়।'

আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম, 'মানা কর্, গুপি, বাড়িতে পা দিয়েছে কি ক্যাঁক্ করে সামন্ত ওকে ধরবে। ওর ঘরে না চোরাই গাড়ির নেমপ্লেট পাওয়া গেছে!'

গুপি বলল, 'আরে দূর! দূর! সে বিষয়ে ছোটমামাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বলল নাকি বড়বাজারের ওদিকে পুরনো লোহার ডাঁই আছে, সেখান থেকে কুড়িয়ে এনেছে। গাড়ির নেমপ্লেট খুলবে ও! আমাকে দিয়ে নিজের পেনসিল কাটায়, ব্লেড দেখলে ওর গা শির-শির করে! নেংটি ইঁদুর ভয় পায়।'

তারপর হঠাৎ থেমে গুপি বলল, 'ছোট মাস্টারকে কি চোরাই কারবারি মনে হয়?'

ভয়ানক রাগ হল। বললাম, 'আমাদের বাড়িতে যারা আসে যায় তাদের তোর সন্দেহ বাতিক থেকে বাদ দে। সামন্তর তো ধারণা যে তোর ছোটমামাই চোরাই কারবারের চাঁই।' গুপি তার জিনিসপত্র গুটিয়ে তুলে চলে গেল। দরজার কাছ থেকে বলে গেল, 'আশা করি এর পরেও ছোটমামার স্পেসশিপে জায়গা আশা কর না!' আমিও চটেমটে বললাম, 'যারা স্পেসশিপ বানায়, তারা পুরনো লোহার ছ্যাকড়া ঘুড়ি চড়ে না।'

গুপি চলে গেলে মনটা খুব-ই খারাপ হয়ে গেল। স্কুলের সব খবর ওর কাছেই পাই। বলতে গেলে ও-ই আমার একমাত্র বন্ধু। ছোট মাস্টারের হাতে লেখা চাঁদ বিষয়ক নোট বইটা খুলে বসলাম।

চাঁদ পৃথিবী থেকে গড়পড়তা দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দূরে।

তার মধ্যে দুই লক্ষ ষোল হাজার মাইল পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির এলাকার মধ্যে। বাকি চব্বিশ হাজার মাইল চাঁদের মাধ্যাকর্ষণের এলাকায়।

চাঁদে নামতে হলে প্রথমে মনে রাখতে হবে সেখানে বাতাস নেই। শব্দতরঙ্গ ওঠে না, অর্থাৎ কানে কিছু শোনা যায় না। নিশ্বাস নেবার অক্সিজেন নেই, কাজেই অক্সিজেনের ব্যবস্থা করে নিতে হবে। বায়ু নেই বলে সূর্যের আলোর বেজায় তাপ। আর রাতে বেজায় ঠাণ্ডা।

চাঁদের দিন আর রাত আমাদের চোদ্দ দিনের সমান লম্বা। এক দিন আর এক রাতেই চাঁদের এক মাস কাবার হয়।

চাঁদ সর্বদা পৃথিবীর দিকে তার একটা পিঠ-ই ফিরিয়ে রাখে। পৃথিবী থেকে অন্ত পিঠটা দেখা যায় না, তবে রকেট থেকে তার ছবি তুলে দেখা গেছে যে সে-দিকে পাহাড়-পর্বত কম। নামতে হলে ওদিকেই সুবিধা।

প্রথম বৈজ্ঞানিকরা চাঁদে গিয়ে, মাটির নিচে উপনিবেশ তৈরি করবে! তা হলে রাতের বড় বেশি ঠাণ্ডা আর দিনের বড় বেশি গরম থেকে বাঁচা যাবে। উপনিবেশটা হবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত।

নিশ্বাস নেবার অক্সিজেনের ব্যবস্থা করতে আর নিশ্বাস ফেলার সঙ্গে যে কার্বন-ডায়ক্সাইড বেরুবে তাকে দূর করতে ক্লরেলা বলে এক রকম শ্যাওলার চাষ করা হবে, মাটির নিচের সেই উপনিবেশে।

এইসব পড়ে আমি তো অবাক হয়ে গেলাম। কিন্তু তাহলে আমাদের বাতাসের ব্যবসাটা তুলে দিতে হয়। তা হক। ক্লরেলার চাষ করব।

ভেবে দেখলাম চাঁদের মাটির তলার উপনিবেশে কি কি লাগতে পারে। জোনাকি পোকা সরবরাহ করা যায়। লক্ষ লক্ষ জোনাকি ছাড়লে মাটির তলার গুহা ঘর নিশ্চয় আলো হয়ে থাকবে। তবে হয়তো বিজলিবাতির ব্যবস্থা হবে। তাহলে জোনাকি লাগবে না।

পরদিন রবিবার। যখন বড়মাস্টার এলেন, চাঁদের সম্বন্ধে না বলে পারলাম না। মিটমিট করে হাসতে লাগলেন। বললেন, 'তার চেয়েও অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক কথা হল, আমাদের এই ভারতের দক্ষিণ দিকের তীরভূমির কাছাকাছি সমুদ্রের তলা থেকে রাজার ঐশ্বর্য তোলা যায়।'

আমি বললাম, 'মুক্তো ?'

বড়মাস্টার হাসতে লাগলেন, 'মুক্তো হবে কেন ? মুক্তো আর এমন কি, আজকাল মুক্তোর চাষ হয়, মুক্তোর দিন গেছে।'

'তবে ?'

বড়মাস্টার বললেন, 'জাহাজডুবির কথা শুনেছিস্ ?'

ইংরেজরা এদেশের নাম শোনার অনেক আগে পর্তুগিজরা ব্যবসা করতে আসত। আবার জলদস্যু বোম্বেটেরাও ছিল। সমুদ্রে লড়াই হত, ঝড় হত, ডুবন্ত পাহাড়ে জাহাজের তলা ফেঁসে যেত, জাহাজ-ডুবি হত। তার অনেক জাহাজ এখনো সমুদ্রের তলায় পড়ে আছে। সোনারূপোর গয়না, হীরে মণি মাণিক্য, এত বড় বড় মোহর সমুদ্রের নিচেকার বালির উপর ছড়িয়ে পড়ে আছে। কত লোকে নিজের চোখে দেখে এসেছে। আমিও।'

আমি অবাক হয়ে বড়মাস্টারের মুখের দিকে তাকালাম। চেয়ারের হাতলে দুহাত চাপড়ে, কেঠো পা মাটিতে ঠুকে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমিও। এবং এই কাঠের পা নিয়েই, আমাকে কি ঐ ফেরারি ছোট মামাটির চেয়ে কম ঠাউরেছিস্ নাকি ?'

চমকে উঠেছিলাম। তবে কি গুপি ভুল বলল, ছোটমামাকে বড় মাস্টারমশাই চিনে ফেলেছেন। তাহলে সামন্তের কানে কথাটা তুলতেই বা কতক্ষণ ! হয়ে গেল চাঁদে যাওয়া। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল ছোটমাস্টারের কথা। বড় মাস্টার বললেন, 'হাসছিস্ যে বড় ? আমার কথাটা বিশ্বাস হল না বুঝি ?'

না, না, সেজন্যে নয়, ডুবো জাহাজের কথা খুব বিশ্বাস করেছি। কিন্তু কাল টেলিস্কোপ দিয়ে দেখলাম, জিনিসপত্রে বোঝাই আকাশী নৌকো চাঁদে যাচ্ছে।'

'সে কি ! চাঁদে জনমানুষ নেই, জিনিসপত্র যাচ্ছে আবার কি ? কেনই বা যাচ্ছে ?'

আমি বললাম, 'বাঃ, মাটির তলায় উপনিবেশ হবে যে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত উপনিবেশ তৈরি করতে হলে যন্ত্রপাতি তার, তক্তা, স্ক্রু ইত্যাদি লাগবে না ?'

বড় মাস্টার চোখ থেকে চশমা জোড়া খুলে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। তার পর বললেন, 'বুড়োধরার কথা বলেছিলাম কি ?'

ক্রমশঃ

বৃষ্টি

দেবযানী দে

গ্রাহক নং ৯০৮   বয়স ৮ বৎসর

মেঘলা আকাশে,
যদি তুমি দেখতে
কেমন হাওয়া বইছে
রাত দিন ভোরে ভোরে,
শিল পড়ে জোরে জোরে
সকল গাছে ও বাড়ির মাথায়।

গল্প হলেও সত্যি

অনিরুদ্ধ চক্রবর্ত্তী

গ্রাহক নং ১১২২। বয়স ৯½ বছর

পুতুলের বিয়ে দেখেছি। কুকুর বেড়ালের বিয়ের গল্প শুনেছি। আমার মার নিজের চোখে দেখা আর একটা মজার বিয়ের গল্প বলছি শোন।

তখন মা আলুকদিয়া নামে এক গ্রামে থাকতেন। সে বছর বৈশাখ মাস শেষ হ'য়ে জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি হয়ে এল; এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়েনি—মেঘের চিহ্নও দেখা যায় না।

অসহ্য গরম। ফসল জ্বলে যাচ্ছে। গাছ পালা শুকিয়ে যাচ্ছে। পুকুর, খাল, বিল, ডোবা ও কুয়োতে জল নেই। চাষীদের মনে মহা দুর্ভাবনা দেখা দিল। সবাই ভয় পেল, যদি এই খরা আর বেশি দিন থাকে, তাহলে চাষ-আবাদ মোটেই হবে না। দেশে আকাল আসবে।

আশে পাশে গ্রামের লোকেরা যখনই এক জায়গায় হয় তখন এক আলোচনা—'কি হবে, কি করা যায়?'

ঐ গ্রামে একজম বুড়ো চাষী ছিলেন তাঁর নাম সৃষ্টি মণ্ডল একদিন সন্ধ্যায় চণ্ডী মণ্ডপে সক জটলা করছে। তখন সৃষ্টি মণ্ডল এসে বল্লেন, 'ওরে তোরা ব্যাঙের বিয়ে দে! আমার ছেলেবেল একবার খুব খরা হয়েছিল ; মাঠ ঘাট ফেটে চৌচির। ব্যাঙের বিয়ে দেওয়াতে বৃষ্টি হয়, চাষীর বাঁচল

সৃষ্টির কথা শুনে অনেকে হেসে উড়িয়ে দিলে। কয়েক জন প্রধান কৃষক বললেন, 'দেখাই যা না কি হয়।' অনেক যুক্তি পরামর্শ করবার পর ঠিক হল ব্যাঙের বিয়ে দেওয়া হবে।

পরের দিন সবাই বিয়ের যোগাড় করতে লেগে গেল। প্রথমেই ডোবা, খাল, বিল খুঁজে জু বড় বড় কোলাব্যাঙ—একটা ব্যাঙ এ একটা ব্যাঙী পাওয়া গেল। তাদের সেদিন কি আদর যত্ন! যে সত্যিকারের বর কন্যা।

ব্যাঙ দুটোকে পরিষ্কার জলে বেশ ভাল করে স্নান করানো হল। যেমন 'বর,' তেমনি 'ক একটু স্থির হয়ে বসতে চায়না। সরু সুতো দিয়ে কলা গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হল।

এদিকে গ্রামের মেয়েরা বিয়ের আয়োজনে লেগে গেলেন। অনুষ্ঠানের কোনো ত্রুটি ছিল না ঢাকী এল, পুরোহিত এলেন ; কলাগাছ ও ঘট ইত্যাদি দিয়ে ছাদনা তলা সাজানো হল। গাঁয়ের য ছেলে বুড়ো এসে জমা হল।

পাল্কিতে করে বিয়ের আসর বরকে আনা হল। লাফ দিয়ে বর নামল। তার সঙ্গে এল, সো ব্যাঙ, কট্‌কটে ব্যাঙ বরযাত্রী হয়ে। ঠিক সন্ধ্যে বেলা বিয়ে হল। মালা বদলটা অবশ্য করিয়ে দিে হয়েছিল।

এরপর খিচুড়ি দিয়ে ভোজ হল। তখন ও অনেকের খাওয়া শেষ হয়নি, এমন সময় হঠা মেঘ করে এল। অল্পক্ষণের মধ্যেই।

ঝমাঝম্ বৃষ্টি আরম্ভ হল। মাঠ ঘাট জলে ভরে উঠল। তখনকার মতো মনে হ'ল বৃষ্টি যে আর থামবে না। মনের আনন্দে এক সঙ্গে ডাকতে শুরু করল ব্যাঙগুলো—গ্যাঙর গ্যাঙ। চাষীর বললেন, 'জয় সৃষ্টি মণ্ডলের জয়।'

চিত্রকুট ভ্রমণ

কারুবাকী দত্ত

গ্রাহক নম্বর—৮৯০। বয়স ১০ বৎসর ৪ মাস

গত পূজার ছুটিতে আমরা পশ্চিমে বেড়াতে গিয়েছিলাম। তবে বেনারস ও এলাহাবাদেই বেশি দিন ছিলাম। বেনারস থেকে বিন্ধ্যাচল, রামনগর ও চুণার দুর্গ আর এলাহাবাদ থেকে চিত্রকূট দেখেছি। এলাহাবাদে আমরা ভারত সেবাশ্রমে ছিলাম। চিত্রকূট এলাহাবাদ থেকে ৮০ মাইল দূরে এই পাহাড়েই নাকি রামচন্দ্র বনবাস করেছিলেন।

চিত্রকূটে যেতে হলে বাসে যেতে হয়। বাস আবার ছাড়ে, এলাহাবাদ রেল স্টেশন থেকে তাই আমরা নির্দিষ্ট দিনে দুপুরে রেল স্টেশনে গেলাম। গিয়ে দেখলাম সেখানে লোকও প্রচুর বাস

অনেক। শুনলাম পরদিন নাকি চিত্রকূটে মেলা আছে। ভালই হল, চিত্রকূটে আমরা মেলা দেখতে পারব।

দুপুরে বাসে যেতে যেতেই আমরা দেখতে পেলাম তিন দিকেই সবুজ পাহাড়, গাছপালায় ঢাকা। আর দেখলাম পিঁপড়ের সারির মত লোক চলেছে। কেউ উটের পিঠে চেপে কেউবা হেঁটে, কেউ লাঠির আগায় পুঁটুলি বেঁধে, আবার কেউ বা খালি হাতে। পথে আমরা মাঠের মধ্যে চারটে লালমুখো সারস দেখলাম। পিচে বাঁধানো আঁকাবাঁকা পরিষ্কার রাস্তায় দুপুরে রোদ পড়ে সাপের পিঠের মত চকচক করছিল। বিকেল প্রায় পাঁচটার সময়ে চিত্রকূটে পৌঁছালাম।

ওখানে খালি একরকম ঠেলা জাতীয় গাড়ি আছে তাছাড়া অন্য যানবাহন পাওয়া যায় না। তাই তাতেই মালপত্র চাপিয়ে আমি আর বোনও তাতে চেপে বসলাম। মা বাবা পিছনে হেঁটে আসতে লাগলেন। পাহাড়ের উপত্যকা, উঁচুনিচু পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে রাস্তা। যেতে যেতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

ডাকবাংলোতে গিয়ে দেখি সেখানে কোনো ঘর খালি নেই। সাঁতনা থেকে রিজার্ভ করতে হয়। একটা ঘর খালি আছে, তাতে থাকার জন্য ওভারসিয়ারের অনুমতি দরকার। তখন আমরা নিরুপায়। কারণ আসতে আসতে দেখেছিলাম যে ধর্মশালাগুলি সব ভরতি, পাহাড়ের উপরে আখড়াগুলিতেও জায়গা নেই। তাই আমরা ওভারসিয়ারের বাড়ির দিকে এগোলাম। তখন একদম অন্ধকার হয়ে গেছে।

পথও চিনি না। একে তাকে জিজ্ঞেস করে এগোতে লাগলাম। ডাকবাংলোর পাশ দিয়েই মন্দাকিনী নদী বয়ে গেছে। রামায়ণে দেখেছি ওকে মাল্যবতী বলা হয়েছে। ডাকবাংলোর পিছনে আর দুপাশে খালি পাহাড়। আর অন্ধকারে পাহাড়গুলোকে কালো মনে হচ্ছে। যেতে যেতে দেখলাম অনেক লোক মাঠেই শুয়ে কিম্বা বসে রয়েছে। তারা মাঠেই রেঁধে খেয়ে নেবে। পরে অবশ্য এর কারণ জানতে পেরেছিলাম।

পরদিন ছিল দেওয়ালী। ওদের ওদিকে কিন্তু কালীপুজার সঙ্গে দেওয়ালীর কোনই সম্বন্ধ নেই। ওই দিনে নাকি রামচন্দ্র বনবাস থেকে ফিরে অযোধ্যায় প্রবেশ করেছিলেন। সেইদিন সবাই পাহাড়ে একটা করে আলো দেয় আর কামদনাথজী পাহাড় প্রদক্ষিণ করে। তাতে পুণ্য হয়।

যাই হোক আমরা বাজারের ভিতর দিয়ে ঘুরে ওভারসিয়ারের বাড়ি চললাম। ছোট্ট বাজার। অন্যদিন হয়তো সেখানে তরিতরকারির ছোট্ট বাজার বসে। কিন্তু পরদিন মেলা ছিল বলে বাজারে কাঠের পুতুল, কৌটা, পুঁথির মালা, চুড়ি ইত্যাদি বিক্রী হচ্ছিল। চিত্রকূটের চিহ্ন রাখার জন্য আমরা একটা কৌটো আর একটা মালা কিনলাম। ওভারসিয়ার আমাদের খুবই আপ্যায়ন করলেন আর চাও খেতে দিলেন। বিদেশে এসে এরকম আতিথেয়তা পেয়ে আমরা খুবই খুসি হলাম। তিনি অবশ্য তখনই ডাকবাংলোতে থাকার অনুমতিপত্র লিখে দিলেন। তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমরা চিত্রকূট জায়গাটা একটু ঘুরে দেখলাম। দেখলাম পাশেই মন্দাকিনী নদী দিয়ে অনেক লোক

আসছে। তাই দেখে আমরা ডাকবাংলোতে ফিরে এলাম। সঙ্গে প্রচুর পাঁউরুটি, কলা আর মিষ্টি আনা হয়েছিল। তাই খেয়ে সেদিনের মত শুয়ে পড়লাম। দরজাগুলো ভাল বন্ধ হচ্ছিল না বলে ভয় ভয় করছিল। চম্বলের ডাকাতরা যদি উপত্যকা দিয়ে চলে আসে!

পরদিন পাহাড় প্রদক্ষিণ করতে গেলাম। পথ চিনি না কিন্তু সারি বেঁধে লোকেরা চলছে। তাদের সঙ্গে এগোলেই ঠিক পথে যাব জানতাম। পথের ধারে ধারে বহু ভিখারী বসেছে সাহায্যের আশায়। আবার অনেক অদ্ভুত জিনিসও নিয়ে এসেছে। যেমন তিন শিংওয়ালা গরু পাঁচ পা ওয়ালা গরু। এক যোগী দেখি গলা পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে পা ওপর দিকে তুলে রয়েছে। হঠাৎ দেখি এলাহাবাদের বাজারের দেখা সেই বিকলাঙ্গ সাধু। তাকে ঘিরে লোক জমে আছে। এতটা পথ সে গড়িয়ে গড়িয়ে কি করে এল জানি না। যেতে যেতে দেখি অনেক বাঁদর আর হনুমান সেখানে। সকলেই তাদের ছোলা মটর খেতে দেয়। আমরাও দিলাম।

পাহাড় কেটে রাস্তা, তাই আমরা এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে যেতে পারছিলাম। প্রদক্ষিণ করতে প্রথমে বেশ ভাল লাগছিল। দুই পাশে গাছ, বড় বড় পাথর তার মধ্যে দল দল হনুমান ও বাঁদর কিচমিচ ও লাফালাফি করছে। রামচন্দ্রের ভক্তরা তো থাকবেই এখানে।

পথে আবার অনেক মন্দির, কোনটাতে রাম আর ভরতের দেখা হয়েছিল আবার কোনটাতে তুলসীদাসের কাছে রাম লক্ষণ যে এসেছিলেন সেই পায়ের ছাপ আছে। কিন্তু তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে, পথের শেষ নেই। বেগতিক দেখে শেষে একটা পাথরের উপর বসে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করলাম। আমরা তো জানতাম না পথ এত দীর্ঘ তাই কোনো খাবার সঙ্গে নেই নি। অন্যরা দেখলাম খাবারের পুঁটুলি খুলে বসেছে।

অনেকেই সারাদিন পাহাড়ে কাটিয়ে সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালিয়ে তারপর ফিরবে। পাহাড় থেকে সমস্ত চিত্রকূট জায়গাটা খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। মানুষগুলিকে পুতুলের মতো মনে হচ্ছিল। এরপর উঠে খানিকক্ষণ হাঁটলাম। অনেকে দণ্ডি কেটে কেটে যাচ্ছে। আমরা হেঁটেই ক্লান্ত আর ওরা কি করে যে শুয়ে আর উঠে উঠে এগোচ্ছিল দেখে অবাক হচ্ছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে মনে হচ্ছিল পথের যেন আর শেষ নেই। কোনখান দিয়ে চলেছি জানিনা, দুপাশে সারি সারি লোক পুঁথির মালা চুড়ি, কুমকুম খেলনা বিক্রী করছে। হনুমান বাঁদরদের দেবার জন্য ছোলা চাল বিক্রী হচ্ছে। বুঝতে পারছি না আবার নতুন করে প্রদক্ষিণ আরম্ভ করলাম নাকি! যাই হোক আরও অনেকক্ষণ হেঁটে ডাকবাংলোতে ফিরে এলাম। আমরা বেরিয়েছিলাম ৭টায় ফিরেছিলাম দুপর ১২টায়। পরে জানতে পেরেছিলাম ওখানে ৭ মাইল পথ হাঁটতে হয়। আমার ৫ বছরের ছোট্ট বোনও এতটা পথ হেঁটেছিল।

দুপুরে খেয়ে দেয়ে আবার একজন লোকের স্টেশন ওয়াগন করে অন্যান্য জায়গা দেখতে গেলাম। আমাদের সঙ্গে আরও ২৫।৩০ জন লোক ছিল। তারা সকলেই ওই অঞ্চলের চাষী শ্রেণীর লোক ও পুণ্যার্থী, আমাদের দিকে তারা বেশ কৌতুহল নিয়ে দেখছিল। দুপুরে প্রথমে গেলাম

অনসূয়া আশ্রমে। যেতে যেতে ধুলোয় আমাদের রঙীন জামা কাপড় চুল সব সাদা হয়ে গেল। ধুলোর জন্য চোখ খোলা যাচ্ছিল না।

অনসূয়া আশ্রমে অনসূয়া দেবী সীতাকে সতী ধর্মের উপদেশ দিয়েছিলেন। জায়গাটা খুবই সুন্দর, তপোবনের মতই। গাছপালায় ঢাকা, একপাশ থেকে খাড়া পাহাড় উঠেছে। অন্য পাশে একটা ঝর্ণার জল এসে নদীর মত হয়ে আছে। তাতে অসংখ্য মাছ। কেউ জলে নামলে তারা তার চারিপাশে এসে ভিড় করে। ঘাটের পাশে পাশেই এরা ঘোরে। ওখানে লোকে তাদের মুড়ি-টুড়ি খেতে দেয়, তাদের কেউ ধরে না। তাই তারাও নির্ভয়ে মানুষের কাছে আসে। ওখানেই দেখলাম একজন সাধু সামনে ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছেন। মুখ ভরা দাড়ি গোঁফ, চোখদুটি হাসি হাসি। ঠিক যেন ছবিতে দেখা বাল্মিকির মতো। তাঁর সঙ্গে দেখা করে ফাটক শিলা দেখতে গেলাম। সেটা জলের মধ্যে উঁচু একটা মাঝখান থেকে ফাটা পাথর। জুতো খুলে উপরে উঠে দেখলাম সেটাও একটা ঝর্ণা তার মধ্যেও অসংখ্য মাছ। তার উপরে বসে নাকি রামচন্দ্র বিশ্রাম করেছিলেন। এরপর দেখতে গেলাম কুণ্ড। সেটাও একটা ঝর্ণা, তাতেও অসংখ্য মাছ। ঝর্ণার উপরে পাথরগুলো এমন ভাবে সাজানো যে এপার থেকে ওপারে যাওয়া যায়। এই কুণ্ডতে নাকি সীতাদেবী বিশ্রাম আর স্নান করেছিলেন। এই সব জায়গা এমন নিরিবিলি আর সুন্দর যে মনে হয় সত্যিই এসব ঘটনা ঘটেছিল। চিত্রকুট জায়গাটা এত সুন্দর যে ফিরতে ইচ্ছা করছিল না। চিত্রকূটে গুপ্ত গোদাবরীও একটি দর্শনীয় স্থান, কিন্তু এবার আর আমাদের সেখানে যাওয়া হয়ে উঠল না। সেখানকার লোকগুলিও খুব সাধাসিধা আর সরল। কিন্তু সেই দিনই রাত্রি প্রায় ১১টার সময় ভারত সেবাশ্রমে ফিরে এলাম। পথে আসতে আসতে মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়ছিলাম। মাঝে মাঝে দেখছিলাম সেদিন দেওয়ালী ছিল বলে বাড়িগুলি প্রদীপ দিয়ে সাজানো হয়েছে। আর ছেলেমেয়েরা রাস্তার মাঝখানেই বাজি পোড়াচ্ছিল। এলাহাবাদে ফেরার পরদিনই রাত্রে কলকাতায় এসে পড়লাম।

একটু হাসো

উত্তমকুমার বটব্যাল

বয়স ১১২ গ্রাহক নং ১৪৮১

শিক্ষক—'Song' মানে কি ?

ছাত্র—'বন্দুক' স্যার।

শিক্ষক—গাধা, স্টুপিড ছেলে কোথায় ··।

ছাত্র—কেন স্যার Song মানে গান আর মানে বন্দুক!

একটুখানি হাসো

সুব্রত ঘটক

বয়স ১২ বছর—গ্রাহক নং ২০২৮

একটি বড় সহরে একবার মহাকাশচারীদের সভা হচ্ছে। বহু বড় বড় মহাকাশচারী এবং মহাকাশযান বিশেষজ্ঞগণ তাতে যোগদান করেছেন। সভার শুরুতে সভাপতি মহাশয় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মানুষের চাঁদে যাবার অক্লান্ত চেস্টার কথা বলছিলেন। হঠাৎ একজন শ্রোতা আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বললেন 'মানুষ এখন চাঁদে যাবার জন্য পৃথিবী তোলপাড় করছে! কিন্তু আমি কিছুদিনের মধ্যেই সূর্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করব।'

ভদ্রলোকটির এই অদ্ভুত আচরণে অবশিষ্টরা একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। সভাপতি মহাশয় প্রশ্ন করলেন 'আপনি সূর্যের কাছে যাবেন কি করে? তার কাছে এলেই তো গরমে রকেট পুড়ে ছাই হয়ে যাবে!' ভদ্রলোকটি একটু গর্বের সঙ্গে উত্তর দিলেন 'আমি সেজন্য মাঝরাত্রে যাত্রা করব।'

পাহাড়-কোলে

অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়

বয়স ১১ বছর

গ্রাহক নং ১৬১৯

(একাদশ-এক ছন্দ)

ওই দূর পাহাড়ের আড়ালে,
বেড়ায় হরিণ পালে পালে—
ছোট্ট নদীর কালো জলে
সাদা হাঁস ভেসে চলে।
নাম না জানা পাখি
ডাকে—নদীতীরে,
কাঠবিড়ালী
দিয়ে উঁকি
পালায়
ফিরে।
কি
জানি,
ওখানে
কে গাইছে
গান,—গানের
সুরেই ভরিয়ে
প্রাণ,—বুঝি কোনও
ছোট্ট পাখিরই মিষ্টি
তান। অলিরা গান গেয়ে
যায় শালুক ফুলের দামে
শেষে পাহাড়কোলে সন্ধ্যা নামে॥

একটি ছেলের কাহিনী

সোনালী ব্যানার্জি

বয়স ১১½ বছর—গ্রাহক নং ২৭৪০

বছর সাতেক বয়সের একটি ছেলে। সেকালের এক বিখ্যাত অভিজাত পরিবারের ছেলে। ছবি আঁকায় খুব ঝোঁক তার। হাতের কাছে যা পায়, কয়লা, ইটের টুকরো, তাই দিয়েই দেয়ালের গায়ে ছবি এঁকে রাখে।

একবার ছেলেটির বাবা একটা কাঁচের এ্যাকোয়ারিয়াম কিনে জল ভরে তার মধ্যে কতগুলো লাল মাছ ছেড়ে দিলেন। বাড়ির সব ছেলেমেয়ে এই দৃশ্য দেখতে ভিড় করে এল। সেই ছেলেটির জলের মধ্যে মাছগুলির খেলা করার দৃশ্য খুব ভাল লাগল। তারপর দুপুর বেলা, সকলে যখন ঘুমিয়ে পড়েছে তখন ছেলেটি চুপি চুপি এক শিশি লাল কালি জলে ঢেলে সেই রঙিন মাছের চিত্রকে আরো রঙিন করে দিল। ভারি খুশী ছেলেটি।

এদিকে বিকেলবেলা ছেলেটির বাবা এসে দেখেন, তাঁর সখের মাছগুলি মরে জলের উপর ভাসছে। কে করলে এই কাজ? খোঁজ, খোঁজ! বাবা কিন্তু বুঝতে পেরেছেন কে করেছে এই কাজ। তিনি বললেন, 'ধরে আনো সেই গুণ্ডাটাকে, তারই কাজ।' গুণ্ডাটাকে ধরে আনা হল। বাবা বললেন, 'তুই এ কাজ করেছিস?' ছেলেটি দোষ স্বীকার করলে। বাবা বললেন, 'কেন করলি? 'ছেলেটি বলল, 'বারে, সাদা জলে কি লাল মাছ ভাল লাগে? লাল জলে কেমন দেখায় তাই দেখছিলাম। 'একথা শুনে সকলেই হেসে উঠল।

ছেলেটি কে বলতো? এই ছেলেটিই বিখ্যাত শিল্পী শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর তাঁর বাবা স্বনামধন্য শ্রীগুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(জীবনচরিত থেকে সংক্ষেপিত)

জলের পা আছে

শংকর ঘোষ—গ্রাহক নং ২৭০৯—বয়স ১২

আষাঢ় মাস। সকাল সাড়ে আটটা। বৃষ্টি ঝিম্‌ঝিম্ করে পড়ছে। বাড়িতে একাএকা বসে থাকতে মন চায়না। কিন্তু কি করবে রুনু। তার মা তাকে এই বৃষ্টিতে বাড়ির বাইরে যেতে দেবে না। তাই সে মনমরা হয়ে জানলার ধারে বসে আছে। তার বয়স এখন পাঁচ বছর। তার এক ছোট্ট দাদা আছে। সে এখন ক্লাস টু তে পড়ে। সে নাকি অঙ্ক কষতে পারে। তাই তার বেশি আদর। আর রুনু মার কাছে বসে শুধু অ আ পড়ে। জানলাতে বসে ও শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছে। দূরে একটা ছোট পাহাড়। বৃষ্টি পাহাড়ের উপর পড়ে তার গা বেয়ে নিচে নেমে নদীর আকারে বয়ে যাচ্ছে। ও মনে করছে বৃষ্টিগুলো নিচে পড়ে সেই জল পাহাড়ে উঠছে আর সেখান থেকে মেঘ হয়ে উড়ে যাচ্ছে। সেই

সময় তার ছোট্ট দাদাটি বাবার কাছ থেকে পড়ে এসে ঐ জানলার কাছে দাঁড়াল। দাদাটিকে পেয়ে রুনু সরল মনে 'জল পাহাড়ে ওঠা এবং পাহাড় থেকে মেঘ হয়ে যাওয়ার' কাহিনী বলল। দাদা হেসে তার বোনের কথা উড়িয়ে দিয়ে বিজ্ঞের মত বলল, 'জলের কি হাত পা আছে যে পাহাড়ে উঠবে?'

'আছেই ত!' জোর গলায় বলে উঠল রুনু। 'তা না হলে বাবা মা কি বলত যে জল দাঁড়িয়ে গেছে?'

ধাঁধা

পার্থসারথী মুখার্জী—গ্রাহক সংখ্যা ১৩৫৯ বয়স ১৫ বছর

(১)

এক বাড়ির ন-বউ আর একবাড়ির ছ-বউ তাল গাছের তলা দিয়ে যাচ্ছিল। ১৪টা তাল গাছ থেকে পড়ল, তারা সবাই সমান ভাগ করে নিল। প্রত্যেকে কটা পেল?

(২)

আটটা আটকে এমনভাবে সাজাও যেন তাদের যোগফল ঠিক একহাজার হয়। বিয়োগ, গুণ, ভাগ বা অন্য কোন প্রক্রিয়া চলবে না কিন্তু

ঘুড়ি

সান্ত্বনা ঘোষ

ভগবানের হাতে লাটাই আমরা সবাই ঘুড়ি,
তিনি যেমন মোদের ওড়ান আমরা তেমন উড়ি॥
হরেক ঘুড়ি তাঁর ভাঁড়ারে কেউ সাদা কেউ কালো,
মোদের মাঝেও হরেক মানুষ কেউ মন্দ কেউ ভালো॥
গা ভাসিয়ে চলছি মোরা এই জীবনের স্রোতে,
কেউ জানিনা কোথায় যাব, আসছি কোথা হতে॥
কেউ বা আগে চলছে ছুটে, কেউ বা পিছে পড়ে,
কেউ বা হাসে আনন্দেতে কেউ বা কেঁদে মরে॥
ঘুড়ির খেলায় যখন হারেন, সুতো যখন কাটে,
আমাদেরও বাস উঠে যায় এই মাঠে, এই বাটে॥
বিশাল বালক স্বর্গছাদে ওড়ান কেবল ঘুড়ি,
আমরাও তাই উড়ে বেড়াই সারা আকাশ জুড়ি॥

১। দেবাশিস মুখোপাধ্যায়—১৫৬৭ বয়স ১২

প্রকৃতি পড়ুয়া হতে গেলে আমাদের আপিসের ঠিকানায় জীবন সর্দারকে একটা চিঠি দিলেই যথেষ্ট। অবিশ্যি গ্রাহক সংখ্যা ও বয়স-ও দেবে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, স্বপন বুড়ো ইত্যাদি ইত্যাদি যাঁদের কথা লিখেছ তাঁদের লেখা আগেও বেরিয়েছে এবং পরেও সুবিধা মতো বেরুবে বই কি। রহস্য উপন্যাস বলতে কি বোঝ জানি না, আমরা যা বুঝি তা আমরা ছাপি। যেমন 'তুষার মানবের সন্ধানে' 'জাহাজীর কবচ' ইত্যাদি। হাতপাকাবার আসরে গ্রাহকদের আঁকা ছবি নিশ্চয় দেওয়া হয়। এবার আমার প্রশ্নটা দিই। আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করবার চেষ্টা করছ নাকি? জান না, এক হাতে তালি বাজে না।

২ অভিজিত চৌধুরী ১৯০২, বয়স দাও নি কেন?

৩ শুভ্রা বিশ্বাস, ২০২৯ বয়স ১৩

এই চিঠিতেই জানিয়ে দেওয়া হল সংহিতার আষাঢ় মাসের ধাঁধার উত্তর 'ডিগ্‌ বয়'। পত্রবন্ধু চাও নাকি? শখ—কবিতা ও গল্প লেখা, খেলা ধুলা, বই পড়া।

৪ রামেন্দ্রচন্দ্র ভুঞা ১৭৯৮, বয়স ১৬

গ্রাহক না হয়েও রচনা পাঠানো যায়, কিন্তু অন্যান্য ভালো লেখকদের মতো লেখা না হলে কি করে ছাপানো যায়? তোমার এখন ষোল বছর বয়স হয়েছে, সিনেমার সম্বন্ধে বেশি জানতে হলে বড়দের পত্রিকাও তো পড়তে পার। কবি বিহারী লাল আমাদের ছেলেমানুষ পাঠকদের প্রায় অচেনা। রচনা কিন্তু চলল না ভাই।

৫ সোনালি সেন গুপ্তা, ৮৫১, বয়স ১১

তোমার ধাঁধাগুলি মন্দ না। কোন রাজার নামে চাঁদ লুকিয়ে আছে? কোন রাজার নামে আনন্দ বাড়ে? কোন ফলের নামে মজা আছে? কই বন্ধুরা উত্তর দাও।

রঞ্জন রায়, ১৭৩৫

বয়স দাওনি কেন? ডাকঘরে খোঁজ কর। জিপিওতে নালিশ কর। আমরা ঠিক-ই পাঠাই।

সৌমিত্র ভট্টাচার্য, ২৬৩৮, বয়স ১৩

সতেরোর বেশি বয়স হলে সাধারণ বিভাগে লেখা পাঠানো যায়, কিন্তু খুব ভালো হওয়া চাই। 'এ কেন নেই' 'ও কেন নেই' না লিখে, যা আছে তা কেমন লাগল শুনতে ভালো লাগে। তবে আষাঢ় মাসের সন্দেশ ভালো লাগে নি শুনে হতাশ হলাম। ওটাকেও যত্ন করে বের করা হয়েছে।

৮ মধুশ্রী চৌধুরী, ২১২, বয়স ১২

পত্রবন্ধু চাই; শখ, ডাকটিকিট সংগ্রহ, কার্ড জমানো, বই পড়া।

৯ সোহম দাসগুপ্ত, ২৮৬৮, বয়স ?

১০ জয়শ্রী তরাত, ২০৮৬, বয়স ?

নতুন গ্রাহিকা যখন হয়েছ, তখন শুনে রাখ যে যা লিখে পাঠাবে তাতেই গ্রাহক সংখ্যা ও বয়স দিতে হয়। গ্রাহক সংখ্যা না পাওয়া অবধি, লিখতে হয় 'নতুন গ্রাহক।' তবে তুমি তো সংখ্যা পেয়েই গেছ।

প্রতিযোগিতা, ধাঁধার উত্তর ইত্যাদি কি ভাবে কি করতে হয়, কবে শেষ তারিখ, সব জানানো হয়। হাত পাকাবার আসরের লেখা ছোট না হলে জায়গায় কুলোয় না। ছবি পাঠালে অন্ততঃ একটা পোস্টকার্ডের মতো বড় করে এঁকো।

১১ প্রবীর কুণ্ডু, ৫১১, বস ১২½

যেখানে গেলে, সেখানকার এতটুকু বর্ণনা না দিলে ছাপি কি করে? অত ছোট ছবিওতে চলে না, ভাই।

১২ জয়ন্ত সেন, ১৩১৫, বয়স ১৩

তাহলে ভাই, আমাদের কি বুঝতে হবে যে শ্রাবণ মাসের সন্দেশের (১) মুসকিল আসা (২) সেয়ানা ছেলে, (৩) বন মানুষের খেল (৪) জৈব বিদ্যুৎ ও তার ব্যবহার, (৫) ভারতীয় বাইসন (৬) একটি নতুন. গণিতের আবিষ্কার, (৭) নেপোর বই—এর সবকটিই ৬।৭ বছরের বালকদেরও পড়া যোগ্য নয়? এগুলির চেয়ে কি সচিত্র ডিটেক্টিভ গল্প ও কমিক্‌স্ তোমার মতো পরিণত বুদ্ধির ছেলে মেয়েদের বেশি উপযুক্ত? বানান শেখাও কি পাকা-বুদ্ধিদের দরকার নেই? ভাই, আমরা তো যথাসাধ্য চেষ্টা করি, তুমি বরং তাড়াতাড়ি বয়সটা বাড়িয়ে একটা আদর্শ পত্রিকা বের করে ফেল।

১৩ দেবকুমার দাস, ২১৩৯, বয়স ১৬

বৈদ্যুতিক মাছ পেয়েছি। তবে ছাপা হবে কি না বলতে পারছি না, কারণ আমাদের বিজ্ঞানে আসরে এই রকম বিষয়ে আরো আলোচনা হয়ে গেছে।

১৪ **শশাঙ্কশেখর সেন, ১৯৯, বয়স ১০**

তোমার সব প্রশ্নের উত্তর যে-কোনো ভালো সাধারণ জ্ঞানের বইতে পাবে। পত্রবন্ধু চাই। শখ :—ভ্রমণ, বই পড়া। তোমার সেই হাসির গল্পগুলি কোথা থেকে নিয়েছিলে সেটা জানালে কিন্তু ভালো হত।

১৫ **সত্যশ্রী উকিল, ২১৬২, ১২ বছর বয়স**

গল্প ও ছবি ভালোই হয়েছে। এখন দেখ কবে ছাপা হয়। গাদা গাদা জমে আছে কিনা। যতদিন খুসি গ্রাহক থাকতে পার, কিন্তু বয়সটা সতেরোর নিচে না হলে কোনো প্রতিযোগিতা, ইত্যাদিতে যোগ দিতে পারবে না।

১৬ **শৃণ্বন্তী পাল, ১৬৫৫, বয়স ৯**

যা পাঠাবে একই খামে পাঠিও, তবে উপরে লিখে দিও কোন বিভাগের জন্যে পাঠাচ্ছ।

১৭ **মিত্রা রায় চৌধুরী, ১৪২৫, বয়স ১১**

পত্রবন্ধু চাই। শখ, গান, ছবি আঁকা, বিজ্ঞান, ডাকটিকিট সংগ্রহ, গল্পের বই পড়া ও গল্প লেখা।

১৮ **অনিশ দেব, ২১২২, বয়স ১৭**

এটা হল ভাই তোমাকে আমাদের প্রথম ও শেষ চিঠি। কারণ এই বিভাগে কিম্বা কোনো প্রতিযোগিতা ইত্যাদিতে যোগ দিতে হলে, বয়স হওয়া চাই সতেরোর নিচে। তবে সাধারণ বিভাগে লেখা পাঠাতে পার। খুব ভালো হওয়া চাই কিন্তু।

জুলু সেন, ২৫১৯ বয়স ১৫

তোমার সঙ্গে সন্দেশের এই সাত বছরের সম্বন্ধ আমাদেরো কম আনন্দের বিষয় নয়। তবে সন্দেশে কি কি চাও আর কি কি ততটা উপভোগ কর না সর্বদা জানিও। বন্ধুর মতো করে।

মলয়বীজন ভট্টাচার্য, ১৩৪৪, বয়স ১৩

এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে আমাদের আজকের বাঙালী শিক্ষা ও সংস্কৃতি রবীন্দ্রনাথের কাছে গভীর ভাবে ঋণী। তুমি তাঁর বিষয়ে হাত পাকাবার আসরের জন্যে একটা ভালো লেখা দিয়ে আমাদের ঘাটতি পুরিয়ে দাও না কেন?

পত্র বন্ধু

পত্রবন্ধু সম্বন্ধে তোমরা কেউ কেউ এখনও ভুল করছ।

পত্রবন্ধুর নামে সন্দেশ কার্যালয়ের ঠিকানায় চিঠি লিখলে সেই খাম বা পোষ্টকার্ডটাই **আমরা রি-ডাইরেক্ট করে তাকে পাঠিয়ে দেব।** গ্রাহক সংখ্যা দিতে ভুলোনা।

অন্যভাবে লিখলে কিন্তু পাঠানো সম্ভব হবে না।

কোরিয়াকের হরিণ-পালকদের ছেলেমেয়েরা

এরা সুদূর উত্তরে কামচাটকায় থাকে। কেমন মন দিয়ে সবাই লাইব্রেরীতে বই পড়ছে দেখ।
(সোভিয়েত ইনফর্মেশনের সৌজন্যে।)

ক্রীড়াজগৎ

—অজয় হোম

ক্রীড়া জগতে বড়ো গণ্ডগোল। শুধু আমাদের দেশে নয় বিদেশেও। সর্বত্র। কলকাতায় ফুটবল মরসুম (আইনমাফিক ১লা এপ্রিল থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর) শেষ হয়ে গেলেও সুপার লীগ ও আই এফ-এ শীল্ড এখনও শেষ হয় নি। তবে সুপারলীগ শেষ হলেও হতে পারে অন্ততঃ আই এফএ-র এই আশা। ইতিমধ্যে আইএফএ-র সভাপতি শ্রীস্নেহাংশুকান্ত আচার্য পদত্যাগ করেছেন। তিনি অনেক চেষ্টা করেছিলেন কলকাতার ফুটবলকে ভদ্রস্থ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারলেন না। পদত্যাগপত্রে ব্যক্তিগতভাবে তিনি কারুর উপর দোষারোপ করেন নি, শুধু বলেছেন, "ওখানে থেকে ভাল কিছু করা সম্ভব নয়।" সভাপতির পদ শ্রীআচার্য ছেড়ে দিলেও স্টেডিয়ামের জন্যে তিনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন এবং ফুটবলের প্রশাসনিক গলদ সম্পর্কে এক অনুসন্ধান কমিটি গঠনের জন্য রাজ্যপালের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

অনেক তুমুল প্রতিবাদ ও ঝড়ের পর দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে এমসিসি-র দলভুক্ত হন দক্ষিণ আফ্রিকার কালো খেলোয়াড় বেসিল ড অলিভিয়েরা। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ প্রধানমন্ত্রী জন ভরস্টার বর্ণবৈষম্যনীতির স্বার্থে কিছুতেই রাজি হলেন না, এমসিসি-র সফর বাতিল করে দিলেন। এতে ভারত ও পাকিস্তানের লাভ হয়েছে। কারণ সঙ্গে সঙ্গে এমসিসি ভারত ও পাকিস্তান সফরের জন্য

ইচ্ছা প্রকাশ করে। এই সফর সম্ভব হলে ভারতীয় ক্রিকেটের যথেষ্ট উপকার হবে। কারণ পরের মরসুমেই অস্ট্রেলীয় দলের ভারত ভ্রমণের কথা। কিন্তু এমসিসি র সফরের সমস্ত কিছু নির্ভর করছে অর্থমন্ত্রীর উপর। এমসিসি তিনটি টেস্ট সহ সফরের জন্যে ২০ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা দাবী করেছে। চতুর্থ টেস্ট্ হলে আরও কিছু দিতে হবে। এই বৈদেশিক মুদ্রা অর্থমন্ত্রী মঞ্জুর করলে তবে সফর সম্ভব। যদি এ সফর হয় তাহলে এই প্রথম ভারতের মাটিতে পূর্ণ ইংল্যণ্ড দলের সঙ্গে ভারতীয়রা মোকাবিলা করতে পারেন।

কুচবিহার ট্রফির খেলা শুরু হয়েছে। এই খেলার পর স্কুল ক্রিকেট দলের খেলোয়াড় নির্বাচন করা হবে এবং আগামী ১৮ই নভেম্বর সেই ভারতীয় স্কুল দল ম্যানেজার হেমু অধিকারীর সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাত্রা করবে।

কলকাতায় ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভা শেষ হল। সকলেই উৎসুক ছিলেন কারা খেলোয়াড়-নির্বাচক কমিটির সভ্যপদ লাভ করেন তা জানতে। নির্বাচক মণ্ডলীর চেয়ার-ম্যান হিসাবে ভারতের খ্যাতকীর্তি টেস্ট্ খেলোয়াড় বিজয় মার্চেন্ট সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হয়েছেন। গোলাম আমেদ, এম্ কে মন্ত্রী এবং হেমু অধিকারী এ বছর নির্বাচনে দাঁড়ান নি কিন্তু সুদীর্ঘ পাঁচ বছর যিনি চেয়ারম্যান ছিলেন সেই বাংলার শ্রীএম দত্ত রায় অন্যান্যদের মতো সভ্যপদ ত্যাগ করেন নি। তিনি সাধারণ সভ্যপদের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করেন নিজেরই ক্লাবের ছেলে টেস্ট্ খেলোয়াড় শ্রীপঙ্কজ রায়কে হারিয়ে। অপর দুজন সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন অতীত দিনের টেস্ট্ খেলোয়াড় মাদ্রাজের সি ডি গোপীনাথ এবং সার্ভিসের এচ টি দানী।

ভারতীয় অলিম্পিক দল মেক্সিকোয় পৌঁছেছেন। কর্মকর্তাদের বাদ দিয়ে দলে আছেন ১৮ জন হকি খেলোয়াড়, ২ জন অ্যাথলিট, ৪ জন কুস্তিগীর, ১ জন ভারোত্তোলক, ২ জন সুটার এবং ১ জন মুষ্টিযোদ্ধা।

আমার কাছে অলিম্পিকের সবচেয়ে আকর্ষনীয় গেমস ম্যারাথন দোড়। এই দৌড়ের দূরত্ব ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ। এতখানি দূরত্ব অতিক্রম করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সকলে পৌঁছতে পারেন না, মাঝপথে অবসর নিতে বাধ্য হন। অনেক দৌড়বীর অজ্ঞান হয়েও পড়েন। ১৯১২ হলে স্টকহলম অলিম্পিকে পর্তুগালের দোড়বীর ল্যাদারো মারাই যান। ১৮০৬ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত একমাত্র দুবার স্বর্ণপদক জয়া হয়েছেন ইথিয়োপিয়ার আবেবে বিকিলা (১৯৬০ ও ১৯৬৪)। আবেবে বিকিলা এবারও দৌড়বেন এবং আশা করেন তিনিই জয়ী হবেন।

অলিম্পিক গেমসে ম্যারাথন দৌড়ের অবতারণার পিছনে আছে একটি ঐতিহাসিক ও বীরত্বব্যঞ্জক ঘটনা। তোমরা হয়তো অনেকে জানো গ্রীসের প্রসিদ্ধ এথেন্স্ শহরে থেকে প্রায় ২৭ মাইল উত্তরপূর্ব দিকে ম্যারাথন অঞ্চল।

ঘটনাটা ঘটেছিল ৫ম শতাব্দীতে। গ্রীক সেনাবাহিনী পারস্য সাম্রাজ্যের সার্দিন নগর আক্রমণ করে ধনরত্ন লুট তো করেই, উপরন্তু শহরের বুকে যথেচ্ছা হত্যা করে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয়। ক্ষুদ্র

গ্রীসের এই ধৃষ্টতায় পারস্য সম্রাট দারায়ুস হিপিয়াস তাঁর বিরাট সৈন্যবাহিনীকে গ্রীস দেশে পাঠান। পারসিক সেনাবাহিনীর বিপুলতা এবং তাদের বিক্রমের কথা ভেবে এথেন্সের লোকদের চিন্তায় ভয়ে চোখের ঘুম ছুটে যায়। কিন্তু গ্রীক সেনাবাহিনী ম্যারাথন প্রান্তরে মরণপণ যুদ্ধ করে শত্রুসৈন্য পারসিকদের গ্রীস ভূগণ্ড থেকে বিতাড়িত করে। গ্রীস যে বিপদমুক্ত, শত্রুরা যথেষ্ট শিক্ষা পেয়ে প্রাণ ভয়ে পলায়িত, এই সুখবর ম্যারাথন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সুদূর এথেন্স শহরের সদাশংকিত নগরবাসীদের কানে কে পৌঁছে দিয়ে আসবে? লড়াই করে গ্রীক সেনাবাহিনীর প্রতিটি জীবিত সেনা এত ক্লান্ত যে কোমর ভেঙে পড়ছে। প্রতিটি পদক্ষেপে তাদের পায়ের হাঁটু ভেঙে পড়ছে। এই কঠিন ও গুরুদায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যের আহ্বানে একজনমাত্র যুবক এগিয়ে এলেন। তিনি গ্রাসের খ্যাতনামা দৌড়বীর ফিডিপিডেজ। দুর্গম পার্বত্যপথ অতিক্রম করে তিনি এথেন্স অভিমুখে ছুটলেন। এথেন্স নগরে পৌঁছে রণক্লান্ত ফিডিপিডেজ তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে আনন্দের খবরটা ঘোষণা করলেন, "তোমরা আনন্দ কর, উৎসব কর, আমরা জয়ী।" এই কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গে ফিডিপিডেজ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

এই মহান মৃত্যু গ্রীসের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। ম্যারাথন থেকে এথেন্স—ফিডিপিডেজের এই দৌড় পরিক্রমাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দৌড়—এর তুলনা নেই। ফিডিপিডেজের এই ঐতিহাসিক দৌড়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ফরাসী ঐতিহাসিক মাইকেল ব্রীলের প্রস্তাবে বর্তমান অলিম্পকের উদ্বোধন বছরেই (১৮৯৬) ম্যারাথন দৌড় ক্রীড়াসূচীতে ভুক্ত হয়। বিজয়ীর পুরস্কার হিসাবে মাইকেল ব্রীল যে একটি কাপ উপহার দিয়েছিলেন তা এখন ম্যারাথন দৌড়ের প্রথমস্থান অধিকারীকে দেওয়া হয় না। ব্রীল কাপটি স্মারক হিসাবে অলিম্পিক গেমসের মিউজিয়মে স্থান পেয়েছে। ১৮৯৬ সালে বিজয়ী হন গ্রীসের স্পাইরিডন লুইস ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ ২ ঘণ্টা ৫৮ মিনিট ৫০ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে। ১৯৬৪ সালে হয়েছেন ইথিয়োপিয়ার আবেবে বিকিলা। সময় নিয়েছেন মাত্র ২ ঘণ্টা ১২ মিনিট ১২.২ সেকেণ্ড।

সঙ্কল্প

সুকৃতি রায়চৌধুরী

জেনো সবে জীবনের মধুময় ছন্দ
ভালোটারে ভাল বলো মন্দরে মন্দ
সাহসেতে বুক পেতে মেনে চল ধর্ম।
নিস্পৃহ মনে কর কর্তব্য কর্ম,
যেখানেই যাবে তুমি নিকটেতে বা দূরে,
সেবা কর প্রাণ ঢেলে আর্ত ও আতুরে।
ভয়ে ভীত হয়োনাকো, সবে ভালবাসবে
অরি আর মিত্র জেনো তোমা কাছে আসবে।

(১)

প্রথম অক্ষর তার রাগে আছে দ্বেষে নাই।
মনোহরে দ্বিতীয়টি সুশোভনে নাহি পাই।
মোগলে তৃতীয় থাকে, পাঠানেতে পাবে না।
শহরেতে চতুর্থ, গ্রামে দেখা যাবে না।
নাহি পাবে বালুকায়—নদীজলে পঞ্চম।
পাঁচে মিলে আধুনিক ভারতের পিতা-সম।

(২)

রেস্তোঁরার দরজায় এসে দাঁড়ালেন তিনটি মা। হৈ-চৈ করে তাঁরা খাবেন, প্রত্যেকের সঙ্গে আছে তাঁর দুটি করে মেয়ে।

দারুণ ভীড় এখন রেস্তোঁরায়। মাত্র সাতটি আসন খালি। কিন্তু কি আশ্চর্য! তাঁরা সকলে প্রত্যেকেই আলাদা আসনে বসে খেয়ে গেলেন কাউকে দাঁড়াতে হল না বা এক চেয়ারে দুজন বসতে হল না। বল ত কি ভাবে এটা সম্ভব হল?

(৩)

শ্বেতাম্বর—(পীতাম্বরকে ছয়টি ঠিক একরকম দেখতে মাটির গোলা দিয়ে)—এর একটার মধ্যে একটা রূপোর টাকা আছে, যদি বলতে পার কোনটার ভিতর টাকা লুকোন আছে, তাহলে টাকাটা তোমার হবে।

পীতাম্বর—এত খুবই সহজ কথা। গোলাগুলো ভেঙ্গে ফেললেই টাকাটা বেরিয়ে পড়বে।

শ্বেতাম্বর—তা হবে না। যার মধ্যে টাকা আছে, সেটা ছাড়া একটা গোলাও ভাঙ্গতে পারবে না।

পীতাম্বর—তাহলে আমাকে দাঁড়িপাল্লা আর বাটখারা দাও। ওজনে যে গোলাটা অন্য পাঁচটার চেয়ে একটু বেশি হবে, তার মধ্যেই টাকা আছে বুঝব।

শ্বেতাম্বর—বেশ, দাঁড়িপাল্লা দিলাম, কিন্তু বাটখারা পাবে না। তাছাড়া দাঁড়িপাল্লাও দুইবারের বেশি ব্যবহার করতে পারবে না।

পীতাম্বর সেই বাটখারা-হীন দাঁড়িপাল্লা দুইবার ব্যবহার করেই ঠিক বার করে ফেলল কোন গোলার মধ্যে টাকা লুকোন আছে।

বলত সে কি করে বের করল?

উত্তুরে হাওয়া

অসীম বর্ধন

গাছপালা নাড়িয়ে হাড়গোড় কাঁপিয়ে হু-হু-উ করে বয়ে চলেছে উত্তুরে বাতাস! বাঁশী বাজার মতো কী তার শব্দ। ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ে গাছের পাতাগুলো। ঝোপঝাড় এলোমেলো করে ঝড় বইছে হিমের…ছেলেমেয়েরা কান-আঁটা টুপি প'রে, গলা বুক ঢেকে আরাম করে মুড়িসুড়ি দিয়ে ঘরের মধ্যে বসে পড়াশুনা গালগল্প করছে! বেশ লাগে কিন্তু ঘরের মধ্যে!

কিন্তু। কিন্তু…তোমরা জানো না, বেচারি কোকিলের কথা ভারী—বিপদে পড়েছে সে। সবাই দরজাজানলা বন্ধ করে আরাম করে বসে ঘরে; শুধু কোকিল বেচারি এই হাড়-কাঁপানো উত্তুরে বাতাসে ভারি নাকালে পড়েছে।

"হু-হু-উ—শোঁ-ও-ও" শব্দ করে উত্তুরে বাতাস কোকিলের কানে কানে বলে গেল, "কোকিল ভায়া, মরে যাবে, মরে যাবে। আমার ঠাণ্ডায় তুমি বাঁচবে কি করে? শিগ্‌গিরি কোথাও আস্তানা নাও!' বলতে বলতে চলে গেল উত্তুরে বাতাস অমনি শব্দ করে।

কোকিল বেচারি উড়তে উড়তে কাঁপতে কাঁপতে বলে, "কিন্তু, মাথা গোঁজবার ঠাঁই তো দেখিনা। ফাঁকা মাঠ হেথাহোথা একটা-আধটা বাড়ি। তাও সব আঁট-ঘাট বন্ধ করে সবাই নিশ্চিন্দি। একটা ছোট্ট পাখি কোকিলের কথা ভাবতে কারু বয়েই গেছে।"

কোথা থেকে আবার হিমের বাতাস শোঁ শোঁ করে এসে খুব ধমক দিয়ে গেল কোকিলকে, "এরপর কিন্তু আমায় দোষ দিওনা বলছি। আকাশে নবাবী চালে ওড়াউড়ি না করে নিচে নামো না। তবু কোঁকর-কাঁকরও তো একটা খুঁজলে পাবে। আকাশে কি—' বলতে বলতে আবার কোথায় ছুটে চলে গেল কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস। ভারি এলোমেলো আজ তার কাজ। যেখানে যে অসাবধানে আছে এই শীতের দিনে, তাকেই একবার 'মালুম' দেবার ভার পড়েছে এই উত্তুরে বাতাসের ওপর। তাই সে দিগ্বিদিকে ছুটোছুটি করে' সকলকে তাড়াহুড়ো ঠেলাঠেলি মেরে ঘরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে।

কোকিল-বেচারি উত্তুরে হাওয়ার ধমকানি খেয়ে অসাড় পাখনা ছুটো গুটিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে নিচে নেমে পড়লো। নিচে ছোট্ট একটি ফোকর পেল ইয়া মোটা এক গাছের নিচে। যেই পাতাটাতা সরিয়ে তার মধ্যে মাথা গুঁজেছে, অমনি এক হুমদো প্যাঁচা খ্যাকখ্যাক করে তেড়ে এসে বলল, "কি চাও?"

"দেখ ভাই, প্যাঁচা। বলতে পার কোথায় গেলে একটু আস্তানা মিলবে?'

—"আমি জানি না, আমি জানি না। ঘুমে আমি বেজায় কাহিল। এসময়ে আমাকে বিরক্ত কর না। এঃ—ঘুমটা বেশ জমেছিল, দিলে মাটি করে—'বলে প্যাঁচা কোঁকরে ঢুকে পড়ল।

শোঁ-ও-অ করে উত্তুরে বাতাস মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেল আবার। কোকিল মনে মনে ভাবল যাক্ ঠাণ্ডা হাওয়াটা চলে গেল। ও আবার ঘুরে এদিকে আসবার আগেই নিশ্চয়ই একটা আস্তানা পেয়ে যাবে।' এই ভেবে ভরসা করে কোকিল আবার উড়ল আকাশে।

অনেক আশা নিয়ে চারিদিক তাকাতে তাকাতে কোকিল উড়ে চলল। কিন্তু বেচারির কপাল মন্দ—কোথাও এতটুকু ঠাঁই মিলল না। চলেছে…চলেছে। হঠাৎ একটা গাছের মাথায় দেখে একটা বাসা। কার বাসা কে জানে? তাতে রয়েছে এটা-সেটা ফল পাকুড়ের টুকরো। কে বুঝি জোগাড়-যন্তর ক'রে এনে রেখেছে ভুরিভোজনের জন্যে! কোকিলের পেয়েছিল বেজায় খিদে। ভাবলে 'যারই হোক খেয়ে তো নিই, তবু একটু দেহে বল পাব' কোকিল বেচারি যেই না বাসায় বসে এক টুকরো ফল ঠুকরতে যাবে, অমনি কোথা থেকে একটা গেছো ইঁদুর এসে বলল, কি গো কোকিল ভায়া, পরের খাবারে লোভ কেন।

ভারি লজ্জা পেয়ে আধখানা হয়ে কোকিল বললে, 'দেখ ভাই, বলতে পার কোথায় একটু আস্তানা মিলবে!'

খুদে ইঁদুর ন্যাজফ্যাজ্ নেড়ে মহা রেগে বললে, 'এই একটা সামান্য কথা বলবার জন্যে তুমি পরের বাড়িতে ঢুকে তার ঘুম ভাঙিয়ে বিরক্ত করতে এয়েছ! ভারি অন্যায়. ভারি অন্যায়। যাও—যাও, ঘুমোতে দাও!'

—'ওঃ আচ্ছা ভাই, আচ্ছা—' কোকিল আবার উড়ল হিমভরা আকাশে। শোঁ শোঁ করে শীতের ঝোড়ো বাতাস আবার এসে বলে গেল, 'কিহে, কোকিলভায়া! তুমি এখনো আস্তানা পেলে না? তোমার দেখছি আজ প্রাণটা বেঘোরেই যাবে! আমাকে কিন্তু পরে দোষ দিও না—' চলে গেল সে আবার নিজের কাজে।

ভয় পেয়ে কোকিল তাড়াতাড়ি নিচে নেমে একটা গাছের ফাটলে মাথা ঢুকিয়ে একটু জিরোতে চেষ্টা করল। কিন্তু ফাটল থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল একটা বাদামী রংয়ের ছোট্ট মাথা।

—'ওঃ কাঠবেড়ালী ভাই, তুমি! বলতে পার একটু ঠাঁই মিলবে কোথায়?' কোকিল কাঁপতে কাঁপতে বলল।

—'ঠাঁই? তোমাকে ঠাঁই করে এক চাঁটি মারতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার! ভদ্দরলোকের ঘুম ভাঙানোটা ভারি বিচ্ছিরি, ভারি বিচ্ছিরি। নাঃ, দেখি আবার ঘুমটা আসে কিনা!' কাঠবেড়ালী তার ফুলো ফুলো ল্যাজ উঁচিয়ে গদিয়ানী চালে ফাটলে ঢুকে পড়ল।

এমন সময়ে গাছের ওপরের ডালের একটা বাসা থেকে কে যেন বলে উঠল।

'ঠকাস্ ঠক্ ঠকাস্ ঠক্
করছো কারা বকর্ বক্?'

তারপরেই একটা কাঠঠোকরা পাখি কোকিলের পাশে এসে বলল, 'ওঃ হো কোকিল ভায়া! মিললো নাকো ঠাঁই? এসো এসো আমার সঙ্গে ভাবনা কিছুই নাই।' তাল মিলিয়ে কথা বলাই কাঠঠোকরার স্বভাব! এতক্ষণ পরে একজনের কাছে এমনি মিষ্টি কথা শুনে কোকিলের ভারি আনন্দ হলো। কথা ক'টা বলেই কাঠঠোকরা বোঁ করে আকাশে উড়ে পড়ল—কোকিল উড়ল তার পেছনে!

আবার উত্তুরে হাওয়া শোঁ শোঁ করে ছুটে এল! ততক্ষণে কাঠঠোকরা কোকিলকে নিয়ে একটা ধানগোলার ওপরে পৌঁছে গেছে। কাঠঠোকরা বললে, 'ওই যে ওই ধানগোলা। ভারি আরাম পাবে এখানে। যাও—ঢুকে পড়।'

কোকিল গোঁৎ খেয়ে মহানন্দে নেমে গেল গোলাবাড়িটার দিকে। একবার পেছন ফিরে কাঠ-ঠোকরাকে ছোট্ট একটা ধন্যবাদ জানাতেও ভুলল না। কাঠঠোকরাও কন্‌কনে ঝড়টাকে কাটাবার জন্যে আর কোকিলের ধন্যবাদের উত্তর দেবার জন্যে সাঁ করে নিচে নেমে গোলার চারিদিকে একটা চক্কর মেরে আবার ফিরে চলল আপন ঘরে। উত্তুরে বাতাস তখন গোলা ছাড়িয়ে অনেক দূরে দৌড় মেরেছে।

কোকিলও অনেকক্ষণ উত্তুরে ঝড়ের পাল্লায় পড়ে কাহিল হয়ে পড়েছিল। তাই পাখনার মধ্যে মাথা গুঁজে এককোণে বেশ আরাম করে বসতে পেয়ে ভারি খুশি হল। একবার মনের আনন্দে সে ডেকে উঠল 'কুক্ কুক্!'

চিচিং ফাঁক

শৈলশেখর মিত্র

কাক-ডাকা জোছনায় যারা বাস করে
আকাশের গায়ে নাকি তারা চাষ করে।
মেঘ হ'ল ধান ক্ষেত, বিষ্টিরা ধান।
দখিনার বাতাসেতে গায় তারা গান।
তাদের বেদনা ঝরা অশ্রু-ধারা
সবুজ ঘাসের বুকে শিশিরে হারা।
তাদের সঙ্গে কারো আলাপ হলে
নামটা শুধিয়ে নিও—নাম না বলে।
সেই নাম ধরে জোরে তিন হাঁক
কেল্লাটা ফতে হ'বে, চিচিংটা ফাঁক।

এম্. এম্. লাওস
[Messagerics Martimes Laes]

সুনীল রঞ্জন দত্ত

স্নেহের সোমা ও রূপা,

এখন আমার চারদিকে শুধু জল আর জল। মাটির এতটুকু চিহ্ন নেই। নীল আকাশ অসীম সমুদ্রের সঙ্গে মিশে নীলে সবুজে মেশান একটা অদ্ভুত সুন্দর সীমারেখার সৃষ্টি করেছে চারদিকে। অনেকক্ষণ থেকে দুটি সাদা সামুদ্রিক পাখি উড়ে চলছে আমাদের জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে। তারা লাল টুকটুকে পা দিয়ে বার বার জাহাজের মাস্তুল স্পর্শ করে আবার আকাশে উড়ে যাচ্ছে। সীমাহীন সমুদ্রের বুকে কোন শক্ত বস্তুর উপর বসে বিশ্রাম করার সুযোগ তাদের জীবনে হয়ত কোনদিনই আসেনি, তাই বসতে আগ্রহ।

এসব পাখিরা কি কোনদিনই স্থলের সৌন্দর্য দেখেনি? সমুদ্রের বুকেই কি সমস্ত জীবন উড়ে বেড়ায়, সমুদ্রের বুকেই কি এদের জন্ম। সমুদ্রের বুকেই কি নিভে যায় এদের জীবনের শেষ আলো? শুনেছি অ্যালবাট্রস পাখিরা দিকভ্রান্ত নাবিকদের পথের নির্দেশ দেবার জন্য সমস্ত জীবন সমুদ্রের বুকে উড়ে বেড়ায়, এ সব পাখিরা কি অ্যালবাট্রসের বংশধর? পাখি দুটিকে দেখে আমার মনে বার বার এসব প্রশ্ন জাগছে।

তোমাদের এ চিঠি লিখছি 'এম্, এম্, লাওস্' থেকে এম্ এম্ লাওস কোনো দেশ নয়, একখানি যাত্রিবাহী জাহাজ। আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে ফরাসি দেশের মার্সেই বন্দর থেকে, শেষ করে জাপানের ওকোহামা বন্দরে। আমার যাত্রা শেষ হবে বোম্বাই বন্দর। ছেলেবেলা থেকে আমার মনের গোপন কোণে একটা স্বপ্ন লুকিয়ে ছিল—সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে নতুন দেশ দেখব, অথচ কয়েক বৎসর আগে বিদেশে যাবার সুযোগ পেয়েও সাত সমুদ্র পাড়ি দিতে পারিনি।

কলকাতা থেকে আমস্টারডমের বিরাট দূরত্বটা অতিক্রম করেছিলাম আকাশপথে মাত্র সামান্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। তাই দেশে ফেরার সময় সমুদ্র যাত্রার বিরাট সুযোগটা আর হাতছাড়া করতে মন সায় দিল না। অসীম সমুদ্রের সৌন্দর্য এবং তার ভয়ঙ্কর রূপ দুটোই আমাকে আকর্ষণ করছিল বারবার। ইচ্ছা ছিল সমুদ্রের বুকে দাঁড়িয়ে সাইক্লোন দেখব, সে বাসনা বোধহয় এ যাত্রায় আর পূর্ণ হল না। সমুদ্রের ঐ রূপ দেখবার সৌভাগ্য নাবিক জীবনে সম্ভব হলেও যাত্রীদের বড় একটা হয় না।

জাহাজে ওঠার জন্য আমাকে ডেনমার্ক থেকে মার্সেই বন্দরে আসতে হয়েছিল ট্রেন করে। ডেনমার্ক থেকে ফরাসি দেশের মার্সেই বন্দরের দূরত্ব কম নয়, সময় নিয়েছিল সম্ভবতঃ ৩১ ঘণ্টা কি তার কিছু বেশী। মার্সেইতে ছিলাম মাত্র দু' দিন। তখন আবহাওয়া ছিল খুবই ভাল, পরিষ্কার আকাশ এবং চড়া রোদ বার বার মনে করিয়ে দিচ্ছিল আমাদের দেশের গ্রীষ্মের, প্রথম অবস্থার কথা।

কিছু ভারতীয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে হোটেলে, রেস্তোরায়, এবং স্টেশনে। তারাও এম্ এম্ লাওস জাহাজের যাত্রী। ইউরোপের যে সমস্ত সহর এবং বন্দর দেখেছি এ সহর কিন্তু সে রকম নয়। এখানকার অনেক অলিগলি অপরিচ্ছন্ন বস্তিতে ভরা, রাস্তায় ঢালা কাঁচা তরিতরকারির বাজার। তবে বহুদিন পর কয়েকটা সুস্বাদু দেশীয়

খাবারের সন্ধান পেয়ে আর লোভ সামলাতে পারিনি—বড় বড় জিলিপি এবং সন্দেশ পেট ভরে খেয়েছি। বেশ কয়েকটা মিষ্টির দোকান রয়েছে এই বন্দরে। মনে হয় মিষ্টির দোকানের কারিগররা আরবীয় অথবা অন্য কোন পূর্ব দেশের অধিবাসী।

৭ই সেপ্টেম্বর বিকেল ঠিক পাঁচটার সময় এম্ এম্ লাওস্ বন্দরের তীরের স্পর্শ থেকে মুক্তি পেয়ে ছুটেছিল মহাসমুদ্রের দিকে। বায়নকুলার চোখে লাগিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ফরাসি দেশের তটভাগ দেখেছি আর মনে মনে তাকে শেষ বিদায় জানিয়েছি, কতদিন পর দেশে ফিরছি। কে জানে আর কোনদিন ইউরোপে আসার সৌভাগ্য হবে কিনা।

বন্দর ছেড়ে দিয়ে একটানা চারদিন জাহাজ চলেছিল ভূমধ্য সাগরের বুকের উপর দিয়ে। ঐ চারদিনে মাঝে মাঝে দু' একটা দ্বীপ এবং দু' একটা জাহাজের মুখোমুখি হয়েছি,জাহাজের রেলিং ধরে পরিষ্কার নীল জলে দেখেছি সামুদ্রিক কাঁকড়ার সাঁতার কাটা, মাঝে মাঝে বড় বড় সামুদ্রিক মাছ জাহাজের পাশ দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে দূরে সরে গিয়েছে। এতদিন উড়ন্ত মাছ (Flying fish) এর কথা কেবল বই-এ পড়েছি এবার নিজের চোখে দেখলাম, ঠিক যেন এক ঝাঁক চড়াই পাখি, ছোট ছোট মাছ কানকো (Gills) দুটি খুব বড়। উড়ে যাবার সময় পাখির ডানার মতো দুটিকে ছড়িয়ে দেয়। এক একবারে ২০-৩০ গজ অনায়াসে যেতে পারে।

এম্ এম লাওস জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে ভারতীয়দের সংখ্যাই বেশি। তার মধ্যে আবার বাঙালীদের সংখ্যাও কম নয়।

আমাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। জাহাজে আমাদের কিছুই করার নেই। সময় মতো ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ এবং ডিনার খাই। বাকি সময় ডেকের উপর বসে গল্প করি, রাত একটু বেশি হলে মাঝে মাঝে ডেকের উপর শুয়ে নীল আকাশের গায়ে আঁকা চক্চকে তারাগুলিকে দেখি।

একরাত্রে ভূমধ্যসাগরের বুকে জাহাজ খুব দুলেছিল, সমস্ত রাত ধরে শুধু এদিক আর ওদিক। অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়লেও আমি কিন্তু একটুও নরম হইনি। আমার জীবনের প্রথম ভাগ কেটেছে পূর্ববঙ্গে। জাহাজে চাপবার সুযোগ না পেলেও নৌকা এবং স্টিমারের দোলা খেতে খেতে বড় হয়েছি। সমুদ্রের সাক্ষাৎ না পেলেও বঙ্গোপসাগরের নোনা জলের হাওয়া গায়ে লাগিয়েছি খুব ছোট বয়সে। আরেকজনের এই হল দ্বিতীয় সমুদ্র যাত্রা, তার অভিজ্ঞতা সে সকলকে জানিয়েছিল ঐ সময় কেবিনে থাকা উচিত নয় তাতে গা বমি বমি করে বেশি আর খালি পেটে থাকাও ভাল নয়। আমরাও লক্ষ্য করেছি ঐ সময় ডেকের উপর ভরা পেটে থাকা সবচেয়ে নিরাপদ।

চার দিন পর অর্থাৎ ১১ই সেপ্টেম্বর রাত ১টার সময় জাহাজ থেমেছিল পোর্ট সৈয়দ বন্দরে, নতুন কিছু যাত্রী নিয়ে সকাল ৮টার সময় আমাদের জাহাজ পোর্ট সৈয়দ থেকে আবার যাত্রা শুরু করেছিল সুয়েজখালের দিকে, সুয়েজ খালের কথা ছেলেবেলায় অনেকবার বই-এ পড়েছি কিন্তু নিজের চোখে দেখতে পাব একথা সপ্নেও ভাবিনি, আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে কতবার কতরকমের সমস্যা দেখা দিয়েছিল এই সুয়েজ খালকে নিয়ে। এখনও বহু সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সুয়েজ খাল। খালটি দৈর্ঘ্যে ১০১ মাইল, অতিক্রম করতে সময় লেগেছিল ১২ ঘন্টারও বেশি, প্রস্থে মাত্র ১৯৫ ফুট থেকে ২৪৫ ফুট, আমাদের জাহাজ খুব ধীরে ধীরে সুয়েজের মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছিল, দুধারের দৃশ্য দেখতে কোনো অসুবিধে হয়নি। দৃশ্য বলতে বাঁ দিকে নিষ্প্রাণ মরুভূমি বৃক্ষলতার কোনো চিহ্ন নেই, শুধু কালো বালির উচু নিচু স্তুপ। ডান দিকে কিছু সবুজের চিহ্ন রয়েছে; কাঁটা গাছের ঝোপ, খেজুর গাছ ইত্যাদি।

সুয়েজ খালের পথ এঁকেবেঁকে চলে গেছে। একটি রেল লাইন, সুয়েজের পরই লোহিত সাগর। পোর্ট সইদ বন্দর ছেড়ে আসার তিন দিন পর সন্ধ্যা ৭ টায় জাহাজ থেমেছিল এডেন বন্দরে। এখানে কোন জিনিস কিনলে

তার জন্য কোন ট্যাক্স দিতে হয় না তাই সব জিনিসের দাম খুব কম, জাহাজ এডেনে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে সকলে জাহাজ থেকে নামবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু নামার অনুমতি প্রথমে পাওয়া যায়নি, তার কারণ এডেনে একটা রাজনৈতিক গোলযোগ আছে। অবশ্য সেটা ইংরেজ মিলিটারীদের সঙ্গে। এম এম লাওস্ ফরাসী কম্পানীর জাহাজ ক্ষয় ক্ষতির ভয়ে তারা জাহাজ পোর্টে ভেড়ায়নি। দূরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। এডেন থেকে যে সকল যাত্রীর জাহাজে ওঠার কথা তাদের নৌকা করে জাহাজে নিয়ে আসা হয়েছিল।

জাহাজ তীর থেকে দূরে থাকলেও ব্যবসায়ীরা ছোট ছোট নৌকা ভরতি প্রচুর জিনিস এনে জাহাজের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। এই সব ছোট ছোট নৌকাতে এত জিনিস থাকে যে তার হিসাব দেয়া একেবারেই অসম্ভব। তীরে নামার জন্য জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে আমরা অনুমতি আদায় করেছিলাম, তবে নিজ দায়িত্বে, অর্থাৎ স্থলের উপর আমাদের কোন বিপদ হলে তার জন্য জাহাজ কোম্পানী দায়ী থাকবে না। নৌকা ভাড়া করে তীরে গিয়েছিলাম. সামান্য সময় এডেনে কাটিয়েছি, ঐটুকু সময়ের মধ্যেই দেখেছি সশস্ত্র ইংরেজ সৈন্য বার বার গাড়ি করে ঘুরছে।

আজ ১৭ই সেপ্টেম্বর। ১৮ই সেপ্টেম্বর বিকাল ঠিক তিনটের সময় আমি বোম্বাই বন্দরে পৌঁছাব। এতদিন এত জল দেখেও চিত্ত কিন্তু একটুও বিকল হয়নি, বরং খুব আনন্দেই কাটালাম এই কটা দিন। তাই বোম্বাই বন্দরের দিকে যতই এগচ্ছি তোমাদের কথা ভেবে মন পুলকিত হচ্ছে ঠিকই, তেমনি আবার বেদনায় ভরে যাচ্ছে এই ভেবে—যাত্রীদের সঙ্গে এই যে ক্ষণিক বন্ধুত্ব সে কি এখানেই শেষ হয়ে যাবে ?

যা হোক জাহাজ থেকে খুব বড় চিঠি লিখতে বলেছিলে—এবার খুসি হলে তো ? আগামী কাল আমার সমুদ্রযাত্রা শেষ হবে, জাহাজ থেকে নেমেই তোমাদের দেখতে পাব আশা করি, আমার ভালবাসা নাও।

খুসির হাসি

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

আলোর হাসি, রোদের হাসি,
ফুলের হাসি আর
দূর-আকাশের ঝিকে হাসি
বড়ই চমৎকার।
ঝিলের হাসি, বিলের হাসি
মাঠের হাসি আর

সোনার বরণ চাঁদের হাসি—
তুলনা নেই যার।
মিষ্টি হাসি দুষ্টু হাসি—
এখন হাসি কার ?
সে আমাদের খোকন সোনার—
খুসির হাসি তার।

ডাকটিকিটের মজার মজার গল্প

শুভঙ্কর ঘোষ

প্রত্যেক ডাকটিকিট সংগ্রহকারীর মনে মনে ইচ্ছা থাকে—'আমি যদি একটি দুর্লভ ডাকটিকিট পাই।' আমি নিজের কথাই বলছি—যে কোনো ডাকটিকিটই আমার হাতে আসে, আমি আগে আমার আতস কাঁচ দিয়ে সেটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ গত সাত বছরে হাজার-হাজার ডাকটিকিট পরীক্ষা করে এমন একটিও পাইনি যার মধ্যে কোনো রকম ভুল-ত্রুটি আছে।

কিন্তু কখনও কখনও কারো ভাগ্য থাকে, তারা আশ্চর্য সব ডাকটিকিট হাতে পায়। এই গত ১৯৫৭ সালের জানুয়ারীতে ১৬ বছরের প্যাট্রিশিয়া জার্ভিস ইংলণ্ডের কেন্ট্ প্রদেশের একটি পোষ্টঅফিস থেকে ২৪০টি ২-পেনির ডাকটিকিট কেনে। কিন্তু সেগুলি ছিঁড়ে খামে লাগাতে গিয়ে দেখে যে ডাকটিকিটগুলিতে কোন Perforation (ডাকটিকিটগুলি ছেঁড়বার সুবিধার জন্য ছোট ছোট ফুটো) নেই। যদিও প্যাট্রিশিয়া ডাকটিকিট সম্বন্ধে কিছুই জানতনা, তা সত্বেও তার ডাকটিকিটগুলি কেমন অদ্ভুত মনে হয় এবং তখনি সে সেগুলি একজন ডাকটিকিটের দোকানদারকে গিয়ে দেখায়। দোকানদারটি প্যাট্রিশিয়াকে ৪০ পাউণ্ড (৭২০ টাকা) দিয়ে ডাকটিকিটগুলি কিনে নেয়। ৩৬ টাকা দিয়ে কেনা ডাকটিকিটগুলির বদলে ৭২০ টাকা পেয়ে প্যাট্রিশিয়া ত মহানন্দে বাড়ি ফিরে গেল।

কিন্তু ৭২০ টাকা ত কিছুই নয়। লণ্ডনে একটি নিলামে ঐ ২৪০টি ডাকটিকিট ১,৭২,০০০ টাকায় বিক্রী হয়!!

* * *

যখন পৃথিবীর প্রথম ডাকটিকিটগুলি—ইংলণ্ডের কালো রঙের এক-পেনি—১৮৪০ সালের মে মাসে বার করা হয়, তখন ইংলণ্ডের জনসাধারণ সেগুলি মোটেই খুসি মনে গ্রহণ করেনি। তারা তাদের চিঠিতে 'ছোট ছোট রঙিন কাগজের টুকরেগুলি' এঁটে দিতে চাইত না। বেশির ভাগ লোকই ডাকটিকিট না লাগিয়েই চিঠি ডাকে ছেড়ে দিত। যে চিঠি পেত, সে পোস্টম্যানকে পয়সা দিয়ে চিঠি নিত!

* * *

রাশিয়ার বল্‌শেভিক্ Revolution-এর সময় শেষ 'জার' (Czar)-এর এক ভাই—রাজকুমার ওল্ডেনবার্‌—যখন সুইডেন-এ পালিয়ে যান, তখন তিনি নিজের বিশাল ডাকটিকিট সংগ্রহ থেকে কিছু দুষ্প্রাপ্য টিকিট তাঁর কোটের লাইনিং-এর ভিতর সেলাই করে নিয়েছিলেন। কিন্তু রাশিয়া ছেড়ে পালাবার আগে ওল্ডেনবার্ যখন বন্দী ছিলেন তখন তাঁর শরীর খুব খারাপ হয়ে যায়। সুইডেনএ পৌঁছে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ে—ফলে তিনি ডাকটিকিটগুলির কথা ভুলে যান।

কোটটি তিনি কয়েক বছর পরার পর এক দরিদ্র রাশিয়ান উদ্বাস্তুকে দান করে দেন। আরো কয়েক বছর পরে যখন এই লোকটি ছেঁড়া কোটটি দরজীর কাছে সেলাই করতে নিয়ে যায়, তখন লাইনিং খুলতে গিয়ে দরজী ডাকটিকিটগুলি পায় এবং লোকটিকে দিয়ে দেয়। এতদিন কোটের মধ্যে থাকার দরুণ অনেক ডাকটিকিট কুঁচকিয়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কিছু তখনও ভাল অবস্থায় ছিল। লোকটি ডাকটিকিটগুলির দাম জানত না—সে তার ছোট ছেলেকে সেগুলি খেলতে দেয়। সেই ছেলে যখন বড় হ'ল এবং ডাকটিকিট সম্বন্ধে আরো জানল, তখন সে বুঝল যে কোটের লাইনিংএ পাওয়া ডাকটিকিটগুলি কত দামী।

পরে একটি নিলামে ডাকটিকিটগুলি বেশ কয়েক হাজার টাকায় বিক্রী হয় এবং গরীব উদ্বাস্তুর ছেলেটি রাতারাতি বড়লোক হয়ে যায়।

* * *

১৮৬০ সালে চার্লস কনেল ছিলেন নিউ ব্রান্সউইকের পোস্টমাস্টার। নিউ ব্রান্সউইক ছিল উত্তর আমেরিকার একটি কলোনি, এখন ক্যানাডার একটি প্রদেশ।

সেখানে প্রথম ডাকটিকিট বের হয় ১৮৫১ সালে। কয়েক বছর পরে কলোনির লেফটেনেন্ট গভর্ণর মিঃ কনেলকে আদেশ করেন একটি নতুন সেট ডাকটিকিট বার করবার জন্ত—যাতে রাণী ভিক্টোরিয়া ও যুবরাজের (যিনি পরে সম্রাট অষ্টম এড্‌ওয়ার্ড হ'ন) ছবি থাকবে। মিঃ কনেল 'আমেরিকান ব্যাঙ্ক-নোট কম্পানির' সঙ্গে ডাকটিকিটগুলির ডিজাইন ও ছাপার বন্দোবস্ত করেন।

১৮৬০ সালের মে মাসে, ৬টি ডাকটিকিটের সুন্দর সেটটি তৈরি হয়ে আসে। কিন্তু কলোনির Lt Governor অবাক হয়ে দেখেন যে নতুন সেটের ৫ সেণ্টের টিকিটে না আছে রাণীর ছবি, না আছে যুবরাজের ছবি—যাঁর ছবি আছে তিনি স্বয়ং পোস্টমাস্টার চার্লস কনেল। উঁচু কলার ও ক্র্যাভাট পরে তাঁকে অবশ্য একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মতই দেখাচ্ছিল। বেচারী লেফটেনেণ্ট গভর্ণরের রাণীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা ছাড়া আর কোনই উপায় ছিলনা।

রাণী ভিক্টোরিয়া অবশ্য এই ঘটনায় খুবই চটে গিয়েছিলেন। তিনি আদেশ করেন 'কনেল'-এর ছবি দেওয়া ডাকটিকিটটির বিক্রী বন্ধ করতে এবং উদ্ধত পোস্টমাস্টারকে বরখাস্ত করতে। একটি নতুন ৫ সেণ্টের ডাকটিকিট শীঘ্রই বার করা হয়, এবার অবশ্য তাতে রাণীর ছবি ছিল। 'কনেল'-এর ছবি দেওয়া ৫ সেণ্টের ডাকটিকিটটি এখন দুর্লভ।

* * *

আর একটি মজার ঘটনা বলে এই রচনা শেষ করব। একটি ডাকটিকিট যদি না বার করা হ'ত, তাহ'লে 'পানামা ক্যানাল'টি হয়ত ৫০০ মাইল উত্তরে কাটা হ'ত এবং তার নাম হয়ত হ'ত 'নিকারাগুয়া ক্যানাল'।

যখন আমেরিকান ও ফরাসী ব্যবসায়ীরা প্রথম ক্যানালটি তৈরি করার পরিকল্পনা করেন, তখন দুটি দল ছিল—একদল চাইছিলেন ক্যানালটি পানামার যোজকের মধ্যে দিয়ে কাটতে আর একদল চাইছিলেন নিকারাগুয়া দেশের মধ্যে দিয়ে তৈরি করতে। এমনকি ১৮৯৬ সালে নিকারাগুয়া কয়েকটি নতুন ডাকটিকিট পর্যন্ত বার করে। বেশ কয়েক বছর আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট এই দুটি ভিন্ন মত নিয়ে আলোচনা করেন।

হঠাৎ ১৯০০ সালে, নিকারগুয়ার পোস্টঅফিস ঠিক করল একটি নতুন সেট ডাকটিকিট বার করবে, যাতে মোমোটম্বো আগ্নেয়গিরির ছবি থাকবে। যদিও আগ্নেয়গিরিটি শত শত বছর ধরে মৃত (Extinct) ছিল, তা সত্ত্বেও যে শিল্পীকে ডাকটিকিটগুলির নক্সা করতে দেওয়া হয়েছিল, তিনি নিজের খেয়ালে আঁকলেন আগ্নেয়গিরির মুখ দিয়ে ধোঁয়া এবং লাভা বেরুচ্ছে।

কর্ণেল বুন-ভারিল্, একজন ফরাসী ব্যবসায়ী যিনি নতুন ক্যানালটি পানামার মধ্যে দিয়ে কাটার পক্ষে ছিলেন। নিকারাগুয়ার এই নতুন ডাকটিকিটগুলি ভাল করে দেখলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথায় দুষ্টবুদ্ধি খেলে গেল। তিনি মোমোটম্বো আগ্নেয়গিরির ছবি দেওয়া অনেকগুলি নতুন নিকারাগুয়ার ডাকটিকিট কিনে নিলেন। তারপর এক একটি কার্ডবোর্ডের টুকরোর উপর সুন্দর করে একটি করে ডাকটিকিট আঁটলেন এবং তলায় লিখে দিলেন 'নিকারাগুয়ায় আগ্নেয়গিরির বিভীষিকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।' তারপর ডাকটিকিট ও লেখা সমেত কার্ডবোর্ডের টুকরোগুলি প্রত্যেক আমেরিকান সেনেটর এবং ক্যানেল-পরিকল্পনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি লোকের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এর কারণ আর কিছুই নয়—কর্তৃপক্ষকে ক্যানালটি নিকারাগুয়ার মধ্য দিয়ে কাটা থেকে বিরত করা।

কর্ণেল বুন-ভারিল সম্পূর্ণভাবে সফল হয়েছিলেন। ক্যানালকমিটির শেষ সভায় একজনের পর একজন ডাকটিকিট সমেত কার্ডবোর্ডের টুকরো হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন যে নতুন ক্যানালটিকে নিকারাগুয়ার আগ্নেয়-গিরির বিপদের সামনে ফেলা আর আমেরিকার টাকা জলে ফেলে দেওয়া একই কথা।

ক্যানালটি তাই পানামার যোজকের ১,২০,০০০ একর অনুর্বর জমির মধ্যে দিয়েই কাটা হ'ল—যার জন্ত পানামা গভর্ণমেণ্টকে লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। নিকারাগুয়া একটা ডাকটিকিটের জন্ত ক্যানাল কাটার কনট্র্যাক্ট হারাল এবং গরীব থেকে গেল।
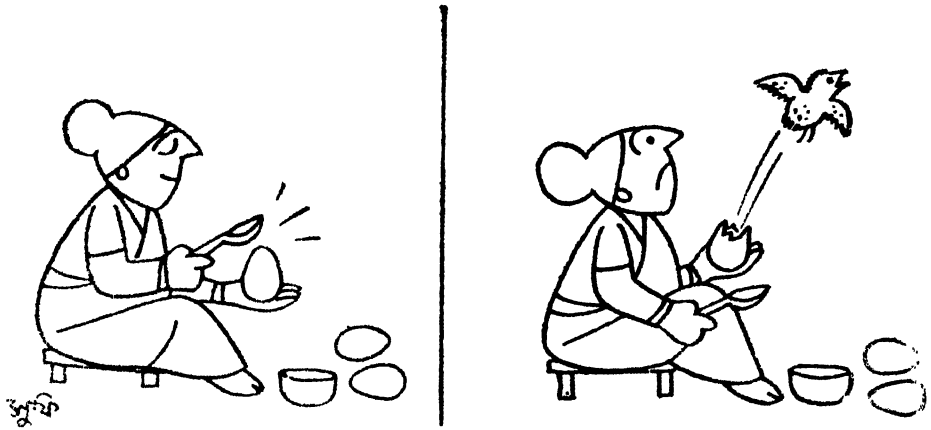
হায়! হায়!! হায়!!! হায়!!!! হায়!!!!

ডালনার ডিম উড়ে যায়!
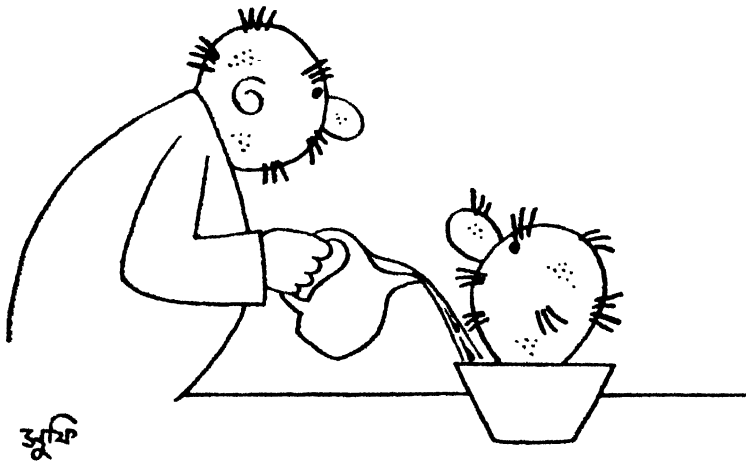
সহানুভূতি

অষ্টম বর্ষ—অষ্টম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ ১৩৭৫/ডিসেম্বর ১৯৬৮

শীত আসে

প্রভাকর মাঝি

আন কোট আলোয়ান,
কম্বল ধরে টান।
পুলোভার, জামপার,
ফুল-হাতা সোয়েটার,
জড়িয়ে নে সারা গায়—
ও কে যেন কামড়ায় ?
ঠোঁট করে চিন্ চিন্
বুলিয়ে নে গ্লিসারিন।
হৈ হৈ হৈ রে—
শীত আসে ঐ রে !
ও জানে কি মন্তর
পাতা কাঁপে থথর,
বাগানে হরেক ফুল
চোখ বোজে বিলকুল।
উত্তুরে হাওয়া বয়—
আমরা করিনে ভয়।
পিঠে পুলি মরসুম,
রাত্তিরে তোফা ঘুম !
হৈ হৈ হৈ রে—
শীত আসে ঐ রে।

ছোটদের জন্যে ফিল্ম তোলা
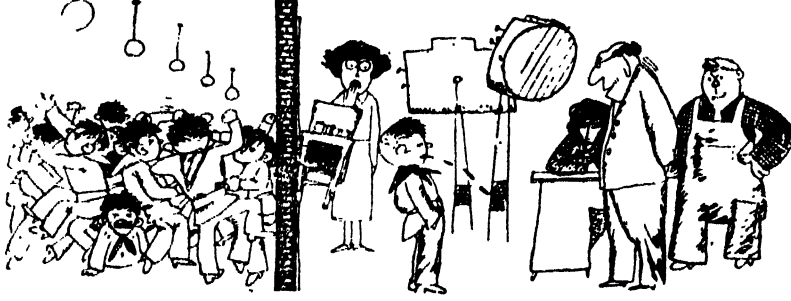
ভি পডানকভ্

ইস্কুলের মধ্যে ঠিক যেন একটা বোমা ফাটল। সেই নোটিসটা থেকে ব্যাপারটা শুরু। সেদিন টিফিনের সময় যেই না দুপদাপ করে আমরা প্যাসেজে বেরিয়েছি, অমনি দেখি ছয়ের বি'র দরজায় একটা নোটিস আঁটা।

চুপ।

ছোটদের জন্যে ফিল্ম্ তোলা হচ্ছে।

বলা বাহুল্য, সবাই হাঁ। তারপর চাবির ছ্যাঁদা দিয়ে দেখার চেষ্টা।

হঠাৎ দরজা গেল খুলে আর আমাদের দিদিমণি ইন্না ইলিইচনা ঐ ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

দিদিমণি বললেন, ছেলেমেয়েরা, একেবারে চুপ। একজন চিত্র পরিচালক তোমাদের পরীক্ষা করবেন। যে যার ক্লাস অনুসারে নিয়মিতভাবে তোমরা ঘরে ঢুকবে। সব চেয়ে আগে আসবে ছয়ের এ।

ছয়ের এ? কেয়াবৎ। তার মানে আমরা। আমরাই সবার আগে পরীক্ষা দেব।

ছয়ের বি ঘরটাকে চেনা যাচ্ছিল না। ভিতরে প্রকাণ্ড বড় বড় আলো আর পরিচালক মশাই। দেয়ালের গায়ে দড়িদড়া বিজলির তার আর তার পাশে ক্যামেরাম্যান।

দিদিমণির ডেস্কে আমাদের ক্লাসের পত্রিকাটি। একজন সহকারী পরিচালক সেটাকে দেখছেন। উত্তেজিতভাবে দিদিমণি আমাদের পরিপাটি একটি দল বানিয়ে দাঁড় করিয়ে ফেললেন।

সহকারী বলল, 'দুজন দুজন করে নেব। সবার আগে আরাপভ আর বুনিন। তার পরেই ভিলকিন আর গ্রিস্কো।'

দলের ভিতর থেকে আরাপভ আর বুনিন ঠেলেঠুলে এগিয়ে গিয়ে চিত্রপরিচালক মশাইয়ের সামনে দাঁড়াল।

পরিচালক মশাই বললেন, 'আরাপভ, তোমাকে শুধু একটি কথা বলতে হবে:—কচু!

আরাপভ কয়েকবার চোখ পিটপিট করে আলগোছে বলল, 'কচু!'

পরিচালক মশাই বললেন, 'আরে না, না, ও ভাবে না।

জোরে জোরে বলবে, বেশ ঘৃণার সঙ্গে!'

আরাপভ আরেকটু জোরে বলল, 'কচু!'

পরিচালকমশাই বললেন, 'ওতেও চলবে না। আরো জোরে বল।'

আরাপভ জোর করে গোঙ্গিয়ে উঠল, 'কচু।'

'না, না, একটু রাগ দেখাও!'

'কচু!'

'কি জ্বালা, মনে কর তুমি একটা বাঘ।'

আরাপভ চেঁচিয়ে উঠল, 'কচু! কচু!! কচু!!!'

হঠাৎ সে বুনিনের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল, সম্ভবতঃ ওকে কামড়াবার জন্মেই। সহকারী আর ক্যামেরাম্যান অতি কষ্টে তাকে টেনে তুলল।

পরিচালকমশাই কপালের ঘাম মুছে ফেললেন, 'নাঃ, ওকে দিয়ে হবে না, পরেরটিকে দেখা যাক।'

সহকারী বলল, 'বুনিন!'

বুনিন বলল, 'এ্যাঁ?

'দেখ বুনিন, বল তো কচু! কিন্তু গোড়া থেকেই ভেবে নাও যে তুমি একটি হিংস্র জানোয়ার।'

বুনিন চোয়াল বাগিয়ে রুষ্টস্বরে বলল, 'কচু।'

'আহা, বললাম ত ভেবে নাও তুমি একটা হিংস্র জন্তু, তুমি আবার কি ভাবলে?'

বুনিন টেনে টেনে বলল, 'হিংস্র জানোয়ার বলেছিলেন বটে, কিন্তু কোন হিংস্র জানোয়ার তা তো বলেন নি।'

পরিচালকমশাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন জানোয়ার হয়েছ ভেবেছিলে?'

বুনিন বিড়বিড় করে বলল, 'কুমির।'

পরিচালকমশাই জোর গলায় বললেন, 'বুনিন, তুমি যেতে পার। তারপর কে আছে?'

দিদিমণি দরজা খুলে দিলেন, ভিলকিন আর শ্বেতা গ্রিস্কো টুকটুক করে ঢুকল। পরিচালকমশাই জানলার কাছে গিয়ে উঠোন দেখতে লাগলেন। তারপর বললেন, 'আচ্ছা, একটি কথা বল তো—কচু!'

শ্বেতা একবার ভিলকিনের দিকে তাকাল, তারপর—ঘাড় নেড়ে আধো আধো স্বরে বলল, 'কচু!'

'এ কি, তুমি মেয়ে কেন?

শ্বেতা বলল, 'তা তো জানি না। আমি চিরকালই মেয়ে।'

পরিচালকমশাই দিদিমণির দিকে ফিরে বললেন, 'আমরা মেয়ে চাই না।'

শ্বেতার চোখ জলে ভরে গেল। 'কেন? আমার যে চিরকাল চিত্র-তারকা হবার ইচ্ছা!'

পরিচালক মশাই খেঁকিয়ে উঠলেন, 'কি আপদ, ফোঁৎ ফোঁৎ কর না। আমি ছিচঁকাঁদুনে দেখতে পারি না।' তারপর একটু নরম গলায় বললেন, 'বুঝলে না, বাছা, আমি আহাম্মুক ইভানুশ্‌কা সাজবার জন্য কাউকে খুঁজছি।'

'তাতে কি হয়েছে আমি তো ছেলে সাজতে পারি। মুখটুক এঁকে নেব।'

'না, আমরা ছেলেই চাই ? তা ছাড়া তুমি আধো আধো কথা বল। একটা ছেলে দেখা যাক।'

সহকারী বলল, 'ভিল্‌কিন!'

ভিলকিন পরিচালকমশাইয়ের মুখের দিকে বেয়াড়ার মতো তাকিয়ে বলল,

'আমাকেও কচু বলতে হবে নাকি ?'

'ধর তাই।'

ভিলকিন ঘৃণাভরে বলল, 'মুণ্ডু!' বলে ফোঁস করে উঠল।

'এঁ্যা!'

ভিলকিন আবার ঐ রকম করল।

পরিচালকমশাই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'পেয়েছি। পেয়েছি! ঠিক যা চাই'

সহকারী কলম তুলে বলল, 'নাম।'

'ভিলকিন সাশা।'

সহকারী বিরক্তভাবে বললে, 'ও আবার কি হল ?' 'সাশা ভিলকিন।'

পরিচালক মশাই ছেলেটার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালেন। 'বাঃ খাসা আহাম্মক।'

সাশা দুঃখিত হয়ে বলল, ' কে আহাম্মক ?'

পরিচালক মশাই কেশে বললেন, 'ইভানুশকা। বুঝলে না, সাশা, আহাম্মুক ইভানুশকার বিষয়ে নতুন একটা ফিল্ম করব, তুমি তাতে ইভানুশকা সাজবে। তার কপালটা যেমন মন্দ ছিল, ঠিক তেমনি ভালোও ছিল। কাল তোমাকে পড়াশুনো থেকে ছুটি দেওয়া হবে। সোজা এখানে আসবে ফিল্ম তুলতে।'

মনে মনে সাশা বলল, 'কেয়াবাৎ।'

হঠাৎ দরজা খুলে গেল, আরাপভ চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে ছুটে এল,— 'ও দিদিমণি একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে! কাস্ট্রিউলিন একটা জ্যান্ত গুবরে গিলে ফেলেছে!'

ঘরের সবাই একবাক্যে বলল, 'কি বললে ?' সঙ্গে সঙ্গে কাস্ট্রিউলিনকে ধরাধরি করে ঘরে আনা হল। গরম কড়াইয়ে মাছের মতো সে লাফাচ্ছে আর বেদম চেঁচাচ্ছে।

দিদিমণি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

তোমার কি হল ?'

কাস্ট্রিউলিন চেপে চেপে কথা বলতে লাগল। এক ঘণ্টায় এক চামচ মাপে।

'গুবরে—গিলেছি—জ্যান্ত—চলে বেড়াচ্চে পেটের ভিতর—ও দিদিমণি—আমি মরে যাব।'

দিদিমণি বললেন, 'না, না, কক্ষনো মরবে না, আমি কথা দিচ্ছি!'

পরিচালকমশাই সহকারীর দিকে হাত নেড়ে বললেন; 'এক্ষুণি ডাক্তার ডাকলে ভাল হয়।'

কাস্ট্রিউলিন ঐ হাত নাড়াটির জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিল। সে উঠে দাঁড়িয়ে পরিচালক মশাইকে জিজ্ঞাসা করল 'কেমন হল?'

পরিচালকমশাই কপালে ভুরু তুলে বললেন; 'কি কেমন হল?'

দিদিমণিও অবাক হয়ে বললেন, 'বোরিয়া, গুবরেটার কি হল?'

কাস্ট্রিউলিন হাসিমুখে বললে, 'গুবরেটুবরে ছিল না। আমি অভিনয় করছিলাম।'

পরিচালকমশাই ফিক্ করে হেসে ফেললেন।

'ভালো অভিনয় করেছ, বোরিয়া, কিন্তু বড় দেরিতে করেছ। আমরা যে ইভানুশকাকে পেয়ে গেছি।' কাস্ট্রিউলিন তখুনি কান খাড়া করল।

'তাই নাকি, পেয়ে গেছেন? ভিলকিন বুঝি? ভালো লোক ই পেয়েছেন! আমার দিকে একবার তাকান তো দেখি। আমি জাত আহাম্মুক।'

'আমাদের আর জ্বালাস্ নি ছোকরা। ও বিষয়ে আমরা তোর চেয়ে বেশি জানি।'

ছোটদের ফিল্মে সাশা ভিলকিনই অভিনয় করেছিল।

শেয়াল পণ্ডিত

চণ্ডী রায়

পড়ায় শৃগাল ভায়া পণ্ডিত সেজে,
কাঁকড়া হঠাৎ তার কামড়াল লেজে।
কামড়েই দিল দৌড় সোজা চট পট,
ব্যথায় শৃগাল দেখি করে ছট ফট।
দেখে শুনে পড়ুয়ারা চটে হল লাল,
বাঘ বলে ওকে ঠিক দেখে নেব কাল।
তিন বার দিয়ে লাফ বলে গোদা হাতি,
পেলে হয় কাছে পিঠে দেব পেটে লাথি।
দূর থেকে সব দেখে কাঁকড়াটা শেষে,
ঢুকে গেল ঘরে তার ফিক করে হেসে!

আমাদের দেশ

স্থবোধ কুমার চক্রবর্তী

সন্ধ্যে সাতটার গাড়িতে আমরা মাদুরা থেকে ত্রিবেন্দ্রাম যাত্রা করলাম। এটি প্যাসেঞ্জার গাড়ি, সারা রাত চলে—সকাল সাড়ে দশটায় ত্রিবেন্দ্রাম পৌঁছবে। মেল ট্রেণ গেছে সকালে, তাতে গেলে সন্ধ্যেবেলাতেই পৌঁছন যেত। রাত সাড়ে দশটার পরে আসবে এক্সপ্রেস, তাতে গেলে ঘণ্টা দুই আগেই পৌঁছান যাবে। কিন্তু প্যাসেঞ্জার গাড়িতে যায়গার সুবিধা হবে ভেবে আমরা তাতেই যাত্রা করলাম।

পুপু বলল, আমরা ত্রিবেন্দ্রাম যাচ্চি কেন ছোটকা, আমরা তো কন্যাকুমারী যাব!

ঘণ্টু বলল, কন্যাকুমারীতে কি ট্রেণ যায়?

আমি বললাম, কন্যাকুমারী যাবার দুটো পথ আছে। একটা ত্রিবেন্দ্রাম থেকে, আর একটা তেনেভেল্লি থেকে। তেনেভেল্লি মাদুরার কাছে, কিন্তু আমরা ত্রিবেন্দ্রাম শহরটাও দেখব বলে ঘুরে যাচ্ছি।

এই দুটো পথ নাগের কয়েল নামে একটা জায়গায় এসে মিলেছে। সেখান থেকে শুচীন্দ্রমের মন্দির দেখে কন্যাকুমারীতে যেতে হয়।

এক ভদ্রলোক আমাদের সামনে বসে গভীর মনোযোগে আমাদের কথা শুনছিলেন। আমি থামতেই ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনারা কি বাংলা দেশ থেকে আসছেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ।'

ভদ্রলোক বললেন,—বেড়াতে বেরিয়েছেন বুঝি!'

এ কথার উত্তরেও আমি 'হ্যাঁ' বললাম।

ঘণ্টু ও পুপুর দিকে চেয়ে ওদের পরিচয় জানতে চাইলেন। আমি সংক্ষেপে বললাম, 'আমার বড়দার ছেলেমেয়ে।'

ভদ্রলোক খুশি হয়ে বললেন 'বাপমাকে ছেড়ে দেশ দেখতে বেরিয়েছে, খুব ভাল কথা।'

ক্রমশ এই ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হল। তিনি কেরালার মানুষ, কর্মক্ষেত্র বাইরে, দিনকয়েকের জন্য দেশে যাচ্ছেন। তাঁর কাছেই প্রথম শুনলাম যে কন্যাকুমারী এখন আর কেরালা রাজ্যে নেই। কন্যাকুমারী ছোট একটা জেলা এখন মাদ্রাজরাজ্যের অধীনে আছে। কন্যাকুমারী আগে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, ত্রিবাঙ্কুর আর কোচিন দুটি করদ রাজ্য নিয়ে বর্তমান কেরালা গড়ে উঠেছে। কিন্তু তামিল ভাষাভাষী লোকেরা কন্যাকুমারীকে কেড়ে নিয়েছে।

আমি বললাম, 'আপনাদের ভাষা তো মালয়ালাম।

ভদ্রলোক বললেন, ঠিক বলেছেন! মালয়ালাম হল কেরালার ভাষা। এ ভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দ আছে। কিন্তু সংস্কৃত থেকে এ ভাষার জন্ম হয়নি। পণ্ডিতরা বলেন যে, পুরাকালে বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে একটি ভাষা ছিল, সেই দ্রাবিড় ভাষা থেকেই পরবর্তীকালে চারটি ভাষার জন্ম হয়েছে—তামিল, তেলেগু, কানাড়া ও মালয়ালাম।

আমি বললাম, তামিল ভাষা শুনেছি খুব প্রাচীন।

ভদ্রলোক বললেন, এদেশের প্রাচীনতম ভাষাকে নাকি তামস তামিল বলত। তার থেকেই তেলগু ও কানাড়া ভাষা আলাদা হয়ে যায়। চোল চের ও পাণ্ড্যরাজ্যে তখনও এক ভাষা ছিল তারপর মালয়ালামের জন্ম হয়েছে।

এ ভাষায় সংস্কৃত শব্দ কি করে এল সেকথাও তিনি বললেন। নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণেরা নাকি সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতেন, তাঁরা মালয়ালাম ভাষা ভাল জানতেন না। কবিরা সংস্কৃত ভাষা অনুসরণ করতেন, অথচ সাধারণ লোকে সংস্কৃত জানত না। শেষ পর্যন্ত এদেশে একটা মিশ্রভাষার সৃষ্টি হল।

ঘন্টু ও পুপুর যে এ আলোচনা ভাল লাগাছলনা তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। তারা তখন জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। দেখছিল দিগন্তবিস্তৃত অন্ধকার। ভদ্রলোকও একথা বুঝতে পারলেন। তাই মণ্টুর দিকে ফিরে বললেন, এদেশটা কার ছিল জান?

ঘন্টু বুঝতে পারেনি যে প্রশ্নটা ভদ্রলোক তাকে করেছেন। আমি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। মুখ ফিরিয়ে ঘন্টু বলল, 'জানিনে তো।'

ভদ্রলোক বললেন,—কেরালা হল পরশুরামের রাজ্য। পরশুরামের নাম শুনেছ তো?

ঘন্টু বলল, 'যিনি রামের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন?'

'ঠিক বলেছ।'

ঘন্টু পুপুর দিকে তাকাল গর্বিত ভাবে। পুপু বলল, 'আমিও জানি।'

'তাই নাকি!'

পুপু আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'জানিনে ছোটকা! রাম যখন হরধনু ভঙ্গ করে সীতাকে বিয়ে করলেন, তখনই তো পরশুরাম এসে পথ আটকেছিলেন।'

ভদ্রলোক সহাস্যে বললেন, 'সেই পরশুরাম এদেশে এসেছিলেন মাতৃহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করতে। মনে নেই বাপ জমদগ্নির কথায় পরশুরাম তাঁর মাকে কেটেছিলেন কুঠার দিয়ে, সেই কুঠার তাঁর হাতে আটকে গিয়েছিল। তোমরা কন্যাকুমারী যাচ্ছ, সেখানে মাতৃতীর্থে স্নান করে তাঁর পাপ দূর হয়েছিল।'

ঘন্টু ও পুপুর এ গল্প জানা নেই। তাই চুপ করে রইল।

ভদ্রলোক বললেন, পরশুরামের প্রায়শ্চিত্তে দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, তোমার হাতের কুঠার যতদূর নিক্ষেপ করতে পারবে, ততটা ভূমি তোমার নিজের হবে। একথা শুনে পরশুরাম কুঠার নিক্ষেপ করলেন। সেই কুঠার কেরালা থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত গেল। তাতেই এই মালাবার উপকূল হল

তাঁর সম্পত্তি। দেশের নাম হল কেরল।

ঘন্টু ও পুপু ইংরেজী স্কুলে পড়ে, তাই ইংরাজীতে কথাবার্তা বুঝতে তাদের কষ্ট হয় না, বলতেও পারে। পুপু বলল, 'এতো অনেক দিনের পুরানো কথা—ছোটকা রামেশ্বরে রাম এসেছিলেন, আর কেরালায় পরশুরাম।'

ঐতিহাসিক যুগে এ রাজ্যের নাম ছিল চের। সেই তিন ভাইএর গল্প, দক্ষিণ ভারতে তারা তিনটি রাজ্য স্থাপন করেছিলেন—চোল পাণ্ড্য ও চের। চের রাজ্যে কালিকট থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কখনও পাহাড় ডিঙিয়ে পূর্বদিকের মলেম কইম্বাতুর ও মহিশুর পর্যন্ত তাদের অধিকারে আসত, কখনও বা পাণ্ড্যরা এসে মালাবার উপকূল পর্যন্ত ছিনিয়ে নিত।

'একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,' বাঙলার সেই বীর সন্তান বিজয় সিংহের কথা আমার মনে পড়ল। সে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের কথা। বৌদ্ধগ্রন্থ মহাবংশে আছে যে বুদ্ধ যেদিন নির্বাণ লাভ করেন, বাঙলাদেশে বিজয়ের জন্ম হয়েছিল সেই দিন। যৌবনে ইনিই শত্রুদের তাড়িয়ে দক্ষিণ দেশে প্রবেশ করেছিলেন। নীল দেশের পর্বত ও উপত্যকার উপর দিয়ে মৃত্থগিরি মলয়গিরি ও পাণ্ডুগিরি অতিক্রম করে যান। মহাভারতে তার উল্লেখ আছে। সেই কালে মাহীস্মতি ছিল নীলের রাজধানী। কাজেই মহাভারতের যুগেও আমরা সভ্যতার বিস্তার দেখি দক্ষিণ ভারতে। গত চারহাজার বছর ধরে সভ্যতার ধারা এখানে অব্যাহত আছে।

ভারতবর্ষে প্রাচীন ইতিহাস তৈরি হয়েছে হিন্দু ও বৌদ্ধ শাস্ত্র গ্রন্থ, চীনাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও শিলালিপি থেকে। সবচেয়ে বেশি সাহায্য পাওয়া গেছে পেরিপ্লাস থেকে। এ একখানা অদ্ভুত গ্রন্থ। লোকে বলে এরিয়নের লেখা। লেখা হয়েছে আশি থেকে উননব্বই খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। সে যুগে গ্রীকরা ভারতে আসত মিশর আরব পারস্য ও বেলুচিস্থান হয়ে। ভারতের কোন্ কোন্ বন্দরে নোঙর ফেলত তারই এক অদ্ভুত বিবরণ। দাক্ষিণাত্যের বন্দর ও বাণিজ্যের বৃত্তান্ত পড়ে মনে হয় না যে সেখানকার সভ্যতা উত্তর ভারতের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল।

কেরালার ইতিহাসের শুরু বাণিজ্যের খ্যাতি দিয়ে। খ্রীষ্টের জন্মের একহাজার বছর আগে রাজা সলোমনের জাহাজ আসত এখানে। ওফির নামে একটি বন্দরে ফিনিসিয়ানরা তাদের জাহাজের নোঙর ফেলত। লোকে বলে যে ত্রিবেন্দ্রামের দক্ষিণে পুভার গ্রামেই সেই জায়গা। গ্রীস আর রোমের সঙ্গে যে এখানকার বাণিজ্যিক সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ ছিল তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। মেগাস্থিনিস প্লিনি ও মার্কোপোলো সে সব বৃত্তান্ত লিখে রেখে গেছেন। কুইলন আর কোচিনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল চীনাদের। ইতিহাসে তার প্রমাণ না থাক, এ অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। এ দেশের মাছ ধরার জাল ঠিক চীনের মতো।

তারপর একে একে এল দিনেমার পর্তুগীজ ও ওলন্দাজ, এল ফরাসী ও ইংরেজ। পর্তুগীজ ভাস্কো ডা গামা কালিকট বন্দরে এসেছিলেন পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে। আরবী ও মিশরী বণিকরা প্রবল আপত্তি তুলেছিল, কিন্তু পর্তুগীজেরা গ্রাহ্য করেনি। আট্টিংগলের রাণীর সঙ্গে চুক্তি করে কোচিনে তারা

বেশ জমিয়ে বসল। এর পরের ইতিহাস আমরা স্কুলের বই-এ পড়েছি।

আমাকে অন্যমনস্ক দেখে ভদ্রলোক ঘণ্টু ও পুপুর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছিলেন। তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'ত্রিবাঙ্কুর নাম কি করে হল বলতে পার?'

দুজনেই এক সঙ্গে উত্তর দিল, 'পারিনে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'অনেকদিন আগে এই দেশের নাম ছিল শ্রীভামুস-কোড়ু। তার মানে কি জান?'

'জানিনে।'

'তার মানে হল, ঐশ্বর্য যেখানে বাস করে সেই দেশ। দিনে দিনে সেই নাম পরিবর্তিত হয়ে হল থিরুভিথানকোড়ু। তারপর সাহেবরা এসে সাহেবী কায়দায় নাম করলেন ট্রাভাঙ্কোর, আর দেশী লোকেরা তাই শুনে বলল ত্রিবাঙ্কুর।

উল্লসিত ভাবে পুপু বলল, 'লিখে রাখ দাদা, তা না হলে ভুলে যাবে।'

গম্ভীর ভাবে ঘণ্টু বলল, 'অত সহজে ভুলে গেলে কি চলে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'ঠিক কথা। তারপরে শোন থিরুভিথান কোড়ুর রাজাদের কথা। তাঁদের রাজধানী ছিল পদ্মনাভপুরে। ত্রিবেন্দ্রাম থেকে কন্যাকুমারী যাবার পথে এই জায়গাটি এখনও আছে। আর আছে একটি পুরনো প্রাসাদ। লোকে এখনও তা দেখতে যায়। দেওয়ালের গায়ে এমন নানা রঙের চিত্র আছে যে চোখ জুড়িয়ে যায়। একটা ছোট জাদুঘরও আছে, তা পাথরের মূর্তি আর শিলা-লিপির একটা ভাণ্ডার। আগে এই রাজ্যে আটজন স্বাধীন সর্দার ছিল, দুআড়াই শো বছর আগে রাজা মার্তণ্ড বর্মা তাদের জয় করে এই স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন।'

আমাকে মনোযোগী দেখে ভদ্রলোক বললেন, 'ফেরার সময় এ পথে না ফিরে কোচিন হয়ে ফিরবেন। ত্রিবেন্দ্রাম থেকে মোটরের পথে ফিরতে আপনাদের খুব ভাল লাগবে। সমুদ্রের ধারে বরকলা নামে একটা জায়গা আছে, এমন সুন্দর স্থান এ অঞ্চলে কম।'

তারপরে আমাদের বরকলার গল্প শোনালেন।

দক্ষিণ ভারতে একশো আটটি বিষ্ণুর মন্দির আছে। তার মধ্যে বরকলার মন্দিরে বিষ্ণুর বালক মূর্তি। নির্জন সমুদ্রবেলায় এই জনার্দন মন্দির। তরঙ্গের পর তরঙ্গ এসে এই মন্দিরের পাদদেশে আছড়ে আছড়ে পড়ছে, সারাক্ষণ এই তরঙ্গ ভঙ্গের বন্দনা গান।

এই মন্দিরে একটা ঘণ্টা আছে, জাহাজের ঘণ্টা সেটি। কেমন করে একটা জাহাজ থেকে সেই ঘণ্টা মন্দিরে এল তার একটা গল্প আছে। একদা এক ওলন্দাজ জাহাজ এসে বরকলার তীরে লেগেছিল। বাতাস নেই। দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে, অথচ বাতাসের অভাবে জাহাজ আছে আটকে। একদিন জাহাজের কাপ্তান সাহেব চুপিচুপি এলেন মন্দিরের পূজারীর কাছে। বললেন, যদি সাহায্য কর, তাহলে আমার জাহাজের ঘণ্টা দিয়ে যাব তোমার মন্দিরের জন্যে।

পূজারী বললেন, কী সাহায্য?

কাপ্তান বললেন, বাতাস চাই, সেই বাতাসে আমরা সমুদ্রের উপরে ভাসব, এগিয়ে যাব সামনের দিকে।

পূজারী বললেন, তথাস্তু।

সায়াহ্নে সাড়ম্বরে দেবতার পূজা হল। আর অন্ধকার হতেই জাহাজ উঠল দুলে। বাতাস—বাতাস বইছে—প্রবল বাতাস। এ যে অসম্ভব ব্যাপার! দেবতার পায়ে অর্ঘ্য না দিয়ে কি পালিয়ে যাওয়া যায়। কাপ্তান ছুটে এসে জাহাজের ঘণ্টা দিয়ে গেলেন দেবতার জন্যে। তখন থেকে বরকলার মন্দিরে প্রহরে প্রহরে সেই ঘণ্টা বাজে।

ঘণ্টু আমাকে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যি নাকি ছোটকা?'

আমিও চুপিচুপি বললাম, 'মিথ্যে কি করে হবে! এখনও যে সেই জাহাজের ঘণ্টা প্রহরে প্রহরে বাজে।'

ভদ্রলোক আমাদের বাঙলা কথা বোঝেন নি, বোঝবার চেষ্টাও করলেন না। বললেন, 'টানেল দেখেছ, পাহাড়ের ভিতর দিয়ে সুড়ঙ্গ?'

ঘণ্টু আমার মুখের দিকে তাকাল, আর পুপু বলল, 'দেখিনি ছোটকা?'

আমি বললাম, 'মনে পড়ছে না ঠিক।'

ভদ্রলোক বললেন, 'বরকলায় দুটো টানেল আছে। তার মধ্যে একটা প্রায় আধ মাইল লম্বা। এই সুড়ঙ্গপথের ভিতর দিয়ে ট্রেন যায় না, মোটরও যায় না। যায় নৌকো।'

ঘণ্টু বলে উঠল, 'পথের উপর দিয়ে নৌকো যাবে কী করে?'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'সেইতো মজা। কুইলন থেকে ত্রিবেন্দ্রাম পর্যন্ত যে নালা বইছে, সেই নালা এই টানেলের ভেতর দিয়ে পাহাড় অতিক্রম করেছে। যখন কোন নৌকো সেই টানেলের মধ্যে ঢুকে পড়ে তখন ভারি মজা লাগে দেখতে।'

পুপু বলল, 'আমরা দেখবনা ছোটকা?'

ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ত্রিবেন্দ্রাম থেকে বরকলায় আপনি ট্রেনেও আসতে পারেন, তারপরে সেখান থেকে কুইলন। যাবার সময় এদুটো জায়গা রাতে পড়বে বলে দেখতে পাবেন না।'

আমি বললাম, 'এবারে তাহলে কুইলনের কথা বলুন।'

ভদ্রলোক গল্প বলতে খুবই ভালবাসেন। আর এছাড়া করবারও কিছু নেই। অন্ধকার গভীর হয়েছে, বাতি জ্বলছে গাড়ির ভিতর, বাইরের দৃশ্য আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আমার প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক খুশি হলেন, বললেন, 'ত্রিবাঙ্কুরের এক বিখ্যাত কবি কি বলেছেন জানেন?'

বললাম, 'জানিনে।'

'বলেছেন—

কুইলন যে দেখেছে

সে সেখানে থেকে যেতে চাইবে
নিজের ঘর দোর ছেড়ে।'

আমি হেসে বললাম, 'ভয়ের কথা। আমরা তাহলে আর সে জায়গা দেখব না।'

ভদ্রলোক বললেন, 'এক সময় এই কুইলনের সমৃদ্ধি ছিল বিশ্বজোড়া। তখন সেখানে জাহাজ আসত ফিনিস পারস্য আরব গ্রীস রোম আর চীন থেকে। চীনের তাঙ রাজাদের সময় বাণিজ্য জমজমাট ছিল। কুবলাইখানের আমলে তো দূত বিনিময় হত। আজও এ অঞ্চলে চীন দেশে তৈরি পিতল ও চীনেমাটির প্রাচীন বাসন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। কুইলন সে যুগে স্বাধীন ছিল। তারপর কখনও ত্রিবাঙ্কুর কখনও কোচিন রাজ্য এই শহরটি শাসন করেছে। শেষ পর্যন্ত ত্রিবাঙ্কুরের ভাগেই পড়েছিল।'

ঘণ্টু আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা কুইলন দেখব না ছোটকা?'

পুপুও আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি বললাম, 'তোমার খাতায় এখন টুকে রাখ, তারপর দেখা যাবে কপালে কী আছে!'

ভদ্রলোক বললেন,'বরকলা আর কুইলনতো আপনার পথেই পড়বে। তার জন্যে পয়সা লাগবে না। শুধু সময় লাগবে কিছু। সেই সময় যদি না থাকে তবে আর একটা কাজ করবেন।'

'কী কাজ?'

'কন্যাকুমারী থেকে ত্রিবেন্দ্রাম ফিরে রাতে এর্ণাকুলম এক্সপ্রেস ধরবেন। ভোরবেলায় পৌঁছবেন এর্ণাকুলম। এর্ণাকুলম আর কোচিন দেখে মাদ্রাজে ফিরবেন। কেরালায় আসা আপনার সার্থক হবে।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী দেখব সেখানে?'

ভদ্রলোক সোৎসাহে বললেন, 'সন্ধ্যাবেলায় একটা পরীর রাজ্য বলে মনে হবে। পুরনো কোচিন রাজ্যের রাজধানী এর্ণাকুলম, আর কোচিন সমুদ্রের উপরে বন্দর। দুই শহরের মাঝখানে একটা পুল। রাতে এই পুলের উপরে বাতি জ্বলে, বাতি জ্বলে দুদিকের শহরে।'

ভদ্রলোক থামলেন, বললেন, 'প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে কোচিন বড় ধনী। সুন্দর দ্বীপ, সুন্দর সমুদ্র, তাল নারিকেল বেষ্টিত হ্রদ আর বড় বড় জাহাজের আশ্রয় হারবার।'

মনে মনে আমি সেই সৌন্দর্য দেখে নিলাম। ভাবলাম, ফেরার পথে এ জায়গাটা দেখে নিলে মন্দ হতনা। ঘণ্টু বলল, 'কোচিন তাহলে আমাদের দেখতে হবে ছোটকা। নিশ্চয়ই মাইশোরের বৃন্দাবন গার্ডেনের মতো।'

পুপু বলল, 'তারচেয়েও বোধহয় ভাল।'

ভদ্রলোক তাঁর সাফল্য লক্ষ্য করে খুশি হলেন, বললেন, 'তার চেয়ে ঢের ভাল। এখানে তো কৃত্রিম কিছু নেই, সবই প্রাকৃতিক, তাই অত সুন্দর।'

ভদ্রলোকের কাছে আমরা আরও অনেক গল্প শুনলাম, আরও অনেক নতুন কথা। ত্রিবেন্দ্রামে

কী দেখতে হবে আর কন্যাকুমারী যেতে হবে কেমন করে, সে কথাও বললেন। অনেক রাত্রে টেন-কাশীতে নামবেন। টেনকাশী মানে দক্ষিণ কাশী। আমার একটা পুরনো কথা মনে পড়ল। ছেলেবেলায় দীপালীর উৎসবে আমরা যে লাল নীল আলোর দেশলাই জ্বালাতাম, তার গায়ে লেখা থাকত 'মেড ইন টেনকাশী'। এই টেনকাশী থেকেই কি বাজী পোড়ানোর জিনিস বাঙলা দেশে আসে!

সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে আর ভদ্রলোককে দেখতে পেলাম না।

ক্রমশঃ

সবার চেয়ে

শিমুল রায়

বল্‌তো মিঠা ফুলমাসীটা সবার চেয়ে কাকে
ভালোবাসে,—রোণ্টু কে না তোকে না আমাকে ?
আমরা কেউই নয়, তবে কে এমন আছে আর
চোখের আড়াল হ'লে যে তার জগৎ অন্ধকার ?
নিজের রুমাল দিয়ে দু'গাল সাবধানেতে ধ'রে
মুছিয়ে তাকে বসিয়ে রাখে অনেক আদর ক'রে।
চমকে ওঠে ধমকে ওঠে হাত দিলে তার গায়
সন্ধ্যে রাতে রোজ বেড়াতে সঙ্গে নিয়ে যায়।
জানিস না কে ? সদাই তাকে রাখছে চোখে চোখে,
এমন ক'রে ব'লছি যদি একটু মাথায় ঢোকে!
আয় তাহ'লে দিচ্ছি বলে শোনরে বোকা মেয়ে
পল্‌কা ডাঁটি চশমাটি তার আপন সবার চেয়ে।

আরোগ্য

নীহার বন্দ্যোপাধ্যায়

গোটা বাড়ির মধ্যে দোতলায় মেজদার এই ঘরটাই সব চাইতে ভাল লাগে টুটুনের। আলমারির মধ্যে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত ছবিওয়ালা বই। ইন্‌ভেলিড গাড়ির মধ্যে বসেই আলমারি খোলা যায়। নিচের তাকের বইগুলো হাত বাড়িয়ে নিয়ে ছবি দেখা যায়। মেজদার টেবিলের উপর রঙিন পেন্সিল থাকে, কাগজ থাকে—নিয়ে গাড়িতে বসে ছবি আঁকা যায়। তাছাড়া টেবিলের উপর কতরকম সব পাথরটাথর থাকে। কোন কিছুতে হাত দিলে মেজদা মোটেই বকে না। অবিশ্যি বাড়িতে কেউই ওকে সত্যিকারের বকাঝকা করে না। তাহলেও মেজদার কথা আলাদা। মেজদা ওকে সবার চাইতে বেশি ভালবাসে।

মেজদার এই ঘরটা টুটুনের ভাল লাগে সব চাইতে অন্য কারণে। এই ঘরটার জানলার সামনে এলে গলিটা দেখা যায়। নিচের রাস্তার লোকের সংগে কথা বলা যায়। সামনের নিমগাছটার ছায়ায় বসে মুচি, ছাতামেরামত, পুরনো বাসন ঝালাই এসব লোকেরা কাজ করে গলির ভিতরের সব বাড়ির—এদের সংগে গল্প করা যায়। মধুদা অবিশ্যি সর্দারী করে সবসময়। 'ওদের সংগে অত গল্প কর না টুটুন। ওরা সব চোর। জাননা, গল্প করে বাড়ির কোথায় কি আছে সব জেনে নেবে। তারপর রাত্তিরে এসে—'

হুঁ, মধুদা তো ভারি সবজান্তা। কক্ষনো না। লোকগুলোকে দেখলে চোর বলে মোটেই মনে হয় না। কেমন নিরীহ রোগা রোগা খিধে পাওয়া চেহারা লোকগুলোর। বুড়ো ছাতা সেলাইওলাটা—বা অতবড় মেশিনটা কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় ছুরিকাঁচি শান দেওয়ার সেই ছেলেটা—সবার উপর মধুদার তম্বি। কালকের সেই মুচিটার কথাই ধরনা। বেচারার সারাদিন কিছু খাওয়াই হয়নি। অথচ মধুদা খালি খালি পুলিশের দারোগার মত চোখ রাঙাল।

ভাবতে ভাবতে জানলার সামনে গাড়িটা নিয়ে এল টুটুন। বিকেলবেলার রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে থাকে। নিচে পাশের বাণ্টুদের বাড়ির দরজার সামনে দুতিনটে কুকুর মারামারি করছে আর চেঁচাচ্ছে। ওদের ক্ষিরোদা ঝি মাঝে মাঝে তাড়া দিচ্ছে দূর্ দূর দূর্ হ। দূরে রিক্সার ঠুন্ ঠুন্ শব্দ শোনা যায়। কোন বাড়িতে বাচ্চা ছেলের কান্না। বোধহয় শানুদের নতুন ছোট ভাইটা। টুটুন দেখে ওধারে সেনেদের বাড়ির খোকন আর খোকনের দাদা সুকুমারদা স্কুলের পোষাক পরা, বই হাতে বাড়ি এল স্কুল থেকে। খোকনটা আবার মুখে একটা লম্বা বেলুন ফোলাতে ফোলাতে আসছে। একটা ট্যাক্সির হর্ণ শোনা যায়। গলিতে ঢোকে না।

টুটুনের আফসোস হয়। শোবার ঘর থেকে দেওয়াল ঘড়ির মিষ্টি শব্দ ভেসে আসে ঢং ঢং বিকাল পাঁচটা।

নিচের দিকে তাকিয়ে নেড়ি কুকুরগুলোর মারামারি দেখতে দেখতে একেবারে মশগুল হয়ে গিয়েছিল টুটুন। নিজের মনেই হাসছিল। কাজেই কখন যে মেজদার বন্ধু পার্থদা আর মেজদা এসে ঘরে ঢুকেছে টেরই পায়নি।

মেজদা হাতের একটা সুন্দর প্যাকেটের কাগজ খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করে, 'কি রে টুটুন? নিচে কি দেখছিস আর আপন মনে হাসছিস?'

টুটুন মুখ ফিরিয়ে বলে, 'জান মেজদা তিন ঠেঙি পাণ্ডা কুকুরটা না ভোলাদের টেমিকে খ্যাঁক করে পায়ে কামড়ে দিয়ে এইস্যা তাড়া করেছে, ওর সঙ্গে কেউ পারে না মারামারিতে—'

মেজদার বন্ধু পার্থদা চেয়ারে বসে পড়ে বলে, 'উঃ রাস্তার নেড়িগুলোর জ্বালায় টেকা যায় না। কর্পোরেশনে একটা ফোন করে দিস অভি। ধরে নিয়ে যাবে'।

টুটুনের মেজদার নাম অভিজিৎ। সে কিছু বলার আগেই টুটুন কিন্তু গাড়ি চালিয়ে চলে এসেছে পার্থর কাছে। বলে, 'না না পার্থদা। কর্পোরেশনের লোকেরা ধরে নিয়ে গাড়িতে তুলে মেরে ফেলে ওদের। না। ওকথা বলবে না, কক্ষণও না।'

হাসতে থাকে পার্থ। 'আচ্ছা টুটুন ভাই। ঠিক আছে কর্পোরেশনে খবর দেবে না।'

অভিজিৎ হাতের প্যাকেটটা খুলে একটা খেলনা বের করে। 'জানিস টুটুন প্রথম মাইনে পেয়েছি আজকে। পেয়েই তোর একটা খেলনা কেনার জন্যে আগে ছুটি নিয়ে চলে এসেছি। দেখেছিস্ কেমন মজার, না? পার্থর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল রাস্তায়—দেখ, ওই পছন্দ করেছে।'

পার্থ বলে—কি টুটুন ভাই পছন্দ হয়েছে? নিউ মার্কেট থেকে কেনা।

টুটুন মাথা নাড়ে। হ্যাঁ তারপর নতুন খেলনাটার গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বলে, 'আচ্ছা মেজদা আমাকে একটা বল কিনে দেবে। ফুটবল। সত্যিকারের চামড়ার।'

অভিজিৎ: ফুটবল! ও আচ্ছা। তুই ভাল হয়ে নে। দেবো। একেবারে পাঁচ নম্বর সাইজের। বুট পায়ে দিয়ে খেলবি। বিল্টুর মত।'

টুটুন: না না ছোঁড়ার মত অত বড় নয়। একটু ছোট। আচ্ছা মেজদা আমি কবে ভাল হব?

অভিজিৎ: শিগ্‌গিরই তুই ভাল হয়ে যাবি টুটুন। দেখনা আবার ফুটবল খেলবি।

টুটুন: শিগ্‌গিরই? কিন্তু কই ভাল তো হচ্ছি না একটুও আগের থেকে! দাঁড়াতে তো একদম পারি না। ডাক্তারবাবু খালি খালি বলে, 'একটু একটু চেষ্টা করবে।' কিন্তু চেষ্টা করেও পারি না। গাড়িতে বসে বসে একদম ভাল লাগে না আর আমার। আমি আর ভাল হব না। আর হাঁটতে পারব না। জান আমার সব জুতোগুলো একেবারে ছোট হয়ে গেছে। আমার বুট জুতোও ছোট হয়ে যাচ্ছে।'

মেজদা ওর পিঠের উপর হাত বুলায়। পার্থ বলে: আচ্ছা আচ্ছা টুটুন ভাই তোমার সব চাইতে কি ভাল লাগে?

টুটুন : ফুটবল। ফুটবল খেলতে। মধুদা ছাদে নিয়ে যায় মাঝে মাঝে। ওই মাঠে ছেলেরা সব খেলে দেখি। জানো আমার চাইতেও ছোট ছেলেরা। এইখানে এই গলিতেও তো বস্তির ছেলেরাও খেলে মাঝে মাঝে দুপুর বেলা। আমাকে ডাকে। হি হি, জান ওদের ফুটবল তো নেই একটা ফাটা রবারের বল নিয়ে খেলে। আচ্ছা মেজদা, ওদের যদি একটা ফুটবল দেওয়া যায় একেবারে —যা অবাক হয়ে যাবে না! দেবে আমাকে কিনে—'

এমন সময় নিচে গলির রাস্তায় ডাক শোনা যায়। 'জুত্তি শ্লাই।' টুটুন ইন্‌ভেলিড গাড়ি হাতে চালিয়ে তাড়াতাড়ি জানালার দিকে চলে যায়।

অভিজিৎ জিজ্ঞেস করে, 'কি রে?'

টুটুন জানালার কাছ থেকে বলে, 'কালকের সেই মুচিটা। আমি গলার আওয়াজ শুনেই বুঝতে পেরেছি। এই মুচি—এই দিকে শোনো। শোনো।'

অভিজিৎ পার্থর উল্টো দিকে বিছানার উপর বসে।

জানালা দিয়ে নিচের রাস্তায় মুচির সংগে কথা বলে টুটুন। 'আজকে আবার এসেছ যে।'

মুচির গলার আওয়াজ পাওয়া যায়। বলে, 'হ্যাঁ। তোমার কি খবর খোকাবাবু ভাল আছ তুমি?'

টুটুন : হুঁ। আচ্ছা কি নাম যেন তোমার কাল বলেছিলে, রামদাস না? আজ কি খেয়েছ রামদাস?

রামদাস : হ্যাঁ খোকাবাবু, জুতো সেলাইয়ের কাজ নেই আজকে আর?

টুটুন : আজকে? আজকে তো আর—আচ্ছা দাঁড়াও।

টুটুন ফিরে আসে মেজদার কাছে। আচ্ছা মেজদা আমার বুট জুতো তো ছোট হয়ে গেছে পায়ে। বড় করে নেওয়া যায় না?

মেজদা হাসে! 'কেন জুতা সেলাইয়ের মুচি বুঝি? বুঝেছি। তোর জন্যে তো বাড়িতে ছেঁড়া জুতো, ভাংগা ছাতা, বাসনপত্রের কিছুই বাকি নেই আর মেরামতের। দুবার করেও মেরামত হচ্ছে। কিন্তু বুট জুতো তো বড় করা যায় না। নতুন কিনে দেব তুই ভাল হলে।'

পার্থর আবার নানা বাতিক। বিলেত থেকে ঘুরে এসেছে কিনা। কথায় কথায় খালি বিলেতের ব্যাপার ট্যাপার বলে। 'উহুঁ হুঁ টুটুন ভাই এটা কিন্তু ভাল নয়।'

টুটুন : কি?—ও বুঝেছি। মধুদা তোমাদের বলেছে বুঝি। কিন্তু আমি বলছি, কক্ষণ না। ওরা কক্ষণ চোর নয়। মধুদার খালি খালি ভণ্ডি।

পার্থ : না না সেসব নয়। মানে তুমি যে ওদের এই নাম ধরে ডাকছিলে। তুমি-তুমি বলছিলে এই এই সব। জান বিলেতে এখন সবাইকে সম্মান করে 'মিস্টার' বলতে হয়। চাকরদেরও।

টুটুন : চাকরদেরও!

পার্থ : হ্যাঁ। মানে যারা সব নিজের আত্মীয় নয় আর কি। জান, ওদের খুব সম্মান

জ্ঞান খুব বেশী কি না। সবাই সবাইকে সম্মান করতে হয়।

মুচি : নিচের থেকে ডাকে, 'খোকাবাবু ?'

টুটুন : মেজদার দিকে ফিরে। 'মেজদা, তাহলে ?'

অভিজিৎ : তাহলে কি ?

টুটুন : জুতো সেলাইয়ের কাজ চাইছে যে! জান এমন ভাল লোকটা। কত জায়গায় ঘুরেছে—

অভিজিৎ (হাসে) : ব্যস্ তা হলেই তো হয়ে গেল। তোমার অনেক গল্পের জোগানদার! আচ্ছা দাঁড়া। মধুকে ডাক। আমার সুটকেশের হ্যাণ্ডেলটা ছিঁড়ে গেছে। আরও কিছু কিছু ওর সেলাই করতে হবে। ওই যে খাটের নিচে আছে। জিনিসপত্র সব খালি করে দিতে হবে। মধুকে ডাক্।

টুটুন : খুব খুশি। গাড়িটা তাড়াতাড়ি চালিয়ে যেতে যেতে বলে 'দাঁড়াও আমি ডেকে নিয়ে আসছি। তুমি নিচে ওকে একটু বসতে বলে দাওনা মেজদা।'

টুটুন : বাড়ির ভিতরে চলে যায়। অভিজিৎ জানালার সামনে গিয়ে বলে 'এ্যাই মুচি তুমি বসো একটু। একটা সুটকেশ সেলাই করতে হবে।

পার্থ : এটা কি হলো অভি ?

অভিজিৎ : কি ?

পার্থ : এই যে তুই ওকে ডাকলি, 'এ্যাই মুচি' বলে। সে জন্যেই তো ছোটরা—

অভিজিৎ : হো হো করে হাসে। 'তুই বরাবরই পাগল। বিলেতে গিয়ে আরও পাগল হয়ে গেছিস। ওকে কি বলে ডাকব তাহলে—'

বাড়ির ভিতরে টুটুনের গলার আওয়াজ পাওয়া যায়। মধুকে ডাকছে। 'মিষ্টার মধু। মিষ্টার মধু!' অভিজিৎ শোনে। আরও মজা পেয়ে হাসে।

মধুকে সংগে নিয়ে টুটুন আসে খানিক পরে গাড়ি চালিয়ে। 'এই দেখ মিষ্টার মধুকে নিয়ে এসেছি।'

মধু : বারে! এসব আবার কি ? এ্যাঁ। এসব কি ?

টুটুন : কী ?

মধু : কী আবার! এই সব মিষ্টার ফিষ্টার এসব কি ? এসব চলবে না কিন্তু! এসব কি খালি খালি ই'য়ে—

সবাই হেসে ফেলে। অভিজিৎ তো হাসছেই। পার্থও হাসে। টুটুনও হাসে। মধু কিন্তু রেগে যায়। 'যত সব চালাকি—আমাকে নিয়ে।

টুটুন : বারে। জানো পার্থদা বলেছে বিলেতে সবাইকে মিষ্টার বলতে হয়।

মধু : হুঁ অমনি বললেই হল—ওসব মিষ্টার ফিষ্টার বলে গালাগাল দিলেই হল। এটা বিলেত নাকি ? এ্যা এটা কি বিলেত ? আমি কিন্তু বড়বাবুকে বলে দেব।

অভিজিৎ : আচ্ছা। ঠিক আছে। ওসব বলবে না আর তোমাকে।

মধু : হুঁ—নাও এবার কি করতে হবে বল।

অভিজিৎ : ওই নিচে মুচি বসে আছে একজন।

মধু : মুচি! ও। (টুটুনের দিকে তাকায়)

টুটুন বলে, ওই খাটের নিচে মেজদার সুটকেসটা আছে—একেবারে ছিঁড়ে গেছে কিনা। মেজদা বলছে সেলাই করতে হবে। জিনিসপত্তরগুলো বের করে নিচে দিয়ে আসতে হবে ওকে।

মধু : বুঝেছি। ছিঁড়ে গেছে না আরও কিছু। এ তোমার কাজ। ডেকে এনেছে। এখন একটা ছুতো করে বসে বসে গল্প জুড়বে। কিন্তু তোমাকে বলেছি না টুটুন। ব্যাটারা সব চোর। এইসব মুচিটুচি, ছাতা সেলাই, পুরনো বাসন মেরামত, খবরের কাগজ বিক্কিরি। সব ভাঁওতা দিয়ে আসে। ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে গল্প করে বাড়ির সব কিছু জেনে নেয়। তারপর রাত্তিরে এসে চুরি করে। বিচ্ছু! ডাকাত সব।

টুটুন : হ্যাঁ খুব জানো তুমি। তুমি তো সবজান্তা কিনা! একেবারে পুলিশের ডিটেকটিভ!

অভিজিৎ : ব্যোমকেশ!

মধু রেগে গিয়ে চেঁচাতে থাকে : কি! আমি বোমার কেস্! আসামী? ত্রিশ বছর এ বাড়িতে চাকরী করছি। আমি বোমা তৈরী করি—

পার্থ : আরে না না। মধুদা রাগছ কেন? বলছে, তুমি একেবারে গোয়েন্দা ব্যোমকেশের মতো সেই-যে বইতে আছে না? মানে, চোরদের সব খবর টবর তোমার নখদর্পণে কিনা।

মধু : নিশ্চয়ই তো। এতখানি বয়স হল। ওদের চিনি না আমি। সব চোর। জানো। আমাদের গাঁয়ে জমিদার বাড়িতে দু'ব্যাটা কামলা সেজে—সবকিছু তো জেনে গেছে দিনের বেলায় আঁটঘাট। তারপর ঘুটঘুটে রাত্তিরে ডাকাতদল মুখে ভুষো কালি মেখে—একেবারে সেকি হৈ হৈ রৈ রৈ!

টুটুন : ঈশ। ও গল্প তো কতবার শুনেছি। তখন তো তুমি নাকি জন্মাওনি।

মধু : নাইবা জন্মালাম। তাতে কি? কিন্তু ব্যাটারা যে এমনি সব চোর সে তো আর মিথ্যা নয়। জমিদার বাড়ির সে কাণ্ড আমার বলে স্বচক্ষে দেখা! হুঁ ডাকাত সব ছদ্মবেশী!

অভিজিৎ আর পার্থ মুচকি হাসে।

টুটুন রেগে গিয়ে বলে, 'খুব। খুব। জন্মায়ওনি তাও বলছে 'স্বচক্ষে দেখা।' কক্ষনো না লোকগুলো কক্ষনও চোর নয়। কেমন কষ্ট হয় দেখলে। রোগা রোগা লোক, ভালমানুষ। জানো মেজদা, পার্থদা কত কষ্ট করে থাকে ওরা। দেশে ওদের ছেলেমেয়ে আছে। কত কষ্ট করে টাকা পাঠায়। জানো শুধু মুড়ি আর জল খায় সারাদিন।

মধু সুটকেসটা খাটের নিচের থেকে টেনে বের করে জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে রাখতে বলে, 'হয়েছে হয়েছে। আর ব্যাখ্যান করতে হবে না তোমার বন্ধুদের গুণ। তুমি যখন ধরেছ তখন ও মুচিটাকে দিয়ে পারলে বাড়ির সব ক'টা লোকের গায়ের চামড়াও সেলাই করাবে।' জানালার কাছে

গিয়ে দেখে। তারপর বলে, 'কালকের সেই লোকটা না। দেখ, আজকে আবার এসেছে। নিশ্চয় কোন তালে আছে। এদিকে আবার সন্ধ্যাও হয়ে এল।'

অভিজিৎ : ঠিক আছে। ঠিক আছে মধুদা। ছেড়ে দাও। তুমি ওকে স্যুটকেসটা মেরামৎ করতে দিয়ে এস।

মধু গজ গজ করতে করতে স্যুটকেসটা হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যায়। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামার আওয়াজ পাওয়া যায়।

পার্থ হাসে। বলে, 'মধুদা খুব রেগে গেছে।'

অভিজিৎ : হ্যাঁ। টুটুন তুই কিন্তু নিচের দিকে নজর রাখবি। স্যুটকেসটা নিয়ে লোকটা যেন না পালায়।

টুটুন মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, 'না, কখনো পালাবে না।' তারপর গাড়িটাকে হাতে চালিয়ে জানালার কাছে নিয়ে যায়। নিচে মধুর সংগে মুচির কথাবার্তার আওয়াজ আসে। দরদস্তুর। টুটুন ডাকে মুচিকে, 'রামুদাদা!'

মুচি : কাকে ডাকছ? আমাকে?

টুটুন : হ্যাঁ। পার্থদা বলেছে সবাইকে সম্মান করে কথা বলতে হয়।

পার্থ অভিজিৎকে বলে. 'বাঃ টুটুন কেমন বুদ্ধিমান দেখেছিস অভি!

অভিজিৎ : দেখ পার্থ, আমার এই মা মরা ছোট্ট ভাইটার কথা মনে হলে আর কিছুই ভাল লাগে না।

ওরা নিচু গলায় কথা বলে। টুটুন জানালায় দাঁড়িয়ে কাজ দেখে মুচির।

পার্থ বলে, 'অভি, তুইতো বলেছিস ওকে ডাক্তার দেখানো হয়েছে। অনেক ওষুধ ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে। আমার মনে হয়—অসুখ ওর তেমন কিছুই হয়তো নেই। মানসিক একটা—

অভিজিৎ : মানে?

পার্থ : মানে,—দেখ ওদেশে তো আজকাল দেখছি কথায় কথায় মানসিক চিকিৎসা হচ্ছে টুটুনের ব্যাপারেও ধর—

অভিজিৎ : আস্তে। শুনতে পাবে।

পার্থ : ও। আচ্ছা আচ্ছা। দাঁড়া।

টুটুনকে ডাকে পার্থ। 'টুটুনভাই শোন।'

টুটুন : কি বলছ?

পার্থ : আমার জন্যে এককাপ চা দিতে বল না মধুদাকে। মানে, মাথাটা ধরেছে তো।

টুটুন : আচ্ছা।

গাড়ি চালিয়ে ভিতরে চলে যায় ও।

পার্থ উঠে দাঁড়িয়ে থাকে। 'আমি কি বলছি শোন্ অভি।' জানালার কাছে চলে যায়।

'দেখ আমার মনে হয় টুটুনকে ভাল করা যাবে একটু অন্যরকম চিকিৎসা করে।'

অভিজিৎ উঠে আসে কৌতূহলে ওর কাছে। সামনে দাঁড়িয়ে বলে, 'মানে?'

পার্থ: মানে, মনের উপর চিকিৎসা করতে হবে।

অভিজিৎ: কি জানি। পোলিও যে নয় সে সব ডাক্তারই বলেছেন। কিন্তু ছ'মাস আগে টাইফয়েড হওয়ার পর থেকে সেই যে কি হল। আর দাঁড়াতে পারে না। হাঁটতে পারে না।

পার্থ: হুঁ অসুখের পর তখন ছিল হয়ত দুর্বলতা—বা কোনো কোনো নার্ভের গোলমাল বা পেশীর সংকোচন। দুত্তোর ওসব ডাক্তারির গোলমেলে জিনিস বুঝিনা। কিন্তু একটা আইডিয়া আসছে আমার মাথায়। দারুণ আইডিয়া। মোদ্দা, ডাক্তাররা বলেছেন তো ওর শরীরে অসুখ নেই কিছু।

অভিজিৎ: না, মানে ধরতে পারছে না হয়ত।

পার্থ: ওই হল। আচ্ছা আচ্ছা। ওদেশে জানিস একটা সিনেমায় দেখেছিলাম—অনেকটা এরকম। সেরকম একটা আইডিয়া আসছে। শোন্। আমি কেমন থিয়েটারে অভিনয় করতাম মনে আছে তো। ম্যাজিক দেখাতাম। ধর কোন রকম সাজ নিয়ে এসে—

অভিজিৎ অবাক হয়ে বলে, 'কি বলছিস সব। কী সাজ নিয়ে এসে—?

পার্থ: এই ধর ছাতাওয়ালা বা শিশি বোতলওয়ালা বা (জানালার নিচে তাকিয়ে)

এই মুচি—মানে টুটুনের যাদের সংগে খুব ভাব আছে। আচ্ছা আচ্ছা। এই মুচির মেক আপ নিয়েই আসা যায়। টুটুন বুটজুতার কথা বলছিল না। একজোড়া জুতো এনে যদি বলা যায়—খুব নাটকীয়ভাবে আর কি—

অভিজিৎ: কী বলছিস?

পার্থ—হুঁ হুঁ—এখন বলব না। আচ্ছা আচ্ছা। কিন্তু তোকে দূরে থাকতে হবে।

অভিজিৎ: দূর। বরাবরই তোর সব অদ্ভুত অদ্ভুত চিন্তা। বিলেতে গিয়েও ছাড়েনি। আর সেই 'আচ্ছা! আচ্ছা!' উত্তেজিত হলেই—তর্ক লাগলে, খেলার মাঠে, পরীক্ষার আগে তোর সেই 'আচ্ছা আচ্ছা।' আচ্ছা মুদ্রাদোষ!

পার্থ হাসে। হা হা। বলে, আমি চলি এখন। আমার মেক-আপের বাক্সটা দেখি কোথায় আছে।

পার্থ চলে যায় তাড়াতাড়ি। অভিজিৎ দাঁড়িয়ে থাকে খানিকক্ষণ হাঁ করে। মধুকে নিয়ে টুটুন এসে ঘরে ঢোকে। মধুর হাতে আছে দু'জনার চা আর খাবার।

মধু: এই দেখ। আর একজনা গেল কোথায়? পার্থ দাদাবাবু?

অভিজিৎ বলে, 'সে চলে গেছে বাড়ি। ইয়ে মানে মাথা ধরেছে কিনা—আমার চা খাবারটা ভিতরে নিয়ে এস মধুদা।'

খানিকক্ষণ পরে অন্ধকার হয়ে আসছে। ঘরে আর কেউ নেই। টুটুনের খুব মজা। খুব গল্প করতে পারে রামুদাদার সঙ্গে। জানালার ধারে গরাদে হাত দিয়ে বলে, 'রামুদাদা। আমি মেজদাকে

বলব তোমাকে বেশি করে পয়সা দিতে। তুমি ভাল করে সেলাই কর।'

রামদাস: তুমি খুব ভাল খোকাবাবু। আমি সব শুনেছি। জানো, তোমার মত আমারও এক ছেলে ছিল হাঁটতে পারত না।

টুটুন: কি বলছ? আমার মত দাঁড়াতেও পারত না? এরকম সারাদিন গাড়িতে বসে বসে চলতে হত?

রামদাস: গাড়িটাড়ি আমি কোথায় পাব? গরীব মানুষ। বিছানায় শুয়ে থাকত। না হয় হেঁচড়ে হেঁচড়ে চলত। দুবছর,—তিনবছর—'

টুটুন: সে এখন ভাল হয়ে গেছে?

রামদাস চুপ করে থাকে। খানিকক্ষণ পরে বলে, 'তুমি খুব ভাল খোকাবাবু। তুমি ভাল হয়ে যাবে।'

টুটুন: না না আমি আর ভাল হব না। কিন্তু তোমার ছেলের কথা বলছ না কেন? ভাল হয়ে গেছে? কি মজা!

রামদাস: আমার ছেলে ভাল হলে তোমার মজা কেন খোকাবাবু?

টুটুন: মজা নয়? বারে, মজা নয়?

রামদাস মুচি কোন কথা বলে না। চুপ করে মাথা নিচু করে কাজ করে যায়। একটু পরে বলে, 'খোকাবাবু, সুটকেস সেলাই হয়ে গেছে। দিয়ে আসব উপরে?'

টুটুন: আচ্ছা। ডানদিকে সিঁড়ি! ঘুরে এস। আর তুমি আমার বুটজুতো ঠিক করে দিতে পারবে? ছোট হয়ে গেছে আমার পায়ে। আমি তো ভাল হব না। তবু আমার ভীষণ ভাল লাগে ভাবতে—বুটজুতো পরে ফুটবল খেলছি ভাবতে আমার ভীষণ ভাল লাগে। দাঁড়াও আমি জুতো নিয়ে আসছি। এস তুমি উপরে।

টুটুন গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে গেল। রামদাস মুচি সুটকেসটা হাতে নিয়ে ঘরে এসে ঢোকে। কাঁধে চামড়ার ব্যাগ। আর একহাতে লোহার নেহাই। মাথায় পাগড়ি গামছা দিয়ে বাঁধা। ঘরের এদিক ওদিক তাকায়। টুটুন এসে ঢোকে জুতো নিয়ে। রামদাস বলে, এই নাও সুটকেস। দেখ কেমন ভাল সেলাই করে দিয়েছি।

টুটুন: ওইখানে, ওই খাটের উপরে রেখে দাও।

মুচি সুটকেসটা খাটের উপরে রাখে। খোলা জিনিসগুলো চোখে পড়ে।

টুটুন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আচ্ছা রামুদাদা তোমাকে দেখতে এখন অন্যরকম লাগছে কেন?' রামদাস হাসে। বলে, 'কেন?'

টুটুন: না, কিরকম যেন অন্যরকম লাগছিল উপর থেকে।

রামদাস হাসে। 'মাথায় পাগড়িটা পরেছি কিনা। কই দেখি তোমার বুটজুতো।

টুটুন একজোড়া বুটজুতো মুচির হাতে তুলে দেয়। রামদাস বাঁ হাতের নেহাইটা মেঝেতে রেখে

দুহাতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জুতো জোড়া দেখে। তারপর বলে, 'আচ্ছা খোকাবাবু, তোমার আবার হাঁটতে ইচ্ছে করে খুব, না ? ছুটতে। খেলতে।

টুটুন : হ্যাঁ। খুব।

রামদাস : সেও বলত। জানো, সেও বলত, 'আবার ছুটব, খেলব। হাঁটব।' আমার ছেলে। কিন্তু সে তো নাই। সে মরে গেছে।

টুটুন : মরে গেছে ?

রামদাস : হ্যাঁ মরে গেছে। আজকেই চিঠি পেয়েছি। আমি এত কষ্ট করে টাকা পাঠাতাম ওরা ওকে খেতে দিত না। চিকিৎসা করাত না। আমার শ্বশুর বাড়ির লোকেরা। খোকাবাবু সে মরে গেছে। তারজন্যেই তোমাকে আবার দেখতে এসেছি আজকে। ছোট্ট খোকাবাবু তুমি বড় ভাল। জানো, আর ক'টা দিন যদি বাঁচিয়ে রাখতো ওরা ওকে। বা ওর মাটা যদি বেঁচে থাকত।

টুটুন : আহা।

মুচি : দেখতে সে তোমার মতই ছিল খোকাবাবু।

টুটুন : আমিও আর ভাল হব না। ঠিক মরে যাব।

মুচি : না তুমি মরবে না খোকাবাবু। তুমি ভাল হয়ে যাবে। আমি সে জিনিস পেয়ে গেছি।

টুটুন : কি জিনিস ?

মুচি : এই জুতো—জানো এই জুতো মন্ত্রপড়া জুতো। এ পরে একবার হাঁটলে তুমি ভাল হয়ে যাবে।

টুটুন চোখ মুছে বলে, 'কি বলছ ? দূর্!'

মুচি : চুপ্ চুপ্। ওরকম বলতে নেই। জানো বিশ্বাস করে শুধু একবার চেষ্টা করতে হবে। ভাবতে হবে আমার কোনো অসুখ নেই।

টুটুন : বাঃ তা কি করে হয়।

মুচি : হ্যাঁ হয়। শোন খোকাবাবু বিশ্বাস করতে হবে।

মুচি হাতের নেহাইটার দুটো পায়াতে জুতো দুটো পরিয়ে দেয়। নেহাইটা টুক্‌টুক্ করে হাঁটতে থাকে। জুতো দুটো হাতে নিয়ে বলে, 'দেখি দেখি তোমার পা।' তারপর টুটুনের পায়ে জুতো দুটো পরিয়ে দেয়। 'বাঃ এই তো সুন্দর লেগে গেছে। বলেছি তো আমার ছেলে ছিল তোমার বয়সী। দাঁড়াও, উঠে দাঁড়াও। একবার এ জুতো পরে হাঁটতে পারলে ভাল হয়ে যাবে তুমি। তখন আর এ জুতো না পরলেও চলবে। ওঠ।'

টুটুন অবাক হয়ে ভ্যাবাচাকা হয়ে গেছে। বলে, 'আমি—আমি।'

মুচি : ভয় পাবে না—ভয় পাচ্ছ কেন খোকাবাবু।

টুটুন তবু ভয় পেয়ে বলে, 'না, না আমি যে উঠতে পারছি না।'

মুচি : পারবে। পারবে। একবার উঠে দাঁড়াও। তুমি বড় ভাল খোকাবাবু গরীব লোকের

কত দুঃখ দূর কর। নাও চেষ্টা কর।

টুটুন: আমি যে জোর পাচ্ছি না পায়ে। আমার ভয় পাচ্ছে।

মুচি: চুপ। চুপ। ওকথা বল না খোকাবাবু। দেখলে না লোহার নেহাই হেঁটে গেল। তোমাকে পারতেই হবে। উঠে দাঁড়াও।

টুটুন: চেষ্টা করে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় গাড়ির ভিতরে।

মুচি: এই তো!

টুটুন কাঁপতে থাকে একা দাঁড়িয়ে।

টুটুন: আমি—আমি পড়ে যাব।

মুচি: না না পড়বে না। আচ্ছা আচ্ছা। দাঁড়াও।

মুচি টুটুনকে কোলে করে গাড়ি থেকে নামিয়ে মেঝেতে দাঁড় করিয়ে দেয়। 'এইবার হাঁটো। হ্যাঁ হাঁটো।'

টুটুন ভয় পেয়ে বলে, 'না না'—তারপর দুলতে থাকে।

মুচি: খোকাবাবু, মনে করে দেখ লোহার নেহাইটা—লোহার নেহাইটা কি করে হেঁটে গেল। তুমি পা ফেলতে থাক। দেখবে—দেখবে—

টুটুন কেঁদে ফেলে এবারে। বলে, 'না, আমি পারব না'—

মুচি রেগে যায়। চোখ পাকিয়ে বলে, 'তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না। তবে দেখো আমি কি করি।' হঠাৎ ব্যাগের মধ্যে থেকে ছুরি বের করে একটা। শোন আসলে আমি ডাকাত। হা! হা! খাটের উপরের জিনিসগুলো দেখায় ও, বলে, 'ওগুলো সব নিয়ে যাব—পালাও, পালাও পালাও নইলে তোমাকে খুন করে ফেলব। জিনিসগুলো ব্যাগে পুরে ফেলে টুটুনকে তেড়ে যায়। 'পালাও'—

টুটুন ভয় পেয়ে হাঁটতে থাকে। কয়েক পা গিয়ে দরজার সামনে এসে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে পড়ে। মুচি দুহাত দিয়ে টুটুনকে ধরে ফেলে। বলে, 'এইতো, এইতো হেঁটেছ। ব্যাস ভাল হয়ে গেছ খোকাবাবু!! তাড়াতাড়ি ব্যাগ থেকে বের করে ঘরের জিনিসগুলো আবার রেখে দেয়। নেহাইটা হাতে তুলে নেয়। টুটুনের পায়ের থেকে জুতো দুটো খুলে নেয়। বলে, 'আচ্ছা চলি খোকাবাবু। তুমি ভাল হয়ে গেছ। আর ভয় নেই—'

মুচি বেরিয়ে যায়, প্রায় ছুটে টুটুনকে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়।

টুটুনের এতক্ষণে বোধ হয় চেতনা হয়। ডাকে, 'মেজদা। সেজদা। মধুদা। বাবা।'

অভিজিৎ প্রথমে ছুটে আসে। টুটুনকে জড়িয়ে ধরে শুধোয়, 'কী রে টুটুন কী হয়েছে? এখানে নিজে নিজে হেঁটে এসেছিস? এ্যাঁ?'

টুটুন: হ্যাঁ। জানো মেজদা আমি—আমি হাঁটতে পেরেছি। ঐ রামুদাদা—মন্ত্রপড়া জুতো শোন আমি বলছি সব—রামুদাদা ডাকাত সেজে—' অভিজিৎ ওর মাথায় হাত বুলাতে থাকে। বলে, 'থাক। এখন থাক পরে বলবি।'

এতক্ষণে মধু এসেছে। আসছে আরও অনেকে। পায়ের শব্দ পাওয়া যায় ঘরের বাইরে।

অভিজিৎ: মধুদা টুটুনকে নিয়ে যাও তো। ওর ঘরে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দাও। বেশী উত্তেজনা ভাল নয়। পরে সব শুনব টুটুন। এখন যা বিছানায় শুয়ে থাক্।

মধু এসে টুটুনকে কোলে তুলে নেয়। অবাক হয়ে বলে, 'এসব কি ব্যাপার বাবা। এই বাবা! আমি কিন্তু কিছু বুঝতে পারছি না। হায় হায় বাড়িতে তাহলে ডাকাত পড়ল ঠিক ঠিক।'

মধু টুটুনকে নিয়ে ভিতরে চলে যায়। সেই সময়ে পার্থ এসে ঘরে ঢোকে। অভিজিৎ দরজার সামনের থেকেই পার্থকে হাতে ধরে প্রায় বুকে জড়িয়ে নিয়ে আসে। বলে, 'পার্থ! অদ্ভুত। অদ্ভুত করেছিস। কি বলে যে তোকে ধন্যবাদ দেব। আমাদের টুটুনকে বাঁচিয়ে দিয়েছিস তুই—হ্যাঁ বাঁচানোই বলতে হবে।

পার্থ অবাক হয়ে ওঠে, 'মানে'!

অভিজিৎ: মানে আবার কি? কী অপূর্ব কল্পনা তোর! আমি ভাবতেই পারছি না। কী অদ্ভুত অভিনয়! আমি পাশের ঘরে বসে শুনছিলাম আর জানালার ফাঁক দিয়ে দেখছিলাম। তুই ছোটবেলায় ম্যাজিক দেখাতিস। কিন্তু এত সুন্দর ম্যাজিক যে শিখেছিস—ভাবতেই পারি না। লোহার নেহাইটাকে কেমন অদ্ভুত—'

পার্থ বাধা দিয়ে বলে, 'দেখ অভি—থাম—'

অভিজিৎকে তবু থামান যায় না। বলে, 'থামব কি রে? সত্যি তোর তুলনা হয় না। শুধু একবার আচ্ছা আচ্ছা বলেছিলি। সে কিছু নয়। থাম দাদা সে তো—'

পার্থ: কিন্তু অভি শোন্। আমি তো কিছু করিনি। আমি বুঝতে পারছি না কিছু। দেখ আমার মেক্ আপের বাক্সটা খুঁজে পাচ্ছি না। সেজন্য তোকে বলতে এসেছিলাম ক্লাব থেকে যদি—

অভিজিৎ: মানে? সত্যি বলছিস?'

পার্থ: হ্যাঁ সত্যি বলছি। কিন্তু কি হয়েছে ব্যাপার বল্‌তো?

অভিজিৎ প্রচণ্ড বিস্ময়ে বলে, 'তা হলে! তা হলে! অবাক কাণ্ড। সে লোকটা—সে মুচি—রামুদাদা সে কোথায় গেল—' জানলা দিয়ে ছুটে গিয়ে ডাকে, 'রামুদাদা! রামুদাদা! নেই! অবাক কাণ্ড!—'

যে বুড়ো দাঁড়িয়ে থাকে আর কান পেতে শোনে

(এস্কিমোদের উপকথা)

মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

সন্ধ্যার আকাশে যত তারা দেখা যায়, তাদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল হ'ল সন্ধ্যাতারা। কিন্তু এস্কিমো ছেলেমেয়েরা এর কি নাম দিয়েছে জান ? তারা এর নাম দিয়েছে নালাউস সারটক, অর্থাৎ 'যে বুড়ো দাঁড়িয়ে থাকে আর কান পেতে শোনে' ! কেমন করে সন্ধ্যাতারার এমন নামকরণ হ'ল, তাই এখন বলছি। সে এক মজার কাহিনী !

অ-নে-ক অ-নে-ক দিন আগে, বরফের দেশে বাস করত এক বুড়ো। সে ছিল যেমনি বদ্‌মেজাজী তেমনি খিট্‌খিটে প্রকৃতির। বাস্তবিক সে এত খিটখিটে ছিল যে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের হাসিও সে সহ্য করতে পারত না। ওরা যদি কখনও তার বরফের ঘরের কাছে এসে খেলা করত, চেঁচামেচি করত, তাহলে সে ভয়ানক রেগে যেত। কুকুর মারা চাবুক হাতে করে তেড়ে আসত এবং ওদের সবাইকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিত। বলা বাহুল্য, তার এই স্বভাবের জন্য তাকে কেউ ভালবাসত না। এজন্য তাকে সব সময় অত্যন্ত নিঃসঙ্গ অবস্থায় দিন কাটাতে হত। আর এমন বদ্‌মেজাজী মানুষকে কোন মেয়েই বিয়ে করতে রাজি হয় নি। তাই সে যত বুড়ো হচ্ছিল, তার মন-মেজাজও ততই খারাপ হয়ে পড়ছিল।

একদিন সে তার বর্শাটা হাতে নিয়ে সীলমাছ শিকারের উদ্দেশ্যে বেরুল। চলতে চলতে বরফের মধ্যে একটা গর্ত দেখে সেখানে থমকে দাঁড়াল। তারপর কান পেতে শুনতে লাগল। তার মতলব, শ্বাস নেবার জন্য সীলমাছ যেমনি জলের উপরে মাথা তুলবে, অমনি সে তাকে বর্শা দিয়ে গেঁথে ফেলবে।

কাছেই কতগুলি ছেলেমেয়ে খেলা করছিল। পাশাপাশি দুটো বরফের পাহাড়, তার মাঝে সরু গলিপথ। ছেলেমেয়েরা সেখান দিয়ে ছুটোছুটি করছিল, চোর-চোর খেলছিল।

এদিকে শীলমাছটা শ্বাস নেবার জন্যে যতবার মাথা তোলে, ততবারই ছেলেমেয়েদের চীৎকারে ভয় পেয়ে আবার ডুব দেয়। এজন্য বুড়ো তাকে কিছুতেই বর্শা দিয়ে গাঁথতে পারছিল না। বারবার ব্যর্থ হয়ে বুড়ো খুব রেগে গেল। সে তখন বর্শা হাতে বাচ্ছাদের দিকে তেড়ে গেল। তাদের তখনই সেখান থেকে চলে যেতে বলল।

কিন্তু কে কার কথা শোনে? ওরা বুড়োকে বেশ ভাল করেই জানত। তার খিটখিটে মেজাজের জন্যে তাকে একটুও পছন্দ করত না। তাই তারা বুড়োকে মোটেই গ্রাহ্য করল না। আপন মনে খেলা করতে লাগল।

এতে বুড়ো আরও রেগে গেল। রাগে গরগর করতে করতে শয়তানকে ডেকে বলল,—'এই দুষ্ট্, বাচ্ছাগুলো চেঁচামেচি করে আমাকে শিকার করতে দিচ্ছে না। এখনই এই বরফের পাহাড় দুটো চেপে গলিপথটা বন্ধ করে দাও, যাতে বাচ্চাগুলো আর গণ্ডগোল করতে না পারে।

একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এক সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটল। চোখের নিমেষে ঐ বরফের পাহাড় দুটো গায়ে গায়ে জুড়ে গেল, আর ঐ অবোধ শিশুরা তারই মধ্যে আটকা পড়ে গেল। ওরা কেউ সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারল না! বাইরে থেকে যে কেউ ওদের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসবে, তারও কোন উপায় রইল না!

সৌভাগ্যবশতঃ ওপর দিকে ছোট্ট একটা ফাটল ছিল। সেখান দিয়ে ছোট্ট এক ফালি আকাশ দেখা যাচ্ছিল। অসহায় আবদ্ধ ছেলেমেয়েগুলো চীৎকার ক'রে কাঁদতে লাগল। সাহায্যের জন্যে তারা কত ডাকাডাকি করল। কিন্তু হায়, ওদের ডাক কেউ শুনতে পেল না! ছোট্ট অবোধ শিশুরা কি সাংঘাতিক বিপদেই না পড়ল।

বাচ্চা একটা মেয়ে :কেঁদে উঠল,—'এখন আমরা কি করব? আমাদের কাছে তো কোন খাবার নেই। আমরা তো না খেয়েই মরে যাব!'

ওদের মধ্যে একটা ছেলে খুব সাহসী ছিল। সে বলল,—'ঐ দেখ, মাথার উপরে একটা ফাটল দেখা যাচ্ছে। আমি একবার চেষ্টা করে দেখি, ওখান দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারি কিনা! যদি পারি, তাহলে সবাইকে ডাকব সাহায্যের জন্যে।'

এই ব'লে ঐ ছেলেটি একজনের কাঁধে চ'ড়ল। তারপর বরফের দেয়াল বেয়ে ওপরদিকে ওঠবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু দুঃখের বিষয় দেওয়ালের গা ছিল অত্যন্ত মসৃণ, আর ভয়ানক পিছল। দারুণ ঠাণ্ডায় ছেলেটির হাত পা জমে গেল। কয়েকবার চেষ্টা করে সে অত্যন্ত অবসন্ন হ'য়ে পড়ল, শেষে এক সময় সে নিচে পড়ে গেল।

আতঙ্কিত ছেলেমেয়েদের দল তখন এক জায়গায় জড় হয়ে আরও জোরে চীৎকার করে কাঁদতে লাগল। এই সময় কয়েকটি সমুদ্রের পাখি ওদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল, তারা ওদের কান্না

শুনতে পেল। তারা তখন নানা জায়গা থেকে খাবার সংগ্রহ করে এনে ঐ ফাটলের ভিতর দিয়ে ফেলে দিতে লাগল ছেলেমেয়েদের কাছে। এই সব খাবার খেয়ে ওরা তখনকার মতো একটু আশ্বস্ত হল।

সন্ধ্যা হয়ে এল, কিন্তু অন্যান্য দিনের মতো ছেলেমেয়েরা খেলা সাঙ্গ করে ঘরে ফিরল না। এতে ওদের মা-বাবারা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। বরফের ওপর দিয়ে তাঁরা ওদের কত খুঁজলেন! নাম ধরে কত ডাকলেন। কিন্তু কোনো সাড়া পেলেন না, বারবার শুধু প্রতিধ্বনি ফিরে এল দূরের পাহাড় থেকে। এরপর তাঁরা নৌকায় করে সমুদ্রেও কত খুঁজলেন! কিন্তু হায়, ওদের কোন সন্ধানই তাঁরা পেলেন না!

এদিকে ছেলেমেয়েরা তখন একমনে প্রার্থনা করছে। ওদের প্রার্থনা শুনে স্বর্গের দেবতারা স্থির থাকতে পারলেন না, সাহায্যের জন্য ছুটে এলেন। তারপর বরফের ভিতর দিয়ে এক লম্বা সুড়ঙ্গের সৃষ্টি করলেন। ছেলেমেয়েরা সেখান দিয়ে বেরিয়ে এল। ভয়ে ভাবনায় আর দারুণ ঠাণ্ডায় ওরা তখন মৃতপ্রায়!

ওদের ফিরে পেয়ে ওদের সকলের মা-বাবার মনে আনন্দ আর ধরে না!

তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন,—'বাছারা, তোমরা সবাই এক সঙ্গে ঐ বরফের মধ্যে আটকা পড়লে কি করে?'

কি করে যে কি ঘটেছে, তা ওরা ঠিক বলতে পারল না। তবে বদ্‌মেজাজী বুড়োটার কথা ওরা সবই বলল।

এমনিতেই বুড়োটাকে কেউ দেখতে পারত না। তার ওপর ছেলেমেয়েদের কথা শুনে সবাই তো রেগে আগুন। কি! এত দূর স্পর্দ্ধা! তারা সকলে তখন ছুরি, বর্শা ইত্যাদি হাতের কাছে যা পেল, তাই নিয়ে ঐ বুড়োর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। এদিকে ঐ বুড়োটা তাদের আসতে দেখেই সব বুঝতে পারল আর সঙ্গে সঙ্গে প্রাণপণে ছুটতে লাগল। বুড়ো প্রাণপণে ছুটছে, আর তার পেছনে তাড়া করে চলেছে একদল হিংস্র মানুষ, যেন এক পাল শিকারী কুকুর শিকারের পেছনে তাড়া করে চলেছে!

তাই দেখে সমুদ্রের দেবতা ছুটে এলেন এবং চীৎকার করে বললেন—'যেমনি দুষ্টু বুড়ো তেমনি তার শাস্তি! যা হতভাগা বুড়ো, এখন থেকে তুই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবি আর কান পেতে শুনবি, যা তোর চিরকালের অভ্যাস!'

যেমনি বলা, অমনি সে একটা তারা হয়ে ধীরে ধীরে আকাশে চলে গেল। আর সেখানে গিয়ে যেন এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল পৃথিবীর দিকে। সে যে দুষ্টু, তাই সে আকাশে বেশি দূর উঠতে পারলে না। আকাশের সামিয়ানার নিচে ঝুলে রইল উজ্জ্বল একটা বাতির মতো!

আজও সন্ধ্যাবেলা ওকে দেখা যায় পশ্চিম আকাশে। এস্কিমো ছেলেমেয়েরা বলে—'সেই বুড়োটা! যে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে আর কান পেতে শোনে!'

(আমার নাম পান্থ, বয়স বারো বছর। বাস থেকে পড়ে গিয়ে আমার শিরদাঁড়া জখম হয়ে গিয়েছে বলে হাঁটতে পারি না, একটা ছোট গাড়ি চড়ে বাড়ির মধ্যে ঘুরে বেড়াই আর তেতলার জানলা দিয়ে চারদিকে দেখি। ভজুদা বলেন—হাঁটতে চেষ্টা কর! এক্সারসাইজ কর্। আমার পোষা বেড়ালের নাম নেপো।

ভজুদা সকালে আমাকে তিন ঘণ্টা পড়ান, আমি বাড়িতে বসেই বার্ষিক পরীক্ষা পাশ করেছি।

বড় মাস্টার প্রতি রবিবারে আমাকে গল্প বলতে আসেন। গুপি আমার বন্ধু, সেও গল্প শোনে।

তিনি লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা করেছেন, সারা পৃথিবী ঘুরে সাংঘাতিক, রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। ঝড়ের মধ্যে জাহাজডুবি হয়েছিল, হাঙরে একটা পা কামড়ে টেনে নিয়েছিল, এখন কাঠের পা। অগ্নিকাণ্ডে বৌ-এর মুখ পুড়ে গিয়েছিল। এখন সব ছেড়ে ছুড়ে সামান্য টাকায় আমাদের বাড়ির পাশের ছাপাখানার প্রুফ দেখেন আর নাইট স্কুল চালান। তাঁর নতুন এসিস্টান্ট তলাপত্র আমাদের বাড়ি এসেছিলেন।

গুপি তার ছোট মামার কাছ থেকে নানা বই আনে, মঙ্গলের মানুষ, চন্দ্রনাথের চন্দ্রযাত্রা—এই সব। আমরা ঠিক করেছি বড় হয়ে চাঁদে যাব। গুপির ছোটমামা মহাকাশ-যান বানাবে। এখন থেকে লোহা পেরেক জমাচ্ছে।

ভজুদাদের কলেজের প্রিন্সিপ্যালের নতুন গাড়ি চুরি হয়ে গেছে মেজকাকুর গাড়িও। আজকাল হরদম গাড়ি চুরি হচ্ছে। কিন্তু এবার বিখ্যাত গোয়েন্দা বিন্থ তালুকদার তাঁর দলবল নিয়ে আসরে নেমেছেন। মোটর চোরদের ঘাঁটিশুদ্ধ নাকি তাঁরা বের করে দেবেন! কান্থ সামন্তর মুখে খালি সেই কথা।

কদিন থেকে নেপোকে পাওয়া যাচ্ছে না। গতমাসে এই পাড়া থেকে ছত্রিশটা বেড়াল নিখোঁজ।

বাড়ির পেছনের 'ঠাণ্ডাঘরটা' থেকে দারুণ খটখট ঝনঝন আওয়াজ আসছে। ঠিক যেন বরফ ফাটার শব্দ। ঘরটা এত ঠাণ্ডা যে ওখানে পেঙ্গুইন গজিয়েছে। ওখানে নাকি স্পেস্‌শিপ তৈরি করছে। গুপির ছোট মামা বাড়ি থেকে পালিয়ে ওখানে নাইটওয়াচম্যানের চাকরি নিয়ে লুকিয়ে আছে। ওদিকে তার ঘরে চোরাই গাড়ির নাম্বার প্লেট পাওয়া গেছে।

আজকাল ছোটমাস্টার আমাকে রোজ বিকালে মডেল বানাতে শেখান। গুপি একটা টেলিস্কোপ কিনেছে, তাই দিয়ে চাঁদ দেখছি। মনে হল যেন কি একটা চাঁদের দিকে গেল—বোঝাই নৌকার মত।

গুপির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। মন খারাপ। বড় মাস্টার বুড়োধরার কথা বললেন।)

সাত

আমি বললাম, 'বুড়ো-ধরা আবার কি?'

বড়মাস্টার বললেন, 'তা যদি না থাকত তো এতদিনে এই পৃথিবী বুড়োতে ছেয়ে যেত। তোদের আর দাঁড়াবার জায়গা থাকত না।'

আমি লজ্জা পেয়ে বললাম, 'আপনাকে ধরেছিল বুঝি?'

বড়মাস্টার রেগে গেলেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন, 'আমাকে আবার বুড়ো দেখলি কোথায়? বুড়োরা দিনের মধ্যে দশবার কেঠো পা নিয়ে পাঁচ তলা অবধি ওঠানামা করতে পারে?'

হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে বলে ফেললাম 'গুপির ছোটমামা বলেন আপনি ছাপাখানার লিফ্‌টে চড়ে চারতলায় ওঠেন, তারপর সেখান থেকে সিঁড়ি দিয়ে পাঁচতলায় ওঠেন। সেটুকু সব বুড়োরাই পারে।'

মাস্টারমশায়ের মুখটা প্রথমে লাল হয়ে তারপর বেগনি হয়ে গেল। আমি তো ভয়েই মরি, এক্ষুণি না ফেটে যান।

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে মাস্টারমশাই বললেন, 'গুপির ছোটমামা মানে সেই কুখ্যাত ফেরারি আসামী চাঁদু তো? সে আমাকে কোথায় দেখল?'

আমি তো মহামুস্কিলে পড়ে গেলাম। এর আগেই গুপি আমাকে বলেছিল যে ছোটমামার প্রাণ আমার হাতে। আমি আমতা আমতা করে বললাম, 'ওঁর ভালো নাম নৃপেন্দ্রনারায়ণ।'

'তা হতে পারে, কিন্তু সে আমাকে দেখল কোথায়?' এই বলে বড়মাস্টার আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইলেন। আমি বললাম, 'না, তা নয়, দেখেননি হয়তো। কিন্তু উনি বলছিলেন যে সরকারি ছাপাখানার লিফ্‌ট্‌ তো চারতলায় শেষ। তারপর বোধ হয় তোদের মাস্টারমশাইকে হাঁটতে হয়।'

'কাকে বলছিলেন? তোকে?' 'না, না, আমাকে তো ভালো করে চেনেন না, তাই গুপিকেই বলেছিলেন। গল্পটা বলবেন না?'

বড়মাস্টার ফোঁস করে নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'ওঃ, আমার জন্যে ভেবে ভেবে চাঁদুর বুঝি ঘুম হয় না? গুপিকে বলিস্ ওকে বলে দিতে—ও কি! অমন চমকে উঠলি কেন?' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বুঝেছি। বলবে কি করে? সে এতক্ষণে জলঢাকায় কি সোফিয়ায় কি নাথুলায় কি কোথায় তাই বা কে জানে!'

আমি বললাম, 'তা ছাড়া গুপির সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে গেছে, সে এখন আমাদের বাড়িতে আসবে না।'

সঙ্গে সঙ্গে গুপি ঘরে ঢুকে বলল, 'না স্যার, ওর কোনো কথা বিশ্বাস করবেন না, স্যার। ওর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বলে আসব নাই বা কেন, আপনার গল্প শুনব নাই বা কেন, খাব নাই বা কেন?'

এই বলে রামকানাইয়ের হাত থেকে ছোট ছোট মাংসের বড়া আর আলুমটর সিদ্ধর থালাটা নামিয়ে নিয়ে তিনটে প্লেটে ভাগ করতে লাগল। মাস্টার মশাই একবার ওর দিকে, একবার আমার দিকে তাকাতে তাকাতে, চামচ দিয়ে খেতে লাগলেন। তখন গুপি পকেট থেকে ছুটো মলাট-আলগা বই বের করে বলল, 'তা ছাড়া, ওর এসব পড়া দরকার। নইলে চাঁদে যাবার মতো যথেষ্ট জ্ঞান হবে কি করে?'

চোখ বুলিয়ে দেখলাম। একটার নাম, 'চাঁদ উপনিবেশ' অন্যটার নাম, 'চাঁদের আবহাওয়া'। ভেবেছিলাম ওর সঙ্গে কথা বলে কাজ নেই।' বই দেখে বললাম, 'কোথায় পেলি রে?' গুপি বলল, 'ছোট স্যারের কাছ থেকে নিয়েছিলাম।' মাস্টার মশাই বিরক্ত হয়ে বললেন তোমাদের মাথা খেতে আর বড় বেশি বাকি রাখে নি তলাপত্র। ওটা কিসের মডেল?' আমি খুব খুসি হলাম। বললাম, 'ওটা স্পেসশিপের পার্ট। ওর ভিতরে মানুষরা বসে থাকবে, মহাকাশযান পাক খেলেও মানুষগুলো স্থির হয়ে বসে থাকবে।'

বড় মাস্টার একটুক্ষণ সেদিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'পুনালুর গেছিস কখনো?' আমরা তো অবাক।

পুনালুর আবার কোথায়? কোনো গ্রহের উপগ্রহট্রহ নয় তো?

মাস্টার মহাশয় হেসে বললেন, ঐযা বলি, চাঁদ চাঁদ করে তোরা ক্ষেপে গেলি অথচ এই পৃথিবীটার কিছুই দখলি না। পুনালুর শুধু এই পৃথিবী নয়, আমাদের নিজেদের দেশে। মাদ্রাজ থেকে ত্রিবান্দ্রাম যেতে চলে প্রায় একটা গোটা দিন লেগে যায়। পথে খাওয়ার খুব ভালো ব্যবস্থা না থাকলেও, যেই না পশ্চিমঘাট ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে আমাদের ট্রেন পুনালুরে থামল, প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ছোট্ট একটা স্টেশন, তার পরেই সমুদ্রের গন্ধ পেলাম। তার পরেই কুইলন বলে একটা জায়গায় নেমে পড়লাম।

সঙ্গে সামান্য জিনিসপত্র। কিছু কাপড়-চোপড়, একটা শতরঞ্চি আর হাঁসের সাজ!' আমি বললাম, হাঁসের সাজ আবার কি মাস্টার মশাই?' বড় মাস্টার অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

'হাঁসের সাজ কি তাও জানিস না? এই বিদ্যে নিয়ে চাঁদে যেতে চাস? হাঁসের সাজ না পরলে সমুদ্রের তলায় সরজমিন তদন্ত করব কি করে শুনি? কেঠো পায়ের উপর আড়াইমণি ডুবুরির পোষাক চাপালেই হয়েছে আর কি?'

গুপি গলা খাঁকরে বলল, 'অবশ্যি জলের নিচে আড়াইমণ আর কিছু আড়াইমণ থাকে না! বয়েন্সি অর্থাৎ উবতা জলের একটা গুণ!'—বড় মাস্টার বিরক্ত হয়ে বললেন—'থাক্, আর বিদ্যে জাহির করতে হবে না। এ-ও নিশ্চয় তলাপত্রর কাছে শেখা?—বেশ, আড়াই মণ না হয় দেড় মণ-ই হয়ে যাবে, তবুও আমার শরীরের আড়াই মণ তার সঙ্গে জুড়তে হবে। কাঠের ঠ্যাং হয় তো ত্রিশ বছর সেই জাহাজের রান্নাঘরের টেবিল ঠেকিয়েছে। তারপর আমার কাছেই আছে ধর এই পঁয়ত্রিশ বছর। আর কত সইবে?'

গুপি বলল, 'আচ্ছা, এবার বলুন হাঁসের সাজের কথা।'

বড় মাস্টার বললেন, 'আর কিছু নয়, দুপায়ে প্লাস্টিকের তৈরি বড় বড় হাঁসের পা লাগিয়ে, মুখে মুখোস, চোখে বড় বড় গগ্‌লস্ এঁটে, পিঠে অক্সিজেনের থলি বেঁধে মুখোসের ভিতরে নাকে তার নল গুঁজে, হাতে হার্পুণ নিয়ে, তৈরি হয়ে নিতে কতক্ষণ লাগে!

অতিরিক্ত বেশি পয়সা কড়ির বালাই নেই, সঙ্গে রিটার্ণ টিকিট আর যৎসামান্য খাই-খরচা। তাছাড়া ছোট্ট

বিছানা আর কাপড়-চোপড়। বাদামগাছের মগডালে সেগুলো ঝুলিয়ে রেখে, কুইলনের সমুদ্রের ধারে গিয়ে জেলেদের একটা নৌকা ভাড়া করলাম। তীর থেকে সিকি মাইলটাক গিয়ে নৌকোতে বসে বসেই যেই না হাঁসের সাজ পরেছি, ভয়ের চোটে নৌকোর মাঝি মাঝ দরিয়ায় নৌকো থেকে নেমে যায় আর কি। অনেক করে তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নৌকো থেকে টুপ করে জলে নেমে পড়লাম! নেমেই টের গেলাম ব্যাটা ঊর্ধ্বশ্বাসে ডাঙার দিকে পাড়ি দিল। যাক্ গে, এসব সামান্য জিনিসে আমি ভয় খাই না। মিছিমিছি তো আর বর্মার শ্রেষ্ঠ সাঁতারুর সম্মান পাই নি। মানপত্র, সুবর্ণ পদক, টাকার থলি—যাক গে, নিজের বিষয়ে বেশি বলা আমি পছন্দ করি না।

আস্তে আস্তে ডুব দিলাম। একেবারে সমুদ্রের তলাকার বালির উপর নামলাম। বুঝতেই পারছিস্ সমুদ্র সেখানে বেশি গভীর নয়, বিশেষ করে এই গরমের সময়ে। গভীর না হলেও অদ্ভুত। কানে কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু সবুজ আলোতে সব দেখতে পাচ্ছিলাম। অদ্ভুত আকারের মাছ, সমুদ্রের কচ্ছপ, আর কত রকম পলা আর আগাছা।

তলাপত্র তোদের যে এত রকম জ্ঞান দেয়, আশা করি একথা বলতে ভোলে নি যে পৃথিবীর তিন ভাগ যখন জল আর মাত্র এক ভাগ মাটি, তখন মাটিতে যত না ফসল হয়, জলে হবে তার তিন গুণ। দেখলাম সে-সব ফসল; একেবারে গিজগিজ করছে, শুঁড় নাড়ছে, পাখনা নাড়ছে, দাঁত দেখাচ্ছে, চোখ পাকাচ্ছে। ডাঙায় তুলে রেঁধে খেলেই হল। হাজার বছরের খাদ্য মজুত আছে সমুদ্রের নিচে! চাঁদে জমি কেনার কথা জানিস্ তোরা, সমুদ্রের তলাকার জমি কিনতে পারলে আর কথা নেই।

এক জায়গায় দেখলাম একেবারে জ্যান্ত ঝিনুকে ছেয়ে আছে। প্রত্যেকটির মধ্যে একটি করে বড় মুক্তো না থাকে তো কি বলেছি!'

গুপি বলল, 'তুললেন না কেন দুচারটে?'

বড়মাস্টার ভুরু কুঁচকে বললেন, 'সামান্য মুক্তো তুলে সময় নষ্ট করব নাকি? আমার সামনে ছিল তার চেয়ে অনেক বড় উদ্দেশ্য। যার জন্যে এই অভিযান। তাছাড়া দুটো চারটে যে তুলি নি তাই বা কি করে জানিস্! দেখিস্ গিয়ে তোদের বৌঠানের কানে। চোখ টেরা হয়ে যাবে।

বড়মাস্টার পানের ডিবে খুলে রামকানাইয়ের দিকে তাকালেন। রামকানাই রেডি ছিল। পকেট থেকে ভিজে ন্যাকড়ায় জড়ানো গোটা ছয় বড় পান বের করে ডিবে ভরে দিল। আজকাল দেখছি পারলে রামকানাই বড়মাস্টারের গল্প শুনতে ছাড়ে না। পরে অবিশ্যি নানা রকম মন্তব্য করে। ভারি ইয়ে হয়েছে ওর। যাই হক মুখে দুটো পান পুরে, দাঁতে চুণের টিপ মুছে, মাস্টার মশাই বলতে লাগলেন,

একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপরে না উঠলে অক্সিজেনের থলি খালি হবার ভয় থাকে। তাতে অবিশ্যি ডাঙায় ফেরার অসুবিধে হয় না। উপরে উঠে সাঁতরে ফিরলেই হল। কিন্তু তদন্ত করতে হলে, তাড়াতাড়ি কাজ করলে হয়?

আর একাজ সারতে হয় খুব গোপনে। কেউ টের পেলেই হয়ে গেল। হাঁসের সাজ পরে দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়বে! পাকা খবর না নিয়ে যাই নি। খুব গুহ্য খবর। ঐখানে একটা পুরনো পর্তুগিজ জলদস্যুদের সমুদ্রের জাহাজ বমাল সমেত ডুবে পড়ে আছে। তিনশো বছরের বেশি হয়ে গেছে।

বর্মায় থাকতেই একজন নাবিক আমার বাবার কাছে একটা চিঠি আর এক সমুদ্রের তলার ছেঁড়া ম্যাপ এক টাকা দিয়ে বিক্রি করেছিল।—

গুপি অবাক হয়ে গিয়ে বলল, 'মোটে এক টাকা দিয়ে?' বড়মাস্টার বললেন, 'কেন, এক টাকা কি কম নাকি? আমার ঠাকুরদার বাবা এক টাকা দিয়ে একশো মণ ধান কিনতেন। গল্প শুনবি, না কি?'

গুপি বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তারপর?'

তারপর হঠাৎ পায়ে কি একটা ফুটল। তুলে দেখি একটা মোহর, খাড়া হয়ে বালিতে বিঁধে আছে। চেয়ে দেখি চারদিকে বালিতে ছড়ানো হাজার হাজার মোহর। সামনে একটা পুরনো লোহার সিন্দুক ভেঙে পড়ে আছে। জং ধরে সবুজ হয়ে গেছে। তার গায়ে কত খুদে খুদে সামুদ্রিক প্রাণী বাসা বেঁধেছে।

চোখ তুলে দেখি আরেকটু দূরে মস্ত একটি মরা তিমি মাছের মতো একটা পুরনো জাহাজ উপুড় হয়ে পড়ে আছে। খোলটা উপর দিকে, তাতে অসংখ্য ছোট বড় ছ্যাঁদা। তার ভিতর দিয়ে শত শত ছোট বড় লাল, কালো, হলদে, সবুজ মাছ আসছে, যাচ্ছে। চেয়ে চেয়ে আর কুল পাইনা। তবে বেশিক্ষণ চাইতে হল না। চারদিক থেকে নিঃশব্দে পনেরো কুড়িটা ছায়া নেমে এল। দেখলাম পনেরো কুড়িটা সাহেব। সকলের হাঁসের সাজ, সঙ্গে শুধু হাপুর্ণ নয়, বন্দুকও। প্ল্যাস্টিকের থলিতে ভরা, যাতে ভিজে না যায়।

তারপর আর কি, দেখতে দেখতে আমাকে ধরে ফেলে তারা ভাঙা নৌকোর কানা তুলে তার ভিতর পুরে দিল। বলি নি এই ঘটনার বিষয়বস্তু হল বুড়ো ধরা? তারপর যত পারল সোনা দানা চেঁছেপুঁছে নিয়ে চলে গেল।

আমি প্রথমটা জাহাজের খোলের ভিতরকার গাঢ় অন্ধকার দেখে হকচকিয়ে গেলাম। তারপর আস্তে আস্তে যখন চোখ সয়ে গেল, তখন চেয়ে দেখলাম কত কঙ্কাল চার দিকে ছড়িয়ে আছে। তাছাড়া কত যে গয়নাগাঁটি ছড়ানো, সে আর কি বলব।'

গুপি বলল, আনলেন না স্যার, তা হলে এখন কত সুবিধে হত।'

বড়মাস্টার বললেন, 'তখন আমি বেরুবার পথ খুঁজতে ব্যস্ত, গয়না তোলার কথা মনেও হয় নি। তাছাড়া কঙ্কালগুলো জলের মধ্যে কেমন নড়ছিল চড়ছিল। শেষ পর্যন্ত হাপুর্ণটা দিয়ে একটা ছ্যাঁদাকে আরেকটু বড় করে নিয়ে, বেরিয়ে পড়লাম। ততক্ষণে অক্সিজেন প্রায় শেষ, কোনোমতে জলের উপরে উঠলাম। ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে এসেছে। সারা দিন পেটে কিছু পড়ে নি। কোন রকমে সাঁতরে ডাঙায় উঠলাম। তারপর বাদাম গাছের নিচে গিয়ে দেখি 'সর্বনাশ, বাঁদররা সব জিনিসপত্র তচনচ করে, চারদিকে ছড়িয়েছে!' অন্য জিনিস প্রায় সব-ই পেলাম। শুধু সেই চিঠিটা আর ম্যাপটা ছাড়া। মাঝে মাঝে কাগজে যখনি দেখি ডুবো জাহাজের সন্ধান পাওয়া গেছে ভারতের উপকূলের কাছে, ভাবি এই আমার সেই জাহাজ।'

গুপি বলল, 'তবে জাহাজটা তো আর সত্যি করে আপনার নয়। অন্যরাই বা নেবে না কেন?'

বড় মাস্টার বললেন, 'আমার নয় মানে? দস্তুরমতো এক টাকা দিয়ে ওর কাগজপত্র কেনা হয় নি বলতে চাস?'

তারপর বললেন, 'বোধ হয় ঐ নৌকোর মাঝি সাহেবদের গুপ্তচর ছিল। আমাকে নামিয়েই শহরে গিয়ে খবর দিয়ে এসেছিল। এই রকম করেই সাহেবদের অত টাকা হয়েছিল। নইলে—!'

আমাদের গলিতে সে কি দুপদাপ ক্যাঁও ম্যাও, জানলা দিয়ে দেখি স্রোতের মতো বেড়ালের পাল ছুটে বেরিয়ে আসছে। বড়মাস্টার লাফিয়ে উঠে খটখট করতে করতে দৌড় দিলেন।

ক্রমশঃ

যুক্তির যাদু

মণীন্দ্রনাথ দাস

সকলের জানা আছে যে যুক্তির দ্বারা কাজ করার ক্ষমতা থাকার জন্যই মানুষ আজ জীবজগতের রাজা হয়েছে। সব প্রাণীর চেয়ে মানবজাতির যুক্তি শক্তি বেশী। এই যুক্তি বিদ্যার অপর নাম ন্যায়-শাস্ত্র। এখানে যুক্তিবিজ্ঞান সম্পর্কিত কয়েকটি সুন্দর চিত্তাকর্ষক কাহিনী সঙ্কলন করা গেল।

(১)

প্রাচীনকালে গ্রীসদেশে প্রোটাগোরাস (খৃষ্টপূর্ব ৪৮০-৪১১) বলে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন, তিনি ছাত্রদের বাক্য বিজ্ঞান ও শব্দতত্ত্ব শিক্ষা দিতেন। একদিন তাঁর কাছে এক দরিদ্র শিক্ষার্থী এসে অনুরোধ করলে যে তাকে ওকালতি শেখাতে হবে, এ দিকে কিন্তু তার গুরুদক্ষিণা দেবার সামর্থটুকু পর্যন্ত ছিল না। যাহোক প্রোটাগোরাস তাকে এই সর্তে ছাত্ররূপে গ্রহণ করতে সম্মত হলেন যে, সে অধ্যয়নকাল সমাপ্ত হবার পরই যেদিন প্রথম কাছারীতে মোকদ্দমায় জয়লাভ করবে, তখন যেন শিক্ষককে সমস্ত পারিশ্রমিক এককালে প্রদান করে। কিন্তু উভয় পক্ষেরই দুর্ভাগ্যবশতঃ নতুন আইন ব্যবসায়ীর ভাগ্যে পশার জমানো আজকাল যেমন শক্ত, সে যুগেও সেই রকমই কঠিন ছিল। মাসের পর মাস কেটে গেল, কিন্তু তবুও কোনো লোকই ঐ নবীন উকিলকে নিজপক্ষে নিযুক্ত করলে না। অতঃপর প্রোটাগোরাস ঐ তরুণ উকিলকে একদিন ডেকে পাঠিয়ে নিজের প্রাপ্য অর্থের জন্য মোকদ্দমা করবেন, এ কথা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন। কারণ প্রোটাগোরাস বললেন, 'যদি আমি এ ক্ষেত্রে জয়লাভ করি, তা'হলে এর মানে হবে যে আদালত থেকে আদেশ আসবে আমার টাকা আমাকে দিয়ে দেবার জন্য। আর যদি তুমি এই মামলায় জেত তা'হলেও আমাদের পূর্ব সর্ত অনুযায়ী তোমার প্রথম মোকদ্দমায় জয়লাভ হওয়ার দরুণ আমাকে আমার পারিশ্রমিক দিতেই হবে। জিতি কিম্বা হারি আমি আমার প্রাপ্য টাকা ঠিকই পাব।'

কিন্তু বৃদ্ধ প্রোটাগোরাস তাঁর শিষ্যকে তর্কবিদ্যা একটু বেশী ভাল করেই শিখিয়েছিলেন। ছাত্রটি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, 'গুরুদেব আপনি যা বললেন তা' ঠিক নয়। যদি আমি এই মোকদ্দমায় বিজয়ী হই, তা'হলে বিচারালয়ের কর্তৃপক্ষ আমাকে কিছুই দিতে বলবেন না। আর যদি এ অবস্থায় আপনার জয় হয়, তা'হলেও আমার প্রথম মোকদ্দমায় জেতা হল না, সুতরাং আমাদের সর্ত অনুসারে আমাকে পূর্ব প্রতিজ্ঞা পালন করতে হবে না।' এই জটিল সমস্যার কোনো সমাধান আজও বার হয় নি।

(২)

যদি কোনো লোক বলে, 'আমি মিথ্যা বলছি'—তার এই উক্তি কি সত্য বলে পরিগণিত হবে? যদি তাই হয়, সে তাহলে মিথ্যা বলছে সুতরাং তার কথা মিথ্যা বলে ধরতে হবে। আর তার উক্তি

যদি মিথ্যা হয়? তবে সে তো মিথ্যা বলছে না। অতএব তাঁর বিবৃতি সত্য। এই ধাঁধার কোনো উত্তর নেই।

(৩)

মনে করা যাক আমাদের কাছে একখানি এক ইঞ্চির সহস্র ভাগের এক ভাগ পুরু অথচ বেশ বড় কিন্তু খুব পাতলা কাগজ রয়েছে। আমরা ঐ কাগজখানি ঠিক আধখানা করে দুই টুকরা একসঙ্গে একটির ওপর একটি রাখলুম। তারপর আবার ঐ জোড়া কাগজ আধখানা করে চারখণ্ড কাগজ একত্রে পর পর সাজালুম। পুনরায় ঐ দুজোড়া কাগজ আধখানা করে আট টুকরা কাগজ স্তূপীকৃত করলুম। যদি আমরা এইভাবে পঞ্চাশ বার ঐ কাগজখানি ছিঁড়ে পঞ্চাশ বার একসঙ্গে রাখি, তাহলে ঐ কাগজের স্তূপ কত উঁচু হবে?

কেউ বলবেন এক গজ, অন্যরা মন্তব্য করবেন কয়েক গজ, খুব সাহসী ব্যক্তি হয়ত আন্দাজ করবেন এক মাইল। কিন্তু সকলেই বোধ হয় প্রকৃত উত্তর বিশ্বাস করতে সম্মত হবেন না—যা হচ্ছে এক কোটি সত্তর লক্ষ মাইলেরও বেশী।

এই অঙ্কের সমস্যাটি এইভাবে সমাধান করা যাবে। কাগজখানি প্রথমবার বিচ্ছিন্ন করলেই দুই ভাগ হবে, দ্বিতীয়বার ছিঁড়লে চার বা ২^{২} খণ্ড হবে, পঞ্চাশবার এইরূপে ছিন্ন হলে কাগজটি ২^{৫০} হবে এখন ২^{৫০} = ১১২৬০০০০০০০০০০০০। এক ইঞ্চিতে ১০০০ খানি কাগজ আছে অতএব পঞ্চাশবার ছিঁড়ে স্তূপ করলে তার উচ্চতা হবে ১১২৬০০০০০০০০০ ইঞ্চি। এই বিপুল সংখ্যাকে মাইলের হিসাবে আনতে হলে তাকে ১২ × ৫২৮০ দিয়ে ভাগ করতে হবে, তাহলে উত্তর আসবে ১৭০০০০০০।

(৪)

আমরা এবার প্রমাণ করব পঞ্চাশ নয়া পয়সা বা আট আনা পাঁচ নয়া পয়সার সমান।

¼ টাকা = ২৫ নয়া পয়সা

দুই দিকের বর্গমূল করলে:

অর্থাৎ √¼ টাকা = √২৫ নয়া পয়সা।

½ টাকা = ৫ নয়া পয়সা

৫০ নয়া পয়সা = ৫ নয়া পয়সা

(৫)

সবশেষে, প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রের সমস্যা ঢিপ করে তাল পড়ে, না তাল পড়ে ঢিপ করে—কিম্বা পাত্রাধার তৈল না তৈলাধার পাত্র—তার মীমাংসা আজও কেউ করতে পারেন নি।

কৃষকের পূজা

নির্মল চক্রবর্তী

তিনজন ব্রাহ্মণ ৺শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের দর্শনেচ্ছায় পুরী চলেছেন। তাঁদের পরণে গেরুয়া আল-খাল্লা, কাঁধে একটি করে বড় ঝোলা আর প্রত্যেকের হাতে একখানি করে বাঁশের বাঁকা লাঠি। ঝোলার মধ্যে রয়েছে রান্নার সরঞ্জাম এবং তার সঙ্গে পূজার বাসন কোসন, গীতা, আতপচাল, গঙ্গামাটি ইত্যাদি।

এখনকার মত তখনকার দিনে ট্রেন, মোটরের আবির্ভাব হয় নি। তীর্থযাত্রা করতে হলে পায়ে হেঁটেই করতে হত। এই ব্রাহ্মণ তিনজনও তাই করেছেন। ঠাকুর দর্শনের আশায় মনের আনন্দে তাঁরা একটার পর একটা গ্রামকে পিছনে ফেলে পুরীর দিকে এগিয়ে চলেছেন। এমনি করে কিছুদূর যাওয়ার পর তাঁরা শ্রান্ত হয়ে একটা গাছতলায় বিশ্রাম নিতে বসে পড়লেন। তীর্থযাত্রীরা দেবতার গুণগান ছাড়া অন্য কথা মুখে আনেন না। কারণ তাঁরা তো আর ইহকালের জন্য এপথ ধরেন নি—পরকালের মুক্তির জন্যই এই দেব দর্শন বা তীর্থযাত্রা। তাই বসতে না বসতেই তিনজনের মুখনিঃসৃত ঠাকুরের গুণগানে বৃক্ষতল মুখরিত হয়ে উঠল।

পাশেই একজন কৃষক জমিতে লাঙ্গল দিচ্ছিল। ব্রাহ্মণদের কথা শুনে সে আর স্থির থাকতে পারল না। এঁরা যে তীর্থযাত্রী এবং পুরীই যাবেন সে বিষয়ে তার কোন সন্দেহ রইল না। এত দিনে মনের আশা পূর্ণ হল ভেবে কৃষক মনের আনন্দে হাঁপাতে হাঁপাতে তাঁদের কাছে এসে দাঁড়াল। তাকে দাঁড়াতে দেখেই দলের একজন বললেন—কি চাই?

কৃষক বিনয়ের ভঙ্গিতে হাত জোড় করে বলল—আজ্ঞে, আমার নাম দাশু বাউরী। আপনারা পুরী যাবেন শুনে ছুটে এলাম। আমার একটি নিবেদন আছে।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ বললে,—শুনি তোমার কি নিবেদন?

দাশু বাউরী তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে ছিল। বলল—আজ্ঞে, অনেক দিন থেকে আমি একটি নারকোল রেখেছি—ঠাকুরকে দেব বলে। কিন্তু আমি চাষা মানুষ, চাষ ছেড়ে কোথাও যেতে পারিনে—তাই যদি আপনারা দয়া করে······?

তৃতীয় ব্রাহ্মণ বললেন—নিয়ে যেতে বলছ, এই তো।

দাশু বাউরী আরো একটু ঝুঁকে বলল—আজ্ঞে।

তিন জনেই কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন। পরস্পরের মনোভাব বুঝতে কারুরই অসুবিধা হল না। সবারই চোখে মুখে ক্রোধের চিহ্ন ফুটে উঠেছে—অর্থাৎ কিনা, একজন নিচু জাতের লোক যারা বামুনের পায়ের ধুলোর জন্য কাড়াকাড়ি করে—সেই কিনা ব্রাহ্মণকে হুকুম

করছে। কিন্তু এভাবে তাঁরা কেউ ভাষায় প্রকাশ করলেন না। তাকে নারকেলটি আনতে আদেশ দিলেন।

হুকুম পেয়েই দাশু বাউরী এক নিশ্বাসে নিজের বাড়ির দিকে ছুটে গেল এবং চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই তার সযতনে রক্ষিত নারিকেলটি নিয়ে এল। এসেই ব্রাহ্মণের হাতে দিয়ে বলল—ঠাকুরকে বলবেন যে, এই নারকোলটি দাশু বাউরী দিয়েছে, তিনি যেন দয়া করে নিয়ে নেন। কিন্তু একটি কথা··· !

—কি—?

—যদি ঠাকুর আমার নারকোল হাতে হাতে না নেন তবে আমার কাছেই ফিরিয়ে দেবেন।

আগুনে ঘৃত দিলে যেমন আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে, দাশুর কথা শুনে ব্রাহ্মণরাও সেই রকম হলেন। কিন্তু এবারেও তাঁরা কোনোরকমে চেপে গেলেন। দাশু চলে যেতেই তাঁরা ফেটে পড়লেন। একজন বললেন—আস্পর্ধা তো কম নয়—বলে কিনা যদি হাতে হাতে না নেন···। ইস—কি বড় ভক্ত রে— !

অপর জন বললেন—ছোটলোকের বুদ্ধি আর কতটুকু হবে—শাস্তর ফাস্তর পড়েনি তো। যা' মুখে এল তাই বলে দিল।

তৃতীয়জন বললেন—বেশ, পরীক্ষা করে দেখাই যাক না। যদি না হয়, তা' হলে ফিরতি পথে ব্যাটাকে···।

এই বলে তিনজনে আবার পুরীর পথে পা' বাড়ালেন।

পুরীর রথ উৎসব ভারত বিখ্যাত। উৎসব শুরু হবার আগেই লোকে সমস্ত পুরী শহরটাকে ছেয়ে ফেলেছে। চারিদিকে জনসমুদ্র, কোথাও তিল ফেলতে জায়গা নেই। সেই ব্রাহ্মণ তিনজনও এসে উপস্থিত হলেন। উৎসব শুরু হতে তখনো কয়েকদিন বাকি আছে। তাঁদের মধ্যে একজন বললেন—এখনই যা' ভিড় দেখতে পাচ্ছি—রথ চলার সময় ঠাকুরকে স্পর্শ করতে পারব কিনা সন্দেহ। তার চেয়ে এক্ষুণি সমুদ্রে চানটান করে ঠাকুরকে পূজো দিয়ে নিই আর সেই সঙ্গে দাশু বাউরীর নারকেলটাও··· !

নারকেলের কথায় সকলেই একবার হাসলেন। তারপর পূজার উদ্দেশে নিজেকে শুদ্ধ করতে সমুদ্রের দিকে পা বাড়ালেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্নান সেরে পূজার উপকরণ সাজিতে সেজে মন্দিরে এসে ঢুকলেন। নিজেদের পূজা-অর্চনা হয়ে গেলে পর একজন বললেন—দাশু বাউরীর নারকেলটা ?

যাঁর কাছে ছিল তিনি নারিকেলটি ঠাকুরের কাছে তুলে ধরলেন এবং দাশু বাউরী যা' বলে দিয়েছিল তাঁরা তার একটুও বেশী আর কিছু বললেন না।

কিন্তু এ কী !

ঠাকুরের কাছে তুলে ধরতেই নারকেলটা যে অদৃশ্য হয়ে গেল। হাতের অঞ্জলি যেমনকার

তেমনই আছে অথচ নারকেল নেই। মনে হল কে যেন ভেল্কিবাজীর মত ছোঁ মেরে ফলটা নিয়ে গেল। কারো চোখে পলক পড়ে না। তিনজনই পরস্পরের মুখের দিকে আশ্চর্যভাবে চাইতে লাগলেন। কারো মুখে কথা নেই, ভয়ে-বিস্ময়ে তিনজনই হতবাক্ হয়ে গিয়েছেন—যেন তিনটে পাষাণ মূর্তি। অলৌকিক কর্ম দেখে তাঁদের সমস্ত শরীর শিহরিত হয়ে লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠল—পলকের মধ্যে তাঁরা এমন ঘেমে গেলেন যেন এইমাত্র পুকুর থেকে স্নান সেরে উঠছেন।

এতদিনের তপজপ এবং বর্ণশ্রেষ্ঠত্বর যে আভিজাত্য তাঁদের মনের মধ্যে ছিল, ঠাকুর তা' এক নিমেষে চূর্ণ করে দিলেন।

সম্বিত ফিরে পেয়ে ব্রাহ্মণতিনজন রথযাত্রা দেখবার জন্য আর অপেক্ষা করলেন না। তাঁরা সেই মুহূর্তেই তল্পিতল্পা গুটিয়ে পুরী থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁরা আসল ভগবানকে পথে পেয়েও অহমিকায় আচ্ছন্ন হয়ে চিনতে পারেননি, এবার সেই দাশু বাউরীর পায়ের ধুলো নিয়েই নিজেদের কৃত কর্মের প্রায়শ্চিত্ত করবেন। তিনজনে একপ্রকার ছুটতে ছুটতেই বেরিয়ে গেলেন পুরী থেকে। সকলের চোখেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টি—দাশু বাউরীর গ্রাম আর কতদূর ?

রাজার পরীক্ষা

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

হঠাৎ রাজা গেলেন রেগে আয়নাতে মুখ দেখে—
বিশ্রী সাদা পাকা দাড়ি এল কোথা থেকে ?
কোথায় গেল তার সে অমন কালো কাঁচা দাড়ি—
যেখান থেকে পারো খুঁজে আন তাড়াতাড়ি।

মন্ত্রী সেপাই সেনাপতি দাড়ির খোঁজে ছোটে,
জ্ঞানী গুণিন জ্যোতিষ সবাই রাজবাড়িতে জোটে।
রাজার দাড়ি কোথায় গেল—ভেবে সবাই সারা,
রাজা তখন সকলকে তাই দিলেন কষে তাড়া—

মিথ্যে তোরা হল্লা করিস, ভাবিস না কেউ কিছু—
কাণ নিয়ে যায় চিলে শুনে ছুটিস চিলের পিছু।
বয়স হল, পাকল দাড়ি—রং ধরেছে সাদা,—
এই কথাটা কেউ বোঝে না, এমনি সবাই হাঁদা !

জলপাইগুড়ির বন্যা

উপল দত্তগুপ্ত

বয়স ১৫ বছর—গ্রাহক নং ১৪২৯

সে দিন রাতে হঠাৎ উঠে দেখি—
আরে, ব্যাপার একি ?
'বাঁচাও বাঁচাও !' করুণ সুরে উঠছে কারা হাঁকি,
জলের তোড়ে দুটো বাঁধই ভেঙে গেছে নাকি !
সারা শহর ভেসে গেছে তিস্তা নদীর জলে
গরুছাগল, কাঠের গুঁড়ি ডুবল জলের তলে !

শত শত আর্ত মানুষ ভাস্‌ছে স্রোতের টানে,
শহর খানা গুঁড়িয়ে গেছে নদীর প্রবল বাণে।
প্রকৃতির এই নিঠুর খেলায় বেঁচে আছে যারা,
যমের সাথে যুদ্ধ করে ক্লান্ত এখন তারা ॥

প্রাকৃতিক এই বিপর্যয়ে করব মোরা পণ,
আর্তগণের সেবা মোরা করব অনুক্ষণ ॥

বর্ষারাণী

কুমারী শুভ্রা বিশ্বাস

বয়স ১৩ গ্রাহক নং ২০২৯

বর্ষারাণী ঝাঁপিয়ে এল
টুপ্-টুপা-টুপ্-টুপ্
দুষ্টু খোকার বন্ধ খেলা
মায়ের কোলে চুপ্।
সারাটাদিন আকাশ ছেয়ে
মেঘলাদিদির খেলা
খোকনমণি বুঝছে না আজ
কখন বিকেল বেলা।
মেঘদিদিরা হাঁকিয়ে ওঠে
গুড়ুম্ গুড়ুম রবে
বৃষ্টি ছোড়ে মাটির পানে
এবার মজা হবে।

রাগ করেছে ছুঁড়ছে তারা
বড় বড় ঢিল
ছেলেরা সব ভিজে ভিজে
কুড়োয় ঠাণ্ডা শিল।
ফুলগুলো সব ফুটে ওঠে
গাছের শাখে শাখে
বেণুবনে ঝুমকোলতা
দুলছে লাখে লাখে।
খোকাসোনার নাও ভাসিয়ে
খুসি খুসি মন
কেকারবে ভেসে আসে
বর্ষার আমন্ত্রণ।

মুনমুন

অর্পিতা রায় চৌধুরী

বয়স ১০½ বছর—গ্রাহক নং ২৮৩৭

আমাদের বাড়ির কাছে রোজই একটা চন্দনা পাখি আসত, আবার কিছুক্ষণ বাদেই উড়ে চলে যেত। তার বাসা ছিল কোন এক নারকেল গাছের ফোকরে। আমার পাখি পোষার খুব শখ বলে একদিন বাড়ির ভিতরে কিছু ছোলা ছড়িয়ে দিলাম। পাখিটা এসে খেয়ে গেল। এর দুএক দিন বাদে আমি ওকে ধরবার জন্য একটা খাঁচা কিনলাম। তার মধ্যেও কিছু ছোলা ছড়ালাম। লোভ সামলাতে না পেরে সে যেই খাঁচায় ঢুকল, আমি সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করে দিলাম। সে আর উড়ে পালাতে পারল না। তারপর থেকে সে আমাদের সঙ্গেই থাকত। আমি তার নাম রেখেছিলাম মুনমুন। মুনমুনের গলায় হারের মতো একটি গোল লাল দাগ ছিল। আমিই তাকে স্নান করাতাম ও খাবার দিতাম। মুনমুন লঙ্কা খেতে খুব ভালবাসত। রোজ সকালে ঘুম ভাঙলেই ছুটে চলে যেতাম মুনমুনের কাছে। গিয়ে তাকে নানারকম কথা শেখাতাম—আমার বন্ধুদের নাম, গুডমর্ণিং, আর কত ঘুমাবে ইত্যাদি। আস্তে আস্তে সে কথা বলত। আমাকে ঘুম থেকে উঠতে দেখলেই বলত 'কি ঘুম ভাঙল—গুড-মর্ণিং'। বন্ধুরা এলেই সে তাদের সব নাম ধরে ডাকত এবং গুডমর্ণিং বলত দেখে সবাই তাকে ভালবাসত।

একদিন খাঁচা খোলা থাকাতে মুনমুন উড়ে পালিয়ে গেল, আর এল না। সেদিন বিকালে আমার বন্ধু টিঙ্কু এসেই অবাক হয়ে গেল কারণ সেদিন আর 'এই টিঙ্কু মাংকু গুডমর্ণিং' কেউ বলল না। সে আমাকে কারণ জিজ্ঞেস করাতে আমি টিঙ্কুকে সব কথা বললাম আর খেলতে গেলাম না। মুখ ভার করে বসে রইলাম। আমার দু-তিন খেতেও ভাল লাগত না। আমি এখনও তার কথা ভাবি দেখে বাবা বললেন—'তোকে আবার একটা চন্দনা পাখি কিনে দেব।' কিন্তু সে-ও তো আবার এরকম উড়ে যাবে। আমি মুনমুনকে ভুলব না, কিন্তু মুনমুন যে কি করে আমার মায়া কাটিয়ে চলে গেল সেই কথা ভাবলেই আমার কান্না আসে। আমি তাকে কত ভালবাসতাম কিন্তু ভালবাসার কি এই শেষ পরিণাম?

আমি এখনও চন্দনা পাখি দেখলেই ভাবি এই কি আমার সেই ছোট দুষ্টু পাখি মুনমুন?

সঃ সঃ—দুষ্টু হবে কেন? আকাশের পাখির কি আর কখনো খাঁচায় ভালো লাগতে পারে? আর তার মা বাবা ভাই বোন?

শিল্পীর মৃত্যু

সুপর্ণ চৌধুরী—বয়স ১১ বছর গ্রাহক সংখ্যা ১২০৯

আমরা সকলেই জানি যে আচার্য নন্দলাল বসু একজন বড় শিল্পী ছিলেন। আমরা সকলেই ছোটবেলায় রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠে তাঁর আঁকা অনেক ছবি দেখেছি। আমি যখন শান্তিনিকেতনে ছাত্র হিসেবে ছিলাম তখন তাঁকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমি কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের ছবি আঁকতে দেখেছি। অবনীন্দ্রনাথের পরে নন্দলাল বসুর উপরেই কলাভবনের ভার পড়ে। শান্তিনিকেতনে তিনি মাস্টার মশাই বলে পরিচিত ছিলেন।

তাঁর জন্মদিনে আমরা সবাই তাঁকে প্রণাম করতে গেলাম। তাঁর বাড়িতে ঢুকে দেখি, তিনি অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন। আমি এক এক সময় নিজে নিজে ভাবি যে নন্দলাল বসু যদি অসুস্থ না হয়ে পড়তেন তাহলে তিনি কলাভবনকে আরো সুন্দর ভাবে গড়ে তুলতে পারতেন।

আমার জীবনে যত স্মরণীয় দিন এসেছে তার মধ্যে আচার্য নন্দলাল বসুর মৃত্যুদিনের কথাই বেশি করে মনে পড়ে। সেদিন বিকেল বেলায় খেলাধুলো করে এসে জিরোচ্ছি এমন সময় খবর এল আচার্য নন্দলাল বসু মারা গেছেন। সেদিন এই অবিশ্বাস্য খবর শুনে আমরা সবাই খুব দুঃখিত হয়ে পড়লাম। তারপর সন্ধ্যে হলে সমস্ত ভবন থেকে ছাত্ররা চলল নন্দলাল বসুর বাড়িতে তাঁকে শেষ প্রণাম জানাতে। তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখি তাঁর সমস্ত অঙ্গ ঢাকা, খালি সেই মলিন মুখখানা বের করা। কিন্তু এই শোচনীয় দৃশ্য কি বেশিক্ষণ দেখা যায়! কোন রকমে তাঁকে প্রণাম করে হোস্টেলে চলে এলাম।

সেদিন রাত্রিতে কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না। সারা রাত জেগে শুয়ে থাকলাম আর ভাবতে লাগলাম সেই অসাধারণ শিল্পীর কথা যিনি একটু আগেই তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। যাই হোক রাত্রির অন্ধকার থাকতেই শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্র-ছাত্রী সবাই মিলে আচার্য নন্দলাল বসুর মৃতদেহ নিয়ে বৈতালিকে বার হলেন। তখন সবার মন খুব বিষণ্ণ।

বৈতালিকে রবীন্দ্রনাথের 'আগুনের পরশমণি', 'কর তাঁর নাম গান' প্রভৃতি গান গাইতে গাইতে আমরা সমস্ত শান্তিনিকেতন প্রদক্ষিণ করতে লাগলাম। আমরা মাঝপথে গেছি এমন সময় অন্য পথ দিয়ে শ্রীনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা প্রকাণ্ড ফুলের মালা নিয়ে উপস্থিত হলেন। দুটি মিছিল এক সঙ্গে মিলিত হল গৌরপ্রাঙ্গণে। তারপর নন্দলাল বসুকে সেই মালা পরিয়ে দেওয়া হল। এরপর তাঁর মৃতদেহ উত্তরায়ণের কাছে নিয়ে নামানো হল। সেখান থেকে আমরা সবাই হোস্টেলে ফিরলাম। আর শিক্ষক-শিক্ষিকা ও বড় বড় ছাত্রছাত্রীরা মিলে আচার্য নন্দলাল বসুর মৃতদেহ নিয়ে কোপাই নদীর দিকে চলে গেলেন। আজও আচার্য নন্দলাল বসুর মৃত্যু দিনের কথা মনে পড়ে।

প্রভাত

ঝিনুক চৌধুরী

বয়স ১২ বছর—গ্রাহক সংখ্যা—২৮৬৩

রাঙিয়ে গগন উঠল রবি,
নীল আকাশে আঁকল ছবি,
নানান রঙের ডানা মেলে
উড়ছে মেঘের দল।
মৌমাছিরা দলে দলে—
ফুলের মধু আনতে চলে,
গাছের ডালে পাখিরা সব
করছে কোলাহল।

বাড়ছে যে রোদ ধীরে ধীরে
উঁচু গাছের শিরে শিরে
সোনার রোদের আলোক লেগে
করছে যে ঝলমল।
যেই একটু হ'ল বেলা—
থেমে গেল মেঘের খেলা,
সাথে সাথে থেমে গেল
প্রভাত পাখির গান।
শেষ হ'ল যে নীল আকাশের
রঙীন আলোর স্নান।

ভ্রমণ

অন্তরা সেন—গ্রাহক নং ১৯২ বয়স—১৫

গরমের ছুটি শুরু হ'ল যবে
কহিলেন আসি বাবা—
'বেড়াতে কোথায় যাইবে এবার
শুরু ক'র তাই ভাবা।'
ভেবে আমি বলি 'চলো কাশ্মীর'
বোন কহে 'না-না বোম্বাই'
ঠিক করা তায়, কিছুতে না যায়
কোথা যাব ভেবে নাহি পাই!
অনেক ভাবিয়া শেষে হ'ল ঠিক
কোথা যাব মোরা এবারে
মুসৌরী আর দেরাদুন যাব
আর যাব হর্‌দোয়ারে ॥
ঠিক করা দিনে মোরা চারজনে
বাহির হ'লেম পথেতে—
ট্রেনে চেপে স্মরি, নারায়ণ হরি
থেকো আমাদের সাথেতে।
ক্রমে গয়া কাশী, ফেলে এনু পিছে
পার হয়ে এনু লখ্‌নো— ;
অবশেষে আসি হরিদ্বারেতে
ভাবিনু বুঝি এ স্বপ্ন— ॥
কলতান তুলি ছুটিছে গঙ্গে—
কভু নাহি হয় শ্রান্ত— ;
দুই-তীরে তার কত গিরিমালা
মৌন তাপস-শান্ত ॥
সেইখান হতে—গেনু ঋষিকেশ
—গেনু 'লছ্‌মন-ঝুলিতে'— ;
জীবনেতে কভু পারিবনা আমি
আহা! সে দৃশ্য ভুলিতে।
তারপরে গেনু দেরাদুন মোরা
ছিলেম সেথায় স্বল্প—।
তবু মোরা সেথা, যা দেখিনু তাহা
নহে একতিল অল্প—।
দেরাদুন হতে, পাহাড়ীয়া পথে
গেনু মুসৌরী ক্রমে—
সে মোর গ্রীষ্মে, মুসোরীতে এসে
শীতকাল ভাবি ভ্রমে।
বিদায়ের দিন ঘনিয়ে আসিল
দিন পনেরো পরে
ফের গুছাইয়া বিছানা পত্র
রওনা হলেম ঘরে— ।
অনেক বেড়ানু, অনেক দেখিনু
যাইয়া নতুন দেশে—
তবু না পাইনু এ হেন শান্তি
যা পেলেম ফিরে এসে।

ধাঁধার উত্তর

পার্থসারথী মুখোপাধ্যায়—গ্রাহক সংখ্যা ১৩৫৯

(১)

প্রত্যেক বউ দুটো করে তাল পেল। ন' বউ মানে হল চতুর্থ বউ (বড়-মেজো-সেজো-ন ইত্যাদি)

(২)

৮৮৮+৮৮+৮+৮+৮=১০০০

নন্দিতা গুহঠাকুরতা
গ্রাহক নং ১৯১৩—বয়স ১২ বছর

খুকু—মন খারাপ
সোনালী চৌধুরী
গ্রাহক নং ১৭০৪, বয়স ১৪ বছর

অজয় হোম

মেকসিকো অলিম্পিক

কবি দ্বিজেন্দ্রলালের একটি গানের প্রথম লাইন হল, 'ভেঙে গেছে মোর স্বপনের ঘোর, ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার।' ১৯৬৮-র মেকসিকো অলিম্পিকে হকি সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারার পর এই প্রথম কলিটি বারবার মনে পড়ছে। এই প্রথম আমরা ফাইনালে উঠতে পারলাম না।

কেন এমন হল?

১৯২৮ সালের আমস্টার্ডাম অলিম্পিক থেকে ১৯৫৬-র মেলবোর্ণ অলিম্পিক পর্যন্ত পরপর ৬টি অলিম্পিকের স্বর্ণপদক বিজয়ী বিশ্ব হকি চ্যাম্পিয়ন প্রথম ধাক্কা খেল ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকে। ফাইনালে হেরেছিল ১-০ গোলে পাকিস্তানের কাছে। ভারতের হকি সোনা থেকে রূপোয় নামল।

১৯৫৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ফাইনালে ভারত কেঁদে ককিয়ে জেতা সত্ত্বেও হকির কর্ণধাররা সচেতন হলো না। তার প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিকে। ১৯৬৪ সালে টোকিও অলিম্পিকে আমরা হারার বদলা নিলাম অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে হিমসিম খেয়ে ওই পাকিস্তানকে ১-০ গোলে হারিয়ে। অর্থাৎ, মেলবোর্ণ থেকে আমরা ধাপে ধাপে নেমেই চলেছি। আজ ব্রোঞ্জে এসে ঠেকেছি।

পাকিস্তানকে হারিয়ে টোকিও থেকে ভারতে ফিরে ম্যানেজার অশ্বিনীকুমার বলেছিলেন—আমি জিতিয়েছি…'আই ডিড ইট'। কিন্তু এবারের অলিম্পিকের পর মনের মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে কে আমাদের হারাল—হু ডিড আস ডাউন? এর জবাবে ম্যানেজার মেজর-জেনারেল ডি এস কাল্‌হা কি বলবেন?

অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারার পর তিনি বিশেষ করে ফরোয়ার্ডদের ঘাড়ে দোষ দিয়েছেন এবং নিজে ফেল্ট 'ভেরি ব্যাড'।

আমি দোষ দেব ইণ্ডিয়ান হকি ফেডারেশনের কর্মকর্তাদের, তাঁরা ১৯৬০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত সচেতন হলেন না। অলিম্পিকে ভারতের স্থান একমাত্র হকিতেই আর কোনো প্রতিযোগিতায় পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম দেশগুলির কাছেও দাঁড়াতে পারে না। ৫০ কোটি ভারতবাসীর ২৭জন ক্রীড়া প্রতিনিধি মেকসিকো থেকে আমাদের জন্যে কি এনেছে জানো? হকিতে তৃতীয় স্থান করে ব্রোঞ্জ পদক এবং কুস্তিতে ২ পয়েন্ট।

অলিম্পিক হকিতে ম্যানেজারি করতে গেলে বুদ্ধির সঙ্গে কৌশল, খেলার টেকনিক এবং খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে প্রচণ্ড জ্ঞান থাকা দরকার। মেজর-জেনারেল কাল্হা সাহেবের তা একদম নেই। শুধু তাই নয় তিনি হকির 'হ' ও জানেন না অথচ তিনি হলেন ম্যানেজার। ম্যানেজার হওয়া উচিত ছিল ইন্দার মোহন মহাজান, বাবু (কে ডি সিং), আর এস ভোলা, ভিক্টর সাইমন, জেণ্টল বা জস গনসালভেজ এঁদের মধ্যে যে কেউ একজনের।

কেবলমাত্র খেলোয়াড়দের দোষ বা অপারগতার জন্যে ম্যাচ হারি নি। হেরেছি দল পরিচালনায় কূটবুদ্ধি ও কৌশল জ্ঞানের অভাবে। এছাড়াও দুনিয়ার হকি পরিস্থিতি সম্বন্ধেও তাঁর জ্ঞান একদম নেই। মিলিটারি মেজর জেনারেল হলেই যে খেলোয়াড় ও খেলা পরিচালনায় দক্ষ হবেন এ ধারণা অবাস্তব।

আমি বলব এই হারাতে খেলোয়াড়দের কোনো দোষ নেই। খুব ভালো দলও যে কোনও দিন অনেক কাঁচা খেলোয়াড়দের হাতে হঠাৎ হেরে যায়। ইতিহাসে এর নজির কিছু কম নেই।

আমাদের দেশে বহু ভালো খেলোয়াড় আছেন। সুতরাং খেলোয়াড়েরও কমতি নেই। নেই শুধু কর্মকর্তাদের দৃষ্টি এবং খেলোয়াড়দের ঠিকমতো সুযোগ দেওয়া এবং পরিচালনা করার যোগ্যতা। আজ যে আমরা মেকসিকো অলিম্পিকে হেরেছি তা শুধু কর্মকর্তাদের দোষেই। গলদ গোড়াতেই দল ও ম্যানেজার নির্বাচনে।

প্রথম খেলা থেকেই ধরা যাক। হারাটা কিছু নয়। সেটা দৈবাৎও হতে পারে। কিন্তু কালহা-সাহেবের দলগত শক্তি হিসেবে নিউজিল্যাণ্ড যে কি দরের তার জ্ঞান তাঁর ছিল না। নিউজিল্যাণ্ড আজ হকি খেলছে না। ভারত ১৯২৬ সালে এবং খুব সম্ভবত তার আগেও হকি খেলতে ওদেশে গেছে। এই প্রথম খেলাতেই ভারতের দলগঠনে ম্যানেজার সাহেব পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করলেন না, পরের খেলা পশ্চিম জার্মানির জন্যে রিজার্ভে তুলে রাখলেন। ১৯৬৪ সাল থেকেই নিউজিল্যাণ্ড বিশ্বহকিতে স্থান করে নেবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে সে সম্বন্ধে তিনি মোটেই ওয়াকিবহাল ছিলেন না। সুতরাং এই অজ্ঞতার ফল যা হবার তাই হয়েছে।

তারপর সেমিফাইনাল অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। তিনি ফরোয়ার্ডদের উপরে দোষ দিয়েই খালাস হতে চেয়েছেন। ফরোয়ার্ডলাইন খুবই দুর্বল তা মেনে নিলাম কিন্তু যা আছে তাই দিয়ে পরিচালনায়

কোনো বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় নি। প্রমাণ, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে কেন তিনি পিটারকে খেলিয়েছেন যখন তিনি ভালো করেই জানেন গ্রুপ ম্যাচগুলি খেলার সময় ইনসাইড রাইটে পিটার অত্যন্ত খারাপ খেলেছে?

গ্রুপ ম্যাচগুলি খেলার সময় ম্যানেজার বারে বারে মুখে বকেছেন ফরোয়ার্ড লাইন তিনি বদলাবেন কিন্তু কার্যত তিনি তা মোটেই করেন নি। অথচ দলে দুজন বেশ ভালো ফরোয়ার্ড আছেন। গুরবকস্ সিং-কে দিয়ে ইনসাইড-রাইট এবং ইনাম উল রেহমানকে দিয়ে ইনসাইড-লেফটে খেলানো উচিত ছিল। তারপর দু'জন আহত খেলোয়াড়কে কেন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলিয়েছেন?

সেমিফাইনাল খেলার আগের দিন পৃথিপাল সিং ও সার্ভিসের বলবীর সিং দুজনেই আহতদের তালিকায় ছিলেন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কখনই তাঁরা খেলার জন্যে পুরোপুরি সক্ষম হতে পারেন না। আমি বলব তাঁদের খেলানো উচিত হয় নি যখন পৃথিপালের জায়গায় ধরম সিং এবং জগজিৎ সিং বদলি হিসেবে দলে ছিলেন।

এখন তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কেন আমরা মেকসিকো থেকে হকিতে ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে ফিরেছি। সবচেয়ে খারাপ লেগেছে ব্রোঞ্জ পদক পাবার খেলায় পশ্চিম জার্মানির বিরুদ্ধে জয়সূচক গোলে গুরবকস্ সিং ও বলবীরের দাঁত বেরকরা ছবি খবরের কাগজের পাতায় দেখে। ব্রোঞ্জেই খুশি ধরছে না, সোনা-রূপো চুলোয় গেল! ছিঃ

ভেবে পাই না নির্বাচনে ফরোয়ার্ড লাইন এত দুর্বল করে তৈরি করা কেন হল। ভারতের পক্ষে বেশি গোল করেছে ব্যাক আর হাফব্যাক। ভারতের গোলের নমুনা দেখলে লজ্জা লাগে। কোথায় গেল ফরোয়ার্ড লাইন থেকে ডজন দরে গোল দেওয়া? মেকসিকোতে ১৬টি অংশগ্রহণকারী দেশের মধ্যে ১৬শ স্থানের অধিকারী শক্তিহীন মেকসিকোর বিরুদ্ধে ৮ গোল এবং জাপান মাঠ ছেড়ে চলে যাওয়ায় আন্তর্জাতিক হকিদের জুরিদের কাছ থেকে একটিও গোল না করে ৩ গোল পাওয়া বাদ দিলে ভারত ৭টি খেলায় মাত্র ১০টি গোল করেছে এবং খেয়েছে ৭ গোল। আর ওদিকে বিশ্বজয়ীর মতো খেলে ফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে পাকিস্তান দ্বিতীয়বার স্বর্ণপদক লাভ করল। যোগ্যের যোগ্য পুরস্কার লাভ।

এতো গেল হকি পর্ব। বাকিগুলোও জেনে রাখ। দু'জন অ্যাথলীট পরভীন কুমার ও ভীম সিং-এর মধ্যে পরভীনের উপর কিছুটা আশা রেখেছিলাম। অন্ততঃ ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করে নির্দিষ্ট ১ পয়েন্ট হয়তো পাবে। ওর নীচে কোনো পয়েন্ট নেই। পঞ্চমে ২, চতুর্থে ৩, তৃতীয়ে ৪, দ্বিতীয়ে ৫ এবং প্রথম স্থানের জন্যে ৬ পয়েন্ট।

পরভীন কুমার কায়দা মেরে, খুব সম্ভবতঃ ভয়েই, ডিসকাস ছুঁড়লো না। হাতুড়ি ছোঁড়ায় দেখিয়ে দেবেন। দেখা গেল ভারতে সিলেকসন ট্রায়ালে যতটা দূর হাতুড়ি ছুঁড়েছিলেন ওখানে তাও ছুঁড়তে পারেন নি। হাই জাম্পে ভীম সিং ফাইনালে উঠতে না পারলেও ৬ ফিট ১০·৯ ইঞ্চি লাফিয়ে এশিয়ার লাফিয়েদের মধ্যে শীর্ষস্থানে পৌঁছেছেন। ৪৪ জনের মধ্যে হয়েছিলেন ১৪শ।

ক্লে-পিজিয়ন সুটিং-এ প্রখ্যাত রাইফেল-চালক মহারাজা কর্নি সিং ১০ম স্থান এবং মহারাজকুমার

রণধীর সিং ১৬শ স্থানে পৌঁছেছেন।

ভারোত্তোলক এম এল ঘোষও ভারতে তিনি যতখানি ভার তুলেছিলেন ওখানে তার চেয়েও কম তুলেছেন। ফেদারওয়েট বিভাগে তিনি তুলেছেন মাত্র ৩৪৭ কিলোগ্রাম। ফলে স্থান হয়েছে ১৫শ।

একমাত্র ভারতের কুস্তিগীর বা মল্লবীরেরা একেবারে ফেলে দেবার মতো দেখান নি। ফেদার-ওয়েটে মুক্তিয়ার সিং ২য় রাউণ্ডে এবং বিশ্বম্ভর সিং ৫ম রাউণ্ডে হারলেও লাইটওয়েটে উদয়চাঁদ ৬ষ্ঠ স্থান এবং ফ্লাইওয়েটে সুদেশকুমার ৬ষ্ঠ স্থান পেয়ে ভারতের জন্যে ২টি পয়েণ্ট সংগ্রহ করেছেন।

এই হল ভারতের মেকসিকো অলিম্পিকের খতিয়ান। ওদিকে আমেরিকা প্রথম হয়েছে, পেয়েছে ৪৫ স্বর্ণ, ২৭ রৌপ্য, ৩৪ ব্রোঞ্জ, মোট ১০৬ পদক। দ্বিতীয় রাশিয়া, পেয়েছে ২৯ স্বর্ণ, ৩১ রৌপ্য, ৩১ ব্রোঞ্জ, মোট ৯১ পদক। ভারতের নীচে মাত্র একজন আছে সে হল তাইওয়ান। তার নীচে আর কেউ নেই। সেও ভারতের মতো একটিমাত্র ব্রোঞ্জের পদক পেয়েছে কিন্তু কোনো পয়েণ্ট সংগ্রহ করতে পারে নি।

যাত্রা ● বিবেকানন্দ সেনগুপ্ত

যাত্রা হবে সীতা হরণ
সাজবে রাবণ রাম কে ?
ঠিক হয়েছে রাজ পোষাকের
নগদ দেবে দাম যে।
দশরথের পাঠ কিছু কম
পাকা চুল আর দাড়ির,
সবাই বলে ভাবতে হবে
অমত আছে বাড়ির।
সবার চেয়ে অভাব হলো
বীর হনুমান ভক্তের

আনতে হবে উঁচিয়ে পাহাড়
কার আছে জোর রক্তের।
লাগিয়ে গুড়ের আঠা গায়
ভুলোর লোমে সাঁটলে,
দশটি টাকা নগদ পাবে
লেজ লাগিয়ে হাঁটলে।
যাত্রা হবে সীতা হরণ
পারবে সীতা কাঁদতে ?
পারবে না সে ধুমসো রামকে
হরিণ ধরতে সাধতে॥

পাহাড় থেকে নেমে

জীবন সর্দার

পাহাড় থেকে নেবে, ফিরে উপর দিকে তাকিয়ে আমার মাথা ঘুরে গেল। এত উঁচুতে উঠেছিলাম কি করে। কত উঁচুতে উঠেছিলাম সে কথা পরে বলছি, কেন উঠেছিলাম আগে শোনো :

ছোটবেলায় উইঢিবি দেখে পাহাড়ের কল্পনা করেছি। পরে দূর থেকে টিলা দেখেই খুশি হয়ে ভেবেছি—এরা এখানে কি করে এলো? নুড়ি কুড়িয়ে জমিয়ে রাখতুম তখন থেকে।

নীলাঞ্জন একদিন এসে বললে, চল, পাহাড় দেখে আসি। কেন, কোথায় কিছু ভাবলুম না, তৈরী হয়ে নিলাম। সঙ্গে নিলাম, নীলাঞ্জনের কথামত একটি হাতুড়ি, একটি ছেনী। এ দুটি দিয়ে সহজে পাথর কাটা যাবে, ভাঙ্গা যাবে। আতস কাচ নিলাম একটি—পাথরের ভেতরে দানাগুলোর গড়নধরন বড় করে দেখার জন্য। কম্পাস আমার পকেটে রাখলাম, দিক ঠিক রাখতে হবে সবসময়। নোটবই পেন্সিলত' নিলামই আর নিলাম কিছু তুলো আর কাগজের থলে। পাথরের নমুনাগুলো তুলোয় ঢেকে কাগজে ভরে রাখব তাই। সব কিছু ভরে নিলাম আমার পিঠঝোলায়, হাতে পাহাড়-চড়ার লাঠি নিয়ে বললাম—আমি তৈরী।

হিমালয় দেখার আগে ছোট বড় সব পাহাড় দেখে নিলাম। পাহাড় সব জায়গায় সমান উঁচু নয়। কোথাও একা একটি ছোট পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও সার বেঁধে পরপর কয়েকটি পাহাড় দাঁড়িয়ে। আমি ভাবতুম কি দিয়ে তৈরী এরা, কেমন করে তৈরী। পাথর—কথাটা শুনলেই মনে হয় লোহার মত শক্ত কিছু। কোন কোন পাথর তেমন বটে, কিন্তু কাছে গিয়ে হাতে নিয়ে দেখলাম, দু' আংগুলের চাপেই কত পাথর গুঁড়িয়ে যায়। পাহাড়ের গা বেয়ে হেঁটে হেঁটে দেখি ওর সবটাই পাথর নয়, মাটিও।

নীলাঞ্জন বললে, পাহাড় তা পাথরের হোক আর মাটির হোক—পৃথিবীর নড়াচড়ার ফলেই গড়া। কোথাও সোজা উঠেছে, কোথাও কাত হয়ে রয়েছে, আবার কোথাও 'পলি-পাথরে' পৃথিবীর চাপের হেরফেরে ঢেউ এর নকশা ফুটে উঠেছে। আমি জানি, নীলাঞ্জন এ কথা বই পড়ে শিখেছে। কিন্তু আমি পাথর থেকে পাথরের তফাৎ বুঝিনা। কত না রং বেরংএর পাথর দেখি, ঐ রংএর রহস্য বুঝিনা। নকশা আঁকা পাহাড়ের ভাঁজ দেখে, পাথরের গা দেখে অবাক হই। ব্যস, আর কিচ্ছু না। যা দেখি তার মানে না বুঝলে অন্ধ বই আর কী! একটি পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে দেখি মাইলা

খানেক জায়গা জুড়ে কি চমৎকার এক ময়দান। কি ক'রে অমন হ'ল বুঝিনি। পাহাড়ের ধাপে ধাপে ঝরণা নেমে আসছে, দেখেছি কি করে ধাপ হল পাহাড়ের গায়, ভেবেছি। গভীর গিরিখাত দিয়ে ভীষণ বেগে নদীকে যেতে দেখে ভেবেছি—ঐ খাদের মধ্যে নদীটি কি করে গিয়ে পড়ল! প্রকৃতি যে অকারণে অমন নয় এখন বুঝি।

ভারতবর্ষের পাহাড়গুলো দেখে নিলাম ধীরে ধীরে। পাহাড় বলেই, একশ্রেণীর সাথে অপরের যত না মিল গরমিল কিছু কম নয়। সবগুলো মাথায় সমান উঁচু নয়। চুড়া, খাঁজ ভাঁজ ধারগুলোও দেখতে অনেক পাহাড়ে অনেক রকম। হিমালয় কোথাও এত উঁচু যে তার মাথায় সারা বছরই বরফ ভরা। তার বরফ চূড়া থেকে নেবে, গা বেয়ে, কত নদী সারা বছর গভীর খাত বেয়ে যাচ্ছে ভারতের আর কোথাও কোন পাহাড়ে অমনটি নেই। কোন পাহাড়ের মাথা তীরের ফলার মত কোথাও তাঁবুর মত, পিরামিডের মত, কোথাও দেখলাম পাহাড়ের মাথা একদম সমতল বা ঢেউ খেলান। বাংলাদেশের ভেতরে বাঁকুড়া পুরুলিয়া মানভুমের পাহাড়গুলো খুব উঁচু নয়, তাতে অবিরল ঝরঝর ঝরণা নেই বড়, গায়ে খাঁজ বা ভাঁজ কম। রোদ জল হাওয়ায় কোনটির উপরকার মাটি গাছ উঠে গিয়ে নেড়া পাহাড় দেখা দিয়েছে। কোনটিতে এখনও গাছ ঝোপঝাড় রয়েছে। হাজার হাজার বছর পরে যদি ফিরে আসতে পারি দেখব ওরাও হয়ত নেড়া হয়ে গেছে, নেড়া পাহাড়গুলো উধাও।

পাহাড় যে উধাও হতে পারে নিজের চোখে দেখলাম। দুদিন সারারাত সারাদিন বৃষ্টি হল এক পাহাড়ে। বৃষ্টির জল মাটি চুঁইয়ে পাহাড়ের গা' নরম করে দিল। মাটি হয়ে গেল কাদা। ভারি পাথরের চাপ সহ্য করতে না পেরে পাহাড়ের ঢালু গা হুড়মুড় নেবে গেল। এই ধস নাবার জন্য বৃষ্টি যেমন দায়ী হতে পারে, নদী যেমন দায়ী হতে পারে, মানুষও দায়ী হতে পারে। বন কেটে সাফ করে দিয়ে, পাহাড় কাটিয়ে পথ করায় আর ধাতুর খোঁজে পাহাড় খোঁড়ায়, ধস নাবার পথ হয়ে থাকে—যদি বৈজ্ঞানিকের সুপরামর্শ না থাকে। ধস নাবা মানে পলকে পালটে গেল পাহাড়ের চেহারা। কিন্তু প্রতিদিন রোদ জল হাওয়া পাহাড়ের চেহারা টুকিটাকি করে কত যে পালটে দিচ্ছে তা একবার দেখে বোঝা যায় না। পাহাড়ী নদীর ধারে নুড়িগুলো কি মোলায়েম। কেন? নুড়িগুলো হলই বা কি করে?

একটি উত্তর নীলাঞ্জন দিলে, বড় বড় পাথরের ফাটলে জল ঢুকে আর শীতে সে জল জমে বরফ হয়ে আয়তনে বেড়ে পাথর ফাটিয়ে নুড়ি বানিয়েছে। নদীর স্রোতে ঘসে ঘসে নুড়ি হয়েছে মোলায়েম আর একটি উত্তর হতে পারে, হাজার হাজার বছর ধরে তুষার-নদীর ঘসায় বড় পাথর ক্ষয়ে ক্ষয়ে নুড়ি হয়েছে' বাতাস আর জলে যে গ্যাস আছে পাথরের সাথে তাদের 'ভাঙ্গাগড়ার' সম্পর্ক আছেই। গ্যাস তাপ চাপ আর পাথর ভাঙ্গাগড়ার কি খেলা খেলছে পাহাড়ে পাহাড়ে সহজে গোনা যায়না।

যমুনা নদীকে এক জায়গায় আমাকে পার হতে হল, যেখানে নদীর দুইপারে দুই রংএর পাহাড়। যে পার ছেড়ে এলাম তা কাল আর হলদে, আর অন্য পার সাদা—শ্বেতপাথরের পাহাড়। পাহাড়ে

পথ যদিও খুব উঁচু কিন্তু চলতে খুব শীত করছিল না। এপারে এসে ঠাণ্ডা লাগল বেশি। নীলাঞ্জন বললে, সূর্যের আলো আর তাপ দুদিকের পাহাড়ই সমান সমান পাচ্ছে। কিন্তু সাদা পাথর গরম কম হচ্ছে ওপারের রঙিন পাথরের চেয়ে। সাদা পাথরের পাহাড়ে তাই ঠাণ্ডা লাগল হঠাৎ এসে।

হঠাৎ গিয়ে হাজির হলাম এক তুষার নদীর বুকে। পাহাড় দেখব বলে বেরিয়েছি। বরফচূড়া পাহাড় দূর থেকে দেখেছিলাম। এখন নিজেই এসে দাঁড়িয়েছি বরফের উপর। বরফের নদীর উপর। এ যে কী বিস্ময়! পাহাড় বেয়ে উঠে এমন জায়গায় এলাম যেখানে হাত বাড়ালেই বরফ। কী বিস্ময়!

পথে একটু বৃষ্টি পেয়েছিলাম। ঝর ঝর নয়, ইলশে গুঁড়ি। মাথায় কাঁধে গোঁপে দাড়িতে হাত দিয়ে দেখি ঝুরো ঝুরো বরফ। পাহাড়ের মাথায় যেখানে দিনের পর দিন বরফ জমে, সে বরফ পাথরের মত শক্ত। কি করে তা সম্ভব?

নীলাঞ্জন বললে, উপরের বরফের চাপে নীচের বরফ জমে শক্ত হয়ে গিয়েছে। সে কি একদিনে? কত শত বছরে কে জানে!

শক্ত বরফের উপর দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে চোখ মানা মানেনা। নীলাঞ্জন বকবক করছে,—পাহাড়ের চূড়ার কাঁধে খাঁজে যে বরফ জমে তারা চলতে থাকে ঢাল বেয়ে। তারও উপর, আরও উপর থেকে, যেখানে চিরতুষার সেখানেও এক অবস্থা। ছোট ধারা বেয়ে, ধীরে ধীরে, পাহাড়ের কোন না কোন ফাঁক দিয়ে বরফের স্রোত বেরিয়ে আসে খোলা একটি জায়গায়। তৈরী হল এইখানে বরফের নদী। সে বরফ গলে যে জল হচ্ছে তা থেকে জন্ম নিয়েছে একটি নদী। পাহাড় ঘুরে ঘুরে আমি নদীর উৎস মুখে হাজির হলাম। তারপর নেবে, ফিরে উপর দিকে তাকিয়ে আমার মাথা ঘুরে গেল! এত উঁচুতে উঠেছিলাম কি করে!!

ছাপার ভুল শুধরে নাও ঃ—কার্তিক ১৩৭৫ সংখ্যায়। পাখির পরিচয়: মৌচুষী। প্রথম লাইন শেষ শব্দ—আছে মধুকুয়া, হবে মধুচুয়া। অষ্টম লাইন নবম শব্দ—আছে চুন হবে চুল।

রেডিও, টেলিফোন ও মহাকাশ

অমিতানন্দ দাশ

বছর পঞ্চাশের মধ্যেই হয়তো বর্তমান জেট প্লেনের মতো মহাকাশযানে ইয়োরোপ-আমেরিকা যাওয়া সম্ভব হবে। তা সত্ত্বেও তোমাদের অধিকাংশেরই মহাকাশ যাত্রার সুযোগ নাও মিলতে পারে; তবে ১৯৭০ থেকে শুরু করে ভারতবর্ষ থেকে কেউ বিদেশে ফোন করলেই, ফোনের কথাবার্তা মহাকাশ দিয়ে যাবে। (কথা শুনে অবশ্য তা বুঝবার কোনো উপায় থাকবে না!) এর মধ্যেই এ্যাটলান্টিক মহাসাগরের উপরে অবস্থিত একটি কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহার করে ইয়োরোপ থেকে আমেরিকার টেলিফোন সংযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে।

তবে কৃত্রিম উপগ্রহের আগে দেখা যাক শব্দ ও রেডিও-তরঙ্গের প্রকৃতি কি। শব্দ-তরঙ্গ এবং তড়িৎ-চুম্বকীয় (electromagnetic) রেডিও তরঙ্গ দুইই, জলে ঢিল ছুঁড়লে যে রকম ঢেউ হয়, সে রকম ভাবে উৎস থেকে চারদিকে (উপরের দিকেও বটে) ছড়িয়ে পড়ে। রেডিও স্টেশনের এরিয়ালে বিশেষ ধরনের তড়িৎ প্রবাহের দরুন এই তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে এবং তরঙ্গ যখন বাড়ির রেডিওর এরিয়াল (ট্রান্‌জিস্টার রেডিওর ভিতরের এরিয়াল) পার হয়ে যায় তখন তাতে তড়িৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়, এবং তাইতেই রেডিও স্টেশনের সংকেত ধরা পড়ে।

জলে ঢেউয়ের বেলায় পাশাপাশি দুটি ঢেউএর মাথার মধ্যের দূরত্বকে বলে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (wavelength)। রেডিওর ডায়াল-প্লেটে দেখবে বিভিন্ন স্টেশনের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য লেখা থাকে—১৬ মি., ৩১ মি., ৫০০ মি., ইত্যাদি। রেডিও তরঙ্গ, আলো ও আর সব তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের মতো সেকেণ্ডে ৩০০,০০০ কি. মি. বেগে যায়। সুতরাং কোনো রেডিও স্টেশন যদি ৫০০ মিটার দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ ব্যবহার করে তবে তার প্রেরকযন্ত্রের এরিয়াল থেকে সেকেণ্ডে ৬০০,০০০টি ঢেউ বেরোবে। রেডিও স্টেশনটির স্পন্দনসংখ্যা (frequency) বলা হয় সেকেণ্ডে ৬০০,০০০ সাইক্‌ল্ বা ৮০০ কিলোসাইক্‌ল্ (kilo-cycles per second)—রেডিওর ডায়ালপ্লেটে দেখবে ৫০০ মিটারের উল্টোদিকে লেখা আছে সেকেণ্ডে ৬০০ কিলোসাইক্‌ল্ (600 k/cs)। যে কোনো তরঙ্গের বেলাতেই :

(তরঙ্গের গতিবেগ) = (স্পন্দনসংখ্যা) × (তরঙ্গ দৈর্ঘ্য)

শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি হয় শব্দের উৎসের কাঁপার ফলে বাতাসের চাপ বাড়া-কমায়। যে শব্দ আমরা

শুনতে পাই তার স্পন্দনসংখ্যা সেকেণ্ডে ২০ থেকে ২০,০০০ সাইক্‌ল্। মোটা গলার আওয়াজের স্পন্দনসংখ্যা কম, সরু গলার আওয়াজের স্পন্দনসংখ্যা বেশী; 'সা-রে-গা-মা'র প্রথম 'সা'র স্পন্দন-সংখ্যা সেকেণ্ডে ২৫৬ সাইক্‌ল্, দ্বিতীয় 'সা'র ৫১২। মাইক্রোফোনের সামনে আওয়াজ হলে বাতাসের চাপ বাড়া-কমার সঙ্গে সঙ্গে মাইক্রোফোনে বিদ্যুতের প্রবাহও বাড়ে-কমে। এর ফলে শব্দের সমান স্পন্দন-সংখ্যা বিশিষ্ট বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়। গান-বাজনায় মোটামুটি সেকেণ্ডে ৫০ থেকে ১০,০০০ সাইক্‌ল্ স্পন্দনসংখ্যা-বিশিষ্ট শব্দ ভালো শুনতে পাওয়া চাই। অনেক সস্তা রেডিওতে এটা সম্ভব হয় না বলেই কথা ও গান কিছুটা বিকৃত শোনায়।

ধরা যাক কোনো রেডিও স্টেশন ৫০০ মিটারের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বা সেকেণ্ডে ৬০০ কিলোসাইক্‌ল্ স্পন্দনসংখ্যা বিশিষ্ট রেডিওতরঙ্গের মাধ্যমে সেকেণ্ডে ১০ কিলোসাইক্‌ল্ অবধি স্পন্দনসংখ্যার শব্দ রেডিও সংকেতের মাধ্যমে পাঠাতে চায়। হিসাব করে দেখানো যায় যে স্টেশনটি যে সংকেত পাঠাবে তার স্পন্দনসংখ্যার পরিসর হবে সেকেণ্ডে ৬০০—১০ = ৫৯০ কিলোসাইক্‌ল্ থেকে সেকেণ্ডে ৬০০ + ১০ = ৬১০ কিলোসাইক্‌ল্; বা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিসর ৪৯২ থেকে ৫০৮ মি.। রেডিওতে টিউনিং করলেই বেশ বোঝা যায় যে প্রত্যেক রেডিও স্টেশনের স্পন্দনসংখ্যা এরকম একটি বিস্তৃত এলাকা (bandwidth) জুড়ে থাকে। অবশ্য বেশী জোরালো স্টেশনের বেলা (ধর কলকাতার কাছাকাছি বসে কলকাতা "ক" ধরলে) অন্যান্য কারণে এই এলাকা আরো বেড়ে যায়। সুতরাং দুটি রেডিও স্টেশনের স্পন্দনসংখ্যার মধ্যে বেশ কিছুটা ব্যবধান না থাকলে রেডিও খুললে দুটি স্টেশন একসঙ্গে শোনা যায়। সুতরাং যে কোন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পরিসরের মধ্যে (ধর মিডিয়াম ওয়েভ ব্যাণ্ডে) সর্বাধিক কতগুলি স্টেশন কাজ করতে পারবে তার নির্দিষ্ট সীমা আছে। আবার রেডিও তরঙ্গ আলোর মতই সর্বদা সোজা পথে যায়, এবং পৃথিবী গোল হওয়ার দরুন শুধুমাত্র যে তরঙ্গগুলি বায়ুমণ্ডলের উপরের অংশের আয়নমণ্ডলে (Ionosphere)* প্রতিফলিত হয় এর দ্বারাই দূর পাল্লার রেডিও সংযোগ সম্ভব। শুধুমাত্র ১০ মিটার থেকে ৬০০ মিটার দৈর্ঘ্যের তরঙ্গই আয়নমণ্ডল থেকে ভালোভাবে প্রতিফলিত হয়।

আজকাল বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রচুর টেলিফোন কল হয়। এর অধিকাংশই রেডিওর মাধ্যমে পাঠানো হয়—সাধারণ রেডিও স্টেশনের সংকেতের মতোই। রেডিরও শর্ট ওয়েভে ১৬,১৯,২৫ মিটার ইত্যাদি ব্যাণ্ডের মধ্যে যে ফাঁকা এলাকাগুলি আছে, সেই সব তরঙ্গদৈর্ঘ্যেই এই রেডিও-টেলিফোন কাজ করে। সুতরাং সব রেডিও স্টেশন এবং রেডিও-টেলিফোনকেই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এক সীমাবদ্ধ পরিসরের মধ্যে কাজ করতে হয়। বছর বছর আন্তর্দেশীয় টেলিফোনে কথাবার্তার সংখ্যা যেমন হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছিল যে হয়তো দশ বারো বছরের মধ্যেই রেডিও-টেলিফোন ব্যবস্থা প্রায় অচল হয়ে পড়বে, কারণ প্রত্যেক দুটি সহরের মধ্যেই রেডিও-টেলিফোনকে আলাদা তরঙ্গদৈর্ঘ্যে

---

* আয়নমণ্ডল মাটি থেকে ৫০ থেকে ৪০০ কি. মি. উঁচুতে অবস্থিত এক অঞ্চল যার একটি ধর্ম হলো কোন কোন রেডিও তরঙ্গ প্রতিফলিত করা। গত চৈত্র মাসের সন্দেশে আরো বিস্তৃতভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

কাজ করতে হয়। লণ্ডনে ফোন করতে গিয়ে নিউ ইয়র্কের সঙ্গে ক্রস্ কানেকশ্যান হলে তো আর চলবে না!

আবার রেডিওতে দশ-বিশ হাজার কিলোমিটার সংকেত পাঠানোও বেশ মুস্কিলের ব্যাপার। ভালো রেডিওতে দিনের বেলা ইংল্যাণ্ড অষ্ট্রেলিয়ার মতো দূরের রেডিও স্টেশন ধরার চেষ্টা করলেই বোঝা যায় যে শব্দ খুবই আস্তে আসে, বিকৃত শোনায় এবং মাঝে মাঝে একেবারেই শোনা যায় না। এমন হয় প্রধানতঃ আয়নমণ্ডল থেকে খারাপ প্রতিফলনের জন্য।

ঠিক এই আন্তর্দেশীয় টেলিফোন সংকটের সময়েই কৃত্রিম উপগ্রহ এক নতুন পথ দেখালো। ১০০ মিটার দৈর্ঘ্যের রেডিও তরঙ্গের কাছে আয়নমণ্ডল ঠিক আয়নার মতো, কিন্তু ১০ মিটারের কম দৈর্ঘ্যের রেডিও তরঙ্গ অনায়াসে আয়নমণ্ডল ভেদ করে চলে যায় এবং কৃত্রিম উপগ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা এ ধরনের তরঙ্গের সাহায্যেই করা হয়। ১৯৬২ সালে টেলষ্টার (Telstar) উপগ্রহ মারফৎ প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে ইয়োরোপ আর আমেরিকার মধ্যে কিছু টেলিফোন সংযোগ করা হয়। এটুকু প্রমাণ হয় যে টেলিফোন ব্যবহারকারীরা টেরই পাবে না যে তাদের কথাবার্তা মহাকাশ ঘুরে যাচ্ছে।

সাধারণতঃ একটি কৃত্রিম উপগ্রহ অল্প কয়েক ঘণ্টায় পৃথিবীকে পাক খায়। তার মারফৎ যদি এক দেশ থেকে অন্য দেশে রেডিও-টেলিফোন ব্যবস্থা করতে হয় তবে মুস্কিল হল যে শুধুমাত্র যখন উপগ্রহটি দুটি দেশের মাঝামাঝি যায়গায় থাকবে তখনই, হয়তো দিনে শুধু এক ঘণ্টা, টেলিফোন ব্যবস্থা কার্যকরী থাকবে। ১৯৫৭র স্পুটনিকের মতো নীচু (ধর, ২০০ কি. মি.) উচ্চতার কক্ষের কৃত্রিম উপগ্রহ ১½ ঘণ্টায় পৃথিবীকে পাক খায় এবং এ কাজের জন্য একেবারেই উপযোগী নয়। ৬০০০ কি. মি. উচ্চতার 'টেলস্টার' ৪ ঘণ্টায় এক পাক খায় এবং হিসাব করে দেখা গেছে যে এরকম ৩০।৪০টি উপগ্রহ বিভিন্ন কক্ষে ছাড়লে সর্বদাই যে কোনো দেশ আশেপাশের সব দেশের সঙ্গে টেলিফোন ব্যবস্থা চালাতে পারবে। কিন্তু সব চেয়ে সুবিধার হয় যদি কোনো উপগ্রহকে আকাশের এক অংশে ২৪ ঘণ্টা ঠায় দাঁড় করিয়ে রাখা যায়। এরও উপায় আছে—কারণ নীচু কক্ষের উপগ্রহ ১½ ঘণ্টায় পৃথিবীকে পাক খায়, আর চাঁদ পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ৪ লাখ কি. মি. দূরে বসে ঘোরে ২৮ দিনে একবার। সুতরাং এ দুটির মাঝামাঝি, ৩৬,০০০ কি. মি. উচ্চতায় অবস্থিত এক উপগ্রহ পৃথিবীর চার দিকে ঘুরবে ঠিক ২৪ ঘণ্টায় একবার। এরকম একটি উপগ্রহ যদি বিষুবরেখার উপরে গোলাকার এক কক্ষে থাকে, তবে পৃথিবী ও উপগ্রহ দুটিই সমান ভাবে ঠিক ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরবে, এবং এদের মধ্যে কোনো আপেক্ষিক গতি না থাকায়, উপগ্রহটি সর্বদাই পৃথিবীর একই অংশের উপর থাকবে। এর ফলে, পৃথিবী থেকে দেখে মনে হবে যে উপগ্রহটি ঠিক পৃথিবীর উপরে আকাশে স্থির হয়ে রয়েছে; দিনে রাতে এর সূর্য, চাঁদ, তারার মতো ওঠা-ডোবার বালাই নেই।

টেলস্টারের সফলতা দেখে ৬২টি দেশ মিলে INTELSAT (International Telecommunication Satellite) নামক সংগঠন তৈরী করে, যার কাজ হবে কৃত্রিম উপগ্রহ মারফৎ বিভিন্ন দেশের

মধ্যে সংযোগ-ব্যবস্থা গড়ে তোলা ; যদিও দুর্ভাগ্যবশতঃ রাশিয়া চীন ইত্যাদি কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দেশ এর থেকে বাদ পড়ে যায়। কমস্যাটের প্রথম কার্যক্রম হলো এ্যাটলান্টিক প্যাসিফিক ও ভারত মহাসাগরের উপরে তিনটি ২৪ ঘণ্টা কক্ষের ইন্টেলস্যাট-৩ উপগ্রহ নিক্ষেপ করা। এর প্রথম দুটি এর মধ্যেই কাজে লেগে গেছে, এবং তৃতীয়টি এখন তৈরী হচ্ছে ও দু-বছরের মধ্যেই ছাড়া হবে। এই উপগ্রহটি বোম্বাই থেকে প্রায় ৩০০০ কি. মি. দক্ষিণ পশ্চিমে ভারত মহাসাগরের এক অঞ্চলের ৩৬,০০০ কি. মি. উপরে থাকবে। এতো উঁচু থেকে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক, বা ইংল্যাণ্ড থেকে জাপান এবং উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যান্ত দেখা যাবে। এই উপগ্রহের সঙ্গে সংযোগ করার জন্য ১৮টি বিশেষ ধরনের এরিয়াল ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি নির্মাণরত রয়েছে। এগুলি যে দেশগুলিতে রয়েছে তা হলো—ভারত (পুনার কাছে), পাকিস্থান (পূর্ব ও পশ্চিম), সিংহল, মালয়, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া, হংকং, ফিলিপাইন্‌স, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, ইরান, ইরাক, কেনিয়া, ইটালী, জার্মানী, স্পেন ও ইংল্যাণ্ড। ভারত থেকে ধর জাপানে টেলিফোন করতে গেলে পুনার এরিয়াল থেকে এক বেতার সংকেত পাঠানো হবে। উপগ্রহ থেকে এই সংকেত আরো জোরালো করে সব দেশে পাঠিয়ে দেবে। জাপানের এরিয়ালের গ্রাহকযন্ত্র ফোন কলটি জাপানের বুঝতে পেরে তাকে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে পাঠাবে। সংকেতটি আমেরিকার হলে ইংল্যাণ্ড বা জাপান থেকে তাকে আবার দ্বিতীয়বারের মতো আরেকটি উপগ্রহ মারফৎ রিলে করে দেবে।

কলকাতার টেলিফোন ভবনের মাথায় একটি নতুন যন্ত্র বসেছে দেখেছো বা শুনেছো বোধ হয়—এতে একটা টাওয়ারের গায়ে তিনটে ২ মিটার ব্যাসের বাটির মতো জিনিস লাগানো আছে। ওগুলি হলো মাইক্রোওয়েভ (এক ফুটের চেয়ে ছোটো তরঙ্গদৈর্ঘ্য) রেডিওর এরিয়াল। এ ধরনের তরঙ্গ আয়নমণ্ডলে প্রতিফলিত হয় না, তবে ওই বাটির মতো এরিয়াল দিয়ে এই তরঙ্গকে টর্চ বা গাড়ির হেডলাইটের মতো ইচ্ছামতো একটা বিশেষ দিকে পাঠানো যায়। টেলিফোন ভবনের মাথার এরিয়াল গুলি একটি খড়্গপুরের দিকে এবং অপর দুটি আসানসোলের দিকে ঘোরানো আছে। এগুলি দিয়ে ৭২ সেণ্টিমিটার দৈর্ঘ্যের মাইক্রোওয়েভ বেতার তরঙ্গ ব্যবহার করে, বিশেষ উপায়ে একসঙ্গে ৯৬০টি টেলিফোন কথাবার্তা পাঠানো যায়। এখন খড়্গপুর হয়ে মাদ্রাজ, জামসেদপুর, বোম্বাই, মাদ্রাজ বা আসানসোল হয়ে আসাম, বিহার, দিল্লী ইত্যাদির যে কোনো ট্রাঙ্ক কল এই মাইক্রোওয়েভ মারফৎ যায়। ক্রমশঃ মাইক্রোওয়েভ ও অন্য নানান উপায়ে ভারতের সমস্ত টেলিফোন এক্সচেঞ্জ জুড়ে এমন এক ব্যবস্থা করা হচ্ছে যে আর ট্রাঙ্ক কলের দরকার পড়বে না—সোজাসুজি নম্বর ডায়াল করে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত, ফোন করা সম্ভব হবে। ইয়োরোপ-আমেরিকায় এধরনের ব্যবস্থা অল্প কয়েক বছর হ'লো চালু হয়েছে।

পুনার কাছে উপগ্রহের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য যে এরিয়ালটি তৈরী হচ্ছে তা এই টেলিফোন ভবনের মাথার এরিয়ালেরই এক বড় সংস্করণ—এর ব্যাস ২ মিটারের বদলে ৩০ মিটার। এটি সর্বদাই ভারত মহাসাগরের উপরের ইন্টেলস্যাট—৩ উপগ্রহের দিকে ফিরে থাকবে এবং বোম্বাই মারফৎ

মাইক্রোওয়েভে ভারতীয় টেলিফোন-ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকবে। সুতরাং ভারতের যে কোনো টেলিফোনেই দিনের যে কোনো সময়ে উপগ্রহ মারফৎ বিদেশে ফোন করা যাবে। আরো মনে হয় যে আন্তর্দেশীয় টেলিফোন সংযোগের চাহিদা যে হারে বাড়ছে তাতে ৭।৮ বছরে আরো বড় তিনটি ইণ্টেলস্যাট—৪ উপগ্রহ ছাড়া হবে। হিসাব করে দেখা গেছে যে, সে সময়ে উপগ্রহ মারফৎ টেলিফোন করার খরচ বর্তমানে সাধারণ রেডিও-টেলিফোনে বিদেশে ফোন করার খরচের প্রায় অর্ধেক হবে।

টেলিফোন ছাড়াও একই ধরনের উপগ্রহের মারফৎ টেলিভিশনের ছবিও পাঠানো সম্ভব। টেলিভিশন ষ্টেশনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য হয় ৩০ সে. মি. থেকে ৩ মি. পর্যন্ত—সুতরাং টেলিভিশনের ঢেউ আয়ন-মণ্ডলে প্রতিফলিত হয় না। এজন্য টেলিভিশন স্টেশনের এরিয়াল খুব উঁচুতে বসানো হয়—সাধারণতঃ ১০০ মিটার, তবে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু ছুটি টাওয়ার, একটি ৪৫০ মিটার উঁচু মস্কোতে এবং আর একটি প্রায় ৪০০ মিটার উঁচু টোকিওতে, টেলিভিশানের এরিয়ালের জন্যই তৈরী। এই এরিয়ালের উপর থেকে চক্রবাল যতদূর, সেই অঞ্চলের মধ্যেই খালি টেলিভিশন ষ্টেশন ধরা যায়। দিল্লী ও ঢাকায় টেলিভিশন আছে বলে কলিকাতার টেলিভিশন সেট কিনে তো কোনো লাভ নেই, এমনকি কলকাতায় দু-তিন বছরের মধ্যে টেলিভিশন বসলেও কল্যানীতে সে ষ্টেশন ধরা নাও যেতে পারে।

বর্তমানে টেলিভিশনে বিদেশের খবরের ছবি সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায় না—ছবির ফিল্ম প্লেনে আসতে কয়েকদিন লেগে যায়। কিন্তু উপগ্রহ মারফৎ সরাসরি এক দেশ থেকে অপরদেশে টেলিভিশনের ছবি পাঠানো শুরু হলে কয়েক বছরের মধ্যেই ইংল্যাণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেট খেলা হলে বা মিউনিখে অলিম্পিক (১৯৭৬) হলে কলকাতা-দিল্লীতে বসে সঙ্গে সঙ্গেই টেলিভিশনে তা দেখা যাবে।

চাঁদের হাট

অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চাঁদনি রাতে মাদুর পেতে
দাওয়ায় বসে হল্লা খুব,
ঠাকুমা বলে ঃ গল্প যদি
শুনতে চাস্-তো কর্-না চুপ ;

গল্প-গাথা শুনতে বসে
পালিয়ে গেল চোখের ঘুম,
সাতটা মাথা হুমড়ি খেয়ে
গল্প গেলার সে কি ধুম !

চাঁদের আলোয় ঝলোমলো
উপ্‌চে পড়ে উঠোন-মাঠ…
আকাশে চাঁদ, ঘরেও চাঁদ—
চাঁদের মেলা, চাঁদের হাট !!

(১) **মহম্মদ কামাল হোসেন**, ১৩৬০, বয়স ১৩

তুমি যে নকল করা গল্পের কথা লিখেছ, সে বিষয়ে আরো কেউ কেউ লিখেছে এবং এই চিঠিপত্রের বিভাগেই তার উল্লেখ-ও করা হয়েছে। একটা কথা বলে রাখা উচিত যে অনেক গল্পই নকল গল্প, অর্থাৎ অন্যের লেখা প্রবন্ধ বা গল্প থেকে মালমসলা নিয়ে রচিত। এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই যে বিশেষ করে গল্প বা কবিতার ক্ষেত্রে মূল রচনাটির উল্লেখ থাকা উচিত। তা যদি, না থাকে, তবু সম্পাদকের পক্ষে সব সময় সন্দেহ প্রকাশ করা উচিত হয় কি? অনেক সময় টের-ও পাই না। সব সময় আশা করি আমাদের গ্রাহকরা আমাদের প্রতারণা করবে না।

তারপর তোমার গল্পের বিষয়-বস্তু সত্যি হলেও ব্যাপক নয়। সাম্প্রদায়িকতা অতি মন্দ জিনিস সন্দেহ নেই। কিন্তু তাকে বিষয়বস্তু করে কিছু লিখতে হলে ব্যক্তিগত ভাব বাদ দিয়ে লিখতে হয়, ভাই। আর এ ও জেনে রেখো যে আমাদের কাছে সবাই সমান আদরের।

(২) **ভাস্বতী দত্ত** ২৬৮৬, বয়স ১২½

তুমি যাদের নাম করেছ তাদের সকলেরি লেখা তো আমরা মাঝে মাঝেই প্রকাশ করি। ১ নং গ্রাহকের নাম জেনে কি হবে? একদল গ্রাহক একসঙ্গে হয়েছিল। তারা এখন বড় হয়ে গেছে।

(৩) **পবিত্রকুমার বসু**, ২০৫৯

বয়স না দিলে কোনো চিঠির উত্তর দেওয়া হয় না। সতেরো পূর্ণ হয়ে গেলেও হয় না।

(৪) **গৌতমকুমার বেরা**, ২১১৬, বয়স ১৫

রকেট সম্পর্কে প্রবন্ধ ভালো হলেই ছাপব। যদি একটা প্রবন্ধে বক্তব্য শেষ না হয়, তা হলে ভাগ করে দু তিনটে প্রবন্ধ লেখ না কেন? এমন করে লিখো যাতে প্রত্যেকটি ভাগ স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়। একবারে দিতে পারলেই ভালো হয়, না হয় একটু লম্বাই হল। তবে খুব ভালো হওয়া চাই। খুব ভালো হলে সাধারণ বিভাগে দেওয়া যায়। কিন্তু বইয়ের ভাষায় না লিখে চলিত ভাষায় সহজ করে লিখো।

(৫) **দেবাশিস মুখোপাধ্যায়** ১৫৬৭, বয়স ১২

দেখ তোমার সব প্রশ্নের একে একে উত্তর দিতে চেষ্টা করছি।

(১) হাজার প্রশ্ন আসে, তার সবগুলির উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। যেগুলি মনে হয় অন্য পাঠকদেরও ভালো লাগবে আর তারা শিক্ষণীয় কিছু, কিছু মজা পাবে, সেগুলিরই উত্তর দেওয়া হয়। মজার কিছু থাকলেই উত্তর দিই। (২) হাতপাকাবার আসরের জায়গা কম, তারই মধ্যে যত জনকে পারি স্থান দেবার চেষ্টা করি। তাই একজনের জন্য প্রত্যেক মাসে জায়গা রাখা যায় না। তবে অসাধারণ লেখা কেউ যদি পাঠায়, তা-ও করব।

(৩) তুমি কি নিজের নাম ছাপাবার জন্যেই নকল লেখার বিরোধিতা করেছিলে? তার অপরাধের জন্যে লেখককে সাবধান করা হয় নি কি করে জানলে? তুমি ছাড়াও অনেকে নকল লক্ষ্য করে চিঠি দিয়েছিল। (৪) তোমাদের মতামত আরো পাকুক তারপর তো তাদের মূল্য বেশি হবে। এখনো তো চিঠিপত্র বিভাগে মতামত জানাতে পার। (৫) কনান ডয়লের আরো অনুবাদ শীঘ্রই ছাপার ইচ্ছা আছে। (৬) এবার আরো ধারাবাহিক গল্প বেরুচ্ছে। (৭) ভালো লেখা পাঠালে সাধারণ বিভাগের জন্যে বিবেচ্য হবে নিশ্চয়। এবার খুসি হয়েছ?

(৬) **জয়ন্ত রায়**, ২০৫৩, বয়স ১৬

রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের লেখা তাঁদের প্রকাশিত বই থেকে পড়াই ভালো।

উপেন্দ্রকিশোরকে তাঁর এক দূর সম্পর্কের কাকা পোষ্য নিয়েছিলেন। তাঁদের পদবী হল রায়-চৌধুরী। উপেন্দ্রকিশোর তাই রায়চৌধুরী লিখতেন। তাঁদের নিজেদের পদবী শুধু রায়। উপেন্দ্র-কিশোরের তিন ছেলে সুকুমার, সুবিনয় ও সুবিমল। এঁরা সকলেই রায় নামে পরিচিত। সত্যজিৎ ও তাই। জাদুকরের নাম শ্রীপ্রতুলচন্দ্র সরকার। তাঁর ভাইয়ের নাম শ্রীঅতুলচন্দ্র সরকার। এঁর লেখা অনেক সময় সন্দেশে পড়েছ।

(৭) **প্রশান্ত রায়**, ২০৯৭, বয়স ১৫

সম্পাদকদের লেখা ভালো লাগছে না এ তো বড় হতাশার কথা, ভাই!! ছোটদের সব ভালো লেখকদেরই লেখা আমরা ছেপে থাকি, তার-ও কিছুই কি ভালো লাগে না? শুধু অনুবাদ ছাপতে হবে? যে সব অনুবাদের নাম করেছ, তার মধ্যে তুষার-মানবের গল্পের উল্লেখ করেছ। ওটা কিন্তু একটা মৌলিক গল্প, অনুবাদ নয়। উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমার বহুদিন স্বর্গে গেছেন, তাঁদের নিত্য নতুন গল্প কোথায় পাব, ভাই? তবু প্রায়ই ছেপে থাকি পুনর্মুদ্রণরূপে। ছোটদের জন্যেও কিছু কিছু দিতে হয় যে, ৬।৭ বছরের গ্রাহক-ও অনেক আছে। তার চেয়ে-ও ছোটদের জন্যে একটা পাতা থাকে। এতে সন্দেশের সাহিত্যিক মান কমে যায় বুঝি? আগে বয়সটা বাড়ুক, তখন দেখবে 'মান' সম্বন্ধে অন্যরকম মনে হচ্ছে। প্রকৃতিপড়ুয়ার দপ্তরে যোগ দিতে হলে জীবন সরদারকে চিঠি দিও, আমাদের ঠিকানায়। গ্রাহক সংখ্যা ও বয়স দিও।

(৮) **ঐ লীলারায় ৺অনিলরায়ের স্ত্রী,** নামকরা দেশসেবিকা।

তোমাদের সম্পাদিকার নাম লীলা মজুমদার। অবিশ্যি বিয়ের আগে তাঁর নাম ছিল লীলা রায়। তবে সে আজ ৩৫ বছর আগের কথা। আরেক লীলা রায় ও আছেন। কবি অন্নদাশঙ্কর রায়ের স্ত্রী। তিনি অ্যামেরিকান মহিলা হয়েও সুন্দর বাংলা লেখেন। সন্দেশের প্রথম সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোর, তারপর তাঁর বড় ছেলে সুকুমার, তারপর সুকুমারের মেজ ভাই সুবিনয়। তারপর অনেক বছর সন্দেশ বন্ধ ছিল। সুকুমারের ছেলে সত্যজিৎ পত্রিকাটিকে নতুন করে প্রকাশ করেন। নতুন সন্দেশের প্রথম সম্পাদক ছিলেন সত্যজিৎ রায় ও কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তারপর থেকে লীলা মজুমদার ও সত্যজিৎ রায় যুগ্ম-সম্পাদকের কাজ করছেন। এঁরা পিসি-ভাইপো।

(৯) **আশিস রহমান,** ১৩১০, বয়স ১৪

আরেকটু বড় কাগজে এঁকে পাঠিও, ভাই।

(১০) **পূরবী চক্রবর্তী, ১৩ ও অরুণাভ মুখোপাধ্যায়** ৭, গ্রাহক সংখ্যা ৩৪০

এই যে দুজনার-ই নাম ঢুকিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু একটাই চাঁদা দেবে ও একটাই বই পাবে ভাই। আলাদা নামে চিঠিপত্র বা লেখা বা আঁকা পাঠাতে পারবে ও প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে।

(১১) **অমিতাভ পাল** ১২০২, বয়স না দিলে কি হয় জানই তো।

(১২) **অলোককৃষ্ণ সেন,** নতুন গ্রাহক, বয়স ১৫

পত্রবন্ধু চাই। শখ :—গাছের পাতা সংগ্রহ করা, বই পড়া, বিজ্ঞান চর্চা, গল্প ও কবিতা লেখা।

প্রতিযোগিতার ফলাফল

বাঃ! বাঃ! চমৎকার!! তোমরা দেখি বড্ড বেশি চালাক হয়ে পড়েছ!!!

শারদীয়া সংখ্যার নতুন প্রতিযোগিতার ২-০৭ টা সঠিক উত্তর পাওয়া গেছে!!!!

প্রতিযোগিতার সর্তগুলো মনে আছে ত? আমরা সব কয়টি উত্তর একটা বাক্সের মধ্যে না খুলে রেখে দিয়েছিলাম। নভেম্বর মাসের প্রথমে একটা বড় থলির মধ্যে ভরে সেগুলি খুব ভাল করে মিশিয়ে দেওয়া হল। তার পরে, থলির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে এক একটা করে উত্তর বার করা হল। ওমা, সবই দেখি সঠিক উত্তর!

যাই হোক, সর্ত ত আগেই ঠিক করা ছিল, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় যাদের নাম উঠেছিল তাদের যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার দেওয়া হবে। কিন্তু যারা ঠিক উত্তর পাঠিয়েছিল তারা সবাই আমাদের অভিনন্দন জেনো।

১। মনামী ও অনামী রায়—২১৯৪—প্রথম পুরস্কার ১৫৲

২। বাঁশরী, মৌসুমী ও বর্ণালী চক্রবর্তী—১২১—দ্বিতীয় পুরস্কার ১০৲

৩। কস্তুরী চৌধুরী—১৫২০—তৃতীয় পুরস্কার—৫৲

(উত্তর দেবার শেষ দিন ১৫ই ডিসেম্বর)

(১)

সূর্যের প্রসাদে আমি সবা সাথে ঘুরি,
সারাদিন কত রূপে কত লুকোচুরি।
কখনও দখিণে বামে, কভু আগে পিছে,
বিনয়ে লুটাই সদা চরণের নীচে।
তপন পশ্চিমে যায়, আমি যাই পূবে,
আমিও লুকায়ে পড়ি সে যখন ডুবে!

(২)

চারু আর কানাই পাঁচ টাকা বাজি রেখে দৌড়াবে ঠিক করেছে।

হিসেব করে দেখা গেল যে চারু যদি হারে তাহলে তার আর কানাইএর সমান টাকা থাকবে। কিন্তু কানাই যদি হারে তাহলে চারুর টাকা হবে কানাইএর তিন গুণ। বল ত, এখন তাদের কার কাছে কত টাকা আছে?

(৩)

মাস্টারমশাই স্কুল ছেড়ে চলে যাবেন তাই তাঁর কুড়িটি ছাত্র তাঁকে এমন একটা জিনিস বিদায়-উপহার দিতে চায় যেটা দেখলেই তাঁর তাদের প্রত্যেকের নাম মনে পড়ে যাবে। তাদের প্রত্যেকেরই নাম তিন অক্ষরের। অনেক ভেবে তারা এমন একটা বালাপোষ তৈরি করাল, যার এক পিঠে কুড়িটি খোপ কাটা এবং খোপে খোপে কতগুলি অক্ষর লেখা আছে (ছবিতে দেখ)। উপর নিচ, সামনে পিছন অথবা কোণাকুণি লাগালাগি খোপের তিনটি অক্ষর নিয়ে এক একজনের নাম পাওয়া যায়। এক ঘর বাদ দিয়ে গেলে চলবে না। তবে একই অক্ষর এক নামে অথবা ভিন্ন নামে একাধিকবার ব্যবহার করা চলবে। নামগুলি কি ভাবে সাজান থাকতে পারে তার একটা উদাহরণ দেখান হল—ছবিতে দেখ সমর নামটি কি ভাবে লেখা হয়েছে। উপর থেকে চতুর্থ লাইনের বাঁ দিক থেকে তৃতীয় অক্ষর 'স' তার ঠিক বাঁ পাশে 'ম' আবার ম'য়ের ডানদিকে কোনাকুনি নিচে 'র'। একটি ছেলের নাম সমর। এই ভাবে বাকি ১৯টি ছেলের কি নাম হতে পারে বল ত?

ন্ত	স	জ	ণী
য়	ন	ধ	র
বি	জ	অ	ম
ক	ম	স	নী
পি	ল	র	হা

কার্ত্তিক মাসের ধাঁধার উত্তর ঃ—

(১)

রাম মোহন

(২)

একজন মহিলা তাঁর দুই মেয়ে এবং প্রত্যেক মেয়ের দুটি করে মেয়ে—মোট এই সাতজনই ছিলেন, সুতরাং সাতটা চেয়ারে বসতে তাঁদের কোন অসুবিধা হয় নি। (কেউ কেউ মহিলাকে 'ঠাকুমা' বলেছ কেন ? যদি তাঁর দুই মেয়ে এবং মেয়েদের দুটি করে মেয়ে থাকে, তাহলে তিনি ত নাতনীদের 'দিদিমা' হবেন—তাই না ?)

(৩)

পীতাম্বর দুইভাবে টাকাটা বার করতে পারে দুটোকেই সঠিক উত্তর ধরা হয়েছে ঃ—

(ক) প্রথমে সে দুই পাল্লায় দুটো দুটো করে গোলা নিয়ে ওজন করল, দুটো গোলা মাটিতে রইল।

যদি দুটো পাল্লাই সমান হয়, তখন যে গোলা দুটো মাটিতে ছিল, সেই দুটো দুদিকে নিয়ে ওজন করতে হবে, এবং যেটা ভারি সেটাতে টাকা আছে বোঝা যাবে। প্রথমেই যদি পাল্লার একদিক ভারি হয়। তাহলে ভারি দিকের গোলা দুটো নিয়ে ওজন করলে, তার মধ্যে কোনটা ভারি, অর্থাৎ কার মধ্যে টাকা আছে বেরিয়ে পড়বে।

(খ) দ্বিতীয় পদ্ধতিতে প্রথমে তিনটে করে গোলা দুদিকে নিয়ে ওজন করতে হবে। যে পাল্লা ভারি হবে, দ্বিতীয় বারে তার দুটো গোলা পাল্লার দুদিকে বসিয়ে তৃতীয় গোলাটা মাটিতে রাখতে হবে। এবার যদি এক পাল্লা ভারি হয় সেই গোলাতেই টাকা পাওয়া যাবে। আর যদি দুই পাল্লাই সমান হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে মাটিতে রাখা গোলাটায় টাকা রয়েচে।

এই উত্তরটা প্রায় সবাই ঠিক বার করলেও অনেকেই বুঝিয়ে লিখতে পার নি।

উত্তর দাতাদের নাম

যাদের সব কয়টি উত্তর ঠিক হয়েছে ঃ—

৫৭ শাশ্বতী দত্ত, ৭১ সেঁজুতী ও শিবশঙ্কর চক্রবর্তী ১১৫ অর্পিতা, কিশলয় ও কিশোর চক্রবর্তী ১৮১ মিষ্টি ও বাসবেন্দু গুপ্ত, ১৫৮ রীণা ও রীতা গুপ্ত, ১৯২ অন্তরা ও যুথিকা সেন, ২৮৪ নূপুর ও মিঠু দাশগুপ্ত, ২৮৮ গোপা বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪৫১ রঞ্জনা লাহিড়ী ৬১৬ ভারতী মিত্র, ৬৮৩ চৈতালী সেন, ৭০৭ মন্দিরা দেব, ৮১৬ সুমন্ত্র দাশ, ৮৩৩ সুনীল ও প্রদীপ দে, ৮৩৮ সুপ্রতীক বাগচী ৮৯০ কারুবাকী ও বিপাশা দত্ত, ৮৯৪ তপন ঘোষ, ৯৬২ অঞ্জন ও কুমকুম ভট্টাচার্য ৯৮৩ জ্যোতির্ময় মজুমদার, ১২৩২ নন্দিনী দত্ত-মজুমদার, ১২৯২ রুদ্রনাথ ঘোষ দস্তিদার, ১৩১০ আশীষ রহমণ, ১৩৫৯ পার্থসারথী ও দেবরথী মুখার্জী, ১৩৯৪ বুলা দাশগুপ্ত, ১৪০১ মহাশ্বেতা গঙ্গোপাধ্যায় ১৪৪৫ পার্থপ্রতিম গুপ্ত ১৪৮১ উত্তম কুমার বটব্যাল, ১৫০১ তপন কুমার বসু, ১৫৩৬ বাপ্পাদিত্য দেব, ১৫৫২ সুপ্রতিম লাহিড়ী, ১৫৬৭ দেবাশীষ মুখার্জী ১৬৫৫ শৃণ্বন্তী পাল ১৬৫৯ রেজাউল কবীর ১৬৯৩ শ্যামল পাইন, ১৭২৮ গোপা রায়, ১৭৩১ রঞ্জন রায় ১৭৫০ সন্দীপ মুখার্জী, ১৭৯২ মলয়া পাল, ১৮০৫ দেবাশীষ রক্ষিত, ১৮১২ অমিতাভ মুখার্জী, ১৮৪০ অনুরাধা ও অদিতি ঘোষ, ১৮৬৩ সোনালী লাহিড়ী (পদ্যে উত্তর), ১৮৮৫ রীণা ও হেনা ভট্টাচার্য, ১৮৯৪ সুস্মিতা কাঞ্জিলাল, ১৯৩৮ লীনা মিত্র, ২০১৯ শুভ্রা বিশ্বাস, ২০৪৫ সৌমিত্র সেনগুপ্ত, ২০৫৭ কমলেশ দাশগুপ্ত, ২০৮২ দেবাশিস রায়, ২০৯৭ প্রসূন রায়, ২১১৬ গৌতম কুমার বেরা, ২১৪২ স্বর্ণাভ ব্যানার্জী, ২১৭০ অম্লান ভট্টাচার্য, ২১৭৩ সায়ন্তন গুপ্ত, ২১৭৪ শিবরঞ্জনী মাইতি, ২২১৫ শুভা মজুমদার, ২২১৬ মৈত্রেয়ী মুখার্জী, ২২১৭ প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২২২৪ শুভময় ও কল্যাণময় চট্টোপাধ্যায়, ২২২৫ শ্যামাপ্রসাদ দাশ, ২২৩৯ অনীতা চ্যাটার্জী, ২২৪৮ মিহিরকুমার, দেবকুমার ও শৈবালকুমার গুহ, ২২৬১ অরুন্ধতী ব্যানার্জী, ২২৯৪ সুনন্দন চক্রবর্তী, ২৩৫৭ অমিয় কুমার রায়, ২৩৬১ অঞ্জন ভট্টাচার্য, ২৪৯৯ দেবী প্রসাদ সিংহ, ২৫০০ বারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ২৫৪২ তন্ময় সেনগুপ্ত, ২৫৪৪ সান্ত্বনা রায় চৌধুরী, ২৫৪৭ প্রসেনজিৎ ও মৈত্রেয়ী বসু, ২৬৬৯ চয়ন সান্যাল ২৭২০ খুশনুদ গুলাম হাসনায়ন, ২৭৩৫ উৎপল ভট্টাচার্য, ২৭৪০ সোণালী বন্দ্যোপাধায়, ২৭৬১ ঋতা, মিতা ও ইন্দ্রাণী সেনগুপ্ত, ২৮৩৭ অর্পিতা রায় চৌধুরী, ২৮৭১ অমিতাভ রায় চৌধুরী, নন্দিতা, চিরাইল নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ।

যাদের দুইটি উত্তর ঠিক হয়েছে ঃ—

১০৪ উজ্জয়িনী, সুচরিতা, নবনীতা ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য, ১১৫৯ গায়ত্রী রায়, ১৩৬০ মহম্মদ কামাল হোসেন, ১৪৬০ কেয়া বসু, ১৭৩০ সুখেন্দু কুমার বাউর, ১৯০২ অভিজিৎ চৌধুরী, ২১০৮ সুব্রত ঘটক, ২০৮৪ ইন্দ্রাণী ও পলা সেনগুপ্ত, ২০৮৬ জয়শ্রী তরাত, ২৬৭৬ শুদ্ধেন্দু, সৌমেন্দু, শুভেন্দু ও দীপ্তি গঙ্গোপাধ্যায় ২৬৮৬ ভাস্বতা ও শাশ্বতী দত্ত, ১৮২৭ অণুতোষ ও অশোক চট্টোপাধ্যায়।

যাদের একটি উত্তর ঠিক হয়েছে ঃ—

৮৭১ শম্পা মুখার্জী, ২০৫৩ জয়ন্ত, তাপসী, কলিকা, মণিকা ও নরেশ রায়।

সবঠিক—দেরীতে পাওয়া ঃ—

৩২১ অজন্তা ও বন্দিতা ঘোষ, ১০২৯ সুপর্ণ চৌধুরী, ১৫৮৩ অঞ্জন চ্যাটার্জী, ২৪১০ ঋত্বিক সান্যাল।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আশা করি শেষ পর্যন্ত সকলেই শারদীয়া সংখ্যাটি পেয়ে গেছ।

পোস্টাল স্ট্রাইকের জন্য গ্রাহকদের সন্দেশ ঠিক সময়ে পৌঁছায়নি জেনে আমরা খুব দুঃখিত হয়েছি।

১৩৭৫এর শারদীয়া সংখ্যা ২০শে সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়েছিল। যারা বাড়তি পয়সা অথবা ডাকটিকিট যথাসময়ে পাঠিয়েছিল, তাদেরটা রেজিঃ ডাকে আর অন্যদের আণ্ডার সার্টিফিকেট অব্ পোষ্টিং ২১শে এবং ২৩শে সেপ্টেম্বর পাঠান হয়েছিল।

এবার আমরা এত বেশি সংখ্যক গ্রাহকের কাছ থেকে ঠিক সময়ে শারদীয় সন্দেশ না পাবার সন্দেশ পেয়েছি যে আলাদা করে প্রত্যেককে চিঠি লেখা সম্ভব নয়।

ম্যারাকট ডীপ : স্যর আর্থার কন্যান ডয়েল। (জ্যোতিরিন্দ্র মোহন জোয়ার্দার অণূদিত)

অষ্টম বর্ষ—নবম সংখ্যা পৌষ ১৩৭৫/জানুয়ারী ১৯

বিদেশবাসী নাতি আর নাতনীকে ঠাকুমার চিঠি
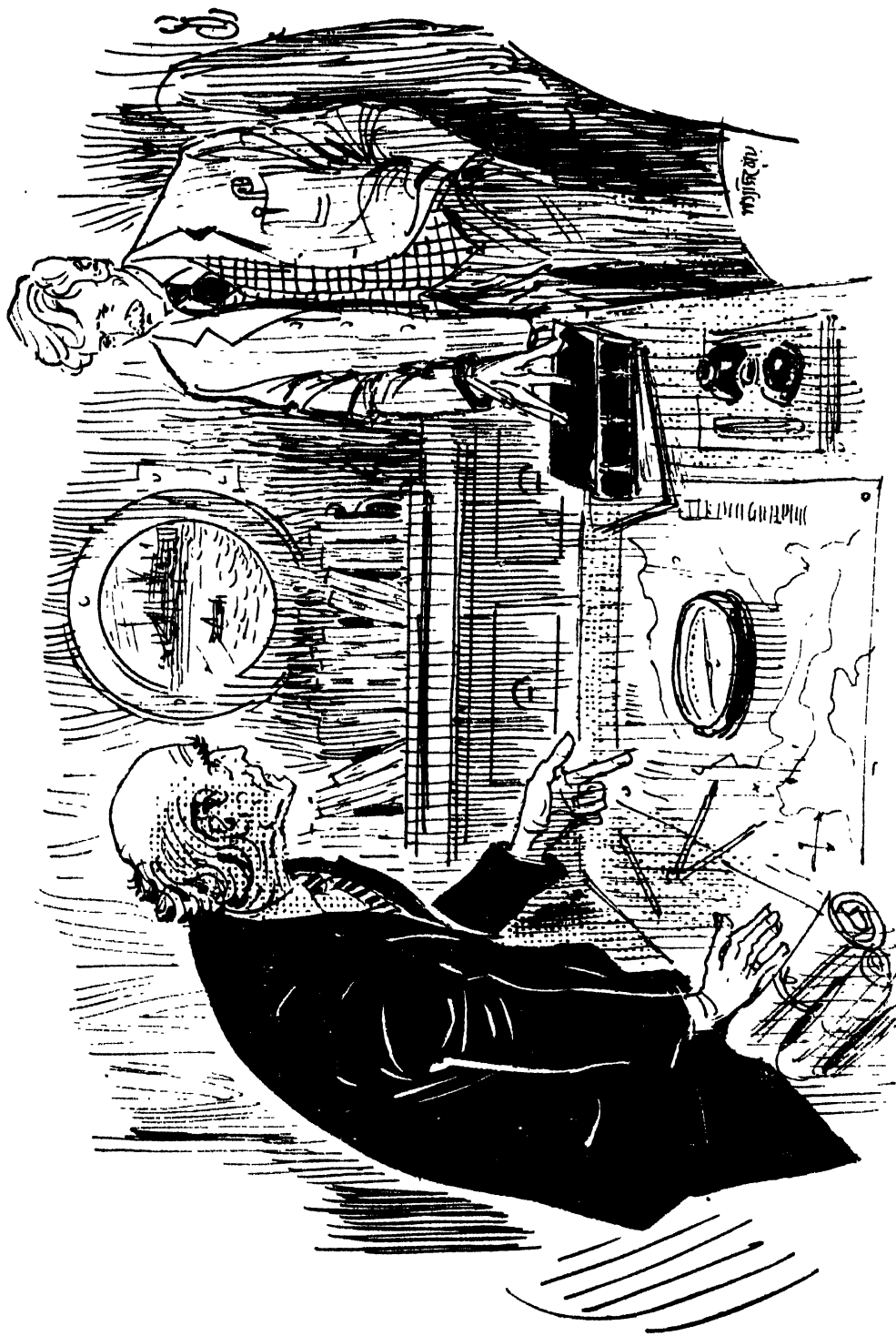
সুলতা সেনগুপ্ত

ও ভাই গোরী, নতুন দিনে তোকেই মনে পড়ে,
মন টেকেনা ঘরে
দোর খুলে ভাই বাইরে এলাম শালিক ডাকা ভোরে।
ট্যাক্সিটা কার থামে ? ডাকছে কে কার নামে ?
চমকে গিয়ে থমকে দাঁড়াই বইলে হাওয়া জোরে !
এ সব কথা থাক
নতুন বছর তোদের দিল ডাক।
সুস্থ শরীর. সবল মনে—আনন্দে রও সবার সনে
খুসির গাংএ লাগল বাতাস, ডাকল মনের বান
সিন্ধু পারে পৌঁছে দিলাম ভালোবাসার গান !
দূরবিদেশে মায়ের বুকে
সোনার মেয়ে থাকুক সুখে
সফল হউক ছোট্ট মনের মস্ত বড়ো সাধ
রইল আশীর্বাদ।
চিক্‌চিকে রোদ আজ সকালে—
নামল কনক চাঁপার ডালে
লাগল সে রোদ ঝুমকো লতায়
তার পরে রোদ ছড়িয়ে পড়ে
ছাদের পরে খোলার-চালে।
গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে—নতুন খবর দিয়ে গেল
'নতুন বছর এল !'
আজ সকালে নতুন সালের প্রথম সকাল হল
জানলে তো ভাই পোলো ?
রোদের দেশের সোনার ছেলে
হিমের ওপর বেড়ায় খেলে
সেই না-দেখা খুসির খেলা
ভাবছি বসে ভোরের বেলা !
আনন্দের এই নতুন দিনে আমার আশিস নিয়ো
আলোর ধোয়া মনের আদর বন্ধুজনে দিয়ো
নতুন দিনের খুসির খবর সবার কাছে বলো
জানলে তো ভাই পোলো ?

এক

'স্ট্র্যাট্‌ফোর্ড' জাহাজ বানচাল হওয়ার কথা হয়ত অনেকেরই মনে আছে। বেশী দিন নয়, মাত্র এক বছর আগের কথা। গভীর সমুদ্রের তলাটা কি রকম আর সেখানে কি রকমের জীব জন্তু থাকে। এই সব কথা একেবারে হাতে কলমে জানিবার জন্য 'স্ট্র্যাট্‌ফোর্ড' সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল, তারপর আর ফিরে আসেনি। সেই অভিযানের নেতা ছিলেন ডক্‌টর ম্যারাকট। তিনি মহাপণ্ডিত লোক, প্রবাল আর ঝিনুক সম্বন্ধে দুইখানি বই লিখে বিখ্যাত হয়েছিলেন। এই সমুদ্রযাত্রায় তাঁর সঙ্গী ছিলেন একজন আমেরিকান্‌ প্রাণিবিদ্‌ মিঃ সাইরাস্‌ হেড্‌লি। সে সময়ে তিনি ইংল্যণ্ডে অক্‌স্‌ফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে বিশেষ কোনও গবেষণার জন্য এসেছিলেন। 'স্ট্র্যাট্‌ফোর্ড' জাহাজের অধিনায়ক ছিলেন ক্যাপটেন হাওয়ি নামে একজন ঝুনো নাবিক। জাহাজের কর্মচারী ও মাল্লারা মিলে ছিলেন মোট তেইশ জন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন একজন আমেরিকান্‌ এন্‌জিনিয়ার, ফিলাডেলফিয়ার এক ইন্‌জি-নিয়ারিং ফার্ম থেকে তাঁকে আনানো হয়েছিল।

এই গোটা দলটাই একেবার নিরুদ্দেশ হয়েছে। জাহাজটার যে কি হল কেউ জানেনা, কেবল নরওয়ের একটা পাশের জাহাজের ক্যাপটেন্‌ বলেন যে 'স্ট্র্যাট্‌ফোর্ড'-এর মত দেখতে একটি জাহাজকে তাঁরা গত বছর আশ্বিনের ঝড়ে ডুবে যেতে দেখেছেন। তাঁর কথামত সমুদ্রের সে অঞ্চলে গিয়ে কতকগুলি জিনিস ভাসতে দেখা যায়। যথা—'স্ট্র্যাট্‌ফোর্ড' নাম লেখা একটা লাইফ-বোট, একটা বয়া, জাহাজের ডেকের একখানি ভাঙা টুকরা ও একটা শক্ত লগা। এসব চিহ্ন দেখে এবং অনেক দিন

'স্ট্র্যাট্‌ফোর্ড'-এর কোন খবর না পাওয়ায় সকলেই ধরে নিয়েছিল যে জাহাজটি বানচাল হয়ে ডুবেই গিয়েছে। তাছাড়া সে সময়ে অনেক জাহাজেরই বেতার যন্ত্রে এক অদ্ভুত বেতার-বার্তা ধরা পড়েছিল যার কোনো কোনো জায়গা একেবারেই বোঝা যায় না, কিন্তু মোটের উপর বুঝতে বাকি থাকে না যে 'স্ট্র্যাটফোর্ড' আর কোনো দিন ফিরে আসবে না। সেই বেতার-বার্তাটি কি পরে বলব।

প্রফেসর ম্যারাকট্ ছিলেন অদ্ভুত রকমের গোপনতাপ্রিয়। কাজেই খবর-কাগজের লোকেরা ছিল তাঁর চক্ষুশূল। এই অভিযান সম্বন্ধে কোনও কথা তো তাদের বলতেনই না, এমন কি যে কয় সপ্তাহ জাহাজখানা অ্যালবার্ট ডকে নোঙ্গর করে ছিল, কোনও খবর-কাগজের লোকের তাতে পা দেওয়াই একেবারে বারণ করে দিয়েছিলেন। কাজেই জাহাজটার সম্বন্ধে নানারকম কানাঘুসো শোনা যেতে লাগল, যেমন জাহাজটা গভীর সমুদ্রে পাড়ি দেবার মত করেই তৈয়ারী আর তার ভিতরে নাকি নানা অদ্ভুত কল কব্জা আছে—এই সব। কথাগুলি যে সত্য তা জানা গিয়েছিল পরে, যে জাহাজী কারখানায় এই সব কল কব্জাগুলি লাগানো হয়েছিল সেইখানে খোঁজ নিয়ে।

'স্ট্র্যাট্‌ফোর্ড' জাহাজের কি হল সে সম্বন্ধে মোট চারটি দলিল পাওয়া গিয়েছে। এক, জাহাজ থেকে লেখা মিঃ সাইরাস্ হেড্‌লির চিঠি, তাঁর বন্ধু অক্‌স্‌ফোর্ডের ট্রিনিটি কলেজের সার্ জেমস ট্যাল্‌-বট্‌কে লেখা। দুই, সেই অদ্ভুত বেতার-বার্তা। তিন, 'আরাবেলা নোউল্‌স্' নামক এক জাহাজের লগ্-বুক্ অর্থাৎ দিনপঞ্জিকার কতক অংশ যেখানে এক আশ্চর্য কাঁচের গোলার কথা লেখা আছে। আর চার, সেই কাঁচের গোলার ভিতরেই পাওয়া একেবারেই অবিশ্বাস্য রকমের এক আশ্চর্য বিবরণ। একটির পর একটি এই দলিল চারখানি আমি উদ্ধৃত করব। প্রথম মিঃ হেড্‌লির চিঠিখানি। এটি আমি সার্ জেম্‌স্ ট্যাল্‌বটের সৌজন্যে পেয়েছি। চিঠির তারিখ গত বৎসরের ১লা অক্‌টোবর।

'ভাই ট্যাল্‌বট্, অ্যাটলান্টিক মহাসাগর ক্যানারি দ্বীপগুলির মধ্যে যেটি সব চেয়ে বড় সেই গ্র্যাণ্ড্ ক্যানারি থেকে তোমায় লিখছি। এখানে আমরা দিন কয়েক বিশ্রামের জন্য জাহাজ ভিড়িয়েছি। এই সমুদ্রযাত্রায় আমার বিশেষ বন্ধু হয়ে উঠেছে জাহাজের হেড্ মেকানিক্ বিল্ স্ক্যান্‌ল্যান। লোকটি ভারী মজার আর আমুদে, তার উপর আমরা দুজনেই মার্কিন মুলুকের লোক।

'ম্যারাকটের সঙ্গে তোমার তো একবার দেখা হয়েছিল, কাজেই ভদ্রলোক যে কিরকম একখানি 'শুকং কাষ্ঠং' তা আর তোমায় বলে' বোঝাতে হবে না। তবে সে যাই হোক আমি যে কাজ ভালবাসি তাই নিয়েই আমাদের এই সমুদ্র অভিযান, তাই খুবই ভাল লাগছে। সামুদ্রিক কাঁকড়া সম্বন্ধে আমার লেখা একটি পুরস্কার পাওয়া প্রবন্ধ ম্যারাকটের চোখে পড়েছিল, তিনি আমাকে এই অভিযানে তাঁর সঙ্গী করেছেন। কিন্তু তাঁর মত একটি জীবন্ত 'মামি'র সঙ্গী হওয়া যে কী ব্যাপার তা তো বোঝ! তিনি যেরকম সর্বদা একলা থাকেন আর অনুক্ষণ কাজ করেন তাতে তাঁকে মানুষ বলেই মনে হয় না। বিল্ স্ক্যানল্যান বলে, 'দুনিয়ার যত কড়া লোকের সেরা কড়া উনি।' তাঁর বিজ্ঞান-সেবার বাইরে জগতে আর কিছুর অস্তিত্বই নেই তাঁর কাছে। তিনি প্রায় কথাই বলতেন না, তাঁর শীর্ণ মুখের কঠিন রেখাগুলি কখনও হৃদ্যতায় কোমল হয়ে ওঠে না। তাঁর খাঁড়ার মত ধারালো নাক, তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল দুটি ছোট ছোট

ধূসর চোখ—লোমশ জ্রর নিচে কাছাকাছি বসানো, পাতলা চাপা ঠোঁট, নিরন্তর চিন্তা আর কঠোর জীবন যাপনে চোপসানো গাল, সঙ্গী হিসাবে এর কোনোটাই খুব মনোরম নয়। আর মনের দিক দিয়ে তিনি যেন কোনো এক পাহাড়ের চূড়ায় বাস করেন, সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। এক এক সময় মনে হয় তাঁর একটু মাথার দোষই বুঝিবা আছে। যেমন ধর এই যে অদ্ভুত কলটি তিনি বানিয়েছেন……কিন্তু নাঃ, যার পরে যেটি সেই হিসাবেই আমি বলে' যাব, তার পর তুমি নিজেই বুঝে দেখো।

গোড়া থেকেই তাহলে বলি। 'স্ট্র্যাট্‌ফোর্ড' জাহাজখানি ছোটখাট হলেও তার সমস্ত ব্যবস্থা নিখুঁত। বারো শ টনের জাহাজ, কিন্তু ডেকে বেশ জায়গা আছে। আর সমুদ্রের গভীরতা মাপা, ট্রলিং করা—অর্থাৎ গভীর জলের মধ্যে ট্রল বা বড় মুখওয়ালা কলের মত জাল নামিয়ে দিয়ে জাহাজ চালিয়ে মাছ ধরা, অগভীর জায়গায় খুঁড়ে খুঁড়ে জাহাজ চলবার মত জল করে নেওয়া, টানা জাল ফেলা ইত্যাদি যত রকম বন্দোবস্ত থাকা সম্ভব সবই তাছে। ট্রল গুটোবার জন্য জোরালো স্টীমের লাটাই তো আছেই, তা ছাড়া আরও নানা রকম কল-কবজা আছে যার অনেকগুলি খুবই সাধারণ—অনেক জাহাজেই থাকে, আবার কতকগুলি একেবারেই অচেনা। এই সবের নিচে রয়েছে আমাদের থাকবার কামরা-গুলি—বেশ আরামের, আর রয়েছে একটি সুসজ্জিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার।

'যাত্রা সুরু করার আগে আমাদের জাহাজের রহস্যময় বলে খ্যাতি হয়েছিল। কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম সেটা অকারণ নয়। প্রথম দিকটাতে অবশ্য জাহাজের কার্যকলাপের মধ্যে অসাধারণ কিছুই ছিল না। নর্থ সী-তে একপাক ঘুরে আসা গেল। সেখানে দু একবার ট্রল নামানো হল। কিন্তু সেখানকার গভীরতা গড়ে মাত্র ষাট ফুট, আর আমরা তৈরি হয়েছি অতি গভীর সমুদ্রের জন্য, কাজেই এর মানে কিছু বুঝলাম না। নেহাত বেশ খাবার মাছ, ডগ-ফিশ, স্কুইড্ জেলিফিশ আর নদী ধুয়ে আসা পলি মাটির তলানী কাদা ছাড়া চিঠিতে লেখবার মত আর কিছুই সেখানে পাইনি। তারপর সেখান থেকে স্কট্‌ল্যাণ্ডের পাশ দিয়ে ঘুরে বরাবর দক্ষিণ মুখো আসতে লাগলাম। ক্রমে আমাদের কাজের উপযুক্ত জায়গায় এলাম—আফ্রিকার উপকূল আর এই ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের মাঝামাঝি। এক অন্ধকার কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতে আমরা আর একটু হলেই একটা পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়েছিলাম আর কি, তবে এছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কিছুই ঘটেনি।

'এই হপ্তাকয়েক আমি ম্যারাকটের সঙ্গে একটু আলাপ জমাবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সেকি সহজ কাজ! এক তো তাঁর মত অন্যমনস্ক লোক দুনিয়ায় আর দুটি নেই, নিজের চিন্তায় একেবারে বুঁদ হয়ে থাকেন। তার উপর আবার তিনি অত্যন্ত গোপনতাপ্রিয়। সর্বক্ষণই কিসব কাগজ আর চার্ট নিয়ে পড়ে আছেন, কিন্তু আমি তাঁর ক্যাবিনে কখনও ঢুকলেই অমনি সমস্ত একাকার করে' মিশিয়ে একদিকে সরিয়ে ফেলেন। আমার মনে হয় লোকটির মাথায় কোনো একটা মতলব আছে কিন্তু আমাদের জাহাজ কোনও বন্দরে না ভেড়ানো অবধি তিনি সেটা আমাদের কাছে ভাঙবেন না। আর দেখছি বিন্ স্ক্যানল্যানেরও তাই ধারণা।

'একদিন সন্ধ্যাবেলা পরীক্ষাগারে বসে' সমুদ্রের কত গভীরের জল কতখানি নোনা তাই পরীক্ষা করছি, এমন সময় স্ক্যান্‌ল্যান্ বলে উঠল, 'এই ধরুন গিয়ে মিঃ হেড্‌লি, ঐ মহাত্মাটির মতলবখানা কি মালুম হয় আপনার ?'

'আমি বললাম, 'চ্যালেঞ্জার' বা আরও ডজনখানেক জাহাজ এর আগে যা করেছে হয়ত আমরাও তাই করব, নানা জাতের মাছের নামের ফর্দে আরও গোটা কয়েক নাম জুড়ব আর সাগরতত্ত্বের যে সব চার্ট আছে তার ভিতরে আর কয়েকটা তথ্য ঢোকাব।'

'স্ক্যান্‌ল্যান্ আমার দিব্য গেলে বললে, 'মোটেও না। আবার ভাবুন। আচ্ছা, এই আমার কথাই ধরুন না ; আমি কেন সঙ্গে এসেছি বলুন তো ?'

'বললাম, 'যদি কলকব্‌জা কিছু বেগড়ায়—'

'আহা ! জাহাজের কলকব্‌জার ভার তো স্কচ্ এনজিনিয়র ম্যাক্‌ল্যারেনের উপর। না সার্ ঐ একরত্তি এনজিন্ চালাবার জন্য মেরিব্যাঙ্ক কোম্পানি তাদের সেরা লোককে এখানে পাঠায় নি। হপ্তায় পঞ্চাশটি ডলার আমায় অমনি দিচ্ছেনা। আচ্ছা, আসুন আপনাকে কিছু এলেম দিই।'

'পকেট থেকে একটা চাবি বার করে, বিল্ পরীক্ষাগারের পিছন দিকের একটা দরজা খুলে ফেললে। সেখান থেকে একটা তোলা সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে। সেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে আমরা জাহাজের খোলের ভিতর গিয়ে পৌঁছালাম। জায়গাটা একেবারে পরিষ্কার, কেবল চারটি বিরাট্ প্যাকিং কেসের মধ্যে খড়ের আড়াল থেকে চারটি ঝক্‌ঝকে জিনিস উঁকি মারছে ! সেগুলি ইস্পাতের বড় বড় পাত, ধারগুলিতে মেলাই বোল্‌ট্ আর রিভেট্ লাগানো। প্রত্যেকটি পাত প্রায় দশ ফুট লম্বা, দশ ফুট চওড়া আর ইঞ্চি দেড়েক পুরু ; মাঝখানে দেড় ফুট মাপের একটি করে' গোল গর্ত।

'আমি বলে' উঠলাম, 'ইটি কি ব্যাপার বটে ?'

'বিল্ বললে, 'উটি আমার বাচ্ছা বটে, সার্ ; উটির জন্যই আমি এখানে আছি।'

'বিলের মুখের চেহারাখানা যেন সার্কাসের ক্লাউন আর বক্সারের মাঝামাঝি। আমাকে অবাক্ করতে পেরে তার সেই মজার মুখ আরও মজার হয়ে উঠল। সে বলে চলল, 'এই জিনিসটার তলাটা ইস্পাতের সেটা ঐ বড় প্যাকিং কেসটার মধ্যে রয়েছে। আচ্ছা তলা গেল ; এখন দেখুন একটা মাথাও রয়েছে—খিলানের মত গোল করে' তৈরী, আর তার গায়ে একটা মস্ত আংটা, তাতে শেকল বা তারের কাছি লাগানো যেতে পারবে। এই যে, জাহাজের তলার দিকে চেয়ে দেখুন।'

'নিচের দিকে চেয়ে দেখলাম লম্বায় চওড়ায় সমান একটি কাঠের মঞ্চ, তার চার কোণ থেকে বড় বড় স্ক্রু মাথা বের করে' রয়েছে, দেখেই বোঝা যায় যে সেটিকে খুলে আলাদা করে' ফেলা যায়।

'বিল্ বললে, 'জাহাজের তলা একটা নয়, দুটো। যা বুঝছি, বুড়ো হয় আসলে এক পাকা এন্‌জিনিয়র নয় তো আমাদের চাইতে ঢের বেশী মশলা আছে বুড়োর মুণ্ডুতে। তবে আমি যদি ঠিক বুঝে থাকি তাঁর মতলবখানা হচ্ছে আগে একটা খাঁচা বানানো—তার দেওয়াল কখানা এইখানে জমা করা রয়েছে—তারপর সেটাকে জাহাজের তলা দিয়ে নামিয়ে দেওয়া। বিজ্ঞলীর সন্ধানী বাতিও কা—

ধরে' নিচ্ছি তাই আলিয়ে ঐ গোল গোল পোর্ট-হোলের মত জানলাগুলি দিয়ে বাইরের দিকে দেখবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।'

'আমি বললাম, 'যদি তাই ওর অভিপ্রায় হয় তবে জাহাজের তলায় একটা স্ফটিকের পাত লাগালেই তো পারতেন, যেমন করে ক্যাটালিনা দ্বীপের নৌকাগুলিতে।'

'বিল্ মাথা চুলকিয়ে বললে, 'তা যা 'বলেছেন, ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনা। যাক্ এটা ঠিক যে আমাকে পাঠানো হয়েছে তাঁর হুকুম তামিল করতে আর ঐ আজগুবি তোড় জোড়ের ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করতে। আমায় তো তিনি এখনও কিছু বলেননি, তাই আমিও তাঁকে কিছু বলিনি। তবে গন্ধে গন্ধে আছি!'

এমনি করে' হঠাৎই আমি আমাদের জাহাজের রহস্যের কিনারায় গিয়ে পড়ি। এর পর দিন কয়েক বড় খারাপ হাওয়া গেল, তারপর কেপ জ্যুবার উত্তর-পশ্চিমে আফ্রিকা মহাদেশের ঢালুর ঠিক বাইরে গভীর সমুদ্রে আমরা ট্রলিং করতে লাগলাম। সেই সঙ্গে সমুদ্রের কতখানি নিচের জল কতখানি গরম বা ঠাণ্ডা আর কতখানি নোনতা তার তথ্য সংগ্রহ করাও চলতে লাগল। সে বেশ এক মজা। গভীর সমুদ্রে পিটার্সন্ ট্রল নামিয়ে দিয়ে চালিয়ে নাও, তার কুড়ি ফুট চওড়া মুখের সামনে যা কিছু পড়বে সবই তার পেটের মধ্যে ঢুকবে। কখনও হয়ত ট্রল নামিয়ে দেওয়া হল সিকি মাইল নিচে, সেখান থেকে উঠল এক রকমের এক রাশ মাছ। আবার কখনও হয়ত নামানো আধ মাইল নিচে, উঠল অন্য রকমের মাছের ঝাঁক। সমুদ্রের বিভিন্ন স্তরে যেন বিভিন্ন জাতের বাসিন্দা রয়েছে। এক এক সময়ে সমুদ্রের তলা চেঁচে হয়ত উঠল প্রায় আধ টন খানেক পরিষ্কার পারুল রঙের জেলি—জীবসৃষ্টির আদিম উপাদান, কিংবা উঠল সিন্ধুজল অর্থাৎ সমুদ্রের তলানী কাদা—তার মধ্যেও রয়েছে প্রাণের বীজ, অণুবীক্ষণের নিচে দেখায় যেন লক্ষ লক্ষ ছোট্ট গুলির তৈরী একটা জালির মত জিনিস। মহালুমন্, স্থলিকা, সমুচ্চণ্ড, পুরুদেহিকা, শল্যত্বক্ ইত্যাদি কত জাতির জীব যে ওঠে সে সবের নাম করে' আর তোমার ধৈর্য পরীক্ষা করব না। তবে এইটুকু জেনে রাখ যে সমুদ্রের নাম রত্নাকর এবং আমরা যথেষ্ট রত্ন আহরণ করছি। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে ম্যারাকটের মন যেন এ সবের মধ্যে নেই। তাঁর সেই চওড়া কপালওয়ালা, লম্বাটে, ইজিপশিয়ান মামি'র মত মাথার মধ্যে যেন রয়েছে সম্পূর্ণ আলাদা চিন্তা। যেন আসল কাজ সুরু করবার আগে এ কেবল মহড়া দেওয়া হচ্ছে মাত্র।

'এই পর্যন্ত লিখে একবার ডাঙায় নেমেছিলাম। কাল ভোরে আবার জাহাজ ছাড়বার কথা, তাই শেষ বারের মত ভাল করে' হাত পা মেলে নেব ভেবেছিলাম। ভালই করেছিলাম, কারণ নেমেই দেখলাম জেটির উপর এক লড়াই চলেছে আর ম্যারাকট এবং বিল্ স্ক্যান্‌ল্যান্ তারই ঠিক মধ্যিখানে। বিল্ দাঙ্গা বাধাতে বেশ পটু, তার দুখানি হাতেই সে চমৎকার ঘুঁসি চালাতে পারে। কিন্তু চারিপাশে ছোরা হাতে আধ ডজন স্প্যানিয়ার্ড। ব্যাপার সুবিধের নয় দেখে আমি ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। ঢুকে দেখি ব্যাপারটা এই: ওখানকার যে অপরূপ যান—যাকে ওরা খুব খাতির করে বলে ক্যাব্—তাই ভাড়া করে' ডক্টর ম্যারাকট গোটা দ্বীপের প্রায় অর্ধেকটাই ঘুরে এসেছেন তাঁর ভূতাত্ত্বিক তথ্য

সংগ্রহ করতে করতে, কিন্তু সঙ্গে যে একটি পেনিও নেই সে কথাটা স্রেফ্ ভুলে গেছেন। তারপর গাড়োয়ান যখন ভাড়া চেয়েছে তখন আর সেই গেঁয়ো ভূতদের কিছুতেই কিছু বুঝিয়ে উঠতে পারেন নি। গাড়োয়ান জামিন হিসাবে তাঁর ঘড়িটি ছিনিয়ে নিয়েছে, ফলে বিল স্ক্যানল্যানের হাত চলতে সুরু করেছে। আমি সময় মত গিয়ে না পড়লে ছোরায় ছোরায় তাঁদের পিঠ দুখানির দুটি পিন-কুশনের মত অবস্থা হত! আমি গাড়োয়ানকে দু এক ডলার আর স্ক্যান্ল্যানের ঘুঁসি খেয়ে যার, চোখের নিচে কালশিরা পড়েছিল তাকে পাঁচ ডলার বকশিশ দিয়ে ঠাণ্ডা করলাম। ব্যাপারটা ভালয় ভালয় কেটে গেল এবং সেই প্রথম ম্যারাকটকে একটু রক্ত মাংসের মানুষের মত মনে হল। আমরা জাহাজে ফিরে যাবার পর তিনি আমাকে তাঁর ক্যাবিনে ডেকে পাঠিয়ে ধন্যবাদ জানালেন।

তারপরে বললেন, 'আচ্ছা মিঃ হেডলি, আপনি তো বিবাহিত নন

বললাম, 'না, বিবাহিত নই।'

'আপনার মুখাপেক্ষীও আর কেউ নেই।'

'না।'

'বেশ। এই অভিযানের উদ্দেশ্য আপনাকে জানাই নি, কয়েকটি কারণে আমি এ পর্যন্ত সেটা গোপন রাখতে চেয়েছিলাম। একটি কারণ এই যে তা জানতে পারলে আর কেউ হয়ত আমার আগেই এই ধরণের একটি অভিযান সুরু করে দিতে পারত। মন্ত্রগুপ্তিতে অক্ষম হলে ক্যাপটেন স্কটের দশা হয়। স্কট্ যদি তাঁর অভিপ্রায় গোপন রাখতেন তাহলে তিনিই সর্বপ্রথম দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছাতে পারতেন, আমুণ্ডসেন নয়। আমারও দক্ষিণ মেরুর মত কোনো বিশেষ লক্ষ্য স্থল আছে, তাই আমি কোনো কথা প্রকাশ করি নি। কিন্তু এখন আমরা আমাদের বিরাট অ্যাডভেঞ্চারের প্রান্তে উপস্থিত, এখন আর কেউ আমাদের পরিকল্পনা চুরি করতে পারবে না। কাল আমরা আমাদের আসল লক্ষ্যস্থলের উদ্দেশে যাত্রা করছি।'

'সে লক্ষ্যস্থল কি?'

'তিনি আমার দিকে খানিকটা ঝুঁকে এলেন, তাঁর সেই কঠোর মুখে যেন এক উন্মত্ত উৎসাহ জ্বল জ্বল করে' উঠল। বললেন, 'আমাদের লক্ষ্যস্থল আটলান্টিক মহাসমুদ্রের তলদেশে!'

কোনো গল্পের শেষ এর চেয়ে চমৎকার হতে পারে না, আর আমি যদি গল্পলেখক হতাম নির্ঘাত এইখানেই দাঁড়ি টেনে দিতাম। কিন্তু আমি তো তা নই, আমি বিজ্ঞানী, আমার কাজ কেবল যেমনটি ঘটে ঠিক ঠিক তাই লিখে রেখে যাওয়া। তাই তোমায় জানাচ্ছি যে এর পরে আমি আরও এক ঘণ্টা তাঁর ক্যাবিনে ছিলাম আর অনেক কিছুই তাঁর কাছ থেকে শুনলাম। জাহাজ থেকে চিঠি নিয়ে যাবার শেষ খেয়া ছাড়তে একটু আছে, এই ফাঁকে সে সব তোমায় বলে নিই।

ম্যারাকট বললেন, 'হ্যাঁ হে, তুমি এখন স্বচ্ছন্দে এ কথা লিখতে পার, কারণ তোমার চিঠি যখন ইংল্যাণ্ডে গিয়ে পৌঁছাবে ততদিনে আমরা আমাদের কাজে ঝাঁপ দিয়েছি।'

এই বলে বৃদ্ধ চাপা হাসি হাসতে লাগলেন। তাহলে তাঁর কৌতুকবোধও আছে—যদিও কেমন

যেন এক খোট্টা ধরনের !

বৃদ্ধ বলে চললেন, 'হ্যাঁ ঝাঁপ দেওয়াই বটে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে আমাদের ঝম্পপ্রদান স্মরণীয় হবে। তোমায় একটা কথা বলি। সমুদ্রের অনেক নিচে জলের চাপ অত্যধিক বলে যে মত প্রচলিত আছে তা যে একেবারে ভুল সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। স্পষ্টই বোঝা যায় যে অন্যান্য এমন কয়েকটি বিষয় আছে যাতে সেই চাপ যতটা হবার কথা ততটা হতে পারে না। অবশ্য সেই অন্য বিষয়গুলি কি তা আমি এখন বলতে পারছি না। কয়েকটি সমস্যার সমাধান এখনও হয় নি, এটাও তার মধ্যে একটা। আচ্ছা, এক মাইল নিচে কত চাপ হবে বলে তুমি মনে কর?' তাঁর ফ্রেমের চশমার বড় বড় কাচের ভিতর দিয়ে তিনি কটমট করে' আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললাম, 'প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে এক টনের কম নয়, এ তো স্পষ্টই প্রমাণ হয়ে গেছে।'

তিনি বললেন, 'যে সব বিষয় স্পষ্টই প্রমাণ হয়ে গেছে সেগুলি অপ্রমাণ করাই চিরদিন আগে-চলা লোকদের কাজ। নিজের মাথা খাটাও হে। এক মাস হল তোমরা গভীর সমুদ্রের তলা থেকে অতিশয় নরম জীবজন্তু তুলছ, এত নরম যে জল থেকে তুলে চৌবাচ্চায় ছাড়তে গিয়ে তার আকার নষ্ট হয়ে যাওয়ার মত হয়। তার উপর এই ভয়ঙ্কর চাপের কোনও চিহ্ন দেখতে পেয়েছ?'

বলতেই হল যে পাইনি। তিনি বললেন, 'কিংবা আমাদের ট্রলের কথাই ধর, তার মুখের কাছের তক্তাগুলো তো সেই চাপে পিষে চেপটে যায় নি।

বললাম, কিন্তু 'ডুবুরীরা যে তাদের কানে ভয়ানক চাপ পায়?'

'অবশ্যই কিছু দূর পর্যন্ত সেটা ঠিক। শরীরের যে জায়গাটা সবচাইতে অনুভবনশীল, সামান্য কাঁপুনি যেখানে ধরা পড়ে, সেই কানের ভিতর দিকে লাগবার মত যথেষ্ট চাপ তারা পায় বইকি। কিন্তু আমি যে উপায় করেছি তাতে আমাদের দেহে কোনও চাপ পড়তে পারে না। একটা ইস্পাতের তৈরী খাঁচায় করে' আমরা নামব। তার গায়ে স্ফটিকের জানলা থাকবে। দেড় ইঞ্চি পুরু বিশেষ শক্ত করে তৈরী ডবল নিকেল করা ইস্পাতের পাত ভেঙে ঢোকবার ক্ষমতা সেই চাপের হবে না আশা করি। আর আমার হিসাবে যদি ভুল হয়েই থাকে তাহলে—যাক্, তুমি তো বলছ তোমার মুখাপেক্ষী কেউ নেই। না হয় একটা মহান্ অ্যাড্‌ভেঞ্চারে আমরা মৃত্যুবরণ করব। অবশ্য তুমি যদি এর মধ্যে থাকতে না চাও তো আমি একলাই যেতে পারি।'

ম্যারাকটের মতলবখানা আমার কাছে পাগলামির চূড়ান্ত বলেই মনে হল। কিন্তু এই রকম চ্যালেঞ্জ স্বীকার করে না নেওয়াও কত কঠিন তা তো জানই। আমি একথা বলতে বলতে এদিকে মনে মনে ভাবতে লাগলাম।

'শুধোলাম, 'কত নিচ অবধি যাবেন মনে করেছেন সার্।

'টেবিলের উপর পিন দিয়ে একটা চার্ট আঁটা ছিল। ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণ-পশ্চিমে একটা জায়গায় তিনি তাঁর কম্পাসের কাঁটা রাখলেন। বললেন, 'গত বৎসর এই রকম জায়গায় গভীরতা মাপবার জন্য আমি বারকয়েক ওজন ফেলেছিলাম। ঐখানে একটি অত্যন্ত গভীর ডীপ* আছে।

সেখানে আমরা পঁচিশ হাজার ফুট পেয়েছিলাম। আমিই প্রথম সে বৃত্তান্ত প্রকাশ করি। ভবিষ্যৎ চার্টে সে জায়গাটা 'ম্যারাকট ডীপ' নামেই দেখতে পাবে।'

'আমি বলে' উঠলাম, 'কি সর্বনাশ, আপনি কি ঐরকম অতল গহ্বরের মধ্যে নামবেন নাকি ?'

'মৃদু হেসে তিনি বললেন, 'না না, আমাদের নিচে নামাবার কাছি বা বাতাসের নল কোনোটাই আধ মাইলের বেশী নিচে পৌঁছায় না। আমি বলছিলাম এই যে এই গভীর গর্ত বহুকাল আগে পৃথিবীর ভিতরকার আগ্নেয় উৎপাতের ফলে সৃষ্ট হয়েছে। তার চারি পাশে একটা শৈলশিরা বা একটা সঙ্কীর্ণ উপত্যকা যেন একটা গোল মঞ্চের মত তাকে ঘিরে আছে, সেটা তিনশো ফ্যাদমের* বেশী গভীর নয়।'

তিন শ ফ্যাদম ! এক মাইলের তেহাই !'

'হ্যাঁ, মোটামুটি এক মাইলের এক-তৃতীয়াংশ। আমার ইচ্ছা আমাদের চাপসহ খাঁচাটিতে করে' সমুদ্রের তলায় সেই শৈলশিরার উপর আমাদের নামিয়ে দেওয়া হবে। সেখানে আমরা যথাসাধ্য নিরীক্ষা ও তথ্য সংগ্রহ করব। কথা বলবার জন্য জাহাজ পর্যন্ত একটি নল থাকবে, তাই দিয়ে আমরা জাহাজের লোকেদের নির্দেশ দিতে পারব। এতে কোনো অসুবিধা হবে না। যখন আমরা উঠে আসতে চাইব তখন শুধু বললেই হল।'

'বাতাস ?'

'পাম্প করে' আমাদের কাছে পাঠানো হবে।'

'কিন্তু সেখানে তো ঘুটঘুটে অন্ধকার হবে।

'ঠিকই। জাহাজের এনজিনের শক্তিতে আমাদের খাঁচায় জোরালো বিজলী আলো জ্বলবে, আর তার সঙ্গে দু ভোল্টের ড্রাই সেলও থাকবে ছয়টি, সেগুলি থেকেও বারো ভোল্টের প্রবাহ পাওয়া যাবে। এই সবের সঙ্গে একটা লুকাস্-'এর আমি সিগনালিং ল্যাম্প থাকবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ইচ্ছামত আলো ফেলবার জন্য, তাতেই আমাদের কাজ চলে যাবে। আর কোনো অসুবিধা ?'

'যদি আমাদের বাতাসের নলগুলি জড়িয়ে যায় ?'

'জড়াবে না। আর জরুরী অবস্থার জন্য চব্বিশ ঘণ্টার মত টিউবে পোরা বাতাসও মজুত থাকবে। তোমার সব প্রশ্নের উত্তর পেয়েছ তো? রাজি আছ আসতে ?'

'উত্তর দেওয়া সহজ নয়! চিন্তা হাওয়ার আগে চলে। মুহূর্তের মধ্যে আমার মাথায় কত কি যে খেলে গেল। যেন স্পষ্ট মনে হতে লাগল সেই খাঁচাটাতে করে' সমুদ্রের আদিম গভীরতার অন্তস্থলে নেমেছি, খাঁচার ভিতরকার বাতাস দূষিত হয়ে উঠেছে। দেখলাম যেন তার ইস্পাতের দেয়ালগুলি জলের প্রচণ্ড চাপে টোল খেয়ে ভিতরের দিকে ঠেলে আসতে লাগল, জোড়ের মুখগুলি অল্পে অল্পে খুলে যাচ্ছে, ভিতরে জল ঢুকছে, নিচ থেকে খাঁচাটা আস্তে আস্তে জলে ভরে' উঠছে। সে এক ভয়ঙ্কর মন্থর

* ডীপ (deep)—সমুদ্রের অতি গভীর স্থান, সামুদ্রিক দহ।

* ১ ফ্যাদম fathom = ৬ ফুট

মৃত্যু। হঠাৎ চোখ তুলে দেখি বৃদ্ধ এক দৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে, তাঁর সে দৃষ্টিতে বিজ্ঞানের জন্য আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত উৎসাহ। সে উৎসাহ যদি পাগলামিও হয় তবু তা নিস্বার্থ ও মহৎ। তাঁর ছোঁয়ায় আমিও যেন জ্বলে উঠলাম। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে আমার হাত বাড়িয়ে দিলাম।

'বললাম, 'ডক্‌টর, আমি শেষ পর্যন্ত আপনার সঙ্গে আছি।'

"তিনি বললেন, 'আমি তা জানতাম, তোমার পেটে কিছু বিদ্যে আছে, কিন্তু সেজন্য তোমায় পছন্দ করিনিহে, তারপর একট মুচকি হেসে, 'কিংবা সামুদ্রিক কাঁকড়ার সঙ্গে তোমার নিবিড় পরিচয়ের জন্যও নয়। তোমার অন্য যে গুণ আছে তারই দরকার ছিল আমার সব চাইতে বেশী সে হচ্ছে অটল সাহস আর নিষ্ঠা।'

"ঐ মিষ্টি কথাদুটো শুনিয়ে তিনি আমায় বিদায় দিলেন। ফিরে এসে আমার চটকা ভাঙ্গল। এখন মনে হচ্ছে আমার গোটা ভবিষ্যৎটা যেন তাঁর কাছে বাঁধা দিয়ে এলাম। যাক্, শেষ খেয়া এই ছাড়ল বলে', ডাকের জন্য হাঁকাহাঁকি করছে। ভাই ট্যাল্‌বট্, হয় এই আমার শেষ চিঠি নয়তো আবার যদি আমার চিঠি পাও, সে একখানা পড়বার মত চিঠি পাবে বটে। আর যদি না পাও তাহলে আমার কবরের উদ্দেশে ক্যানারির দক্ষিণে কোথাও এই লেখাটি জানিয়ে দিও ঃ—

"এইখানে কিংবা এইখানেই কোথাও রয়েছে—
মাছে তার যেটুকু বাকি রেখেছে—সেই আমার বন্ধু সাইরাস জন হেড লি।'

ক্রমশঃ

ছবি

সত্যানন্দ মণ্ডল

ছুটির দিনে দুপুর রোদে ঘরে
কাগজ তুলি রঙের বাটি নিয়ে
একলা টুটুল আঁকতে বসে ছিল
খেলনা পুতুল সব সরিয়ে দিয়ে।

খড়ের চালে ঘুঘু ছিল বসে,
দেখে দেখে আঁকতে বসে টুটুল,
দুষ্ট, ঘুঘু পালিয়ে যায় উড়ে ;
দূর সে পথে গায় কে তখন বাউল।

চুপটি করে গানটা শুনে নিয়ে
তাকায় টুটুল আকাশ পানে আবার ;
সাদা সাদা মেঘের ভেলা ভাসে,
আঁকতে গিয়ে পায় না দিশা তাহার।

এমন সময় মিনি বেড়াল এল,
টুটুল তাকে করল আদর কত
সামনে থেকে রইল বসে কাছে ;
একটা ছবি আঁকল মনের মত।

রামমোহনের ছোটবেলা

স্বপনবুড়ো

নতুন ভারত গড়ে তুলেছেন রামমোহন।

বাঙলার বুকে নতুন শিশু জন্ম নিল। দেশটা তখন পরাধীন। আর জাতি হিসেবে আমরা ছিলাম—অন্ধ বিশ্বাস আর কুসংস্কারে ভরা।

কিন্তু সেই অন্ধকার যুগে জন্মগ্রহণ করেও সারা দেশের জন্যে রামমোহন রাতদিন পরিশ্রম করে যে কত কাজ করে গেছেন, তাঁর জীবনী পাঠ করলেই সে কথা জানতে পারা যায়।

রামমোহনের নাম দেওয়া হয়েছে—'ভারত পথিক'। কিন্তু জীবনে যে যতই বড় হোন না কেন, প্রত্যেক মানুষেরই একটা ছেলেবেলা থাকে।

সেই ছেলেবেলাটা মা-বাবার স্নেহ যত্ন ভালোবাসায় ভরা থাকে। কখনো সেই ছেলেবেলাটা থাকে নানা ধরনের স্বপন দিয়ে মালা গাঁথা। আবার কারো ছেলেবেলা দস্যিপনা আর দুষ্টামী দিয়েও ভরা থাকে।

একদিনে যাঁরা জীবনে বড় হয়ে গেছেন, সারা ভারতের উন্নতির জন্য কত ভালো ভালো কাজ করে গেছেন, সকলের প্রীতি আর ভালবাসার মালা গলায় দুলিয়ে ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছেন, আশাকরি তাঁদের মধ্যেকার সেরা একজনের ছেলেবেলার কাহিনী তোমাদের ভালই লাগবে।

রামমোহনের বিরাট জীবনী ইতিহাসের মতোই ঘটনাবহুল। বড় হয়ে সে জীবনী পাঠ করে তোমরা অনেক কিছু জানতে পরাবে।

এই রামমোহন তাঁর মা-বাবার কাছ থেকে স্নেহ যত্ন ভালোবাসা আর প্রেরণা লাভ করে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে ছোট্ট ফুলের গাছের মতো কি ভাবে বেড়ে উঠলেন, আমি শুধু আজ সেই গল্পই তোমাদের শোনাব।

খানাকুলের কাছে রাধানগর গ্রাম রামমোহনের জন্মস্থান। রামমোহনের বাবার নাম ছিল রাম কান্ত রায়, আর মায়ের নাম ছিল তারিণী দেবী। রামকান্ত জমিদার ছিলেন, বাড়ির অবস্থা বেশ ভালো ছিল। যাকে বলে রমরমা গমগমা সংসার।

যে সময়ের কথা তোমাদের বলছি, সেই সময় হিন্দুরা একের বেশি বিয়ে করতেন। রামকান্তও লোকাচার আর পরিবারের সামাজিক চলতি নিয়ম অনুসারে তিনটি বিয়ে করেছিলেন। রামমোহন পিতার দ্বিতীয় পত্নী তারিণী দেবীর সন্তান। রামমোহনের আপন বড় ভাইয়ের নাম জগমোহন। রাম-কান্ত যে পরিবারের সন্তান, তাঁরা পরম বৈষ্ণব ছিলেন। কিন্তু তারিণীদেবী ছিলেন শাক্ত বংশের মেয়ে। রামমোহন কিন্তু বাবার নিষ্ঠা আর মায়ের তেজস্বিতা দুইই একই সঙ্গে লাভ করেছিলেন। রামমোহনের একটি বড় ভাই ছাড়া একটি ছোট বোনও ছিল। রামকান্তের যেমন বিষয় বুদ্ধি ছিল, তেমনি তিনি

ছিলেন ধর্মপ্রাণ, পরোপকারী, সহানুভূতিসম্পন্ন, এক সমবেদনশীল উদার মানুষ। সন্তানদের নিয়ে তিনি অনেক স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর স্নেহ ছায়ায় বহু আশ্রিত ব্যক্তি লালিত পালিত হত।

রামমোহনের মাতা তারিণী দেবী তেজস্বিনী মহিলা ছিলেন। সুন্দরী বলে সেই অঞ্চলে তাঁর একটা খ্যাতি ছিল। তিনি যেটা ভালো বুঝতেন, সত্যরূপে তাকেই আঁকড়ে ধরতেন। রামমোহন মায়ের কাছ থেকে অনেক সদ্‌গুণের অধিকারী হয়েছিলেন।

যদিও পরে ধর্মবিশ্বাস নিয়ে রামমোহনের সঙ্গে তাঁর মা-বাবার মতের মিল হয় নি, তবু একথা মানতে হবে যে, রামমোহন যে ভালো ভালো গুণের অধিকারী হয়েছিলেন সবই তাঁর মা-বাবার কাছ থেকে পাওয়া।

তাই সারা জীবন ধরে রামমোহন যাকে 'সত্য' বলে মনে করেছেন, শত বিপদেও তাকে ত্যাগ করেননি। এই ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে কতবার রামমোহনের জীবনহানির আশঙ্কা ঘটেছে, তবু চলার পথের অসংখ্য বিপদেও রামমোহন কখনো সত্যভ্রষ্ট হননি।

রামমোহনের ছবি তোমরা সকলেই দেখেছ। ওই তেজোদৃপ্ত আকৃতি তিনি মা-বাবার কাছ থেকেই লাভ করেছিলেন।

ছেলে বয়সেই রামমোহনের মায়ের কাছে অক্ষর পরিচয় হয়। এই সময় রামমোহন মায়ের খুব 'ন্যাওটা' ছিলেন। মায়ের কথাই ছেলের কাছে বেদ বাক্য। মা তারিণী দেবী সংসারের হাজার কাজের মাঝেও ছেলেকে মুখে মুখে নানা রকম গল্প বলতেন। সেই সব কাহিনী আর পুরানের গল্প রামমোহন অবাক হয়ে শুনতেন।

শিখবার আর জানবার আগ্রহ রামমোহন প্রথম মায়ের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন।

এরপর একজন গুরুমশাই বাড়িতেই রামমোহনকে মুখে মুখে শুভঙ্করী শেখান। সব ছেলেকেই তখন শুভঙ্করী মুখস্থ করতে হত।

রামমোহনের স্মরনশক্তি খুব প্রখর ছিল বলে দুই একবার শুনেই সে সব কিছু গড় গড় করে মুখস্থ বলতে পারতেন।

ছেলেবেলা থেকেই রামমোহনের ইতিহাস ও ভূগোল শিক্ষার খুব আগ্রহ ছিল। কোন দেশের মানুষ কি রকম পরিবেশে বাস করে, কোথায় পার্বত্য অঞ্চল, কোথায় নদী সাগর বেশি, এসব জানবার আগ্রহ ছিল তাঁর অসীম। বিভিন্ন দেশের আচার ব্যবহার জানতেও তিনি খুব কৌতুহলী ছিলেন। এরই ফলে পরবর্তী জীবনে তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করে নিজের জ্ঞান ভাণ্ডার পূর্ণ করেছিলেন।

তখনকার দিনে ছেলেদের তিন ভাবে শিক্ষা দেওয়া হত। এক—গুরুমশায়ের পাঠশালা ; দুই—ভট্টাচার্যের চতুষ্পাঠী, আর তিন—মৌলভীর মক্তব।

পিতার ব্যবস্থায় রামমোহন ছেলেবেলায় এই তিন রকম শিক্ষাই লাভ করেছিলেন।

খুব ছেলেবেলা থেকেই রামমোহন মেধাবী ছাত্র ছিলেন, একবার যা শুনতেন বা পড়তেন, তা কখনই ভুলতেন না। মা তারিণী দেবী তাঁর শত কাজের মাঝেও রামমোহনের দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখতেন

বাবা রামকান্ত চেয়েছিলেন, তাঁর মেধাবী ছেলে রামমোহন সকল দিক দিয়ে 'চৌকস' হয়ে গড়ে উঠুক। তাই তিনি তখনকার দিনে প্রচলিত সব রকম বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

রামমোহনের বাবা রামকান্ত সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। সেই জন্য মা তারিণী দেবী পুষ্টিকর খাদ্য খাইয়ে রামমোহনকে সকল দিক দিয়ে মেধাবী ও যত্নশীল ছিলেন। তারই ফলে রামমোহনের স্বাস্থ্য খুব ভালো ছিল।

বড় হয়ে তিনি ভারত ও ভারতের বাইরে বহু অঞ্চল পরিভ্রমণ করে জ্ঞান আহরণ করেছেন। দুর্গম পথে ভ্রমণের সময় তিনি বহু স্থানে বিপদেও পড়েছেন। কিন্তু কখনো ধৈর্য হারান নি। তাঁর মানসিক স্থৈর্য চিরকাল অটুট ছিল।

বাড়িতেই অক্ষর পরিচয় ও সাধারণ জ্ঞান লাভের পর রামকান্ত ছেলের আরবী ও ফারসী পড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। শুনলে আশ্চর্য হতে হয় রামমোহনের বয়স তখন মাত্র নয় বৎসর!

আরো মজার কথা এই যে, এই বয়সের মধ্যেই ছোট্ট ছেলে রামমোহনের দুটি বিয়ে দেন তাঁর মা-বাবা! এতে অবাক হবার কিছু নেই, কেননা, এই ছিল তখনকার সামাজিক বিধি। আট বছর বয়সে রামমোহনের প্রথম বিবাহ হয়। সেই পুতুল খেলার খেলাঘর ভেঙে গেল অল্প দিনের ভিতরেই। তাঁর প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু ঘটল।

আবার নয় বছর বয়সে রামমোহনের বাবা তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে দেন। রামমোহনের দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম ছিল শ্রীমতী দেবী। তার পিত্রালয় ছিল বর্ধমান জেলার কুড়মন পলাশী গ্রামে। রামমোহনের তৃতীয় পত্নীর নাম উমা দেবী। ইনি ভবানীপুরের মেয়ে। চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জির নামে ভবানীপুরে একটি রাস্তা আছে। উমাদেবী হচ্ছেন এই চন্দ্রনাথের পিসি।

যাই হক আমরা রামমোহনের বাল্য শিক্ষা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব।

রামমোহনের বাবা তাঁকে উচ্চ শিক্ষিত করবার জন্যে পাটনায় পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে তাঁকে আরবী ও ফারসী ভালো করে শিখতে হবে। সেই সময় যাতায়াতের জন্যে রেলগাড়ি চালু হয় নি। যানবাহনের বিশেষ সুবিধে ছিল না। তা ছাড়া পথে চোর ডাকাতের ভয় ছিল। এ সব বিপদের কথা ভেবেও রামকান্ত এতটুকু নিরুৎসাহ হন নি।

তখন সব বৈষয়িক কাজে আরবী ও ফারসীতে সম্পন্ন হত। আরবী ও ফারসী ভালো করে শিখতে না পারলে ছেলে জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারবে না, এই দূরদৃষ্টি নিয়ে পিতা রামকান্ত বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করে সেই বালককে পাঠিয়ে দিলেন সুদূর পাটনা শহরে। পাটনায় কার কাছে থেকে বালক রামমোহন শিক্ষালাভ করলেন—সেটা অবশ্য সঠিক জানতে পারা যায় না, তবে একথা সত্যি যে, রামমোহন পিতার আকাঙ্খা পূর্ণ করতে পেরেছিলেন। তখনকার দিনে ইস্‌লাম সাহিত্য ও শাস্ত্র অধ্যয়নের কেন্দ্রস্থল ছিল পাটনা শহর। সেখানে বহু শিক্ষিত মৌলভী বাস করতেন। তাঁদের শিক্ষা দান গুণে বালক রামমোহন অতি অল্প কালের মধ্যে আরবী ও ফারসী ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করেন। আরবী ভাষায় রামমোহন ইউক্লিড ও অ্যারিস্টটলের গ্রন্থও পাঠ করেন। তখনকার দিনে আরবী ও

ফারসী ভাষার মাধ্যমেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জ্ঞানের সম্যক পরিচয় পাওয়া যেত। এইখানে রামমোহন কোরাণ পাঠ করে একেশ্বরবাদ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই রাম-মোহন আরবী ও ফারসী ভাষা এমন সুন্দর ভাবে শিক্ষালাভ করেছিলেন যে, তাঁর নতুন নাম হয়ে গেল "জবরদস্ত্ মৌলভী।"

রামকান্ত কিন্তু এতেই খুশী হলেন না। তিনি এর পর রামমোহনকে পাঠালেন বারাণসী ধামে। সংস্কৃত ও হিন্দুশাস্ত্র শিক্ষা লাভের জন্য অতি প্রাচীন কাল থেকে বারাণসীর প্রসিদ্ধি ছিল।

তাই রামকান্ত এইবার ছেলেকে সুদূর বারাণসীতে প্রেরণ করলেন। মনে আকাঙ্খা ছেলে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ হবে।

বালক রামমোহন পিতার সে ইচ্ছাও পূর্ণ করলেন।

শোনা যায়, রামমোহনের মাতামহ এই সময় কাশীবাস করছিলেন। অনুমান করা যেতে পারে, বালক রামমোহন মাতামহের স্নেহচ্ছায়ায় ও সাহচর্যে অতি অল্পকালের মধ্যেই সংস্কৃত ও হিন্দুশাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন।

এরপর রামমোহন আবার রাধানগরে মা-বাবার স্নেহাঞ্চলে আশ্রয় লাভ করেন।

চৌদ্দ বৎসর বয়সে রামমোহনের মনে একবার সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণের আকুল আকাঙ্খা জাগে। এই সময় তাঁর এক বন্ধু জুটেছিল। তার কাছেই তিনি দেশ ভ্রমণের কথা শুনে বিভিন্ন দেশ দেখবার জন্যে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। ফলে তিনি আর সংসারে থাকবেন না, সন্ন্যাসী হয়ে সারা ভারত পরিভ্রমণ করবেন,—এই সঙ্কল্প করে ফেলেন।

কিন্তু ছেলেবেলায় রামমোহন খুব মাতৃভক্ত ছিলেন। মায়ের অনুমতি না নিয়ে ত' গৃহত্যাগ করা যায় না!

এইখানেই গোলযোগের সূত্রপাত হল। মাতা তারিণী দেবী কিছুতেই চৌদ্দ বছরের বালককে নিজের কোল খালি করে অনিশ্চিতের পথে ছেড়ে দেবেন না।

তিনি ছেলেকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে না যেতে সম্মত করালেন।

অবশেষে মাতৃস্নেহেরই জয় হল।

রামমোহন গৃহত্যাগের সেই প্রথম সঙ্কল্প পরিত্যাগ করলেন। জননীও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে গৃহ দেবতার আরাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন।

এর পর রামমোহন ষোল বছর বয়সে হিন্দুদের পৌত্তলিকতা সম্পর্কে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করেন। হিন্দুধর্মে বহু বিধি-নিষেধ ও কুসংস্কার তাঁর মনে বহু প্রশ্নের সৃষ্টি করেছিল; এই আত্ম জিজ্ঞাসা থেকেই তাঁর পুস্তক রচনা। অন্যদিকে মুসলমান ধর্মের একেশ্বরবাদ বালক রামমোহনকে অতি সহজেই আকর্ষণ করে। তাই বালক রামমোহন প্রথম প্রতিবাদ জানালেন তৎকালীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে। এই পুস্তিকা প্রকাশের পর তাঁর রক্ষণশীল পরিবারের সঙ্গে মতান্তর ঘটল।

পিতা রামকান্ত তাঁর ব্যবহারে বিশেষ ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হলেন। রায় বাড়িতে কোনো শান্তি

থাকল না। পিতা তাঁর ছেলের কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করেছিলেন। এই আশা ভেঙে যাওয়াতে পিতা-পুত্রের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল।

ফলে রামমোহন পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে অজানার আহ্বানে বহির্গত হলেন।

এই ষোল বছর বয়স থেকেই রামমোহন ভারত পথিক।

এই সময় রামমোহন দেশে ও বিদেশে বহু স্থানে পরিভ্রমণ করে জ্ঞান সঞ্চয় করেন। শোনা যায়, এই সময়ই রামমোহন জীবন বিপন্ন করে তিব্বতে গিয়েছিলেন আর বহুবার বহু বিপদের মুখে পড়েছিলেন।

তিব্বতের মেয়েরা স্নেহবশে অনেকবার তাঁর জীবন রক্ষা করে। তারা অনেকেই রামমোহনকে মায়ের স্নেহে আগলে রেখেছিল।

পরে অবশ্য রামকান্ত পুত্র স্নেহে রামমোহনকে স্বগৃহে ফিরিয়ে এনেছিলেন। রামমোহনের উপর পিতার বিশেষ দুর্বলতা ও স্নেহ সঞ্চিত ছিল।

তাঁর জীবিতাবস্থাতেই তিনি এই ছেলেকে বহু পৈত্রিক সম্পত্তি দান করে যান।

পারিবারিক বিগ্রহ সেবা নিয়ে পরবর্তী কালে মায়ের সঙ্গে রামমোহনের বহুবার মত বিরোধ ঘটে। কিন্তু ছেলেবেলায় মা বাবার কাছ থেকে রামমোহন যা পেয়েছিলেন তাতেই তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা গড়ে ওঠে। একবার যাকে সত্য বলে গ্রহণ করেছেন, তাকে কখনই পরিত্যাগ করেন নি রাজা রামমোহন রায়।

আর এই বিরাট গুণটি রামমোহন তাঁর পিতা মাতার কাছ থেকেই লাভ করেছিলেন।

মাছি

দীপকরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

ছোট্ট জিনিস সদাই ছোট
বলবে হয় তো সকল লোকে
কিন্তু জেনো ছোট্ট সে নয়
কালো মাছির ছোট্ট চোখে
ফুলকে মাছি শয্যা ভেবে
শুয়ে পড়ে আলস ভরে
কাঁটাকে সে বর্শা ভেবে
আঁতকে উঠে যায় যে সরে।
শিশির কণার আয়নাটিতে
মুখ সে দেখে সকাল ভরে

দাদুর পাকা চুলটিকে সে
শনের দড়ি মনে করে॥
তিলগুলোকে দেখবে যখন
নিশ্চয়ই সে কয়লা কবে!
পাঁউরুটির ওই প্যাকেটটা তার
পাহাড় বলেই মনে হবে
বরফ বলে ভুল করে সে
নুনের ছোট কণাটিকে
বোলতাটাকে বাঘ ভেবে সে
ছুটে পালায় পেছন দিকে॥

গ্রীক পুরাণের গল্প

এথেন্সের রাজা ঈজিউস যৌবনকালে একদিন একটি গ্রামের মধ্য দিয়ে পথ চলছিলেন। সেখানে একজন রূপসী তরুণী কন্যাকে দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহ করলেন। এঁরই গর্ভে থিসিউস নামে তাঁর একটি পুত্র হ'ল।

বালকটির যখন কয়েকমাস বয়স, তখন ঈজিউসের এথেন্সে ফেরার সময় হ'ল। কিন্তু যাবার পূর্বে তিনি একটি কাজ করে গেলেন। মাটির নিচে তিনি তাঁর তরবারি এবং পাদুকা পুঁতে রেখে তার উপর প্রকাণ্ড ভারী একটি পাথর চাপালেন। যাবার পূর্বে তিনি রানীকে বললেন, 'যখন পুত্র যথেষ্ট বলবান হয়ে এ পাথরকে তুলে ফেলতে পারবে, তখন তাকে এ তরবারি আর পাদুকা নিয়ে এথেন্সে পাঠিয়ে দিয়ো। আমি তাকে আমার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করব।" পুত্রকে আদর করে, রানীর কাছে বিদায় নিয়ে রাজা যাত্রা করলেন।

এদিকে যে সময়ে থিসিউসের জন্ম হয়েছে, সে সময়ে ক্রিটের রাজা মিনোসেরও একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। পুত্রটি মিনোসের চোখের মণি। তার শিক্ষার জন্য সকল প্রকার যত্নই তিনি নিতে লাগলেন। অল্প সময়েই সকল বিষয়ে রাজপুত্র অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করল।

সেই সময়ে প্রতি বৎসরই বসন্তের দিনে এথেন্সে এক বিরাট ক্রীড়ানুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হত। দেশ-

বিদেশের নানা গুণী, শিল্পী, যোদ্ধা, বলবান ব্যক্তি এ অনুষ্ঠানে যোগদান করে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করতেন : ক্রিটের রাজপুত্র বড় হলে রাজা একদিন তাকে ডেকে বললেন, 'পুত্র, নানা বিষয়ে তুমি শিক্ষা লাভ করেছ। অস্ত্রবিদ্যায়ও তুমি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছ। তুমি এথেন্সে যাও। সেখানে এক বিরাট ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন হচ্ছে : তুমি তোমার যোগ্যতা প্রদর্শন করে এসো।'

পিতার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে ক্রিটের রাজপুত্র এথেন্সে এসে উপস্থিত হল। এথেন্সের সকলেই অল্প দিনের মধ্যে তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সকল বিষয়েই তার অসাধারণ নৈপুণ্য! এমন অমিত বলসম্পন্ন যুবক, এমন অসীম সাহসী যোদ্ধা, এমন মহৎ উদার প্রাণ সচরাচর দেখা যায় না।

কিন্তু এ ব্যাপারে এথেন্সের রাজা ঈজিউস মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি এই সুকুমার রাজপুত্রের উপর ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়লেন। উৎসব শেষে রাজপুত্র যখন ক্রিটে ফিরে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে তাকে হত্যা কররার জন্য ঈজিউস এক জঘন্য চক্রান্ত করলেন। সারাদিনের পথচলার শেষে ক্লান্ত রাজকুমার যখন একটি গাছের নিরাপদ আশ্রয়ে পরম নির্ভয়ে গভীর নিদ্রামগ্ন, তখন আততায়ীর নিষ্ঠুর ছুরি তার কোমল, নির্ভীক হৃদয় বিদীর্ণ করে অবিশ্বাসী পৃথিবীর সঙ্গে তার সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন করে দিল।

এ নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের জন্য এথেন্সের লোকেরা নিশ্চয়ই রাজাকে দোষারোপ করত; কিন্তু এর মধ্যে এমন এক ব্যাপার ঘটে গেল যার জন্য সকলে ভুলে গেল রাজার নিষ্ঠুরতার কথা। ব্যাপারটা হল, এথেন্সের রাজপুত্র তার পিতার কাছে এসে উপস্থিত!

থিসিউস যখন বেশ বড় ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, তখন একদিন রাণী তাকে যেখানে ঈজিউসের তরবারি এবং পাদুকা পুঁতে রাখা হয়েছিল, সেখানে নিয়ে এলেন। তাকে বললেন, "দেখ বাবা, এখানে তোমার পিতার তরবারি আর পাদুকা লুকিয়ে রাখা হয়েছে। ওপরে দেখ ঐ প্রকাণ্ড পাথরটা চাপান আছে। তুমি যদি ওটাকে তুলতে পার, তা'হলেই তুমি তোমার পিতার তরবারি আর পাদুকা পাবে। আর সেগুলি নিয়ে গেলেই তুমি এথেন্সের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবে।

অমিত বলবান থিসিউস অবলীলাক্রমেই প্রকাণ্ড পাথরটাকে তুলে ফেলল। তারপরে তার নীচে থেকে তার পিতার তরবারি আর পাদুকা খুঁজে বার করল। মায়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে এথেন্সের পথে যাত্রা করল থিসিউস।

এথেন্সের পথ অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ডাকাতের ভয়; ক্রুদ্ধ দৈত্যদানব নিরীহ পথচারীকে বিপদে ফেলার জন্য সমস্ত রকমের ফাঁদ পেতে রেখেছে। দু'দিকের বনই অসংখ্য জন্তু-জানোয়ারে ভরা। কিন্তু থিসিউসের শক্তি অসাধারণ, সাহসও অসীম। যে সব ডাকাত তাকে আক্রমণ করল কেহই প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারল না; যে-সমস্ত দৈত্যদানব তাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করল, বুদ্ধিতে সে সকলকেই হারিয়ে দিয়ে ফাঁদ এড়িয়ে চলল; যে সমস্ত জন্তু জানোয়ার তার সম্মুখে এল, পিতার তরবারি দিয়ে প্রত্যেকের প্রাণই সে হরণ করল।

অবশেষে বহু দুঃখ কষ্ট সহ্য করে ক্লান্ত দেহে একদিন থিসিউস তার পিতার রাজধানীতে পোঁছো

উপস্থিত হল। এই সুন্দর সাহসী, শক্তিশালী পুত্রটিকে দেখে ঈজিউস তো আনন্দে আত্মহারা। রাজপ্রাসাদের দ্বার তিনি সাধারণের জন্য খুলে দিলেন। দিনরাত্রি ধরে চলতে লাগল খাওয়া দাওয়া, হৈ হুল্লোড়, আনন্দ উৎসব। সিংহাসনের জন্য আর কারো দুর্ভাবনা নেই, সিংহাসনের যোগ্য উত্তরাধিকারী নিজেই এসে উপস্থিত।

ঠিক এই কারণেই এথেন্সের লোকেরা ক্রিটের রাজপুত্রের নিষ্ঠুর হত্যাকাহিনীটা ভুলে গেল।

এদিকে এথেন্সে যখন চলছে দিবারাত্রি আনন্দোৎসব, ক্রিটের রাজার মিনোস তখন পুত্রের প্রত্যাবর্তনের আশায় পথ চেয়ে আছেন। কিন্তু হায়, তিনি তো জানেন না এক নিষ্ঠুর চক্রান্ত তাঁর প্রিয় পুত্রের কোমল প্রাণটিকে হরণ করেছে আর এথেন্সের বাইরে এক নিবিড় বনের অভ্যন্তরে পড়ে আছে তার মৃতদেহ।

কিন্তু এ নিদারুণ সংবাদ রাজা মিনোসের অগোচরে রইল না বেশি দিন। একদিন কয়েকজন পথিক ঐ বন দিয়ে চলতে চলতে দেখতে পেল ক্রিটের রাজকুমারের মৃতদেহ আর নিয়ে এল তা রাজা মিনোসের কাছে। রাজা যখন তাঁর প্রিয়পুত্রের মৃতদেহ দেখলেন আর জানলেন কি ভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছে, তখন শোকে দুঃখে অধীর হয়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন : এ হত্যার প্রতিশোধ তিনি নেবেনই।

একদিন ঈজিউস যখন তাঁর পুত্রকে নিয়ে প্রাসাদ কাননে বিচরণ করছিলেন, তখন দূত এসে সংবাদ দিল ক্রিটের রাজা এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে তার পুত্র-হত্যার প্রতিশোধ নিতে আসছেন। উৎসবমুখর নগরীর আনন্দোজ্জ্বল মুখে মুহূর্তের মধ্যে ভীতি-বিহ্বলতার ছায়া নেমে এল।

এদিকে রাজা মিনোস এক বিরাট সৈন্য বাহিনী নিয়ে এথেন্সের দিকে যাত্রা করলেন। এথেন্সে যেতে হলে একটা বড় নগরী পার হয়ে সমুদ্রে যেতে হয় এবং সে সমুদ্র অতিক্রম করতে হয়। কিন্তু নগরের দ্বারে এসে তিনি পথরুদ্ধ হলেন। এ-নগরের রাজা মিনোসকে নগর অতিক্রম করতে দেবেন না। তাই নগরের বাইরে তাঁবু ফেলতে হল। সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন রাজা মিনোস।

এ নগরের রাজা বৃদ্ধ। তাঁর সমস্ত চুল পেকে গেছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার তাঁর কপালের মধ্যখানে ঝুলছে একগুচ্ছ কাঁচা বেগুনী চুল। নগরবাসীর বিশ্বাস, যতক্ষণ পর্যন্ত রাজার মাথায় ঐ চুল আছে, ততক্ষণ কেহই, সে যত শক্তিশালীই হোক না কেন, নগরে প্রবেশ করতে পারবে না। নগরে প্রবেশ করতে হলে রাজার মাথার ঐ কাঁচা একগুচ্ছ বেগুনী চুল সংগ্রহ করতে হবে।

এ নগরের রাজকন্যা যখন শুনল রাজা মিনোস এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে নগরের দ্বারে এসে তাঁবু ফেলেছেন, তখন তাই দেখবার জন্য প্রাসাদের উচ্চ শিখরে সে আরোহণ করল। সে দেখল : এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নগরীর বাহিরে তাঁবু পেতে বসেছে। একদিকে একটি সাদা ঘোড়ার উপর বসে আছেন রাজা মিনোস। মৃদু বাতাসে তাঁর বেগুনী পোষাক কাঁপছে।

সুদর্শন সুদীর্ঘ, অসীম সাহসী রাজাকে দেখে রাজকন্যা প্রেমে অভিভূত হয়ে পড়ল। ঘটনাচক্রে রাজা মিনোস তাদের শত্রু হয়ে পড়েছেন ভেবে তার কষ্ট হতে লাগল।

আচ্ছা, নগরের দ্বার খুলে দিলে হয় না ? তা' হলে রাজা মিনোস নিশ্চয়ই তাকে ভাল বাসবেন।

কিন্তু তা'-ও তো করা যায় না। তা করলে যে নগরীর প্রতি শত্রুতা করা হবে, পিতার প্রতি শত্রুতা করা হবে। দ্বিধায় পড়ল রাজকন্যা, পিতা তাকে কত ভালবাসেন। কি করে সে পিতার বিরুদ্ধাচরণ করে?

কিন্তু দিনের পর দিন সে যতই প্রাসাদের উচ্চ চূড়ায় উঠে রাজা মিনোসকে দেখতে লাগল ততই তার মনে হতে লাগল রাজা মিনোসের প্রেম লাভ করার ঐ একটিমাত্র উপায়ই আছে।

অবশেষে একদিন সে তার নগরীর ও পিতার বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত হল। নিদ্রামগ্ন পিতার কপাল থেকে বেগুনী চুলের গুচ্ছটিকে কেটে নিতে কোনই অসুবিধা হল না। তারপর সে রাত্রের অন্ধকারে বেরিয়ে এসে নগরীর দরজা খুলে এসে দাঁড়াল।

কম্পিতকণ্ঠে বলল রাজকন্যা, 'আমি এ নগরের রাজকন্যা। আপনার জন্য আমার পিতার এ চুলের গুচ্ছ চুরি করে নিয়ে এসেছি। আপনি এটি গ্রহণ করুন এবং আমার ভালবাসাও গ্রহণ করুন।

মিনোস আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'কি! একজন অচেনা লোককে ভালবাসার জন্য তুমি তোমার নগরের ক্ষতি করবে, পিতার প্রাণ বিপন্ন করবে? যে-স্ত্রীলোক এ-কাজ করতে পারে, তার দ্বারা সমস্ত অসৎকর্মই সম্ভব। তোমার জন্যই আমি দুঃখিত, তুমি আমার কোনো কাজেই লাগবে না।'

তখন রাত্রি প্রভাত হয়ে এসেছে। আকাশের কালো পর্দাটা কখন ছিঁড়ে গিয়ে প্রভাতে খুশির আলো একটু একটু করে ঝরে ঝরে পড়ছে। রাজা তাঁর সৈন্যদের জাগিয়ে নগরীতে প্রবেশ করলেন, সাহস আর শক্তি দিয়ে নগর জয় করলেন।

নগরের শেষ প্রান্তে সমুদ্র। নগর পার হয়ে রাজা মিনোস তাঁর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সমুদ্র তীরে এসে উপস্থিত হলেন। রাজা আদেশ করলেন জাহাজে চেপে তারা যেন এখুনি এথেন্সের দিকে যাত্রা করে।

একে একে যখন সমস্ত জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে এবং শেষ জাহাজটিও ছেড়ে দিল, তখন রাজকন্যা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে জাহাজের হাল ধরে ফেলল। সে কেঁদে মিনোসকে বলল, 'আপনি আমাকে চান বা না চান, আমি আপনার সঙ্গে যাবই। আপনি ছাড়া আমার জীবন মূল্যহীন। আমার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য নগরীর দ্বার আমার জন্য চিরকালের মতো রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। আমি আপনার জন্য নগরীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। আমি আমার নগরীর শত্রু হলেও আপনার মিত্রতা করেছি। তাই আপনাকেই আমি অনুসরণ করব। আপনি যেখানে যাবেন, আমিও আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাব।'

কিন্তু রাজা কোনো কথা শুনলেন না। তাঁর সৈন্যরা রাজকন্যাকে জাহাজ থেকে সরিয়ে ফেলল। রাজকন্যা ডুবে যেতে লাগল। শীঘ্রই রাজকন্যা একটি পাখিতে পরিণত হল।

বিষণ্ণ হৃদয় রাজকন্যা নগরীর উপর দিয়ে উড়ে চলে গেল। কারো সঙ্গে সে কথা বলতে পারে না। আকাশে আর যে-সব পাখি উড়ে চলে, তারাও তাকে এড়িয়ে যায়। এমনি করে রাজকন্যা তার অসৎ-কর্মের জন্য শাস্তি পেতে লাগল।

এদিকে অল্পদিনের মধ্যে রাজা মিনোস এথেন্সে এসে উপস্থিত হলেন। নগরীতে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য, কারণ নগরীর দ্বার বন্ধ আর নগরী সুরক্ষিত। সুতরাং নগর দ্বারের বহির্ভাগে তিনি শিবির স্থাপন করলেন।

রাজা মিনোস তাঁর সৈন্যদের জন্য প্রচুর খাদ্য নিয়ে এসেছিলেন। আর প্রয়োজনমতো খাদ্য বাইরে থেকেও সংগ্রহ করা যেত। কিন্তু অবরুদ্ধ এথেন্স নগরীর অধিবাসীদের অসুবিধা শুরু হল। সঞ্চিত খাদ্য সমস্ত নিঃশেষিত, বাইরে থেকেও খাদ্য সংগ্রহের উপায় নেই। নগরীর দ্বার খুললেই শত্রু এসে নগরী অধিকার করবে। বহু লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করল। আর যারা কোনক্রমে বেঁচে রইল, তাদেরও বলবান শত্রু সৈন্যর সঙ্গে যুদ্ধ করার শক্তি রইল না।

নগরীর লোকেরা পুরোহিতের সঙ্গে দেখা করে জানল ক্রিটের রাজা যা চান তাই তাদের করতে হবে। তা না করলে তাদের রক্ষা নেই। পুরোহিতের পরামর্শমতো রাজা মিনোসের কাছে দূত পাঠানো হল কি হলে নগরী ছেড়ে তিনি চলে যাবেন।

মিনোস বললেন প্রতি বৎসর সাতজন যুবক ও সাতজন অবিবাহিত যুবতী তাঁর পালিত দৈত্য মিনোটরের খাদ্য হিসাবে প্রেরণ করা হলেই তিনি নগরী ছেড়ে চলে যাবেন।

দূত মিনোসের বার্তা নিয়ে ফিরে এল। সকলে এ প্রস্তাব শুনে বিষণ্ণ হয়ে গেল। প্রথমে প্রস্তাবটাকে একেবারে অবাস্তব ও গ্রহণের অযোগ্য বলে মনে হ'ল। পরে সকলে যখন পুরোহিতের পরামর্শের কথা মনে করলেন তখন সকলেই ভাবলেন: সমস্ত লোক একসঙ্গে অনাহারে মরার চেয়ে প্রতি বৎসরে সাতজন যুবক এবং সাতজন যুবতীর মরা অনেক ভালো।

প্রস্তাব অনুসারে চৌদ্দজন হতভাগ্য যুবক-যুবতীকে রাজা মিনোসের সঙ্গে প্রেরণ করা হ'ল মিনোটরের খাদ্য হিসাবে।

পরের বৎসরে এবং তার-ও পরের বৎসরে সেই একই ব্যাপার অনুষ্ঠিত হ'ল। রাজা মিনোসের এই হিংস্র দাবীকে অমান্য করার সাহস কারো হল না। এইভাবে যখন চতুর্থবার ভেট পাঠানর সময় উপস্থিত হ'ল, তখন রাজপুত্র থিসিউস নিজেই ভেট হিসাবে যেতে চাইল। অটল তার সংকল্প: হয় প্রতি বৎসরে প্রাণ হানি থেকে সে তার দেশকে বাঁচাবে, নয় তো নিজেই দৈত্যের খাদ্য হবে। বৃথাই রাজা তার মন ফেরাবার চেষ্টা করলেন।

যাবার দিনে রাজা কাঁদতে কাঁদতে সমুদ্র তীরে এলেন। হায়, তাঁর নিজের দোষে একমাত্র রাজকুমার এথেন্সের সিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী – প্রাণ হারাতে চলেছে!

কালো পাল-তোলা জাহাজে চড়ে অন্যান্যদের সংগে থিসিউস যাত্রা করল। জাহাজে উঠবার সময় বিষণ্ণ পিতাকে দেখে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'পিতা, আপনি কিছু ভাববেন না। আমি যখন আরো

-, তখনই আমি বহু দৈত্য-দানব হত্যা করেছি। এখন আমি আর ও অনেক শক্তিশালী

সুদর্শন-ম নিশ্চয়ই মিনোটরকে হত্যা করে, বিজয়ী হয়ে এথেন্সে ফিরে আসব।'

রাজা মিনোস ঘ ।ল তুলে থিসিউসের জাহাজ অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যে কালো সাগরে মিলিয়ে গেল।

আহা, ন'

জাহাজে করে যেতে যেতে থিসিউস তার সহযাত্রীদের সান্ত্বনা দিতে লাগল। কিন্তু তারা বিন্দুমাত্র আশান্বিত হতে পারল না। দৈত্যটাকে বধ করা একেবারেই অসম্ভব। আর যদিও বা ওটাকে বধ করা যাবে, গোলকধাঁধা থেকে বেরোবার উপায় কি?

শেষে তারা ক্রিটে এসে উপস্থিত হ'ল। রাজা মিনোস দেখলেন এ সব ভীত সন্ত্রস্ত তরুণ তরুণীদের। এদের দেখলে সকলের মনেই করুণার উদয় হয়। কিন্তু রাজার হয় না। করুণার উদয় হতেই নিহত রাজপুত্রের সুন্দর, বীর্যবান মুখখানিকে মনে পড়ে। ইস্পাতের মতো শক্ত হয়ে ওঠে রাজার মন।

রাজার পাশেই বসে, রাজকন্যা সুন্দরী এরিয়াডনি। তার হৃদয় ফুলের মতোই কোমল। এ সব হতভাগ্য তরুণ-তরুণীদের দেখে ওর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল।

হঠাৎ রাজা থিসিউসের দিকে তাকালেন। তিনি বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কি এথেন্সের রাজপুত্রও আছে?'

গর্বিত-কণ্ঠে উত্তর দিল থিসিউস, 'সম্রাট. আমিই এথেন্সের রাজপুত্র। আপনার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।'

'বল, কি তোমার প্রার্থনা।'

'আমি প্রার্থনা করছি, সম্রাট আজ রাত্রে আমার সঙ্গীরা সব সভাগৃহেই নিদ্রা যাবে। শুধু আমি একা গোলক ধাঁধায় প্রবেশ করব। কাল সকালে আমার সঙ্গীরা আমায় অনুসরণ করবে।'

রাজা হেসে বললেন: 'রাজপুত্র একাই মরতে চাও দেখছি। আচ্ছা তাই হোক।'

এরিয়াড্‌নি বিমুগ্ধ নয়নে তরুণ রাজকুমারের দিকে তাকিয়েছিল। সে ভাবল: আমি যদি তাঁকে বাঁচাতে পারি, তা' হলে রাজপুত্র মরবেন না।'

থিসিউসকে গোলকধাঁধার দ্বার পর্যন্ত পৌঁছে দেবার জন্য এরিয়াড্‌নি রাজার অনুমতি চেয়ে নিল। যখন আকাশ অন্ধকার হয়ে গেছে এরিয়াড্‌নি তখন রাজপুত্র থিসিউসকে নিয়ে প্রাসাদের বাইরে এল।

স্বচ্ছ চন্দ্রোজ্জ্বল রাত্রি। একটা মিষ্টি সুগন্ধ বাতাস বইছে। যে জাহাজে করে থিসিউস এসেছে, সে জাহাজের পাল পত্‌ পত্‌ করে উড়ছে।

গোলকধাঁধার প্রবেশপথে এসে এরিয়াড্‌নি বলল, 'রাজপুত্র, তোমার আর তোমার বন্ধুদের জন্য আমার কষ্ট হচ্ছে। এ বীভৎস মৃত্যু থেকে তোমাদের কারো নিষ্কৃতি নেই। তবে, তুমি তো সাহসী, বলবান আর তোমার তরবারিরও যথেষ্ট ধার আছে। তুমি দৈত্যটাকে বধ করে তোমার সঙ্গীদের নিয়ে আজ রাত্রেই কেন পালিয়ে যাও না?'

এ-কথার উত্তরে কৃতজ্ঞচিত্তে থিসিউস রাজকন্যার দিকে তাকিয়ে বলল, 'রাজকন্যা, আমি যে-কোনো দৈত্যকেই বধ করতে পারি, সে সাহস ও শক্তি আমার আছে। কিন্তু আমি এ দৈত্যটাকে বধ করলেও আমি গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে আসব কি করে?'

এরিয়াড্‌নি থিসিউসকে একটা শক্ত রশি দিয়ে বললে, 'রাজপুত্র, এ রশির একটা দিক তুমি গোলকধাঁধার প্রবেশপথে বেঁধে নিয়ো, অন্য দিকটা শক্ত করে তোমার বাঁ হাতে ধরে রেখো, দৈত্যটাকে যদি বধ করতে পার, তা' হ'লে তোমার হাতের রশিটা গুটালেই তুমি আসার পথ পাবে।'

থিসিউস রাজকন্যাকে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় দিল। তারপর রাজকন্যার কথামতো রশির এক দিক প্রবেশ পথের দ্বারে বেঁধে নিল। বহু অন্ধকার ঘোরানো পেঁচানো পথ দিয়ে থিসিউস একটা খোলা জায়গায় এসে পড়ল। সেখানে গভীর নিদ্রায় মগ্ন দৈত্য। দৈত্যটার ধারণা ছিল পরের দিন সকালে খাদ্য এসে পৌছাবে।

খুব সাবধানে থিসিউস মিনোটরের পিছনে এসে দাঁড়াল এবং ধারাল তরবার দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে দৈত্যটার মাথা কেটে ফেলতে কোনো অসুবিধা হ'ল না। তারপরে এরিয়াড্‌নির উপদেশ মতো রশি গুটাতে গুটাতে গোলক ধাঁধার প্রবেশ পথে এসে উপস্থিত হ'ল রাজকুমার।

এরিয়াডনি থিসিউসের জন্য এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিল। সে তার জন্য খাবার এনে রেখে ছিল। খাবার খেয়ে থিসিউস বেশ সতেজ বোধ করল। রাজকন্যা তাকে এবার সঙ্গীদের নিয়ে পালিয়ে যেতে বলল। থিসিউস সম্মত হল : কিন্তু একা নয়, এরিয়াডনিও যাবে তাদের সঙ্গে এথেন্সের রাজপুত্রের স্ত্রী হিসাবে। মৃদু হেসে সম্মত হল এরিয়াডনি—ক্রিটের রাজকন্যা।

সঙ্গী যুবক-যুবতীদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে সে রাত্রেই এথেন্সের পথে জাহাজে করে পাড়ি দিল থিসিউস আর এরিয়াডনি। সেই থেকে আর ক্রিটে যুবক-যুবতী ভেট হিসাবে পাঠাতে হত না, কারণ দৈত্যটা আর বেঁচে নেই।

ছড়া

অতীন মজুমদার

(১)

সুখের যত পায়রাগুলো বকম্‌ বকম্‌ করে,
দুখের চড়াইগুলো কেবল দানা খুঁটেই মরে।
এম্নি ক'রেই চলবে চিরকাল কি।
ধর্মের কল নড়লে দাদা তখন হবে হাল কি ?

(২)

বর্গীরা সব এসেছিল—গেছেও তারা চলে
ধান খাওয়া সব বুলবুলিরা গেছে দলে দলে !
ধানের গোলা হায়রে তবু ফাঁকা,
খাজনা দেবে কিসে দাদা—ট্যাঁকে যে নেই টাকা

আমাদের দেশ

সুবোধকুমার চক্রবর্তী

(২)

সকাল সাড়ে দশটায় আমরা ত্রিবেন্দ্রামে এসে নামলাম। পরিচ্ছন্ন রৌদ্রে তখন সমস্ত স্টেশন আলো হয়ে আছে, ভাল লাগল এই স্টেশনটি।

গাড়িতেই আমরা মুখ হাত ধুয়ে স্নান করে নিয়েছিলাম। তার আগে কুইলনে আমরা জলযোগ করেছি। গাড়ি সেখানে পনর মিনিট দাঁড়ায়। বরকলা স্টেশনটিও দেখেছি। কুইলন আর ত্রিবেন্দ্রামের মাঝে এই স্টেশন। সমুদ্রের ধারে জনার্দনের মন্দিরের কথা আমাদের মনে পড়েছিল।

প্ল্যাটফর্মে নেমেই পুপু জিজ্ঞাসা করল, 'এখন আমরা কী করব ছোটকা ?'

ঘণ্টু বলল, 'সোজা কন্যাকুমারী যাব।'

আমি বললাম, 'এ শহরটা বুঝি দেখবে না ?'

পুপু বলে উঠল, 'এই শহরটাই আগে দেখব ছোটকা, তারপরে কন্যাকুমারী যাব।'

একজন কুলি এসেছিল কাছে, সে আমার মুখের দিকে চেয়ে আদেশের অপেক্ষা করছিল। আমি তাকে রিফ্রেসমেণ্ট রুমের দরজায় আমাদের জিনিসপত্র পৌঁছে দিতে বললাম। আশ্চর্য হয়ে দুজনেই আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি বললাম, 'দুটো খেয়ে নিয়েই বেরনো যাক, কী বল ! তাহলে আর কোন ভাবনা থাকবে না।'

খাবার কথা কারও মনে হয়নি, তবু আমরা খেয়ে নিলাম। তারপর জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়েই ট্যাক্সিতে উঠলাম। ট্যাক্সির ভাড়া এখানে বেশি নয়, সমস্ত শহর দেখিয়ে আমাদের বাস স্ট্যাণ্ডে পৌঁছে দেবে। বিকেলে পৌঁছলেও চলবে। কন্যাকুমারী এখান থেকে বাহান্ন মাইল পথ, এক্সপ্রেস বাসে চাপলে হয়তো সূর্যাস্তের আগেই পৌঁছে যাব।

ড্রাইভার আমাদের প্রথমেই নিয়ে এল চিড়িয়াখানার দরজায়। গাড়ি থেকে নেমে আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আকাশ যে কখন মেঘাচ্ছন্ন হয়েছিল তা আমরা দেখতে পাইনি। মাথায় কয়েক ফোঁটা জল পড়তেই আকাশের দিকে চেয়ে দেখলাম। টিপটিপ করে বৃষ্টি নয়, ইলশে গুঁড়ি। ঘণ্টু ও পুপুও নেমে পড়েছিল, আমি তাদের ঠেলে গাড়িতে তুলে দিলাম। অসময়ের এই বৃষ্টিতে ভেজার পরিণাম কী হবে জানিনে, খারাপ হলে এই বিদেশে বিপদে পড়ে যাব। দরকার নেই চিড়িয়াখানা দেখে, আমি ড্রাইভারকে অন্যত্র যেতে বললাম, যেখানে খোলা আকাশের নিচে ঘুরে ঘুরে কিছু দেখতে হবে না।

এই শহরের রাস্তা একটু উঁচু-নিচু। এখানেও তাই। ড্রাইভার একটি-ব্যাক করল

সোজা উঠে গেল সামনের দিকে। পরিষ্কার রাস্তা, দুধারে গাছপালা বাগান। একখানা লাল র
সুন্দর বাড়ির সামনে এসে আবার দাঁড়াল।

গাড়ি থেকে নেমেই আমরা ভিতরে গিয়ে ঢুকলাম। জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে এটি ত্রিবা
রাজ্যের জাদুঘর। এখনও ঝাড়ামোছা হচ্ছে, খুলবে দুপুর বেলায়। ফিরে এসে আবার আমরা গাড়ি
বসলাম।

ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিল এবং প্রবল উদ্যমে টেনে এনে আর একটা বাড়ির সামনে দাঁ
করিয়ে দিল। নেমে দেখলাম যে সেই বাড়ির গায়েই তার পরিচয় লেখা, রেপটাইল হাউস।

ভিতরে ঢুকে গা ঘিন ঘিন করে উঠল। কত রকমের সাপ আর সরীসৃপ। ঘন্টু খুসী হয়েছি
খুব, কিন্তু পুপু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল।

এর পরে আমরা ডানদিকের বাড়িতে গিয়ে ঢুকলাম। ঘরের ভিতর বিচিত্র সব জিনিস। বা
ও যবদ্বীপের মুখোস আর পোশাক। নানা দেশের নানা শিল্পের নমুনা।

পায়ে হেঁটে আরও খানিকটা এগিয়ে চিত্রালয়। একটা বিরাট বাগানের মধ্যে এই বাড়িগুলি
দেখছি। মাঝখানে তারের বেড়ার ভিতর অনেক রকমের জন্তু জানোয়ার। সেটা চিড়িয়াখানার
সীমানা। রাস্তা উঁচু-নিচু। মনে হয় এ সমস্তই একটা পাহাড়ের মাথায়।

চিত্রালয়ে ঢুকে আশ্চর্য হতে হয় বাঙালী শিল্পীর সম্মান দেখে। রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্র
নাথ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের এমন কোন শিল্পী নেই যাঁর ছবি বাঙলায় আছে আর
এখানে নেই।

আরও অনেক শিল্পীর ছবি দেখলাম এখানে। সারা ভারতের সমস্ত শিল্পীর ছবি একত্র করা
হয়েছে প্রচুর নিষ্ঠার সঙ্গে। এমনটি আর কোথাও দেখিনি। দেশের রাজার যে শিল্পী-প্রীতি ছিল তাতে
কোন সন্দেহ রইল না।

জানা গেল যে বিখ্যাত শিল্পী রবিবর্মা এই রাজপরিবারের একজন ছিলেন। ডানদিকের একটা
বড় ঘরে তাঁর অনেকগুলি অপরূপ ছবি টাঙানো আছে। বাঁ দিকের আর একটা ঘরে তাঁর স্কেচ
দেখলাম। অত্যন্ত ক্ষিপ্রহাতে স্কেচ করেছেন, ছবির নিচে সময়ের পরিমাণ লেখা আছে। কোনটা
চল্লিশ সেকেণ্ড, কোনটা বা তারও কম সময়ে আঁকা।

পুপু প্রথমটায় বুঝতে পারেনি, ঘন্টু তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল। সব শুনে সে বলল, চল্লিশ
সেকেণ্ড যে এক মিনিটও নয় ছোটকা! আমরা চল্লিশ মিনিটের একটা ক্লাসেও ছবি আঁকতে পারিনে।

আমি বললাম, 'তাহলে তোমাকে একটা গল্প বলতে হয়।'

গল্প শোনার নামে দুজনেরই সমান উৎসাহ। তাই দেখে বললাম, 'একবার একজন নামজাদা
বিদেশী শিল্পী এসেছিলেন অবন্ ঠাকুরের কাছে। তিনি তখন তাঁর নিজের জায়গায় বসে ছবি আঁক-
ছিলেন, আর তামাক খাচ্ছিলেন। বিদেশী শিল্পী তাঁকে কয়েক সেকেণ্ড স্থির হয়ে থাকতে অনুরোধ
করলেন। গড়গড়ার নল নিয়ে তিনি স্থির হয়ে রইলেন আর কয়েক সেকেণ্ড পরেই বিদেশী ভদ্রলোক

তাঁর হাতে স্কেচটি দিলেন। অবন্ ঠাকুর সেই স্কেচ হাতে নেবার আগে নিজের হাতে আঁকা অন্য স্কেচ দিলেন বিদেশীর হাতে। ঐটুকু সময়ে তিনিও বিদেশী শিল্পীর একখানা ছবি এঁকে ফেলেছিলেন।'

চিত্রালয়ের রক্ষীরা বাতি জ্বেলে ঘরগুলো আমাদের দেখাচ্ছিল। এবারে তারা উপরে চলেছিল দোতলায়। কিন্তু মন তখন আমাদের ভরে গিয়েছিল। তাই আমরা তাড়াতাড়ি দেখা সেরে নেমে এলাম।

বাইরে এসে পরিবেশটি বড় ভাল লাগল। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সূর্যের কিরণ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। পাতায় আর ফুলের পাপড়িতে ঝিকমিক করছে সকালের শিশিরের মতো বৃষ্টির জল।

এবারে আমাদের গাড়ি এসে রাস্তার ধারের একটা গেট পেরিয়ে বাগানের ভিতর ঢুকল। মনে হল যে একটা পাহাড়ের শহরে এসেছি। এক ধাপ নিচে একটা বাড়ি, তার পিছনে সরোবর। আর এক ধাপ উপরে পাহাড়ের গায়ে গায়ে আরও কয়েকটা বাড়ি। ঘোরানো রাস্তায় খানিকটা এগিয়ে একটা বাড়ির সামনে ড্রাইভার গাড়ি থামাল। গাড়ি থেকে নেমে দেখলাম যে সেটা ত্রিবেন্দ্রামের ওয়াটার ওয়ার্কস্—সহরের সমস্ত জল যায় এইখান থেকে।

একে একে আমরা আরও অনেক দ্রষ্টব্য স্থান দেখলাম। হাইকোর্ট, পাবলিক লাইব্রেরি, রাজ-প্রাসাদ, সরকারী অবজারভেটরি, বিশ্ববিদ্যালয় আর অ্যাকোয়েরিয়াম অ্যাকোরেরিয়াম দেখতে ঘণ্টু ও পুপুর আনন্দ আর ধরে না। কত জাতের মাছ আর মাছ জাতীয় কত প্রাণী নিঃশঙ্কে ঘুরে বেড়াচ্ছে বড় বড় কাচের ঘরে। শৌখিন লোকের ঘরে লালনীল মাছ পোষবার শখ যে কত বড় হতে পারে এ তারই বিরাট নমুনা। এখানে খুদে খুদে ব্ল্যাকমলি এঞ্জেল কিসিং গোরামি আর ফাইটার ফিস নেই, আছে সত্যিকার মাছ, নদী আর সমুদ্রের জলের ছোট বড় নানারকম মাছ।

আরও খানিকটা এগিয়ে আমরা সমুদ্রের ধারে গেলাম। ঝড়ের মতো বাতাস বইছে সেখানে। ঢেউ এসে পাড়ের উপর সশব্দে আছড়ে পড়ছে। গাড়ি থেকে নামবার আগেই শিপশিপ করে আবার বৃষ্টি নামল, কুয়াশায় চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তবে অন্ধকার নেই, অপূর্ব আলোয় উজ্জ্বল এই কুয়াশা। বৃষ্টিধারার ফাঁকে ফাঁকে রৌদ্র ঝরছে অকৃপণ ভাবে। সমুদ্রের ধারে আমরা নামতে পারলাম না।

ফেরার পথে শ্রীরামুলম্ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়ামে আমরা কিউরিও দেখতে লাগলাম। হাতির দাঁতের কাজই এখানে আসল। তাছাড়াও আছে নানারকম উপহারের জিনিস, কাঠের ফুলদানি, চন্দন কাঠের বাক্স, নারকেল মালার কৌটো, পাতার ও ঘাসের টি-কোজি, মাদুরের ভ্যানিটি ব্যাগ, মোষের শিঙের পেপার ওয়েট, ত্রিবাঙ্কুরের প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকা লোহার পেপার কাটার, বেতের ফার্নিচারও ছিল।

ঘণ্টু ও পুপু আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি হেসে বললাম, কিছু কিনতে হবে নাকি ?

উৎসাহ পেয়ে পুপু বলল, 'মার জন্যে একটা চন্দনকাঠের বাক্স।'

ঘণ্টু বলল, 'আর বাবার জন্যে হাতির দাঁতের সিগারেট পাইপ।'

আমি হেসে বললাম, 'আমাদের জন্যেও তো কিছু নেওয়া দরকার।'

'আর তোমার জন্যে!'

বলে দুইজন একসঙ্গে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

সকলের শেষে আমরা পদ্মনাভ স্বামীর মন্দিরে এলাম। মন্দির তখন বন্ধ হয়ে গেছে। বিকেলের আগে খুলবে না। অনন্তশয়ান পদ্মনাভ স্বামী ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের মালিক ছিলেন। রাজা তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে দেশ শাসন করতেন। ভারত স্বাধীন হবার পর এই ত্রিবাঙ্কুর কোচিন রাজ্যের প্রথম রাজপ্রমুখ হয়েছিলেন ত্রিবাঙ্কুরের রাজা।

পদ্মনাভ স্বামীকে দর্শনের রীতি আমি একটা বইএ পড়েছিলাম। প্রথম দ্বারে তাঁর চরণ কমল, মধ্যদ্বারে নাভিকমল আর শেষ দ্বারে মুখমণ্ডল দেখা যায়। ভগবান বিষ্ণু এই মন্দিরে তাঁর ডান হাতের উপরে কপোল রেখে অর্ধশায়িত ভঙ্গিতে বিরাজ করছেন। মহাভারতেও এই তীর্থের উল্লেখ আছে।

একজন এই মন্দির নির্মাণের সম্বন্ধে একটা প্রবাদের কথা শোনালেন। এই মন্দিরটি নাকি খ্রীষ্টের জন্মের তিন হাজার বছর আগে তৈরী হয়েছিল। তার মানে এই মন্দিরের বয়স এখন পাঁচহাজার বছর। সাততালা বাড়ি, সুন্দর কারুকার্য করা সব শুদ্ধ। লোকে বলে যে চার হাজার মিস্ত্রি ছহাজার লোক আর একশো হাতি ছমাস ধরে এই মন্দির শেষ করার কাজে নিযুক্ত হয়েছিল।

পুপু এইসব কথা শুনে জিজ্ঞাসা করল, 'কন্যাকুমারী থেকে আমরা এই পথেই ফিরব নাকি ছোটকা?'

ঘণ্টু উত্তর দিল, 'এই পথেই তো ফিরব।'

পুপু বলল, 'তবে আমরা ফেরার পথে ঠাকুর দেখব।'

এখান থেকে আমরা স্টেশনের কাছে বাস স্ট্যাণ্ডে ফিরে এলাম। তারপর টিকিট কেটে বসলাম কন্যাকুমারীর বাসে। ত্রিবেন্দ্রাম ছেড়ে যাবার সময়ে দুঃখ হল।

আজকের আলো অন্ধকারে, রোদে আর বৃষ্টিতে, চড়াই আর উৎরাইএ মনের গভীরে বুঝি নেশা ধরেছিল। শুধু আমার নয়। ঘণ্টু ও পুপুরও ভাল লেগেছিল। তাই বাস ছাড়বার আগে ঘণ্টু বলল, 'বুঝলে পুপু আবার আমরা ত্রিবান্দ্রম দেখব।'

মাথা দুলিয়ে পুপু বলল, 'দেখবনা ছোটকা!'

আমি বললাম, 'দেখতেই হবে।'

আমরা যখন কন্যাকুমারী যাত্রা করলাম, বেলা শেষ হতে তখনও অনেক দেরি ছিল। যাত্রীতে বাস ভর্তি হয়ে গেছে, সবাই কলরব করছে। যে কথা আমরা বুঝিনা সে কথাকেই আমরা কলরব বলি। এঁরা সবাই মালাবার উপকূলবাসী, কথাবার্তা বলছেন মালায়ালাম ভাষায়।

আমরা বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি, পরিষ্কার ঝকঝকে বাঁধানো রাস্তা ধরে বাস ছুটেছে। শহরের যেন শেষ নেই। রাস্তার দুধারে ছোটবড় কাঁচা পাকা বাড়ির সারি, তার পিছনে কলা আর নারকলের চাষ। ত্রিবেন্দ্রাম শহরের সীমানা ছেড়ে এসেছি বলে মনে হচ্ছে না। এই পথটিই যে এ

রাজ্যের প্রধান নাড়ি আর এইটে কেন্দ্র করেই যে এদেশ সমৃদ্ধ হচ্ছে, তাতে আর কোন সন্দেহ রইল না।

বসে বসে আমি বাসের যাত্রীদের দেখছিলাম আর ভাবছিলাম পুরনো দিনের কথা। অনেক ধর্মের ধাক্কা এসে লেগেছিল এই দেশে, কিন্তু পুরনো সংস্কৃতি তাতে বদলায়নি। কয়েক শতাব্দী ধরে বিবাদ চলেছিল খ্রীষ্টান ও মুসলমান বণিকদের মধ্যে, রাজা সলোমনের জাহাজে চড়ে ইহুদীরাও এসেছিল। কিন্তু এদেশের লোকের রীতিনীতি আচার ব্যবহার আগের মতোই রয়ে গেল।

যিশুখ্রীষ্টের শিষ্য সেণ্ট টমাস এখানে ধর্মপ্রচার করেছেন, সেণ্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার কন্যাকুমারী থেকে কুইলন পর্যন্ত ভ্রমণ করে কোট্টারে নাকি গির্জা নির্মাণ করে যান। কত লোক ধর্মান্তরিত হল, কিন্তু মানুষগুলো রয়ে গেল একই রকম। সাদা সরল শিক্ষিত অতিথিপরায়ণ। এই দেশেই সম্ভব হয়েছিল আচার্য শঙ্করের আবির্ভাব। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের যতটুকু প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল শঙ্করাচার্যের অভ্যুত্থানে তা শেষ হয়ে গেল।

বড় আশ্চর্য পুরুষ এই শঙ্করাচার্য। একহাজার বছর আগে এক নাম্বুদ্রি-ব্রাহ্মণকুলে তাঁর জন্ম এই মালাবার উপকূলে কোচিনরাজ্যের অন্তর্গত কালদী গ্রামে—আলোয়ারী নদীর তীরে। জন্মজন্মান্তরে অর্জিত সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী হয়ে এই জাতিস্মর পুরুষ জন্মেছিলেন। তাই আট বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে নর্মদা তীরে শ্রীমৎ গোবিন্দ আচার্যের কাছে দর্শনাদি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কিছুকাল কাশীধামে বাস করেন ও পরে বদরীনারায়ণ চলে যান। ষোল বছর বয়সে তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থ রচনা শেষ হয়ে যায়। তারপর তিনি দিগ্বিজয়ে বার হন ও সারা ভারত পরিক্রমা করে সকল দেশের সকল পণ্ডিতকে পরাস্ত করে নিজের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। বৌদ্ধ ও জৈনদের চাপে হিন্দুধর্মের তখন মুমূর্ষু অবস্থা। সেই সঙ্কটের দিনে আচার্য শঙ্কর তাঁর অলৌকিক প্রতিভাবলে অন্য সমস্ত ধর্মমতকে খণ্ডন করে হিন্দুধর্মকে তার আপন মহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

ভারতে তিনি চারটি মঠ স্থাপন করেন। উত্তরে বদরীনারায়ণের পথে যোশীমঠ, দক্ষিণে মহিসুরে তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে শৃঙ্গেরী মঠ, পূর্বে পুরীতে গোবর্ধন মঠ, আর পশ্চিমে দ্বারকায় সারদা মঠ। এই সমস্ত মঠে আজও যোগ্য অধ্যক্ষের পরিচালনায় বেদবেদান্তের আলোচনা হয়ে থাকে। শঙ্করাচার্যের জন্মস্থান কালদী গ্রামও এখন একটি তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আমার আর একজন ধর্মগুরুর কথা মনে পড়ল। তাঁর নাম শ্রীনারায়ণ গুরু। এদেশে নায়ের নামে একটি গোষ্ঠী সবচেয়ে প্রাচীন অধিবাসী। আর্যরা এদেশে আসবার আগে এদের প্রতিপত্তির অন্ত ছিল না। নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণেরা খাঁটি আর্য সন্তান বলে দাবী করেন। কিন্তু নারায়ণ গুরু জন্মেছিলেন একটি সাধারণ চাষী পরিবারে। তাঁর বিশ্বাসের কথা বড় সহজ আর সুন্দর। তিনি বলতেন, 'এক জাতি, এক ধর্ম, এক ভগবান।' বলতেন, 'মানুষের ধর্ম যাই হোক না কেন, তার প্রগতি অব্যাহত থাকবে।' ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে বরকলার শিবগিরি মঠে তিনি দেহরক্ষা করেছেন। তাঁর শিষ্যরা শ্রীনারায়ণ ধর্ম সংঘম নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে গুরুর সমাজ ধর্ম প্রচার করে যাচ্ছেন।

শুনেছি এ দেশের পাহাড়ে ও বনে এখনও অনেক জাত সভ্য জগতের চোখের আড়ালে বাস করছে। অদ্ভুত তাদের জীবনধারা ও সমাজ ব্যবস্থা। পণ্ডরম উরলি উল্লটন মুত্রন—এইসব জাতির কথা এ দেশের লোকেই ভাল করে জানেনা। নীলগিরি পাহাড়ের টোডাদের ছবি আমি দেখেছি, কিন্তু এদের কোন ছবি কোথাও দেখিনি। ছবি দেখেছি বল্লম কামির আর কথাকলির।

বল্লম কানি এদেশের একটা খুব জনপ্রিয় খেলা। ইংরেজীতে এই খেলার নাম বোট রেস, স্নেক বোট রেসও বলে। বর্ষার পর খালে যখন জল থৈ থৈ করে, তখন এই খেলা হয়। সরু সরু লম্বা নৌকো জলে নামবে, অসংখ্য লোক চড়বে এক একটা নৌকোয়, আর গান গেয়ে গেয়ে দাঁড় টানবে। সে কী প্রতিযোগিতা! কী উল্লাস! খালের ধারে লোক ভেঙে পড়বে এই খেলা দেখবার জন্যে।

খালের কথায় ব্যাক ওয়াটার্স ক্যানেলের কথা এসে পড়ে। কোচিন থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত এই খাল কলা আর নারকেলের ঘন ছায়ায় ঢাকা। আগেকার দিনে সাহেবরা একমাস ধরে এই খালে পিকনিক করত নৌকোয়।

কথাকলি কোন খেলা নয়, কথাকলি নাচ, হাঁটুর নিচ অবধি ঘাগরা পরা একদল মানুষ রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যানের অভিনয় করে। মুখে তাদের বিচিত্র রঙ, মাথায় মুকুট। সহসা মুখোস পরা মানুষ বলে মনে হয় না, হয়তো বা সত্যিই মুখোস পরে। পিছন থেকে অন্য লোকে গান বাজনা করে।

এদেশে নানা ধরনের নাচ আছে। রামনাট্যম কৃষ্ণনাট্যম ওট্টন তুল্লোল সোহিনী আট্টম প্রভৃতি অনেক নাচ আছে। কিন্তু কথাকলির মত জনপ্রিয় নাচ আর নেই। কতকটা আমাদের দেশের যাত্রা-গানের মতো, সন্ধ্যাবেলায় শুরু হয়ে শেষ রাত পর্যন্ত চলে। আট দশ ঘণ্টার কম একটা পালা শেষ হয় না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে অভিনেতারা কেউ কথা বলে না। শুধু মুখের ভঙ্গি আর হাতের মুদ্রা দিয়ে গল্পকে ফুটিয়ে তুলতে হয়। অবশ্য পিছনে আবহ সঙ্গীত আছে আর গায়করা গান গেয়ে গল্পটা শোনায়।

কথাকলি নাচের এই জনপ্রিয়তার মূলে আছেন কেরালার শ্রেষ্ঠ কবি ভল্লোখোল। তামিল কবি ভারতীর মতো ইনি মালয়ালম সাহিত্যের কবি সম্রাট। শুনে আশ্চর্য হতে হয় যে বাঙলা দেশের অনেক লেখা মালয়ালম ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র এদেশের লোকেরও খুব প্রিয় লেখক।

দুধারের দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা একচল্লিশ মাইল পথ পেরিয়ে অমর নাগের কয়েলে এসে পৌঁছলাম। ত্রিরুনেলাভেল্লির পথও এসে এইখানে মিলেছে। লোকজন হাট বাজার কোলাহল আর মাইক্রোফোনের আওয়াজে সরগরম হয়ে আছে জায়গাটা। একটা দোকানে লাল রঙের কলা দেখে পুপু চেঁচিয়ে উঠল, 'লাল কলা দেখেছ ছোটকা?'

কিছুক্ষণের জন্যে বাস দাঁড়িয়েছিল নাগের কয়েলে। আমি নেমে গিয়ে সেই কলা কিনে আনলাম। লাল আর হলদে দুরকম কলাই আছে। খেতে দুইই ভাল।

আমরা ভেবেছিলাম যে এই বাস শুচীন্দ্রমের মন্দিরের সামনে খানিকক্ষণ দাঁড়াবে। কিন্তু তা দাঁড়াল না। সে মন্দির বড় রাস্তার উপরে নয়, খানিকটা ভিতরে ঢুকতে হয়। শুচীন্দ্রমের মন্দিরের গল্প আমরা একজন যাত্রীর কাছে শুনলাম।

পুরাকালে এই জায়গার নাম ছিল জ্ঞানারণ্য! তখন মহর্ষি অত্রীর আশ্রম ছিল এইখানে। গৌতমের-শাপে অশুচি ইন্দ্র এই জ্ঞানারণ্যে তপস্যা করে শুচি হয়েছিলেন, তখন থেকে জায়গার নাম শুচীন্দ্রম হয়েছে।

শুচীন্দ্রমে লোকে এখন শিবের মন্দির দেখে। কঠোর তপস্যা করে বাণাসুর ব্রহ্মার কাছে বর পেয়েছিলেন যে কোন পুরুষ তাকে বধ করতে পারবে না। বাণাসুর ত্রিভুবন জয় করে ইন্দ্রকে তাড়িয়ে দিলেন অমরাবতী থেকে। বিষ্ণুর পরামর্শে ইন্দ্র যজ্ঞ করলেন, আর সেই যজ্ঞের আগুন থেকে একজন কুমারী কন্যা আবির্ভূত হয়ে, যুদ্ধে বাণাসুরকে বধ করলেন।

তারপরে কন্যাকুমারীর বিয়ের গল্প। শিবকে পতিরূপে পাবার জন্য তিনি তপস্যা করে সফল হলেন। শিব তাঁকে বিয়ে করতে রাজী হয়ে বললেন যে লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেলে কিন্তু এ বিয়ে হবে না। নির্দিষ্ট দিনে কন্যাকুমারী সেজে গুজে তৈরী হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন, আর শিবও ষাঁড়ের পিঠে চড়ে বিয়ে করতে বেরলেন। শুচীন্দ্রমের কাছে তাঁর দুর্বাসার সঙ্গে দেখা হল· শাস্ত্রালোচনায় দেরি হয়ে গেল অনেক, তারপরে ছাড়া পেয়ে খানিকটা এগোতেই কাক ডেকে উঠল, সত্যি সকাল তখনও হয় নি, এ নারদের কারসাজি। ভালোমানুষ শিব লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে ভেবে শুচীন্দ্রমেই রয়ে গেলেন। আর কন্যাকুমারীতে কন্যা চিরকাল কুমারী হয়েই রইলেন।

শুচীন্দ্রমের মন্দিরে শিব এখন পার্বতী ও পুত্র কন্যা নিয়ে সুখে ঘর সংসার করছেন। এই মন্দিরে এখন চারটি স্তম্ভ আছে, মাদুরার সপ্তসুরের থামের মতো। চার রকম বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ এই থামে—মৃদঙ্গ বেণু বীণা ও জলতরঙ্গ। একসঙ্গে চারটি থামে আঘাত করে তীর্থযাত্রীদের যন্ত্রসঙ্গীত শোনানো যায়।

পথের দুধারে পাহাড় ক্রমেই নীচু হয়ে আসছিল। একসময় কখন ডানদিকের পাহাড় শেষ হয়ে গিয়েছিল খেয়াল করিনি। বাঁ দিকের পাহাড় যেন আরও কাছে সরে আসছে, মনে হল, সমুদ্রের ধারে পৌছতে আর দেরি নেই। একসময় সত্যি সত্যিই আমরা এগারো মাইল পথ পেরিয়ে কন্যাকুমারীতেই পৌছে গেলাম। বাস থেকে নেমে আমরা আশ্রয় নিলাম একটা ধর্মশালায়।

ক্রমশঃ

রতন পেতে হলে

সঞ্জীব কুমার নন্দী

(লাওসের লোক কথা অবলম্বনে)

এক গ্রামে একজন কৃষক বাস করত। তার জমি ছিল, তাতে কঠোর পরিশ্রম করে যা ফলাত তাই দিয়ে কোনোমতে দিন চলত।

কৃষকটি ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে। কোনো বদ্ স্বভাব তার ছিল না। ভগবানের প্রতি তার ছিল অসীম বিশ্বাস, জীবনে সে কখনো কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি। পূব আকাশে সূর্য উঁকি দেবার আগেই কৃষক মাঠে লাঙল আর বলদ নিয়ে চলে যেত আর বাড়ি ফিরে আসত অন্ধকার হবার সঙ্গে সঙ্গে।

বাড়িতে ছিল তার স্ত্রী। সেও তার স্বামীর সঙ্গে কাজের ভাগ নিত। তাদের জীবনে ছিল না কোনরকমের বৈচিত্র্য। সুখে শান্তিতে ওদের দিন কাটত।

একদিন মাটি খুড়ঁতে খুঁড়তে সে হঠাৎ লক্ষ্য করল তার কোদালটা যেন কি একটা শক্ত জিনিসে বার বার ঠেকে গিয়ে একটা শব্দ হচ্ছে। কৃষক জিনিসটাকে পাথর ভেবে চারপাশের মাটি খুঁড়ে সেটাকে বের করে আনল—একটা ঘড়া। কৌতূহলী হয়ে সে ঘড়াটার ঢাকনি খুলে দেখতে পেল তার ভেতর রয়েছে অসংখ্য মোহর আর দামী দামী মণিমুক্তা। সে আবার ঘড়াটার ঢাকনি বন্ধ করে ক্ষেতের এক পাশে একটা নারকেল গাছের নিচে রেখে দিল। আবার সে কাজের মধ্যে ডুবে গেল। সন্ধ্যা নেমে এলে পর কৃষক অন্যান্য দিনের মত মনের আনন্দে গান গাইতে বাড়িতে ফিরে এল।

রাত্রে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ তার সেই ঘড়াটার কথা মনে এল। শুয়ে পড়ার পর স্ত্রীর কাছে ঘড়াটার কথা পাড়ল, সব শুনে স্ত্রী ভগবানের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জানিয়ে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করল,—'ঘড়াটা কোথায় রেখেছ?'

কৃষক উদাস সুরে বলল,—'ক্ষেতের পাশের নারকেল গাছটার নিচে রেখে এসেছি। বোধহয় ওখানেই আছে।'

একথা শুনে স্ত্রী নিরাশ হল। রেগে বলল,—'ধন্য তোমার ভুলো মন! তখনি তোমার উচিত ছিল ঘড়াটাকে বাড়িতে নিয়ে আসা। তুমিতো চিরকালই দামী জিনিসকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে আসছ আজ যদি ওটা নিয়ে আসতে তাহলে, তোমাকে আর লাঙল চালাতে হত না। নিজের সুখকে তুমি নিজের হাতে কুঠার মারলে।' বলতে বলতে তার গলাটা ধরে এল। তারপর হতাশার সুরে বলল,—'এখন কি আর ওটা পাওয়া যাবে? তবুও একবার গিয়ে দেখে আসি।'

ওরা যখন কথা বলছিল—তখন একজন চোর বাইরে থেকে আড়ি পেতে কথাগুলো শুনে যাচ্ছিল কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দৌড়ে নারকেল গাছটার নিচে গিয়ে সে ঘড়াটা সত্যিই পেল। দেরী না করে

ঘড়াটাকে নিয়ে সে লম্বা দিল। এর কয়েক মিনিট পর চাষীবউ নারকেল গাছের নিচে এল। অনেক খুঁজেও ঘড়াটা না পেয়ে কাঁদতে শুরু করল। আর বার বার নিজের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করতে করতে বাড়ি ফিরে এল।

স্ত্রীকে কাঁদতে দেখে চাষা তাকে বলতে লাগল,—'ভগবান যখন কাউকে কিছু দিতে চান, তা কখনও অন্য কেউ নিতে পারে না। আর ভগবান যদি দিতে না চান—তাহলে হাজার চেষ্টা করলেও কেউ তা নিতে পারে না। ঈশ্বর যা করেন তা মঙ্গলের জন্যেই করেন। সোনার ঘড়াটা কেউ নিয়ে গেছে বলে তাতে কান্নার কি আছে? ওটা কি আমাদের মেহনতের ফল ছিল? ভগবানের দান হয়ত আমাদের প্রাপ্য ছিল না—তাই আমরা পাই নি। যার পাবার সে পেয়েছে।'

এদিকে চাষীবউ ধন হারানোর দুঃখে কাঁদছিল,—অন্যদিকে চোর ঘড়াটাকে বাড়ি নিয়ে আনন্দে নাচছিল। আর তার স্ত্রীকে ঘুম থেকে জাগিয়ে সৌভাগ্যের কথা আনন্দের সঙ্গে বলছিল, কিন্তু যখন চোর ঘড়াটার ঢাকনি খুলল, ঘড়ার ভেতর থেকে একটা সাপ ফোঁস ফোঁস করে ফণা ধরে উঠল। চোর তাড়াতাড়ি ঢাকনি লাগিয়ে কোনোরকমে বিপদ থেকে রক্ষা পেল। তারপর চোর ভাবল, চাষী আমাদের আচ্ছা জব্দ করেছে।

যদি সত্যিই ঘড়াটা রত্নপূর্ণ হ'ত তাহলে সেই ই কি ওটা ফেলে রেখে যেত? কক্ষণো না। আমাদের পরিশ্রমটাই মাটি হ'ল। এখন আর ভেবে কি হবে? এখন এটা চুপ চাপ ওখানে গিয়ে রেখে আসব।

যেই কথা সেই কাজ। ঘড়াটা চোরেরা আগের জায়গায় রেখে এল, ওখানে সাপটা বেশ বহাল তবিয়তেই আছে। কিন্তু কি আশ্চর্য ঘড়াটা নামিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গেই সাপটা বেরিয়ে এল চোরদের অজান্তে, ঢাকনা বন্ধ সত্ত্বেও।

পরদিন চাষী ক্ষেতে কাজ করতে গিয়ে ঘড়াটা দেখে খুব আনন্দিত হল। ভাবল হয়ত অন্ধকারে বউ ঘড়া দেখতে পায়নি। তারপর কৃষক ঘড়াটাকে ওখানে রেখে অন্যান্য দিনের মতো কাজের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিল। সন্ধ্যা এলে কৃষক বাড়িতে চলে এল। এবারও ঘড়াটা আনতে ভুলে গেল।

রাত্রে বউকে বলল—'দেখ, আজ আবার ঘড়াটা আনতে ভুলে গেছি। আমি ওটা যেখানে রেখেছিলাম সেখানেই আছে দেখেছি। তুমি বোধ হয় অন্ধকারে দেখতে পাওনি।'

স্ত্রী কিন্তু এবার চাষীর কথাকে বিশ্বাস করল না। তবুও তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যিই কি ঘড়াটাকে ওখানে পড়েই থাকতে দেখেছ? কৃষক বলল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয় দেখেছি ঘড়াটাকে। ওটাকে কেউ নিয়ে যায়নি।'

স্ত্রী বলল,—তোমার কথা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। কাল রাত্রে স্বচক্ষে গিয়ে দেখে এলাম ঘড়াটা ওখানে নেই! আজ সকালে ওটা আবার এল কোত্থেকে? বোধ হয় কেউ নিয়ে গিয়ে সর্বস্ব বের করে রেখে গেছে। মণিমুক্তার ঘড়া কেই বা ফেলে দেবে?'

কৃষক নির্বিকার হয়ে বলল, 'তা হতে পারে, আমি শুধু ঘড়াটাই দেখেছি। ঢাকনি খুলে দেখিনি।'

চাষী বউ বলল, 'ঘড়াটা ঘরে না আনলেও একবার ঢাকনি খুলে দেখলে পারতে।'

কৃষক বলল, 'ভগবান যাকে দান করেন তাকে সব উজাড় করেই দেন। যদি আমাদের প্রতি ঈশ্বরের সত্যিই কৃপা হয় তাহলে যে কোনো প্রকারে হোক দান সামগ্রী বাড়িতেই পৌছিয়ে যাবে। আমাদের মিথ্যে চিন্তা করে লাভ নেই।'

এবারও চোর সব কথা শুনছিল। রাগে সে জ্বলে উঠল, কৃষক জেনেশুনে তাকে নির্বোধ বানাল, তাই চোর তাকে উপযুক্ত সাজা দেবার জন্য কোমর বেঁধে নিল।

সে ক্ষেতে গিয়ে ঘড়াটা এনে চাষীর বাড়ির দরজার সামনে রাখল, চোর নিজের মনেই বলতে লাগল,—'এই চাষী আমাদের যথেষ্ট লাঞ্ছনা দিয়েছে। কখন তো এর বাড়িতে আমরা চুরি করিনি। কথাই আছে যেমন কর্ম, তেমন ফল, ভোরে যখন দরজা খুলে ঘড়া দেখবে এবং ঘড়া খুলে সাপের কামড় খাবে তখন বুঝবে মিথ্যে অন্যকে ঠকানোর ফল কি। একথা বলে সে সামনে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রইল, উদ্দেশ্য সকাল বেলায় চাষীর দুরবস্থা লক্ষ্য করা।

ভোরে চাষী ঘুম থেকে উঠেই দরজার সামনে ঘড়াটাকে দেখতে পেল। আনন্দে স্ত্রীকে গিয়ে বলল,—'তুমি আমার কথায় বিশ্বাস করনি। দেখ বহুমূল্য রত্নপূর্ণ ঘড়াটা, অন্যকেও দেখাও। ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা আর বিশ্বাসের এটাই ফল।' বউ তাই করল। মোহর আর মণিমাণিক্য একে একে ঘড়া থেকে বের করল, চোর আড়াল থেকে দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তারপর নিজের অসৎ কাজের জন্য অনুতাপ করতে করতে পালিয়ে গেল।

এই ঈশ্বর বিশ্বাসী গরীব চাষী ধনবান হয়ে গেল, তবুও কঠোর শ্রম থেকে বিরত হয় নি, পরিশ্রম আর অধ্যবসায় দিয়ে নিজ ক্ষেতে উৎকৃষ্ট ফসল ফলিয়ে সে অন্যান্য কৃষকদের সামনে একটা অসাধারণ নজির রেখে যেতে পেরেছিল।

সোনার দোলা

শ্রীসুকমল দাশগুপ্ত

১

সোনার দোলা কে কিনেছে
মুক্তা মণি ঢেলে,
রাজার ছেলের মা কিনেছে—
ঘুমায় রাজার ছেলে।
সীতা কেনেন দোলনা সোনার
কদম গাছে বাঁধা
লব-কুশেরা ঘুমায় তাতে
ঘুম এসেছে আধা।
আর কেঁদোনা, আর কেঁদোনা,
ঘুমাও কাঁদন ভুলে।
সোনার দোলায় কাঁদলে শুয়ে
কেউ নেবেনা তুলে।

২

এদিকটাতে দোলন এলে
ইন্দ্র ওঠেন হেসে
ওই দিকেতে বিষ্ণু হাসেন
দারুন ভাল বেসে।
পাহাড় ঘেরা বন-বনানী
সরোবরের তীরে
জন্মেছে এই যমজ দু'ভাই
বাড়ছে ধীরে ধীরে।
আর কেঁদোনা, আর কেঁদোনা,
ঘুমাও কাঁদন ভুলে
সোনার দোলায় কাঁদলে শুয়ে
কেউ নেবেনা তুলে।

৩

দেব ঠাকুরের আশিস নিয়ে
এলেন 'জনক' দাদু
আদর ক'রে বলেন হেসে—
'ঘুমাও সোনা জাদু।'
বড় ঠাকুমা -কৌশল্যা
নূপুর বাঁধে পায়
গয়নাগাটি ঝুলিয়ে দেবে
তোদের সারা গায়।
আর কেঁদোনা, আর কেঁদোনা,
ঘুমাও কাঁদন ভুলে
সোনার দোলায় কাঁদলে শুয়ে
কেউ নেবেনা তুলে।

৪

আর এসেছে মিষ্টি দিদা
সুমিত্রা তার নাম
গান বেঁধেছে তোদের নামে
মাতিয়ে সারা গ্রাম।
কৈকেয়ী যে দুষ্ট দিদু
পথ এসেছে চিনে
রামকে যিনি পাঠান বনে
অভিষেকের দিনে।
আর কেঁদোনা, আর কেঁদোনা,
ঘুমাও কাঁদন ভুলে
সোনার দোলায়— কাঁদলে শুয়ে
কেউ নেবে না তুলে।

৫

বকুল ব'নের মৌমাছিদের
চাকটি খালি ক'রে
ঊর্মিলা যে মধু আনেন
কৌটো রূপোর ভ'রে।
বাটি ভরা দুধ এনেছে
মাণ্ডবী সে কাকী—
তার সাথে এক সোনার দোলা—
কেউ দিল'না ফাঁকি।
আর কেঁদোনা, আর কেঁদোনা,
ঘুমাও কাঁদন ভুলে
সোনার দোলায়—কাঁদলে শুয়ে—
কেউ নেবেনা তুলে।

৬

চুমুর মতই মিষ্টি কাকী—
খাচ্ছে দ্যাখো চুম্
শ্রুত-কীর্তি আংটি দেবেন
তাই লেগেছে ধুম।
মহৎ-জনের গুন এনেছে
লক্ষ্মণ সেই কাকু—
তোদের তরে যে ক'রেছে
কেবল হাঁকু পাকু—।
আর কেঁদোনা, আর কেঁদোনা,
ঘুমাও কাঁদন ভুলে
সোনার দোলায় কাঁদলে শুয়ে—
কেউ নেবেনা তুলে।

৭

ভরত এবং শত্রুঘ্ন
সেই যে দুটি কাকা
আসছে তারা—কষ্ট ভারি
তোদের ছেড়ে থাকা।
লড়াই করার কুঠার আনে
আনলো রঙিন জামা
এই বারেতে চোখের পরে
ঘুমটি টেনে নামা'।
আর কেঁদোনা, আর কেঁদোনা,
ঘুমাও কাঁদন ভুলে
সোনার দোলায় কাঁয়লে শুয়ে
কেউ নেবোনা তুলে।

৮

ঋষি কবি বাল্মিকী দেয়
রামায়ণের গান,
ঘুমের মাঝে শুনলে সেটা
উথলে ওঠে প্রাণ।
মাথার ওপর রাজার ছাতা
থাম্ পাল্‌কি থাম্—
ঐ দ্যাখো ভাই কে এসেছে
রাঘব রাজা রাম।
আর কেঁদোনা, আর কেঁদোনা,
ঘুমাও কাঁদন ভুলে
সোনার দোলায় কাঁদলে শুয়ে
কেউ নেব না তুলে।*

* তেলেগু ভাষায় লেখা 'ছেলে ভুলানো ছড়া' থেকে অনুবাদ।

সে অনেক অনেক দিন আগেকার কথা।

তখন আমাদের পৃথিবীটার চেহারা এমন ছিল না। বিশাল বিশাল সব পশুপাখী, কত বিচিত্র তাদের গায়ের রঙ, কত রকম তাদের হাঁকডাক। এখন যেমন অনেক প্রাণী টুঁ শব্দটি করতে পারে না, তখন কিন্তু সবাই কথা বলত। ঠিক আমাদেরই মতো।

হ্যাঁ মাছেরাও কথা বলত। এখন যেমন ড্যাবড্যাব করে বোকার মতো শুধু তাকিয়ে থাকে তারা, তখনও অবশ্য এমনই ছিল তারা, তবে কথা বলতে পারত। আর সে কি কথা! ছোট মাছ বড় মাছ সবাই দিনরাত বকবক করছে তো করছেই। আসলে তো বোকা সবাই কাজেই পাছে কেউ তাদের বোকা ভাবে, সেই ভয়েই সবাই অনবরত কথা বলত।

এই সব মাছেদের যিনি রাজা, তিনি থাকতেন জলের নীচে খুব সুন্দর এক প্রাসাদে। কত মণিমুক্তা, কত হীরে জহরৎ যে তার সেই প্রাসাদে ছিল তা গুণে শেষ করা যেত না। প্রতি মাসে একবার তিনি তাঁর রাজসভায় সব মাছেদের ডাকতেন! সেদিন এক বিরাট উৎসব হত। দামী দামী সব গয়না পরে নর্তকীরা নাচত, সোনার সিংহাসনে হীরের মুকুট পরে রাজা বসে থাকতেন। আর শেষে সে কি ভোজ! পোকামাকড় কেঁচো—এসব নয়, নানা রঙের মিষ্টি মিষ্টি সরবৎ আসত, মাছেরা তাই খেয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করত রাজাকে। আর সবাই যখন চলে যাবার জন্য পা বাড়াত, তখন রাজা বলতেন, 'শোনো প্রজারা, এই যে আমাদের রাজ্য, এই যে রাজসভা, এই যে এত মণিমাণিক—এ সবের কথা কিন্তু কাউকে বলবে না! এ যদি কেউ জানতে পারে, তবে কিন্তু সব লুঠ করে নেবে! কাউকে বলবে না, ভুলেও এ বিষয়ে মুখ খুলবে না। কেমন?'

সবাই অমনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠত, 'মহারাজ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এটা কি একটা কথা হল। আমাদের গোপন ধনরত্নের খবর কাউকে বলব না! কক্ষনো না। আপনি দেখবেন।'

রাজা আবার বলতেন, 'মনে থাকে যেন সকলের। কেউ ভুলবে না।'

মাছেরাও সমস্বরে বলত—'না না ভুলব না আমরা।'

এমনি করে আমোদে আহ্লাদে তাদের দিন যায়।

একবার সেই রকম মাসের ভোজ খেয়ে সব যে যার বাড়ি যাচ্ছে, কে কেমন খেল, কে কি দেখল —এই সব হাজারো গল্প করতে করতে চলছে সবাই। এমন সময় একটি লোক শুনতে পেল তাদের কথা! সে ভাবল, তাইতো মাছের রাজ্যে তাহলে অনেক কিছু আছে! সব শুনতে হবে। এই মনে করে সে মাছেদের কাছে গিয়ে বলল,—বাঃ তোমরা তো খুব ভালো কথা বলতে পারো। আমাকে আরো গল্প শোনাও না!

মাছরা তো বোকা! তারা ভাবল একজন মানুষ তাদের কথা শুনতে চাইছে। তাদের কথার দাম তাহলে কম নয়। তারা এক সঙ্গে উঠল, 'নিশ্চয় নিশ্চয়। কত গল্প করতে পারি! কত খবর দিতে পারি!'

ওদের মধ্যে একজনের বুদ্ধি ছিল একটু বেশী। তার বয়সও হয়েছিল। সে চাপা গলায় বললে, 'এই কি হচ্ছে কি! রাজামশায় না নিষেধ করেছেন।'

যেই না এই কথা শোনা অমনি বোকা মাছেরা বলে উঠল,—তাই তো তাই তো! তাহলে তো তোমাকে কিছু বলতে পারব না ভাই।'

লোকটা তখন একটা বুদ্ধি বের করলো। বললে, 'আমরা মানুষরা কিন্তু সব কথা সবাইকে বলি।'

মাছরা বললে, 'না না। আমরা তা বলি না। রাজার প্রাসাদে যে কত মণিমাণিক আছে তা কাউকে বলবো না আমরা।'

ব্যস! লোকটি ভাবল যা শোনায় তা তো শুনলাম। এখন সেখানে যাই কি করে! সে তখন বললে,—'বেশ, বোলো না আমাকে। তাতে আর কি হয়েছে। তবে আমি তোমাদের একটি সুন্দর জিনিস দেখাবো। দেখবে তোমারা?'

মাছেদের তো আর ইস্কুল নেই, অফিস নেই, কোন কাজই নেই বললে,—দেখব দেখব, নিশ্চয় দেখব।

লোকটি বলল,—বেশ। তোমরা তবে অপেক্ষা কর, এখুনি আসছি।

বলে বাড়ি থেকে একটা প্রকাণ্ড জাল নিয়ে এল লোকটা। বলল—তোমরা চটপট এর মধ্যে চলে এসো।

মাছেরাও চলে এল তাড়াহুড়ো করে। এমনি লোকটা বললো,—'এরপর আর ছাড়ছি না তোমাদের। যদি রাজার বাড়ি কোথায় আগে বলে দাও, তবে ছেড়ে দেবো।'

মাছেরা এমন বিপদে আর কখনো পড়েনি। তারা কান্নাকাটি সুরু করলে।

লোকটাও ছাড়ে না। বলে,

—যদি রাজার বাড়ির ঠিকানা না বলে দাও, তবে তোমাদের কেটে ভেজে খাব।

বল শিগগীর !

—ওমা গো !

শুনে মাছেদের কি কান্না ! কি কান্না !

এদিকে কান্নাকাটি হৈ চৈ শুনে সৈন্যসামন্ত নিয়ে রাজা এসে হাজির।

আর শুনে রেগে একেবারে আগুন হয়ে গেলেন রাজা।

—'বিশ্বাসঘাতক ! তোরা সব বলে দিয়েছিস ! বেশ, তবে এ পাপের শাস্তি নে। আমি অভিশাপ দিচ্ছি তোরা আর কোন দিনও কথা বলতে পারবি না। বোবা হয়ে থাকবি চিরকাল।'

অভিশাপ দিয়ে রাজা খুব তাড়াতাড়ি লোকটিকে বুঝতে না দিয়ে জাল কেটে দিলেন। মাছেরা সব লাফিয়ে পড়ল জলে। আর সকলে আজই রাজার পায়ের কাছে মাথা কুটতে লাগল অনুশোচনায় কিন্তু কি আশ্চর্য ! কত কথা বলতে চাইল তারা কিন্তু কিছুই বলতে পারল না ! অভিশাপ ফলতে শুরু করেছে !

তারা বোবা হয়ে গিয়েছে !

আর কি করে ? কাঁদতে কাঁদতে সবাই ফিরে গেল যে যার বাড়িতে।

সেই থেকে মাছেরা আর কথা বলতে পারে না।
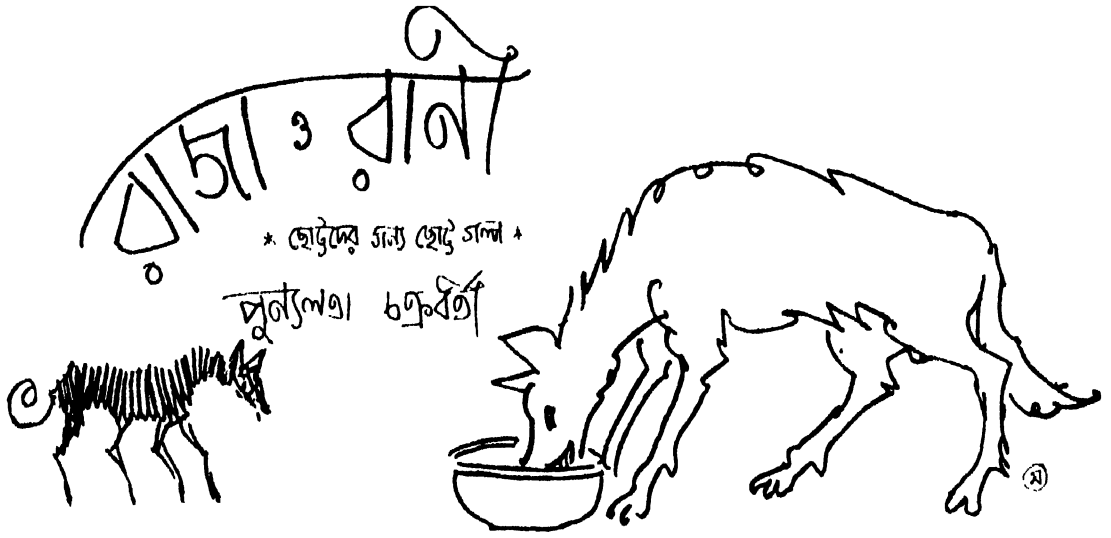
'রাজা' হ'ল কুকুরের রাজা—যেমন জাঁদ্‌রেল চেহারা, তেমনি তার তেজ ! মনটাও তার দয়ালু—কখনও পাখি মারেনা, পোষা বেড়ালটা বিরক্ত করলে, আ-স্তে থাপ্পড় মারে।

রাজা যখন মাংসভাত খায়, রোগা লোমঝরা একটা হ্যাংলা কুকুর দূর থেকে দেখে লেজ নাড়ে। রোজ একপা দুপা এগিয়ে, একদিন কুকুরটা কাছে এল, রাজার পাতের ভাত খেল—রাজা কিছুই বল্‌ল না। সেই থেকে কুকুর। এ বাড়িতেই রয়ে গেল। ভাল খাবার আর যত্ন পেয়ে, সে বেশ সুন্দর হয়ে উঠল। তার নাম রাখা হ'ল "রাণী"।

রাজা রাণী দুজনে পাহারা দেয় বাড়িতে চোর আসতে পারে না, বাগানে গরু ছাগল ঢুকতে পারে না। একদিন একটা গো-সাপ বাগানে ঢুকে পড়ল—কুকুরের তাড়া খেয়ে, সেটা ছুটে গিয়ে পাশের নালার জলে ঝাঁপ দিল।

অমনি দুই কুকুর নালার দুই ধারে গিয়ে দাঁড়াল— গোসাপ সাত্‌রিয়ে যেই ওপারে উঠতে যায়, অমনি রাণী তাকে তাড়া করে, আবার সাঁতরিয়ে এপারে এলেই, রাজা তাকে তেড়ে যায় ! সাঁতার কেটে কেটে বেচারা যখন কাহিল হয়ে পড়ল তখন ওরা দয়া করে তাকে ছেড়ে দিল।

গোসাপ তীরে উঠেই চার পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল—খানিক দম্‌ নিয়ে, তারপর সুড়্‌সুড়্‌ করে পালাল।

(আমার নাম পান্নু, বয়স বারো বছর। বাস থেকে পড়ে গিয়ে আমার শিরদাঁড়া জখম হয়ে গিয়েছে বলে হাঁটতে পারি না, একটা ছোট গাড়ি চড়ে বাড়ির মধ্যে ঘুরে বেড়াই আর তেতলার জানলা দিয়ে চারদিকে দেখি। ভজুদা বলেন—হাঁটতে চেষ্টা কর! এক্সারসাইজ কর্। আমার পোষা বেড়ালের নাম নেপো।

ভজুদা সকালে আমাকে তিন ঘণ্টা পড়ান, আমি বাড়িতে বসেই বার্ষিক পরীক্ষা পাশ করেছি।

বড় মাস্টার প্রতি রবিবারে আমাকে গল্প বলতে আসেন। গুপি আমার বন্ধু, সেও গল্প শোনে।

তিনি লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা করেছেন, সারা পৃথিবী ঘুরে সাংঘাতিক, রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। ঝড়ের মধ্যে জাহাজডুবি হয়েছিল, হাঙরে একটা পা কামড়ে টেনে নিয়েছিল, এখন কাঠের পা। অগ্নিকাণ্ডে বৌ-এর মুখ পুড়ে গিয়েছিল। এখন সব ছেড়ে ছুড়ে সামান্য টাকায় আমাদের বাড়ির পাশের ছাপাখানার প্রুফ দেখেন আর নাইট স্কুল চালান। তাঁর নতুন এসিস্টাণ্ট তলাপত্র আমাদের বাড়ি এসেছিলেন।

গুপি তার ছোট মামার কাছ থেকে নানা বই আনে, মঙ্গলের মানুষ, চন্দ্রনাথের চন্দ্রযাত্রা—এই সব। আমরা ঠিক করেছি বড় হয়ে চাঁদে যাব। গুপির ছোটমামা মহাকাশ-যান বানাবে। এখন থেকে লোহা পেরেক জমাচ্ছে।

ভজুদাদের কলেজের প্রিন্সিপ্যালের নতুন গাড়ি চুরি হয়ে গেছে মেজকাকুর গাড়িও। আজকাল হরদম গাড়ি চুরি হচ্ছে। কিন্তু এবার বিখ্যাত গোয়েন্দা বিনু তালুকদার তাঁর দলবল নিয়ে আসরে নেমেছেন। মোটর চোরদের ঘাঁটিশুদ্ধ নাকি তাঁরা বের করে দেবেন! কানু সামন্তর মুখে খালি সেই কথা।

কদিন থেকে নেপোকে পাওয়া যাচ্ছে না! গতমাসে এই পাড়া থেকে ছত্রিশটা বেড়াল নিখোঁজ।

বাড়ির পেছনের 'ঠাণ্ডাঘরটা' থেকে দারুন খটখট ঝনঝন আওয়াজ আসছে। ঠিক যেন বরফ কাটার শব্দ। ঘরটা এত ঠাণ্ডা যে ওখানে পেঙ্গুইন গজিয়েছে। ওখানে নাকি স্পেস্‌শিপ তৈরি করছে। গুপির ছোট মামা বাড়ি থেকে পালিয়ে ওখানে নাইটওয়াচম্যানের চাকরি নিয়ে লুকিয়ে আছে। ওদিকে তার ঘরে চোরাই গাড়ির নাম্বার প্লেট পাওয়া গেছে!

আজকাল ছোটমাস্টার আমাকে রোজ বিকালে মডেল্ বানাতে শেখান। গুপি একটা টেলিস্কোপ কিনেছে, তাই দিয়ে চাঁদ দেখছি। মনে হল যেন কি একটা চাঁদের দিকে গেল—বোঝাই নৌকার মত।

হঠাৎ আমাদের গলিতে সে কি দুপদাপ ক্যাঁও ম্যাও, জানালা দিয়ে দেখি স্রোতের মতো বেড়ালের পাল ছুটে বেরিয়ে আসছে। বড়মাস্টার লাফিয়ে উঠে খটখট করতে করতে দৌড় দিলেন।)

(আট)

আমি তো হাঁ করে বসেই রইলাম। রামকানাই এসে খাবারদাবারগুলো তুলে নেবার তালে ছিল। বারণ করলাম। বললাম, 'থাক্, ওদের পুষ্টিকর খাবার দরকার হতে পারে। অস্বাভাবিক রকম দৌড়চ্ছে'। রামকানাই ফোঁস শব্দ করে চলে গেল। আরো অনেকক্ষণ পরে গুপি ফিরে এসে কোনো কথা না বলে খেতে আরম্ভ করে দিল।

তারপর খানিকটা জল খেয়ে বলল, 'উঃফ্, ভাবা যায় না।' আমি বললাম, 'নেপোকে দেখলে?'

গুপি মাথা নাড়ল। 'কই, না তো। তবে ঐ শত শত বেড়ালের মধ্যে চোখে না-ও পড়তে পারে।' আমি চটে গেলাম। 'নেপোকে চোখে না-ও পড়তে পারে মানে? সাধারণ বেড়ালের দেড়া সাইজ ওর, গোঁফগুলো পাঁচ ইঞ্চি লম্বা, বেঁড়ে ল্যাজ। চোখে পড়তে বাধ্য।'

গুপি বলল, 'তবে ছিল না।' এমন সময় বড় মাস্টারও হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এলেন। ময়লা রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, 'সারাজীবন ধরে কোথায় না গেলাম, কি না দেখলাম। কিন্তু এর সঙ্গে কোনো কিছুর তুলনা হয় না। দশ ফুট চওড়া বেড়ালের নদীর কথা কেউ কখনো শুনেছে। তার উপর বেড়ালের ঢেউ।'

আমি তো অবাক্! বেড়ালের ঢেউ আবার কি?

গুপি বলল, 'তাও বুঝলি না? পেছনের বেড়াল যদি বেশি জোরে দৌড়য়, তাহলে সামনের বেড়ালের পিঠের উপর উঠে পড়বে। অমনি সেখানে ঢেউ উঠবে।'

বড় মাস্টার চেয়ারে বসে কেবলি মাথা নাড়তে লাগলেন। আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'বলুন না গঙ্গার ধারে কি হল?' গুপি আর চুপ করে থাকতে না পেরে বলল, 'বেড়ালের নদীর মাথায় তিনটে লোক দৌড়চ্ছিল, তাদের চুল খাড়া, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল। বেড়ালরা একবার ধরে ফেললেই তো হয়ে গেল।'

বড় মাস্টার বললেন, 'দুজনের মাথায় দুটো মাছের চুপড়ি, একজনের মুখে দাড়ি। প্রাণের ভয়ে চুপড়ি ফেলে প্রথম দু' জন দে দৌড়। বেড়ালের স্রোত এতটুকু থামল না।'

গুপি বলল, 'সামনের বেড়ালরা হয়তো থেমেছিল, কিন্তু তাদের মাথার উপর দিয়ে পেছনের বেড়ালরা সমান বেগে ছুটে চলাতে কিছু টের পাওয়া গেল না। ফেরার সময় দেখলাম চুপড়িগুলোর, দুটো একটা বাঁশের কুচি পড়ে আছে। আর কিছু নেই।'

আমি উত্তেজনার চোটে চেয়ার থেকে ছয়সাত ইঞ্চি উঠেই পড়েছিলাম। 'আর বেড়ালরা? নেপোকে তো খোঁজা দরকার।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'তাকে আর পেয়েছ! নদীর ধারে পৌঁছে লোক তিনটে আর কোনো উপায় না দেখে, ঝপাঝপ ছুটো খালি যাত্রীর নৌকোয় লাফিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে রাশি রাশি বেড়াল। তাই দেখে ঘাবড়ে গিয়ে যেখানে যত মাঝি ছিল যে যার নৌকো নিয়ে পাড়ি দিল। আর বেড়ালরাও ঝুপ ঝাপ করে সে সব নৌকোয় চেপে বসল। পাঁচ মিনিটে গঙ্গার ধার ভোঁ ভাঁ। শুধু যারা হাওয়া খেতে গেছিল তারা হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল আর দূর থেকে কানে এল একটা ম্যাও-ম্যাও শব্দ। এরকম যে সত্যি হতে পারে কে ভেবেছিল। আমিও না। অথচ একদিন এই আমি ব্রেজিলের সত্যিকার কাঁকড়ামতী নদী থেকে, প্রাণ হাতে নিয়ে বেঁচে এসেছিলাম। সে এক—'

আমি চেঁচিয়ে বললাম—'না, না, শুনব না। এত বেড়ালের মধ্যে নিশ্চয়-ই নেপো ছিল। কেন তাকে ধরে আনলেন না?'

খুব কান্না পাচ্ছিল। তার মধ্যে গুপি কর্কশ গলায় বলল, 'যদি থেকেও থাকে, তার বাড়ি ফেরায় কোনো মতলব নেই।'

মাস্টার মশাইয়ের কি যেন মনে পড়াতে উঠে বললেন, 'যাই আমার কাজ আছে। ছাখ্, পান্থ, আমাদের বড় সাহেব তোর জন্যে পার্সিয়ান ক্যাটের বাচ্চা দেবে বলেছে। তোর বেড়াল হারানোর দুঃখের কথা শুনে তার বড় কষ্ট হয়েছে। আচ্ছা চলি।'

বড় মাস্টার চলে গেলে গুপি আমার কাছে চেয়ার টেনে বসে বলল, 'ব্যাপারটা কিন্তু খুব ঘোরাল। যতদূর দেখলাম বেড়ালগুলো বেজায় মোটা। আর প্রত্যেকের গলায় ছোট্ট একটা করে সাদা টিকিট বাঁধা। সাধারণ বেড়াল নয় ওরা।'

আমি নাক টানতে লাগলাম। কান্না পেলে আমার সর্দি লাগে। গুপি আবার বলল, 'বেড়াল তাড়া করা দাড়িওয়ালা লোকটা ছোটমামা।'

এমনি চমকে গেলাম, যে সত্যি সত্যি চেয়ার-গাড়ি থেকে পড়ে গেলাম। রামকানাই ছুটে এল। দুজনে মিলে আমাকে টেনে তুলল। পায়ের গোড়ালিতে খুব ব্যথা লাগল। কানে এল ঠাণ্ডাঘর থেকে ঠক—ঠক—ঠক।

গুপি বলল, শুনতে পাচ্ছিস্ না? স্পেসশিপ তৈরি হচ্ছে। তবু ব্যাপারটা বুঝতে পাচ্ছিস না? ঐ বেড়ালরা কে তা টের পাচ্ছিস্ না?'

আমি হাঁ করে চেয়ে রইলাম।

গুপি বলল, 'ওরাই হল প্রথম ভারতীয় চন্দ্রযাত্রী। ট্রেনিং নিচ্ছে। আমি তখুনি সব বুঝতে পেরেছি, কিন্তু মাস্টার মশাইয়ের সামনে কিছু বলি নি। মানুষ যাবার আগে ওরা চাঁদে যাবে। নেপো যদি আমাদের আগে চাঁদে যায়, তাতে তোর গর্ব হওয়া উচিত, নাক টানা উচিত নয়। ভেবে ছাখ্, আমরা পৌঁছাবো তার কি আনন্দটাই হবে।'

আমি বললাম, 'কিন্তু পালিয়ে গেছে যে। চাঁদে যাবে কি করে?'

গুপি বলল, 'মোটেই পালায় নি। যাদের নেয় নি, তারাই পালিয়েছে। হয়তো গলার টিকিটে লেখাই ছিল, 'অমনোনীত', পড়তে তো আর পারি নি।'

আমি বললাম, 'তা হলে কি করা উচিত?'

গুপি বলল, 'এখন মোটে সাতটা। আটটা অবধি বসি। ছোট মামা ঠিক সাঁতরে ফিরে আসবে। দারুণ

সাঁতার কাটে জানিস্-ই তো। সেবার সেই-যে সোনার মেডেল পেল। বেড়ালরা কিছু জলে নেমে ওর পেছন পেছন সাঁতার দেবে না।'

সঙ্গে সঙ্গে চুপ্‌চুপে ভিজে ছোটমামার প্রবেশ। দাড়িগুলো ভিজে গালের সঙ্গে লেপটে রয়েছে।

আমাকে বলল, 'পাজামা প্যাণ্ট দে, গেঞ্জি দে, গামছা দে;' আমার আলনাতেই সব ঝোলানো থাকে। পাশে স্নানের ঘর। দশ মিনিটের মধ্যে গা মুছে, কাপড় বদলে ছোটমামা চেয়ারে বসে ঠকঠক কাঁপতে লাগল। নাকি গলায় দাড়ি জড়িয়ে গিয়ে সাঁতারের খুব কষ্ট হয়েছে। তা ছাড়া ইলিশ মাছে পায়ের আঙুলে ঠুকরে দিয়েছে আইডিন দেওয়া দরকার। তাই দেওয়া হল।

রামকানাই একবার উঁকি মেরে বলল, 'ঐ আরেক খোদ্দের এলেন।'

আমি বললাম, 'গরম চা জলখাবার কি আছে এনে দাও।'

রামকানাই গরম চা আর ডিম দিয়ে পাঁউরুটি ভেজে এনে বলল, 'থাকে কখনো ঘরে কিছু? এঁরাই য সব রাক্ষস।',

ছোটমামার খাওয়া শেষ হওয়া অবধি আমরা চুপ করে ছিলাম।

তারপর হাত ধুয়েই বড় বড় চোখ করে বলল, 'বুড়ো চিনেছে নাকি আমাকে? তা হলেই তো বাবা কাছে লাগাবে, অমনি সামন্ত পেয়াদারা এসে ধরে নিয়ে যাবে। তা হলে রহস্য উদ্‌ঘাটন কে করবে?'

এই সময় ছোট মাস্টার টুক্ করে ঘরে ঢুকে একটা মোড়ায় বসে লজ্জিতভাবে বললেন, 'চুল কাটাচ্ছিলা পাড়ার সেলুনে। সেখানে বেড়ালের কথা শুনে ছুটে এলাম। ভাবলাম তাহলে হয়তো নেপোকে পাওয়া গেছে কিন্তু তোমাদের মুখ দেখেই ভুল ভেঙেছে, আর বলতে হবে না।'

ঠক—ঠক—ঠক—ধড়াস্।

ছোটমাস্টার চমকে উঠলেন। 'দিনরাত ঠাণ্ডা ঘরে কাজ হয়, তবু বাড়ি তৈরি শেষ হয় না কেন?'

ছোটমামা আঙুল দিয়ে দাড়ি শুকোতে শুকোতে বললেন,—

'অন্য কাজ হয়। বাড়ি তৈরির কাজ নয়। ঠাণ্ডাঘর হবে তো তার বিজলি ব্যবস্থা কই? পেলেই ঢোঁক ঢোঁক করে বেড়াই। এটুকু বুঝেছি যে ওখানে ঠাণ্ডা করার কোনো ব্যবস্থাই হয় না।'

আমরা বললাম, 'তবে কি স্পেসশিপের কথাই ঠিক? ঠাণ্ডাঘরটা ছদ্মবেশ?' ছোটমাস্টার বললেন, 'ভ স্পেসশিপ বানাবে, তার জন্যে অত গোপনীয়তার কি আছে? আমাদের দেশের লোকে মহাকাশযান তৈরী করছে এতো ঢাক পিটিয়ে বলে বেড়াবার কথা। লুকিয়ে করবে কেন?'

ছোটমামা বললেন, 'প্রকাশ্যে করলেই হয়েছে! অমনি প্ল্যান চুরি যাবে, পার্টস্ চুরি যাবে, সরকারি তল আসবে, স্পেসশিপ বানাচ্ছ তার পারমিট কোথায়, ছবিসহ দরখাস্ত কর! আমি জানি না? ফালতু জিনিস দি ঘরে বসে রেডিও বানিয়েই আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে! করতে হলে লুকিয়েই করতে হবে। আপনি যেন আবা এসব কথা ফাঁস করে দেবেন না।'

ছোটমাস্টার জিব কেটে বললেন, 'না, না, কি যে বলেন! কিন্তু হাজার হাজার বেড়াল এল কোত্থেকে স্পেসশিপ করতে কি বেড়াল লাগে? মানে লোম টোম—' নেপোর জন্য বড় ভাবনা হল। গুপি বলল, 'তা বুঝলেন না?' একেবারে ঝপ করে তো আর চাঁদে মানুষ পাঠানো যায় না। প্রথমে এদের সব পাঠানো হবে 'কিন্তু এতগুলো কেন? দুটো একটা পাঠালেই তো হয়। তাই তো সব দেশ থেকেই পাঠায়।'

গুপি বলল, 'মানুষের ওজন সইবে কি না সেটা তো দেখা দরকার। একটা আড়াইমণি মানুষের সমা

ওজন নিতে হলে, কটা সেড়-সেরি বেড়াল লাগবে বলুন তো? একেবারে একশো দেড়শো মানুষ নিরাপদে যাওয়া-আসা করতে পারবে কি না, তাও তো দেখা দরকার।'

ছোট মাস্টার তখন জানতে চাইলেন, 'কোথায় রাখা হয়েছিল এত বেড়াল?' আমরা ছোটমামার দিকে চাইলাম।

গুপি বলল, 'ছোট করে বল, ছোটমামা।' ছোটমামা বললেন, 'আজ অনেকদিন যাবৎ এই গুরু ভদ্রের দায়িত্ব একলা—' গুপি বলল, 'ছোটমামা, ফের!'

ছোটমামা বললেন, 'ঐ নকল ঠাণ্ডাঘরের ওদিকের দেয়ালে, ঠিক গঙ্গার উপরেই দেখলাম একটা বড় চোঙার মুখ। কাঠ দিয়ে এঁটে বন্ধ করা। সামান্য কাঠে আমি ভড়কাই না। দুটো মাছ-ওয়ালা রোজ গলি দিয়ে যায়, তাদের কিছু পয়সা দিয়ে রাজি করিয়ে, হাতুড়ি দিয়ে কাঠটি ভাঙালাম। কাঠ ভেঙে যেই না ওরা মাছের চুবড়ি মাথায় তুলেছে, অমনি চোঙার মধ্যে থেকে সে কি খচমচ খামচা খামচি! ক্রমশঃ

বলতে পারো

শৈলশেখর মিত্র

ভূষণ্ডিকাক, ভূষণ্ডিকাক
বলতে পারো হাজার বছর পরে—
কেমন ছড়া হ'বে লেখা
বাংলা দেশের ঘরে?
গঙ্গা তখন পথ বদলে
কোন্ শহরের বুকে,
মোহনাটার মুখে
আছড়ে প'ড়ে গান শোনাবে
ময়লা মাটির চরে—
কেমনতর গান হ'বে তা
হাজার বছর পরে?

ভূষণ্ডিকাক—হাজার বছর
জোয়ার-ভাঁটায় হারিয়ে চলে গেলে—
কেমন ছড়া হবে লেখা
আভাস কি তার পেলে?
জীবন চলার ছলা-কলায়
আটপৌরে ছবি,
হেলা-ফেলায় কবি
নিজের মনে আঁকবে যখন
খেয়াল খুসির তরে—
কেমন ছবি হ'বে সেটা
হাজার বছর পরে?

ক্রীড়াজগৎ

অজয় হোম

ফুটবল

১৯৬৭ সালে কলকাতায় ফুটবলের পরিসমাপ্তি হল না। না হল লীগ, না হল শীল্ড। এর ভিতর এল ডায়নামো মিনসক্ রাশিয়া থেকে। রাশিয়ার জাতীয় লীগে ছ'নম্বরী দল। অনেক আশা নিয়ে গিয়েছিলাম ভালো খেলা দেখব বলে। একদম নিরাশ হয়ে ফিরলাম। যেমন ভারতীয় তেমন রুশ। এ বলে আমায় দেখ ও বলে আমায় দেখ। গরমে কষ্ট হলেও ওদের দম অনেক বেশি। আমাদের আবার দল তৈরিতে গলদ, তার উপর অনুশীলনহীন সবাই, তাই ২-০ গোলে হারলাম। অথচ জেতা উচিৎ ছিল ওই ২-০ গোলে। ভারতে সর্বত্র দিল্লি মাদ্রাজ কটক বোম্বাই যেখানেই খেলা হবে প্রায় এই ফলই হবে। রুশদের খেলায় কোনো জেল্লা নেই। সেই ইওরোপীয় ফুটবলের চার-তিন তিন পদ্ধতিতে খেলা। বাইরে থেকে ডেকে এনে এইসব খেলা খেলানোর কোনো মানে হয় না। শুধু সময় নষ্ট পয়সা নষ্ট। খেলা দেখতে দেখতে ঝিমুনি আসে। একী খেলা! ভারতীয় দল কোনোরকমে জোড়াতালি দিয়েই সর্বত্র তৈরি হচ্ছে এবং খেলাও তদ্রূপ হচ্ছে। রুশ ভাবছে বিপক্ষে কেউ যেন তেমন নেই। ভারত যেন এমনই খারাপ খেলে। আমার প্রশ্ন, বাইরের এই দলের সঙ্গে খেলা যখন হবেই তখন সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও অনুশীলনের বন্দোবস্ত কেন থাকবে না?

ক্রিকেট

এমসিসি সফর এই মরশুমে হল না। ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনা না করেই এমসিসির ইচ্ছা প্রকাশে ক্রিকেট কণ্ট্রোল রাজি হয়ে গেল। এমসিসি তার দক্ষিণ আফ্রিকা সফর বাতিল হওয়ার

লোকসান বাঁচানোর জন্যে ভারতে তাদের পছন্দমতো চুক্তি অনুযায়ী খেলতে আসতে চেয়েছিল। অর্থাৎ লোকসান পুষিয়ে নিতে চেয়েছিল। ভারত সরকার বোর্ডের কথায় না নেচে বৈদেশিক মুদ্রা দিতে অস্বীকার করায় সফর বাতিল হল। ভারতের ২০ হাজার পাউণ্ড বেঁচে গেল।

কলকাতায় এখন ক্রিকেট মরশুম। সিএবি লীগ ও নক আউট শুরু হয়েছে।

স্কুলদল

তোমরা সবাই জানো ইংল্যাণ্ড বিজয়ের পর ভারতীয় স্কুল দল অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছে খেলতে ম্যানেজার হেমু অধিকারীর সঙ্গে। সবচেয়ে আনন্দের কথা ওই দলে তিনজন বাঙালির ছেলে আছে। তার মধ্যে একজন আবার অধিনায়ক। অধিনায়ক রাজা মুখার্জি এর মধ্যে বেশ নাম করে ফেলেছে। সবার প্রথম সেঞ্চুরি তো ওই করল। মহীন্দার অমরনাথ ও লক্ষ্মণ সিং দুজনেই এক রানের জন্যে মিস করেছে। দীপঙ্কর তার মারাত্মক স্পিন বোলিং এ হ্যাটট্রিক পর্যন্ত করেছে। রাকেশ ট্যানডন ব্যাটে বলে দুয়েতেই বেশ দক্ষ। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট সমজদার ও সমালোচকরা সবাই স্বীকার করেছেন এত ভাল স্কুল ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়ায় এখনও পর্যন্ত পদার্পণ করে নি। দুর্বলতা জোর বোলিং-এ। এ দুর্বলতা ভারতের প্রধান দলেও। এই দুর্বলতার জন্যে স্কুল দল সত্যিকারের কোনো স্কুলের জোর বোলারের বিরুদ্ধে কেমন খেলবে জানি নে।

প্রথম খেলা খেলল ব্রিসবেনে কুইন্সল্যাণ্ডের গ্রেট পাবলিক স্কুলের সঙ্গে। খেলা হল ড্র। লক্ষ্মণ সিং মাত্র ১ রানের জন্যে সেঞ্চুরি করতে পারে না। গ্রেট পাবলিক স্কুল—৯ উইকেটে ২৪৪ (রাথি ৭৭ ; দীপঙ্কর সরকার ৫৬ রানে ৩, শঙ্কর ৭৫ রানে ৪ উইঃ) এবং ৬ উইঃ ১০৫ (দীপঙ্কর ২৪ রানে ৪)। ভারতীয় স্কুল—৯ উইকেটে ২২৬ ডিক্লেঃ (লক্ষ্মণ সিং ৯৯, বি প্যাটেল ৬০)।

২য় খেলা কুইন্সল্যাণ্ডে টুউম্বা শহরে কম্বাইণ্ড ডালিং ডাউনস সেকেণ্ডারি স্কুলের বিরুদ্ধে ভারতীয় স্কুল এক ইনিংস ও ৬৭ রানে বিজয়ী হয়। রাজা তার রান সংখ্যায় ২ বার ওভার বাউণ্ডারি এবং ১৩ বার বাউণ্ডারি মারে। দীপঙ্কর করে হ্যাটট্রিক। ২য় ইনিংসে দীপঙ্কর উইকেট না পেলেও ৭ ওভার বলে ৬টি মেডেন এবং মাত্র ৭ রান দেয়। ভারতীয় স্কুল—৫ উইঃ ৩০৪ (রাজা মুখার্জী ১৪৪ নটআউট, মহীন্দার অমরনাথ ৪৪, রাকেশ ট্যানডন ৪১ রান আউট)। ডালিং ডাউনস স্কুল—১২৭ (রায়াস ৫১, দীপঙ্কর হ্যাটট্রিক সমেত ১৩·৭ ওভার ৪ মেডেন ৫৩ রান ৬ উইকেট) এবং ১১০ (রায়ান ২৮, ক্লিন ২৯ ; ট্যানডন ৪৮ রানে ৫, মহীন্দার ১০ রানে ৩ উইঃ)।

৩য় খেলা ব্রিসবেনে অ্যাসোসিয়েটেড স্কুলস অফ কুইন্স"্যাণ্ডের বিরুদ্ধে জেতে এক ইনিংস ও ২১ রানে। আমাদের ছেলেরা হাত খুলে প্রচণ্ড মার মারে। দর্শনীয় মার দেখে দর্শকরা প্রচুর আনন্দ পায় এবং উচ্চৈঃস্বরে প্রশংসা জানায়। ভারতীয় স্কুল—৪ উইঃ ডিক্লে : ২৬২ (কুন্দরন ৪২, প্যাটেল ৮৭, ট্যানডন ৫৮)। অ্যাসোসিয়েটেড স্কুল—৯৪ (কনোলী ২৯, ট্যানডন ১৯ রানে ৫, বোরদে ৩৬ রানে ৩ উইঃ) এবং ১৪৭ (ভাণ্ডেলিউর ৪৭ ; গাভারি ৩৪ রানে ৩, বোরদে ৪০ রানে ৩, ট্যানডন ৩২ রানে ৩ উইঃ)।

কুইন্সল্যাণ্ড সফরের পর ভারতীয় স্কুল দল আসে নিউ সাউথ ওয়েলসে। ৪র্থ খেলা সিডনিতে গ্রেট পাবলিক ও অ্যাসোসিয়েটেড স্কুল যুগ্মভাবে নিউ সাউথ ওয়েলস স্কুল দলের বিরুদ্ধে ভারতীয়রা এক ইনিংসের খেলায় জয়ী হয় ৭ উইকেটে। অমরনাথের মারাত্মক বোলিংয়েই প্রতিপক্ষ কাবু হয়। নিউ সাউথ ওয়েলস স্কুল—১১৮ অমরনাথ ৪৮ রানে ৬ উইঃ)। ভারতীয় স্কুল দল—৩ উইঃ ২৫৮ (২১৮ মিনিটে এই রান হয়। রাজা ৫৪, লক্ষ্মণ সিং ৫০, গাভারি ৪৮ সময় মাত্র ৪৭ মিনিট)।

৫ম খেলা সিডনিতে একদিনের খেলায় কম্বাইণ্ড ক্যাথলিক স্কুলের বিরুদ্ধে ভারতীয়রা ড্র করে। কিন্তু তা হলে কি হবে! ২৫০ মিনিটে আমাদের ছেলেরা ২৮৯ রান করে সকলকে তাক লাগিয়ে দেয়। অমরনাথ এক রানের জন্যে সেঞ্চুরি মিস করে। দীপঙ্কর চা পানের পর এক সময় ৬ রানে ৪টি উইকেট দখল করে। ভারতীয় স্কুল—৪ উইঃ ডিক্লেঃ ২৮৯ (অমরনাথ ৯৯, রাজা ৭০, ঘারবি ৬০)। কম্বাইণ্ড স্কুল—৮ উইকেটে ১১৯ রান।

আমেরিকার খুকু

এই যে সেদিন মেক্সিকোতে অলিম্পিক হয়ে গেল তাতে মাত্র ১৫ বছরের একটি মেয়ে তিনটি সোনার মেডেল পেয়ে সবাইকে অবাক করে দিয়েছে। একটি পেতেই কত কাঠখড় পোড়াতে হয় আর এতো কল্পনার বাইরে। আমেরিকার সেই খুকু ডেবি মেয়ার ৪০০ মিটার, ৮০০ মিটার ও ১২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল সাঁতারে অলিম্পিকে নতুন বিশ্বরেকর্ড করেছে। ১৯৬৭ সালে পনের পুরোবার আগেই তাকে সম্মান দেওয়া হয় 'সুইমার অফ দি ওয়ার্লড' বলে। খেলাধুলার ইতিহাসে ডেবি নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। অলিম্পিকে একজন জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ডেবি, তুমি তিনটি মেডেল নিয়ে কী করবে?' সরলমনা ছোট্ট ডেবি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, 'একটা বাবা-মাকে, একটা মাস্টারমশাইকে দেব (কোচ শার্ম চেভুর), আর-একটা রাখব আমার নিজের জন্যে।' অলিম্পিক স্বর্ণপদকের মূল্য যে কী তা বোঝারও বয়স ডেবির এখন হয়নি। কত সুন্দর মেয়ে বলো তো!

বাসা

জীবন সর্দার

বাসা একটি চাই। যেমন মানুষের তেমনি আর সবার। কিন্তু কেন চাই?

বিশ্রাম আরামের জন্যে? 'ছেলে' মানুষ করবার জন্যে? প্রকৃতির দুর্যোগ থেকে বাঁচবার তাগিদেও হতে পারে। সবার বেলায় একই নিয়ম নাও হতে পারে। চলো দেখি কে কেমন করে থাকে। তারপর খুঁজব কারণ।

অনেক দূরের পথ পেরিয়ে যখন বাসায় ফিরে আসি তখন মনে কি আরাম! তখন আমার জানতে ইচ্ছে করে—পোকাগুলো, পাখিরা বনের পশু আর জলের মাছ এদেরও নিশ্চয় বাসা আছে, সে বাসা কেমন?

ঘরে যে কোণটায় বসে আমি লিখি, তার ধারের জানালার এককোণে একদিকে একটুকরো মাটির ঢেলা জমে আছে দেখলাম। শক্ত নয় ঢেলাটি। ভেতর তার ফাঁপা, কলসীর মত 'হাঁ' তার মুখ। আলতো করে খুঁটে তুলে নিলাম হাতে। কী আশ্চর্য, তার পেটের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো 'লাফানে মাকড়সার' সাতটি ছানা। ছানাগুলোকে 'কলসে' ভরে রেখে দিলাম, ঠিক যেমন ছিল তেমনি। তারপর খোঁজাখুজি শুরু করলাম এমন আর পাই কিনা।

অন্য এক ঘরে এক জানালার কোণে ঐ রকম একটি বাসা দেখতে পেলাম। ওটির তলার দিক শুকনো ওপরটা ভেজা। একটু বাদেই ডানা ঝাপটে ফিরে এলো একটি পোকা। 'কলসীর' কানায় বসে, চটপট কি দেখে নিল। তারপর, ঝাঁ-ঈ ঈ-ঈ একটানা একটু শব্দ। দেখি কলসীটি বড় হয়ে উঠছে, গলা সরু হয়ে যাচ্ছে। শেষে কলসীর মুখ অবধি বন্ধ হয়ে গেল। শব্দ থেমে গেল। পোকাটি উড়ে চলে গেল, ফিরে এলোনা।

তারপর ঘরের কোণে সবখানে খুঁজতে লাগলুম—আর কিছু দেখি কিনা। ছোট্ট একটি কাগজের বাকসে পুরনো কিছু কাগজ ছবি এইসব হাবিজাবি জমা ছিল। বাক্সটি সরালাম, কাগজগুলো তুললাম। ওমা, সেকি—খুদি খুদি টিকটিকি ডাগর ডাগর চোখ মেলে আমাকেই দেখছে। তাদের আশপাশে পড়ে আছে টিকটিকির ডিমের খোলা। টেবিলের তলায় একটি টিকটিকির ছানাকে দেখে আগের দিনও

ভেবেছি কোথা থেকে ওরা আসে। কাগজগুলো যেমন ছিল তেমনি রেখে, ঠেলে বাক্সটি যেখানে ছিল রেখে দিলাম। বসে বসেই এ করছিলাম, উঠে দাঁড়াতেই শুনি—ফুড়ুৎ। মানে কি ?

শব্দটা এসেছে বইয়ের তাক থেকে। সেদিকে ঘাড় ফেরাতেই আবার—ফুড়ুৎ। চড়ুই একটি উড়ে গেল। আরেকটি তাহলে আগেই গেল। ওখানে ওরা কি করছে দেখতে হয়! তাকের উপর বইয়ের মাথায় কয়েক টুকরো খড়, দেশলাইয়ের কাঠি, শুকনো ঘাস, বেশ খানিক এনে জমিয়েছে। ওরা কি এখানে বাসা বানাবে ? বইগুলো নষ্ট করবে নাতো—কথাটি ভেবে বইগুলোর উপর ঢাকা দিয়ে দিলাম। তাইতে গেল ওদের বাসা পড়ে। কয়েকবার তার পরেও এসেছে, বসে বসে কতকিছু বলেছে কিন্তু বাসা আর গড়েনি। অন্য কোথাও ঠাঁই খুঁজে নিয়েছে। ওদের বাসা তৈরীর ঐ মশলাগুলো আমি বাইরে ফেলে দিলাম।

বাইরে যাবার আগে কাগজপত্র বইখাতা যে ঘরটাতে থাকে তার দরজাটি দেখে গেলাম। কেমন যেন ফাঁপা মনে হ'ল। খড়কুটোগুলো ফেলে দিয়ে, এসে দরজাটি ঠুকে দেখি ভেতর থেকে মাটি··· শুকনো, ঝরঝরে ঝরে পড়ল। তার সাথে দরজার কাঠামো অবধি ভেঙ্গে গেল। উইপোকা বাসা বানিয়েছিল। ব্যাপারটি একদিনে হয়নি। উইপোকার বাসার গড়ন ধরণ বহুদিন ধরে না দেখলে সহজে বোঝা যায় না। আমার চোখে ধরা পড়ার অনেক আগেই চলে গেছে তারা ঘর ফেলে— দেয়ালজুড়ে মাটির সুরঙ্গ বানিয়ে ছাদের ঘুলঘুলি, তারপর উধাও।

উইপোকা আমাদের বাসা থেকে উধাও হয়েছে বটে কিন্তু বাগানের পিঁপড়েরা তাদের মাটির বাসায় খাসা আছে। পিল পিল করে বেড়ায় যে কালো পিঁপড়েগুলো, কিংবা কুটুর করে কামড়ায় যে লাল পিঁপড়েরা সবারই বাসা আছে,—আমাদেরই বাসার কাছাকাছি। বাগানে যাবার সিঁড়িটার তলা থেকে কালো পিঁপড়ে আনা যাওয়া করে ঘরে। বাগানে কলাবতী গাছটারই তলায় লালপিঁপড়েদের বাসা। বর্ষায় দু'একবার ওরা ঘরে উঠে এসেছিল। নইলে জ্বালাতন বড় করেনা।

একদিন জ্বালাতন বোধ করেছি 'একটি লাফানে ঘর মাকড়সার', বাসা নিয়ে। তুলোর মত সাদা, নরম কিন্তু আরও ঘন তার আঁশ। দোয়াতদানের ভেতর ওটাকে কিছুতেই রাখতে চাইছিলুম না। যতই তুলতে চেষ্টা করি, পরতে পরতে চটচটে তুলো উঠে আসে, সেটি ওঠে না। হঠাৎ এক কোণ দিয়ে বেরিয়ে এল একটি ছোট্ট মোটা কালচে মাকড়সা। লাফিয়ে আমার দিকে ফিরে ড্যাবড্যাব কোরে তাকিয়ে রইল। তার বাসা সে ছেড়ে গেল না। আমি তাকে ছেড়ে বারন্দায় এসে দাঁড়ালাম।

বারান্দা থেকে দেখা যায় রাস্তার ওপাশে ল্যাম্‌পোস্‌ট্। তার মাথায় গো-শালিকের বাসা। কাকের বকের চিলের বাসার সাথে ওদের বাসার কিছু মিল আছে। কাঠকুটো শুকনো ডালের অগোছালো একটি বাসা। কিন্তু বেশ পোক্ত। ল্যাম্পোসটের ধারেই নালা। নালার ওপারে 'চালতে মাদারের' সার। কয়েকটি মাদার গাছে, ঐ গাছের পাতা দিয়েই গড়া গাছপিঁপড়ের বাসা। পাতার সাথে পাতা জুড়ে অমন করে আর কোন্ পোকা বাসা বানাতে পারে !

ঘর থেকে বেরিয়ে জল জংগল আর পাহাড়ে আমি বাঘভালুক হাতী হরিণের বাসা দেখতে গিয়েছি,

কতশত মাইল গিয়েছি পাখির বাসা দেখতে। কিন্তু নিজের বাসায় বসে এঘর থেকে ওঘরে গিয়ে কত 'জনের' কত রকম বাসা দেখেছি, বাসা বানাবার কায়দা দেখেছি একদিনে তোমাদের বলে উঠতে পারব না, কেননা একদিনেই আমারও দেখা হয়নি। তোমাদের কাছে, একই বাসায় 'কত জনের' বাসা হতে পারে, আমার অভিজ্ঞতা থেকে সে কথা বললাম। সবার কাছেই তার নিজের বাসা খাসা। বাসা গড়ার কারুকর্মে কেউ কম যায় না। ঘরে বসে দুচোখ মেলে প্রকৃতি পড়ুয়ারা যদি তা না দেখে তবে কে দেখবে।

প্রকৃতি-পড়ুয়ার পরিবেশ প্র, প, সান্ত্বনা রায়চৌধুরী তার পরিবেশকে যেমন জানাচ্ছে: আমার পড়ার ঘরের জানালা দিয়ে তাকালেই দেখা যায় একটি নারকেল আর একটি নিমগাছ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। দূরে একটি তালগাছের মাথাও দেখা যায়। সব কিছুর পেছনে একটুকরো নীল আকাশ। জানালার সামনের উঠোন পেরিয়ে পাঁচিলের ওপাশ থেকে উঁকি দিচ্ছে একটি কলাগাছ। বাড়ির ছাদে উঠেই খুব কাছে পাই কতগুলো নারকেল গাছ, আর নিমগাছের সবুজ আভা। আশে পাশের ছোট বড় অনেক বাড়ির মাঝে আরও অনেক গাছ, নাম জানিনা সবার। দূরে সুপুরি গাছের সারি। দেবদারু গাছও দেখা যায় একটা।

এবার নিজেদের বাগানে। সিঁড়ি দিয়ে নেমেই পরশ পাই 'থুজা'র। এছাড়া গোলাপ—সাদা, গোলাপী লাল, কালচে লাল, কত রকমের যে। গেটের মাথায় উঠে গেছে একটি অপরাজিতা, আর একটি অপরাজিতা একটি লেবু গাছ বেয়ে উঠেছে। এতদিন বর্ষা শরতের ফুল ছিল এখন শীতের ফুল—গাঁদা, ডালিয়া জায়গা নিয়েছে তাদের বাড়ির পেছন দিকের বাগানে সারি সারি মোরগ ফুলের গাছ। তাদের পাশে খানিকটা খালি জায়গা। ওখানে আগে ছিল বড় একটি চাঁপা গাছ, এখন নেই। একটি তুলসী আছে, আর আছে আম আর কলাগাছ একটি করে। বাগানের বেগুন, পুঁই সবজী গাছের মাঝে কয়েকটি হলুদ গাঁদা বেশ মানিয়ে গেছে।

প্রকৃতি-পড়ুয়ার দিনলিপি থেকে। প্র, প অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮. ৬. ৬৮। আজ বিকেলে কতকগুলো ব্যাঙাচি ধরে আনলাম। পুষে বড় করে ছেড়ে দেব। ব্যাঙাচিগুলোর দেহের মধ্যে একটা মাথা আর একটা লেজ। কানকো দিয়ে মাছের মত শ্বাস নেয়।

১৯. ৬. ৬৮. আজ কিছুটা মস্ এনে সুতো বেঁধে ঝুলিয়ে ওদের খেতে দিলাম, পরে দেখি, কয়েকটা ব্যাঙাচি এসে কুরে কুরে মস খাচ্ছে। আমি ওদের আতস কাচ দিয়ে দেখতে লাগলাম। চামড়াটা একটু সোনালী, আর তার উপর কালো ছিটে, পেটে শাঁখের মত একটা ঘোরালো দাগ।

২৩. ৬. ৬৮. কয়েকদিন ধরে কয়েকটা ব্যাঙাচির একটু পরিবর্তন লক্ষ্য করছিলাম, কয়েকটার পেটের পিছন দিক চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। আজ দেখি, একটা বড় ব্যাঙাচির পিছনের পা দুটো গজিয়ে গেছে আর সামনের পা দুটোও একটু হয়েছে। আর একটার দেখি চারটে পাই গজিয়ে গেছে।
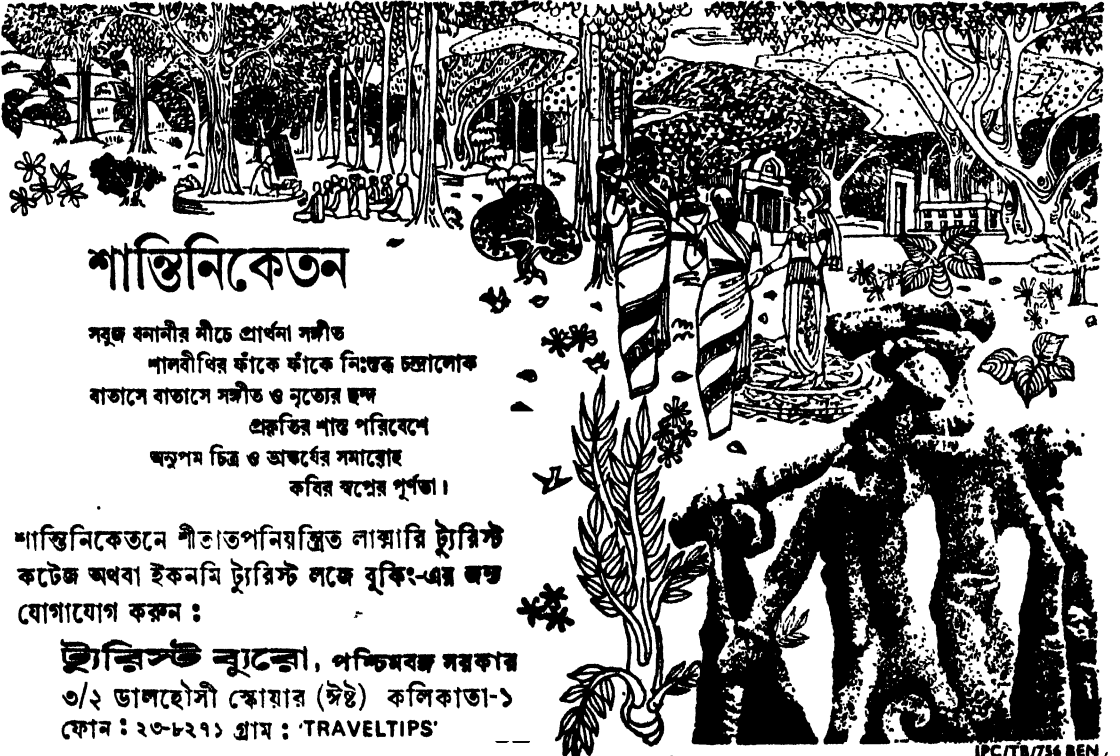
২৪. ৬. ৬৮. আজ কয়েকটা মজার ঘটনা হলো। সকালে গিয়ে দেখি, যেটার চারটে পা হয়েছে, সেটা জল থেকে কিছুটা উঠে গামলাটার শুকনো জায়গায় লেজ ঝুলিয়ে মাথা উঁচু করে বসে

আছে। একটু ছুঁতেই লাফিয়ে জলে পড়ে বড় ব্যাঙের মত সাঁতরে আবার 'ডাঙ্গায়' গিয়ে উঠলো। তারপর এক লাফে গামলা থেকে বেরিয়ে লাফিয়ে বেড়াতে লাগল। বিকেলে বেশ উঁচু একটা ইঁট জলে দিতেই এসে মাথা উঁচু করে বসল।, দেখি, সকালের অত বড় লেজটি প্রায় মিলিয়েই গেছে।

২৭. ৬. ৬৮. এ পর্যন্ত তিনটে ব্যাঙাচি ব্যাঙ হয়ে গেছে। অন্য ব্যাঙাচিদের লেজের উপর একটা স্বচ্ছ চামড়া দেখলাম। ব্যাঙ ও ব্যাঙাচিগুলো পিঁপড়ে জলজ গাছ, মস্ ইত্যাদি খায়। ব্যাঙগুলো অতি ছোট। পিছনের পায়ে পাঁচটা করে আঙ্গুল।

১. ৭. ৬৮. আজ ওদের কাছে একটা ছোট লাল পিঁপড়ে দিলাম। একটা ব্যাঙ সেটা অনেকক্ষণ ধরে দেখল আর শেষে উঁচু হয়ে একটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসল। হঠাৎ হাঁ করে পিঁপড়েটা নিতে গেল। কিন্তু পারল না। সাত আটবার করে পারল।

১১. ৭. ৬৮. এপর্যন্ত চার-পাঁচটা ব্যাঙাচি ব্যাঙ হয়েছে। একটা আবার তার মধ্যে কোথায় পালিয়েছে। ওদের আজ 'জন্মস্থানে' ছেড়ে দিয়ে এলাম। কাছেই জলে গিয়ে সাঁতরাতে লাগল। ব্যাঙ সাঁতারের সময় সামনের পা বিশেষ কাজে লাগায় না। পেছনের পায়ে জলে চাপ দিয়ে এগোয়। আশেপাশে অনেক ব্যাঙ দেখতে পেলাম। বোধ হয় ওদেরই আত্মীয়!

চিঠিপত্র

(১) কিশোরকুমার রায়. ১৪৭৪, বয়স ৯

তোমার দাদা আশিসের ১৭ বছর বয়স হয়ে গেছে, কাজেই আর তাকে চিঠিপত্র লেখা যায় না। ধাঁধাগুলো আরো ধারালো হওয়া দরকার, যেমন ধর, কোন জিনিস এক পা নড়ে না অথচ কলকাতা থেকে দিল্লী যায়? কিম্বা, কোন জিনিস টানলে ছোট হয়ে যায় জান নাকি উত্তরগুলো? প্রকৃতিপড়ুয়ার দপ্তর আমাদের একটা শ্রেষ্ঠ বিভাগ, ভালো তো হওয়াই উচিত। তোমাদের আশে পাশের প্রাকৃতিক ব্যাপার নিয়ে জীবন সর্দারকে লেখ না কেন?

(২) অমিতাভ রায় চৌধুরী, ২৮৭৯, বয়স ১২

তোমার পূজা সংখ্যায় পৃষ্ঠার গোলমাল ছিল, তাই নতুন পৃষ্ঠা পাঠানো হয়েছে। পেয়েছ আশা করি?

পত্রবন্ধু চাই – শখ :—ডাকটিকিট সংগ্রহ, ফুটবল, ক্রিকেট, নাটক, আবৃত্তি। গোয়ালিয়রের সম্বন্ধে আমাদের অনেক কৌতূহল, যদি মনের মতো পত্রবন্ধু না পাও, সম্পাদকদের দুজনকে তোমার পত্রবন্ধু করে নিয়ে ওখানকার খবরাখবর পাঠিও।

(৩) নিশীথ, নীতীশ ও সমীর গুহ, ১৬০৩, বয়স ১৩,১১,৯

তোমারা সাতনা থেকে চিঠি লিখেছ যে পুজোয় অনেক আনন্দ করেছ। বড় জায়গায় অনেক পুজো, আনন্দটা ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ছোট জায়গার দুটো একটা পুজোয় মন ভরে আনন্দ করা যায়। ঐ পুজোকে একান্ত নিজেদের পুজো বলে মনে হয়েছিল নিশ্চয়? ওখানকার খবর দিয়ে চিঠি লিখো। হাত পাকাবার আসরে দিতে পার। ভালো হলেই ছাপব।

(৪) অপরাজিতা বসু, ১৮১৪, বয়স ১১

পরীক্ষায় ভালোভাবে পাশ করেছ শুনে খুসি হলাম। পুজোর ছুটিতে গাড়ি করে দুর্গাপুর, মাইথন, পাঞ্চেত, বক্রেশ্বর, বোলপুর, ময়ূরাক্ষী বেড়ালে, তার একটা বিবরণী লিখে পাঠাও না কেন, হাত পাকাবার আসরের জন্যে?

(৫) অঞ্জন ভট্টাচার্য, ২৩৬১, বয়স ১২,

চিঠি লিখবার সময় তোমার নামের উপর এক ফোঁটা জল পড়ে অঞ্জনকে রঞ্জন মনে হচ্ছে। আশা করি ওটা চোখের জল নয়? পূজা সংখ্যা তো ভালোই লেগেছে মনে হচ্ছে। তোমার তালিকায় প্রায় সব নামই দিয়েছ যে!

(৬) অঞ্জনকুমার ঘোষ, ২৮৯১, বয়স ১৪২

পত্রবন্ধু চাই। শখ :—ডাকটিকিট জমানো, বই পড়া।

(৭) শাশ্বতী দত্ত, ৫৭, বয়স ১৫

ছবি দুটি ভালোই হয়েছে। দেখ কবে ছাপা হয়? জায়গা পেলেই হবে। এই রকম বড় করে, কালি দিয়ে স্পষ্ট করেই আঁকতে হয়।

(৮) জ্যোতির্ময় আর ইন্দ্রাণী ও ঈশানী মজুমদার ৯৮৩, বয়স ১৬½,

বয়স ১৭ হলেও গ্রাহক থাকবে না কেন? বোনদের নামও সঙ্গে থাকবে। ওদের-ও বয়স দিতে হবে। চিঠিপত্র, প্রতিযোগিতা, হাতপাকাবার আসরে ওরা যোগ দিতে পারবে। ওদের জন্যে গ্রাহক কার্ডের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

শিবানী রায় চৌধুরী এখন বিলেতে আছেন বলে লেখা কম বেরুচ্ছে। অন্তরায়ের ই নাম অজেয় রায়। পূজা সংখ্যার 'দূত' গল্পটি উনিই লিখেছেন। সায়নদেব মুখোপাধ্যায় আরো লেখা দেবে আশা করছি। অজয় করকে দিয়ে তোমার অনুরোধ রক্ষা করার চেষ্টা হবে। 'সাগরিকা' তো কুলদারঞ্জনের লেখা বলে শুনি নি। দেখি তাঁর অন্য অনুবাদের কি করা যায়। এখন তো অন্য ধারাবাহিক চলেছে, তবে সবগুলিই একে একে শেষ হবে, তখন দেখা যাবে। কন্যান ডয়েলের বইয়ের ইংরিজি মূল সংস্করণ পড় না কেন? আরো বেশি রস পাবে।

(৯) বিচিত্র কুমার গুহ, ১৫৯৭, বয়স ১৩½

একটা ভালো বলিষ্ঠ বিষয় নিয়ে কবিতা লেখ না কেন? ছোটদের এখন-ই নিরাশ করে দিলে, তাদের দিয়ে কি কোনো কাজ হবে? মিল সম্পর্কে আরো সাবধান হয়ো, ভাই।

(১০) সুশান্ত সাহা, ১২৬৯, তোমার বয়স ১৭ পেরিয়ে গেছে ভাই, কাজেই এ সব বিভাগে আর যোগ দেওয়া চলবে না। গ্রাহক কার্ড একবারই দেওয়া হয়, বছরে বছরে পাল্টায় না! পুরানো সংখ্যার দাম, নভেম্বরের সন্দেশে দেখতে পাবে।
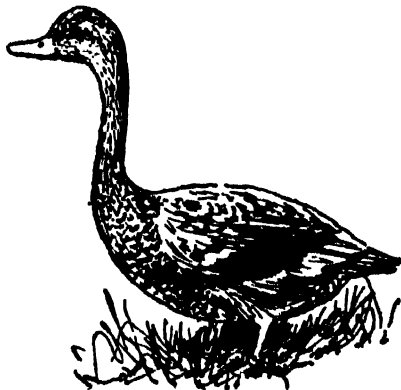
(উত্তর দেবার শেষ দিন ১৫ই জানুয়ারি)

(১)

ল্যাজা মুড়ো দোঁহে মিলে ডাকে আয় আয়।
মুড়ো বাদে চেয়ে দেখি একি হল দায়!
ল্যাজ ফেলে ঝোলে ঝালে ফিরি পাতে পাতে
(মিলিতে পারিনে শুধু কাঁচকলা সাথে)।
নিতে জানি, দিতে কভু নাহি জানি হায়।
পাওনা বুঝিয়া লই কড়ায় কড়ায়!

(১)

এই দালানে লুকিয়ে আছে। এই ত শুধু জানা।
তার অভাবে জানালা নাই। ঘর করেছে কানা।
দেখছ মিছে, খাটের নিচে, চালার পিছে খোঁজ।
‘চালাক লোকের মধ্যে পাবে, সহজ কথা বোঝ।

(৩)

চারটি বন্ধু। শশাঙ্ক শেখর, মৃগাঙ্ক মোহন, গোবিন্দ গোপাল ও কৃতান্ত কিঙ্কর, তাঁদের পদবী হল চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় ও গঙ্গোপাধ্যায় (অবশ্য কার কি পদবী তা জানা নেই)। আর তাঁদের নেশা হল রবিবার দুপুরে যৎসামান্য বাজি ধরে লুডো খেলা।

সেদিন তাঁরা এই ঠিক করে খেলতে বসলেন যে প্রথম খেলাতে যে জিতবে সে বাকি তিনজনের কাছে ১০ পয়সা করে পাবে, দ্বিতীয় খেলার বিজয়ী পাবে ২০ পয়সা হিসাবে, তৃতীয় খেলায় ৩০ এবং চতুর্থ খেলায় ৪০ পয়সা করে।

চারদানে খেলাতে তাঁরা প্রত্যেকে একবার করে জিতলেন, প্রথম খেলায় মৃগাঙ্ক জিতলে, বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয়, গোপাল তৃতীয় এবং চট্টোপাধ্যায় চতুর্থ।

খেলার আগে কৃতান্তের হাতেই ছিল সব চেয়ে বেশি পয়সা। কিন্তু খেলার শেষে দেখা গেল যে গঙ্গোপাধ্যায় মশাইএর পয়সাই সবচেয়ে বেশি।

তোমরা বল দেখি এঁদের মধ্যে কার কি পদবী?

অগ্রহায়ণ মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) ছায়া

(২) চারু ২৫৲, কানাই ১৫৲।

(৩) সরল, অমল, অধর, অমর, অনন্ত, অজয়, কমল, বিমল, বিজয়, বিজন, বিনয়, রজনী, সজনী, নীহার, ধরণী, জনক, কপিল, নয়ন, জয়ন্ত, (সমর)!

উত্তর দাতাদের নাম:—

যাদের সব কয়টি উত্তর ঠিক হয়েছে:—

৪৯ শর্মিষ্ঠা সেন, ৫৭ শাশ্বতী দত্ত, ১০৪ উজ্জয়িনী, সুচরিতা, নবনীতা, সঞ্জয় ও পার্থ ভট্টাচার্য, ১১৫ অর্পিতা কিশলয় ও কিশোর চক্রবর্ত্তী, ১৭৫ অনিতা রায়, ১৯২ অন্তরা ও ফুল্লরা সেন, ২২৮ গোপা বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩২১ অজন্তা ও বন্দিতা ঘোষ, ৩৯৭ ভারতী বসু, ৫১১ প্রতুল, প্রদীপ, প্রণব ও প্রবীর কুণ্ডু, ৬১৬ ভারতী মিত্র ও ৩ চৈতালী সেন, ৮১৬ সুমন্ত্র দাশ, ৮৩৮ সুপ্রতীক বাগচী, ৮৯০ কারুবাকী ও বিপাশা দত্ত, ৯৮৩ জ্যোতির্ময় মজুমদার, ১২০৯ সুপর্ণ চৌধুরী, ১৫৬৭ দেবাশীষ মুখার্জী, ১৬০৩ নিশীথ রঞ্জন, নীতিশরঞ্জন ও সমীর গুহ, ১৬১৫ পথিকৃৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৬১৭ মধুজিৎ রায়, ১৬১৯ রেজাউল কবীর, ১৬৭২ শুভাশীষ গুহ, ১৬৯৩ শ্যামল কুমার পাইন, ১৭০৪ সোনালী চৌধুরী, ১৭৩৫ রঞ্জন রায় ১৭৫০ সন্দীপ মুখোপাধ্যায়, ১৭৭৪ অমৃতা রায়, ১৭৯০ জয়িতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৭৯২ মলয়া পাল, ১৮০৫ দেবাশীষ রক্ষিত, ১৮২৭ অশোক ও অনুতোষ চট্টোপাধ্যায়, ১৮৩৫ সৈয়দ আহসান, জমিল, সৈয়দ হাসমত জালাল, সৈয়দ সুশোভন রফি, ১৮৫৫ সিদ্ধার্থ সেন, ১৮৮৫ রীণা ও হেনা ভট্টাচার্য, ১৮৯৪ সুস্মিতা কাঞ্জিলাল, ১৯২৩ তানিয়া দাশ, ১৯৩৮ লীনা মিত্র ২০৪০ সন্দীপন দেব, ২০৭১ মৈত্রেয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০৭৮ সত্যজিৎ সেনগুপ্ত, ২০৮৭ সুচিত্রকুমার বিশ্বাস, ২১৭৪ শিবরঞ্জনী মাইতি, ২১৮৮ মহুয়া সেনগুপ্ত, ২১৯৪ মনামী ও অনামী রায়, ২২০২ শুভাশিষ ধর, ২২২১ সোমনাথ ঘোষ, ২২২৪ শুভময় ও কল্যাণময় চট্টোপাধ্যায়, ২২২৫ শ্যামাপ্রসাদ দাস, ২২৩৯ অনাভা চট্টোপাধ্যায়, ২২৪৮ দেবকুমার, মিহিরকুমার ও শৈবালকুমার গুহ, ২২৫৭ উদয়ন মুখোপাধ্যায়, ২২৮৭ সঙ্ঘমিত্র চক্রবর্ত্তী, ২২৯৪ সুনন্দন চক্রবর্ত্তী, ২৩৫৮ সংযুক্তা ও অনিন্দ্যশেখর বসু, ২৪১০ ঋত্বিক সান্যাল, ২৫০০ বারীন ও অঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, ২৫৪৪ সান্ত্বনা রায় চৌধুরী, ২৬২১ টুলু ও শুভা বিশ্বাস, ২৬৬৯ চয়ন সান্যাল, ২৬৭৬ শুভেন্দু, সৌমেন্দু ও দীপ্তি গঙ্গোপাধ্যায়, ২৭১০ খুশনুদ গোলাম হাসনায়ন, ৩৭৩৫ উৎপল ভট্টাচার্য, ২৭৬১ ঋতা, মিতা ও ইন্দ্রাণী সেনগুপ্ত,

২৮৩৭ অর্পিতা রায় চৌধুরী, ২৮৫০ শ্যামলা চক্রবর্তী, চিরাইল নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ, পশ্চিম দিনাজপুর।

যাদের দুটি উত্তর ঠিক হয়েছে :—

২২৬ জয়ন্ত ও প্রবালকুমার নন্দী, ৮০৩ বুদ্ধদেব ও পারমিতা নিওগী, ৪৪৮ অঞ্জনা, নূপুর ও মিলনকুমার, ৮৯৮ হিমাদ্রি ও দোলনচাঁপা চৌধুরী, ১০৩৮ কাবেরী মণ্ডল, ১২৯৮ রুদ্রনাথ ঘোষ দস্তিদার, ১৩১০ আশিষ রহমান, ১৪৪৫ পার্থপ্রতিম গুপ্ত, ১৪৬০ কেয়া বসু, ১৫৪২ শুভা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৫৪৫ অরুণ প্রকাশ ভট্টাচার্য, ১৮০৮ রজতশুভ্র মিত্র, ১৮৪০ অনুরাধা ও অদিতি ঘোষ, ১৮৬৭ সোনালী লাহিড়ী, ১৯৭১ মৃণালকান্তি মণ্ডল, ২০২৯ শুভ্রা বিশ্বাস, ৩০৫৭ কমলেশ সরকার, ২০৮২ শুভাশিষ ঘোষ, ২০৮৬ জয়শ্রী, স্বাগতা ও অরূপকুমার তরাত, ২০৯৭ প্রসূন রায়, ২১১৬ গৌতমকুমার বেরা, ২১২৭ অভ্রীশ চৌধুরী, ২১৪২ স্বর্ণাভ ব্যানার্জী, ২১৫৯ স্বাহা ও শুভঙ্কর বাগচী, ২১৭০ অম্লান ভট্টাচার্য, ২১৯৬ মিঠু কুকাই ও বিলু ঘোষ, ২২৭০ অরুন্ধতী ও ব্রততী সেন, ২৩৬১ অঞ্জন ভট্টাচার্য্য ২৭৪০ সোনালী বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮২৮ অস্মিতা সেনগুপ্ত।

যাদের একটি উত্তর ঠিক হয়েছে ঃ—

২০৪৭ অনিতা ও তনুশ্রী বসাক, ২০৬৬ মিলিন্দ চক্রবর্তী, ২১৭৫ বাণী সরকার, ২১৮৫ অমিতেন্দু দেবরায়, একটি নাম নম্বরহীন গ্রাহক।

তোমরা অনেকে নালিশ জানিয়েছ যে গতমাসে ধাঁধার উত্তর ঠিক পাঠান সত্ত্বেও নাম বেরোয় নি। কিন্তু, আমাদের হাতে ঠিক সময়ে উত্তর পৌঁছালে অবশ্যই নাম বের করব। (এমন কি একদিন দুদিন দেরীতে উত্তর পৌঁছলেও তাদের নামটা যোগ করে দিতে চেষ্টা করি)। তবে কখনও কখনও তোমাদের উত্তর অনেক দেরীতে আসে, তখন নাম ছাপা যায় না, আর ডাকে যদি হারায় তাহলে তো জানতেই পারি না।
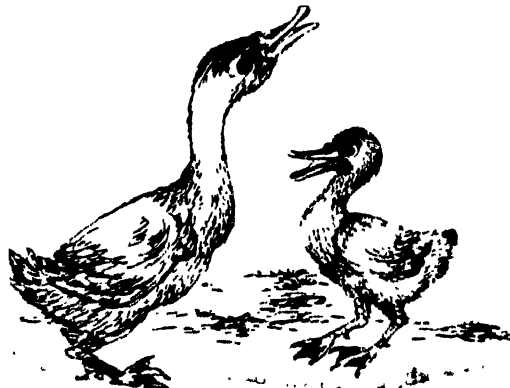
মজার ছড়া

উত্তমকুমার বটব্যাল

গ্রাহক নং—১৪৮১ বয়স—১১ বৎসর ৬ মাস

Book বই Curd দই
Lamp মানে বাতি,
Clock ঘড়ি Chalk খড়ি
Night মানে রাতি।
Sugar চিনি Buy কিনি
Soap মানে সাবান,
Ass গাধা White সাদা
Flood মানে বান
Pan কড়াই Sparrow চড়াই
News মানে খবর,
King রাজা Punish সাজা
Grave হল কবর।
Pain ব্যথা Speech কথা
Tree মানে গাছ,
Pot পাত্র Only মাত্র
Dance মানে নাচ।
Rain বৃষ্টি Creation সৃষ্টি
Hair মানে কেশ,
Lock তালা Garland মালা
End হল শেষ।

খরগোশ ছানা

পরন্তপ গুহ ঠাকুরতা

গ্রাঃ নং ১২৮৯ বয়স ১০ বছর

আমরা একদিন দীঘায় গিয়েছিলাম। সেখানে একজন লোক আমাদের ছোট একটি খরগোশের বাচ্চা দিয়েছিল।

খরগোশটাকে আমারা গাড়ি করে বাড়িতে এনেছিলাম। সে ভয়ে চুপ করে গাড়িতে বসে ছিল খরগোশটার রং কিন্তু সাদা না খয়েরী, কারণ ওটা বুনো খরগোশ।

বাড়িতে আসার পর আমারা খরগোশের নাম দিলাম 'কোকো', আর বানালাম তার জন্য একটা বড় কাঠের ঘর। আমি তাকে রোজ সকালে আর সন্ধ্যাবেলা দুধ রুটি মুখ হাঁ করে খাইয়ে দিতাম।

খরগোশটা এখন বড় হয়েছে তাই ধরলে আঁচড়ে দেয় বা কামড়ে দেয়। সে এখন ভাত, ডাল রুটি, গাজর আর অন্যান্য জিনিস খায়।

ভগবানের উপহার

দেবাশিষ মুখার্জী—গ্রাহক নং ১৫৬৭ বয়স ১১২

অনুকূল এবং প্রবীর দুজনেই পায়রা পুষতো। অনুকূলের পায়রাগুলি অতি সুন্দর দেখতে ছিল। তাদের পাখাগুলি অপরূপ সৌন্দর্যের পরিচয় দিত। কিন্তু প্রবীরের পায়রাগুলি অতি সাধারণ ছিল।

একদিন প্রবীর সকালে উঠে দেখলে যে অনুকূলের দুইটি পায়রা তার পায়রার সঙ্গে মিশে গেছে। প্রবীর খুব ভাল ছেলে ছিল। সে তখন, নিজের কাছে পরের পায়রা রেখে না দিয়ে, অর্থাৎ পায়রাগুলি নিজে হস্তগত করার কোন অভিসন্ধি না দেখিয়ে, অনুকূলকে তার পায়রাগুলি ফেরত দিয়ে দিল। অনুকূল প্রবীরের সৎ কার্য দেখে বিস্মিত হল। তার পরের দিনই, গভীর রাত্রে, সে তার পায়রার দুটি ডিম, প্রবীরের পায়রার খাঁচায় রেখে দিলে। ডিমগুলি থেকে যখন ছানা বের হোল তখন প্রবীর দেখলে, তার মধ্যে অনুকূলের পায়রার মতো দেখতে দুটি পায়রা। তখনই সে ছুটে গিয়ে অনুকূলকে বললে,—দেখ, দেখ, অনু, আমার পায়রার ডিম থেকে দুটি পায়রা বেরিয়েছে, যা ঠিক তোর পায়রার মত দেখতে। আশ্চর্য ব্যাপার সত্যি,—নারে?

সেদিন অনুকূল হেসে জবাব দিয়েছিল,

—নারে, ভগবান তোকে তোর সৎ কার্যের উপহার দিয়েছেন মাত্র। তোর কি মনে হয়?

রেঁনেসার বিখ্যাত ভাস্কর চিত্রকর

তোতন চৌধুরী—গ্রাহক সংখ্যা ১৭৯৭ বয়স ১২ বছর

ইউরোপের ইতিহাসে ইটালীর রেঁনেসার যুগের বিখ্যাত ভাস্কর ও শিল্পী মাইকেল এঞ্জেলোর কথা অনেকেই জানে। তিনি ১৪৭৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম মাইকেল এঞ্জেলো বুয়োনোরোত্তি। তিনি ফ্লোরেন্সের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতার ইচ্ছা ছিল না যে তিনি শিল্পী হন। মাইকেল এঞ্জেলো লুকিয়ে ছবি আঁকা সুরু করেন ও পরে এই নিয়ে তাঁর পিতার সঙ্গে তাঁর গোলমাল হয়। অবশ্য তাঁর পিতা পরে রাজি হয়ে তৎকালীন শিল্পী গিরল্যান্দিয়োর ষ্টুডিওতে শিক্ষানবীশ হিসেবে কাজ করতে অনুমতি দেন। ফ্লোরেন্সের বিখ্যাত মেডিসি পরিবারেও তিনি কিছুদিন কাজ করেন।

মাইকেল এঞ্জেলো কিন্তু ছবি আঁকার চেয়ে পাথরের মূর্তি গড়তেই বেশি ভালবাসতেন। তাঁর ছবির সংখ্যা খুবই অল্প। তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ও উল্লেখযোগ্য হলো রোমের ভাটিকান প্রাসাদের সিস্টিনের ছাদে আঁকা ছবি। পাপরা ভাটিকানে বাস করেন। পোপ জুলিয়াস তাঁকে দিয়ে জোর করে আঁকান। এতে আছে সৃষ্টি, নোয়ার নৌকো, তাছাড়া সব অবতারদের ছবি যাঁরা যীশুখ্রীষ্টের

আগমনের ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। তাঁর এই কাজটি শেষ করতে প্রায় সাড়ে চার বছর সময় লেগেছিল প্রথমে তিনি সহকারীদের সাহায্য নিতেন। কিন্তু পরে তাদের কাজে বিরক্ত হয়ে একাই শেষ করেন সিস্টীনের ছাতে ভারা বেঁধে তার ওপর শুয়ে ছবি আঁকতেন। তিনি অনেক মূর্তি গড়েছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো ডেভিড, পিয়েটা ম্যাডোনা ইত্যাদি।

এই বিখ্যাত ও ভাস্কর ও শিল্পী রোমে ১৫৬৪ সালে ৯০ বৎসর বয়সে প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

বুদ্ধির বল

সুব্রত ঘটক—বয়স বারো বছর—গ্রাঃ সং ২ ২৮

খলীফা ওমরের আদালতে আজ ভয়ানক ভিড়। হোরমজান নামে এক ভদ্রলোকের বিচার হইবে। অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর, কি হয় বলা যায় না।

হোরমজানকে অনেকেই চেনে—বেশ পদস্থ লোক তিনি, তাহার উপর চালাক বলিয়াও তাঁর বেশ নামডাক আছে। কাজেই ব্যাপার দেখিবার জন্য দলে দলে লোক আসিয়া আদালত-গৃহ ঘিরিয়া ফেলিল।

সিংহাসনের ওপর ওমর বসিয়া আছেন, সিপাই-শাস্ত্রী আদেশ পালনের জন্য ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—ধীরে ধীরে হাতে পায়ে শিকল বাঁধা হোরমজানকে আনিয়া আসামীর মঞ্চে দাঁড় করান হইল।

তারপর বিচার আরম্ভ হইল। হোরমজান সত্যসত্যই দোষী। খলীফা তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলিতে হুকুম দিলেন। বন্দী হোরমজানকে বধ্যভূমিতে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করা হইল 'মরিবার আগে তোমার কিছু সাধ আছে কি?'

বেচারা হোরমজান! এখনই তাঁকে এই সুন্দর পৃথিবী হইতে বিদায় লইতে হইবে—ভয়ে তাঁর গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে—একটি কথা বলিবার সাধ্য নাই। তিনি শুধু অস্ফুট স্বরে বলিলেন, 'একটু জল।'

ওমরের আদেশে তখনই একটা পাত্রে করিয়া খানিকটা খাবার জল আনিয়া হোরমজানকে দেওয়া হইল। কিন্তু তিনি খাইবেন কি। ভয়ে তাঁহার হাত কাঁপিতেছে—যতবারই হাতটি মুখের কাছে আনিতেছেন ততবারই তাহা মুখ হইতে সরিয়া যাইতেছে।

ব্যাপার দেখিয়া ওমরের বড় মায়া হইল। তিনি বলিলেন 'আচ্ছা তুমি নিশ্চিন্তে জল খাও; আমি কথা দিচ্ছি যে, তোমার ঐ জলটুকু খাওয়া না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে মারা হবে না।'

খলীফার কথা শেষ হইতে না হইতেই সবাই দেখে হোরমজানের মুখ আনন্দে ভরিয়া গিয়াছে। এতক্ষণে তিনি স্পষ্টভাবে কথা বলিতে পারিলেন, বলিলেন, 'হুজুর যখন কথা দিয়েছেন তখন নিশ্চয়ই তার আর নড়-চড় হবে না; তিনি বলেছেন এ জলটুকু খাওয়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমাক মারা হবে না। তবে এ জল আমি খাব-ই না।' বলিতে বলিতে তিনি পাত্রটি মাটিতে উপুড় করিয়া দিলেন এবং নিমেষ মধ্যে সমস্ত জল মাটিতে মিশিয়া গেল।

ওমর বুঝিলেন হোরমজান দোষই করুন আর যাহাই করুন বুদ্ধিতে তাঁর সঙ্গে আঁটা ভার। তাঁর রাজ্যে এ রকম লোকের দরকার আছে। সেবারের মত হোরমজান মুক্তি পাইলেন।*

মাছ খোরেদের আজব আড্ডা

সত্যশ্রী উকিল—গ্রাহক সংখ্যা ২১৬২ বয়স—১১ বছর ৮ মাস

সন্দেশ পেয়ে হাত পাকানোর আসর পড়ে আমারও মনে হল আমি কিছু লিখি। তাই আমি আজ আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের আইদাহো রাজ্যে মজার খবর বলছি।

আমি দিদা ও মার মুখে শুনেছি যে আইদাহো রাজ্যের রাজধানী 'বয়সী' (Boise) সহরে এমন একটি রেস্টোরেন্ট আছে যেখানে খালি জলজ প্রাণীই খেতে পাওয়া যায়। এই রেস্টোরেন্টটির নাম Dixon's, famous for sea foods. এখানে নানরকম সামুদ্রিক মাছ, হ্রদের মাছ, কাঁকড়া, চিংড়ি, গেঁড়ি, গুগলি, শামুক, ঝিনুক প্রভৃতি খেতে পাওয়া যায়। আলু ছাড়া অন্য কোনও সব্জি পাওয়া যায় না। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্য আর দূরের ও কাছের সমুদ্রতীরের অঞ্চল থেকে এই সব সুলভ ও দুর্লভ সামুদ্রিক প্রাণী রোজ চালান আসে। আলাস্কা থেকে আসে কালো কড্ মাছ যা আলাস্কার ভালুকেরা
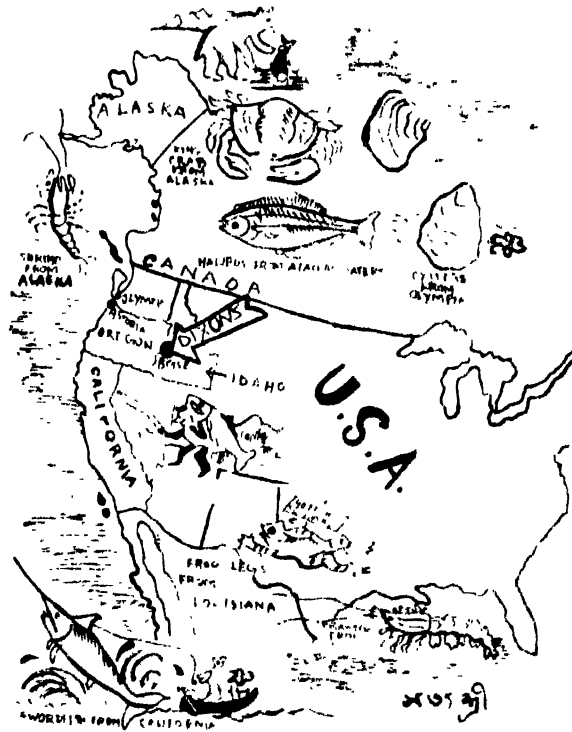
বরফের নিচ থেকে তুলে তুলে খায়। প্রকাণ্ড 'প্রণ' বা গলদা চিংড়ি আসে দক্ষিণের রাজ্য লুইসিয়ানা থেকে। ছোট ছোট 'শ্রিম্প্' বা-বাগদাচিংড়ি আসে আলাস্কা থেকে, করাত মাছ আসে ক্যালিফোর্নিয়া

* আরব দেশের গল্প।

থেকে। ডুবুরিরা তুলে আনে পাথরের গায়ে আটকানো গেঁড়ি, গুগলি আর ঝিনুক। রেস্টোরেন্টে ঢুকলেই মনে হয় জলের নিচের রাজ্যে এসে গেলাম। সবুজে নীল আলো জ্বলছে। ফায়ার প্লেসে

নীলাভ আগুন। কিন্তু আলোর বালব্ যে কোথায় দেখা যায় না পর্দায় পর্দায় বড় বড় মাছের ছবি। শো-কেসে মাছ ধরার জাল টাঙানো তার গায়ে আটকে আছে শামুক, ঝিনুক, ইত্যাদি। নীল দেওয়ালেও মাছ টাঙানো। মনে হয় সব জ্যান্ত। সেই মাছ দেখে প্রাণী দেখে অর্ডার দিলেই রান্না করা গরম গরম মাছ এসে হাজির হবে টেবিলের উপর। এইসব নানান জাতের মাছ ও জলজ প্রাণী খাবার লোভে সারা আমেরিকা থেকে লোকেরা এখানে আসেন। এখানে মেক্সিকোর সামুদ্রিক ব্যাংএর ঠ্যাংও খেতে পাওয়া যায়। ভেতরে এত যে কাণ্ড-কারখানা বাইরে থেকে দেখে তা বোঝা—যায় না। ছোট্ট কাঠের কটেজের মত বাড়ি একখানা। ১৩০১ নং বুলেভার্ডের উপর। দাদু, দিদা ও মাকে তাঁদের আমেরিকান বন্ধুরা যখন নিয়ে গিয়েছিলেন তখন তাঁরা বুঝতেই পারেন নি যে কটেজের ভিতরের এমন একটা রাজত্ব আছে।

আমি এসব কোথা থেকে জানলাম জানো? দিদা ঐ Dixon'sএর একটা মজার ছবি ছাপা সার্ভিয়েট অর্থাৎ ন্যাপকিন বা ঝাড়ন, এনেছিলেন। তার থেকে ছবি দেখে দেখে আমি গল্পটা শুনলাম। আর কয়েকটা ছবি আসরের জন্য পাঠাচ্ছি। যদিও আমি বেশি মাছ খাইনা তবু ইচ্ছা আছে বড় হয়ে একবার ঐ হোটেলে খেতে যাব।

'মজার ধাঁধা'

অঞ্জন ভট্টাচার্য—গ্রাহক নং ২৩৬১ বয়স ১২

ভাই সন্দেশের গ্রাহক-গ্রাহিকারা, বাবার কাছে গতকাল না একটা খুব মজার ধাঁধা শুনলাম। ধাঁধাটা হ'ল—'বল দিয়ে খেলা হয়, এ'রকম এক ডজন খেলার নাম কর।' আমি অনেক চেষ্টা করে উত্তর দিতে পেরেছিলাম। তোমরা বল তো এ'রকম এক ডজন খেলার নাম!
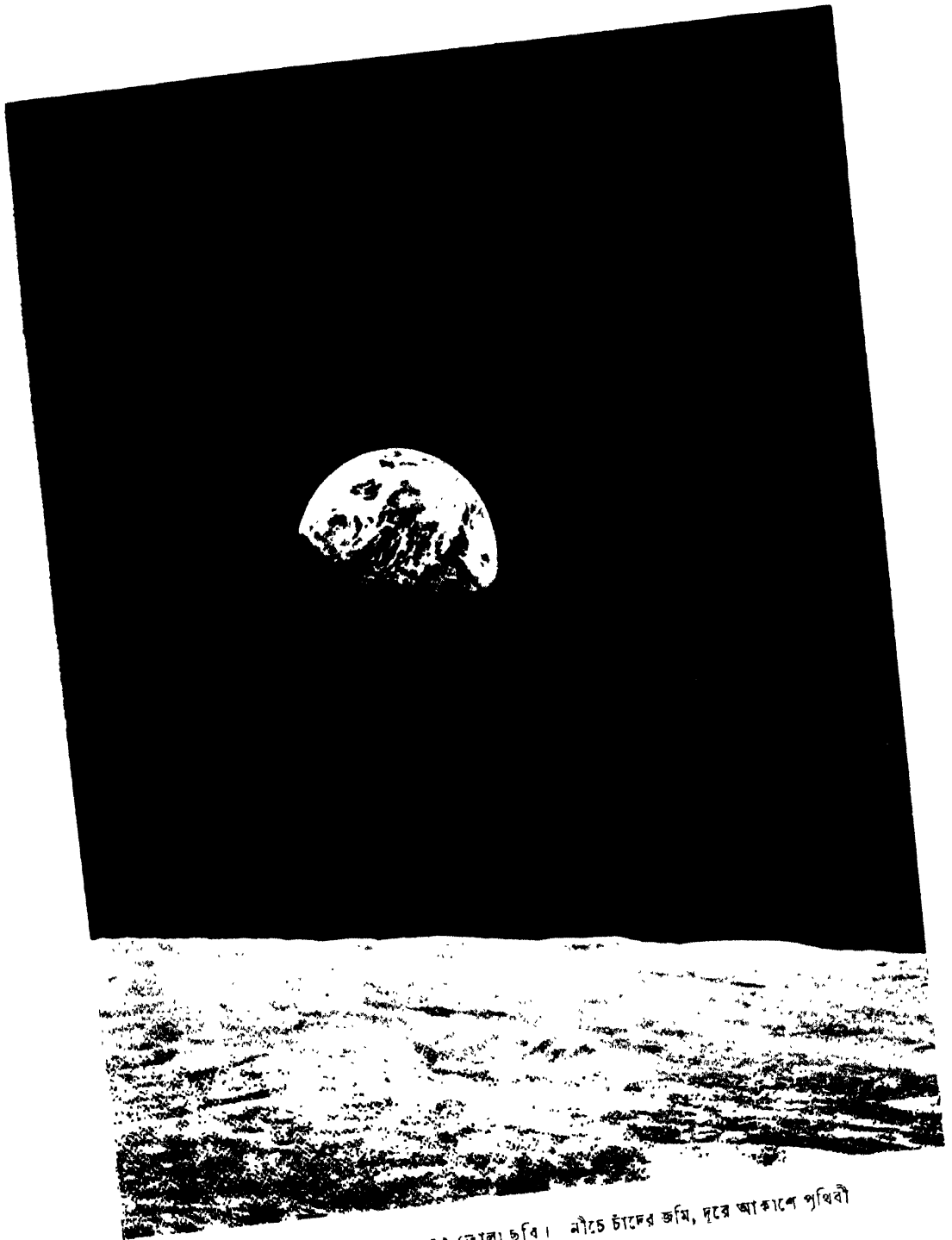
অ্যাপোলো-৮ এর জানালা থেকে তোলা ছবি। নীচে চাঁদের জমি, দূরে আকাশে পৃথিবী

অষ্টম বর্ষ—দশম সংখ্যা   মাঘ ১৩৭৫/ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯

প্রগতি

সুখলতা রাও

বয়স বাড়ে   বয়স বাড়ে,
ছোট্ট শিশু বয়সে বাড়ে,
হাসির সাথে   কথার সাথে
চরণপাতে চলার সাথে
মাটির পরে।

বয়স বাড়ে   আনে তাহারে
কৈশোরেরি তোরণ দ্বারে ;
চেতনা জাগে   প্রেরণা লাগে,
নূতন আলো আঁখির আগে
মুগ্ধ করে।

জ্ঞানের পথে   কর্ম পথে,
উদ্যমেরি ক্ষিপ্র রথে,
অগ্রসরি   যায় সে ত্বরি,
বিঘ্ন বাধা তুচ্ছ করি
নাহিকো ডরে।

তবুও তৃপ্ত   নয় ত চিত্ত,
পরাণ যে চায় পরম বিত্ত !
খুঁজিয়া চলে   ধরণীতলে,
সে ধন হৃদি-পদ্মদলে
লবে সে ভরে।

(সমুদ্রের তলদেশ সম্বন্ধে জানবার জন্য স্ট্র্যাটফোর্ড জাহাজ সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল, তারপরে আর ফিরে আসেনি। এই অভিযানের নেতা ছিলেন মহাপণ্ডিত ডঃ ম্যারাকট ও জাহাজের অধিনায়ক ক্যাপটেন হাওসি। সঙ্গে ছিলেন বিখ্যাত প্রাণিবিদ মিঃ সাইরাস হেডলি, ইঞ্জিনিয়ার বিল স্ক্যানল্যান ও আরো ২৩ জন।

স্ট্র্যাটফোর্ড জাহাজের কি হল, সে সম্বন্ধে মোট চারটি দলিল পাওয়া গেছে :—(১) জাহাজ থেকে বন্ধু স্যর জেমস্ ট্যালবটকে লেখা হেডলির চিঠি (২) এক অদ্ভুত বেতারবার্তা (৩) এক আশ্চর্য কাঁচের গোলা এবং (৪) সেই গোলার মধ্যে পাওয়া এক অবিশ্বাস্য বিবরণ।

হেডলির চিঠিতে জানা যায় যে একটি বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে আটলান্টিক মহাসমুদ্রের তলদেশে নেমে অনুসন্ধান চালানই হল ম্যারাকটের উদ্দেশ্য। তাঁর জ্বলন্ত উৎসাহ প্রায় পাগলামীর সীমায় পৌঁছেছে। চিঠির শেষে হেডলি লিখেছেন—'হয় এই আমার শেষ চিঠি, নয় তো আবার যদি আমার চিঠি পাও, সে একখানা পড়বার মতন চিঠি হবে বটে!')

দুই

এই বিষয়ে দ্বিতীয় দলিল হল সেই অদ্ভুত বেতার-বার্তা। যে-সব জাহাজের গ্রাহক-যন্ত্রে তা ধরা পড়ে তার মধ্যে ডাক-জাহাজ 'আরোইয়া' একটি। গত বৎসর ৩রা অক্টোবর তারিখে বেলা তিনটার সময় সেই জাহাজে এই বার্তা গৃহীত হয়। অর্থাৎ হেডলির পত্র অনুসারে যেদিন 'স্ট্র্যাটফোর্ড' গ্র্যাণ্ড ক্যানারি ছাড়ে তার মাত্র দুই দিন পরেই বার্তাটি আসে। প্রায় সেই সময়েই সেই নরওয়ের পালের

জাহাজ গ্র্যাণ্ড ক্যানারির প্রায় দুই শো মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে একখানি স্টিমের জাহাজকে প্রবল ঝড়ে বানচাল হতে দেখে। বার্তাটি এই :

'ঝড়ে জাহাজ কাত। হয়ত আর আশা নেই। ম্যারাকট হেডলি স্ক্যানল্যান আগেই গেছেন। ব্যাপার অবোধ্য। ওলনতারের আগায় হেডলির রুমাল। ঈশ্বর ভরসা।

'এস্ এস্ স্ট্র্যাটফোর্ড'

কতকটা রোগীর প্রলাপের মত স্ট্র্যাটফোর্ড'-এর এই শেষ বার্তার মধ্যে একটা জায়গা আবার এতই অদ্ভুত যে সেটা অপারেটরের মাথার দোষ বলেই ধরে নেওয়া হয়েছিল। যাই হোক্, জাহাজটি যে ডুবে গিয়েছে সে সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে নি।

তৃতীয় দলিল 'আরাবেলা নোউল্‌স্' নামক জাহাজের লগ্-বুকের কিয়দংশ। তার কথা খবর-কাগজেও প্রকাশ পেয়েছে। তার ক্যাপটেন ছিলেন এমস্ গ্রীন। জাহাজটি কার্ডিফ থেকে কয়লা নিয়ে বুয়েনোস-এয়ারিসে যাচ্ছিল। তার লগ-বুকে এই বৎসরের ৫ই জানুয়ারি তারিখে অর্থাৎ 'স্ট্র্যাট-ফোর্ড' ডুববার তিন মাস পরে যা লেখা হয়েছিল নিচে অবিকল উদ্ধৃত করলাম :—

'বুধবার, ৫ই জানুয়ারি। অক্ষাংশ ২৭°১৪' উত্তর, দ্রাঘিমা ১৮° পশ্চিম। শান্ত সমুদ্র। নীল আকাশ, পেঁজা তুলোর মত মেঘের সারি। সমুদ্রের চেহারা যেন কাঁচের মত। মাঝ চৌকির দুটি ঘণ্টা পড়তে ফার্ষ্ট অফিসার খবর দেন যে তিনি দেখেছেন একটা উজ্জ্বল জিনিস সমুদ্র থেকে অনেক উঁচুতে লাফিয়ে উঠে আবার পড়ে গেল। প্রথমটা তিনি ভাবেন যে সেটা কোনও অদ্ভুত জাতের মাছ, কিন্তু দূরবীন দিয়ে দেখতে পান সেটি একটি রূপোর মত ঝক্‌ঝকে গোল জিনিস। আর এত হালকা যে সেটা জলে ভাসছিল না বলে, জলের উপর রাখা ছিল বলাই ঠিক। আমি দেখলাম সেটা একটা ফুটবলের মত বড় জাহাজের ডাইনে স্টারবোর্ডের দিকে প্রায় আধ মাইল দূরে জলের উপর ঝক্‌ঝক করছে। আমি এন্‌জিন বন্ধ করে সেকেণ্ড মেট-এর হেফাজতে কোআর্টার বোটটা পাঠালাম জিনিসটা নিয়ে আসতে। সেকেণ্ড মেট গিয়ে সেটি তুলে জাহাজে নিয়ে এল।

দেখা গেল জিনিসটা শক্ত কাঁচের তৈরি একটা গোলা, এমন কোনও হালকা গ্যাসে ভরা যে উপরের দিকে ছুঁড়ে ফেললে ছেলেদের বেলুনের মত শূন্যে দুলতে দুলতে নামে। সেটি প্রায় স্বচ্ছ, ভিতরে কাগজের মত কি যেন গুটানো রয়েছে দেখা গেল। সেটা বার করবার জন্য গোলাটা ভাঙতে গিয়ে দেখা গেল সেটা অসম্ভব শক্ত। হাতুড়ি দিয়ে ভাঙা গেল না, শেষে মুখ্য এন্‌জিনিয়র যখন এনজিনের ঘুরন্ত ফ্লাই হুইলের গায়ে লাগিয়ে সেটাকে কম-জোর করে' দিলেন তখন সেটাকে ভাঙা গেল! কিন্তু বড় দুঃখের কথা যে ভাঙা মাত্রই সেটা গুঁড়িয়ে একেবারে ধুলো হয়ে গেল। প্রত্যেকটি গুঁড়ো আলো পড়ে' জ্বল জ্বল করতে লাগল, কিন্তু পরীক্ষা করে দেখবার মত মাপসই রকমের টুকরা পাওয়া গেলনা। কাগজটা অবশ্য আমরা পেলাম। সেটা পড়ে' তার অসাধারণ গুরুত্ব উপলব্ধি করলাম। স্থির হল লা প্লাটায় পৌঁছেই সেটা সেখানকার ব্রিটিশ কনসালের হাতে দিয়ে দেওয়া হবে। আমার জীবনের পঁয়ত্রিশটি বছর সমুদ্রে কেটেছে, কিন্তু এমন অদ্ভুত ব্যাপার কখনও দেখিনি। জাহাজের

সকলেই তাই বলছে। এ সবের সত্যিকার তাৎপর্য আমার চেয়ে বিজ্ঞতর ব্যক্তিরা স্থির করবেন।'

বাকী রইল এই কাঁচের গোলার ভিতরে পাওয়া সেই অত্যাশ্চর্য বিবরণ আমাদের চতুর্থ এবং শেষ দলিল। এরও লেখক মিঃ সাইরাস্ জে হেডলি। নিচে তা যথাযথ উদ্ধৃত হল :—'আমি কাকে উদ্দেশ করে' লিখছি? বলা যেতে পারে গোটা পৃথিবীর লোককে। কিন্তু সেটা একটা নিতান্তই বেঠিক ঠিকানা, কাজেই আমি আমার বন্ধু অক্স্‌ফোর্ড ইউনিভার্সিটির সার্ জেম্‌স ট্যালবট্‌কে উদ্দেশ করে' লিখব। শেষ যে চিঠি লিখেছিলাম সেখানিও তাঁকেই লেখা। এই লেখাটি সেই চিঠিরই জের বলে' ধরে' নেওয়া যেতে পারবে! এই গোলাটি যদি কোন হাঙ্গরের পেটে না গিয়ে দিনের আলোর মুখ দেখতেও পায় তবু আমার ধারণা এটা কারও চোখে পড়বার সম্ভাবনা একশয় মাত্র এক। হয়ত চিরদিন এটা কেবল সমুদ্রের ঢেউয়ে ভাসতে থাকবে, কতবার কত জাহাজ এর পাশ দিয়েই চলে' যাবে, তবু এটা কারও চোখে পড়বে না। কিন্তু তবু এ চেষ্টাটা একবার করে' দেখবার মত বই কি। ম্যারাকট্ এই রকম আর একটি গোলা ছাড়ছেন, কাজেই কোন মতে এই অত্যদ্ভুত কাহিনী পৃথিবীর লোকের কাছে গিয়ে পৌঁছাতেও পারে। তারা এ কাহিনী বিশ্বাস করবে কিনা সেকথা অবশ্য আলাদা। কিন্তু যখন সবলে কাঁচের মত জিনিসে তৈরি অথচ আশ্চর্য রকম শক্ত এই গোলাটি দেখবে আর তার ভিতরে হাইড্রোজেন গ্যাস পোরা রয়েছে দেখবে, তখন তারা বুঝবে ব্যাপারটা সাধারণ থেকে একটু আলাদা। আর যে যাই করুক, ট্যালবট, তুমি নিশ্চয় এটা না পড়ে ফেলে দেবেনা।

'যদি ব্যাপারটার গোড়াকার কথা কেউ জানতে চান তবে গত বছরের ১লা অক্‌টোবর তারিখে গ্র্যাণ্ড ক্যানারি ছাড়বার আগের রাত্রিতে তোমায় লেখা আমার চিঠিতে সমস্ত খবর পাবেন। আমাদের কপালে কি আছে তা যদি তখন জানতাম তাহলে হয়ত একটা খেয়া নৌকায় চেপে রাতারাতি জাহাজ থেকে সরে' পড়তাম। কিংবা হয়ত—না; আর একবার ভাবতে গেলে মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত থেকেই যেতাম সব জেনে শুনেও।

'হ্যাঁ, গ্র্যাণ্ড্ ক্যানারি ছাড়ার দিন থেকে সুরু করে' যা যা ঘটেছে তাই বলব।

'জাহাজ বন্দর থেকে বেরিয়ে আসা মাত্রই বৃদ্ধ ম্যারাকট্ উৎসাহে উত্তেজনায় যেন জ্বলে উঠলেন। এতদিন যিনি কেবল চিন্তা করে' এসেছেন সেই মনীষীর জীবনে অবশেষে এসেছে কর্মের শুভক্ষণ। সেই উসকো খুসকো চুলওয়ালা অন্যমনস্ক পণ্ডিত কোথায় গেলেন? তাঁর জায়গায় হঠাৎ দেখা গেল যেন মানুষরূপী একটা বৈদ্যুতিক যন্ত্র! কোথায় ছিল এই অফুরন্ত কর্মশক্তি? কোথায় ছিল ভিতরের এই প্রচণ্ড ক্ষমতা? চশমার ভিতর দিয়ে তাঁর চোখদুটি যেন লণ্ঠনের ভিতর আগুনের শিখার মত জ্বলছিল। সত্যি সত্যিই যেন তিনি একাই একশ হয়ে সর্বঘটে বিদ্যমান হলেন। এই এখানে চার্ট ধরে' দূরত্ব হিসাব করছেন তো ঐ ওখানে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে নিজের হিসাব মিলিয়ে দেখছেন, কিম্বা স্ক্যান্‌ল্যান্‌কে নানান কাজে ধাওয়া করিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন তো আমাকে একশটা খুচরো কাজে লাগাচ্ছেন। কিন্তু এত সব ব্যাপারের মধ্যে কোথাও কোনো এলোমেলো ভাব নেই, সবকিছুর মধ্যে একটা শৃঙ্খলা রয়েছে। তড়িৎ ও যন্ত্র সম্বন্ধে হঠাৎ তাঁর এত জ্ঞান দেখলাম যে অবাক্ হয়ে ভাবতে লাগলাম এসব কি

তিনি আগের থেকেই জানতেন না এখনই শিখে নিলেন! তাঁর তদারকে স্ক্যানল্যান্ এবার সেই সব কল কায়দার বিভিন্ন অংশগুলি জুড়তে সুরু করল।

দ্বিতীয় দিন সকালে স্ক্যানল্যান বললে, 'এই ধরুন গিয়ে মিঃ হেডলে, একেবারে খাসা হয়েছে, একবারটি ভিতরে এসে এক নজর চেয়ে দেখুন। 'ডক্' আমাদের ওস্তাদ লোক, একেবারে একখানি চোস্ত মেকানিক।'

আমার মনে হল যেন নিজের কফিনের দিকে চেয়ে দেখছি! তবে একটি মন্দির হিসাবেও এটা উপযুক্ত বটে। মেঝেটা চার দিকের চারটি দেয়ালের সঙ্গে ক্ল্যাম্প দিয়ে আঁটা আর পোর্টহোলের জায়গাগুলি দেয়ালের মাঝখানে বসানো। ছাদের গায়ে একটা স্প্রিং-এর দরজা লাগানো, সেইখান দিয়ে ভিতরে ঢুকতে হয়। মেঝেতেও সেই রকম একটি দরজা। খাঁচাখানি আগাগোড়া ইস্পাতের, আর সেটা ইস্পাতের তারের তৈরী কাছিতে ঝোলানো। কাছিটা সরু হলেও খুবই শক্ত, একটা প্রকাণ্ড লাটাইয়ে সেটা জড়ানো রয়েছে। গভীর সমুদ্রে ট্রলিং করবার সময় যে জোরালো ইন্‌জিন্ ব্যবহার করা হত তারই জোরে খাঁচাটা ওঠানো নামানোর ব্যবস্থা হয়েছে। শুনলাম কাছিটা আধ মাইল লম্বা, তার ঢিলে অংশটুকু ডেকের উপরকার খোঁটায় জড়ানো। বাতাস যাবার নলগুলিও ততটাই লম্বা, তার সঙ্গে টেলিফোনের তার আর খাঁচার ভিতরে আলো জ্বালবার তার এক সঙ্গে রয়েছে। অবশ্য আলোর জন্য খাঁচার নিজের আলাদা ব্যবস্থাও ছিল।

'সেই দিন বিকালে জাহাজের ইন্‌জিন্ বন্ধ করে দেওয়া হল। ব্যারোমিটার নেমে গিয়েছিল, সেই দিক্‌চক্রের উপর ঘনিয়ে ওঠা কালো মেঘে অনর্থের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। নরওয়ের নিশান ওড়ানো একখানি পালের জাহাজ ছাড়া আর কোনও জাহাজ কোনও দিকে দেখা যাচ্ছিল না। তার পালগুলি নোটানো বুঝলাম ঝড়ের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। তবে সেই সময়টাতে অবশ্য সব ভালই ছিল। গাঢ় নীল সমুদ্র বাণিজ্য-বায়ুর ছোঁয়া লেগে যেন কুঁচকে উঠছিল শাদা ফেনার মুকুট পরা ঢেউয়ে, তার উপরে 'স্ট্র্যাট্‌ফোর্ড' আস্তে আস্তে দুলছিল। কিন্তু স্ক্যানল্যান্ পরীক্ষাগারে ঢুকল উত্তেজিতভাবে। তার স্বভাবসহজ ভাবের মধ্যে তেমন উত্তেজনা কখনও দেখিনি।

'বললে, 'এই ধরুন গিয়ে মিঃ হেড্‌লে, সেই আজব কারখানাটিকে তো জাহাজের তলাকার একটা কুয়োর মত গর্তের ভিতর নামানো হয়েছে। কর্তা কি তাতে করে' ডুব মারছেন নাকি?'

'আলবৎ বিল, আর আমিও তাঁর সঙ্গে ডুব মারছি!'

'বটে, বটে? আপনাদের দুজনেরই মাথা বিলকুল খারাপ তাতে ভুল নেই, কিন্তু আপনাদের একা চলে যেতে দেব সে চিজ্ আমি নই।'

'আরে তোমার তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কি আছে?'

'আছে কিছু। আপনারা একলা গেলে হিংসেয় আমি চীনেম্যানের মত হলদে হয়ে যাব। মেরিব্যাঙ্ক কোম্পানী আমায় পাঠিয়েছে ঐ সব কলকব্জা দেখা শোনা করবার জন্য, সেগুলো যদি থাকে দরিয়ার তলায় তাহলে আমাকেও সেইখানেই থাকতে হবে। ঐগুলি যেখানে বিল্ স্ক্যানল্যান্ও

সেখানে—বস্, এই তার ঠিকানা, তার সঙ্গের লোকেরা ক্ষ্যাপাই হোক আর পাগলাই হোক।'

'তার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা, কাজেই আমাদের ছোট্ট আত্মঘাতী সমিতির আর একটি সভ্য হল, এখন কেবল হুকুমের ওয়াস্তা!

'সারারাত পুরো দমে কাজ চালিয়ে সমস্ত ফিট্ করা হল। পরদিন সকাল সকাল ব্রেকফাস্ট্ খেয়ে আমাদের অ্যাড্ভেঞ্চারের জন্য তৈরি হয়ে আমরা জাহাজের খোলের মধ্যে নামলাম। খাঁচাখানা জাহাজের নকল তলাটার ভিতর অর্ধেকটা নামানো হয়েছিল। খাঁচার উপর দিককার স্প্রিং-এর দরজাটা দিয়ে আমরা একে একে তার ভিতরে ঢুকলাম। ক্যাপটেন্ হাওয়ি মহাবিমর্ষ মুখে আমাদের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলেন। খাঁচাশুদ্ধ আমাদের আরো কয়েক ফুট নিচে নামানো হল। তারপর জাহাজের নকল তলাটার দরজা ফাঁক করে' ভিতরে জল ঢুকিয়ে আমাদের খাঁচাটি কতখানি সাগরযোগ্য পরখ করে দেখা হল। খাঁচাটি পরীক্ষায় ভালভাবেই পাশ করল। দেখা গেল প্রত্যেকটি জোড় ঠিক খাপে খাপে বসেছে, কোনও দিক দিয়ে জল ঢোকার কোনও চিহ্ন দেখা গেল না। তখন জাহাজের খোলের নিচেকার কবাট খুলে দেওয়া হল, আমরা জাহাজের তলায় সমুদ্রের জলের ভিতরে ঝুলতে লাগলাম।

'ছোট খাঁচাখানি সত্যিই বেশ আরামের। আর তার ভিতরকার সমস্ত ব্যবস্থা এমন পরিপাটি যে দেখলে অবাক মানতে হয়। মনে হয় যিনি এসব করেছেন তিনি আগে থেকেই সব কিছু ভেবে দেখলেন কি করে'! বিজলীর আলোগুলি তখনও জ্বালানো হয় নি। সে জায়গাটা গ্রীষ্মমণ্ডলের কাছাকাছি বলে সূর্যের আলো যথেষ্ট, তখনও মোটা কাঁচের মত সবুজ জলের ভিতর দিয়ে আমাদের পোর্ট-হোলে এসে পড়ছিল। কয়েকটা ছোট ছোট মাছ সবুজ জলের ভিতর রুপালী আঁচড় কেটে ঘুরছিল ফিরছিল। আমাদের ঘরের দেয়াল বরাবর চারিদিকে গোল করে' একটি সেটি' আঁটা। তার উপরেই দেয়ালের গায়ে গভীরতাজ্ঞাপক যন্ত্র, উষ্মতামাপক বা থার্মোমিটার আর অন্যান্য সব যন্ত্র সারি সারি সাজানো। 'সেটির' নিচে এক সারি সরু সরু টিউবের মধ্যে পোরা 'কম্প্রেস্ড' বায়ু অর্থাৎ অল্প জায়গার মধ্যে খুব ঠেসে ঠেসে পোরা অনেকখানি বাতাস। জাহাজ থেকে বাতাস আনবার নলগুলি কোনও গতিকে বিগড়ে গেলে এই টিউবে পোরা বাতাসই হবে আমাদের সম্বল। বড় নলগুলি ঠিক আমাদের মাথার উপর থেকে সুরু হয়েছে, আর পাশেই ঝুলছে টেলিফোন। তাতে ক্যাপটেনের বিষণ্ণ কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া গেল:

'আপনারা কি যাবেনই ঠিক করেছেন?'

'ডক্টর অসহিষ্ণুভাবে উত্তর দিলেন, 'আমরা ঠিক আছি। আপনি আস্তে আস্তে নামাবেন, আর টেলিফোনের কাছে সর্বদা একজনকে রাখবেন। কখন কেমন থাকব জানাব। আমরা তলায় গিয়ে পৌঁছালে আপনারা যেমন আছেন তেমনি থাকবেন যতক্ষণ না আমার নির্দেশ পান। কাছির উপর বেশি জোর পড়লে চলবেনা, আস্তে—ঘণ্টায় দু নট্* হিসাবে গেলে কাছিতে যথেষ্টই সইবে। এবার—নামিয়ে যান!'

এই 'নামিয়ে যান।' কথাদুটো তিনি বললেন পাগলের মত চীৎকার করে। তাঁর জীবনের চূড়ান্ত

* ১ নট্ (knot) = ১ মাইলের কিছু বেশী।

মুহূর্ত উপস্থিত। তাঁর সমস্ত স্বপ্ন আজ সার্থক। কিন্তু আমার বুক মুহূর্তের জন্য কেঁপে উঠল এই মনে হয়ে যে আমরা বাস্তবিক হয়ত এক ধূর্ত পাগলের হাতে পড়েছি। স্ক্যানল্যানেরও হয়ত ঠিক ঐ কথাই মনে হয়েছিল, আমার দিকে চেয়ে একটা অতি বিষণ্ণ হাসি হেসে মাথায় হাতটা ছোঁয়ালে। কিন্তু ডাঃ ম্যারাকটকে দেখলাম পর মুহূর্তেই তিনি আবার সেই শান্ত সংযত বিজ্ঞানসাধক হয়ে গেছেন।

'এখন প্রায় প্রতি মুহূর্তেই আমরা যেসব আশ্চর্য নূতন নূতন জিনিস দেখতে লাগলাম তাতে আমাদের আর অন্য কথা ভাববার সময় রইল না। আস্তে আস্তে আমরা গভীর থেকে আরো গভীরে নেমে যাচ্ছিলাম। জলের হালকা সবুজ রঙ ক্রমে ঘোর সবুজ হয়ে এল। সেটা আবার হয়ে গেল চমৎকার নীল, তারপর গাঢ় নীল। এখন সেটা আরও গাঢ় হয়ে কালচে বেগনী রঙের হয়ে এল। ক্রমশঃ আরও নিচে নামতে লাগলাম আমরা—এক শো ফুট, দুশো ফুট, তিনশো। জাহাজ থেকে বাতাস পাম্প করে আমাদের কাছে পাঠানো হচ্ছিল, বাতাসের নলের ভাল্‌ভগুলি নিখুঁতভাবে কাজ করছিল, জলে এত নিচে জাহাজের ডেকের উপরকার মতই সহজ ও স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম আমরা। গভীরতামাপকের কাঁটা যন্ত্রের ভাস্বর ডালার উপর আস্তে আস্তে চলছিল। চারশো ফুট, পাঁচশো ছশো। উদ্বিগ্ন কণ্ঠের গর্জন নেমে এল টেলিফোন বেয়ে: 'কেমন আছেন আপনারা?'

'ম্যারাকট্ চেঁচিয়ে উত্তর দিলেন, 'খুব ভাল।' ততক্ষণে আলো খুব কমে গিয়েছিল। তখন কেবল খুব আবছা গোধূলির মত, আর একটু পরেই একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল। 'থামাও' বলে' ম্যারাকট্ চেঁচিয়ে উঠলেন। খাঁচাটা থেমে গেল, আর আমরা গভীর সমুদ্রে সাত শ ফুট জলের তলায় ঝুলতে লাগলাম। 'ক্লিক্' করে' সুইচ টেপার সঙ্গে সঙ্গে জোরাল সোনালী আলোয় ঘর ভেসে গেল, পাশের পোর্ট-হোলগুলি দিয়ে চারিদিকের অসীম জলরাশির ভিতর বহুদূর পর্যন্ত চলে গেল সেই আলোর সুদীর্ঘ বীথিকা। যে যার জানলার মোটা কাঁচে চোখ লাগিয়ে যে দৃশ্য দেখতে পেলাম মানুষ তা কখনও দেখেনি।

'এ পর্যন্ত সমুদ্রের এই সব গভীর জলের যেটুকু খবর আমরা পেয়েছি তা কেবল সেই সব স্তরের মাছের মারফত। তাও সব মাছের নয়, কেবল যে সব মাছ আমাদের ট্রলের মুখ কিংবা টানা জাল এড়াতে পারার মত চটপটে বা চালাক নয়। এই জলজগৎ যে বাস্তবিক কি আশ্চর্য তা এখন দেখলাম। মানুষের জন্যই যদি বিশ্বসৃষ্টির উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে স্থলের বাইরে সমুদ্রের এত গভীরে জীবজন্তু কেন যে এত বেশি তা বোঝা যায় না। আর তাদের বৈচিত্র্যই বা কত। সমুদ্রের উপরের দিকের মাছের হয় কোনো রঙ নেই নয়তো উপরটা নীল আর নিচটা রুপালী। সে সব স্তর আমরা পার হয়ে এসেছিলাম। এই নিচেকার মাছের মধ্যে কল্পনায় যতরকম রঙ ও যতরকম গড়ন সম্ভব তা সবই আছে। অতি সুকুমার কুল করোটিকা— খুব অদ্ভুত নাম না?— রুপালী ঝলক লাগিয়ে তীরের মত জলের আলোকিত অংশটুকু পার হয়ে যাচ্ছিল। কোথাও হয়তো একজাতের ল্যাসপ্রে (laspray) তার সাপের মত শরীর নিয়ে মোচড় খাচ্ছে আর কোথাও বা মুখ সর্বস্ব কালো সিরাটিয়া (ceratia) সর্বাঙ্গে কাঁটা নিয়ে বোকার মত হাঁ করে' চেয়ে আছে। কখনও হয়ত ঠোঁট মোটা কাট্‌ল্-ফিশ (cuttle fish) চলে' যেতে

যেতে তার মানুষের মত চোখের কুলক্ষণ দৃষ্টি ফেলে আমাদের দেখছে, আর কখনও হয়ত কাঁচের মত স্বচ্ছ দেহ গ্লকাস্ (glaucus) তার ফুলের মত আকার নিয়ে চারিদিকে শোভাবর্ধন করছে। একটা প্রকাণ্ড হর্স ম্যাকারেল (horse-mackerel) আমাদের জানলায় বার বার ঢুঁ মারতে সুরু করল। হঠাৎ এক ফুট সাতেক লম্বা হাঙর এসে হাজির হল আর তার হাঁ করা মুখের মধ্যে মাছটা অন্তর্ধান করল! হাঁটুর উপর নোটবুকখানি নিয়ে ডক্টর ম্যারাকট্ মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে। যা দেখছেন তাই টুকে নিচ্ছেন আর বিড় বিড় করে এক তরফা বৈজ্ঞানিক টিপ্পনী চালিয়ে যাচ্ছেন। হয়ত আমার কানে এল, 'ওটা কি? হুঁ হুঁ, কিমিরা মাইরাবিলিস্ (chimoera mirabilis)—রাশিয়ায় কোনো কোনো জার (czar) যা খেতেন।…আরে, এ যে সেপিডিঅন্, তবে অন্য প্রজাতির বটে।…মিঃ হেড্‌লে, দেখুন ঐ লম্বা-লেজওয়ালা ম্যাক্রুরাস্‌টাকে (macrurus), আমাদের জালে যেমন উঠেছিল তার থেকে এর রং একেবারে আলাদা।'

'একবারই কেবল দেখলাম তিনি সত্যি অবাক্ হলেন। হল কি, একটা ডিমের মত লম্বাটে জিনিস হঠাৎ তীর বেগে তাঁর জানলার কাছ দিয়ে চলে গেল। তার লেজ সরু তারের মত। কিন্তু উপরে আর নিচে যতদূর আমরা দেখতে পেলাম সে লেজের যেন শেষ নেই। আমিও ভেবে পেলাম না সে কি রকমের জন্তু। বিল্ স্ক্যান্‌ল্যান্‌ই সে রহস্য ভেদ করলে। রসিয়ে রসিয়ে বললে, বোধ করি ঐ ক্যাবলা জন্ সুইনি আমাদের পাশ বরাবর টিপ করে' তার ওলনের সীসেখানি ছেড়েছে। একটু তামাশা একবার চেষ্টা করেছে হয়ত—যাতে আমাদের একেবারে নেহাত একা না লাগে।'

'ম্যারাকট্ তাঁর চাপা হাসি হাসতে হাসতে বললেন, ঠিক—। ঠিক—! বৃহল্লাঙ্গুল ওলনাচার্য—একটা নূতন গণ, মিঃ হেড্‌লে, তার পিয়ানো তারের লেজ আর সীসা-ঠাসা নাক। অবশ্য এখানে বার বার ও নল ফেলা ওদের খুবই দরকার—যাতে শৈলশিরাটির উপরেই থাকতে পারে, সেটা চওড়ায় বেশি নয়।' তারপর টেলিফোনে মুখ দিয়ে চেঁচিয়ে বললে, 'সব ঠিক আছে, ক্যাপ্‌টেন, আমাদের নামিয়ে যেতে পারেন।'

'আবার আমরা নিচে নামতে লাগলাম। ডক্টর ম্যারাকট্ আলো নিবিয়ে দিলেন। সব আবার ঘুটঘুটে অন্ধকার, কেবল গভীরতা মাপকের বাক্সর ডালাটি আমাদের ক্রমনিম্নগতি নির্দেশ করে' চলেছে। একটু তুলুনি লাগা ছাড়া আমরা যে চলছি তা বোঝবার আর কোনো উপায় ছিল না। কেবল যন্ত্রের ডালার উপরে কাঁটাটি আমাদের জানিয়ে দিচ্ছিল কি অদ্ভুত, কি অসম্ভব অবস্থার মধ্যে আমরা রয়েছি। যখন আমরা হাজার ফুট নিচে তখন স্পষ্টই মনে হল খাঁচার বাতাস দূষিত হয়ে উঠেছে। স্ক্যান্‌ল্যান্ নলের ভাল্‌ভ্‌গুলোতে তেল দেওয়ায় অবস্থাটা শোধরাল। দেড় হাজার ফুটে এসে আমরা থামলাম। আলোগুলো আবার জ্বালিয়ে দেওয়া হল। প্রকাণ্ড কালো মত কি একটা আমাদের কাছ দিয়ে চলে' গেল, কিন্তু সেটা তলোয়ার মাছ, না গভীর সমুদ্রের হাঙর না অন্য কোনও অজানা জাতের জন্তু তা আমরা ঠিক করতে পারলাম না। ডক্টর তাড়াতাড়ি আলোগুলো নিবিয়ে দিলেন। বললেন, 'এই আমাদের আসল ভয়। গভীর সমুদ্রে এমন সব জীব আছে যাদের কোনো একটার আক্রমণে আমাদের

এই ইস্পাতের ঘরখানার অবস্থা গণ্ডারের আক্রমণে মৌচাকের মতই হতে পারে।'

'স্ক্যান্‌ল্যান্ বললেন, 'তিমি টিমি হবে।'

'ম্যারাকট্ বললেন, 'তা তিমি অনেক নিচে নামতে পারে। একবার গ্রীনল্যাণ্ডের একটা তিমি হারপুনের (harpoon) ঘা খেয়ে খাড়া নিচের দিকে ডুব মেরে প্রায় মাইলটাক দড়ি টেনে নিয়েছিল। তবে বেশী আঘাত বা ভয় না পেয়ে কোন তিমি এত নিচে আসবে না। এটা হয়ত একটা অতিকায় স্কুইড্, সব স্তরেই দেখতে পাওয়া যায়।'

'আমি বললাম, স্কুইড্ তো নেহাত নরম। মেরিব্যাঙ্কের নিকেল-স্টিলে যদি ফুটো করে দিতে পারে তো তাকে সাবাস বলতে হবে।'

'প্রফেসর বললেন, 'স্কুইডের শরীর নরম হতে পারে, কিন্তু একটা বড় স্কুইডের ঠোঁটে লোহার ডাণ্ডা কাটা পড়তে পারে। সেই ঠোঁটের একটি মাত্র ঠোকরে এই এক ইঞ্চি পুরু কাঁচ কাগজের মত ফুটো হয়ে যাবে।'

'বিল্ তাই শুনে একটি আমেরিকান্ শপথ ঝাড়লে, আমাদের খাঁচাখানিও আবার চলতে সুরু করল।

'আর খানিক পরে একটা সামান্য ঝাঁকানির সঙ্গে সঙ্গে আমরা থেমে গেলাম। ঝাঁকানিটা এতই মোলায়েম যে আমরা হয়ত টেরই পেতাম না যদি না আলো জ্বালিয়ে দেখতে পেতাম আমাদের খাঁচার চারিদিকে খাঁচা-ঝোলানো কাছিটা পাকে পাকে পড়ে আছে। পাছে আমাদের বাতাসের নল তার সঙ্গে জড়িয়ে যায় তাই ম্যারাকট্ টেলিফোনে চীৎকার করে বললেন কাছিটাকে উপর থেকে টান করে ধরতে। যন্ত্রে দেখা গেল আঠার শো ফুট আটলান্টিক মহাসাগরের তলায় একটা শৈলশিরার উপর আমরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে।

তিন

'কিছুক্ষণ বোধ হয় সকলেরই একই রকম মনের ভাব হল। মনে কিছুই দেখবার বা করবার চেষ্টা না করে আমরা যে পৃথিবীর অন্যতম মহাসমুদ্রের তলায় একেবারে ওলন-তারের আগায় বসে আছি এরই অনির্বচনীয় বিস্ময়টুকু শুধু চুপ করে বসে অনুভব করি। কিন্তু আমাদেরই আলোয় উজ্জ্বল চারিদিকের অদ্ভুত দৃশ্য দেখবার অদম্য কৌতূহল শীঘ্রই আমাদের যার যার জানলার ধারে টেনে নিয়ে গেল।

'আমাদের খাঁচাটি যেখানে নেমেছিল সেখানে চারিদিকেই বড় বড় সামুদ্রিক ঝাঁজি (ম্যারাকট্ বললেন 'করপালিকা বহুলাংশিকা'!)। তার লম্বা লম্বা হলদে পাতাগুলি সমুদ্রতলের কোনো রকম স্রোতে আস্তে আস্তে দুলছিল, ঠিক যেমন গাছের পাতা দোলে দখিনা হাওয়ায়। তার ওপাশে একটা কুচকুচে কালো টিলা, তার গায়ে নানা চমৎকার রঙীন জীবের মেলা—কিন্তু তাদের নামগুলো তত চমৎকার নয়!—ঠিক যেমন ইংল্যাণ্ডে বসন্তকালে মাঠে মাঠে ফোটে হায়াসিন্থ আর প্রিমরোজ্।

এখানকার এই জীবন্ত ফুলগুলির রঙই বা কত রকম—টকটকে লাল, টুকটুকে লাল, ফিকে লাল, গাঢ় লাল—সমস্তই এক নিকষকালো পটের উপর ছড়ানো। এক একটা বিরাট্ স্পঞ্জ (sponge) সেই কালো টিলাটার এখানে ওখানে এক একটা গর্তের ভিতর থেকে গা বের করে রয়েছে। সমুদ্রের মাঝারি গভীরতার কয়েকটা মাছ রঙের ঝলক লাগিয়ে আমাদের উজ্জ্বল আলোর বৃত্তটা পার হয়ে যাচ্ছিল। সে যেন পরীর রাজ্য! আমরা সেই অপরূপ দৃশ্য দেখতে দেখতে একেবারে মজে গেছি এমন সময়ে টেলিফোনে ক্যাপটেনের উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর নেমে এল:

'কেমন লাগছে তলাটা? সব ভাল তো? বেশি দেরি করবেন না; ব্যারোমিটার নামছে, আকাশের চেহারাটাও ভাল ঠেকছে না। যথেষ্ট বাতাস পাচ্ছেন তো? আর কিছু করতে পারি?'

'ম্যারাকট্ চেঁচিয়ে উত্তর দিলেন, 'সব ঠিক আছে, ক্যাপটেন্! আমাদের দেরি হবে না। আপনি আমাদের যথেষ্টই হাওয়া খাওয়াচ্ছেন, ঠিক নিজেদের ক্যাবিনের মতই আরামে আছি। এইবার আস্তে আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে দেবেন।'

সমুদ্রের তলাটা এত অন্ধকার যে তাতে ফোটোগ্রাফের প্লেট এক ঘণ্টা ধরে মেলে রাখলেও কোনো আলোর চিহ্নমাত্রও পাওয়া যাবে না। কিন্তু আমরা তখন ভাস্বর মাছের স্তরে এসে পৌঁছেছিলাম—তাদের নিজেদের গা থেকেই আলো বেরোয়। এই আলোকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে অনুপ্রভা। নিজেদের আলো নিবিয়ে দিয়ে সেই মিশকালো অন্ধকারের মধ্যে গভীর সমুদ্রের এই জীবন্ত অনুপ্রভার খেলা দেখতে কি মজাই না লাগছিল। যেন কালো মখমলের পর্দার উপর অনেকগুলি উজ্জ্বল আলোর বিন্দু চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। একটা বিকট দেখতে জন্তুর দাঁতগুলোতে এমনি অনুপ্রভা, কারো বা লম্বা দুখানি সোনালি রঙের জ্বল জ্বলে শুঁয়ো, আর কারো হয়ত মাথায় জ্বলন্ত আগুনের মত ঝুঁটি। যতদূর চোখ যায় জমাট অন্ধকারের মধ্যে অগুনতি উজ্জ্বল বিন্দু যে যার নিজের ধান্দায় ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। একটু পরে আমাদের আলোগুলো আবার জ্বেলে দেওয়া হল, ডক্টর তাঁর সমুদ্রতলের নিরীক্ষা সুরু করলেন।

বললেন, 'আমরা অনেক নিচে নেমেছি বটে কিন্তু সমুদ্রের একেবারে অন্তস্তলে যে সব বিশেষ রকমের স্তর পড়ে তা দেখতে পাবার মত যথেষ্ট নিচে নামিনি। সেগুলো আমাদের নাগালের একেবারে বাইরে। হয়তো পরে কখনো আরও লম্বা কাছির—'

'বাদ দিন! ও কথা ভুলে যান!' বিল্ গরগরিয়ে উঠল।

'মৃদু হেসে ম্যারাকট্ বললেন, 'সমুদ্রের জঠরান্ধকার শীঘ্রই সয়ে যাবে, স্ক্যান্ল্যান্, তার ভিতরে এই জানাই আমাদের শেষ জানা হয়ে থাকবে না।'

স্ক্যান্ল্যান্ বিড় বিড় করে বললে, 'যত আকালগেড়ে কথা!'

ম্যারাকট বলে চললেন, 'ক্রমে সেটা 'স্ট্র্যাটফোর্ড'-এর খোলের ভিতর নামার মতই সামান্য ব্যাপার মনে হবে। মিঃ হেডলে, লক্ষ্য করে দেখ এখানকার জমিটা ঝামাপাথরের আর ঐ কালো কালো টিলাগুলি আগ্নেয়-শিলার অর্থাৎ বহু পুরাকালে যে সব আগ্নেয় উৎপাত হয়েছিল তারই ফলে এই পাথুরে টিলাগুলির জন্ম। সত্যিই মনে হচ্ছে আমি এতদিন যে মত পোষণ করে এসেছি তাযে ঠিক, তাই

প্রমাণিত হচ্ছে। আমার মত এই যে আগ্নেয় উৎপাতের ফলে যে 'লাভা' বেরোয় তাতেই এই শৈলশিরাটি তৈরি, আর ম্যারাকট ডীপ'—এই ছুটি কথা তিনি খুব তারিয়ে তারিয়ে উচ্চারণ করলেন—'আর ম্যারাকট ডীপ হচ্ছে তার ঢালু দিক্‌টা। আমাদের খাঁচাখানাকে আস্তে আস্তে এগিয়ে ডীপের ধারে নিয়ে গিয়ে সে জায়গায় গঠনটা কি রকম দেখে এলে মন্দ হত না। হয়ত সেখানে দেখতে পাব একটা বিরাট খদ যেটা প্রায় খাড়াভাবে সমুদ্রের চরম গভীরতার দিকে নেমে গেছে।'

মতলবটা আমার কাছে বিপজ্জনক মনে হল। আমাদের খাঁচায় কাছিটা এমন কিছু মোটা নয়, আড়ভাবে চালাতে গেলে তার উপর যে চাড় পড়বে তা কতদূর সইবে কে জানে। কিন্তু কোনো বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষার বেলায় ম্যারাকটের কাছে তাঁর নিজের বা আর কারো বিপদ্ বলে কোনো জিনিসের অস্তিত্বই থাকে না। আমি আর বিল দম বন্ধ করে দেখলাম আমাদের ঝুলন্ত ঘরখানা আস্তে আস্তে ঝাঁজির ঝাড় ঠেলে চলতে সুরু করল। অর্থাৎ এইবার কাছির উপর পুরো দস্তুর চাড় পড়ছে। ম্যারাকট হাতে কম্পাস্ নিয়ে কখন কোন দিকে চালাতে হবে চীৎকার করে' তার নির্দেশ দিতে লাগলেন। মাঝে মাঝে সামনে কোনো বাধা এলে খাঁচাখানাকে খানিকটা উপরে তুলে নিতে হুকুম করছিলেন।

আমাদের বললেন, 'শৈলশিরাটি চওড়ায় একমাইলের বেশি হবে না। এইভাবে চললে আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই তার ধারে গিয়ে পৌঁছাব।

চারিদিকে সেই সোনালী ঝাঁজির সুকোমল শোভা, তার মধ্যে কোথাও বা প্রকৃতির নিজের হাতে পল কাটা বিচিত্র বর্ণের পাথর, নিকষের জমির উপর বসানো। আমরা দেখতে দেখতে যেতে লাগলাম। হঠাৎ ডক্‌টর টেলিফোনের দিকে ছুটে গেলেন :

'থামাও! আমরা এসে গেছি!'

'অকস্মাৎ আমাদের সামনে এক বিরাট গহ্বর হাঁ করে' এসে হাজির হল! চকচকে কালো আগ্নেয় শিলার অতলস্পর্শ খদ নেমে গেছে নিছক অজানার দিকে। তার কিনারায় ঝাঁঝির ঝাড় ঝুলছে— যেমন পৃথিবীর মাটিতে খদের মুখে ফার্ন-এর (fern) ঝাড় দোলে। খদটা সামনের দিকে ক্রমশঃ ঢালু হয়ে নেমে গেছে, কিন্তু তার মুখটা কতখানি চওড়া তা বোঝবার কোনো উপায় ছিল না। আমাদের আলো সামনের জমাট অন্ধকার ভেদ করতে পারছিল না। লুকাস সিগনালিং ল্যাম্পের মুখটা ঘুরিয়ে নিচের দিকে আলো ফেলা হল। সমান্তরাল আলোক-রশ্মির সোনালী বীথিকা নেমে গেল নিচে, আরও নিচে ; গহ্বরের অন্তহীন অন্ধকার তাকে শুষে নিল।

ম্যারাকটের শীর্ণ মুখে মালিকানার খুসি খুসি ভাব। বললেন, বাস্তবিকই অতি চমৎকার! অবশ্য এর চাইতেও গভীর "ডীপ" আছে। ল্যাড্রোন দ্বীপপুঞ্জের কাছে চ্যালেঞ্জার ডীপ ছাব্বিশ হাজার ফুট, ফিলিপাইন্‌স্ থেকে কিছু দূরে প্ল্যানেট ডীপ বত্রিশ হাজার, তাছাড়া আরো অনেক আছে : কিন্তু নিছক খাড়াইয়ের দিক থেকে বোধ হয় ম্যারাকট ডীপ অদ্বিতীয়। তাছাড়া এতে কোনো সন্দেহ নেই যে—

কথার মাঝে তিনি হঠাৎ থেমে গেলেন, চেয়ে দেখি গভীর ঔৎসুক্য আর বিস্ময় যেন তাঁর মুখে জমাট বেঁধে গেছে। স্ক্যানল্যান আর আমি তাঁর কাঁধের উপর দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম……যা দেখলাম তাতে আমরা জমে একেবারে পাথর হয়ে গেলাম!!!'

ক্রমশঃ

অপূর্ব সর্পদর্শন

(সত্য ঘটনা)

যোগেশ মজুমদার

আমার বয়স যখন ছয় হইবে অর্থাৎ আজ হইতে আশি বৎসরের পূর্বের ঘটনা। সেই সমে আমার একটি অপূর্ব সর্প দর্শনের সুযোগ হয়। সেই ঘটনার কথা জানিতে পারিলে তোমাদে মনে কৌতূহল জাগিয়া উঠা সম্ভবপর এই বিবেচনা করিয়া তাহার বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

আমরা তখন আজমীরে (রাজপুতানায়) থাকি। আজমীর একটি প্রাচীন সহর। রাজ পুতানার আরাবল্লী পর্বতশ্রেণীর উপত্যকার মধ্যস্থলে অবস্থিত। চতুর্দিকে পর্বতশ্রেণী, মধ্যে এই সহরটি, দেখিতে অতি সুন্দর। এক সময়ে ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ পৃথ্বিরাজের রাজত্বের অন্তর্গত ছিল তিনি এই পর্বতশ্রেণীর কয়েকটি শিখরে 'তারাগড়' প্রভৃতি কয়েকটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করেন। তাহাদে ধ্বংসাবশেষ আজও বর্তমান। সহরের অনতিদূরেই পুরানো পুষ্কর হ্রদ। ফুল্লকমল শোভিত ইহা তীরে ব্রহ্মা একদা যজ্ঞ সম্পাদন করেন।

নিকটস্থ পর্বতশিখরে সাবিত্রী দেবীর মন্দির। পুষ্করের তীরে রাজপুতানার রাজাদের স্নানগৃহগু নির্মিত। এই স্নানগৃহগুলি দ্বিতল, নিম্নতলটী হ্রদের জলে পরিপূর্ণ থাকিত। হ্রদ হইতে যে স্থান হইতে জল ভিতরে প্রবেশ করিত সেই স্থানটি লৌহগরাদ ও জালে সুরক্ষিত ছিল, যাতে কুম্ভীর প্রভৃ জলজন্তু ভিতরে আসিয়া প্রবেশ না করে। জল পরিপূর্ণ এই কক্ষগুলিতে সিঁড়ি বাহিয়া নিচে নামিয় রানীরা লোকচক্ষুর অন্তরালে স্নানক্রিয়া সম্পাদন করিতেন।

লালুপাণ্ডা (পূজারী) বলিয়া একজন পাণ্ডা পুষ্করে থাকিতেন। তিনি মধ্যে মধ্যে আসিয় আমার মাতার সঙ্গে দেখা করিতেন। বুঝিতে পারিতাম এইবার পুষ্করে যাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে তিনি সঙ্গে আনিতেন প্রচুর বাদাম, পেস্তা, কিস্‌মিস্, এলাচদানা প্রভৃতি প্রসাদ। আরও আনিতে ৩০ ৪০ খানি সুবৃহৎ পদ্মপাতা। মখমল সদৃশ মসৃণ ও কোমল এই পত্রগুলি আমাদের দেশের কলা পাতের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। আরও সঙ্গে থাকিত পদ্মবীজের কোষ। ইহার কোষের বীজগুলি মাখানা পরিণত করা হইলে ইহা অতীব সুখাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইত। বৃদ্ধ পাণ্ডাটিকে লইয়া আমার মা ও দিদিমাদের সঙ্গে পুষ্করে গিয়া উপযুক্ত স্নান গৃহে কতবার স্নান করিয়া আসিয়াছি।

কার্তিক পূর্ণিমায় পুষ্করে একটি বৃহৎ মেলা জমে। শুনিতাম নাকি যে সময়ে হাতি, উট, ঘোড় প্রভৃতি ক্রয় বিক্রয় হইত। মেলা উপলক্ষ্যে যখনই সেখানে গিয়াছি, মনে হইত দোকান পাট লইয় যেন এক নতুন সহরে আসিয়াছি। লক্ষাধিক লোকের সমাগম হইত। পুষ্কর হ্রদ ব্যতীত বুড়া পুষ্কর ও আয়না সাগর নামে আরও দুইটি হ্রদ ছিল। আয়না সাগরের জল দর্পণের ন্যায় নির্মল ছিল, ইহারই তীরে মুঘল সম্রাট সাহজাহান একটি মর্মর প্রস্তরের সুদৃশ্য হাওয়া ঘর (বিশ্রাম স্থান) নির্মাণ করেন।

নিকটেই সাহেবদের ইয়াট ক্লাব ছিল হ্রদের তীরে সব সময়ে কতগুলি জলি বোট বাঁধা থাকিত।

হিন্দুদের নিকট পুষ্কর যেমন একটি প্রধান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত, মুসলমানদেরও প্রসিদ্ধ সাধক মৈনুদ্দীন চিস্তির পবিত্র সমাধিভূমি নগরের অপর পার্শ্বে পর্বতের সানুদেশে অবস্থিত। ইহা মুসলমানদিগের একটি পবিত্র তীর্থ। মক্কা নগরের পরেই ইহার খ্যাতি। 'উর্স' উৎসব উপলক্ষ্যে পুষ্করের ন্যায় সুবৃহৎ এখানে মেলা বসে। ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরে নানা দেশগুলি হইতে ধর্মপ্রাণ মুসলমানের সমাবেশ হইত। মনে হইতেছে এই উৎসব পক্ষাধিক ব্যাপী হইত। এই সমাধির প্রবেশ দ্বারের সমুখে দুইটি সুবৃহৎ লৌহ কটাহ রক্ষিত দেখিয়াছি। উৎসবের উপলক্ষ্যে ইহাতে খিচুড়ী, পোলাও প্রভৃতি রান্না হইত এবং উহা প্রসাদরূপে ভক্তগণের জন্য বিতরিত হইত।

এই সমাধিভূমির অনতিদূরেই তেলী মহল্লা নামে একটি পল্লী ছিল। এই পল্লীর অন্তর্গত 'লখ্‌খন্‌ কোটি' নামক একটি সুবৃহৎ ভবনে আমরা থাকিতাম। তদানীন্তন কালে লক্ষাধিক টাকায় ইহা নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার প্রসিদ্ধি ছিল। ইহার প্রবেশদ্বার ছিল একতলা সমান উচ্চ। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অসংখ্য কীলকযুক্ত সুদৃঢ় কাষ্ঠে ইহা নির্মিত, চার পাঁচ জনে মিলিয়া ইহা খোলা বা বন্ধ করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। সুতরাং উহা বন্ধই থাকিত। লোক চলাচলের জন্য প্রবেশদ্বারটির একটি অংশ কাটিয়া দরজার মত করা হইয়াছিল। যাঁহারা দিল্লীর জুম্মা মসজিদের প্রবেশ দ্বার দেখিয়াছেন তাঁহাদের ইহা বুঝিতে কষ্ট হইবে না।

প্রাসাদের ন্যায় প্রস্তর নির্মিত এই ভবনটি ত্রিতল ছিল এবং ছাদের এক কোণে একটি চিলকোঠাও ছিল। ঘরের ছাদে কড়ি, বরগা ব্যবহৃত হইত না। প্রস্তরের বৃহৎ টালি দিয়া উহা আবৃত করা হইত। বাড়িটিতে অনেকগুলি হলের আকারের ঘর ছিল। সর্ব নিম্নতলে গোয়ালঘর ছিল, দ্বিতলে ভৃত্য থাকিত। ত্রিতলে আমরা থাকিতাম। চিলকোঠাটি পিতার উপাসনাকক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হইত। ছাদ এত বড় ছিল যে অনায়াসে উহাতে Badminton খেলা যাইত।

অধিকন্তু বাড়িটির নিম্নে 'তহ্‌খানা' বলিয়া একটি সুবৃহৎ কক্ষ ছিল। গ্রীষ্ম যখন প্রচণ্ড হইয়া উঠিত ও "লু" (উত্তপ্ত বাতাস) বহিতে আরম্ভ করিত তখন মাতৃদেবী আমাদের কয়টি ভাই বোনকে লইয়া ইহা আশ্রয় করিতেন। কক্ষটিতে বাতায় চলাচলের ব্যবস্থা ছিল। নিদ্রাভঙ্গের পর সূর্যাস্ত হইলে আমরা সকলে উপরে উঠিয়া আসিতাম। রাত্রির আহারের পর আমরা ছাদের উপর উঠিয়া আসিতাম। ভৃত্যেরা ছাদ জলে ভিজাইয়া দিত। উহা শুকাইয়া গেলে ঢালাও বিছানা পাতা হইত। প্রস্তর নির্মিত এই বাড়িটি গ্রীষ্মকালে যেমন উত্তপ্ত হইয়া উঠিত, শীতেও ততোধিক ঠাণ্ডা বোধ হইত।

এই ছাদটি মাতৃদেবীর অনেক কাজে লাগিত, তিনি নানাবিধ বড়ি, আচার প্রভৃতি রৌদ্রে দিতেন। আমরাও বাড়িতে লিখিবার কালি প্রস্তুত করিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিতাম। এই কালি তৈয়ারি করা আমাদের একটি অত্যন্ত আমোদের বিষয় ছিল। একটি নাতিবৃহৎ লৌহকটাহে ত্রিফলা, হীরাকষ, ভুষা ও নানাবিধ মসলা দেওয়া হইলে উহাতে কয়েকটি পুরাতন অব্যবহার্য লৌহখণ্ড ডুবাইয়া রাখা হইত। রৌদ্রতাপে লৌহকটাহের জল মরিয়া যখন ঘনত্ব প্রাপ্তি হইত, উহা দোয়াতে ঢালিয়া আমরা ব্যবহার

করিতাম। অধুনা যে সকল কালি বাজারে বিক্রয় হয় তাহা অপেক্ষা এই কালি সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ ছিল যাহাঁরা দিল্লীর লাল-কিল্লার যাদুঘরে রক্ষিত মুঘল সম্রাটদের সন্ধিপত্র প্রভৃতি দেখিয়াছেন তাঁহারা এই কালির যে কি উজ্জ্বল্য ছিল বুঝিতে পারিবেন। বহু বৎসর পূর্বে যাহা লিখিত হইয়াছিল আজও তাহা সেইরূপ উজ্জ্বল। ইংরাজদের লিখিত সন্ধিপত্রের লেখাগুলি ম্লান হইয়া গিয়াছে, উহা কষ্ট করিয়া পড়িতে হয়।

এই বারে যে ঘটনাটির কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহার বর্ণনা করিব। সে রাত্রি ছিল ভীষণ গরম। ভৃত্যেরা ছাদটি ধুইয়া বিছানা করিয়া দিয়া গিয়াছে। ছাদের এক কোণে একটি উঁচু জায়গায় জলের কুঁজা ও গেলাস রাখিয়া দিয়া গিয়াছে।

পার্বত্য দেশ বলিয়া এই সহরটিতে কাঁকড়াবিছার খুব উপদ্রব ছিল। রাত্রে যেখানে জল রাখা হইত সেখানে ইহারা জড় হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। এ সহরে সাপ কখনও দেখি নাই, সাপুড়ের সাপ ভিন্ন। তবে চাকরদের মুখে পাহাড়ে ময়াল ও নানাবিধ সাপের কথা শুনিতে পাওয়া যাইত। সুবৃহৎ কালো রঙের কাঁকড়াবিছার এত উপদ্রব ছিল যে প্রতিবেশীদের মধ্যে প্রায় প্রত্যহই শুনিতে পাওয়া যাইত যে কাহাকে না কাহাকেও কাঁকড়াবিছাতে দংশন করিয়াছে। আমার মাতৃদেবী ও আমাকেও একবার কাঁকড়া বিছায় কামড়াইয়াছিল তাহা এখনও মনে আছে। এই কাঁকড়া বিছার ঔষধ আমার পিতৃদেবের বাক্সে সদা সর্ব্বদাই থাকিত। গভীর রাত্রে অনেকে এই 'জামান গোটা' নামক ঔষধ লইয়া যাইতেন।

সেই রাত্রে আমরা যখন সকলে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হঠাৎ আমার দাদা (বয়স ১৯।২০ হইবে) 'সাপ্‌ সাপ্‌' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। উহা শুনিবামাত্র, ধড়ফড় করিয়া সকলে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলাম। দেখি দাদা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন, মুখে আতঙ্কের চিহ্ন, ছাদের এক অংশে দৃষ্টি নিবদ্ধ।

আমরা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কিছু না বলিয়া ময়াল সাপটি যেদিকে দেখা গিয়াছে সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন। আমরা সাপটিকে দেখিতে পাইয়া ছাদ হইতে প্রাণপণে ভৃত্য 'বুদ্ধা' ও মহারাজ (পাচক):ক চীৎকার করিয়া বলিলাম তাহারা যেন অবিলম্বে একটি লাঠি (লকৃড়ি) ও লণ্ঠন লইয়া উপরে ছাদে আসে। বৃহৎ সাপ দেখা দিয়াছে।

দ্বিতল হইতে বহু বিলম্বে উহাদের সাড়া পাওয়া গেল। কিছু পরে মহারাজ একটি লণ্ঠন ও 'বুদ্ধা' একটি বাঁশের লাঠি লইয়া দেখা দিল। দাদা তাহাদের দূর হইতে সাপটি দেখাইয়া দিলে দেখিলাম যে তাহাদের মুখ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। বুদ্ধা চাকরটি দেখিতে যেরূপ বলশালী তদনুপাতে তাহার সাহস যে খুব কম তাহা বুঝা গেল। মহারাজকে আগে ঠেলিয়া দিয়া তাহার পশ্চাতে সে ধীরে ধীরে আগাইয়া চলিল, কিছুদূর গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া গেল। মনে হইল তাহার পা দুটি কাঁপিতেছে।

দাদা সেই সময়ে তাহাকে একটি প্রচণ্ড ধমক দিলে সে থতমত খাইয়া, একটু আগাইয়া আসিয়া দূর হইতে সেই লাঠি উঁচাইয়া 'জয় রামজীকি' বলিয়া সাপটিকে আঘাত করিল কিন্তু কি আশ্চর্য!

আঘাত পাইয়াও সেই সাপটিকে নড়িতে চড়িতে দেখা গেল না, মনে হইল উহা এক আঘাতেই নিশ্চেষ্ট হইয়া গিয়াছে। ঠিক মরিয়াছে কি না স্পষ্ট বুঝা গেল না। দাদা পুনর্বার ধমক দেওয়াতে বুদ্ধা এবারে সাপের মাথার উপরে লক্ষ্য করিয়া পুনর্বার লাঠি চালাইল কিন্তু সাপটি মৃতবৎ পড়িয়া রহিল। বুদ্ধা ও মহারাজ তখন কিছু সাহস সঞ্চয় করিয়াছে, ধীরে ধীরে সাপের দিকে লণ্ঠন হাতে সন্তর্পণে অগ্রসর হইল এবং সাপের কাছে আসিবামাত্র উচ্চহাস্যে ফাটিয়া পড়িল।

বিপদসঙ্কুল অবস্থায় তাহাদের এইরূপ হাসিতে দেখিয়া দাদার মুখ খুব অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। আমরাও বিছানা ছাড়িয়া সাপের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম এবং সত্য বলিতে কি আমরাও হাসি সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তখন ব্যাপারটা স্পষ্ট বুঝা গেল।

যে লোহার কড়াতে আমরা কালি প্রস্তুত করিয়া ছাদে রৌদ্রে দিয়াছিলাম তাহা কাৎ হইয়া পড়ায় ছাদের অনেক দূর সর্পাকৃতিতে গড়াইয়া গিয়াছিল। অস্পষ্ট নক্ষত্রালোকে দাদার হঠাৎ তাহা দেখিয়া যে সাপ বলিয়া ভ্রম হইবে ইহা কিছু আশ্চর্যের বিষয় নহে। সকলে মিলিয়া অনেকক্ষণ হাসাহাসি হইল। কিছুক্ষণ পরে লাঠি ও লণ্ঠন হাতে বুদ্ধা ও মহারাজ দাদাকে লক্ষ্য করিয়া 'দাদাবাবু অচ্ছে সে আচ্ছা সাপ দিখ্‌লায়া' বলিয়া হাসিতে হাসিতে নিচে নামিয়া গেল।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

* আমাদের হাতে এজেন্টদের কাছ থেকে যথেষ্ট সংখ্যায় শারদীয়া সন্দেশ এসে গেছে। *
* সুতরাং আমরা এ'বছর যাদের শারদীয়া সংখ্যা ডাকে হারিয়েছে তাদের সকলকেই আর এক কপি বিনামূল্যে দেওয়া স্থির করেছি *
* কিন্তু এই সংখ্যাটি সাধারণ ডাকে পাঠানো হবে না। হয় হাতে হাতে নিয়ে যাও নইলে ডাক মাশুল সহ রেজিস্ট্রি খরচ বাবদ ১৲ টাকা পাঠাও *

নোবেল পুরস্কার ও বার্থা ভন সাটনার

রমা মজুমদার

রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বেধেছে তুর্কীস্থানের। সেটা ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ। সুন্দর ককেসাস হয়েছিল রাশিয়াদের সামরিক ঘাঁটি। সমস্ত দেশে নেমে এসেছিল মুমুর্ষুর হতাশা, পরিজন হীন আর্তের চীৎকার, শিশু-বৃদ্ধের নিংসহায় চাউনি। সে অন্ধকারে আলোর রেখা দেখবার জন্য পাগল হলেন একজন, আর্তের চীৎকারে ক্লিষ্ট হলেন, অসহায় চাউনিতে ছট ফট করলেন। বিবেকের তাড়নায় তিনি কাজে নেমে গেলেন। আহতদের শুশ্রূষার কাজে। এঁর নাম বার্থা ভন্ সাটনার। ব্যারণ আর্থার ভন সাটনারের স্ত্রী। এঁরা দুজনেই ছিলেন মানব প্রেমিক। রাজনীতিতে ছিল প্রখর জ্ঞান। আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলো দূর করে কিঁ করে শান্তি আনা যায় এ নিয়ে দুজনেই আলোচনা করতেন, পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে অনেককেই সচেতন করতেন। শুধু রাজনৈতিক হিসেবেই নয়, বার্থার গানেও ছিল যথেষ্ট ঝোঁক ; সাহিত্যের ভাষাকে তিনি ভালবাসতেন, কবিতার কোমল ছন্দ তাঁর মধ্যে এনেছিল কমনীয় অনুভূতি।

বার্থা ভন সাটনারের আর একটি বড় পরিচয় ছিল তা হচ্ছে তিনি প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক অ্যালফ্রেড নোবেলের সেক্রেটারী।

নম্র, নিরীহ অ্যালফ্রেড নোবেলের বৈজ্ঞানিক মনের সঙ্গে ছিল বার্থার স্নিগ্ধ মনের অদ্ভুত সামঞ্জস্য। সামঞ্জস্য ছিল বার্থার সাহিত্য অনুশীলনের সঙ্গে নোবেলের অনুভাবপ্রবণ সাহিত্যপ্রীতির ; পৃথিবীর সমস্যা নিয়ে দুজনেই আলোচনা করতেন, পরামর্শ করতেন, সমাজকে কিভাবে প্রগতিশীল করা যায়, আর সেই প্রগতিকে শান্তির সুতোয় কিভাবে বাঁধা যায়। কিন্তু এত সামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও দুজনের দৃষ্টিভঙ্গীর কিছুটা পার্থক্য দিল। বার্থা ভাবতেন সুন্দর শিক্ষা দিয়ে মানুষের অনুভূতিকে যদি বাড়ানো যায়। তাহলে সেই জেগেওঠা বিবেকের কাছে অনেক স্বার্থ বলি যাবে, আর স্বার্থের বলি দেওয়া মানেই শান্তিকে ফিরিয়ে আনা।

নোবেলের বিশ্বাস ছিল বুদ্ধিমান চেষ্টাপরায়ণ না হলে জীবনে উন্নতি করা সম্ভব নয় ; আ জগতে যদি উন্নতিই না এল তাহলে শান্তি আসবে কি করে ? যুদ্ধের বিভীষিকা ? এত অতি সহজে দূর করা যায় ! তিনি এমন এক মারণাস্ত্র তৈরী করে দিতে পারেন যা কিনা পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেবে এই ধ্বংসের ভয়েই যুদ্ধলিপ্সু রাজ্য গুলো পিছিয়ে যাবে, পৃথিবীতে আসবে শান্তি,। বার্থা বোঝাতে চেষ্টা করতেন মারণাস্ত্রের পেছনে যে পরিশ্রম চেষ্টা বুদ্ধি তিনি ব্যয় করবেন সেটুকু যদি মানুষের বিবেক শক্তিকে জাগাবার কাজে লাগান তাহালেই কাজ হবে ;—সবাই বুঝবে যুদ্ধের লিপ্সায় সমৃদ্ধি কিংবা শান্তি কোনটিই থাকিতে পারে না—একমাত্র যুদ্ধ বিভীষিকার অবসানেই এগুলোকে পাওয়া সম্ভব।

দীর্ঘকাল আলফ্রেড নোবেলের সান্নিধ্যে থেকে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর সুগম্ভীর বিজ্ঞানী মনের কোণে রয়েছে মানুষের প্রতি সুন্দর অনুভূতি। একে যদি কাজে লাগানো যায় তাহলে সভ্যতা

প্রসার সুন্দর ভাবে এগিয়ে চলতে পারে নোবেলের বুদ্ধি দীপ্ত উদার মন পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু কিভাবে একাজে এগোন যায়? ভাবনায় পড়লেন বার্থা। ইতিমধ্যে এমন এক ভয়ানক ঘটনার পূর্বাভাস দেখা দিল যার ফলে পৃথিবীতে দেখা দিল এক নতুন আন্দোলন। সে আন্দোলনে যোগ দিলেন বার্থা, সে আন্দোলনের জোয়ারে আলফ্রেড নোবেলের মন আরও দ্রবীভূত হ'ল। পৃথিবী জানলো কেবল মাত্র সভ্যতার প্রসারেই নয়, সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতেও বৈজ্ঞানিক নোবেল বিশেষ উদ্বিগ্ন।

যখনকার কথা বলছি তখন পৃথিবীর ইতিহাসে জার্মানদের প্রাধান্য। জার্মানরা তখন এগিয়ে আছে বিজ্ঞান সাহিত্য, ব্যবসায় বাণিজ্যে। শক্তির দিক থেকে জার্মানরা তখন দুর্ধর্ষ জাতি।

তার এই শক্তিবৃদ্ধিতে অন্য রাজ্যগুলো ভয় পেল। ভয় পেল ফ্রান্স, রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড। জার্মানী যাতে তাদের কোন ক্ষতি করতে না পারে তার জন্যে তারা উঠে পড়ে লাগল। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা গেল মহাযুদ্ধের সূচনা।

এ সূচনা সমস্ত পৃথিবীকে আতঙ্কিত করল। ভাবিয়ে তুলল বার্থাভন সাটনারকেও। এর আগের যুদ্ধ তিনি দেখেছেন। তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল সুন্দর ছবির মত দেশের ধ্বংসস্তূপ, মানুষের আর্তনাদ, অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা। কল্পনায় তিনি দেখতে পেলেন সে আর্তনাদ, সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করতে আসছে, পৃথিবীর বুকে নেমে আসছে মৃত্যুর করাল ছায়া। কিন্তু এ যুদ্ধের ভয়াবহতা কিভাবে দূর করা যায়? একটা উপায় আছে বৈকি! শান্তি আন্দোলন। শান্তিকামী দেশগুলো যদি একসঙ্গে মিলে মিশে শান্তির প্রস্তাব আনে, যদি বিচ্ছিন্ন জাতিকে শোনায় মিলনের মন্ত্রগান, যদি মানুষের মন থেকে মুছে দিতে পারে বিদ্বেষ আর বৈরীভাব, তাহলে ক্ষয়িষ্ণু সমাজ আবার পূর্ণ হয়ে উঠবে, পৃথিবী হয়ে উঠবে ছবির মত সুন্দর—এ ধারণা কেবল বার্থার ছিল না, ছিল বার্থার মত নির্বিরোধ, নির্বিবাদ বহু মানুষের। এঁদের সকলের চেষ্টায় শান্তিসম্মেলন বসল লণ্ডনে। বার্থা ভাবলেন সম্মেলনে সকলের সমবেত শুভ ইচ্ছার এই যে প্রকাশ, একে যদি মানুষের মনে ছড়িয়েও দেওয়া না যায়, যদি চিন্তাহীন মানুষকে জাগিয়ে তোলা না যায় তাহলে এ সম্মেলনের সার্থকতা কোথায়? এগিয়ে চললেন বার্থা। যুদ্ধের বীভৎসতা আর বিপর্যস্ত পরিস্থিতিকে আরোও ভালভাবে জানবার জন্যে তিনি যুদ্ধস্থানগুলো পরিদর্শন করলেন। সামরিক কর্মচারী, সৈনিকদের জবানবন্দী নিলেন, সাক্ষাৎ করলেন বড় বড় সেনাপতির সঙ্গে। যাঁরা আত্মীয় পরিজনহীন হয়ে এই বিশাল পৃথিবীতে নিঃসহায় হয়ে দিন গুনছেন, তাঁদের মনের ব্যথাকে জানলেন। দেখলেন ঝলমল শহরের, বিলাসবহুল জীবনের, নিরালা গ্রামের আর নিরবিচ্ছিন্ন জীবনের ধ্বংসস্তূপ। এই সমস্ত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যোগ করলেন তাঁর চিন্তাশীল সমবেদনা। বাস্তব অভিজ্ঞতাগুলো সমবেদনার রসে পরিসিক্ত হয়ে রূপ পেল ভাষায়—Lay down your arms. বইটির পাতায় পাতায় ফুটে রয়েছে তাঁর মননশীলতা। বলা বাহুল্য তাঁর মননশীলতার প্রকাশ সমস্ত পৃথিবীকে সচকিত করে তুলল। অভিভূত হলেন ধ্যান তপস্বী মনীষীরা মুগ্ধ হলেন অ্যালফ্রেড নোবেল।

এদিকে অ্যালফ্রেড নোবেল বয়সের সীমা অতিক্রম করেছেন। তিনি বৃদ্ধ, অসুস্থ। দুর্ধর্ষ, উন্মত্ত

মানুষেরা তাঁর আবিষ্কৃত ডিনামাইট সভ্যতা সম্প্রসারণের কাজে লাগায় নি, তাকে তারা আত্মধ্বংসের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। বৈজ্ঞানিক নোবেল এতে বিরক্ত, ক্ষুব্ধ। তিনি বুঝলেন মানুষের বিবেক এবং চেতনাশক্তিকে যদি জাগানো যায়, তাহলে মানুষ আত্মধ্বংসী হবেনা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার গুলোকে নিয়ে সে জাতিকে ধ্বংস করতে এগিয়ে যাবেনা। এ নিয়ে দিনের পর দিন তিনি আলোচন করলেন বার্থার সঙ্গে। বুঝলেন পারস্পরিক সহানুভূতি ছাড়া পৃথিবীর প্রগতি সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারবে না। এ সহানুভূতির ইচ্ছে বাড়ানো যায় মানুষকে অনুপ্রেরণা দিয়ে। আর এ অনুপ্রেরণা জাগানো সম্ভব পুরস্কারের মধ্য দিয়ে। প্রবর্তন করলেন বিখ্যাত নোবেল পুরস্কার। এ পুরস্কারের পেছনে তিনি তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্যকে দান করলেন। প্রতি বছর বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মননশীলরা নোবেল পুরস্কারে পুরস্কৃত হন। পুরস্কার পান শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, যিনি পৃথিবীর অরাজকতা দূর করে শান্তি ও সৌহার্দ্য আনবার জন্যে বিশেষভাবে সচেষ্ট। মানবিকতার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক নোবেলের যে অবিস্মরণীয় অবদান তার পেছনে ছিল এক মহীয়সী মহিলার স্নিগ্ধ প্রয়াস। তিনি হচ্ছেন ব্যারনেস বার্থাভন সাটনার যিনি হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীকে শান্ত করবার প্রয়াসে প্রথম নোবেল শান্তি পুরস্কার পান ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে। মানবিকতার ইতিহাসে নোবেল পুরস্কার উজ্জ্বল হয়ে আছে, কিন্তু মানুষের মন থেকে এই মহিলার অবদান ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে।

মানুষ না উটপাখি ?

বিশ্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়

(সত্য ঘটনা)

কদিন হতেই এ্যাসটানিও পেড্রো দা সিলভার পেটে খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল। বয়স হল তাঁর অনেক প্রায় সত্তর। শেষ পর্যন্ত হাসপাতালেই এলেন এ্যাসটানিও পেড্রোদা সিলভা। পেটের যন্ত্রণাটা কমছে না কিছুতেই।

ব্রাজিলের দোয়া পেসোয়া হাসপাতালে ৫ই জানুয়ারী (১৯৬৬) তাঁর পেটে অস্ত্রোপচার করা হল এক এক করে অনেক জিনিসই বেরিয়ে এল তাঁর পেট হতে। ২৮০টি পেরেক, ২২ খানি ব্লেড, আরও অনেক কিছু। না কোনো কাঁচি দেখা যায়নি তাঁর পেটের মধ্যে। কাঁচি কি গেলেন নি তিনি ?

হাসপাতালের ডাক্তারবাবুরা তাঁর কাছ থেকে শুনলেন এক মজার কথা। এ্যাসটানিও তরুণ বয়সে অনেক ধারালো জিনিস খেয়ে 'উটপাখি মানুষ' উপাধি লাভ করেছিলেন। তবে তিনি কাঁচি কখনও গলাধঃকরণ করবার চেষ্টা করেন নি। কাঁচি যদি পেটে গিয়ে কোনমতে একবার হাঁ করে তবে তাঁর হাঁ করা হয়তো একদিন বন্ধও হয়ে যেতে পারে চিরদিনের মত। এই ভয় ছিলো তাঁর। একবার তিনি একটা ঘড়ি গিলে ফেলেছিলেন। সে ঘড়িটার খোঁজ কিন্তু ডাক্তারবাবুরা তাঁর পেটে কোথাও পাননি।

সত্যি ভদ্রলোক মানুষ না উটপাখি ?

সাপ মানুষের শত্রু ও বন্ধু

(প্রফেসর এস্ পিগুলেভস্কি)

সাপকে সবাই ভাবে দুষ্টবুদ্ধি আর ধূর্ততার প্রতিমূর্তি। সাপ নাকি জন্তুজানোয়ার ও মানুষ সকলেরি নির্মম শত্রু, তাকে কিছুতেই তুষ্ট করা যায় না। মাঠের মাঝখানেই হক কি বনের ভিতরেই হক, সাপের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে সাংঘাতিক কিছু ভাবাই যায় না।

কিন্তু এমন জানোয়ারও আছে যারা সাপ দেখে ভয় পায় না, বরং উল্টে তাদের আক্রমণ করে। এই সব সাহসী প্রাণীদের মধ্যে সেক্রেটারি পাখি, সাপখেকো ঈগল, বাজপাখি, বেজি, সজারু, ভাম, উদ্‌বেড়াল ইত্যাদির নাম করা যায়।

মানুষদের মধ্যেও যারা সাপ শিকার করে, তারা সর্বদা খুব মনোযোগ দিয়ে সাপের স্বভাব ও গতিবিধি লক্ষ্য করে। তার ফলে তারা অনায়াসে আর খুব দক্ষতার সঙ্গে সাপ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে পারে। ঠেকায় পড়লে সাপমাত্রই মানুষকে আক্রমণ করে। কেউ যদি ভুল করে সাপ মাড়ায়, কিম্বা সাপের বিশ্রামের ব্যাঘাত করে, বা তার পালাবার পথ বন্ধ করে, তা হলেই সাপ তাকে তেড়ে আসে।

নাতিশীতোষ্ণ বা গরম দেশের সব বিষাক্ত সাপই যে সমান সাংঘাতিক, একথা মনে করলে ভুল হবে। ঠাণ্ডা দেশে, উত্তর বা মধ্য ইউরোপে, উত্তর এশিয়াতে বা উত্তর আমেরিকায় গরম দেশের মতো অত বেশি আর অত বড় বিষাক্ত সাপ সচরাচর দেখা যায় না। কাজেই সাপের কামড়ের কথা এসব দেশে অনেক কম শোনা যায়, সাপের বিষের তেজও কম।

গরম দেশের সাপ দেখতেও বড়, আবার নানান্ জাতেরও দেখা যায়। দক্ষিণ এশিয়ার আর আফ্রিকার কোনো কোনো বিষাক্ত ভাইপার লম্বায় দেড় মিটার অবধি হয়। দক্ষিণ আমেরিকার বুশমাস্টার সাপ তিন চার মিটার লম্বা হয়। এ সব দেশে নানা রকমের সাপ থাকাতে, অনেক বেশি সাপের কামড়ের গল্প শোনা যায়।

অবিশ্যি তাই বলে সব বিষাক্ত সাপকেই মেরে ফেলা কোনো কাজের কথা নয়। যে সব জানোয়ার শস্যক্ষেত্রের ফসল নষ্ট করে, তাদের অনেকগুলোকেই সাপে মারে। যে দেশে খুব বেশি ইঁদুরের উৎপাত, অথচ সাপের সংখ্যা কম, সেখানে সাপ মারাটা কিছু বুদ্ধির কাজ নয়। সাপের উপকারিতা বা অপকারিতা সম্বন্ধে নানান্ দেশের নানান্ মত।

উপকারিতা

যে দেশে অনেক বড় বড় সাপ দেখা যায়, সেখানেও তাদের বিষ দিয়ে অনেক কাজ হয়। কোনো

জানোয়ারের রক্তস্রোতের সঙ্গে একটুখানি সাপের বিষ মিশলে তার সমস্ত দেহযন্ত্র সজাগ হয়ে ওঠে, নতুন নতুন শক্তি দেখা দেয়। তারপর সেরে উঠলে, সাপের বিষে আর ঐ জানোয়ারটার কোনো অনিষ্ট হয় না। তার রক্তে এমন ক্ষমতা জন্মায় যে নতুন করে, এমন কি খুব বেশি করে সাপের বিষ ঢুকলেও কোনো ক্ষতি হয় না। শরীরের মধ্যে অনেক দিন ধরে একটু একটু করে সাপের বিষ গেলে, আপনা থেকেই ঐ বিষ প্রতিরোধের ক্ষমতা জন্মায়। তারপর ঐ জানোয়ারের রক্ত দিয়ে সাপের কামড়ের খুব ভাল ওষুধ তৈরি করা যায়। সেই ওষুধ দিয়ে কত মানুষকে গুরুতর বিপদ থেকে, এমন কি মৃত্যুর হাত থেকেও বাঁচানো যায়।

এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে সাপ মানুষের অনেক উপকারও করে, অবিশ্যি নিজের ইচ্ছায় নয়। এ ছাড়া কতকগুলো এমন সাংঘাতিক রোগ আছে যা সহজে সারে না, কিম্বা হয়তো অন্য কোনো ওষুধে সারেই না। সাপের বিষের ওষুধ এসব ক্ষেত্রে খুব কাজ দেয়।

ওষুধ হিসাবে সাপের বিষের ব্যবহার সম্প্রতি অনেক দেশেই শুরু হয়েছে। তার মধ্যে সোভিয়েট যুক্ত রাষ্ট্রও আছে। এ ওষুধের খুব ভালো ফল দেখা গেছে। সাপের বিষ থেকে ওষুধ তৈরী করতে হলে, প্রথমে বিষটাকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় ব্যবহারের উপযোগী করে নিতে হয়। তারপর খুব সাবধানে উপযুক্ত ডোজ বা প্রয়োগের পরিমাণ ঠিক করতে হয়। সাপের বিষের ওষুধ ঠিকভাবে পড়লে তার ফল কখনো খারাপ হয় না।

তবে এ কথাও মনে রাখা দরকার যে এই ওষুধের প্রতিক্রিয়া সকলের বেলায় সমান নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কোনো গুরুতর প্রতিক্রিয়া হয় না। কিন্তু এমন লোক-ও আছে, যদিও সংখ্যায় তারা খুব কম, যাদের শরীরে এতটুকু সাপের বিষের ছোঁয়া লাগলেই গুরুতর উপসর্গ দেখা দেয়।

ব্যক্তিগত ব্যবহার

যাদের যকৃতের বা মূত্রাশয়ের দোষ আছে, কিংবা যারা হৃদ্‌রোগে ভোগে, তাদের সাপের বিষের ওষুধ দেওয়া যায় না। ওদিকে আবার অনেক গুরুতর রোগের চিকিৎসায় সাপের বিষ যে অত্যন্ত উপকারী তাও দেখা গেছে। এসব অসুখের মধ্যে হাঁপানি, হিমোফিলিয়া অর্থাৎ যে রোগে রক্ত জমবার ক্ষমতা নষ্ট হয়, ফলে রক্ত পড়া থামতে চায় না, কিম্বা সন্ন্যাস রোগ বা স্নায়ুর নানান্ ব্যাধি।

সাপের বিষ দিয়ে চিকিৎসা করতে হলে, প্রত্যেকটি রোগীকে ভালো করে পরীক্ষা করে নিতে হয়। কোথাও হয়তো ডোজ বাড়াতে হয়, কোথাও সাবধানে কমাতে হয়। ক্বচিৎ এমন-ও হয় যে প্রথম ডোজের পর আর দ্বিতীয় ডোজ দেওয়াই যায় না। হাসপাতালের রোগী হলে সাহস করে চিকিৎসা চালানো যায়। ইনজেক্সনগুলোর মাঝখানে সময়ের ব্যবধান কম রাখা হয়। কিন্তু বাইরের রোগী হলে নিখুঁতভাবে নিয়ম মেনে চলাই ভালো।

এ চিকিৎসায় সর্বদাই ওষুধপত্র ছাড়াও নানান্ পুষ্টিকর পথ্যের ব্যবস্থা থাকা দরকার। তাছাড়া এই ওষুধের সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোনো ওষুধ দেওয়া উচিত নয়, পাছে ওষুধগুলো পরস্পর-বিরোধী হয়। তাহলে দুটো ওষুধের মধ্যে কোনোটাই ফল দেবে না। সাপের বিষের চিকিৎসা বড় সময় নেয়;

রোগের সব লক্ষণ দূর হতে বেশ কয়েক মাস লেগে যায়।

রকমফের

ভারত, ইন্দোনেশিয়া, আফ্রিকা আর দক্ষিণ আমেরিকার কোনো কোনো অঞ্চলে অনেক সময় বিষাক্ত সাপ কিম্বা হেলে সাপ লোকের বাড়িতে অনিমন্ত্রিত অতিথি হয়ে ঢুকে পড়ে। ইন্দোনেশিয়ার জঙ্গলের ধারের গ্রামের বাসিন্দারা ক্ষেতে কাজ করতে গেলে, বড় বড় অজগর সাপ গ্রামবাসীদের বাড়ির পোষা জন্তুজানোয়ারের লোভে এসে আশেপাশে ঘোরে। মাঝে মাঝে শিকারের খোঁজে তারা ঘরের মধ্যেও সেঁধোয়। সে সময় বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়ে থাকলে মুস্কিল।

দক্ষিণ আমেরিকায় গ্রামাঞ্চলে যারা থাকে, সর্বদাই তাদের জঙ্গলের সঙ্গে লড়াই করতে হয়। গাছ কেটে জমি পরিষ্কার করে নিলেই,জঙ্গল আবার সেই জায়গাটুকুকে গ্রাস করতে চায়। এখানে জঙ্গল বলতে শুধু গাছপালা বোঝাচ্ছে না ; তার সঙ্গে ভাইপার জাতীয় নানারকম বিষাক্ত সাপও ধরে নিতে হবে।

সুখের বিষয় বিষাক্ত সাপদের মানুষ ছাড়াও অন্য শত্রু আছে। মুসুরানা বলে এক জাতের সাপ আছে, তাদের নিজেদের বিষ নেই, কিন্তু তারা ভাইপার ধরে খায়। আর্মাডিলোদের সারা গা ছোট ছোট হাড়ের চাকতি গিয়ে মোড়া, পেটের কাছের চাকতিগুলোর কিনারা আবার বেজায় ধারালো। সাপ দেখলেই আর্মাডিলো তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে, তাকে চেপে ধরে, নিজের গায়ের বর্মের ধারালো কিনারা দিয়ে ঘষতে থাকে। তারপর বিষাক্ত ভাইপার-ই বা কি আর সাংঘাতিক সারারাক সাপ ই বা কি, সবাইকে চিপে মেরে আর্মাডিলো তাদের ধীরে সুস্থে গিলে ফেলে।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সবুজ গেছো অ্যাভারের ভারি দুর্নাম। গাছে চড়ে সবুজ পাতার মধ্যে প্রায় অদৃশ্য হয়ে লুকিয়ে থাকে। এদের সবচেয়ে নিষ্ঠুর শত্রু হল ছোট ছোট নেউল। তারা ভারি চটপটে হয় ; সোজাসুজি সাপকে তেড়ে গিয়ে, কুট করে কামড়ে গা থেকে মুণ্ডুটাকে আলাদা করে দেয়।

আফ্রিকার লম্বা ঠ্যাং সেক্রেটারি পাখি কেউটে আর ভাইপারের যম। এই পাখিগুলোর প্রধান খাদ্যই হল সাপ। সাপের খোঁজে ওরা আফ্রিকার রোদে পোড়া শুকনো ডাঙার উপর উড়ে বেড়ায়। সাপ দেখলেই সাঁৎ করে তার কাছে নেমে পড়ে, কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে যেন কত দেমাক! সাপটা এদিকে শরীরটাকে পাকিয়ে পাকিয়ে একটা ক্ষুর মতো করে নিয়ে, মাটিতে মাথা গুঁজে হিস্ হিস্ শব্দ করতে থাকে। পাখি তাকে থোড়াই কেয়ার করে। সে একটি লাথি দিয়ে সাপ মেরে, তাকে তারিয়ে তারিয়ে খেয়ে ফেলে।

সোভিয়েট দেশের সাপ

ককেসাস, মধ্য এশিয়া আর সোভিয়েতের সুদূর পূর্বাঞ্চল বাদ দিলে, সারা সোভিয়েট রাষ্ট্রে একমাত্র ভাইপার ছাড়া অন্য কোনো বিষাক্ত সাপ বড় একটা দেখা যায় না। পিঠে আঁকাবাঁকা গাঢ় রঙের দাগ দিয়ে ভাইপার চিনতে হয়। তবে সব ভাইপারের গায়ে আবার দাগ থাকে না। কারো পিঠে কালো দাগ, কারো পিঠে মেটে দাগ ; কারো দাগ-ই নেই, সাধারণ ঢোঁসো সাপ বলে ভুল হয়। যতদূর মনে হয় সাধারণ ভাইপারের কামড়ে কেউ মরে না, কিন্তু বেজায় যন্ত্রণা।

ভাইপারের প্রধান শত্রু হল সজারু। সাপ দেখলেই সজারু গুটিগুটি তার কাছে গিয়ে, তাকে ধরে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে। কামড়াল কি কামড়াল না সেদিকে ভ্রূক্ষেপ-ও নেই। পরীক্ষা করে দেখা গেছে একটা সজারুকে বিষাক্ত সাপে ত্রিশ বার কামড়ালেও তার গায়ে বিষের কোনো লক্ষণ চোখে পড়ে না। মাঝে মাঝে বুনো বরাহের কি পোষা শূওরের, এমন কি বেড়াল ও ভেড়ার পেটেও অর্ধেক হজম করা সাপ পাওয়া যায়। এরা মাঝে মাঝে ভাইপারও খায়।

সোভিয়েট দেশের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের দক্ষিণে এমন সাপ আছে যারা সাধারণ ভাইপারের চেয়ে মাপেও বড় আর বিষাক্তও বেশি। ককেসাসে অনেক বিষাক্ত ভাইপার, কাজনাকভ ভাইপার আর আর্মিনিয়াতে রাড্ডে ভাইপার দেখা যায়। স্টেপ প্রান্তরেও ভাইপার আছে। মাঝে মাঝে শিংওয়ালা ভাইপার দেখা যায়।

লোকে আগে সাপের বিষয় যতটা জানত, আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে, এখন অনেক বেশি জানে। ক্রমে ক্রমে সাপদের শুধু অনিষ্টকারী প্রাণী বলে নয়, মানুষের বন্ধু বলেও চেনা যাবে।

কিষ্কিন্ধা থেকে এল স্কন্ধ-কাটা

ঝুমুর চৌধুরী

কিষ্কিন্ধা থেকে
এল স্কন্ধ-কাটা:
চোখ দুটো বুকে তার
নাক নেই মুখে তার
গোঁফ যেন ঝাঁটা
হাত দুটো যেন ঠুটো
তার ল্যাংড়া হাঁটা॥

নিস্কন্ধ বলে
নিশ্চিন্ত পুরে
নিরামিষ পাঁঠা আছে
তাল গাছে সাঁটা আছে,
পাবে মাটি খুঁড়ে।
পেলে ভাই গান গাই
আমি বিন্ধ্য চুড়ে॥

সব শুদ্ধ ভয়ে
যেন জব্দ ভারি॥
যারা ছিল শতবাক
আজ তারা হতবাক
মুখখানা হাঁড়ি।
গাধা ডাকে ভাই ভাগে
নিস্কন্ধ বাড়ি॥

আমাদের দেশ

সুবোধকুমার চক্রবর্তী

আকাশে দিনের আলো তখনও ছিল। আমরা তাই একটি মুহূর্তও নষ্ট করলাম না। ঘণ্টু ও পুপুর হাত ধরে বেরিয়ে পড়লাম সমুদ্রের দিকে।

মন্দিরের দেওয়ালের ধার ঘেঁষে মাতৃতীর্থের রাস্তা নেমে গেছে। সেখানে একটা পাথরের বাঁধানো চত্বর, তা থেকে ধাপ নেমেছে সমুদ্রের জলে। বড় বড় পাথরে আর প্রাচীরে ঘেরা এই স্থানটুকু। বড় বড় ঢেউ এসে সেই পাথরে আছড়ে পড়ছে, স্নানের ঘাটে জল ঢুকছে কলকল করে। সেই জলে কোনো, টান নেই। মেয়েরাও স্নান করছে। পরশুরাম এই ঘাটে স্নান করে মাতৃহত্যার পাপমুক্ত হয়েছিলেন, সেই থেকে এই ঘাটের নাম হয়েছে মাতৃতীর্থ।

সমুদ্রের জলে একটা বিরাট পাথর আছে। উঁচু রাস্তা ছেড়ে নিচে নেমে বালি আর পাথর পেরিয়ে তরঙ্গোচ্ছ্বাসের ফেনা ডিঙিয়ে আমরা সেই পাথরের উপরে গিয়ে উঠলাম।

কি অপূর্ব দৃশ্য! সম্মুখে অনন্ত জলরাশি অসীমে গিয়ে মিলেছে। ডান দিকে সমুদ্রের বালি পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করছে। বামে কন্যাকুমারিকা মন্দিরের দেওয়াল পেরিয়ে ছোট ছোট দুটো পাহাড় ডিঙিয়ে সমুদ্রের বিশাল বিস্তার।

সবাই বলে, তিন সমুদ্র এখানে মিলেছে—বঙ্গোপসাগর আর আরব সাগর মিশেছে ভারত মহাসাগরের সঙ্গে। কিন্তু সাগর তো একটাই, এক এক স্থানে তার এক এক নাম।

খানিকটা দূরে সমুদ্রবেলায় খেলা করছিল কয়েকটি ছেলে মেয়ে। খালি পায়ে জলের কাছে তারা বিপর্যস্ত ভাবে দাপাদাপি করছিল। ঢেউ এসে তাদের পায়ের উপরে আছড়ে পড়ছিল। বালির উপরে গড়িয়ে পড়ছিল কেউ। তাদের হাসির শব্দ বাতাসে ভেসে আসছিল অল্প অল্প।

পুপু বলল, 'চলনা ছোটকা, আমরাও ওদিকে যাই।'

বড় পাথরখানার উপর থেকে ঘণ্টু তাড়াতাড়ি নেমে এল।

আমি বললাম, 'তার চেয়ে এস আমরা সূর্যাস্ত দেখি।' পশ্চিমের আকাশ তখন নানা রঙে ভাস্বর হয়েছে। বিশ্বকর্মার রঙের বাক্সে এত রঙও আছে! কিন্তু সূর্য কোথায়! একটু আগে যে সূর্যকে দেখেছি মেঘের আড়ালে, হঠাৎ সেই বেরসিক কোথায় অন্তর্হিত হল দেখতে পাইনি। আকাশ তার নিত্যকার প্রসাধনের কোন ত্রুটি করেনি, সমুদ্রের উজ্জ্বল তরঙ্গে দেখলাম তার প্রতিবিম্ব। কিন্তু যার জন্যে এই প্রসাধন সে তা দেখল না।

আমরা পাথরের উপর থেকে ধীরে ধীরে সেই বালির পাহাড়ের দিকে এগোলাম। পাথরে

বাঁধানো লম্বা রাস্তা ডানদিকে খানতিনেক বড় বাড়ি। একটি রেস্ট্ হাউস, একটি কেপ হোটেল, আর একটি বোধ হয় রাজার গেস্ট্ হাউস বা ঐরকমের কিছু।

একসময় আমরা রাস্তা ছাড়িয়ে বালির পাহাড়ে উঠতে লাগলাম। বেশি দূর উঠতে সাহস হল না। পাহাড়ের পিছনে শুধু আকাশ দেখতে পাচ্ছি, আর কিছু আছে কিনা জানি না।

ঘণ্টুই আগে আগে যাচ্ছিল, হঠাৎ চিৎকার করে উঠল। মনে হল বুঝি বালির ভিতরে সে ঢুকে যাচ্ছে। পুপু ছুটে গেল, আমিও এগিয়ে গেলাম। দেখলাম যে আনন্দে সে চিৎকার করেছে। আর একটা নারকেল গাছের পাতা ধরে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এমন দৃশ্য কোথাও দেখিনি। পুরো গাছটা ডুবে আছে বালির তলায়, শুধু মাথার কয়েকটা পাতা বালির বাইরে জেগে আছে। এমন গাছ একটি দুটি নয়, অনেকগুলো গাছ এখন বালির নিচে। এই বালির পাহাড় সরে গিয়ে গাছগুলো আবার বেরিয়ে পড়বে কিনা জানিনা।

ঝিরঝিরে বাতাসে খানিকটা বালি উড়ল। পূর্বের আকাশ থেকে ছায়া নামছে। আমরা এবারে শহরের দিকে ফিরলাম।

একটা কফির দোকানে বসে আমরা কফি আর ডোসা খেলাম। তার পরে গেলাম মন্দির দর্শনে।

ছবি আর ফুলের দোকান পেরিয়ে তোরণের নিচে দিয়ে আমরা মন্দিরের দরজায় এলাম। প্রহরী বলল, পুরুষদের জামা খুলতে হবে। খালি গায়ে মন্দিরে প্রবেশের নিয়ম সারা ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে। শিশুরা হাফপ্যান্ট পরে ভিতরে যাচ্ছে, কিন্তু বালকদের কোমরে একটা গামছা জড়িয়ে দিতে হচ্ছে।

একজন ব্রাহ্মণ আমাদের ভিতরে নিয়ে গেলেন—সোজা পথে না গিয়ে একটু ঘুরে! বললেন, এইটিই মন্দিরের মূল দ্বার, বছরে একদিন এই দ্বার খোলা হয়।

এই দরজা পেরিয়ে মন্দিরের প্রাঙ্গন। তারপর ধাপ ধাপ সিঁড়ি নেমে গেছে সমুদ্রের জলে। সামনে বিবেকানন্দ রক্স্। সাঁতরে সমুদ্র পার হয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ঐ পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছিলেন, সেখান থেকে দেখেছিলেন ভারতবর্ষকে। তার পিছনে অনন্ত-অসীম, বঙ্গোপসাগর অন্ধকারে আবৃত হয়ে আছে।

ভিতরে যেতে যেতে ব্রাহ্মণ বললেন, 'এই দ্বার বন্ধ করে রাখবার একটা কারণ আছে। দেবীর কপালে আছে একখণ্ড হীরে, তার দ্যুতি দেখা যায় শত যোজন দূর থেকে। পুরাকালে এই হীরের আলোকে লাইট হাউসের আলো মনে করে নাবিকেরা জাহাজ ভুল পথে চালিয়ে বিপদে পড়েছে।'

প্রদীপ আর ফুলের মালায় মন্দিরের অভ্যন্তর সুসজ্জিত। ধূপ দীপ বাদ্য ও উদাত্ত মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে আমরা কন্যাকুমারীকে দেখলাম। চন্দনচর্চিতা কুঙ্কুম রঞ্জিতা বালিকা মূর্তি, বসনে ভূষণে মাল্যে ও সুগন্ধে তাঁর অধিবাস তখন সম্পন্ন হয়েছে। শিবের আগমনের প্রতীক্ষায় দেবীর মোহিনী মূর্তি।

রামেশ্বরে যেমন এখানেও তেমনি, দেবীর কাছে যাবার রীতি নেই। দূর থেকে তাঁকে দেখতে হবে।

ব্রাহ্মণ বললেন, 'সকালের দর্শন অন্যরকম। বিবাহ লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু শিব এলেন না। ঃখে ও ক্ষোভে দেবী তাঁর গলার মালা পুষ্পাভরণ ছিঁড়ে ফেললেন, খুলে ফেললেন মহার্ঘ বসন ভূষণ। ীবন যাঁর ব্যর্থ হল, কী প্রয়োজন তাঁর বাইরের আড়ম্বরে। দেবীর সেই অরক্ষণীয়া কুমারী মূর্তি আমরা কালের দর্শনে দেখি।

মন্দির থেকে বেরিয়ে আসবার ইচ্ছা আমাদের হচ্ছিল না, তবু আমরা বেরিয়ে এলাম।

ফেরার পথে ঘণ্টু আমাকে প্রশ্ন করল, 'স্বামী বিবেকানন্দ এখানে কেন এসেছিলেন ছোটকা?'

স্বামীজীর কথা মনে পড়ল। একদিন ভিক্ষা করে তিনি কন্যাকুমারী এসেছিলেন। রাজা ভাস্কর সেতুপতি মাদুরায় তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন। গুরুকে সিকাগোর সর্বধর্মমহাসভায় পাঠাবার ব্যয়ভার বহন করতে তিনি রাজী ছিলেন। কিন্তু স্বামীজী ভিক্ষা করে পাথেয় সংগ্রহ করে কন্যাকুমারী চলে এলেন। তাঁর ইচ্ছা হল যে সমুদ্রের মধ্যে ঐ পাহাড়ে বসে ভারতকে দেখবেন।

কিন্তু ঐ পাহাড়ের চূড়ায় বসে ধ্যানমগ্ন নেত্রে তিনি ভারতের অন্যরূপ দেখলেন ঐ যে ভুখা মূর্খ ভারতবাসী, পশুর মতো ওরা জীবন যাপন করছে। সভ্য মানুষ শত শত বৎসর ওদের রক্ত খেয়ে ওদেরই পদদলিত করছে দু পা দিয়ে। তিনি ভাবলেন, এদের দর্শন শেখাবার চেষ্টা কি পাগলামি নয়! খালি পেটে কি ধর্ম হয়!

বিবেকানন্দ বুদ্ধ হলেন ঐ পাহাড়ে বসে।

বিবেকানন্দ আজ নেই, কিন্তু নিচু নিচু মাথা কাটা পাহাড় দুটো আছে। চারিদিকের ঢেউ এসে অবিরাম আক্রমণ করছে সে দুটোকে। জব্বলপুরের মার্বল পাথর হলে ক্ষয়ে এতদিনে নিঃশেষ হয়ে যেত। বিবেকানন্দ নাম বলেই বুঝি তাঁরই মতো অটল আর অক্ষয় হয়ে আছে।

ঘণ্টুর প্রশ্নের উত্তরে আমি সংক্ষেপে বললাম, 'তীর্থ করতে।'

তারপর আর একজন বাঙালীর কথা মনে পড়ল। প্রায় পাঁচশো বছর আগে তিনিও পাগলের মতো ভাবাবেশে বিভোর হয়ে নাচতে নাচতে এই কন্যাকুমারীতে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তার সঙ্গে ছিল গোবিন্দদাস নামে তাঁর এক অনুচর। বিশ্ববিখ্যাত তিনি, তাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। 'নদের নিমাই', বাঙলার গৌরাঙ্গ তিনি। পুরী থেকে বেরিয়ে তীর্থের পর তীর্থ-দর্শন করে দক্ষিণের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এসেছিলেন। গোবিন্দদাস লিখেছেন—

তাম্রপর্ণী পার হয়ে সমুদ্রের ধারে।
প্রভু কন্যাকুমারী চলিল দেখিবারে॥
কেবল সিন্ধুর শব্দ শুনিবার পাই।
পর্বত কানন দেশ নাহি সেই ঠাঁই॥

হু হু শব্দে সমুদ্র ডাকছে নিরন্তর।
কি কব অধিক সেথা সকলি সুন্দর॥
দেখিবার কিছু নাই তথাপি শোভন।
সেখানে সৌন্দর্য দেখে শুদ্ধ হয় মন॥

আজ অনেক পরিবর্তন হয়েছে কন্যাকুমারীর। কিন্তু সৌন্দর্য লাঘব হয়নি এতটুকু। কন্যাকুমারী আসা আমাদের সার্থক হয়েছে।

ঠোঁট কাটা

প্রভাকর মাঝি

খুব যে তোদের বুকের পাটা, চেনা আছে সব মিঞাকে,
বড়ফাটাই মুখে কেবল, কাজের বেলা মিলবে কাকে ?
পিছন থেকে ফোড়ন কাটিস, উস্কানিতে খুব বাহাদুর,
সামনে শুনি 'স্যর' 'স্যর' বাৎ শালুক চেনে গোপালঠাকুর।
বাইরে কেবল গুজুর ফুসুর —ন্যায্য কথা বলতে হলে,
বাঘের মুখে পড়িস যেন, কেন্নো হয়ে যাস সকলে।
আমি ওসব সইতে নারি, মেনিমুখো স্বভাব কি এ—
আটাশ বছর চাকরি হল বুক চিতিয়ে শির উঁচিয়ে।
খোসামুদি করতে কারুর সায় দেবে না কখনও মন,
ঠিক ঠিক কাজ না পেলে হ্যাঁ, বলতে পারো তুমি তখন।
আসল কথা নিজের কাছে নিজের থাকা চাই যে খাঁটি,
কখনও ভয় পাই-নে যে তাই বলতে গিয়ে হক কথাটি।
ফালতু কোনো অজুহাতে কেউ যদি চোখ রাঙাতে চায়,
বান্দা জুলুম সইবে না তা, চাকরি করি ডাঁটের মাথায়।
সেদিন যখন বড় বাবু মিছিমিছি তুম্বি করে,
গোপাল ভায়া, সাফ কথাটি দিই নি ছুঁড়ে মুখের পরে ?
ঠোঁট কাটাকে সারা আপিস তাই সমীহ করে দেখি,
ঘেন্না ধরে গেল রে ভাই, হেঁ হেঁ করার দিন আছে কি ?
রেখে ঢেকে কই না কথা, ভালোই বলো মন্দ বলো—
আমার কাছে কালো কালোই ধলো যারা থাকবে ধলো।
'কি রামবাবু; ব্যাপারটা কি ? উত্তেজিত হঠাৎ অতো ?'
'বড়বাবু-য়্যা ? না—না স্যর, কইতেছিলাম তারিখ কতো ?'

সাহিত্যিকের অন্তর্দৃষ্টি

ভাগবতদাস বরাট

নিছক গল্প নয়, সত্য ঘটনা। বন্য পশুরও যে স্বদেশ প্রীতি আছে, এ কাহিনী তারই উদাহরণ।

একবার এক বিখ্যাত সার্কাসদল লণ্ডন সহরে এসেছিল। বাঘ, সিংহ, হাতি, ঘোড়া প্রভৃতি জন্তুতে সার্কাস দল বেশ জম জমাট। সার্কাসের প্রধান আকর্ষণ বিশালকায় ভারতীয় হাতি 'যোজো'। সাগর পারে বিদেশে এই হাতীটি এসে মানুষের কাছে নতশির, শিশুদের খেলার সঙ্গী এবং সঙ্গীত ও বাদ্যের পরম অনুরাগী হয়ে পড়েছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন তার স্বভাবের পরিবর্তন দেখা গেল। তার মেজাজ গেল বিগড়ে। পূর্বের শান্তভাব আর রইল না। সে পাগলের মতো উন্মত্ত হয়ে উঠল। শিশুদের প্রতিও তার মন বিরক্ত। এক সপ্তাহের মধ্যে যোজো তিন বার তার প্রভুকে হত্যা করবার চেষ্টা করল। সুতরাং তার খেলা দেখানো বন্ধ করতে হল। কারণ সে লোক দেখলে খুবই উন্মত্ত হয়ে ওঠে। আবার তাঁবুতে আবদ্ধ থাকতে চায় না।

না, আর না। সার্কাস কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন যোজোকে মেরে ফেলতে হবে নচেৎ বিপদ।

সেদিন সারা সহরে যথারীতি বিজ্ঞপ্তি ছড়িয়ে পড়ল। এবং সেই সঙ্গে এ কথাও জাহির হল যে খেলার শেষে পাগলা হাতি যোজোকে হত্যা করা হবে। ফলে দর্শকের ভিড় জমল। পয়সা খরচ করে টিকিট কিনে অনেকে হাতি মারা দৃশ্য দেখবার আশায় উপস্থিত হল। অগণিত জনসমাগমে সার্কাস দলের তাঁবুটি ভরে উঠল। খেলা সুরু হল। এবং খেলা দেখানো শেষও হল। এবার যোজোকে হত্যা করা হবে।

যোজো কিন্তু এই সময় খুব অস্থির। শুঁড় তুলে খাঁচার মধ্যে সে ছুটাছুটি সুরু করল। কিছুতেই থামতে চায় না। দূরে অলক্ষ্যে ম্যানেজার রাইফেল উঁচিয়ে বসে রইলেন। যোজো নিশ্চল হলেই তার দিকে গুলি ছুঁড়বেন। উন্মত্ত হস্তী কিছুতেই চুপচাপ দাঁড়ায় না। বিপুল উত্তেজনায় ও চঞ্চলতায় অস্থির। ম্যানেজারের চোখে মুখে বিরক্তিকর ছায়া সুস্পষ্ট ভাবে ঘনিয়ে উঠল।

ঠিক সেই সময় একজন আগন্তুকের আবির্ভাব। লোকটি ম্যানেজারকে জানালেন—আপনি যোজোকে হত্যা করবেন না। আমি ওকে বুঝিয়ে শান্ত করে দেব।

ম্যানেজার তো আশ্চর্য। ভাবে, আরে এ লোকটা বলে কি? পাগলা হাতির মত পাগল হল নাকি? প্রশ্ন করলেন,—আপনার জীবনের জন্যে কে দায়ী হবে মশাই? তারপর আরও জানালেন,—আপনি তো এখুনি পাগলা হাতিকে হিতোপদেশ শোনাতে গিয়ে নিজেই চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবেন। এই কথার উত্তরে ভদ্রলোক তাঁর পকেট হতে আপন জীবনের দায়িত্ব গ্রহণের সরকারি সাক্ষ্যযুক্ত অনুমতি পত্র বের করে ম্যানেজারের হাতে দিলেন। তারপর ভদ্রলোক ম্যানেজারের সম্মতি পেয়ে যোজোকে বোঝাবার জন্যে তার খাঁচার মধ্যে প্রবেশ করলেন। যোজো তখন মত্তাবস্থায় খাঁচার মধ্যে ছুটোছুটি করছিল।

উপস্থিত জনতা ও সার্কাস পার্টির দল কৌতুক দেখার জন্যে উদ্‌গ্রীব। সহসা আগন্তুক ভদ্রলোকের কথা সকলের কানে গেল। আগন্তুক যোজোর কাছে যাবার পূর্বে সস্নেহে জানালেন,—'ক্যা হুয়া দোস্ত, মস্ত রহো বিলকুল ভয় নহি।'

যোজো এই কথার অর্থ বোঝে। সাগর পারের বিদেশে ইংরাজী ও পাশ্চাত্য নানা ভাষা শুনতে শুনতে তার মন স্বদেশের কথা শোনার আশায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। সেইজন্যেই তার উন্মত্ত ভাব। যোজো তখনই নিশ্চল হয়ে আগন্তুকের কথা শুনল। আগন্তুক আরও জানালেন,—'যে তুমহারা অন্নদাতা হ্যায়।' এ কথার পর হাতি একেবারে শান্ত হয়ে গেল।

আগন্তুক যোজোর কাছে গিয়ে তার শুঁড়ে ও বিরাট দেহে সস্নেহে হাত বুলালেন। আর হাতি শান্ত ভাবে মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তাঁবু ভরা অসংখ্য দর্শক বিস্মিত ও পুলকিত।

এবার ভদ্রলোক খাঁচা থেকে বের হয়ে মৃদু হেসে তাড়াতাড়ি সরে পড়লেন। যাবার সময় বলে গেলেন,—যোজো এখন লক্ষ্মী হয়েছে। শান্ত সুবোধ জানোয়ার সে। আর কারো কোনো অনিষ্ট করবে না।

ম্যানেজার উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।—তাইতো আগন্তুকের পরিচয়টা যে জানা গেল না। এই সময় তাঁর নজরে পড়ল হস্তস্থিত সরকারী ছাড়পত্রটির উপর। ম্যানেজার দেখলেন ঐ কাগজখণ্ডে আগন্তুকের পরিচয় লেখা আছে।

আগন্তুক ভদ্রলোকটির নাম রাডিয়ার্ড কিপলিং। ইনি তৎকালীন বিখ্যাত লেখক কিপলিং।
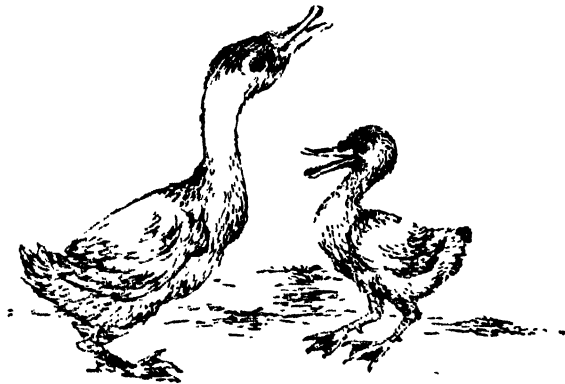
মেয়েটির নাম ছিল ফ্র্যাঙ্কি

বন্দনা গুপ্ত

ঐখানে ঐ ছোট্ট পাহাড়ের উপরে যেখানে দীর্ঘ ফার গাছের সারি ডালপালা নিয়ে সযত্নে ছায়ায় ঘিরে রেখেছে কবরটি—ঐখানে শুয়ে আছে শ্রান্ত ক্লান্ত চব্বিশ বছরের সুন্দরী মেয়ে ফ্র্যাঙ্কি। হ্যাঁ ঐ নামটিই সে পছন্দ করত খুব তাই বন্ধু বান্ধব মহলে ঐ নামেই সে নিজেকে জাহির করতে ভালবাসত।

কিন্তু কেন এই অকালে এমন সুন্দর ফুলটি ঝরে গেল—সমাধির চারিপাশের গাছ পালার দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে লেখা আছে সেই করুণ ইতিহাস। একটি মেয়ে কেমন করে আপনার জীবনকে তুচ্ছ করে বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কয়েকটি নিরীহ প্রাণকে আগুনের ভয়াবহ গ্রাস থেকে বাঁচাতে সেই কথা—. দেশ বিখ্যাত বড় বড় বীর ও আত্ম ত্যাগীদের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। এই অখ্যাত মেয়েটির বীরত্ব ও আত্মদান। তাই বুঝি প্রতিদিন সূর্যদেব দিনের আরম্ভে তাকে জানিয়ে যান প্রথম অভিবাদন তাঁর উষ্ণ স্পর্শে। সুদীর্ঘ ফার গাছের সারি আপন ডালপালা দিয়ে ঘিরে রেখেছে এই মমতাময়ী মেয়েটির সমাধিকে যেন নিবিড় ভালবাসায়। ছোট্ট বেলায় ফ্র্যাঙ্কি নেচে বেড়াত তার ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে এই পাহাড়ের কোলে তাই ফ্র্যাঙ্কি তাদের বড় আদরের।

মাত্র চব্বিশ বছর বয়স—সুন্দরী, দীর্ঘাঙ্গী মেরী ফ্রান্সিস্ হাউস্লী—আমেরিকার মেয়ে। সোনালী তার চুল, মুখখানা তার করুণামাখা। ১৯২৬ সনের ১২ই অক্টোবর উত্তর আমেরিকার টেনেসীতে জন্মগ্রহণ করে ফ্র্যাঙ্কি। বড় হয়ে টেনেসীর সেণ্টাল হাই স্কুলে যেতে আরম্ভ করে সে। তাদের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন মিস্ গ্রেশাম্। পড়াতে পড়াতে তিনি বলতেন কত বীর, কত দেশপ্রেমিকের কাহিনী—যারা দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য কত সহজে উৎসর্গ করেছে তাদের প্রাণ—ছোট্ট মেয়ে ফ্র্যাঙ্কির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত শুনে। এই সব কাহিনী তার বুকে গভীর দাগ কেটে রইল চিরদিনের মত।

১৯৫০ সালে বড় হয়ে ফ্রান্সিস্ হাউস্লী চাকরী নিলে এক ডাক্তারের ডিস্পেন্সারীতে। সেখানে চাকরী করতে করতে লেগে গেল কোরিয়ার যুদ্ধ, ডাক্তারদের সব ডাক পড়ল যুদ্ধক্ষেত্রে, ফ্যাঙ্কির গেল চাকরি। সে তখন আবেদন করল 'বিমান সেবিকা' পদের জন্য 'ন্যাশনাল এয়ার লাইন্স্. ইউ, এস্, এ'তে। পেয়েও গেল সঙ্গে সঙ্গে 'বিমান সেবিকা'র চাকরি।

সেদিন ছিল ১৪ই জানুয়ারী রবিবার। ফ্র্যাঙ্কি রওনা হল বিমানে নিউইয়র্ক থেকে তাদের গন্তব্যস্থল পেন্সিলভ্যানিয়ার দিকে। প্লেনে পাইলট তার সহকারী ও ফ্র্যাঙ্কি ছাড়া ছিল মহিলা ও শিশুসহ আরও পঁচিশজন যাত্রী। বিমান খানিকক্ষণ চলার পরেই যাত্রীগণ চিন্তাকুল নয়নে লক্ষ্য করল বাইরে প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডব। সুস্মিত মুখে ফ্র্যাঙ্কি যাত্রীদের সান্ত্বনা দিলে 'কোন ভয় নেই' যেন কিছুই হয় নি। মনের ভয় মুখে একটুও প্রকাশ করলে না সে পাকা ষ্টুয়ার্ডেস্ এর মত, যদিও মাত্র চার

বাড়ির পেছনের 'ঠাণ্ডাঘরটা' থেকে দারুন খটখট ঝনঝন আওয়াজ আসছে। ঠিক যেন বরফ কাটার শব্দ। ঘরটা এত ঠাণ্ডা যে ওখানে পেঙ্গুইন গজিয়েছে। ওখানে নাকি স্পেস্‌শিপ তৈরি করছে। গুপির ছোট মামা বাড়ি থেকে পালিয়ে ওখানে নাইটওয়াচম্যানের চাকরি নিয়ে লুকিয়ে আছে। ওদিকে তার ঘরে চোরাই গাড়ির নাম্বার প্লেট পাওয়া গেছে!

আজকাল ছোটমাস্টার আমাকে রোজ বিকালে মডেল বানাতে শেখান। গুপি একটা টেলিস্কোপ কিনেছে, তাই দিয়ে চাঁদ দেখছি। মনে হল যেন কি একটা চাঁদের দিকে গেল—বোঝাই নৌকার মত।

হঠাৎ আমাদের গলিতে সে কি দুপদাপ ক্যাঁও ম্যাও, জানালা দিয়ে দেখি স্রোতের মতো বেড়ালের পাল ছুটে বেরিয়ে আসছে। কিন্তু বেড়ালের পালের মধ্যে নেপো ছিল না। কিছুক্ষণ পরে গুপির ছোটমামা 'চুপ্পন্দর' ভিজে এসে হাজির। তার কাছে শুনলাম যে ঠাণ্ডাঘরের দেওয়ালে, গঙ্গার উপরে একটা চোঙার মুখ কাঠ দিয়ে আঁটা ছিল। তদন্ত করবার জন্য হাতুড়ি দিয়ে সেই কাঠ ভাঙ্গতেই সেকি খচমচ আর খামচা খামচি!)

(নয়)

ছোট মামা বলতে লাগলেন, 'সে যে কিসের খ্যাঁচম্যাচ সেটা বুঝতে আর বেশি দেরি লাগল না। ঝরনার মতো ঝুপ ঝাপ ধুপ ধাপ করে কেবলি বেড়াল পড়তে লাগল। মাছওয়ালারা একবার তাকিয়েই চুবড়ি তুলে দে দৌড়। আর যাবে কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে বেড়ালের নদীও ছুটল! আমিও কি আর সেখানে থাকি! পাঁইপাঁই লাগালাম। মাছের গন্ধেই বেড়াল বেরিয়েছে। আমি ছোটবেলা থেকে কড লিভার অয়েল খেয়ে মানুষ, আমাতে আর মাছেতে কতটুকু তফাৎ তোরাই বল্। ছুটতে ছুটতে ছুটতে ছুটতে কোনোমতে একটা নৌকাতে যদি বা উঠলাম্, সঙ্গে সঙ্গে এই কেঁদো কেঁদো গোটা পাঁচ বেড়াল। জলে নেমে সাঁতরে কোনো রকমে প্রাণটা হাতে করে ফিরেছি। পানু, আরো পান দে। আর সেই খোঁচা গোঁফ ভদ্রলোক কোথায় উঠে গেলেন? কে উনি?

তাকিয়ে দেখি, তাই তো ছোট মাস্টার কখন হাওয়া হয়ে গেছেন। গুপি বলল, 'ওর নাম তলাপত্র, এম্ এ পাশ, বড় মাস্টারের শাকরেদ্।' ছোট মামা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললেন, 'কি সর্ব্বনাশ! তবে তো নির্ঘাত ওঁর স্পাই! আর আমি কিনা ওঁর সামনে সব কথা ফাঁস করে দিয়েছি! ই—ই—স্! গুপি বলল, 'না, না, ছোটমামা তোমার সবতাতেই ইয়ে। উনি তোমার বিষয়ে কিছু জানেন না। তাছাড়া জানলেও কেউ তোমাকে এখন চিনতে পারবে না।'

ছোটমামা খুসি হয়ে দাড়ি চুমরোতে চুমরোতে বললেন, 'চিনতে পারবে না, না? বাব্বা, ক্যায়সা ছদ্ম বেশটা ধরেছি তাই বল্! ছোট মাস্টার ছেড়ে দে, সে তো আমাকে আগে কখনো দেখেই নি, আমার নিজের বাবাই চিনতে পারবে না দেখিস্। ভাবছি লোহা লক্কড়গুলো কিছু কিছু নিয়ে এসে কাছে রাখি। পানু, তোর খাটের তলায় কিছু রাখলে তোর আপত্তি আছে?'

আমি তো মহা মুস্কিলে পড়লাম। সেই যে কানু সামন্ত চোরের কথা বলে গেছিল, সেই ইস্তক রোজ রাতে মা একটা বেঁটে লাঠি দিয়ে আমার খাটের তলা খুঁচিয়ে দেখেন। অথচ ছোট মামা যদি ভাবেন আমি ওঁকে সাহায্য করতে চাই না, তা হলে চাই কি হয়তো চাঁদের দল থেকে আমার নামটাই ছাঁটাই করে দেবেন। তাই বললাম 'ইয়ে কি বলব, মানে, ইয়ে—' গুপি বলল, 'না, না এখানে কানু সামন্তর বড় বেশি আনাগোনা। কে ওদের এক টিকটিকি এসেছে দিল্লী থেকে, সে শুঁকে শুঁকে ফেরারি আসামী বের করে দেয়।'

ছোটমামা চটে গেলেন, 'আমি ফেরারি হতে পারি কিন্তু মোটেই আসামী নই। একটু তাড়াতাড়ি করতে

াইছিলাম কারণ অ্যামেরিকানরা এর মধ্যে তিনটে লোক পাঠিয়ে চাঁদে বেড় দিয়ে এসেছে, এবার নাকি লোক যাবে। এর পরে আর ওখানে জমিটমি পাওয়াই যাবে না।'

গুপি বলল, 'আমাদের হেডস্যার বলেছেন যে রাশিয়ানরা হয়তো এর আগেই ওখানে ঘাঁটি গেড়ে ফলেছে—।' আমি লাফিয়ে উঠে বললাম, 'হ্যাঁ, আমি তোর দূরবীন দিয়ে স্পষ্ট দেখেছি, জিনিসবোঝাই নৌকো াদে যাচ্ছে।'

গুপি বলল, 'না রে না, দূরবীণের কাঁচে কে একটা ছোট্ট খেলনা আটকে দিয়েছে, তাতে খুদে একটা নৌকো নলের মতো জিনিসে ভাসে, মনে হয় বুঝি সত্যি।'

এমনি সময় ছোটমাস্টার আবার ফিরে এসে মোড়ায় বসেই বললেন 'চোঙা লোহার ঢাকনি দিয়ে কে বন্ধ করে দিয়েছে। ঐ দিক দিয়ে ঢোকা যাবে না।' ছোটমামা চমকে উঠে বললেন, 'কেন ঢোকা যাবে না? কিন্তু কে ঢুকবে?' ছোটমাস্টার ছোটমামার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কেন, রোগাপানা সাহসী কেউ ঢুকবে।' ছোটমামা বললেন 'খুব রোগা হওয়া চাই নাকি?' ছোটমাস্টার কাষ্ঠহাসি হেসে বললেন, 'আমার চেয়েও রোগা কেউ। দাড়ি থাকলে ক্ষতি নেই। বরং চোঙার ভেতরে নরম লাইনিংএর কাজ করবে'।

ছোটমামা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বাবা দাড়ি রাখা পছন্দ করেন না, ওটা চেঁচে ফেলব ভাবছি।'

ছোটমাস্টার বললেন, 'বাবা তো শুনেছি পড়াশুনো ফেলে লোহালক্কড়ের সন্ধানে ঘোরাও পছন্দ করেন না। তবে সাহস না থাকলে কে-ই বা চোঙার মধ্যে ঢুকবে বলুন? কোথায় কি আছে কে জানে।'

ছোটমামা উঠে পড়েছিলেন, আবার বসে পড়ে বললেন, 'কে আবার থাকবে? স্পেসশিপের গুপ্ত কারখানা আছে। বাইরের লোক ঢুকলে মাথায় হয়তো স্প্যানার মারবে।'

ছোটমাস্টার বললেন, 'কিন্তু বেড়ালরাও ছিল মনে রাখবেন? এ কাজে বেড়ালের চেয়ে মানুষ পেলে অনেক ভালো হয় না কি?'

ভালো করে ওদের কথার মানে বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু দেখলাম ছোটমামার চোখদুটো হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে উঠল। কি চাপা গলায় বললেন, 'মানুষ! চাঁদে নামার প্রথম মানুষ! ই-স্!' একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, কিন্তু লোহার ঢাকনি আঁটা বললেন যে?' ছোটমাস্টার বললেন, 'আহা, বাইরে থেকে রিভেট করা। ওস্তাদ লোকের পক্ষে সে আর এমন কি। তাছাড়া আমার মনে হয়—'

ছোটমামা বললেন, 'কি মনে হয়?'

'আজ রাতে রিভেট খোলা থাকতেও পারে। যা ঘুরঘুট্টি অন্ধকার।'

ছোটমামা বললেন, 'চলি। এবেলা ডিউটি আছে।'

কেমন যেন ওঁকে দেখতে অনেক লম্বা অনেক ষণ্ডা অনেক লোমশ মনে হচ্ছিল। আমার সার্ট প্যান্ট পরেই চলে গেলেন। উৎসাহের চোটে আমার পায়ে বেজায় ঝিঁ ঝিঁ ধরে গেল। অথচ দশ দিন আগেও পায়ে কিছু টেরই পেতাম না। শেষটা হয়তো চাঁদে গিয়ে কোনো অসুবিধাই হবে না। এই সময় ছোটমামা ফিরে এসে বললেন, 'একটা কথা বলতে ভুলে গেছিলাম। গুপি, শোবার সময় জানালা একটু খুলে রাখিস্। তেমন তেমন হলে, পায়রা গিয়ে খবর দেবে।' বলেই সুড়ুৎ করে চলে গেলেন। আমরা অবাক হয়ে গুপির দিকে চাইলাম। গুপি বলল, 'আমরা কয়েকটা পায়রা পুষে আমাদের বাড়ি আর দাদুদের বাড়ির মধ্যে খবর দেওয়া-নেওয়া করি। ছোট্ট ছোট্ট পাহাড়ি পায়রা, দিব্যি পকেটে পুরে রাখা যায়। একটা পায়রা ছোটমামাকে এনে দিয়েছি। সেটার কথাই বলছেন।'

ছোটমাস্টার এমন কথা কখনো শোনেন নি। বললেন, 'উনি থাকেন কোথায়?' গুপি আমার দিকে চেয়ে একটু মাথা নাড়ল। ছোটমাস্টার লজ্জা পেয়ে বললেন, 'জানি অবিশ্যি আপাততঃ ছাপাখানায় চাকরি নিয়ে সেখানেই বসবাস করেন। ভালো খানদান, কিন্তু সব সময় এত ঘোরাঘুরি করেন যে গায়ে মাংস লাগে না। শুনেছি একতলা থেকে পাঁচতলা অবধি দিনের মধ্যে পঁচিশবার ওঠানামা করেন। বড় স্যার ভারি চটা ওঁর উপর। তবে উনিই যে গুপির ফেরারি ছোটমামা এটা জানা ছিল না। সাহসী বটে।'

ছোটমাস্টার উঠে দাঁড়াতেই, গুপি ব্যস্ত হয়ে বলল, 'বড়মাস্টারকে ছোটমামার কথাটা বলবেন না কিন্তু, স্যর তাহলে সব ভেস্তে যাবে। শেষটা হয়তো আমাদেরও চাঁদে যাওয়া হবে না!'

ছোটমাস্টার বললেন, 'না, না, কোন কথাটা আমি তাঁকে বলেছি? তবে চাঁদুকে তাড়াতাড়ি চাঁদে যেতে বল। কারণ সত্যিই এ-বছরেই অ্যামেরিকানরা গিয়ে হয়তো সেখানে ব্যবসা ফাঁদবে। তারপর পারমিট পাওয়াই এক মহা সমস্যা হবে।' ছোটমাস্টার সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলে, গুপি বলল, 'নারে পানু, কাজটা খুব ভালো হল না। ছোটমামা চোঙায় ঢুকতে গিয়ে না আবার কোনো ফ্যাসাদে পড়ে। সাহসী হলে কি হবে। মাকড়সা টিকটিকি এমনকি ব্যাঙ দেখলেও ওর হাঁটু বেঁকে যায়। শেষটা চোঙায় ঢুকে না আটকে থাকে। তাছাড়া ছোট-মাস্টার কি করে ছোটমামার ডাকনাম জানল? নিশ্চয় তোদের কাছে শুনেছে। তোরা বড্ড কথা বলিস। এ সব ব্যাপারে ছোটমাস্টারের এত কিসে মাথাব্যথা তা বুঝলাম না।'

গুপি চলে গেলে, অনেকক্ষণ বসে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলাম। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখতে পেলাম বড় মাস্টার হাত নেড়ে বৌকে কি বোঝাচ্ছেন আর বৌ ঘন ঘন মাথা নেড়ে আপত্তি জানাচ্ছে। কিছুদিন আগে বড়মাস্টারের বৌ পোড়ার লোমহর্ষক কাহিনী শুনেছিলাম। বড়মাস্টার-ই বলেছিলেন ঠিক যেন পরীদের গল্প। বর্মার ঘন জঙ্গলে বড় মাস্টারের বাবা সেগুন গাছের ইজারা নিয়েছিলেন। সেখানে যত সেগুন গাছ ছিল সব তাঁর কেটে আনার অধিকার ছিল। কিন্তু বনে গিয়ে সে গাছের শোভা দেখে আর কাটতে ইচ্ছা করত না। ভাবলেন তার চাইতে বড় বড় ডাল কেটেও তো কাজ চালানো যায়।

সারাদিন বনে বনে ঘুরেছেন। সঙ্গের লোকেরা অনেক ছড়িয়ে পড়েছে। চারদিক ছায়াছায়া থমথম করছে। লোকের মুখে শোনা নানারকম ভয়ের গল্প মনে পড়েছে। তার উপর ঐ বনে বিখ্যাত ডাকাতের সর্দার রামুর কথাও মাঝে মাঝে কানে আসত। মাস্টারমশাইয়ের বাবা ভাবছিলেন অশরীরীদের চেয়ে বরং ডাকাতের সরদারই ভালো। এমন সময় করুণ কান্নার শব্দ কানে এল।

মাস্টারমশাইয়ের বাবা চমকে উঠলেন। তীক্ষ্ণ বিষয়বুদ্ধি থাকলেও, মনটা তাঁর বড় নরম ছিল। কান্না শুনে আর থাকতে না পেরে খোঁজাখুঁজি লাগিয়ে দিলেন। হঠাৎ মনে হল তাঁরি একটা সেগুন গাছের তলা আলো করে কে যেন বসে হাপুস নয়নে কাঁদছে। কাছে গিয়ে দেখেন সাত আট বছরের একটি ছোট্ট সুন্দর মেয়ে, দুধে আলতা গায়ের রং, আঙুরের থোপার মতো কোঁকড়া চুল। কার মেয়ে কোথায় বাড়ি কিছু বলতে পারে না।

জিজ্ঞাসা করলেই মা-মা বলে কাঁদে।

বাবা তাকে অভয় দিয়ে, সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে এলেন। মাস্টার মশাইয়ের মা ছিলেন না, কিন্তু বুড়ি পিসি ছিলেন। সে-ই অনেক যত্নে ঐ মেয়েটিকে মানুষ করে মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলেন। সবাই তখন মানা করেছিল, বলেছিল বন থেকে কুড়িয়ে আনা মেয়ে, কে জানে দৈত্যদানোর ঘরের কি না। কিন্তু পিসিমা কারো কথা শোনেন নি।

তারপর বৌয়ের একটু বয়স হলে রাতে বাড়িতে নানান উপদ্রব হতে লাগল। বাইরে থেকে গোরু ছাগল চুরি করে কারা যেন ছোরা ছুঁড়ে মারে। শেষটা বৌ একদিন আর থাকতে না পেরে সব ফাঁস করে দিলে। সে আসলে রামু ডাকাতের নাতনি। রামুই ওকে বনের মধ্যে ঐভাবে ফেলে রেখেছিল। যাতে বড় হয়ে মাস্টার মশাইয়ের বাবার বাড়ি থেকে ধনরত্ন নিয়মিত পাচার করতে পারে। এইরকম অনেক ছেলেমেয়েকে রামু এবাড়ি-ওবাড়ি পাচার করে, ফলাও করে ডাকাতি ব্যবসা চালাত। এতে করে মাসে গড়ে হাজার দুই উপায় হত।

কিন্তু মুস্কিল হল যে পিসির উপর মাস্টার মশাইয়ের বৌয়ের বড় টান। কিছু পাচার করা দূরে থাকুক, এতটুকু শব্দ শুনলেই হাঁউমাউ করে ওঠে। শেষে ওর জন্যেই দলের দুচারজন ধরাও পড়ল। তখন রামুর দল ওদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সে অঞ্চল থেকে সরে পড়ল। ঐ আগুনে জিনিসপত্রের অনেক ক্ষতি হয়েছিল বটে, কিন্তু প্রাণে কেউ মরেনি। দুঃখের বিষয় বৌয়ের মুখের একদিকটা ঝলসে গেছিল। সেই অবধি বৌ আর কারো সামনে বেরোয় না। কিন্তু পিসিদের বাঁচাতে গিয়েই বৌয়ের এই দশা, তাই হাজার খিটখিটে হলেও মাস্টারমশাই ওর যত্ন করেন।

গল্প শুনে গুপির আর আমার খুব দুঃখ হয়েছিল। বৌয়ের জন্যে গুপি কিছু ফুল এনে দিয়েছিল। মাস্টার মশাই খুব খুসি হয়েছিলেন মনে হল।

কিন্তু রোজ রোজ এত কিসের তর্কাতর্কি ভেবে পেলাম না। আগে এমন ছিল না। জানলা দিয়ে শুধু বৌয়ের ঘোমটা পরা মাথাটুকু দেখা যেত। আজকাল মনে হয় বেশ ঘুঁসি পাকিয়ে মাস্টার মশাইকে ভয় দেখাচ্ছে।

তারপরদিন বিকেলে ছোটমাস্টার আমাকে হাতের কাজ শেখাতে এসে বললেন—'চাঁদে যাবার রকেটের এই মডেলটা বানিয়েছি দেখ।' আমি তো অবাক। সব আছে দেখলাম। লঞ্চিং প্যাড পর্যন্ত। নাকি সত্যি ওড়ানো যায়। তবে খোলা জায়গা দরকার। আমি বড় মাস্টারের ঘরের সামনে খোলা ছাদের দিকে তাকিয়ে বললাম—'ঐখানে যেতে পারলে বেশ হত।'

ছোটমাস্টার একটু যেন থতমত খেয়ে গেলেন। হঠাৎ বললেন, 'ছোটমামার কাছ থেকে কি কোনো খবর আসে নি?' আমি বললাম 'না তো।' 'মানে তিনি আছেন তো?' আমি আঁৎকে উঠলাম। আছেন তো আবার কি? কত সময় তাঁকে দিনের পর দিন দেখা যায় না। ইচ্ছা করেই উনি গা ঢাকা দিয়ে থাকেন, যাতে পুলিশের নজরে না পড়েন।

ছোটমাস্টার হাত থেকে মডেলটা নামিয়ে রেখে বললেন, 'কিন্তু চোঙার মুখের ঢাকনিটা কাল রাত থেকেই খোলা।'

আমি চমকে উঠলাম। 'সে কি! তাহলে কি ছোটমামা—। নাঃ, উনি তো রাতে বেরুতে ভয় পান।'

ছোট মাস্টার হাসলেন, 'উচ্চাকাঙ্খার কাছে ভয়-ডর টেকে না, তাও জান না। ভদ্রলোক কোনোরকম বিপদেটিপদে পড়েন নি তো? একরকম আমার কথাতেই চোঙায় সেঁদোলেন।—আচ্ছা আজ ঠক-ঠক শব্দটব্দ কিছু শুনেছ কি?'

তাই তো! আজ তো ঠাণ্ডাঘর একেবারে চুপ। তাকিয়ে দেখলাম বড়মাস্টারের নাইটস্কুলের গেটে একটা নোটিস্ লটকানো রয়েছে!

ছোটমাস্টার বললেন, 'আজ স্কুল বন্ধ। বড় স্যারের বাড়িতে নাকি কি গোলমাল হয়েছে। বৌটিকে কিন্তু বড় বদমেজাজী মনে হয়। যদিও খাসা রাঁধে। ডাম্প্লি খেয়েছ কখনো?'

আমি বললাম ওয়াক্ থুঃ!

ছোটমাস্টার চটে গেলেন। 'ও আবার কি হল? যে জিনিস সম্বন্ধে কিছু জান না, তাকে ওয়াক থুঃ করার কোনো মানে হয় না। খুব ভালো জিনিস। এক থালা ভাতে এক চিমটি মাখলেই অমৃতের মতো লাগে। বড় স্যারের নিজের মুখে শোনা। ছাদের ঘরে ওঁর বৌ গুপ্পি বানায়। ফুলের টবের মাটিতে পুঁতে রাখে। একদিন একটু চেয়ে নেব।'

তারপর ছোটমাস্টার যাবার জন্যে তৈরি হয়ে বললেন, 'নাঃ, মনটা বড় খুঁৎখুঁৎ করছে। গুপির দূরবিনটা দাও তো একটু দেখি।' অনেকক্ষণ দেখলেন। সব ভোঁ-ভাঁ। ছাদে সেই ছোট ছোট সাদাকালো জানোয়াররাও চরছে না, তা সে পেঙ্গুইন্-ই হক, কি বেড়ালই হক। শেষটা দূরবিন নামিয়ে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ছোট মাস্টার চলে গেলেন।

যেই না সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়েছেন, দরজা তখনো ভালো করে বন্ধ হয় নি, খাবার ঘরের মধ্যে দিয়ে গুপি এসে হুড়মুড় করে ঢুকে বলল,—'পানু, সর্বনাশ হয়েছে।' ক্রমশঃ

—হালকা হাসি—

কল্যাণ দাশগুপ্ত গ্রাহক নং—২০৩৮

(সরু সাঁকো। এত সরু যে একজন লোক মাত্র পার হতে পারে। দু'জন একই সময়ে এই সাঁকোর মাঝখানে এলে, কাউকে পেছু হটতে হবে। একদিন এই পরিস্থিতিতে দুইটি লোক)।

১ম লোক : মশাই, যত তাড়াতাড়ি পারেন পেছু হটুন।

২য় লোক তাজ্জব বাত্! আপনি বরং পেছু হটুন

১ম লোক (একটু রেগে), দেখুন, এখনো পেছু না হটলে, গতকাল আমি যা করেছিলাম, তাই করব

২য় লোক (মনে মনে), খুনটুন করলে মুশকিল, তারচেয়ে আমিই পেছু হটি।

১ম লোক (পার হয়ে গিয়ে), পেছু হটে পার করে দেওয়ায় ধন্যবাদ।

২য় লোক কিন্তু দাদা, গতকাল আপনি কি করেছিলেন?

১ম লোক গতকাল আমি পেছু হটেছিলাম।

অজয় হোম

পুরোনো হলেও খবর। কারণ, তোমাদের মতো ছেলেরা বাংলার মান রেখেছে। ভারতের স্কুল ফুটবলের দলগত শ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'সুব্রত মুখার্জি কাপ'। তৃতীয়বার বাংলাদেশে আনল পাইকপাড়ার কুমার আশুতোষ ইনস্টিটিউটের ছেলেরা। প্রথম আনে ১৯৬১ তে রাণী রাসমণি, দ্বিতীয়বার ১৯৬৩-তে বাটানগর হাই স্কুল। কুমার আশুতোষের ছেলেরা সেমিফাইনালে হারায় দুর্ধর্ষ কার নিকোবর স্কুলকে ৪-১ গোলে। ফাইনালে নাগাল্যাণ্ডের মকচুকং গভর্নমেণ্ট হাইস্কুলকে একস্ট্রা টাইমে ১-০ গোলে। ভাল খেলে দলনায়ক কল্যাণ মুখার্জি (বাবু), কাশীনাথ নন্দী ও সুবিমল দে।

মোহনবাগান রোভার্স কাপ জয় করেছে: ডুরাণ্ড জয়ের পথে। রোভার্সে মোহনবাগান বাংলার মান বাঁচিয়েছে। জলন্ধরের লীডার্স ক্লাবের কাছে কলকাতা ফুটবলের দুই সেরা দল ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিংয়ের হারার পর ফাইনাল খেলার আগে সত্যিই ভয় ধরে গিয়েছিল। বুঝিবা বাংলার মান গেল! নাঃ! পাঞ্জাবী সিং-দের সিংহমার্কিক খেলা প্রথমদিনে গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হলেও দ্বিতীয় দিনে বোম্বাইয়ের দর্শকদের বহুদিন পরে মোহনবাগান দেখাল ক্রীড়াশৈলীর অপূর্ব নৈপুণ্য। ৩-০ গোলে লীডার্স ক্লাব হারতে বাধ্য হল। এর আগে মোহনবাগান ১৯৫৫ ও ১৯৬৬ সালে রোভার্স বিজয়ী হয়।

কলকাতায় ক্রিকেট মরসুম এখন। বাংলা পূর্বাঞ্চল বিজয়ী হতে চলেছে। বিহার ও ওড়িশাকে হারিয়েছে, বাকি শুধু আসাম। নতুন অধিনায়ক অম্বর রায় বেশ ভালই দল পরিচালনা করছেন। এই শীতে কলকাতা জমে নি ; একমাত্র কারণ কোনও টেস্টম্যাচ নেই। ইডেনের মাঠ গরম হয় টেস্ট খেলাকে ঘিরেই। সে স্বাদ কি আর রঞ্জি ট্রফিতে মেটে ? সাউথ ক্লাবে টেনিসেও কেউ নামকরা বাইরের

খেলোয়াড় এবার আসেন নি। এশিয়ান টেনিসে সিঙ্গলসে জয়দীপ মুখার্জি স্ট্রেটসেটে আমেরিকার বিল টিমকে হারান। ডাবলসে জয়দীপ ও প্রেমজিৎলাল স্ট্রেটসেটে পোলাণ্ডের রাইবারজিক ও নোউইককে পরাজিত করেন। মহিলাদের সিঙ্গলসে বিজয়িনী হবার প্রথম সম্মান লাভ করেন নিরুপা বসন্ত মিসেস এ টিমকে হারিয়ে। একমাত্র মিক্সড ডাবলসে বলরাম সিং ও মিস সুশান দাস হারেন রুমানিয়ার ড্রন ও মিস ডিবাসের কাছে।

ক্রিকেট ঃ স্কুলদলের সফর

ঠিক যা ভয় করেছিলাম তা হল ৬ষ্ঠ খেলায়। সিডনিতে অস্ট্রেলিয়া স্কুল দলের (নিউ সাউথ ওয়েলস) জোর বোলার জেফ টমসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় স্কুল দাঁড়াতেই পারল না। এই দুর্বলতা ভারতের ক্রিকেটের। তবে এটা ঠিক কি ইংল্যণ্ড কি অস্ট্রেলিয়া এই দুই দেশের বিরুদ্ধে স্কুলের ছেলেরা প্রথম হারল এই ইনিংস ৩ রানে। ভারতীয় স্কুল—৯৩ (লক্ষ্মণ সিং ২৩, কুন্দরন ৩৬ ; টমসন ৪০ রানে ৩, বেইলি ৩৫ রানে ৭ উইঃ) এবং ২১৬ (লক্ষ্মণ সিং ৭২, ঘাভরি ৪৮ ; টমসন ১৮'৫ ৪-৬৫-৫ উইঃ)। অস্ট্রেলিয়া স্কুল—৯ উইঃ ডিক্লেঃ ৩১২ (আর টমাস ১০৮ ; দীপঙ্কর সরকার ৫৪ রানে ৬, শঙ্কর ৬৮ রানে ৩ উইঃ)।

সপ্তম খেলা ছিল একদিনের ক্যানবেরার মানুকা ওভালে অস্ট্রেলিয়ান ক্যাপিটাল টেরিটরির বিরুদ্ধে। সময়াভাবে খেলা হল ড্র। ভারতীয় স্কুল—৭ উইঃ ডিঃ ২২৯ (এল সিং ৪৯, সুদ ২৬ ; এম ক্লুজ ৭০ রানে ৪ উইঃ)। এসিটি—৮ উইঃ ১২৬ (টি হল ৫৩, ডি স্টিল ৪৮)।

৮ম খেলা জুনিয়র টেস্ট ২ দিন ব্যাপী ক্যানবেরায়। অস্ট্রেলিয়া টসে জিতে ভারতকে ব্যাট করতে পাঠায়। খেলাটি ড্র হয়। একমাত্র ব্যাটে রাজা মুখার্জি এবং বোলিং ও ব্যাটে অমরনাথ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। ভারত—১৭৪ এবং ৬ উইঃ ২১৭ (রাজা মুখার্জী ৫৩, অমরনাথ ৪২ ; টমসন ৪০ রানে ১, আরভিন ১৬ রানে ২ উইঃ)। অস্ট্রেলিয়া—৩ উইঃ ডিক্লেঃ ১৯২ এবং ৭ উইঃ ১১২ (মস ৩৫, বেইলি ৫২ নট আউট ; অমরনাথ ৩৫ রানে ৫ উইঃ)।

৯ম খেলা মেলবোর্নে ভিক্টোরিয়া স্কুলদলের বিরুদ্ধে হল ড্র। বিপক্ষের অধিনায়ক গ্রেমি জসলিন, টেস্ট খেলোয়াড় লেস জসলিনের ভাই সেঞ্চুরি করে। পাল্টা জবাব দেয় ভারতের পক্ষে রাজা মুখার্জী এবং ৫ রানের জন্যে সেঞ্চুরি থেকে বঞ্চিত হয় মহীন্দার অমরনাথ। ভিক্টোরিয়া—৯ উইঃ ডি ৩০৭ (জসলিন ১৫১, স্প্রিং ৪৩ ; অমরনাথ ৫৯ রানে ৩, ঘাভরি ৩৯ রানে ৩ উইঃ)। ভারতীয় স্কুল—৬ উইঃ ৩৩৬ (রাজা মুখার্জী ১০৫, অমরনাথ ৯৫, এল সিং ৪১, ঘাভরি ৫৮ নট আউট)।

১০ম খেলা এই মেলবোর্নে মাত্র একদিনের ভিক্টোরিয়া স্কুলদলের বিরুদ্ধে হল ড্র। লক্ষ্মণ সিং ১১৮ মিনিটে ১৫টি চারের বাড়ি মেরে ১৪৭ রান করে। ভারতীয় স্কুল—২ উইঃ ডিঃ ২৩৯ (লক্ষ্মণ ১৪৭ নট আউট, সুদ ৩৬)। ভিক্টোরিয়া স্কুল—৭ উইঃ ১৭৫ (এ ওলিভেরা ৪৪ ; ঘাভরি ১৫ রানে ৩, আর ব্যানার্জী ৪০ রানে ২ উইকেট)।

১১শ খেলা মেলবোর্নে ২ দিন ব্যাপী সম্মিলিত অ্যাসোসিয়েটেড গ্রামার স্কুল ও ক্যাথলিক

কলেজের বিরুদ্ধে ড্র হয়। বৃষ্টির জন্য প্রথমদিন খেলা হয় না। ভেজা মাঠে কোনো পক্ষই সুবিধে করতে পারে না। ভারতীয় স্কুল—৬৯ (এল সিং ৩৩; জি রবিনস ১৬ রানে ৬ উই:) এবং ৫ উই: ডি: ৭১ (রাজা মুখার্জী ২১)। গ্রামার স্কুল ও ক্যাথলিক কলেজ—৫৭ (স্প্রিং ২৩; অমরনাথ ২২ রানে ৫, দীপঙ্কর ১৩ রানে ৩ উই:) এবং বিনা উইকেটে ২০।

১২শ খেলা মেলবোর্নে ২ দিন ব্যাপী ভিক্টোরিয়া হাইস্কুলের বিরুদ্ধে শেষ হয় অমীমাংসিতভাবে। লক্ষ্মণ সিং-এর ব্যাটিং হয় খুবই চিত্তাকর্ষক। ৭১ রানের মধ্যে বাউণ্ডারি ছিল ১০টি। ভিক্টোরিয়া হাইস্কুল—৩৪৮ (লিডেল ৮৫)। ভারতীয় স্কুল—৩১২ (এল সিং ৭১; নীল বুসজার্ড ১০১ রানে ৮ উই:)।

১৩শ খেলা একদিনের অ্যাডিলেডে কম্বাইণ্ড সাউথ অস্ট্রেলিয়া হাইস্কুলের বিরুদ্ধে বৃষ্টির জন্যে পরিত্যক্ত হয়।

১৪শ খেলা অ্যাডিলেডে ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট স্কুলের বিরুদ্ধে একদিনের খেলা ড্র হয়। বৃষ্টির পর উইকেটে প্রাণ ছিল না। ডন ব্রাডম্যান এই খেলাতে উপস্থিত ছিলেন। ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট স্কুল—৭ উই: ডি: ১৬৮ (ডলিং ৫৭, নানকিভিল ৪৭; অমরনাথ ৪৩ রানে ৩, বাগথেরিয়া ২১ রানে ৩ উই:)। ভারতীয় স্কুল—৬ উই: ৯৮ (অমরনাথ ২০, ঘাভরি ২৪; সিনকক ২৪ রানে ২, মার্টিন ৩১ রানে ২ উই:)।

১৫শ খেলা ২দিন ব্যাপী অ্যাডিলেডে সাউথ অস্ট্রেলিয়া স্কুল বয় ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে সময়াভাবে জয়লাভে ভারতীয়রা বঞ্চিত হয়। ভারতীয় স্কুল—২৬০ (ঘাভরি ৭৬ নট আউট, সুদ ৩১) এবং ২১৩ (এন সিং ৭৪)। সাউথ অস্ট্রেলিয়া—১৪৪ এবং ৫ উই: ২৩৪।

১৬শ খেলা পার্থে ২ দিন ব্যাপী ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন কোল্টসদের বিরুদ্ধে ভারতীয়রা অমীমাংসিতভাবে শেষ করে। বিলম্বে ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করায় জয়লাভের সম্ভাবনা থেকে ভারতীয়রা বঞ্চিত হয়। ওয়েস্ট্ অস্ট্রেলিয়া—১৫৫ (দীপঙ্কর ৫৪ রানে ৮ উই:) এবং ৬ উই: ১৭৫ ভারতীয় স্কুল—৬ উই: ৩০০ (এ সুদ ১১০, রাজা মুখার্জি ৭৩, ঘাভরি ৪৫)।

ব্যর্থ স্পিজ

গতবারে তোমাদের আমেরিকার খুকু ডেবি মেয়ারের কথা বলেছি। এবার বলব অপর এক মার্কিন সাঁতারু ছেলের কথা যার বয়স মাত্র ১৮। নাম মার্ক স্পিজ। স্পিজ ১৯৬৭ সালে সাঁতার বিশারদ হিসেবে 'সুইমার অফ দি ওয়ার্লড' সম্মানের অধিকারী হয়। স্পিজের সাঁতারের স্টাইল ও পারদর্শিতা দেখে মেক্সিকো অলিম্পিকের আগে অনেক বিশেষজ্ঞ বলেছিলেন—'এর জন্যে সাঁতারের রেকর্ড বই নতুন করে লিখতে হবে।' তাঁরা স্পিজকে চিহ্নিত করেছিলেন ৬টি বিষয়ের স্বর্ণপদকের বিজয়ী হবে বলে। গত দু'বছরে মার্ক স্পিজ সাঁতারে ১০ বার বিশ্বরেকর্ড ভেঙেছে আর গড়েছে। ২৮ বার ভেঙেছে আমেরিকার জাতীয় রেকর্ড, আর ২২ বার আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় সাঁতারে বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছে। কিন্তু মেক্সিকোয় এসে ব্যর্থ হল। দুটি সোনা ও দুটো রূপোর মেডেল অবশ্য সে পেয়েছে। কিন্তু সোনা দুটিই একক কৃতিত্বের জন্যে নয়। রিলে দলের ৪ জনের একজন হিসেবে

দুটি রিলেতে দুটি স্বর্ণপদক নিজের কৃতিত্বে রৌপ্যপদক ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল ও ১০০ মিটার বাটার ফ্লাই স্ট্রোক। অনেক আশা নিয়ে মার্ক স্পিজ এসেছিল মেক্সিকোতে। বাটারফ্লাই স্ট্রোকের নানা দূরত্বের সব বিশ্বরেকর্ডের পাশে যার নাম সে কিনা একক কৃতিত্বে এবার কোনো বিশ্বরেকর্ড করতে পারল না। পেল না একটিও স্বর্ণপদক একক কৃতিত্বে। স্পিজের মনে বড়ো দুঃখ। ৪ বছর বাদে তার আশা কি সফল হবে ?

একটি গাছ

অশোক ভট্টাচার্য

দেখতে আমি পাব না কিছু ভাবি না কেন যত।
কোনো কবিতা হয় কি ভালো একটি গাছের মতো !

একটি গাছ মুখ গুঁজে রয় মধুরতম সুখে,
মাটি মায়ের নরম আর আরামদায়ক বুকে ;

সারাটা দিন ভগবানের দিকে তাকিয়ে থাকে,
শাখা হাত তুলে যেন তাঁকেই এখন ডাকে।

গরমকালে সে রাখে যেন মাথার 'পরে তুলে,
আর কিছু না, ছোট একটি পাখির বাসা চুলে।

আমার মতো বোকারা সব কবিতা লেখে যত—
গাছ বানাতে পারে কি কভু ভগবানের মত !

(জয়েস কিলমারের-এর ট্রিস্ কবিতার অনুবাদ)

(১) সুনন্দন চক্রবর্তী, বয়স ১০, ২২৯৪, এতদিনে গ্রাহক সংখ্যা পেয়েছ ত ? সন্দেশ তোমার ভালো লাগছে জেনে খুসি হলাম। মাঝে মাঝে চিঠি লিখো। পত্রবন্ধু চাই, শখ—ডাকটিকিট সংগ্রহ, গল্পের বই পড়া।

(২) নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য, ২৫৮১, বয়স দাওনি তো অমন ভালো লেখাটা ছাপি কি করে ? সম্পাদককে জানিও।

(৩) সন্দীপন দেব, ২০৪০, বয়স দাওনি কেন ? নিজের নাম ঠিক করে বানান করতে হয়।

(৪) দেবীপ্রসাদ সিংহ, ২৪৯৯, বয়স ১৪, তা বললে তো হবে না ভাই, প্রেমেন্দ্র মিত্র আর অদ্রীশ বর্ধনের লেখা পেলেই ছাপি। শিবরাম চক্রবর্তীরো অনেক গল্প এর আগে ছাপা হয়েছে। যে সব লেখা ছাপা হয় নি, তার কথা ছেড়ে, বরং যেগুলি হয়েছে তার বিষয়ে লিখো। হাত পাকাবার আসরে ভালো ভালো লেখা দিও, কেমন ?

(৫) অনীতা চট্টোপাধ্যায়, ২২৩৯, বয়স ১২, ধাঁধাই বল আর গল্প বা অন্য লেখাই বল, ভালো হলেই আমরা ছাপাই। অবিশ্যি সঙ্গে গ্রাহক সংখ্যা আর বয়স দিতে হয়।

(৬) উত্তমকুমার বটব্যাল ১৪৮১, বয়স ১১½, তোমার ধাঁধাটি বেশ। এখানে তাই দিচ্ছি :— 'আমি একদিন পুকুরে ছিপ নিয়ে একটা মাছ ধরলাম। কিন্তু বঁড়শীটাতে পেট কেটে যাওয়াতে সে কানে শুনত না। বাড়িতে এনে ল্যাজটা কেটে ফেলতেই তাকে আর সোজা করা গেল না। তারপর যেই না মুণ্ডু কাটা হল, অমনি সে নিচে চলে গেল। দেখতো এ অদ্ভুত মাছটাকে চিনতে পার কি না।' ভাষাটা একটু বদলাতে হল।

তারপর একটা কথা অনেকবার বলেছি, আবার বলি। পুরনো গল্প, প্রবন্ধ, ধাঁধা, মজার কথা পাঠাতে পার বৈ-কি, কিন্তু মূল লেখার কথা সম্পাদকদের জানিও। আর গল্প প্রবন্ধ নিজের ভাষায় লিখে দেবে।

তুমি কি ভেবেছ সন্দেশ ও অন্যান্য পত্রিকাতে যে-সব ধাঁধা বা মজার কথা বেরোয়, সে সবই যারা পাঠায় তাদের তৈরি ? তা নয়, একই ধাঁধা বা হাসির কথা দেশী বিদেশী অনেক কাগজে দেখবে। তাতে কোনো দোষ হয় না, যদি মূল লেখার কথা উল্লেখ করা হয়।

যেতে যেতে দেখা

জীবন সর্দার

একদিন আমি আর নীলাঞ্জন শহরের ধার ঘেঁসে মাঠের পাশ দিয়ে যেতে যেতে একটি গাছে ছায়ায় একটু দাঁড়ালাম। যাব বলে আবার যেই পা তুলেছি একটি পাতা গাছ থেকে খসে আমার কাঁ ছুঁয়ে মাটিতে ঝরে পড়ল। ঝরা পাতাটি হাতে তুলে নিয়ে নীলাঞ্জন বললে তোমার কি মনে হয়—পাতাটি এমনি এমনি ঝরে পড়েছে?

আমি বললাম, না। পাতা ঝরার এইইত' সময়। ওটার সময় হয়েছে তাই ঝরে পড়েছে।

আমার উত্তরে খুশি না হয়ে সে বলল, গাছে আরও কত শত পাতা আছে, কেউ ঝরল না এটি কেন ঝরল! আমি চুপ। সে বললে, তুমি বলতে পারতে পাতাটিতে গাছ থেকে রস ঠিক যাচ্ছে না তুমি এ কথাও বলতে পারতে পাতাটি কোন অসুখে ভুগছে!

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, ঠিক। তার আগেই, আমাকে কিছু বলতে না দিয়ে সে জিগ্‌গে করলে, তোমার কি মনে হয় আমরা, প্রকৃতি পড়ুয়ারা, যা কিছু দেখি বুঝি পড়ি তা শুধু নিজের জ্ঞা বাড়াবার জন্যে কিংবা সময় কাটাবার জন্যে?

না ঠিক তা নয়। আমরা জানতে চাই অন্যকে জানাবার জন্যেও। ধর, এই পাতাটি কেন ঝ পড়ল তা পরীক্ষা করে দেখতে গিয়ে বুঝলাম যে মাটিতে কোন কিছুর হেরফের হয়েছে তাই পাতাটি খ গেছে, এবং ঐ গাছের সব পাতাই খসবে একে একে। তা থেকে কোনদিন কেউ না কেউ বুঝতে পার মাটিতে কিসের অভাব থেকে ঐ গাছের পাতা অসময়ে খসে পড়ে।

সে দিনের সে ঘটনার পর থেকে যেখানে যা কিছু আমি ঘটতে দেখেছি, মেঘ জড়ো হওয়া কিং আকাশের রং ফেরা, পাখির ঝরা পালক দেখে, কিংবা বাদলা পোকার আলোয় ঘোরা দেখে—যা কিছু মানে আমি বুঝিনি, তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি। আমি শুধু ভেবেছি, আজকে আমি যা জান চেষ্টা করছি বা জানতে পারছি, কোনদিন কেউ না কেউ তা থেকে সুফল পাবে।

সে কথা তোমাদের এখন বলছি, সে কথা অনেকদিন আগে ভেবেছি। তখন আমার মনে বিশ্ব ঘুরে দেখার নেশা ছিল। বিদ্যাধরী নদীর ধার ধরে, ধান খেতের আলের উপর দিয়ে যেতে যেতে থম

দাঁড়ালাম। দেখি মেঠো-ইঁদুর একটি, আলের উপর বসে পাকা ধানের শীষ ছিঁড়ে নিয়ে সুড়ুৎ করে গর্তে গিয়ে ঢুকল। যেখানে তার গর্ত আর যেখানে তাকে দেখলাম তা দূরে দূরে।

একবার নয় অনেকবার, একদিন নয় যতদিন ধান কাটা শেষ না হোলো ততদিন অনেক ইঁদুরকে অনেক জায়গায় এমনি করে 'ধান চুরি' করতে দেখলুম। আলের উপর বসে সামনের দুহাতে ধানের গাছটিকে টেনে নামিয়ে পাকা এক ছড়া ধান কুট কুট করে দাঁতে কেটে নিয়ে দে ছুট। খবরটি আমি দিয়ে দিলাম নেহালপুরের ধান চাষিদের। বিদ্যাধরী নদী থেকে কিছু পশ্চিমে এই গ্রামটিতে কদিন ছিলাম আমি। চাষিরা আমার কথা কান পেতে শুনল। বলল, এর চেয়েও মজার ব্যাপার আপনাকে দেখাব।

ওদের সাথে একদিন মাঠে গিয়ে হাজির হলাম। মাঠ খালি। ধান চলে গেছে ঘরে ঘরে। সার বেঁধে চাষিরা আলের ধারে গর্ত ছিল কোদাল আর শাবল দিয়ে কুপিয়ে তার ভেতর থেকে রাশি রাশি ধান বের করে নিয়ে এলো। ধান-চোর মেঠো-ইঁদুরের ভাঁড়ার খালি হয়ে গেল। সে বছর ইঁদুরদের কি 'আকাল'। ইঁদুরের ভাণ্ডার লুট হবার পর ইঁদুরেরা খাবারের খোঁজে অন্য কোথাও যাবে। ধান না পেলে অন্য কিছু খাবে—চাষিরা আমাকে বোঝাল। কিন্তু ইঁদুরেরা শুধু ধান চুরি করে, কোন উপকারই করে না আমাদের—এ কথা মানতে রাজি নই আমি। আমার আর কোন যুক্তি তারা না মানলেও একথাটি মেনে নিলে যে, মাঠে বেশী ইঁদুর পেলে শেয়ালেরা হেঁসেলে কম হানা দেয়।

মাঠ থেকে রহিম সাহেবের ঘরে যেতে যেতে আমি তাদের এমন আরও কয়েকটি উদাহরণ সঙ্গে সঙ্গে দেখালাম—প্রকৃতির কিছুই অকারণে নয়।

ধানখেত ছেড়ে যখন গ্রামে এসে উঠলাম, গিরগিটির দেখা পেলাম তখন। গাছ থেকে গাছে, রাংচিতার বেড়ার উপর দিয়ে ছুটে লাউ মাচায় উঠে ওরা আমাদের নজর এড়াবার চেষ্টা করল। চুপচাপ একটুখানি দাঁড়িয়ে গিরগিটির পোকা ধরা দেখলাম। আর দেখলাম গিরগিটির পেছনে একটি কাককে তাড়া করতে। পোকা গিরগিটি কাক কেউ ফ্যালনা নয়, আমাদের কাছে। ওরা কেউ খাদ্য কেউ খাদক নিজেদের ভেতর। সবাই মিলে এমন একটি চক্র বানিয়েছে, যার মধ্যে আমরাও পড়ে গেছি। সুফল ভোগ করছি।

নেহালপুরের রহিম সাহেবের দাওয়ায় বসে ভাবছিলুম প্রাকৃতিক ঐ চক্রটি থেকে মানুষ যদি বেরিয়ে আসে কি হবে তার। আমার ভাবনার সাথে তাল দিয়ে কুক্ কুক্ করছে উঠানের মুরগীগুলো। মাচায় বসে যেটি তা দিচ্ছে সে চুপ। একবার উঠে মুরগীটি পেটের তলার ডিমগুলো দেখে নিল, তারপর ঠোঁট দিয়ে সামনের ডিমটিকে পেছনে, পেছনেরটি সামনে, এপাশের ডিমটিকে ওপাশে, ওপাশেরটিকে এপাশে দূরের কটিকে মাঝে এনে মাঝের কটি ডিমকে দূরের সার করিয়ে দিয়ে একবার আড়মোড়া ভেঙে সব কিছু ঠিক সাজানো হয়েছে কিনা দেখে আবার তা' দিতে বসল।

যেতে যেতে বসে, বসে বসে দেখে বুঝলাম—সবকিছু ঠিকঠাক সাজান না হলে গড়পর কিছু হয়ে যাবে।

ভুল সংশোধন : গত মাসে প্রঃ পঃ অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ভুল করে অশোক ছাপা হয়েছিল।

অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেঠো খসড়া থেকে : ৬।৬।৬৮—পর্ণশ্রী।

'শুনতে পাচ্ছ মৌচুসী পাখির ডাক ? ঐ দেখ পুরুষ পাখিটা উড়ে গেল',—বললেন জীবন-সর্দার। তাঁর সাথী ছিলাম আমি, অলোক এবং গৌতম।

এগিয়ে চললাম পাখির খোঁজে, প্রথমে টেলিগ্রাফের তারে এবং গাছের ডালে চোখে পড়ল—কালো বুলবুল। গায়ের রঙ গাঢ় খয়েরী, মাথাটা কালচে, সামান্য একটু ঝুঁটি আছে, তলপেটের রঙ লাল এবং ঠিক তার উল্টোদিকে পিঠের রঙ সাদা।

একটি খালের ধারে দেখলাম গো-শালিক পোকা খাচ্ছে, গো-শালিকের পরেই চোখে পড়ল ভরত পাখি, দেখতে অনেকটা চড়াই পাখির মত। লেজটা লম্বা, ভরত পাখি বেশ সাহসী পাখি, অনেকটা কাছে এসেছিল। ভরত পাখিটা ডাকতে ডাকতে অনেকটা ওপরে উঠে গেল তারপর হঠাৎ ডানা বন্ধ করে দিয়ে পড়তে লাগল ! মাটিতে আসবার আগেই ডানা খুলে দিল। এটাই এর বৈশিষ্ট্য, দেখতে বেশ লাগে।

এতক্ষণে খালটি পেরিয়ে এসেছি, আরো খানিকটা সামনে যাবার পর দেখলাম ফিঙে পাখি, দূরবীন দিয়ে দেখলাম ফিঙের গা-মাথা কুচকুচে কাল। কখনও মনে হ'ল গাঢ় নীল রঙের। দূর থেকে কাল মনে হয়, ফিঙের লেজ চেরা, লম্বা। পোকা-মাকড় খাচ্ছে। ফিঙেটি সবসময়ই একটা উঁচু জায়গায় বসে।

তারে বসা টুনটুনি এবং বাঁশপাতি বা নরুণচেরা পাখি দেখলাম। বাঁশপাতি ছোট পাখি, মাথাটা হলদেটে, গা সবুজ, ঠোঁট কাল, পোকা-মাকড় খাচ্ছে উড়ে উড়ে। ওড়বার সময় লেজ চেরা দেখাচ্ছে। নরুণচেরা নাম কি তাই বলে। মাঠে চলতে চলতে চোখে পড়ল সবুজ ঘাস-ফড়িং।

আরো দেখলাম মেছোবক, মাছরাঙা প্রভৃতি।

একটা বাড়ির ধারে দোয়েল পাখিও চোখে পড়ল, সাদায় কালোয় গা। বাড়ির আনাচে কানাচে আলো ছায়ায় ঐ রঙে ধরাই যাচ্ছে না মাঝে মাঝে ওকে। ফিরে আসবার সময় সামনের নারকোল গাছে একটা কাঠঠোকরা দেখলাম। যেন লাফিয়ে, লাফিয়ে, উঠছে গাছ বেয়ে। পিঠটা সোনালী।

সেদিনকার মত সেখানেই পাখি দেখা শেষ করে বাড়ি ফিরে এলাম।

পাখির পরিচয় :

পরপর চারটি সংখ্যায় পাখির পরিচয় দিয়েছিলাম। বাংলাদেশের চেনা পাখি সব ওরা। সেগুলো পড়ে অনেকে খুশি হয়ে চিঠি লিখেছে, 'আরও আরও পাখির পরিচয় জানতে চাই'। আমি চেয়েছিলাম প্রকৃতি পড়ুয়ারাই অনেক পাখির পরিচয় আমাকে জানাবে। কেউ দেয়নি ! এমনকি পাখিগুলোর অন্য আরও কত নাম বা অন্য কোনখানে রয়েছে, পড়ুয়ারা জানলেও জানায়নি। আগামী সংখ্যা থেকে আবার ছবিসহ পাখির পরিচয় দেওয়া হবে। আমিও আশা করব পড়ুয়ারা আশপাশের পাখির পরিচয় আমাকে জানাবে। [জীঃ সঃ]

এক সওদাগরের নয়টি বৌ! ছোট বৌ 'রাধা' সবচেয়ে সুন্দর, তাই অন্যরা তাকে হিংসা করে। শুধু বড়বৌ 'তারা' রাধাকে খুব ভালবাসে।

সওদাগর বিদেশে গিয়েছে, তারা দু দিনের জন্য বাপের বাড়ি গেল, সেই সুযোগে হিংসুটি সাত বৌ করল কি, ডাইনি বুড়ির কাছে যাদু শিখে এসে, রাধাকে কোলাব্যাঙ বানিয়ে দিল—তারপর তাকে ঝাঁটা মেরে দূর! দূর! করে তাড়িয়ে দিল!

বড়বৌ ফিরে এসে বলল, 'রাধা কোথায়?'

সাতবৌ বলল, 'আমরা কি জানি!' রাধাকে খুঁজতে খুঁজতে বড়বৌ পুকুর ধারে গেল।

থপ্ থপ্ করে একটা কোলাব্যাঙ তার কাছে এল। ব্যাঙটার চোখ দিয়ে জল পড়ছে, গলা ফুলিয়ে কুঁক্-কুঁক্ করে সে বললে—

'দিদি গো দিদি—কুঁক্-কুঁক্—তারা কুঁক্-কুঁক্—সাতজায়ে—কুঁক্-কুঁক্—যুক্তি কইর‍্যা—কুঁক্-কুঁক্—আমারে দিছে—কুক্-কুঁক্—ব্যাঙ বানাইয়া—কুঁক্-কুঁক্!'

তারা তখনি ব্যাঙটাকে তুলে নিয়ে এল। সাতবৌকে বলল, 'ভাল চাস তো এখনি ওকে আবার মানুষ বানিয়ে দে! নইলে কর্তা বাড়ি এসে তোদের—'

দুষ্টুমি ধরা পড়ে গিয়েছে দেখে, সাতবৌ ভয়ে ভয়ে বলল 'না গো দিদি! কাউকে কিছু বলো না—আমরা আর কখনও এমন কাজ করবো না!' তখনি ওরা যাদু দিয়ে আবার রাধাকে ছোটবৌ করে দিল। (পূর্ব বাংলার পুরানো গল্প)

ধাঁধার উত্তর

অঞ্জন ভট্টাচার্য—গ্রাহক সংখ্যা ২৩৬১ বয়স ১২

১। ফুটবল।
২। বাসকেট বল।
৩। ভলিবল।
৪। হকি।
৫। টেনিস।
৬। টেব্‌ল্‌ টেনিস।
৭। গল্‌ফ্‌।
৮। বিলিয়ার্ড'
৯। পোলো।
১০। ব্যাগেটেলি।
১১। বেস্‌ বল।
১২। স্কোয়াশ।

(এ ছাড়াও আছে—ক্রিকেট !)

বর্ষা ঋতু

মৈত্রেয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়

(বয়স ৯ বৎসর—গ্রাহিকা নং ২০৭২)

ওই শোন কড়্‌ কড়্‌ গড়্‌ গড়্‌ শব্দ
দুষ্টু রাখাল ছেলে সেও ভয়ে জব্দ।
ব্যাঙেদের উৎসব
টর্‌ টর্‌ উঠে রব
নাচে তারা গান গেয়ে,
ঘুরে ঘুরে নাচে ধেয়ে।
ধেই ধেই নাচে খোকা ব্যাঙেদের রঙ্গে
খুকুরাও যোগ দেয় খোকাদের সঙ্গে ॥

বাদলা

শ্রী দেবরথী মুখার্জি

বয়স—৮ গ্রাহক নং ১৩৫৯

শুক্র, শনি, রবিবার
বৃষ্টি পড়ে চারিধার
আকাশ শুধু মেঘলা
ঘরে বসে একলা
কি খেলি কি করি আর
উপায় নেই কো বেরুবার
জানলা দিয়ে দেখি আমি
বাইরে শুধু বাদ্‌লা ॥

ধাঁধা

দেবাশীষ মুখার্জী

গ্রাহক নং—১৪৬৭, বয়স—১২

(১)

টাকা দিয়ে কিনে আনি সুবিধার তরে—
কিন্তু তার দাস হই সবে চিরতরে।
তাহার নির্দেশে মোরা চলি দিন রাত—
কথা বলে অবিরত নেড়ে দুই হাত।
প্রতিদিন কানমলা তারে নাহি দিলে ;
চুপ করে বসে থাকে সাড়া নাহি মিলে।

(২)

বল ত, কোন জিনিষ না ভেঙ্গে উচ্চারণ করা যায় না ?

আমার দৃষ্টিতে কুমুদ রঞ্জন মল্লিক

জয়িতা বন্দ্যোপাধ্যায় বয়স ১৬—গ্রাঃ সং ১৭৯০

বিগত ২০শে ফেব্রুয়ারী আমরা শান্তিনিকেতনের 'পাঠভবনের' ঐচ্ছিক বাংলার ছাত্রছাত্রীরা, একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে, কবিবর কুমুদরঞ্জন মল্লিকের আবাসস্থল কোগ্রামে গিয়েছিলাম। কোগ্রাম বর্ধমান জেলার একটি ছোট গ্রাম।

ভ্রমণের দিনটি আসার বহু আগে থেকেই আমাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার সীমা ছিল না। যথা নির্দিষ্ট দিনে বাসে করে ১২ জন বাংলার ছাত্রী এবং ৬ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা গন্তব্য স্থলের অভিমুখে যাত্রা করলাম। আগেই কবিকে চিঠি দিয়ে আমাদের যাত্রা-সংবাদ অবগত করানো হয়েছিল আমাদের কবি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন একটি ক্ষুদ্র অথচ আন্তরিকতায় পূর্ণ চিঠি দিয়ে। যাই হক বাস থেকে নেমে দেখি আমাদের নিয়ে যেতে দুই তিনজন লোক এসেছে। তাদের সঙ্গে অজয়ের রৌদ্রতপ্ত বালির উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে কিছুটা জল পার হলাম তারপর কবির গৃহে পৌছলাম। যেতেই কবি আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা জানালেন, বারবার বলতে লাগলেন, 'তোমরা এসেছ, আমি বড় খুশি হয়েছি, কবিকে দেখেছিলাম, ৮০ উত্তীর্ণ, কিন্তু জরা তাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করতে পারেনি, এখনও বেশ শক্ত, হেঁটে চলে বেড়াতে পারেন। সৌম্য মূর্তি, শুভ্র কেশ যেন প্রাচীনকালের কোন ঋষিমূর্তি। তাঁর স্ত্রী এলেন, আদর্শ হিন্দুগৃহিণীর মতো রূপ। চওড়া লাল পাড় শাড়ী, সিঁদুরের টিপ। প্রণাম করলাম দুজনকে। আমাদের সকলকে নিমন্ত্রণ জানালেন দ্বিপ্রাহরিক আহারের এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা

এই যে কবি বসে থেকে আমাদের খাওয়ার তদারক করলেন নিজে অভুক্ত থেকে! এঁরা প্রাচীনকালের মানুষ, অতিথিকে দেখেন নারায়ণের মতো। দুপুরে খাওয়ার পর আমরা শান্তিনিকেতন থেকে নিয়ে যাওয়া কিছু উপহার দিলাম তাঁকে, তারপর গান ও পাঠ করে তাঁকে শোনানো হল। আমাদের অনুষ্ঠান শেষে তিনি তাঁর স্মৃতিকথা বললেন। তারপর বিদায়ের পালা, সকালের সব উৎসাহ মিলিয়ে গিয়ে নেমে এল সকলের মনে বিষাদের ছায়া। প্রণাম করে বিদায় নিলাম, শুধু মনে উজ্জ্বল ছবি হয়ে রইল একটি সুন্দর দিনের স্মৃতি।

ভালুক সেপাই

সন্দীপন দেব

গ্রাহক নং ২০৪০—বয়স ৬ বছর

(বিদেশী গল্পের অনুবাদ)

একদিন একটা সেপাই একটা গাছের নীচে ঘুমিয়ে ছিল। ও ভাবছিলো যে—যুদ্ধ থেকে ফিরছি, চাকরি-বাকরি নেই, বাড়ি গিয়ে খাব কি? হঠাৎ একটা ঘর্‌র্‌ ঘর্‌র্‌র্‌র্‌ শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। সেপাই উঠে দেখল. একটা বামন তার দিকে আসছে। সেপাইয়ের কাছে এসে বামনটা বলল, 'হ্যাঁ, গো, এত মন খারাপ করে বসে আছ কেন?'

সেপাই হেসে বলল, 'আজ্ঞে যুদ্ধ শেষ হয়েছে, বাড়ি যাচ্ছি, কিন্তু সঙ্গে টাকা-পয়সা নেই, বাড়ি গিয়ে খাব কি? তাই মন খারাপ করে বসে আছি।'

বামন কোনো উত্তর দিল না, অন্য কথা পাড়ল:

'তোমার পিছন দিকে তাকিয়ে দেখ।'

সেপাই পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল—একটা ভাল্লুক তার দিকে ভীষণভাবে এগিয়ে আসছে!

বামন বলল—'যদি তুমি সাহস করে এই ভাল্লুকটাকে তাড়িয়ে দাও, তাহলে তোমার ভাগ্য ফিরে যাবে। আর যদি তোমার সাহস না থাকে, তবে তোমার ভাগ্য ফিরবে না আর তুমি আমার চাকর হয়ে থাকবে।'

সেপাই বলল—'আমার সাহস আছে, আমি ভালুকের নাকের নিচে সুড়সুড়ি দিয়ে তাড়াব। বলেই ভালুকের নাকের নিচে সুড়সুড়ি দিল! আচমকা এই সুড়সুড়িতে ভালুকটা ভয় পেয়ে ভূত ভেবে চারলাফে পগার-পার।

বামন থলি থেকে একটা ভালুকের চামড়া বের করে বলল—'এই ভালুকের চামড়াটা পরে নাও এই ভালুকের চামড়া পরে তোমাকে সাত বছর থাকতে হবে। সাত বছর পরে থাকলে আমি এসে তোমাকে খুব বড়লোক করে দেব। আর যদি তুমি সাত বছর পূর্ণ হবার এক মিনিটও আগে এটা খোল তবে আমার কাছে সারাজীবন চাকর হয়ে থাকবে।' বলে বামন অদৃশ্য হয়ে গেল।

এবার সেপাই ভালুকের চামড়াটা পরে ফেলল। পকেটে হাত দিয়ে দেখলে—পকেট ভর্তি টাকা পয়সা।

হেঁটে চলল সে যেদিকে দুচোখ যায়। সব জায়গায় সে গরীবদের টাকা-পয়সা দিত।

রাত্রিবেলা কোনো না কোনো হোটেলে থাকত।

একদিন সেপাই একটা গাছের নিচে শুয়ে আছে। এমন সময় একটা সত্যিকারের ভালুক এসে হাজির হল। ভালুকের চামড়া পরা সেপাইকে দেখে সে অবাক হয়ে তার বউকে বলল—'এমন অদ্ভুত ভালুক তো জীবনে দেখিনি।'

এমনি করে তিন বছর প্রায় কেটে গেল। এক রাত্রে একটা হোটেলের মালিকের সঙ্গে সে কথা বলছিল: 'আমাকে একটা ঘর দাও না।'

—'আমি একটা ভালুককে একটা ঘর দিতে পারব না।'

শেষে অনেক বলা-কওয়ার পর মালিক বলল—'তোমাকে আমি আস্তাবলে জায়গা দিতে পারি।'

রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন ও ভাবছিল—যদি আজই সাত বছর পূর্ণ হয়ে যেত তবে খুব ভালো হত।

এমন সময় ও শুনলো যে—কে যেন কাঁদছে! সে পাশের ঘরে গেল। গিয়ে দেখল—একটা বুড়ো মতন লোক বসে-বসে কাঁদছে।

—'তুমি কাঁদছ কেন?'

লোকটা গুটিসুটি দিয়ে বসেছিল। বলল—'আমার কাছে একটা পয়সাও নেই যে ঘর ভাড়া দিই। হোটেলের মালিক বলেছে—কালকে আমার জামা, জুতো, প্যাণ্ট, মোজা সব কেড়ে নেবে।'

—'আমি তোমার ভাড়া দিয়ে দেব।' বলল সেপাই। 'ডাকো মালিককে।' লোকটা গিয়ে মালিককে ডেকে নিয়ে এল। মালিক বলল—'কি, তুমি মিঃ গুফোর ভাড়া দেবে?'

ভালুকের চামড়া পরা সেপাই বলল—'হ্যাঁ, আমিই দেব।' তারপর মালিক ভাড়া নিয়ে চলে গেল। সেপাই লোকটাকে একথলি টাকা দিল।

লোকটা টাকা পেয়ে খুব খুশি! 'আমার তিন মেয়ে। তুমি আমার বাড়ি চল। তোমার যাকে ইচ্ছে বিয়ে করবে।'

সেপাই বলল—'আচ্ছা।'

বুড়ো বলল—'চল।'

অনেক নদী, নালা, পাহাড়, পর্বত, গাড়ি, ঘোড়া, লোক আর রাস্তা পেরিয়ে বুড়োর বাড়িতে এল সেপাই আর বুড়ো।

বুড়ো বাড়ির দরজায় খট্-খট্ শব্দ করল। দরজা খুলল একটা মেয়ে। বাজে দেখতে। টিঙ-টিঙে সরু চেহারা। মাথাটাও লম্বা মতন।

'এই আমার বড় মেয়ে ছন্দা। ওরে মিন্নু! ওরে নীমা!'

সঙ্গে সঙ্গে আরও ছুটো মেয়ে এল। মিনুটা ছন্দার চেয়েও বাজে দেখতে। ভীষণ মোটা। আর নীনা ?

তার কথাই আলাদা। ফর্সা রঙ। ঠোঁটগুলো টকটকে লাল। চোখগুলো টানা টানা। সুন্দর ভুরু। প্রথমে ডাক পড়ল ছন্দার।

বুড়ো বলল—'ও আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। তুমি কি ওকে বিয়ে করবে ?'

—'আমি একটা ভালুককে বিয়ে করব না।'

বুড়ো এবার বলল—'মিনু, তুমি বিয়ে করবে ?'

—'আমি একটা ভালুককে বিয়ে করব না, বাবা।'

বুড়ো এবার বলল—'মা নীনা, তুমিও কি তোমার দিদিদের মত করবে ?'

—'না বাবা, আমি ওকেই বিয়ে করব। আমি দিদিদের মত করব না।'

সেপাই বলল—'এখন তো বিয়ে হবে না। চারবছর পরে বিয়ে হবে।'

'কেন ?' তখন সেপাই তার সারাজীবনের কাহিনী বলল।

শুনে সবাই অবাক হল। সেদিনের মত সেপাই বিদায় নিল।

সে চীনে গেল। রাশিয়াতে গেল। জাপানে গেল। সারা ছুনিয়া ঘুরল। শেষে চার বছরে শেষদিন এল।

সে বামনটাকে প্রথম যেদিন যে গাছের নিচে দেখেছিল সেই গাছের নিচে এসে বসল।

হঠাৎ বোমা ফাটার মত একটা শব্দ হল। পৃথিবী যেন কালো হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বামনা এসে হাজির।

সেপাই ভালুকের চামড়াটা খুলে ফেলে বলল—'তুমি আমাকে বলেছিলে সাতবছর পূর্ণ হলে প তুমি আমাকে একথলি টাকা দেবে।'

—'হ্যাঁ, এই নাও টাকা।' বলে বামন তাকে একথলি মোহর দিল 'এই মোহর সারাজীবন খ করলেও ফুরবে না।' বলে বামন অদৃশ্য হয়ে গেল।

সেপাই ছুটে শহরে গেল। সেখানে একটা বড় দোকান থেকে সার্ট, প্যান্ট, জুতো, মোজ পোষাক আর একটা তলোয়ার কিনে সেজে গুজে নিল। তারপর একটা সুন্দর ঘোড়ার গাড়ী কি তার সঙ্গে ছুটো সাদা তেজী ঘোড়া জুতে চলল সেই বুড়োর বাড়ি।

বুড়ো আর তার মেয়েরা তো সেপাইকে চিনতেই পারে না। গুকো বলল—'আমাদের f সৌভাগ্য। একজন জেনারেল আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন। শিগগির খাবার দে।'

সেপাই তখন তার পরিচয় দিয়ে বলল—'আমি সেই ভালুক-সেপাই। এখন আমি ধনী লোক !'

তখন আর সবাইকে পায় কে ? খুব ধুমধাম করে সেপাই আর নীনার বিয়ে হয়ে গেল। ভোজ হল। বরযাত্রীরা ছু সপ্তাহ ধরে খেল।

আর ছন্দা আর মিনু ?

তারা লজ্জায় এক বছর আর বিছানা থেকে মাথা তুলল না।

বেনারস ভ্রমণ

রবীন্দ্রশঙ্কর সেনগুপ্ত—গ্রাহক সংখ্যা ৩৮৬ বয়স ১৩ বছর

গত বছর পুজোর আগে থেকেই বেনারস যাবার কথা হচ্ছিল। খুব হৈ চৈ করে টিকিট কেনার কিছুদিন পরেই আমার জ্বর হল। আমার জ্বর দেখে বাড়ি শুদ্ধ, সকলের মুখ চুণ। যাব কি যাব না এই করতে করতে ডাক্তারের কথামত ওষুধ নিয়ে হাওড়া স্টেশন থেকে দিল্লী-কালকা এক্সপ্রেসে উঠে বসলাম। সবাইকে নিয়ে এই আমার প্রথম বাইরে যাওয়া। আনন্দের আর শেষ নেই। অনেক রাত পর্যন্ত আমরা সবাই বাইরে চেয়ে রইলাম, চোখে আর ঘুম নেই। ট্রেন অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলল। বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল ও কুলটি হয়ে বরাকরে ট্রেন থামল। সেইখানে ডিজেল ইঞ্জিনের জায়গায় ইলেকট্রিক ইঞ্জিন লাগানো হল। তারপর শুরু হল আবার ছোটা। অন্ধকারে প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। পেছনে পড়ে রইল ধানবাদ, হাজারীবাগ, গয়া সাসারাম প্রভৃতি স্টেশন। সকাল ৯টায় ট্রেন মোগল সরাই স্টেশনে এসে থামল। এখানে এসে আমাদের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর কথা মনে এল। এই জায়গায় তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বেশ একটু কষ্ট করে ওভার ব্রিজ পার হয়ে ট্যাক্সিতে উঠে বসলাম। ট্যাক্সি মালব্য ব্রিজে গিয়ে উঠলে বাবা বললেন 'ঐ দেখো বারাণসী।' তখন দেখলাম, গঙ্গার বুকে অর্ধচন্দ্রের মত বারাণসীকে। মনে পড়ে গেল কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'বারুণী' কবিতার কয়েকটা লাইন— চমকি চাহিনু স্বর্গ-সুষমা মর্ত্যে পড়েছে খসি।' বেনারসের ক্লার্ক হোটেলে গিয়ে উঠলাম। সেখানে ব্রেকফাষ্ট, লাঞ্চ, টি ও ডিনার খেলাম। পরের দিন ভারত সেবাশ্রমে গিয়ে উঠলাম। সেখানে কিছুদিন থেকে রবীন্দ্রনগরে একটা বাড়িতে এসে উঠলাম। যাঁর বাড়ি তাঁরা আমাদের খুব আদর যত্ন করতেন। ঐ বাড়িতে বাবু নামে একটা ছেলে ছিল। ওর সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেছিল। আমরা প্রথমেই বেনারসের বিশ্বনাথের মন্দির দেখতে গেলাম। ঠাকুমা হাঁটতে পারেন না তাই তাঁকে ডুলি করে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে আমাদের পাণ্ডা ভগলু তেওয়ারী ছিল, সেই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। বিশ্বনাথের গলিটা খুব স্যাঁতসেঁতে আর সরু। আমরা বিশ্বনাথের লিঙ্গ দর্শন করলাম। তারপর আমরা রামমন্দির দেখলাম। সেইখানে নৃসিংহ অবতার, বরাহ অবতার, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রাম, শিবের জটা থেকে গঙ্গার উৎপত্তি প্রভৃতি মূর্তি আছে। তারপর আমরা দুর্গাবাড়ি ও তুলসী মানসমন্দির দেখলাম। দুর্গাবাড়িতে পিতলের দুর্গামূর্তি আছে। দুর্গাকুণ্ডর ধারে অনেক বানর আছে। বানরগুলি বেশ বড় ও এগুলি দেখে খুব ভয় করছিল। তুলসী মানসমন্দিরের গায়ে রামায়ণের সচিত্র কাহিনী বর্ণিত আছে। এখানে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, ভরত, শত্রুঘ্ন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, হনুমান ও গরুড়ের মূর্তি আছে।

বেনারস ভ্রমণের প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল সারনাথ যাওয়া। সকাল ৯টার সময় আমরা গাড়ি করে রওনা হলাম। পথে যেতে যেতে অনেক উট দেখলাম। এখানে নেমে কতকগুলি ধ্বংসস্তূপ ও সারনাথ স্তূপ দেখলাম। এই ধ্বংস স্তূপগুলি দেখার সময় সেই সময়ের ভারত সম্রাট অশোকের কথা মনে পড়ে গেল। কলিঙ্গ যুদ্ধের ভীষণতার পর তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে বহু স্তূপ, স্তম্ভ, বিহার প্রভৃতি তৈরি করান। এই ধ্বংস স্তূপগুলির মধ্যে বহু মঠ, বিহার তোরণ প্রভৃতি আছে। এরপর সারনাথের মন্দির দেখলাম। এখানে পেতলের বুদ্ধের মূর্তি আছে ও মন্দিরের গায়ে বুদ্ধের আবির্ভাব থেকে তিরোভাব সচিত্র ভাবে বর্ণিত আছে।

এরপর সারনাথের জাদুঘর দেখলাম। জাদুঘরে পুরাণো দিনের বহু মূর্তি আছে যেমন, অশোক-স্তম্ভ, বোধিসত্ত্ব গৌতম, সূর্য, পার্বতী, শিব প্রভৃতি। এখানে বুদ্ধদেবের পাথরের ছাতা আছে। এগুলি মৌর্যযুগ, গুপ্তযুগ ও পালযুগের শিল্পের নিদর্শন। এখানে 'Deerpark' আছে ও এখানে অনেক রকমের হরিণ আছে। ফিরবার পথে একটা বুদ্ধমন্দির দেখলাম। এটা বার্মিজ প্যাগোডা ধরনের। এখানেও বুদ্ধের আবির্ভাব থেকে তিরোভাব দেওয়ালের গায়ে সচিত্র ভাবে বর্ণিত আছে।

এরপর আমরা রাজঘাটের ধ্বংসস্তূপগুলি দেখতে গেলাম। গঙ্গার ধারে কয়েক হাজার বছরের পুরানো এই ধ্বংসস্তূপগুলিকে সারনাথের মত খুঁড়ে বার করা হয়েছে। এখানে এক সাধুকে দেখলাম তিনি নদীর ধারে গুহায় বাস করেন। এখানে একটা সুন্দর মন্দির আছে ও সেখানে কেশরের মূর্তি আছে। মন্দিরের চাতালটা বেশ বড় ও চাতাল থেকে সিঁড়িগুলি গঙ্গা পর্যন্ত নেবে গিয়েছে। কিছু দূরে পাহাড়ী নদী বরুণা আর অসী এসে গঙ্গার সঙ্গে মিলছে। এই জায়গাটার নাম ত্রিবেণী। বরুণা আর অসী নদীর নাম থেকেই কাশীর আরেক নাম বারাণসী।

এরপর আমরা বেনারসের বিখ্যাত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে গেলাম। এই জায়গাটা বে নির্জন ও অজস্র গাছপালায় ভর্তি। এক একটা ব্লকে এক একটা বিভাগ, যেমন বিজ্ঞান বিভাগ, ক বিভাগ, বাণিজ্য বিভাগ, চারুকলা বিভাগ, আয়ুর্বেদ বিভাগ প্রভৃতি। এইখানে ছাত্রদের থাকব জন্য হোস্টেলও আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিড়লা মন্দির নামে একটা মন্দির আছে। সেখানে ব্রহ্মা বিষ্ণুর মূর্তি ও শিবলিঙ্গ আছে। মন্দিরের বাগানটা খুব সুন্দর ও এখানে অনেক মূর্তি আছে। যে শিবের জটা থেকে গঙ্গা নামছেন আর ভগীরথ হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন।

যাঁর বাড়িতে ছিলাম তিনি আমাদের একদিন ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ায় নিয়ে গেলেন। সেখানে উ বন্ধু ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মিঃ ট্যানডনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। সেই দিনই সন্ধ্যাবে আমরা বিশ্বনাথের আরতি দেখতে গেলাম। তখন বিশ্বনাথের ঘরে মিঃ ট্যানডনকে দেখে আমরা অবাক। যে ট্যানডনজী দুপুরবেলায় টাই স্যুট পরে সিগারেট মুখে দিয়ে ব্যাঙ্কের অফিসে বসেছিে তিনিই এখন বিরাট ভুঁড়ির উপর গরদের কাপড় পরে, হাতে ও গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পরে, কপা ত্রিপুণ্ড্রক কেটে বিশ্বনাথের মাথার উপর বাজনার তালে তালে চামর দোলাচ্ছেন। তাঁর পাশে দাঁ একজন পূজারী ডমরু বাজাচ্ছেন, আর কয়েকজন পূজারী নানারকমের গয়না ও ফুল দিয়ে শিবলিঃ

সুন্দর করে সাজাচ্ছেন। যখন প্রদীপ জ্বালিয়ে আরতি শুরু হল, তখন সকলেই গাল বাজিয়ে 'হর হর ব্যোম্ ব্যোম্' বলতে শুরু করলেন।

এরপর রাত্রি ৯টার সময় শয়নারতি দেখতে গেলাম। এও দেখবার মত। শুনলাম শয়ন আরতির খরচ নাকি মাদ্রাজ সরকার বহন করেন। বালতিতে করে অনেক দুধ আনা হল, একটা মেহগনির খাট, মখমলের বিছানা, সিল্কের চাদর, দামী পাথরে খচিত সোনার মুকুট আনা হল। আরতির পর এগুলিকে খাটের উপরের রাখা হল ও মন্দির বন্ধ হয়ে গেল।

বেনারসের গঙ্গায় নৌকায় চড়ে বেড়ানো অনেক দিন মনে থাকবে। একদিন বিকালে দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে নৌকায় চড়ে বসলাম। নৌকায় যেতে যেতে মণিকর্ণিকার ঘাট দেখলাম, এই ঘাটে আছে একটা শ্মশান ও চিতার আভায় জল লাল হয়ে উঠেছিল। প্রথমে একটা ঘাটে নামলাম, এই ঘাটে ত্রৈলঙ্গস্বামীর মঠ আছে। এখানে ত্রৈলঙ্গস্বামীর মূর্তি আছে আর আছে একটা শিবলিঙ্গ, এই শিবলিঙ্গ তিনি নাকি মাথায় করে গঙ্গা থেকে তুলে এনেছিলেন। এরপর আরেকটা ঘাটে পশুপতি নাথের মন্দির দেখলাম। এই মন্দিরটা নেপালের রাজার সাহায্যে তৈরি হয়েছে। প্রথম শিবলিঙ্গ দর্শন করলাম। মন্দিরের গায়ে কতকগুলি সুন্দর কাঠের কারুকার্য ছিল। অনেকক্ষণ ধরে এইগুলিকে দেখলাম। ভাল করে দেখবার জন্য ছোটমা যেই না তার মধ্যে হাত দিল, তক্ষুণি একটা বোলতা কামড়ে দিল। পরে জানলাম যে কাঠের কারুকার্যগুলির ফাঁকে কতকগুলি বোলতা বাসা বেঁধে ছিল। এরপর আরেকটা ঘাটে কেদার নাথের মন্দির দেখলাম। মন্দিরটা খুব স্যাঁতসেঁতে আর অন্ধকার। এখানে একটা ষাঁড়ের বড় মূর্তি আছে। কেদারনাথের লিঙ্গ দর্শন করে নৌকায় উঠে বসলাম। যেতে যেতে রাজা হরিশ্চন্দ্রের ঘাট দেখলাম। এই ঘাটেও একটা শ্মশান আছে। পুরাণে কথিত আছে রাজা হরিশ্চন্দ্র তাঁর রাজ্য হারিয়ে এই শ্মশানে ডোম হয়ে কিছুকাল ছিলেন। এ জন্যই ঘাটটার নাম রাজা হরিশ্চন্দ্রের ঘাট। তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে, সূর্য অস্ত যাচ্ছে, আকাশের রঙ সোনার মত। আর গঙ্গার রঙও গলা সোনার মত লাগছে।

বেনারসে ভারতের একজন মহাপণ্ডিত শ্রীগোপীনাথ কবিরাজের বাড়িতে গিয়েছিলাম। আমরা তাঁর ঘরে গিয়ে বসলাম। তিনি একটা চৌকিতে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে আমরা কোথা থেকে এসেছি। তাকে প্রণাম করে আমরা চলে আসব এমন সময় গোপীনাথ কবিরাজের সহধর্মিনী আমাদের তিনতলায় ডাকলেন। আমরা তাঁর কাছে গিয়ে বসতে, তিনি আমাদের প্লেটে করে নানারকমের খাবার খেতে দিলেন ও ছেলেবেলার গল্প করতে লাগলেন। তাঁকে প্রণাম করে আমরা বাড়ি ফিরে এলাম। আমরা যেখানে থাকতাম, তার কিছু দূরেই ছিল ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজার বাড়ি। (ক্রিকেট জগতে তিনি ভিজি নামে পরিচিত)। তাঁর একটা হাতি ছিল, সেটা প্রতিদিন আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যেত। বেনারসে গিয়ে রাস্তায় প্রথম উট দেখলাম। উটের পিঠে চড়ে যেতে এর আগে আর কখনও দেখিনি। একদিন বিশ্বনাথের মন্দির থেকে আসছি, বাড়ির কাছে আসতে দেখলাম কতকগুলি উট যাচ্ছে। এর মধ্যে কেন জানি না

একটা উট হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে আমাদের বাড়ির সামনের টেলিফোন পোস্ট্‌টাকে ভেঙ্গে দিল। আমি ভয়ে দৌড়ে বাড়ির ভিতর চলে এলাম।

বেনারসের কাঠের খেলনা নাম করা। বিশ্বনাথের গলি থেকে বেশ কিছু কাঠের খেলনা কিনে এনেছিলাম। বেনারসে থাকতে প্রতিদিনই টাঙ্গা আর সাইকেল রিকসায় চড়তাম। প্রাচীন বিশ্ব-নাথের মন্দিরটাকে ১৬৭৮ সালে মুঘল সম্রাট আওরংজেব মসজিদে পরিণত করেন। ইতিহাসে কথিত আছে যে আওরংজেব ১৬৭৭ সালে বেনারস অবরোধ করলে তখনকার পূজারী নাগা সন্ন্যাসীরা হীরা-পান্নার তৈরী লিঙ্গ নিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে পড়েন, সেই থেকে লিঙ্গ নাকি আর পাওয়া যায় না। ১৭৭৫ সালে ইন্দোরের মহারানী অহল্যাবাই পুনরায় আরেকটা লিঙ্গ স্থাপন করেন।

বেনারসের গলিগুলি খুব সরু সরু আর ষাঁড়ে ভর্তি। এখানে ট্যাক্সিতে মিটার বসানো নেই, এখানে মাইল অনুযায়ী ভাড়া ধরা হয়। বেনারসে থাকতে প্রায় প্রতিদিনই কাশীর বিখ্যাত পেঁড়া-ওয়ালার দোকানে গিয়ে পেঁড়া খেতাম। কাশীর আর কতকগুলি বিখ্যাত খাবার হল রাবড়ী, মালাই, পানিফলের জিলাপী আর জেলোভা। জেলোভা অনেকটা অমৃতির মত। এখানে সব জিনিস খাঁটি বলেই এসব খেয়ে আমার অসুখ হয়নি।

কলকাতায় ফিরবার কিছুদিন আগে শঙ্কট মোচনের হনুমান দেবতা দর্শন করতে গিয়েছিলাম। জায়গাটা বেশ নির্জন, চারদিকে ঝিঁঝিঁ ডাকছিল ও গা বেশ ছম্‌ছম্‌ করছিল। এখানেই তুলসীদাস নাকি মহাবীর হনুমানের দেখা পেয়েছিলেন। শঙ্কটমোচনের আরতি দেখে প্রসাদ খেয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

আমাদের ফিরে আসার দিন ছিল অন্নকূট। সেদিন সোনার অন্নপূর্ণা দেখলাম। ঠাকুমাকে চেয়ারের সাহায্যে সিঁড়ি দিয়ে উপরে তোলা হল। সেখানটায় খুব গরম আর ভীষণ ভিড়। ঠাকুমাকে পাখা দিয়ে বাতাস করা হতে লাগল। তারপর যখন মন্দিরে প্রবেশ করলাম তখন মনে হতে লাগল চোখ যেন ঝলসে যাচ্ছে। সোনার রঙে ঘর ঝলসিয়ে উঠছে। অন্নপূর্ণা খাঁটি সোনার তৈরি। মহাদেব খাঁটি রূপোর তৈরি। মন্দির থেকে ফিরে এসে খাওয়া দাওয়া সেরে, যাদের বাড়িতে ছিলাম তাদের বিদায় জানিয়ে রাত দশটার সময় মোগল-সরাই স্টেশনে এসে হাওড়াগামী দিল্লী কালকা-এক্সপ্রেসে উঠে বসলাম।

উত্তর দেবার শেষ দিন ১০ই ফেব্রুয়ারী।

(১)

বন্ধ ঘরে আছি, সেথা নাই জানালা নাইত দ্বার,
রূপের ছটা দেয়াল ফুটে বাইরে বেরোয় চমৎকার।
বন্ধ ঘরেই থাকি ভাল, খুললে পরাণ আইঢাই।
দিন ফুরোলে আদর আমার, দিন থাকিতে আদর নাই।
স্নেহের গুণেই বাঁচি আমি তার অভাবে মরে যাই।
বিদেশ থেকে আমদানি মোর, বিদেশী নাম ধরি তাই।

(২)

প্রতি দুইটি ছত্রের উত্তরে একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন ;—

(ক) নবীন বয়স তার, শিশু যুবা নয়— (বালা)

(খ) দ্বিতীয় সে প্রথমের মনিবন্ধে রয়— (বালা)

১। (ক) বিনা পালে বিনা দাঁড়ে তরী তাতে চলে।

(খ) কারো কাছে সমাদর নেই সে না হলে।

১। (ক) দ্রুতবেগে সোজা সে যে ছুটে চলে যায়।

(খ) নদ নদী জলাশয় পাশে তারে পায়।

৩। (ক) রাজার কাছেতে তারে আনে প্রজাগণ।

(খ) তার দ্বারা সব কাজ করি সমাপন।

(৩)

সত্যসহায় সেনের কথা মনে আছেত তোমাদের? সেই যে বিখ্যাত গোয়েন্দা, মক্কেল একটাও মিছে কথা বললে যিনি কোন তদন্তের ভার নেন না? তবু কত ধনী, মানী লোক, রাজা মহারাজা

তাঁকে সাধাসাধি করতে থাকে, এমনই তাঁর পশার!

এই ত সেদিন এলেন বোম্বাগড়ের রাজা। বোম্বাগড়ের নাম শোন নি? সুন্দরবনের কাছে দশটা ছোট্ট দ্বীপ নিয়ে হল বোম্বাগড় রাজ্য। মহাদেশের সঙ্গে আর পরস্পরের সঙ্গে কয়েকটি সাঁকো দিয়ে জোড়া এই রাজ্যে ঢুকবার প্রত্যেকটি পথই সুরক্ষিত। তবু যে কি করে সেখানে চুরি হল কে জানে!

রাজামশাই এসে সত্যসহায় বাবুকে বললেন যে তাঁর রাজ্যের পাঁচটা দ্বীপের প্রত্যেকটি থেকে একটা করে সাঁকো তীরে এসেছে। তাছাড়া চারটে দ্বীপ থেকে চারটে করে সাঁকো বেরিয়েছে, তিনটে দ্বীপ থেকে বেরিয়েছে তিনটে করে আর একটা এমন দ্বীপ আছে, যেখানে যাবার কেবল একটা মাত্রই সাঁকো।

(১) বলত সত্যসহায়বাবু এই তদন্তের ভার নেবেন কিনা।

(২) কেন?

পৌষমাসের ধাঁধার উত্তর

(১) আদায়।

(২) লা।

(৩) শশাঙ্কশেখর চট্টোপাধ্যায়, মৃগাঙ্ক মোহন মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং কৃতান্তকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

উত্তরদাতাদের নাম

যাদের সব কয়টি উত্তর ঠিক হয়েছে:—

২৮৮ গোপা বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩২১ অজন্তা ও বন্দিতা ঘোষ, ৬১৬ ভারতী মিত্র, ৮৩৮ সুপ্রতীক বাগচী, ১২৩২ নন্দিনী দত্ত মজুমদার, ১৩১০ শীলা ও আশীষ রহমান, ১৩৪৮ রিতা, রুমা, বাসব ও শান্তনু রায়, ১৩৬০ কামাল হোসেন, ১৪৮১ উত্তমকুমার বটব্যাল, ১৫৮৩ অঞ্জন চ্যাটার্জী, ১৬১৫ পথিকৃৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৬৫১ হাম্বির মজুমদার, ১৬৬৭ উদয়ন ব্যানার্জি, ১৬৬৯ অমিতাভ ও বাণী মুখোপাধ্যায়, ১৭০৫ কৃষ্ণকলি বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮১২ অমিতাভ মুখার্জী, ১৮৩৫ সৈয়দ আহসান জমিল, সৈয়দ হাসমত জালাল ও সৈয়দ সুশোভন রফি, ১৯৩৮ লীনা মিত্র, ১৯৯৭ অনসূয়া বসু, ২০৪০ সন্দীপন দেব, ২০৪৫ সৌমিত্র সেনগুপ্ত, ২০৫৭ কমলেশ দাশগুপ্ত, ২০৮১ শুভাশিস ঘোষ, ২০৮৪ ইন্দ্রনীল ও পলা সেনগুপ্ত, ২০৯৭ প্রসূন রায়, ২২১৫ শুভা মজুমদার, ২২৮৭ সঙ্ঘমিত্রা চক্রবর্তী, ২৫৭৪ অপরাজিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৮৩৭ অর্পিতা রায়চৌধুরী, ১২৯৮ রুদ্রনাথ ঘোষ দস্তিদার, ১৫৬৭ দেবাশীষ মুখার্জী।

যাদের দুইটি উত্তর ঠিক হয়েছে:—

৫৭ শাশ্বতী দত্ত, ২৮৪ নূপুর ও মিঠু দাশগুপ্ত, ৯৮৩ জ্যোতির্ময়, ইন্দ্রাণী ও ঈশানী মজুমদার, ১১৫৪

ককা চৌধুরী, ১৪০১ মহাশ্বেতা গঙ্গোপাধ্যায়, ১৪৬০ কেয়া বসু, ১৮৮৫ রীনা ও হেনা ভট্টাচার্য, ১৮৯৪ ‌ঃস্মিতা কাঞ্জিলাল, ২০৬৬ মিলিন্দ চক্রবর্তী, ২১৭০ অম্লান ভট্টাচার্য, ২২২১ সোমনাথ ঘোষ, ২২৩৯ অনীতা ‍্যাটার্জী, ২২৬৭ ভবেশ, দেবী ও মধুমিতা কুরী, ২৩২৯ দুলাল সমাদ্দার, ২৩৬১ অঞ্জন ভট্টাচার্য, ২৫৪৪ ‌াস্থনা রায়চৌধুরী, ২০৪৭ প্রসেনজিৎ ও মৈত্রেয়ী বসু, ২৭৬১ ঋতা, মিতা ও ইন্দ্রাণী সেনগুপ্ত, ২২৬ জয়ন্ত ও প্রবাল কুমার নন্দীরায়, ১৪৪৫ পার্থপ্রতিম গুপ্ত।

একটি উত্তর ঠিক

১৩৯৪ বুলা দাশগুপ্ত, ২০৫৩ জয়ন্ত ও তাপসী রায়, ২০৭১ মৈত্রেয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়, ২১৪২ স্বর্ণাভ ব্যানার্জি, ২২২৪ শুভময় ও কল্যাণময় চট্টোপাধ্যায়, ২০৪০ সোনালী বন্দ্যোপাধ্যায়, ২১৫৯ স্বাথী ও শুভঙ্কর বাগচী।

গতমাসের উত্তরদাতাদের মধ্যে ২০৫৭ কমলেশ দাশগুপ্তর নাম ভুল করে ৩০৫৭ কললেশ সরকার এবং কার্ত্তিকমাসে ২০৮৪ ইন্দ্রনীলের নাম ভুল ক্রমে ইন্দ্রাণী ছাপা হয়েছিল।

মোহন লাল গঙ্গোপাধ্যায়

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদ তোমরা হয়ত কাগজে পড়েছ। বাংলা ভাষায় ছেলেমেয়েদের জন্য যাঁরা সত্যিকার ভালো গল্প লিখে গেছেন, মোহনলাল ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন।

মোহনলালের বাবা মণিলালের বিয়ে হয়েছিল ঠাকুর পরিবারে। মোহনলালের মা ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেয়ে। মণিলাল তখনকার দিনের একজন নামকরা সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর লেখা ভূতের গল্পের বই 'কায়াহীনের কাহিনী' যে পড়েছে, সেই জানে তিনি ছোটদের জন্যেও কত ভালো লিখতেন।

আজ থেকে সাতচল্লিশ বছর আগে, মোহনলালের যখন ১২ বছর বয়স, তখন সন্দেশে তাঁর লেখা প্রথম গল্প 'সোনার ঝরনা' ছাপা হয়। সেই সময় থেকে শুরু করে মোহনলাল ও তাঁর ভাই শোভনলাল, হয় দুজনে একসঙ্গে না হয় আলাদা ভাবে অনেক ভালো ছোটদের গল্প লেখেন। এই সেদিনও মোহনলালের ঝরঝরে ভাষায় অনুবাদ করা গ্রিম-ভাইদের কিছু রূপকথা সন্দেশে বেরিয়েছে।

আজ যদিও তিনি আমাদের মধ্যে নেই, আমরা বিশ্বাস করি, তাঁর লেখার মধ্যে তিনি এখনও অনেকদিন বেঁচে থাকবেন।

প্রথম চন্দ্রযাত্রা

অমিতানন্দ দাশ

চাঁদের আকাশে পৃথিবীকে কেমন দেখায় দেখলে তো ?* চাঁদকে আকাশে যেমন দেখো, মহাকাশ থেকে পৃথিবীকে তার চেয়েও বড়ো ও সুন্দর দেখায়। প্রধান কারণ পৃথিবীর ব্যাস চাঁদের ব্যাসের চার গুণ। তার ওপর চাঁদ তো খালি ম্যাড়ম্যাড়ে রঙের পাথর ও ধুলোয় ভর্তি; চাঁদ থেকে পৃথিবীর নীল সমুদ্র, সাদা মেঘ এবং সবুজ ও খয়েরী মহাদেশগুলিকে কতো সুন্দর দেখায় আন্দাজ করতে পারো। আর পৃথিবী চাঁদের চেয়ে উজ্জ্বলও বটে—পৃথিবীর সূর্যের আলো প্রতিফলন ক্ষমতা (albedo) চাঁদের প্রতিফলন ক্ষমতার প্রায় সাড়ে ছয় গুণ।

চাঁদ থেকে পৃথিবীকে এরকম দেখাবে সেটা এতদিন খালি জ্যোতির্বিদ্যার বইএর কথা ছিল, গত ডিসেম্বর মাসে মহাকাশযাত্রী লাভেল, অ্যান্ডার্স ও বরম্যান প্রথম এই দৃশ্য দেখে ও তার ছবি তুলে আনলেন! ২১শে ডিসেম্বর সকাল ৭টা বেজে ৫১ মিনিটে (ভারতীয় সময় ৬'২১) কেপ কেনেডী থেকে অ্যাপোলো-৮ চন্দ্রযানের বিশাল রকেট পৃথিবীর মাটি ছেড়ে উঠতে শুরু করে। প্রথমে আড়াই ঘণ্টা ধরে অ্যাপোলো-৮ আগের মহাকাশগুলির মতোই পৃথিবীকে প্রায় দুবার প্রদক্ষিণ করে। তারপর হিসাব করে ঠিক এমন সময় ২½ সেকেণ্ডের জন্য রকেট জ্বালানো হয় যে মহাকাশযানটি আগের কক্ষ পথ ছেড়ে চাঁদের দিকে রওনা দেয় এমন পথে যেটি চাঁদের কক্ষে পৌছবে ২৪শে ডিসেম্বর বিকেল ৩½টার সময়ে ঠিক তখন চাঁদ যেখানে থাকবে সেখানে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই অ্যাপোলো-৮ আগের মহাকাশযাত্রীদের উচ্চতার রেকর্ড ১৩৬০ কিঃ মিঃ ভেঙ্গে চাঁদের দিকে ছুটে যেতে থাকে।

২৪শে ডিসেম্বর অ্যাপোলো ৮ পৃথিবী থেকে ৪ লক্ষ কিঃ মিঃ দূরে চাঁদের কাছে পৌছলে মানুষ প্রথম পৃথিবার মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বাধা ছাড়িয়ে আসল মহাকাশে প্রবেশ করলো। চাঁদের চারদিকে ৪০ ঘণ্টা ধরে পাক খেয়ে ২৭শে ডিসেম্বর মহাকাশচারীরা পৃথিবীতে ফিরে আসেন।

অ্যাপোলো-৮ আসল মহাকাশযাত্রার প্রথম ধাপ মাত্র, এর আগের পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা ছিলো যার মহড়া। অ্যাপোলো ৮ এর যাত্রায় যান্ত্রিক গোলোযোগ খুব কমই হয়। এতে বোঝা যায় বহুলাংশে এই একই যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে, আরো শক্ত কাজ, চাঁদের মাটিতে নামারও বেশী দেরী নেই। বছর দশেকের মধ্যেই মনে হয় চাঁদে বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের এক কলোনী বসে যাবে। তোমরা বড় হলে হয়তো চাঁদে বেড়াতে যাওয়ারও সুযোগ পেতে পারো—খরচ অবশ্য খুব কম হবে না!

* এই মাসের প্রথম ছবি।

আগে থাকতেই
সাবধান
হওয়া প্রয়োজন
এখনই সবাই
টিকা
নিন
বসন্তরোগ মানুষের এক ভয়াবহ শত্রু। বসন্তরোগ যাদের হয় তাদের মধ্যে আমাদের দেশে শতকরা চল্লিশজনের মৃত্যু ঘটে। ভাগ্যক্রমে যাঁরা বেঁচে যান, তাঁদের দেহে ঘটে নানা বিকৃতি। কেউ চিরকালের মত অন্ধ হয়ে যান, কেউ হন বধির, কারো বা দেখা দেয়. শ্বাস-যন্ত্রের রোগ, সারা দেহে থেকে যায় স্থায়ী দাগ—এতে মুখের সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়। অথচ, এই রোগ নিবারণ করার অতি সহজ প্রতিষেধক রয়েছে। বসন্তের টিকা নিলে, এই রোগের বিস্তার বন্ধ করা যায়।
এই মারাত্মক রোগ আমাদের দেশ থেকে একেবারে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার এক জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। সহর ও গ্রামাঞ্চলে প্রতি মানুষকে টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন পশ্চিম বাংলা সরকার। বাংলার প্রতিটি মানুষকে অভ্যাস করতে হবে নিয়মিতভাবে এই টিকা নেওয়ার।
এই ভয়ঙ্কর রোগের হাত থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করার জন্য জাতীয় এই পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা ক'রে একে সাফল্যমণ্ডিত ক'রে তুলুন।
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত
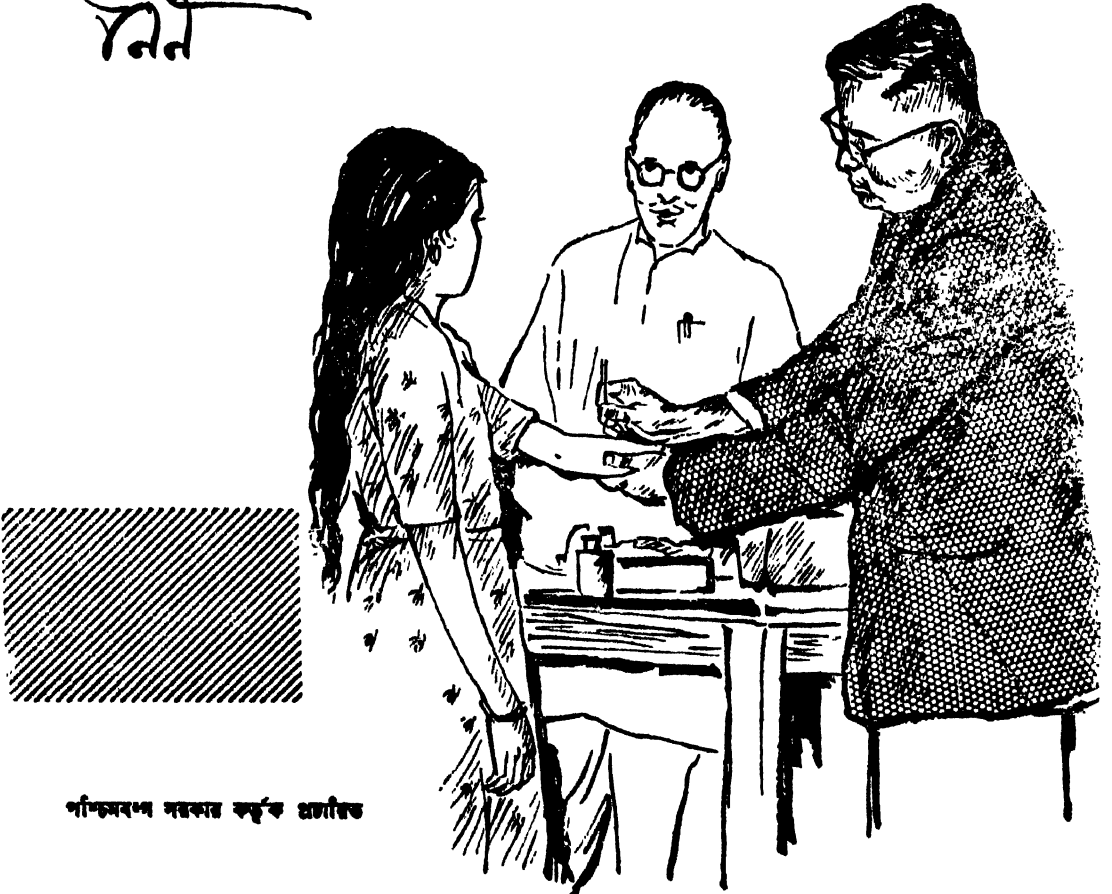
প্রোফেসর শঙ্কু ও কোচাবাম্বার গুহা—সত্যজিৎ রায়

অষ্টম বর্ষ—একাদশ সংখ্যা ফাল্গুন ১৩৭৫/মার্চ ১৯৬৯

ঘুড়ির জবানী

রমা ভট্টাচার্য

এইতো কেমন হালকা হাওয়ায় চলছি ভেসে
দোদুল দেসে
লালতারা আর নীলতারাদের দেশে
বলা যায়না চাঁদেও আমি চলতে পারি
বলতে পারি
আমিই প্রথম চন্দ্রাচারী শেষে !
এবার আমি লাট খেয়েছি নাট খেয়েছি
ঠিক চেয়েছি
'মুখপোড়া'টার সঙ্গে তবে চলুক লড়াই
গোবর গণেশ হ্যাংলা ভোঁদা ওড়ায় ঘুড়ি
গুড়িগুড়ি
সিড়িঙ্গে ওর মুখপোড়াটার কত্ত বড়াই।
'ভোঃ ভোঃ কাটা' যুদ্ধ শেষে ক্লান্ত কেহ
ধুঁকছে দেহ
স্বাধীন পথে চলছি ছুটে কোথায় যেন।
মুখপোড়াটা দাঁত করে বের ভেংচি কাটে
উঠছি লাটে
সর্ষেফুলের রাশি : হারায় চন্দ্রতারা কেন !!

৭ই আগস্ট

আজ আমার পুরোন বন্ধু হনলুলুর প্রোফেসর ডাম্‌বার্টনের একটা চিঠি পেয়েছি।

তিনি লিখছেন—

প্রিয় শ্যাঙ্ক্‌স,

বোলিভিয়া থেকে লিখছি, তা খামের উপর ডাক টিকিট দেখেই বুঝতে পারবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকেও যে সভ্য সমাজের উপকার হতে পারে তার আশ্চর্য প্রমাণ এসে পেয়েছি। সেটার কথা তোমাকে জানানোর জন্যেই এই চিঠি।

গত জুন মাসে বোলিভিয়ায় যে ভূমিকম্প হয়েছিল তার খবর তোমার গিরিডিতেও নিশ্চয়ই পৌঁছেছে। এই ভূমিকম্পের ফলে এখানকার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর কোচাবাম্বা থেকে প্রায় একশো মাইল দূরে একটা বিশাল পাহাড়ের একটা অংশ চিরে দুভাগ হয়ে একটা যাতায়াতের পথ তৈরি হয়ে যায়। এই পাহাড়ের পিছন দিকটায় এর আগে কোন মানুষের পা পড়েনি (বোলিভিয়ার অনেক অংশই ভূতাত্ত্বিকদের কাছে এখনো অজানা তা তুমি জান)। যাই হোক্, এই পাহাড়ের কাছাকাছি একটা গ্রামের কিছু ছেলে লুকোচুরি খেলতে খেলতে এই নতুন পথ দিয়ে অনেকখানি এগিয়ে যায়। তাদের

মধ্যে একজন পাহাড়ের গায়ে একটি গুহার মধ্যে লুকোনোর জন্য ঢোকে, এবং ঢুকেই তার ভিতরের দেয়ালে আঁকা রঙীন ছবি দেখতে পায়।

আমি গত শনিবার পেরুতে একটা কনফারেন্সে যাবার পথে বোলিভিয়ায় আসি ভূমিকম্পের কীর্তিটা চাক্ষুষ দেখার জন্য। আসার পর দিনই স্থানীয় ভূতাত্ত্বিক প্রোফেসর কর্ডোবার কাছে গুহার খবরটা শুনি, এবং সেইদিনই গিয়ে ছবিগুলো দেখে আসি। আমার মনে হয় তোমারও একবার এখানে আসা দরকার। ছবিগুলো দেখবার মতো। কর্ডোবার সঙ্গে আমার মতভেদ হচ্ছে। তোমার সমর্থন পেলে (নিশ্চয়ই পাবো!) মনে কিছুটা জোর পাবো। চলে এসো। পেরুতে বলে দিয়েছি—তোমার নামে কনফারেন্সের একটা আমন্ত্রণ যাচ্ছে। তারাই তোমার যাতায়াতের খরচা দেবে।

আশাকরি ভালো আছ। ইতি—

হিউগো ডামবার্টন

আমার যাওয়ার লোভ হচ্ছে দুটো কারণে। প্রথমত, দক্ষিণ আমেরিকার এ অঞ্চলটা আমার দেখা হয়নি। দ্বিতীয়ত, স্পেনের বিখ্যাত আলতামিরা গুহার ছবি দেখার পর থেকেই আদিম মানুষ সম্পর্কে আমার মনে নানারকম প্রশ্ন জেগেছে। পঞ্চাশ হাজার বছর আগের মানুষ—যাদের সঙ্গে বাঁদরের তফাৎ খুব সামান্যই—তাদের হাত দিয়ে এমন ছবি বেরোয় কী করে তা এখনো বুঝে উঠতে পারিনি। এক-একটা ছবি দেখে মনে হয়, আজকের দিনের আর্টিস্টও এত ভালো আঁকতে পারে না; অথচ এরা নাকি ভালো করে সোজা হয়ে হাঁটতেও পারত না!

নেহাৎই যদি বোলিভিয়া যাওয়া হয়, তাহলে সঙ্গে আমার নতুন তৈরি 'অ্যানিস্থিয়াম' পিস্তলটা নেবো, কারণ যে জায়গায় এর আগে মানুষের পা পড়েনি, সেখানে নানারকম অজানা বিপদ লুকিয়ে থাকতে পারে। অ্যানিস্থিয়াম পিস্তলের ঘোড়া টিপলে তার থেকে একটা তরল গ্যাস তীরের মত বেরিয়ে শত্রুর গায়ে লেগে তাকে বেশ কয়েক ঘন্টার জন্য অজ্ঞান করে দিতে পারে।

এখন অপেক্ষা শুধু পেরুর নেমন্তন্নের জন্য।

১৮ই আগস্ট

বোলিভিয়ার কোচাবাম্বা শহর থেকে একশো ত্রিশ মাইল দূরে ভূমিকম্পের ফলে আবিষ্কৃত গুহার বাইরে বসে আমার ডায়রি লিখছি। হাত দশেক দূরে মাটিতে প্রায় সমতল পাথরের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে ডামবার্টন তার হাত দুটো ভাঁজ করে মাথার নিচে রাখা, তার সাদা কাপড়ের টুপিটা সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য মুখের উপর ফেলা।

এখন বিকেল চারটে। দিনের আলো ম্লান হয়ে আসছে। আর মিনিট কুড়ির মধ্যে সূর্য নেমে যাবে পাহাড়ের পিছনে। এ-জায়গাটাকে ঘিরে একটা অস্বাভাবিক, আদিম নিস্তব্ধতা। মানুষের পা যে এর আগে এদিকে পড়েনি, সেটা আশ্চর্যভাবে অনুভব করা যায়। মানুষ বলতে যে আমি সভ্য মানুষ বলছি সেটা বলাই বাহুল্য, কারণ আদিম মানুষ যে এককালে এখানে ছিল তার প্রমাণ আমাদের

পাশের গুহাতেই রয়েছে। বোলিভিয়ার ভূমিকম্পের দৌলতে ক্রমে পৃথিবীর লোকে এই আশ্চর্য গুহার কথা জানতে পারবে। আলতামিরার গুহা আমি নিজে দেখেছি ; ফ্রান্সের লাস্‌কো-গুহার ছবি বইয়ে দেখেছি। কিন্তু বোলিভিয়ার এ গুহার সঙ্গে ও দুটোর কোন তুলনাই হয় না।

প্রথমত, ছবি সংখ্যায় অনেক বেশি। গুহার ভিতরে ঢুকলেই এক মেঝেতে ছাড়া আর সর্বত্র ছবি চোখে পড়ে। গুহার মুখ থেকে প্রায় একশ গজ ভিতরে পর্যন্ত ছবি রয়েছে। তারপর থেকে গুহাটা হঠাৎ সরু হয়ে গিয়েছে—হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে হয়। সেইভাবে বেশ খানিকটা পথ এগিয়েও আমরা আর কোন ছবি দেখতে পাইনি। মনে হয় ছবির শেষ ওই একশ গজেই। কিন্তু গুহাটা যেহেতু চওড়ায় বেশ অনেকখানি। এই একশ গজের মধ্যেই ছবির সংখ্যা হবে আলতামিরার প্রায় দশগুণ।

এ ছবিতে আঁকার গুণ ছাড়াও আরো অনেক অবাক করা ব্যাপার আছে। আদিম মানুষ গুহার দেয়ালে সাধারণত শিকারের ছবিই আঁকত। জন্তু-জানোয়ার যা আঁকত তা সবই তাদের শিকারের জিনিস। তাছাড়া, মানুষ বল্লম দিয়ে জানোয়ার মারছে, এমন ছবিও দেখা যায়। এখানেও শিকারের ছবি আছে, কিন্তু সে ছাড়াও এমন ছবি আছে যার সঙ্গে শিকারের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না ; যেমন, গাছপালা ফুল পাখি পাহাড় চাঁদ ইত্যাদি। বোঝাই যায় এসব জিনিস ভালো লেগেছে বলে আঁকা হয়েছে। আর কোন কারণ নেই। ছবির ফাঁকে ফাঁকে এক ধরণের হিজিবিজি নকশা বা অক্ষরের মত জিনিস লক্ষ্য করলাম যার কোন মানে করা যায় না। সব মিলিয়ে এটা বোঝা যায় যে এরা বেশ একটা বিশেষ ধরণের আদিম মানুষ ছিল।

আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হল এইসব ছবির রং। এই রঙের এত বাহার আর এত জৌলুস যা নাকি অন্য কোন প্রাগৈতিহাসিক গুহার ছবিতে নেই। বোধহয় এরা কোন বিশেষ ধরণের পাকা রং ব্যবহার করত। মোটকথা ছবিগুলোকে হঠাৎ দেখলে দশ বারো বছরের বেশি পুরোন নয় বলেই মনে হয়। অথচ স্বভাবতই ছবির জানোয়ারগুলো ফ্রান্স বা স্পেনের মতই সবই প্রাগৈতিহাসিক। আদিম বাইসন, বিরাট বাঁকানো দাঁতওয়ালা বাঘ—এইসব কিছুরই অজস্র অদ্ভুত ছবি এই গুহাতে আছে। এছাড়া আরেকরকম জানোয়ারের ছবি লক্ষ্য করলাম যেটা আমাদের দুজনের কাছেই একেবারে নতুন বলে মনে হল। এর গলাটা লম্বা নাকের উপর গণ্ডারের মত শিং, আর সারা পিঠময় সজারুর মত কাঁটা। একটা মোটা ল্যাজও আছে, বোধহয় কুমীরের ল্যাজের মত। সব মিলিয়ে ভারী উদ্ভট চেহারা।

আমি আজ সারাদিন আমার 'ক্যামেরাপিড' দিয়ে গুহার ছবির ছবি তুলেছি। এই ক্যামেরা আমারই তৈরি। এতে রঙীন ছবি তোলা যায়, আর তোলার পনের সেকেণ্ডের মধ্যে প্রিন্ট হয়ে বেরিয়ে আসে। হোটেলে ফিরে গিয়ে ছবিগুলো নিয়ে বসব।

গুহার বাইরে এসে চারদিকে চাইলে বেশ বোঝা যায় কেন এদিকটায় মানুষ এতদিন আসতে পারেনি। এজায়গাটার তিনদিক ঘিরে খাড়াই স্লেট-পাথরের পাহাড়। এই পাহাড়ের গা অস্বাভাবিক রকম মসৃণ, ঝোপঝাড় গাছপালা নেই বললেই চলে। অন্যদিকে অর্থাৎ উত্তর দিকে—দুর্ভেদ্য জঙ্গল। আমরা যেখানে বসে আছি সেখান থেকে জঙ্গলের দূরত্ব প্রায় আধমাইল ত হবেই। জঙ্গলের পিছনে দূরে

অ্যাণ্ডিজ পর্বতশ্রেণী দেখা যায়, তার মাথায় বরফ। গুহার আশেপাশে গাছপালা বিশেষ নেই, তবে বড় বড় পাথরের চাঁই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে, তার এক একটা পঞ্চাশ ষাট ফুট উঁচু। পোকামাকড়ের অভাব নেই এখানে, তবে পাখি জিনিসটা এখনো চোখে পড়েনি; হয়ত জঙ্গলের ভিতরে আছে। একটু আগে একটা ফুট চারেক লম্বা আরমাডিলো বা পিঁপড়ে খোর জানোয়ার ডামবার্টনের খুব কাছ দিয়ে হেঁটে গিয়ে একটা পাথরের ঢিপির পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সব কিছু মিলিয়ে এখানকার পরিবেশটা একেবারে আদিম, আর তাই গুহার ছবিগুলোর বাহার এত অবাক করে দেয়।

একটা কথা বলে রাখা ভালো—এখানকার বৈজ্ঞানিক প্রোফেসর পোরফিরিও কর্ডোবা আমাদের এই গুহা অভিযানের ব্যাপারটা খুব ভালো চোখে দেখছেন না। তার একটা কারণ হয়ত এই যে তাঁর সঙ্গে আমাদের গভীর মতভেদ হচ্ছে। কর্ডোবা বললেন—

'তোমরা এই গুহাটাকে প্রাগৈতিহাসিক বলছ কী করে জানি না। আমার মনে হয় এর বয়স খুব বেশি হলে হাজার বছর। পঞ্চাশ হাজার বছরের পুরোন গুহার ছবির রং এত উজ্জ্বল হবে কী করে?'

কর্ডোবার কথা বলার ঢং বেশ রুক্ষ—অনেকটা তার চেহারার মতই। এত ঘন ভুরু কোন লোকের আমি দেখিনি।

আমি বললাম, 'দেয়ালে যে সব প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর ছবি রয়েছে, সেগুলো কী করে এলো?'

কর্ডোবা হেসে বললেন, 'মানুষের কল্পনায় আজকের দিনেও হাতির গায়ে লোম গজাতে পারে। ওতে কিস্যু প্রমাণ হয় না। আমাদের দেশের ইন্‌কা সভ্যতার কথা শুনেছ ত? ইন্‌কাদের আঁকা ছবির কোনো জানোয়ারের সঙ্গে আসল জানোয়ারের হুবহু মিল নেই। তাহলে কি সে সব জানোয়ারকে প্রাগৈতিহাসিক বলতে হবে? ইন্‌কা সভ্যতার বয়স হাজার বছরের বেশি নয় মোটেই।'

আমি কিছু না বললেও, ডামবার্টন একথার উত্তর দিতে কসুর করল না। সে বলল, 'প্রোফেসর কর্ডোবা, আলতামিরার গুহা যখন প্রথম আবিষ্কার হয়, তখনও সেটাকে অনেক বৈজ্ঞানিকেরা প্রাগৈতিহাসিক বলে মানতে চাননি। পরে কিন্তু তাদের ভারী অপ্রস্তুত হতে হয়েছিল!'

এর উত্তরে কর্ডোবা কিছু বলেননি। কিন্তু তিনি যে আমাদের এই অভিযানে মোটেই সন্তুষ্ট নন সেকথা আঁচ করতে অসুবিধা হয়নি।

যাই হোক্, আমরা কর্ডোবাকে অগ্রাহ্য করেই কাজ চালিয়ে যাবো। আজকের কাজ এখানেই শেষ। এবার শহরে ফেরা উচিত।

১৮ই আগস্ট, রাত বারোটা

গুহা থেকে শহরের হোটেলে ফিরেছি রাত সাড়ে নটায়। ডিনার খেয়ে ঘরে এসে গত দুঘন্টা ধরে আমার আজকের তোলা ছবিগুলো খুব মন দিয়ে দেখেছি। প্রাকৃতিক জিনিসের ছবির চেয়েও যেগুলো সম্পর্কে বেশি কৌতূহল হচ্ছে সে হল ওই হিজিবিজিগুলো নিয়ে। অনেকগুলো হিজিবিজির ছবি পাশাপাশি রেখে তাদের মধ্যে কিছু কিছু মিল লক্ষ্য করেছি। এমনকি এ-সন্দেহও মনে জাগে যে

হয়ত এগুলো আসলে অক্ষর বা সংখ্যা। তাই যদি হয়, তাহলে ত এদের শিক্ষিত অসভ্য বলতে হয়! অবিশ্যি এটা অনুমান মাত্র; আসলে হয়ত এগুলো এইসব আদিম মানুষের কুসংস্কার সংক্রান্ত কোন সাংকেতিক চিহ্ন।

এ নিয়ে কাল ডামবার্টনের সঙ্গে আলোচনা করা দরকার।

১৯শে আগস্ট, রাত ১১টা

হোটেলের ঘরে বসে ডায়রি লিখছি। আজ বোধ হয় এদের পরব-টরব আছে কারণ কোত্থেকে যেন গানবাজনা আর হৈ হল্লার শব্দ ভেসে ভেসে আসছে। মিনিট পাঁচেক আগে একটা মৃদু ভূমিকম্প হয়ে গেল। একটা বড় ভূমিকম্পের পর কিছুদিন ধরে মাঝে মাঝে অল্প ঝাঁকুনির ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়।

আজকের রোমাঞ্চকর ঘটনার পর বেশ ক্লান্ত বোধ করছি; কিন্তু তাও এইবেলা ব্যাপারটা লিখে ফেলা ভালো। আগেই বলে রাখি—রহস্য আরো দশগুণ বেড়ে গেছে। আর তার সঙ্গে একটা আতঙ্কের কারণ দেখা দিয়েছে, যেটা ডামবার্টনের মত জাঁদরেল আমেরিকানকেও বেশ ভাবিয়ে তুলেছে।

আগেই বলেছি, কোচাবাম্বা থেকে গুহাটা প্রায় একশো ত্রিশ মাইল দূরে। রাস্তা ভালো থাকলে এ পথ তিন ঘণ্টায় অতিক্রম করা সম্ভব হত। কিন্তু ভূমিকম্পের ফলে রাস্তা অনেক জায়গায় বেশ খারাপ হয়ে আছে, ফলে চার ঘণ্টার কমে জীপে যাওয়া যায় না। ফাটলের মুখে এসে জীপ থেকে নেমে বাকি পথটা (দশ মিনিটের মতো) পাথর ডিঙিয়ে হেঁটে যেতে হয়।

এই কারণে আমরা ঠিক করছিলাম যে ভোর ছটার মধ্যে আমাদের অভিযানে বেরিয়ে পড়ব।

হোটেল থেকে যখন জীপ রওনা দিল, তখন ঠিক সোয়া ছটা। সূর্য তখনো পাহাড়ের পিছনে। আজ সঙ্গে আমরা একটি স্থানীয় স্প্যানিশ লোককে নিয়েছিলাম—নাম পেদ্রো। উদ্দেশ্য ছিল আমরা যখন গুহার ভিতরে ঢুকব, তখন সে বাইরে থেকে পাহাড়া দেবে। কারণ কিছু জিনিসপত্র খাবার-দাবার ইত্যাদি বাইরে রাখলে আমাদের চলাফেরা আরো সহজ হতে পারবে। আমরা কিছু না বলাতেও দেখলাম পেদ্রো তার সঙ্গে একটি বন্দুক নিয়ে এগোচ্ছে। কেন জিজ্ঞেস করাতে সে বলল, 'সিনিওর। এখানকার জঙ্গল থেকে কখন যে কী বেরোয় তা বলা যায় না। তাই এটা আমার আত্মরক্ষার জন্যই এনেছি।'

ত্রিশ মাইল গাড়ি যাবার পর হঠাৎ খেয়াল হল যে আমাদের পিছন পিছন আরেকটা গাড়ি আসছে, এবং সেটা যেন আমাদের গাড়িটার নাগাল পাবার জন্য বেশ জোরেই এগিয়ে আসছে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই গাড়িটা (সেটাও একটা জীপ) আমাদের পাশে এসে পড়ল। গাড়ির মধ্যে থেকে দেখি প্রোফেসর কর্ডোবা হাত বাড়িয়ে আমাদের থামতে বলছেন।

অগত্যা থামলাম, এবং দুজনেই গাড়ি থেকে রাস্তায় নামলাম। অন্য জীপটা থেকে কর্ডোবা নেমে আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। তার মধ্যে একটা স্পষ্ট উত্তেজনার ভাব লক্ষ্য করলাম।

কর্ডোবা আমাদের দুজনকে গম্ভীরভাবে নমস্কার জানিয়ে বলল, 'আমার ড্রাইভার তোমার

ড্রাইভারকে জানে। তার কাছ থেকেই জানলাম তোমরা ভোরে ভোরে বেরিয়ে পড়বে। আমি এসেছি তোমাদের সাবধান করে দিতে।'

আমরা দুজনেই অবাক। বললাম, 'কি ব্যাপারে সাবধান হতে বলছ -'

কর্ডোবা বলল, 'গুহার উত্তর দিকের জঙ্গলটা খুব নিরাপদ নয়।'

ডামবার্টন বলল, 'কী করে জানলে?'

কর্ডোবা বলল, 'আমি প্রথম যেদিন গুহাটা দেখতে যাই, সেদিন জঙ্গলটাতেও ঢুকেছিলাম। আমার ধারণা হয়েছিল যে ছবিগুলো খুব অল্প কদিন আগে আঁকা, এবং জঙ্গলের মধ্যেই বোধহয় ছবির রঙের উপাদানগুলো পাওয়া যাবে। হয়ত কোন বিশেষ গাছের রস থেকে 'বা কোনরকম পাথর জলে ঘষে রঙগুলো তৈরি হয়েছে ;'

'তার কোন হদিস পেয়েছিলে কি?'

'না। কারণ, বেশি ভিতরে ঢোকার সাহস হয় নি। জঙ্গলের মাটিতে কিছু পায়ের ছাপ দেখে ভয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম।'

'কি রকম পায়ের ছাপ?'

'অতিকায় জানোয়ারের। কোন জানা জন্তুর পায়ের ছাপ ওরকম হয় না।'

ডামবার্টন হেসে বলল, 'ঠিক আছে। আমাদের সতর্ক করে দেবার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। কিন্তু আমাদের সঙ্গে অস্ত্রধারী লোক আছে। তাছাড়া গুহায় আমাদের যেতেই হবে। এমন সুযোগ আমরা ছাড়তে পারব না। কী বলো শ্যাঙ্কস্?'

আমি মাথা নেড়ে ডামবার্টনের কথায় সায় দিয়ে বললাম. 'সাধারণ অস্ত্র ছাড়াও অন্য অস্ত্র আছে আমাদের কাছে। একটা আস্ত ম্যামথকে তা কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সায়েস্তা করতে পারবে।'

কর্ডোবা বলল, 'বেশ। আমার কর্তব্য আমি করে গেলাম, কারণ দেশটা আমারই, তোমরা এখানে অতিথি। তোমাদের কোন অনিষ্ট হলে আমার উপরে তার খানিকটা দায়িত্ব এসে পড়তে পারত! তবে তোমরা নেহাৎই যখন আমার নিষেধ মানবে না, তখন আর আমি কী করতে পারি বলো? আমি আসি তোমরা বরং এগোও!'

কর্ডোবা তার জীপে উঠে উল্টোমুখো শহরের দিকে চলে গেলেন, আর আমরাও আবার রওনা দিলাম গুহার দিকে।

কিছুদূর যাবার পর সামনের সীট থেকে পেড্রো হঠাৎ আমাদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'ভূমিকম্পের দিন প্রোফেসর কর্ডোবার কী হয়েছিল আপনারা শুনেছেন কি?'

বললাম, 'কই, না ত। কী হয়েছিল?'

পেড্রো বলল, 'সেদিন ছিল রবিবার। প্রোফেসর সকালে উঠে গির্জায় যাচ্ছিলেন। গির্জার গেট দিয়ে ঢুকবার সময় ভূমিকম্পটা শুরু হয়। প্রোফেসরের চোখের সামনে সান্তা মারিয়া গির্জা ধূলিসাৎ হয়ে যায়, আর প্রায় ৬০০ লোক পাথর চাপা পড়ে মারা যায়। আর দশ সেকেণ্ড পরে হলে

প্রোফেসরেরও ওই দশা হত।'

আমরা বললাম, 'সেতো ওর খুব ভাগ্য ভালো বলতে হবে।'

পেড্রো বলল, 'তা ঠিক, কিন্তু ওই ঘটনার পর থেকে প্রোফেসরের মাথা মাঝে মাঝে বিগড়ে যায়। আজ যে জন্তুর কথা বলছিলেন, মনে হয় সেটা একেবারে মনগড়া। ও জঙ্গলে যা জন্তু আছে, তা বোলিভিয়ার সব জঙ্গলেই আছে।'

আমি আর ডামবার্টন পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। দুজনেরই মনে এক ধারণা: কর্ডোবা চান না যে আমরা গুহায় গিয়ে কাজ করি। অর্থাৎ, খুব সম্ভবত তিনি চাইছেন যে গুহায় যদি কোন আশ্চর্য তথ্য আবিষ্কার করার থাকে, তাহলে সেটা উনিই করেন; আমরা বাইরের লোক এসে তার এলাকায় মাতব্বরি ক'রে যেন বৈজ্ঞানিক জগতের বাহবাটা না নিই। বৈজ্ঞানিকদের পরস্পরের মধ্যে এই রেশারেশির ভাবটা যে অস্বাভাবিক না সেটা আমি জানি। তবু বলব, যে সুদূর বোলিভিয়ায় এসে এ জিনিসটার সামনে পড়তে হবে সেটা আশা করিনি।

* * *

পেড্রোকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে যখন আমরা গুহার ভিতরে ঢুকলাম তখন প্রায় সাড়ে দশটা। আজ সূর্য কিছুটা ম্লান, কারণ আকাশ পাতলা মেঘে ঢাকা। গতকাল গুহার ভিতরে অনেকদূর পর্যন্ত বাইরের সূর্যের প্রতিফলিত আলোতেই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল; আজ পঞ্চাশ পা এগোতে না এগোতেই হাতের টর্চ জ্বালতে হল।

পথ যেখানে সরু হয়ে এসেছে, সেখান থেকে যথারীতি হামাগুড়ি দিতে শুরু করলাম। আজ আরো কিছু বেশি দূর যাব। এখানে ছবি নেই, তাই আশে পাশে—দেখবারও কিছু নেই। আমরা মাটির দিকে চোখ রেখে এগোতে লাগলাম। পাথর আশ্চর্যরকম মসৃণ, আর আলগা পাথর নেই বললেই চলে। বেশ বোঝা যায় যে এখানে আদিম মানুষেরা অনেকদিন ধরে বসবাস করেছিল, আর তাদের যাতায়াতের ফলেই পাথরের এই মসৃণতা।

গতকাল যে পর্যন্ত এসেছিলাম, তার থেকে শ'খানেক হাত এগিয়ে দেখলাম সুড়ঙ্গ আবার চওড়া হতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আর কোন ছবির চিহ্ন নেই। ডামবার্টন বলল, 'জানো শ্যাঙ্কস্—এক একবার মনে হচ্ছে যে আর এগিয়ে লাভ নেই। কিন্তু গুহার এই যে অস্বাভাবিক পরিষ্কার ভাব, এতেই যেন মনে হয় ভিতরে আরো দেখবার জিনিস আছে।'

ডামবার্টন আমার মনের কথাটাই যেন প্রকাশ করল। সত্যি, কী আশ্চর্য ঝকঝকে তকতকে এই গুহার ভিতরটা। দেয়ালের দিকে চাইলে মনে হয় যেন এখানে নিয়মিত ডাস্টার দিয়ে পরিষ্কার করা হয়।

সুড়ঙ্গ চওড়া হয়ে যাওয়াতে আমরা সোজা হয়ে হাঁটছিলাম, এমন সময় আমার কানে একটা শব্দ এলো। ডামবার্টনের কাঁধে হাত দিয়ে ওকে থামতে বললাম।

'শুনতে পাচ্ছ?'

খুট্ খুট্ খুট্ খুট্ খুট্ খুট্...আমার কানে শব্দটা স্পষ্ট—কিন্তু ডামবার্টনের শ্রবণশক্তি বোধহয় আমার মত তীক্ষ্ণ নয়। সে আরো কিছু এগিয়ে গেল। তারপর থেমে ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'পেয়েছি।'

দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ শব্দটা শুনলাম। মাঝে মাঝে থামছে, তবে বেশিক্ষণের জন্য নয়।

মানুষ? না অন্য কিছু? বললাম, 'এগিয়ে চলো।'

ডামবার্টন বলল, 'তোমার পিস্তল সঙ্গে আছে?'

'আছে।'

'ওটা কাজ করে ত?'

হেসে বললাম, 'তোমার ওপর ত আর পরীক্ষা করে দেখতে পারি না, তবে এটুকু বলতে পারি যে আমার তৈরি কোন জিনিস আজ পর্যন্ত 'ফেল' করেনি।'

'তবে চলো।'

আরো কিছুদূর এগিয়ে একটা মোড় ঘুরেই দুজনে একসঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

আমরা একটা রীতিমত বড় হল ঘরের মধ্যে এসে পড়েছি। এদিকে ওদিকে টর্চের আলো ফেলে বুঝতে পারলাম সেটা একটা গোল ঘর, যার ডায়ামিটার হবে কম পক্ষে একশ ফুট, আর সেটা উঁচুতে অন্তত কুড়ি ফুট।

হলঘরের দেওয়াল ও ছাত ছবি ও নকশাতে গিজগিজ করছে। ছবির চেয়ে নকশাই বেশি, আর তাদের চেহারা দেখে বুঝতে কোনই অসুবিধে হল না যে সেগুলো অঙ্ক বা ফরমুলা জাতীয় কিছু।

ডামবার্টন চাপা গলায় বলল, 'শিল্পের জগত থেকে ক্রমে যে বিজ্ঞানের জগতে এসে পড়েছি বলে মনে হচ্ছে! এ কাদের কীর্তি! এসবের মানে কী? কবেকার করা এসব নকশা?'

খুট্ খুট্ শব্দটা থেমে গেছে।

আমি হাত থেকে টর্চটা নামিয়ে রেখে কাঁধের থলি থেকে আমার ক্যামেরা বার করলাম। ফ্ল্যাশ-লাইট আছে—কোন চিন্তা নেই। বেশ বুঝতে পারলাম উত্তেজনায় আমার হাত কাঁপছে।

ক্যামেরা বার করে সবেমাত্র দুটো ছবি তুলেছি, এমন সময় একটা ক্ষীণ অথচ তীব্র চীৎকার আমাদের কানে এলো।

আওয়াজটা নিঃসন্দেহে আসছে গুহার বাইরে থেকে। পেড্রোর চীৎকার।

আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে আমরা দুজনেই উল্টোদিকে রওনা দিলাম। হেঁটে, দৌড়ে, হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে পৌঁছতে লাগল প্রায় কুড়ি মিনিট।

বেরিয়ে এসে দেখি পেড্রো তার জায়গায় নেই, যদিও আমাদের জিনিসপত্রগুলো ঠিকই রয়েছে। কোথায় গেল লোকটা? ডাইনে একটা পাথরের ঢিপি। ডামবার্টন দৌড়ে তার পিছন দিকটায় গিয়েই একটা চীৎকার দিল—

'কাম হিয়ার, শ্যাঙ্কস্!'

গিয়ে দেখি পেড্রো চিৎ হয়ে চোখ কপালে তুলে পড়ে আছে, তার গলায় একটা গভীর ক্ষত থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে, আর তার বন্দুকটা পড়ে আছে তার থেকে চার পাঁচ হাত দূরে, মাটিতে। পেড্রোর নিষ্পলক চোখে আতঙ্কের ভাব আমি কোনোদিন ভুলব না। ডামবার্টন তার নাড়ি ধরে বলল, 'হি ইজ ডেড।'

এটা বলবারও দরকার ছিল না। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে পেড্রোর দেহে প্রাণ নেই।

পেড্রোর দিক থেকে এবার দৃষ্টি গেল জমির উপর দিয়ে আরো প্রায় বিশ হাত উত্তর দিকে। মাটিতে খানিকটা জায়গা জুড়ে আরেকটা লালের ছোপ। এগিয়ে গিয়ে বুঝলাম সেটাও হয়ত রক্ত, কিন্তু মানুষের নয়। রক্তের কাছাকাছি যে জিনিসটা পড়ে আছে সেটাকে দেখলে হঠাৎ একটা হাতল ছাড়া তলোয়ার মনে হয়। হাতে তুলে নিয়ে দেখি সেটা ধাতুর তৈরি কোন জিনিস নয়।

ডামবার্টনের হাতে দেওয়াতে সে নেড়ে চেড়ে বলল, এ থেকে যা অনুমান করছি সেটা যদি সত্যি হয় তাহলে আর আমাদের এখানে থাকা উচিত নয়।'

আমি বুঝলাম যে আমাদের দুজনেরই অনুমান এক, কিন্তু তাও সেটা সত্যি হতে পারে বলে বিশ্বাস কর'ছলাম না। বললাম, 'দেওয়ালে আঁকা সেই নাম না জানা জানোয়ারের কথা ভাবছ কি?'

'এগ্‌জ্যাক্ট্‌লি। পেদ্রো জখম হয়েও গুলি চালিয়েছিল। তার ফলে জানোয়ারটাও জখম হয়, এবং তার পিঠ থেকে এই কাঁটাটি খসে পড়ে।'

ডামবার্টনের বয়স পঞ্চাশের উপর হলেও সে রীতিমত জোয়ান। সে একাই পেড্রোর মৃতদেহ কাঁধে করে তুলে নিল। আমি বাকি জিনিসপত্র নিলাম।

আকাশে মেঘ করে একটা থমথমে ভাব।

কর্ডোব তাহলে হয়ত মিথ্যে বলেনি। উত্তরের এই জঙ্গলের মধ্যে আরো কত অজানা বিভীষিকা লুকিয়ে রয়েছে কে জানে?

ক্রমশঃ

দুটি ছড়া

চম্পক কুমার দাস

(১)

কানাই বলে, দুধে না মিশালে জল
হবে বাবু মহাপাপ।
একি শুধু করছি একা আমি?
করে গেছেন, আমার বাপের বাপ॥

(২)

ধারাপাতের কড়া ক্রান্তি কাক,
সবকিছু নিপাত গেছে থাক।
দশমিকের নতুন নিয়মগুলি,
চিরদিনের জন্য টিকে থাক॥

অনুবাদ

অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজা চিন্তান্বিত। কিছুতেই তিনটি প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাচ্ছেন না। সব সময় ভাবেন। উত্তর মেলে না।

শেষে রাজা ঘোষণা করলেন, যে তাঁর প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবে, তাকে তিনি প্রচুর পুরস্কার দেবেন।

নানা জায়গা থেকে পণ্ডিতরা এলেন। সভাগৃহ পরিপূর্ণ।

রাজা বললেন, 'কদিন হল আমার মনে তিনটি প্রশ্ন জেগেছে। আমার মনে হয় এই তিনটি প্রশ্নের জবাব জানা থাকলে আমি কোনদিন বিপদে পড়ব না বা অকৃতকার্য হব না।'

পণ্ডিতরা রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন।

রাজা বলে চলেছেন, 'আমার প্রথম প্রশ্ন হল—কোন কাজ শুরু করার প্রকৃত সময় কখন? অর্থাৎ কখন আমি কোন কাজ শুরু করব? দ্বিতীয় প্রশ্ন—আমার প্রয়োজনীয় ব্যক্তি কে বা কারা? শেষ প্রশ্ন—আমার অবশ্য কর্তব্য কি?'

এবার উত্তর দেবার পালা। একেকজন পণ্ডিত উঠছেন আর তাঁর মনের মতো উত্তর দিচ্ছেন। রাজা ঘাড় নাড়ছেন—'ঠিক হল না, আমি সন্তুষ্ট হতে পাচ্ছি না।'

বেলা গড়িয়ে এলো রাজা উত্তর পেলেন না। সভা সেদিনকার মতো বন্ধ হয়ে গেল।

পণ্ডিতরা সবাই মাথা নত করে বিদায় নিলেন, প্রধান মন্ত্রী রাজাকে বললেন 'মহারাজ আমাদের রাজ্যের উত্তরদিকে এক জঙ্গলে এক তপস্বী বাস করেন। জ্ঞানী বলে তিনি এ রাজ্যে প্রসিদ্ধ। তিনি হয়তো আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। কিন্তু তিনি জঙ্গলের বাইরে কোনদিন আসেন না। জঙ্গলের ভেতরেই একটা কুটিরে বাস করেন আর নিজ হাতে ফসল ফলিয়ে আহার করেন।'

রাজা চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবলেন, তারপর বললেন 'কাল সকালে আমি সেই তপস্বীর কাছে যাব, আপনি ব্যবস্থা করুন।'

পরদিন ভোরবেলা—রাজা তপস্বীর উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। পরনে তাঁর সাধারণ প্রজার বেশ। দেহরক্ষীদের জঙ্গলের বাইরে অপেক্ষা করতে বলে একাকী বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন। কিছুদূর এগিয়ে দেখেন একটা কুটীরের সামনে একজন বৃদ্ধ মাটি কাটছেন। রাজা বুঝলেন ইনিই সেই তপস্বী। রাজা প্রণাম করে দাঁড়াতে, ঋষি স্মিতহাস্যে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে আবার মাটি কাটতে শুরু করলেন।

রাজা অত্যন্ত বিনীত কণ্ঠে বললেন, 'দেব, আমি আপনার কাছে তিনটি প্রশ্নের উত্তর জানতে এসেছি।'

ঋষি রাজার প্রশ্নগুলি স্থিরভাবে শুনে আবার নিজের কাজে মনোনিবেশ করলেন। উত্তর দিলেন না।

বয়স বেশী হওয়ায় আর শরীর দুর্বল থাকার জন্য মাটি কাটতে ঋষির খুবই কষ্ট হচ্ছিল, একেক বার কোদাল চালাচ্ছেন আর জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছেন।

ঋষিকে পরিশ্রান্ত দেখে রাজা বললেন, 'দেব, আপনি ক্লান্ত। আমাকে কোদালটা দিন। আপনি বিশ্রাম করুন।'

'তোমার মঙ্গল হোক' বলে ঋষি রাজাকে কোদালটা দিয়ে মাটির উপর বসে বিশ্রাম করতে লাগলেন।

রাজা মাটি কাটতে শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পর রাজা আবার ঋষিকে প্রশ্নগুলি জিজ্ঞেস করলেন। ঋষি উত্তর না দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন 'এবার তুমি বিশ্রাম কর। আমি মাটি কাটি।'

রাজা বললেন 'আপনি এখনও ক্লান্ত দেব। আপনি বিশ্রাম করুন, আমি আপনার খেত তৈরি করে দিচ্ছি।'

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। বেলা গড়িয়ে এল, ক্লান্ত দেহে কোদাল রেখে ঋষির পাশে এসে রাজা বললেন, 'দেব আপনি দয়া করে আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দেবেন :—আমি কখন কোন কাজ শুরু করব? আমার প্রয়োজনীয় ব্যক্তি কে? আমার অবশ্য কর্তব্য কি?'

ঋষি আঙুল তুলে দেখালেন কে যেন এদিকে ছুটতে ছুটতে আসছে। লোকটি তার হাতদুটো পেটে চেপে রেখেছে। রাজা ও ঋষি দুজনেই উঠে পড়লেন। আগন্তুক তাদের সামনে এসে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। রাজা তাড়াতাড়ি লোকটির সামনে গিয়ে দেখেন, তার পেটের কাছ থেকে প্রচুর রক্তপাত হচ্ছে। একটানে জামাটা খুলে দিতেই পেটের উপর ক্ষতস্থান বেরিয়ে এল। রাজা তাড়াতাড়ি জল দিয়ে আস্তে আস্তে ক্ষতস্থান ধুয়ে ভালো করে রুমাল দিয়ে বেঁধে দিলেন. কিছুক্ষণ পর লোকটি সুস্থ হয়ে তাঁদের কাছে জল চাইতে রাজা ঋষির কাছ থেকে জল এনে লোকটিকে খাইয়ে দিলেন। তারপর দুজনে তাকে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলেন।

রাজাও সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনিও লোকটির পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলে রাজা দেখেন লোকটি তাঁর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে।

লোকটি রাজার ঘুম ভাঙতে দেখে হাতজোড় করে আস্তে আস্তে বলল, 'মহারাজ, আমাকে ক্ষমা করুন।'

রাজা তো অবাক। বললেন, 'আমি তো তোমাকে চিনি না।'

লোকটি বলল, 'আপনি আমাকে চিনবেন না। আপনি আমার ভাইদের মেরেছেন। আমার

সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছেন। তাই আমি আপনাকে হত্যা করার সুযোগ খুঁজছিলাম। আমি জেনেছিলাম আপনি এই সন্ন্যাসীর কাছে আসবেন। তাই জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়েছিলাম ফেরার পথে আপনাকে হত্যা করব বলে। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে গেল আপনি ফিরছেন না। অবশেষে গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে এলাম। আপনার দেহরক্ষীরা আমাকে চিনতে পেরে তাড়া করল। আমি কোনরকমে এখানে পালিয়ে এলাম। আপনাকে আমি হত্যা করব ভেবেছিলাম; আর আপনি আমাকে বাঁচালেন। এখন আমি যদি বাঁচি, আর আপনি যদি চান তাহলে সারা জীবন আপনার চাকর হয়ে থাকব। আমার ছেলেদেরও বলে দেব তারাও যেন রাজার গোলামের কাজ করে। মহারাজ, দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন।'

রাজা অবাক হয়ে শুনলেন। আর শত্রুর সঙ্গে সহজে মিটমাট হয়ে গেল বলে খুব আনন্দিতও হলেন। লোকটির কাছে গিয়ে বললেন, 'আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি বন্ধু।'

রাজা তারপর ঋষির খোঁজে কুটীরের বাইরে এলেন। দেখলেন ঋষি গতকালের তৈরি করা ক্ষেতে বীজ বপন করছেন।

তিনি ঋষির কাছে গিয়ে বললেন, 'দেব, আপনার কাছে তিনটি প্রশ্নের উত্তর পাব ভেবে এসেছিলাম। আপনি কি দয়া করে আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দেবেন?'

ঋষি রাজার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বৎস, তোমার উত্তর তুমি তো পেয়েছ।'

'উত্তর পেয়েছি! কেমন করে?' রাজা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। 'কেন বুঝতে পার নি?' ঋষি বললেন 'গতকাল এখানে এসে আমাকে পরিশ্রান্ত দেখে তুমি যদি মাটি না কেটে ফিরে যেতে আততায়ীর হাতে তোমার মৃত্যু হত। অতএব তোমার প্রয়োজনীয় সময় ছিল তখনই, যখন তুমি মাটি কাটছিলে। আমি ছিলাম তোমার সবচেয়ে দরকারী ব্যক্তি এবং আমার উপকার করাই ছিল তোমার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কর্তব্য। আবার যখন লোকটি আহত হয়ে আমাদের কাছে এলো তুমি তার সেবা করতে লাগলে। তা যদি না করতে তাহলে লোকটি হয়তো মারা যেত। কিন্তু তোমার শত্রুর বিনাশ হত না তার ছেলেরা তোমাকে হত্যা করার চেষ্টা করতো। লোকটি ছিল তখন তোমার দরকারী ব্যক্তি এবং তার সেবা করা ছিল তোমার অবশ্য কর্তব্য।

মনে রেখো বৎস, পৃথিবীতে কোনো কাজ শুরু করার একটি মাত্র সময় আছে, সেটি হল—'এখন', কারণ কোনো কাজ করার পিছনে তোমার সব শক্তি কেবলমাত্র এখনই নিযুক্ত করতে পার ভবিষ্যতে সে শক্তি হয়তো থাকবে না।

প্রতিমুহূর্তে যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে, সে-ই তোমার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যক্তি। কেউ বলতে পারে না, ভবিষ্যতে তার সঙ্গে আবার দেখা হবে কিনা।

সর্বোপরি, মানুষের মঙ্গল করাই তোমার অবশ্য কর্তব্য। কারণ মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে, মানুষের মঙ্গল করার জন্যে।'

(সমুদ্রের তলদেশ সম্বন্ধে জানবার জন্য স্ট্র্যাটফোর্ড জাহাজ সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল, তারপরে আর ফিরে আসেনি। এই অভিযানের নেতা ছিলেন মহাপণ্ডিত ডঃ ম্যারাকট ও জাহাজের অধিনায়ক ক্যাপটেন হাওসি। সঙ্গে ছিলেন বিখ্যাত প্রাণিবিদ মিঃ সাইরাস হেডলি, ইঞ্জিনিয়ার বিল স্ক্যানল্যান ও আরো ২৩ জন।

স্ট্র্যাটফোর্ড জাহাজ থেকে হেডলি তাঁর বন্ধু জেম্‌স্‌ ট্যালবটকে লেখেন যে একটি বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে আটলান্টিক মহাসমুদ্রের তলদেশে অনুসন্ধান চালানই হল ম্যারাকটের উদ্দেশ্য।

স্ট্র্যাটফোর্ড জাহাজ রওনা হবার কয়েকদিন পর, ৩রা অক্টোবর, 'আরোইয়া' জাহাজের গ্রাহক যন্ত্রে এক অদ্ভুত বেতারবার্তা ধরা পড়ে—'ঝড়ে জাহাজ কাত। হয় ত আর আশা নেই। ম্যারাকট, হেডলি, স্ক্যানল্যান আগেই গেছেন। ব্যাপার অবোধ্য। ওলনতারের আগায় হেডলির রুমাল। ঈশ্বর ভরসা। এস্‌ এস্‌ স্ট্র্যাটফোর্ড।'

৫ই জানুয়ারি আরাবেলা নোউল্‌স্‌ নামক জাহাজ হাল্কা গ্যাসে ভরা এবং বিশেষ উপাদানে তৈরি একটি ঝকঝকে গোলকের ভিতর হেডলির দ্বিতীয় চিঠিতে এক অত্যাশ্চর্য বিবরণ জানতে পারে;

জানা যায় যে এক ঝুলন্ত খাঁচার মতন যন্ত্রের সাহায্যে ম্যারাকট, হেডলি ও স্ক্যানল্যান আটলান্টিক মহাসমুদ্রের তলায় এক গভীর খাদের ধারে অনুসন্ধান চালাচ্ছিলেন। জাহাজের সঙ্গে তাঁদের নলের মধ্য দিয়ে টেলিফোন যোগাযোগ ছিল। হঠাৎ তাঁরা যা দেখলেন তাতে তাঁরা জমে পাথর হয়ে গেলেন।)

চার

'খাদের হাঁ-করা মুখের ভিতর থেকে আমাদের ফেলা আলোর পথ বেয়ে উঠে আসছে প্রকাণ্ড

জীব। অনেক নিচে যেখানে আমাদের আলো অন্ধকারে গিয়ে মিশেছে সেইখানে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল তার কালো বিরাট দেহটা হেলতে দুলতে অদ্ভুত ভঙ্গীতে উপর দিকে উঠছে। একটু কাছে আসতে যখন আলোটা পুরোপুরি তার উপর পড়ল, তখন তার ভয়ঙ্কর চেহারা আমরা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। সে জন্তু বিজ্ঞানের অজানা, কিন্তু জানা কোনো কোনো জীবের সঙ্গে তার মিল আছে। তার গড়নটা একটা বিরাট কাঁকড়ার মতও বটে—কিন্তু একটু বেশি লম্বাটে, আবার একটা অতিকায় গলদা চিংড়ির মতও বটে—কিন্তু একটু বেশি বেঁটে, মোটের উপর ধাঁচটা অনেকটা বাগদা চিংড়ির মত। দুই দিকে দুটো রাক্ষুসে দাঁড়া আর মুখের সামনে পনেরো যোল ফুট লম্বা এক জোড়া শুঁয়ো। তার পিছনে দুটো কালো কালো বদমেজাজী বোকা বোকা চোখ। গায়ের ফিকে হলদে রঙের খোলা শুদ্ধ সেটা চওড়ায় দশ ফুট হবে, আর শুঁয়ো বাদে লম্বায় ত্রিশ ফুটের কম নয়।

'ম্যারাকট্ তাঁর নোট বুকে ঊর্ধ্বশ্বাসে লিখতে লিখতে হাঁকতে লাগলেন, 'চমৎকার। অপূর্ণ বৃন্তক (অর্থাৎ খাটো বোঁটার আগায় বসানো) চোখ, স্থিতি স্থাপক খোলক, জাতি কবচী, প্রজাতি অজ্ঞাত।—কবচী ম্যারাকটীয়—কেন হবে না? হবে না কেন?'

বিল্ চেঁচিয়ে উঠল, 'আমার দিব্যি ও নাম আমি চালিয়ে দেব, কিন্তু আপাততঃ ওটা যে আমাদের দিকেই আসছে মনে হয়! ধরুন গিয়ে 'ডক্', আমাদের আলোগুলো নিবিয়ে দিলে কেমন হয়?'

বিজ্ঞানী প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বললেন 'এক মিনিট! আনায়কাগুলি (গায়ের জালির মত দাগগুলো) টুকে নিই।······হ্যাঁ, হয়েছে।' বলেই তিনি সুইচ অফ্ করে দিলেন। আমরা আবার সেই নিকষকালো অন্ধকারে ডুবে গেলাম, কেবল বাইরে সেই আলোর বিন্দুগুলি অমাবস্যার আকাশে অনবরত উল্কাপাতের মত ছুটোছুটি করতে লাগল।

'বিল্ কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললে, 'আলবৎ জানোয়ারটা দুনিয়ার মধ্যে সবচাইতে বদ!'

'ম্যারাকট্ বললেন, 'এটা দেখতে ভয়ঙ্করই বটে, আর ঐ রাক্ষুসে দাঁড়ার পাল্লায় পড়লে সেটাও হয়ত ভয়ঙ্করই হবে। কিন্তু আমাদের এই ইস্পাতের ঘরখানার ভিতর থেকে ওটাকে নিরাপদে পর্যবেক্ষণ করা যাবে।'

তাঁর কথা শেষ হতে না হতে ঘরের দেওয়ালের বাইরে থেকে যেন কোদালের ঘা মারার মত আওয়াজ এল। তারপর খানিকক্ষণ ধরে উখা দিয়ে ঘষার মত শব্দ আর শেষে আর একবার তেমনি ঘা মারার আওয়াজ।

বিল্ স্ক্যান্‌ল্যান্ চেঁচিয়ে উঠলে, 'ধরুন গিয়ে, ও ভিতরে আসতে চায়! আমার দিব্যি, ঘরখানার গায়ে 'প্রবেশ নিষেধ' লিখে দেওয়া চাই।' তামাশা করে কথা বললে কি হবে, গলা এদিকে তার কেঁপে যাচ্ছিল। সেই রাক্ষুসে জীবটা নিঃশব্দে আমাদের গোল খাঁচাটা পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। তার বিরাট দেহে একবার এ জানলা একবার ও জানলা যেন গভীর অন্ধকারে ঢাকা পড়তে লাগল। জানোয়ারটা বোধ হয় ভাবছিল গোলাটা ভাঙতে পারলে ভিতরে খাবার জিনিস মিলতে পারে।

'ম্যারাকট্ বললেন, 'জন্তুটা আমাদের কিছু করতে পারবে না'— কিন্তু তাঁর গলায় আর তেমন

ভরসার সুর ছিল না—'তবে ওটাকে ঝেড়ে ফেলাই ভাল।' এই বলে তিনি টেলিফোনে ক্যাপটেনকে ডেকে বললেন, 'আমাদের ফুট কুড়ি ত্রিশ উপরে তুলুন।'

কয়েক সেকেণ্ড পরে আমরা সেই 'লাভা'ময় জমি ছেড়ে উপরে উঠে আস্তে আস্তে দুলতে লাগলাম। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর জীবটা ছাড়বার পাত্র নয়, একটু পরেই আবার খাঁচার গোল গায়ে তার দাঁড়া ঘষবার ঘ্যাসঘ্যাসানি আর পায়ের নখের ঠকঠকানি শোনা গেল। সেই অন্ধকারের মধ্যে চুপচাপ বসে' অনুভব করতে লাগলাম মরণ সত্যি সত্যি দোর গোড়ায় এসে হাজির হলে' কেমন লাগে। যদি জন্তুটার রাক্ষুসে নখের এক ঘা আমাদের জানলার কাঁচের উপর পড়ে তাহলে তার কি দশা হবে? সকলের মনেই এই প্রশ্ন জাগছিল।

'হঠাৎ শোনা গেল ঠকঠকানিটা চলে গেছে খাঁচাটার উপর দিকে—যেখানে আমাদের বাতাস আসবার নল, টেলিফোন, আমাদের কাছে, আমাদের সব কিছু। খাঁচাখানা পেণ্ডুলামের মত দুলতে সুরু করল!

'আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, সর্বনাশ! কাছিটাকে ধরেছে, নিশ্চয় ছিঁড়ে ফেলবে।'

'এই ধরুন গিয়ে ডক্, আমি বলি এবার উঠে পড়া যাক্। আমরা যা দেখতে এসেছিলাম তা তো দেখা হয়েছে, এবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাওয়া যাক্। ফোন করুন, আমাদের টেনে তুলুক।'

'ম্যারাকট একটু অপ্রসন্ন সুরে বললেন, 'কিন্তু আমাদের কাজ যে অর্ধেকও সারা হয় নি, আমরা কেবল ডীপের মুখের কাছটাতে অনুসন্ধান সুরু করেছি মাত্র, অন্ততঃ এটা কতখানি চওড়া সেটুকুও দেখা যাক্। এর ওপারে পৌঁছালে পর আমি ফিরতে রাজি আছি।' তারপর টেলিফোনে মুখ দিয়ে, 'সব ঠিক আছে, ক্যাপটেন। দু নট হিসাবে চলুন, যতক্ষণ না থামতে বলি।'

'আমরা আস্তে আস্তে ডীপের ধার থেকে মাঝের দিকে এগুতে লাগলাম। আলো নিবিয়ে যখন জানোয়ারটার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল না তখন আর বৃথা অন্ধকারে না থেকে আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হল। একটা পোর্টহোল একেবারে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, সেখান দিয়ে বোধ হয় জন্তুটার পেটের নিচের দিকটা দেখা যাচ্ছিল। মাথাটা আর প্রকাণ্ড দাঁড়াদুটো উপরের দিকে কি কাজে ব্যস্ত ছিল কে জানে। তখনও আমরা পেটা ঘড়ির মত দুলছিলাম। মানুষে কখনো এমন অবস্থায় পড়েনি—নিচে পাঁচ মাইল জল আর উপরে এই রাক্ষুসে জানোয়ার। দুলুনিটা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। কাছির প্রবল ঝাঁকানি ক্যাপটেন টের পেলেন, তাঁর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর টেলিফোনের তার বেয়ে নেমে এল, আর ম্যারাকট হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন, নিদারুণ হতাশায় তাঁর দুই হাত শূন্যে তোলা। সেই মুহূর্তে আমরা ছেঁড়া কাছির ঝাঁকুনি অনুভব করলাম, তার পরেই আমরা নিচের গভীর অতলস্পর্শ গহ্বরের মধ্যে পড়ে যেতে লাগলাম।

'সেই ভয়ঙ্কর সময়ের কথা যখন ভাবি মনে পড়ে ম্যারাকটের বিষম চীৎকার শুনতে পেয়েছিলাম। টেলিফোনটা আঁকড়ে ধরে তিনি চেঁচাচ্ছিলেন:

'কাছি কেটে গেছে! আর কোনো আশা নেই! আমরা মলাম!' তারপর—'বিদায় ক্যাপটেন্ সকলে বিদায় দিন।'

পৃথিবীর মানুষের উদ্দেশে সেই আমাদের শেষ কথা।

সেই ভয়ঙ্কর জীবটার পায়ের ভিতর দিয়ে আমাদের গোলার মত গোল খাঁচাটা আস্তে আস্তে পিছলে বেরিয়ে এল, একটা লম্বা ধ্যাসধ্যাসানি শুনতে পেলাম। তারপর ভাবছ আমরা হু হু করে নিচের দিকে পড়তে লাগলাম? না। আমাদের খাঁচাটা ফাঁপা হওয়ার দরুণ সেটা আমাদের নিয়ে আস্তে আস্তে মোলায়েম ভাবেই ঘুরপাক খেতে খেতে সেই অতল গভীরতার মধ্যে নামতে লাগল।

টেলিফোনের তার ফুরাতে হয়ত মিনিট পাঁচেক লাগল—কিন্তু আমাদের মনে হল যেন একঘণ্টা—তারটা সুতোর মত পট করে ছিঁড়ে গেল। বাতাসের নলগুলিও প্রায় সেই মুহূর্তেই কেটে গেল আর তাই দিয়ে পিচকারির মত জল ঢুকতে লাগল আমাদের খাঁচায়। বিল তার নিপুণ হাতে চটপট নল-গুলোর মুখ দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলাতে জল ঢোকা বন্ধ হল। সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর সঞ্চিত বাতাসের টিউব

খুলে দিলেন, হিস্ হিস্ শব্দে বাতাস বেরুতে লাগল। তার কেটে যাওয়াতে আলোগুলো নিবে গিয়েছিল। সেই অন্ধকারেও ডক্‌টর ড্রাই সেলগুলো সংযুক্ত করে ফেললেন, তাতে ছাদের গায়ে কতকগুলি আলো জ্বলল।

'একটু শুকনো হাসি হেসে তিনি বললেন, এতে আমাদের এক সপ্তাহ চলবার কথা, অন্ততঃ আলোতে মরতে পাব।' তারপর বিষণ্নভাবে একটু মাথা নাড়লেন, তাঁর কঠিন মুখে এবার একটা সহৃদয় হাসি দেখা দিল। বললেন, 'আমার এতে কিছু যায় আসে না, আমার বয়স হয়েছে, পৃথিবীতে আমার কাজও ফুরিয়েছে। কিন্তু তোমাদের বয়স অল্প, তোমাদের দুজনকে যে সঙ্গে এনেছি এই আমার একমাত্র দুঃখ। আমার একাই এ ঝুঁকি নেওয়া উচিত ছিল।'

আমি কেবল তাঁর হাতটা ধরে সজোরে নাড়লাম, বলবার মত কোনো কথা আমার মুখে জোগাল না। এমন কি বিল্ স্ক্যান্‌ল্যানের মুখেও কথা নেই। আমরা নামতেই থাকলাম, জানলার পাশ দিয়ে মাছের কালো কালো ছায়াগুলো ক্রমাগত উপরের দিকে চলে যেতে লাগল। খাঁচাটা তখনও দুলছিল। সেটা পাশ ফিরে বা মাথা নিচের দিকে করেও পড়তে পারত। কিন্তু তার ভিতরকার ওজন সমান ভাবে ছড়ানো থাকায় মেঝেটা ঠিক সমানই রইল। গভীরতা-মাপকের দিকে তাকিয়ে দেখি আমরা এর মধ্যে এক মাইল গভীরে এসে পড়েছি।

ম্যারাকট্ খুব খুশি খুশি মুখ করে' বললেন, 'দেখেছ, আমি যা বলেছিলাম তাই! সাগর তাত্ত্বিক সমিতির অধিবেশনের বিপরীত গভীরতা ও চাপের সম্বন্ধ নিয়ে আমার মতামত হয়ত পড়ে থাকতে পার। জার্মানীর বিজ্ঞানী বুলো আমার মতের প্রতিবাদ করেছিলেন। পৃথিবীতে কেবল একটা কথা যদি এখন পাঠাতে পারতাম তাহলে তাঁর মত যে ভুল তা প্রমাণ হয়ে যেত।

'বিল্ বলে উঠল, 'আমার দিব্যি, আমি যদি এখন দুনিয়াকে একটা কথা পাঠাতে পারতুম তা হলে এক পণ্ডিতী ছিট্‌ওয়ালা বুড়োর পিছনে সেটা নষ্ট করতুম না। ফিলাডেলফিআয় আছে একটি জাহাজী মেয়ে, বিল স্ক্যানল্যান্ টেঁসেছে শুনলে যার সুন্দর চোখ দুটি জলে ভরে উঠবে।'

'আমি তার হাতে হাত রেখে বললাম, 'তোমার আসা ঠিক হয়নি, বিল্।'

'সে উত্তর দিলে, 'না এসে কেটে পড়লে সেটাই বা কেমন খেলো ইয়ারকি হত? না, এ আমার কাজ, আমি আমার কাজ ফেলে সরে' পড়িনি এতেই আমি খুশি।'

'ঠিক কথাই। ডক্‌টরকে শুধোলাম, 'আর কতক্ষণ?'

'তিনি কাঁধ-ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, 'সমুদ্রের একেবারে আসল তলাটা দেখতে পাবার মত সময় যাই হোক পাওয়া যাবে। প্রায় একদিনের মত বাতাস আমাদের টিউবে আছে। মুশকিল হচ্ছে আমরা নিঃশ্বাসের সঙ্গে যে কার্বন-ডাইঅক্‌সাইড্ গ্যাস্ ছাড়ছি সেইটাকে নিয়ে। ওতেই ক্রমে আমাদের দম আট্‌কে আসবে। ঐ গ্যাসটার যদি কোনও ব্যবস্থা—

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি অসম্ভব।'

'এক টিউব বিশুদ্ধ অক্‌সিজেন আছে, বিশেষ বিপদে ব্যবহারের জন্য রেখেছিলাম। মাঝে মাঝে

তারই একটুখানি করে' বার করে' নিয়ে আমরা বেঁচে থাকব। দেখ, এখন আমরা ছ মাইলেরও বেশি নিচে।'

'আমি বললাম, 'বেঁচে থাকবার চেষ্টা করে' লাভ কি? যত শীগগির সব শেষ হয় ততই তো ভাল।'

'স্ক্যানল্যান্ চেঁচিয়ে উঠল, 'ঐ ঠিক দাওয়াই। খুলে দিন টিউব, যা হবার হয়ে যাক্।'

'আর এই পরমাশ্চর্য দৃশ্য দেখবার সুযোগ হারাও—মানুষের চোখ যে দৃশ্য কখনো দেখেনি! তাতে বিজ্ঞানের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। শেষ পর্যন্ত আমাদের অভিজ্ঞতা লিখে রেখে যেতে হবে, যদি সে সব লেখা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চিরকালের মত এইখানে সমাধি পায়, তবু। শেষ অবধি খেলে যাও।'

'বাহাদুর বটে ডক্' স্ক্যানল্যান বলে' উঠল, 'আমাদের মধ্যে ওঁরই ছাতি সবসে আচ্ছা। তবে শেষ পর্যন্তই দেখা যাক্।'

'সেটির ধারটা আঁকড়ে ধরে' আমরা তিনজনে স্থির হয়ে বসে রইলাম। খাঁচাটা বরাবরই একটু দুলছিল। পোর্টহোলগুলির পাশ দিয়ে তখনো মাছগুলো ঝিলিক দিতে দিতে উপর দিকে চলে' যাচ্ছিল।

'ম্যারাকট্ বললেন, 'তিন মাইল হল। অক্সিজেনটা একবার খুলছি মিঃ হেড্‌লে, সত্যিই বড় বুক-চাপ লাগছে। তার পর তাঁর সেই চাপা হাসি হাসতে হাসতে বললেন, 'একটা কথা, এখন থেকে এটা যে 'ম্যারাকট্ ডীপ'ই হবে এতে আর ভুল নেই।'

'আবার খানিকক্ষণ সবাই চুপচাপ। যন্ত্রের কাঁটা ক্রমে চতুর্থ মাইলে পৌঁছাল। একবার একটা কিসের গায়ে ঠোকর লেগে খাঁচাটা এমন কাত হয়ে গেল যে আমার মনে হল এবার বোধ হয় খাঁচাটা বরাবর কাত হয়েই থাকবে, কিন্তু সামলে গিয়ে আবার সোজা হল, একটু বেশি দুলতে লাগল শুধু। গাঢ় সবুজ অন্তহীন জলরাশির ভিতর দিয়ে তখনো আমরা কেবল নামছিই, নামছিই। কোথায় থাকল সেই আঠারোশো ফুট গভীর শৈলশিরা যাকে তখন অত ভয়ানক গভীর মনে হয়েছিল! সেটা ছিল এক মাইলের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র, আর এখন আমরা প্রায় মাইল পাঁচেক নিচে। গভীরতা-মাপকের ডালায় পঁচিশ হাজার ফুট দেখা গেল।

'ম্যারাকট্ বললেন, 'আমরা প্রায় যাত্রাশেষে এসে পৌঁছেছি। গত বৎসর সব চাইতে গভীর জায়গাটাতে স্কটের গভীরতা-মাপকে ছাব্বিশ হাজার সাতশো ফুট উঠেছিল। আর মিনিট কয়েকের মধ্যেই আমাদের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ হয়ে যাবে। হয়ত ধাক্কার চোটে আমরা চুরমার হয়ে যাব, কিংবা হয়ত—'

'সেই মুহূর্তে আমরা তল পেলাম।

'মা তার খোকাকে যে ভাবে শুইয়ে দেয় পালকের বিছানায়, যেন তার চেয়েও মোলায়েমভাবে আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশ তার কোল পেতে দিল আমাদের জন্য। যে নরম, পুরু সিন্ধুজলের

গদির উপর আমরা নামলাম তাতে আমাদের পড়বার চোটটা এখনই সামলে নিল যে আমরা একটু নাড়াও পেলাম না। এমন কি যে যেখানে বসে' ছিলাম সেইখানেই রইলাম। আর সত্যি এমনটি নাহলে' মুশকিলই হত। খাঁচাটা নেমেছিল একটা ঢিবিমত জায়গার উপরে, খাঁচার অর্ধেকটাই সেই ঢিবির বাইরে বেরিয়ে থাকাতে খাঁচাটা থেমে গিয়েও দুলতে থাকল। আমরা যে যার জায়গায় না থেকে যদি এদিক ওদিক ছিটকে পড়তাম তাহলে নির্ঘাত খাঁচাটা ঢিবির উপর থেকে মুখ থুবড়ে পড়ে যেত। এখন যাহোক খাঁচাটা কয়েকবার দুলে স্থির হল। ডক্‌টর ম্যারাকট্ তাঁর পোর্টহোলের ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে চারিদিক নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। হঠাৎ তিনি যেন মহা আশ্চর্য হয়ে 'আরে' বলে' চেঁচিয়ে উঠে আলো নিবিয়ে দিলেন!

'আমরা অবাক্ হয়ে দেখলাম যে আলো নেবানো সত্ত্বেও চারিদিকে কয়েক শো গজ পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। শীতকালের ভোরের কুয়াশা ঢাকা আলোর মত একটা ম্লান আলো পোর্টহোল দিয়ে ভিতরে এসে পড়ছে। ব্যাপারটা অসম্ভব, অচিন্তনীয়; তবু নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতেই হল। সমুদ্রের বিস্তীর্ণ তলদেশ নিজস্ব আলোয় উজ্জ্বল।

'প্রায় মিনিট দুয়েক সবাই নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকবার পর ম্যারাকট্ উৎসাহে চেঁচিয়ে বললেন, 'ঠিকই তো! আমার তো এটা আগেই মনে হওয়া উচিত ছিল! এই সিন্ধুমল জিনিসটি কি? কোটি কোটি প্রাণিদেহের বিনাশের ফলেই তো তার সৃষ্টি। আর প্রাণিদেহের পচনের সঙ্গে অনুপ্রভা বা আলেয়া নামক ব্যাপারটি জড়িত তাও তো জানা কথা। আহা, এমন একটা তথ্য এমন হাতে কলমে জেনেও আমরা পৃথিবীকে সে জানার ভাগ দিতে পারলাম না এ বাস্তবিকই অদৃষ্টের বড় নির্মম বিচার।'

'আমি বললাম, 'কিন্তু আমরা তো কখনো কখনো আধটন খানেক জীব-জেলি সমুদ্রতল থেকে চেঁচে তুলেছি, তাতে তো এরকম কোনো আলো দেখতে পাইনি।'

'ডক্‌টর বললেন, 'সমুদ্রতল থেকে জলের উপর পর্যন্ত কম দূর নয়, এতদূর যেতে যেতে নিশ্চয়ই জেলি তার অনুপ্রভা হারিয়ে ফেলে। আর এই সুবিশাল পচন-ভূমির তুলনায় আধটনই বা কতটুকু?' তার পর আবার হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আর দেখ দেখ, গভীর সমুদ্রের জীবরা এই সিন্ধুমলের গালচের উপর চরে' বেড়াচ্ছে ঠিক যেমন আমাদের গরুর পাল মাঠে চরে বেড়ায়!'

'ম্যারাকটের কার্যকলাপ দেখে সত্যিই অবাক্ হয়ে যাচ্ছিলাম। খাঁচার ভিতরকার দূষিত হাওয়ায় আসন্ন মৃত্যুর ছায়ায় বসে' তিনি তখনো বিজ্ঞানের আজ্ঞা পালন করছিলেন। যা কিছু দেখছিলেন অবিরাম দ্রুত গতিতে তাঁর নোট বুকে লিখে চলেছিলেন। ঠিক তাঁর মত করে না করলেও আমিও সব কিছুর নোট রাখছিলাম—আমার মনের নোট বুকে। সেখানে সেগুলির ছাপ চিরদিন আঁকা থাকবে। সমুদ্রের তলাটা লাল মাটির, কিন্তু এখানে সেটা ছাই রঙের পাতলা কাদার মত জিনিসে ঢাকা। সমুদ্রের অতি ক্ষুদ্র জীববস্তু; অণুবীক্ষণ দিয়ে যা দেখতে হয়, তারই পচনের ফলে এই পদার্থের উৎপত্তি। যত দূর চোখ যায় সমুদ্রতলের সমভূমি, কোথাও উঁচু হয়ে গেছে, কোথাও নিচু হয়ে গেছে। জায়গায়

জায়গায় অদ্ভুত গোল গোল ঢিবি—যে রকম ঢিবির উপর আমরা নেমেছিলাম। প্রত্যেকটি ঢিবিই সেই ভৌতিক অবাস্তব আলোয় ঝিকমিক করছে। এই ঢিবিগুলির আশ পাশ দিয়ে অদ্ভুত অজানা মাছের ঝাঁক তীরের মত আসছে যাচ্ছে। বিজ্ঞান আজও তাদের নাম ধাম ঠিকানা জানে না। কোনো রকম রং বাদ ছিল না, তবে লাল আর কালোই বেশি। ম্যারাকট তাঁর উত্তেজনা চেপে তাদের পর্যবেক্ষণ করলেন আর তাঁর নোট বুকে টুকে রাখলেন।

'হাওয়া বড়ই দূষিত হয়ে উঠেছিল, আবার খানিকটা অক্‌সিজেন বার করে' নিয়ে আমরা প্রাণ বাঁচালাম। আশ্চর্যের বিষয় আমাদের সকলেরই খিদে পাচ্ছিল, যেমন তেমন খিদে নয়, রাক্ষুসে খিদে! ভাগ্যে দূরদর্শী ম্যারাকট্ মাংস আর রুটি মাখনের যোগাড় রেখেছিলেন। খাওয়ার ফলে বোধশক্তি আবার প্রখর হল। আমার জানলার ধারে বসে' ছিলাম। শেষ বারের মত একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছিল। ঠিক এমনি সময়ে এমন একট জিনিস আমার চোখে পড়ল যাতে আমার মনের ভিতরে একটা অসম্ভব চিন্তা আর আশার ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেল।

যে সব ঢিবির কথা বলেছি আমার পোর্টহোলের সামনেই তেমনি একটা বেশ বড় গোছের ঢিবি ছিল—আমাদের খাঁচা থেকে ফুট ত্রিশের মধ্যেই। তার গায়ে একটা বিশেষ ধরনের চিহ্ন দেখতে পেলাম। ভাল করে চেয়ে দেখি কিছু দূর অন্তর সেই রকম চিহ্ন ঢিবিটাকে বেড়ে রয়েছে মনে হল। নিশ্চিত মৃত্যুর এত কাছাকাছি এসে সহজে আর কোনো কিছু নিয়ে মাথা ঘামাতে ইচ্ছে হয় না, কিন্তু হঠাৎ যখন আমি বুঝতে পারলাম যে ঐ দাগগুলি ঢিবির গায়ে খোদাই করা কারুকার্য, তখন মুহূর্তের জন্য আমার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে গেল। এও বুঝতে বাকী রইল না যে ঢিবিটাও আসলে মানুষের হাতের তৈরি স্তূপ, যদিও এখন সেটা অনেক ক্ষয়ে গেছে আর গা এক রকম ক্ষুদ্র প্রাণিদেহে আচ্ছন্ন। ম্যারাকট আর স্ক্যান্‌ল্যান্ এসে আমার জায়গায় ভিড় করলেন। একেবারেই বাক্যহারা হয়ে তাঁরা মানুষের সর্ব-ব্যাপী কর্মপ্রেরণার এই চিহ্নগুলির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

শেষে স্ক্যান্‌ল্যান্ চেঁচিয়ে উঠল, 'নির্ঘাত এ খোদাই! এটা কোনো বাড়ির চূড়ো হবে। তাহলে আর গুলোও তাই। ধরুন গিয়ে সার্, আমরা যে আস্ত একখানা শহরের উপর নেমে পড়েছি।'

ম্যারাকট্ বললেন, 'এটা বাস্তবিক এক প্রাচীন নগরী। ভূতত্ত্ব বলে যে সমুদ্রগুলি একদিন মহাদেশ ছিল আর মহাদেশগুলি ছিল সমুদ্র। ইজিপ্টের লোকমুখে এক প্রাচীন কিংবদন্তী শোনা যায়: আটলান্টিস্ নামক মহাদেশ নাকি সমুদ্রে তলিয়ে গিয়েছিল। আমি কোনোদিন তা বিশ্বাস করিনি, কিন্তু এখন দেখছি সে কথা সত্যি। এক বিরাট ভূমিকম্পের ফলেই যে একটা গোটা মহাদেশ সমুদ্রের ভিতর তলিয়ে গিয়েছিল সেটা সেই শৈলশিরাটির গঠন হেকে প্রমাণ হচ্ছে।'

আমি বললাম, 'এই স্তূপগুলি সব একই ধরনের। আমার এখন হচ্ছে এগুলো আলাদা আলাদা বাড়ির চূড়ো নয়, একটাই খুব বিশাল বাড়ির ছাদের উপরকার গম্বুজ এগুলি।'

স্ক্যান্‌ল্যান্ বললে, 'বোধ হয় তোমার কথাই ঠিক। চার কোণে চারটে বড় বড় গম্বুজ রয়েছে,

আর সেগুলোর মাঝে মাঝে সার দিয়ে ছোট ছোট গম্বুজ রয়েছে। নেহাত মন্দ ইমারতখানি নয়, গোটা মেরিব্যাঙ্ক কারখানাটা এর ভিতর স্বচ্ছন্দে রাখা চলে।'

ম্যারাকট বললেন, উপর থেকে ক্রমাগত নানা জিনিস নিচে পড়ে পড়ে বাড়িটা ছাদ পর্যন্ত পুঁতে গেছে, কিন্তু নষ্ট হয় নি। সমুদ্রের তলাকার তাপমান সর্বদাই ৩২° ফারেন্‌হাইটের কাছাকাছি, এত ঠাণ্ডায় ক্ষয়ের কাজ চলতে পারে না। আর সামুদ্রিক জীবজন্তুর মৃতাবশেষ পচে এই যে সমুদ্রতল ছেয়ে ফেলেছে আর সঙ্গে এই স্থির আলেয়ার সৃষ্টি করছে সে ব্যাপারটিও চলেছে খুবই আস্তে। কিন্তু একি ! এগুলো তো কারুকার্য নয়, মনে হচ্ছে এগুলো কোনোরকম লেখা, খোদাই করা হয়েছে গম্বুজের গায়ে।'

সত্যিই, তাঁর কথা যে ঠিক তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। প্রায় প্রত্যেকটি চিহ্নই বার বার খোদাই করা ছিল। নিশ্চয় সেগুলো লুপ্ত বর্ণমালার অক্ষর।

ম্যারাকট বললেন, 'আমি এক সময়ে ফিনিশি আর প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি, এই অক্ষরগুলি আমার কাছে একেবারে অচেনা নয়। আমরা আজ বহু প্রাচীন কালের এক হারিয়ে যাওয়া শহরের ধ্বংসাবশেষ দেখলাম, ভগবানের এক আশ্চর্য সঞ্চয় নিয়ে আমরা মরতে চললাম। এবার আমিও বলি যত শীঘ্র সব শেষ হয় ততই ভাল।'

শেষের আর দেরিও ছিল না। বাতাসটা কার্বন ডাইঅক্‌সাইডে এমন বোঝাই হয়ে গিয়েছিল যে এখন আবার যখন অক্সিজেনের টিউব খুলে দেওয়া হল তখন সেই ভারি হাওয়া ঠেলে অক্সিজেন ভাল করে বেরুতেই পারছিল না। 'সেটির উপর দাঁড়িয়ে উঠে এক এক ঢোক একটু পরিষ্কার হাওয়া তখনো পাওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু বিষাক্ত দুর্গন্ধ হাওয়ার স্তরটা ক্রমেই উঁচুতে উঠে আসছিল। ডক্টর ম্যারাকট ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে হাত দুটি বুকের উপর ভাঁজ করে মাথা নোয়ালেন। স্ক্যান্‌ল্যান্‌ একেবারে কাবু হয়ে হাত পা ছড়িয়ে মেঝের উপর পড়ে ছিল। আমার মাথাও রীতিমত ঘুরছে, বুকের উপর যেন একটা অসহ্য বোঝা। আমি চোখ বুজলাম। মনে হচ্ছিল আজ একটু পরেই হয় ত অজ্ঞান হয়ে যাব। যে জগত ছেড়ে চলে যাচ্ছি তার দিকে শেষ বারের মত চেয়ে দেখব বলে একবার চোখ খুললাম, খুলেই যা দেখলাম তাতে ভাঙ্গা গলায় এক চীৎকার দিয়ে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালাম !

পোর্ট হোল দিয়ে আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছে একটা মানুষের মুখ !!

ক্রমশঃ

॥ জেনে রেখো ॥

প্রীতিভূষণ চাকী

২

একদিন খুকুমণি বলেছিলো হেঁকে—
'বলো দেখি প্রজাপতি আসে কোত্থেকে ?
প্রশ্নটা শুনে খোকা খুশি হয় ভারী
কিছুতেই ঠকবেনা, জিত হবে তারই।
'শুঁয়ো পোকা গুটি গুটি' গুটি হয় আগে
তার থেকে ডানা মেলে প্রজাপতি জাগে।

১

পোকাদের জগতেও
আছে বড় কারিগর—
অদ্ভুত কৌশলে
গড়ে তোলে বাড়িঘর !
দল ধরে উইপোকা
চলে সারি সারি
যেন তারা সৈনিক
শৃঙ্খলা ভারী !
মাঠে বনে ভুল হয়
পাহাড় কি বাসা !
ঠিক যেন মিশরের
পিরামিড খাসা।

৩

ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকে
খুঁজে ফেরে কাকে
জানো কি ?
ওরা যায় কাজে
ডানা দুটি বাজে—
মুখ ওরা খোলে না
মানো কি ?

এ-ও-সে-তা

গৌরী ধর্মপাল (চৌধুরী)

তিন জেলে নদীতে মাছ ধরতে গেছে। এ, ও সে। আর এক চিল গেছে তাদের পেছন পেছন, তার নাম তা।

এ বললে, আমি ভাই নৌকো নিয়ে মাঝ নদীতে যাই।

ও বললে, আমি থাকব কোমরজলে। যে মাছগুলো পালিয়ে এদিকে আসবে, সেগুলোকে ধরব। সে চুপ করে রইল।

এ-ও বললে, ভাই, তুই কিছু করবি না?

সে বললে, ভাই, করতুম তো, কিন্তু বেরোবার মুখে বৌ বললে, বাবু নদীতে মাছ ধরতে যাবে, কত লোকজনের আসা-যাওয়া, ফরসা কাপড়খানা পরে যাও। তা ছাড়া অনেকদিন বাদে আজ বেয়াইবাড়ির দেওয়া গন্ধসাবান মেখে চান করেছি। জল কাদা ঘাঁটতে কি ইচ্ছে করে? তা তোরা ভাই মাছ ধরতে যা আমি এই কিনারায় দাঁড়িয়ে রইলুম। কোন মাছ যদি এদিকে লাফিয়ে পড়ে তো ধরব!

এরা বললে, আচ্ছা।

অনেকদিন জলকাদা ঘেঁটে দুজনে মিলে ধরলে এক দশসেরী কাতলা মাছ। তারপর ছুরি বার করে তাকে ডাকলে, এই, কাটবি আয়। সে বললে, ভাই যেতুম তো, কিন্তু কাপড়খানা যে যাবে।

এরা বললে, আচ্ছা তবে থাক।

মাছখানাকে লম্বালম্বি চিরে এ নিলে আধখানা, ও নিলে আধখানা, আর মাঝখান থেকে কাঁটাখানা বের করে নিয়ে তাকে বললে, এই নে।

সে বললে, বয়ে গেছে আমার কাঁটা নিতে। শীগগির আমার ভাগ আমায় দে বলছি।

তখন এ বললে, জল ছুঁলে না, কাদা ছুঁলে না, ভাগের বেলা পুরো?

ও বললে, হাত দিলে না, মাথা দিলে না, মাছের বেলা মুড়ো?

মাথার ওপর থেকে তা বললে, তা-ও কি কখনো হয়? বলেই ছোঁ মেরে কাঁটাখানা নিয়ে উড়ে চলে গেল। সে ধর্ ধর্ করতে করতে তা-র পেছন পেছন ছুটল। ছুটতে ছুটতে শিয়ালকাঁটার খোঁচা লেগে কোঁচা-কাপড় ফঁড়র-ফাঁই। পাশেই ছিল বিছুটির ঝোপ, অন্ধকারে হুড়মুড়ি, আঁই-মাঁই-কাঁই।

সারা গায়ে গোবর মেখে সে যখন বাড়ি ফিরল, এ-ও ততক্ষণে বেচাকেনা সেরে নেয়েধুয়ে খেয়ে দেয়ে ঘুম।

(ছড়া নাটিকা)

প্রদীপ কুমার রায়

(ঠাকুরমার ঝুলির গল্প আর হাসিখুশির ছড়ার কিছু অংশের সাহায্য নিয়ে রচিত এই ছড়া-নাটিকা। জল হাওয়ার মতো এগুলো বাংলার সার্বজনীন সম্পদ, তাই ঋণ স্বীকার নিরর্থক।)

—এক—

[এক যে ছিল শেয়াল
তার বাপ দিয়েছিল দেয়াল ;
সেও আর কমবা কিসে,
তারো হল খেয়াল।
ইয়া ইয়া ইয়া,
গোঁফে চাড়া দিয়া
খুললো সে এক পাঠশালা যে
কচুর বনে গিয়া।
যত পশুর ছা,
আদুড় করে গা,
পড়ছে বসে নামতা এবং
ক, খ, অ, আ।
শেয়াল ভরে প্রাণ
মলছে তাদের কান,
বেতের ঘায়ে পিঠ ফাটিয়ে
করছে শিক্ষাদান।]

শেয়াল করিস নে গোল, থামরে থাম,
ভুলিয়ে দেবো নিজের নাম ;
এমন পড়া পড়বি তোরা
পড়বে পায়ে মাথার ঘাম।
এগিয়ে দিয়ে গড়গড়া,
মন দিয়ে সব কর পড়া ;
বদলে দিয়ে কলকেটি,
স্বরবর্ণ বল দেখি ?

ছাগল ছানা। অজগর আসছে তেড়ে,
পাচ্ছ তাতে ভয় নাকি ?
ভেড়ার ছানা। আমটি আমি খাব পেড়ে,
দেখে সাহস হয় নাকি !
কুকুর ছানা। ইঁদুর ছানা ভয়েই মরে,
তার কি আবার ভাবনা হে ?
বেড়াল ছানা। ঈগল পাখি পাছে ধরে,
পালাচ্ছে তাই পাবনা হে !
ছাগল ছানা। উট চলেছে মুখটি তুলে,
খুঁজছে গাছে খাবার গো ;
ভেড়ার ছানা। দীর্ঘ ঊটি আছে ঝুলে,
করলে তাকেই সাবাড় গো !

কুকুর ছানা। ঋষি মশাই বসে পূজায়,
কাঁসর ঘণ্টা খুব নাড়ে;

বেড়াল ছানা। ৯ কার যেন ডিগবাজি খায়,
পড়ল বুঝি তাঁর ঘাড়ে!

ছাগল ছানা। এক্কা গাড়ি খুব ছুটেছে,
রাস্তা বেজায় অন্ধকার!

ভেড়ার ছানা। ঐ দেখ ভাই চাঁদ উঠেছে,
ভাগ্যটা নয় মন্দ তার।

কুকুর ছানা। ওল খেয়ো না ধরবে গলা,
বদ্যি এসে মারবে হে;

বেড়াল ছানা। ঔষধ খেতে মিছে বলা,
তেঁতুল খেলেই সারবে হে।

শেয়াল। সাবাস, সাবাস, বেশ বলেছিস,
বই থেকে স্বরবর্ণটা।
ব্যঞ্জনটা বলবি এবার,
নইলে ধরব কর্ণটা।
ভুল করলে আজকে তোদের
করব ক্রীয়ার কর্মটা;
বেতের ঘায়ে থাকবে নাকো
পিঠের উপর চর্মটা।

ছাগল ছানা। কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি,
ঠিক পুলিশের পাগড়িটা!
খেঁকশিয়ালী পালায় ছুটি,
খেয়েছে তার দাবৃড়িটা।

ভেড়ার ছানা। গরু বাছুর দাঁড়িয়ে আছে,
জাবর কাটা বন্ধ তো;
ঘুঘু পাখি ডাকছে গাছে,
গলাটা নয় মন্দ তো।

কুকুর ছানা। ঙ নৌকা, মাঝি ব্যাঙ্
ডাকছে কেঁদে আল্লাকে।
চিতাবাঘের সরু ঠ্যাং,
খেয়েছে সব মাল্লাকে।

বেড়াল ছানা। ছাগল ছানা লাফিয়ে চলে,
সাঁতরে চলে মাছের ছাও।
জাহাজ ভাসে সাগর জলে
নদীর জলে ভাসছে নাও।

ছাগল ছানা। ঝাড়ু হাতে এল কানাই,
কোদাল হাতে বলাই হে;
ঞয় চড়ে নাচছে দুভাই,—
পাগল নাকি; পলাই হে।

ভেড়ার ছানা। টিয়া পাখির ঠোঁটটি লাল,
ঠুকরেছে সে শ্মশ্রুতে,
ঠাকুরদাদার শুকনো গাল,
ভাসছে যে তাই অশ্রুতে।

ছাগলছানা। থালা ভরা আছে মিঠাই,
তবুও পুজো পণ্ড হে;
দোয়াত আছে কালি নাই—
সরস্বতীর মণ্ডপে।

তিনজন। এক এক্কে এক,
গুরুমশাই আছেন বসে
চক্ষু মেলে দেখ!
দুই এক্কে দুই,
ঝাঁপিয়ে পড়ে সক্কলে তাঁর
চারটি চরণ ছুঁই।
তিন এক্কে তিন,
লেখাপড়া অংক তিনি
শেখান প্রতিদিন।
চার এক্কে চার,
একটুখানি ভুল করলেই
দেবেন কষে মার।
পাঁচ এক্কে পাঁচ,
রাগলে পরে বদলে দেবেন

চেহারাটার ধাঁচ।
ছয় এক্‌কে ছয়,
আমাদের এই বদমায়েসি
কদ্দিন তাঁর সয়?
সাত এক্‌কে সাত,
আজকে থেকে সবাই মিলে
পড়ব যে দিন রাত।
আট এক্‌কে আট
শুনছ ওগো গুরুমশাই
মানছি এবার ঘাট।
নয় এক্‌কে নয়,
মারটা তোমার থামাও এবার
যাচ্ছে না যে ভয়।
দশ এক্‌কে দশ,
দিগ্‌বিদিকে তোমার নামে
ছড়িয়ে যাবে যশ।

[সুন্দর বনভূমির
বিশাল কান্তি কুমীর
সাতটি ছানাপোনা নিয়ে
এবার হলেন হাজির।
দেবী পদ্মভূজা
সরস্বতীর পূজা
শেষ করেছেন; বেরিয়েছেন
দিনটা দেখে পাঁজীর।]

কুমীর। শেয়াল ভায়া, শেয়াল ভায়া,
পাঠশালাতে রইছ কি?
মাথার টেরি পাকড়ে ধরে
ছাত্রটাকে কইছ কি?

শেয়াল। এসো, এসো, কুমীর দাদা,
পড়েছি ভাই মুশকিলে;
উলটো করে পড়ছে ব্যাটা,
ভাঙবো যে দাঁত এক কিলে।
দূর হ গাধা, পড়গে যা।
এরা আবার কাদের ছা?

কুমীর। এই যে আমার সাতটি ছেলে,
আর পড়বে কোন্‌কালে?
ভাবছি এবার ঢুকিয়ে দেবো
তোমাদের এই পাঠশালে।

শেয়াল। আহা, এতো সুখের কথা,
করছি আজই ভর্তি হে।
কোনটির কি নাম রেখেছেন
তোমার গৃহকর্ত্রী হে?

কুমীর। এর নাম হাঁদা,
খুব সিধেসাধা;
মগজটা নয় এর জোরালো।

শেয়াল। ঘষে ঘষে রাঁদা,
মাথা করে ছাঁদা,
বুদ্ধিটা করে দেব ঘোরালো।

কুমীর। এর নাম গেঁটে,
ব্যাটা বড়ো বেঁটে,
নয়কো মানান সই লম্বা।

শেয়াল। দিনরাত মেরে
ওটা দেব সেরে,
কত মার করবে হজম বা?

কুমীর। এর নাম ভুতো,
রাস্তায় শুতো,
তাই এর রং বুঝি ময়লা।

শেয়াল। উনুনেতে সেঁকে
শোধরাব একে;
দেখ নি কি জ্বলন্ত কয়লা?

কুমীর। এর নাম ট্যারা,

চোখের চেহারা
দেখো তো কেমন এর ব্যাঁকা যে ?

শেয়াল। কেরোসিন তেলে
হ্যারিকেন জ্বেলে
চোখে দেব দুই বেলা ছ্যাঁকা যে।

কুমীর। এর নাম বোঁচা,
নাক চাঁচা পোঁছা,
চেহারায় ঠিক যেন চীনে।
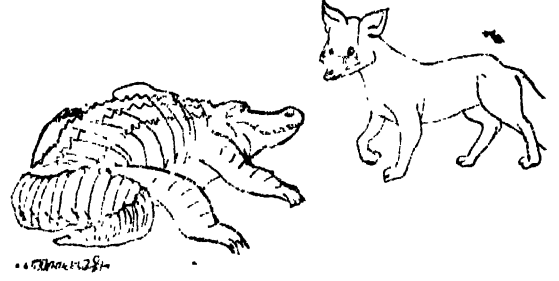
শেয়াল। রাত্তিরে শুলে
টেনে দেব তুলে
একটা সাঁড়াসী এনে কিনে।

কুমীর। এর নাম ন্যাড়া,
চুলগুলো ছেঁড়া,
মাথাখানা হেন ল্যাপা পোঁছা যে !

শেয়াল। চট দিয়ে মুছে
মোটা গুন ছুঁচে
টাকে এব দিতে হবে খোঁচা যে।

কুমীর। এর নাম ভোঁদা,
পালের এ গোদা,
দেহটা কেমন এর মোটা যে।

শেয়াল। শুধু জল সাবু
খেলে হবে কাবু,
তিন দিনে হবে এক ফোঁটা যে।

কুমীর। শেয়াল ভায়া বেশ কথা
জানোই তো ভাই আমার কাছে
তোমার কথাই শেষ কথা !
চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে অনেক কাজ।
খুঁজছে আমায় প্রায় প্রতিদিন
সাগর পারের হাঙর রাজ।
বোশেখ মাসে চড়বে যে তাঁর
মাথায় তাজ,
ভোজের পাতে দেবার তরে
মানুষ যে চাই এক জাহাজ।

ছেলের কথা ভাববো যে ছাই
কাজের আমার শেষ কোথা ?
তোমার কাছেই রইল এরা
তোমার কথাই শেষ কথা।
শেয়াল ভায়া, বেশ কথা

শেয়াল। কুমীর দাদা, কুমীর দাদা,
পাচ্ছ মিছে ভয় নাকি ?
তোমার ছেলে গ্রামসুবাদে
ভাইপো আমার হয় নাকি ?
বাপকে ছেড়ে পুত্র কভু
খুড়োর কাছে রয় নাকি ?
আমায় যদি পর ভাব তো
মনটা খারাপ হয় নাকি।
এ ইস্কুলের ফল যে ভালো
দেশের লোকে কয় নাকি ?
ফিরে এসেই দেখবে ছেলে
বিদ্যেসাগর হয় নাকি !
অমনি কি আর হচ্ছে ভালো
পাঠশালাটার পয় নাকি ?
মাঝে মাঝে আসেন হেথা
মন্ত্রী মহাশয় নাকি ?
কুমীর দাদা, কুমীর দাদা,
পাচ্ছ মিছে ভয় নাকি ?
তোমার সাথে আজকে আমার
নতুন পরিচয় নাকি ?

ক্রমশঃ

(আমার নাম পানু, বয়স বারো বছর। বাস থেকে পড়ে গিয়ে আমার শিরদাঁড়া জখম হয়ে গিয়েছে বলে হাঁটতে পারি না. একটা ছোট গাড়ি চড়ে বাড়ির মধ্যে ঘুরে বেড়াই আর তেতলার জানলা দিয়ে চারদিকে দেখি। ভজুদা বলেন—হাঁটতে চেষ্টা কর! এক্সারসাইজ কর্। আমার পোষা বেড়ালের নাম নেপো। ভজুদা সকালে আমাকে তিন ঘণ্টা পড়ান, আমি বাড়িতে বসেই বার্ষিক পরীক্ষা পাশ করেছি:

বড় মাস্টার প্রতি রবিবারে আমাকে গল্প বলতে আসেন। গুপি আমার বন্ধু, সেও গল্প শোনে। তিনি লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা করেছেন, সারা পৃথিবী ঘুরে সাংঘাতিক, রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। ঝড়ের মধ্যে জাহাজডুবি হয়েছিল, হাঙরে একটা পা কামড়ে টেনে নিয়েছিল. এখন কাঠের পা। অগ্নিকাণ্ডে বৌ-এর মুখ পুড়ে গিয়েছিল। এখন সব ছেড়ে ছুড়ে সামান্য টাকায় আমাদের বাড়ির পাশের ছাপাখানার প্রুফ দেখেন আর নাইট স্কুল চালান। তাঁর নতুন এসিস্টান্ট তলাপত্র আমাদের বাড়ি এসেছিলেন।

গুপি তার ছোট মামার কাছ থেকে নানা বই আনে, মঙ্গলের মানুষ. চন্দ্রনাথের চন্দ্রযাত্রা—এই সব। আমরা ঠিক করেছি বড় হয়ে চাঁদে যাব। গুপির ছোটমামা মহাকাশ-যান বানাবে। এখন থেকে লোহা পেরেক জমাচ্ছে।

ভজুদাদের কলেজের প্রিন্সিপ্যালের নতুন গাড়ি চুরি হয়ে গেছে মেজকাকুর গাড়িও। আজকাল হরদম গাড়ি চুরি হচ্ছে। কিন্তু এবার বিখ্যাত গোয়েন্দা বিনু তালুকদার তাঁর দলবল নিয়ে আসরে নেমেছেন। মোটর চোরদের ঘাঁটিশুদ্ধ নাকি তাঁরা বের করে দেবেন। কানু সামন্তর মুখে খালি সেই কথা।

কদিন থেকে নেপোকে পাওয়া যাচ্ছে না। গতমাসে এই পাড়া থেকে ছত্রিশটা বেড়াল নিখোঁজ।

বাড়ির পেছনের 'ঠাণ্ডাঘরটা' থেকে দারুন খটখট ঝনঝন আওয়াজ আসছে। ওখানে নাকি স্পেসশিপ

তৈরি করছে। গুপির ছোট মামা বাড়ি থেকে পালিয়ে ওখানে নাইটওয়াচম্যানের চাকরি নিয়ে লুকিয়ে আছে। ওদিকে তার ঘরে চোরাই গাড়ির নাম্বার প্লেট পাওয়া গেছে!

আজকাল ছোটমাস্টার আমাকে রোজ বিকালে মডেল বানাতে শেখান।

হঠাৎ আমাদের গলিতে সে কি দুপদাপ ক্যাঁও ম্যাও, জানালা দিয়ে দেখি স্রোতের মতো বেড়ালের পাল ছুটে বেরিয়ে আসছে। কিন্তু বেড়ালের পালের মধ্যে নেপো ছিল না। কিছুক্ষণ পরে গুপির ছোটমামা এসে হাজির। তার কাছে শুনলাম যে ঠাণ্ডাঘরের দেওয়ালে, গঙ্গার উপরে একটা চোঙার মুখ কাঠ দিয়ে আঁটা ছিল। তদন্ত করবার জন্য হাতুড়ি দিয়ে সেই কাঠ ভাঙতেই সেকি খচমচ আর খামচা খামচি!

ঝরনার মত ঝুপঝাপ বেড়াল পড়ল।

ছোটমাস্টার বললেন যে সাহসী কেউ ঐ চোঙার মুখ দিয়ে ঢুকে অনুসন্ধান করতে পারে।

উত্তেজিত হয়ে ছোটমামা চলে গেল। তারপর থেকে তাঁর আর খোঁজ নেই!

হুড়মুড় করে গুপি ঘরে এসে বলল—পানু সর্বনাশ হয়ে গেছে!')

(দশ)

গুপি পকেট থেকে কিলবিলে গোলাপি রং-এর কি একটা বিশ্রী জানোয়ার আমার কোলের উপর ফেলে দিয়ে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবলি হাঁপাতে লাগল। আমার ত চক্ষুস্থির। মনে হল নতুন ধরনের ব্যাঙ। আমি আবার ব্যাঙ দেখতে পারি না। তাই বলে যে ভয় পাই তা যেন কেউ মনে না করে। খুদে একটা গোলাপি ব্যাঙ; তাও যদি মস্ত পায়রাখেকো ব্যাঙ হত। ফেলেই দিচ্ছিলাম কোল থেকে, এমন সময় ছোটমাস্টার ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠলেন—'ওর পায়ে বাঁধা ওটা কি?'

বলে আমার কোল থেকে ব্যাঙটাকে তুলে নিয়ে ভালো করে দেখতে লাগলেন। বাঁ পায়ে ছোট্ট একটা এলুমিনিয়মের খাপের মতো। ব্যাঙটা থরথর করে কাঁপছিল। মাঝে মাঝে কালো ঠোঁট দুটো খুলছিল আর বন্ধ করছিল। ভারি অদ্ভুত লাগল। ব্যাঙের আবার ঠোঁট হয় জানতাম না।

গুপি গোল গোল চোখ করে এক সেকেণ্ড তাকিয়ে থেকে, বলল, 'ওটা ব্যাঙ নয়, আমাদের বার্তাবাহী পায়রা, বিদ্যুৎ।' বলে কি! পায়রা কখনো ব্যাঙের মতো হয়? গুপি বলল, 'হয় হয়। সব জানোয়ারের লোম ছাড়ালেই ব্যাঙের মতো। মানুষও। আমার ছোট বোনটা একেবারে ব্যাঙের মতো, শুধু একটু বড়, এই যা।'

ছোটমাস্টার ততক্ষণে পায়ের খাপটা খুলে ছোট একটা চিঠি বের করে ফেলেছেন। চিঠি খুলে চমকে উঠে সেটা গুপিকে দিলেন। গুপিও চিঠি পড়ে দারুণ ব্যস্ত হয়ে উঠে, আমাকে দিল। দেখি ফিকে পেনসিল দিয়ে লেখা 'গুপে চলে আয়। লোমহর্ষক ব্যাপার।' নামটাম নেই।

ছোটমাস্টার বললেন, 'চাঁদুর লেখাই তো?' গুপি বলল, 'সে আর বলতে হবে না। অমন খারাপ হাতের লেখা আর কার হবে?' ছোটমাস্টার বললেন, 'কিন্তু কোথায় চলে যেতে হবে? একেবারে শত্রুর খপ্পরে পড়ে যাবি না তো? ওরা যদি চিঠির কথা না-ই জানবে তো পায়রার পালক ছাড়াল কে? গুপি বলল, 'তাইতো যে পালক ছাড়িয়েছে, সে খাপটাকেও দেখেছে। আর খাপ দেখেছে যখন তখন কি আর চিঠি খুলে পড়ে নি। পড়ে আবার গুঁজে রেখেছে। যাতে সবাইকে এক সঙ্গে ধরতে পারে। কে জানে ছোটমামা এতক্ষণ বেঁচে—!' গুপি থেমে গিয়ে মুখ ঢাকল। হঠাৎ আমি হেসে উঠলাম। ওরা তো অবাক।

ছোটমাস্টার ভারি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'একটা মানুষের মরণ-বাঁচন সমস্যা আর তোমার কি না হাসি পাচ্ছে!'

খুব লজ্জা পেয়ে বললাম, 'না, না, সেজন্যে নয়, তাছাড়া ছোটমামা যে সহজে মরবে না সেটা ঠিক। আমি হাসছিলাম কারণ নেপো যে বেঁচে আছে সেটা প্রমাণ হল। পাখি ধরতে পারলেই ও তাদের পালক ছাড়ায়। পায়রা যেখান থেকে এসেছে, সেখানে নেপোও আছে।'

গুপি বলল, 'তার মানে সেখানে ছোট মামাও আছে।' চলুন, ছোট স্যার, তাকে উদ্ধার করতে হবে। বিপদ আপদ দেখলে ছোটমামার দাঁত কপাটি লেগে যায়।' ছোটমাস্টার কাষ্ঠ হেসে বললেন, 'তাহলে চাঁদে যাবার খুবই উপযুক্ত পাত্র দেখছি। তুমি বরং এগোও, আমি একটু কাজ সেরে আসছি।'

গুপি বলল, 'কার কত সাহস বোঝাই যাচ্ছে।' ঐ ওর দোষ, অল্পতেই রেগে যায়। ছোট মাস্টার কিছু মনে করলেন না। তাছাড়া বড় মাস্টারের কাছে তো দিন-রাতই এই ধরনের কথা শোনেন। নরম গলায় বললেন, 'মন্দ বল নি। দুজনে গেলে বেশি কাজে দেবে। তা হলে তোমরা এখানে একটু অপেক্ষা কর, আমি কাজ দুটো সেরে আসি। ততক্ষণে এই বইটা থেকে চাঁদের বিষয়ে আরো কিছু তথ্য শেখো, কেমন?' এই বলে ছোট একটা বই আমার হাতে দিয়ে ছোটমাস্টার এক রকম ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

ভাবি ভালো বইটা! নাম 'চাঁদের রহস্য'। খুলে দেখলাম লেখা রয়েছে সম্ভবতঃ সাড়ে চারশো কোটি বছর আগে গ্যাস আর ধুলো এক সঙ্গে জমে চাঁদের সৃষ্টি হয়েছিল, এই রকম মত কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ পোষণ করে থাকেন। অর্থাৎ চাঁদ পৃথিবীর চেয়েও পুরনো। কেউ কেউ আবার বলেন পৃথিবীর টুকরো ছিঁড়ে উড়ে গিয়ে চাঁদ তৈরি হয়েছে।

চাঁদ নিজের অক্ষ-দণ্ডে ২৭½ দিনে একবার পাক খায়। পৃথিবীর চারদিকে ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিটে একবার ঘুরে আসে। চাঁদের ব্যাসের মাপ ৩৪৫৬ কিলোমিটার। মাঝে মাঝে চাঁদে যে রঙের পরিবর্তন দেখা যায়, তার কারণ সম্ভবতঃ নিবে যাওয়া আগ্নেয়-গিরির গহ্বর থেকে গ্যাস্ বেরোয়।

এই অবধি পড়ে গুপি বইটাকে ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে, ঘরময় পাইচারি করতে লাগল। দেখলাম মুখটা খুব লাল। বোধহয় কান্না চাপছিল। ঠিক সেই সময় হন্ত-দন্ত হয়ে ছোট মাস্টার ফিরে এসে বললেন, 'গুপি, চল।'

তারপর একটা ছোট্ট কার্ডে একটি গোপন টেলিফোন নম্বর আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'যদি দেখ রাত দশটার মধ্যেও আমরা ফিরে এলাম না, তাহলে এই নম্বরে ফোন্ করে শুধু বলবে—'ফুস্-মন্তর,' বাস্ আর কিছু নয়। কার্ডটি তখুনি ছিঁড়ে ফেলো আর কখনো কাউকে বল না।' বলিও নি কাউকে, তা ছাড়া এখন ভুলেও গেছি। অবিশ্যি ফোন করার দরকার-ও হয় নি। কার্ডটাকে ছিঁড়েও ফেলেছি।

ওরা চলে গেলে পর আমার নানান কথা মনে হতে লাগল। পা দুটোর উপর এমনি রাগ হতে লাগল যে আর কি বলব। তার উপর রামকানাই এসে ইনিয়ে বিনিয়ে ওর পিসেমশাইয়ের কতবার কি অসুখ হয়েছিল তাই বলতে লাগল। ওকে বললাম, 'জান, নেপো বেঁচে আছে।' রামকানাই তো অবাক। 'ওকি কথা পাহুদাদা, যারা অনেকদিন সগ্গ ভোগ করছে, তাদের বিষয় অমন কথা বলতে হয় না। অবিশ্যি সগ্গ কি না সে বিষয়েও ঠিক বলা যায় না।'

আমি বললাম 'না, রামকানাই দা, না। নেপো ছাড়া কে বিদ্যুতের পালক ছাড়িয়েছে বল।' বুক পকেট থেকে বিদ্যুতকে বের করে দেখালাম। রামকানাই তো হাঁ।

হঠাৎ বড় মাস্টারের জানলার দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম। ঘরে আলো জ্বলছে না। এই বাড়িতে

আমরা চার বছর আছি, কখনো ও ঘর অন্ধকার দেখি নি। যেই না সূর্য ডোবে ও ঘরেও বাতি জলে। একবার অনেকক্ষণ পাড়ার সব আলো নিবে গেছিল। সেবার সঙ্গে সঙ্গে ও ঘরে মোমবাতির আলো দেখতে পেয়েছিলাম। বৌ বোধ করি অন্ধকারকে ভয় পায়। অথচ একদিন ঐ বৌ-ই বনে বাস করত।

জানলার কাছে গিয়ে দেখলাম ছাপাখানার আর ঠাণ্ডা-ঘরের কোনো আলোই জলছে না। নিচে বড়মাস্টারের নাইটস্কুলের সেডের সামনের বড় আলোও নেবানো। কোথাও একটা লোক দেখা যাচ্ছে না। তবু আমার ঘরে বসেই টের পাচ্ছিলাম যে ঐ দুটো বাড়িতে সাংঘাতিক কিছু একটা পাকিয়ে উঠছে।

রামকানাইকে বললাম, 'তুমি একবার যাও না, গুপি আর ছোট মাস্টারের সাহায্যে দরকার হতে পারে।' রামকানাই ফোঁস করে উঠল, 'ও বাবা, সে আমি পারব না। কেউটে সাপের বাসায় নাক গলানো আমার কম্ম নয়। তা ছাড়া আমি গেলে তোমায় দেখাশুনো করবে কে! তোমাকে একা ফেলে যাই, আমার চাকরিটাও যাক্ আর কি। যাই, মাংসটা চাপিয়ে এসেছি।' এই বলে রামকানাই সত্যি সত্যি দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

দরজার কাছে পৌঁছে, ফিরে বলল, 'কোনো ভয় নেই, ঐ যে সামন্তবাবুও একদল প্যায়দা নিয়ে গলিতে ঢুকল। যাই, মাংস না ধরে যায়। চোর ধরার চেয়ে সে অনেক খারাপ হবে।'

আরো অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম রামকানাই একবার উঁকি মেরে দেখতে এল কি করছি। বললাম, 'সব শুনেও নেপোকে খুঁজতে যাবে না?' রামকানাই বলল, 'না আমার গুরুদেব শুনলে দুঃখিত হবেন।' এই বলেই চলে গেল। একটু পরে আবার এসে বলল।

'অত নেপো—নেপো কর কেন? মহা পাজি বেড়াল। অমন ঢের ঢের বেড়াল পাওয়া যায়। চাও তো দুটো একটাকে এনেও দিতে পারি।' চাঁদের বইটা ছুঁড়ে মারলাম।

সঙ্গে সঙ্গে সে কি চিৎকার!! শুনে আমার গায়ের সব লোম খাড়া হয়ে উঠল। মনে হল কে চ্যাঁচাচ্ছে, 'পানু—পানু—পানু—ওরে পানু—বাঁচা—রে! মি—আঁ্যা—ও মি আঁ্যাও।' আর এক মিনিটও অপেক্ষা করলাম না, পাঁই পাঁই গাড়ি চালিয়ে একেবারে পেছনের বারান্দার ঘোরানো সিঁড়ির মুখের কাছে চলে গেলাম। মনে হল ও দিকে ওদের ঘোরানো সিঁড়ির মাথার দরজাটায় কারা যেন আছড়ে পড়ল। 'পানু—পানু বাঁচা।' আর সে কি ম্যাঁও—ম্যাঁও শব্দ। 'ও রামকানাই দা! ও রামকানাই দা!' বলে চ্যাঁচাতে লাগলাম। উত্তর নেই। হঠাৎ দেখি রঙের মিস্ত্রিদের তক্তাটা আমাদের রেলিংএর ধারে পড়ে আছে। এক মাথা সিঁড়ির রেলিংএ বাঁধা নিশ্চয় গুপির কাজ। হাত বাড়িয়ে সেটাকে তুলে নিলাম। বেশ ভারি। গাড়ি থেকে নেমে সিঁড়ির রেলিংএর ফাঁক দিয়ে ঠেলে ঠেলে যেই না ওদের সিঁড়ির সঙ্গে জুড়ে দিলাম, অমনি ওদিকের দরজা খুলে হুড়মুড় করে দাড়িওয়ালা একটা লোক বেড়াল বগলে তক্তা পেরিয়ে চলে এল। সঙ্গে সঙ্গে গুপি এসেই সে তক্তা টেনে নিল। কিন্তু ততক্ষণে আরো গোটা দশেক বেড়াল আমাদের বারাণ্ডায় এসে উঠেছে। উঠেই কার্নিশ বেয়ে হাওয়া।

আমি মাটিতে পড়ে গিয়েছিলাম। এবার উঠে গাড়িতে চেপে খাবার ঘরে এলাম। গুপি বারান্দার দরজাটা বন্ধ করে দিল! আমি কেবল বলতে লাগলাম—'ওরে নেপো, নেপো, আবার ফিরে এসেছিস্।' আর নেপো আমার কোলে পিঠে উঠে কেবলি আমাকে চাটতে লাগল। নেপোর গলায় দেখলাম একটা সাদা টিকিট ঝুলছে।

ছোটমামা আর গুপি আমার বিছানায় বসে বসে খালি হাঁপাতে লাগল। তাদের মুখগুলো কাগজের মত সাদা, হাত পা কাঁপছে।

রামকানাইকে কিছু না বলতেই ওদের জন্যে গরম চা আর নেপোর জন্যে বাটি করে দুধ নিয়ে এল। নাক

টানতে টানতে নেপোকে আমার কাছ থেকে নিয়ে দুধের বাটির সামনে বসিয়ে দিল এবং বলা বাহুল্য নেপোও তৎক্ষণাৎ দুধের সদ্ব্যবহার করতে লেগে গেল।

এমন সময় দরজা ঠেলে মেজকাকু ঢুকেই, ওদের দেখে বললেন 'এই যে তোমরা এখানে! ওটা কে? চাঁদু না? তুই আবার দাড়ি রেখেছিস কেন? চেঁচে ফেল, বিশ্রী দেখাচ্ছে, স্রেফ আইন ভঙ্গকারী! তোরা এখানে কি কচ্ছিস্ এদিকে পাশের বাড়িতে বিনু তালুকদার যে কেল্লা ফতে করে দিয়েছে তাও জানিস্ না বুঝি? এবার তুই বাড়ি ফিরে নিশ্চিন্তমনে পড়াশুনো কর্‌গে যা। বুড়ো বাপকে আর জ্বালাস্ নি।'

গড়গড় করে কি যে বকছেন কাকু আমি ভালো করে বুঝতেই পারছিলাম না। কিন্তু গুপি আর ছোট মামা কোন কথা না বলে পাশাপাশি আমার খাটের উপর শুয়ে পড়ল। কাকু ব্যস্ত হয়ে রামকানাইকে বললেন, 'হাঁ করে বসে আছিস যে? ওদের দাঁতকপাটি লেগেছে দেখছিস না? মাথায় জলের ঝাপটা দে!' কিন্তু রামকানাইএর-ও এমনি হাত-পা কাঁপছিল যে সেও নড়তে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত আমিই তাক থেকে কুঁজো নামিয়ে জলের ঝাপটা দিতে লাগলাম। তাই দেখে কাকু আবার ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, 'এঁ্যা! তু-তু-ই হাঁটছিস!'

তাইতো, দিব্যি হাঁটাহাঁটি করছি, এতক্ষণ তো টের পাই নি। বাবা-ও এসে ঘরে ঢুকে হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। কেন জানি হাউ মাউ করে কেঁদে ফেললাম। বাবা-ও নাক টানতে টানতে আমার হাত ধরে আবার বসিয়ে দিলেন। পকেটে বোধ হয় চিপকে গিয়ে বিদ্যুৎ বক-বকম্ করে উঠল। মা এসে কিছু না বলে মহা কান্নাকাটি লাগালেন। এ তো বড় জ্বালা।

অনেক পরে বাবা বললেন, 'ডাক্তারবাবুকে ফোন্ করে দেওয়া হয়েছে, এখুনি আসবেন। বললেন এইরকম একটা উত্তেজনার-ই দরকার ছিল। কিন্তু এরা দুজন এখনো ভিজে বালিশে শুয়ে কেন? সর্দি লাগবে না?'

গুপি আর ছোটমামার দুজনারি সর্দির বড় ভয়। বাবার কথা শুনেই উঠে বসে আমার তোয়ালে দিয়ে তারা মাথা মুছতে লেগে গেল।

তারপর বাবা মেজ কাকুকে বললেন, 'কি ব্যাপার খুলে বল্ দিকি নি।' কাকু বললেন, 'কাদু সামন্ত একুণি এল বলে, এদের স্টেটমেণ্ট নিতে। তার কাছেই সব শুনো। আমার বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে গেছে। কাদু ফোন করে বলল তোমার বাড়ি থেকে পাখি যেন না পালায়। তাই এলাম।' একথা যেই না বলা ছোটমামা আর গুপি দুজনেই লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। মেজকাকু বললেন, 'ও কি হচ্ছে? ওসব চলবে না। চুপ করে বসে থাক। আমি কথা দিয়েছি কাদু না আসা অবধি তোমাদের এখানে আটকে রাখব।'

গুপি বলল, 'কি—কি—করে জানলেন আমরা এখানে?' মেজকাকু তো অবাক! 'কি করে জানলাম? শুধু আমি না, পাড়াসুদ্ধ যত লোক অন্ধকার গলিতে খাপে দাঁড়িয়ে ছিল, সবাই দেখেছে তক্তা পার হয়ে দুজন আইনভঙ্গকারী এখানে আশ্রয় নিচ্ছে। খবরদার যদি নড়েছ!! আর সামন্ত আসার আগে ঠোঁট ফাঁক করবে না। তোমরাই পুলিসের সব চেয়ে বড় সাক্ষী। ভিতরের ব্যাপার স্ব-চক্ষে দেখে এসেছ। ছোট মাস্টার কোথায়? যাক গে, পুঁটিমাছ বোধ হয় বিনু তালুকদারের জালে পড়েছে।'

এই বলে মেজকাকু বেদম হাসতে লাগলেন। খুব রাগ হল।

তারপর গম্ভীর মুখ করে ছোটমামার দিকে চেয়ে বললেন, 'তুমি সত্যি এর মধ্যে জড়িয়ে আছ দেখে বড়

দুঃখিত হলাম। তোমার বাবা এত ভালো লোক, গেলেই কি ভালো তামাক খাওয়ান। তবে কানু সামন্ত যেই তোমার ঘরে চোরাই গাড়ির নম্বর প্লেট পেয়েছিল, তখনি সব আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছিল, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি তুমি দুষ্টুলোকের—'

ছোটমামা হঠাৎ রেগে গেলেন। 'ওসব আমি গোমেস ব্রাদার্স থেকে সের দরে কিনেছি, তার ভাউচার আছে মার হাতবাক্সে, গিয়ে দেখতে পারেন।' শুনে মেজকাকু অবাক।

বাবা হেসে বললেন, 'ও হো, তোকে বলা হয় নি। চাঁদু যে স্পেসশিপ বানিয়ে গুপি আর পানুকে চাঁদে নিয়ে যাবে। সেখানে জমি কিনে ওরা স্পেসশিপ সারাবার কারখানা করবে।—ভাখ্ চাঁদু, মাটির তলার জমি কিনিস্ কিন্তু, ওপরের জমি বাজে।—হ্যাঁ কি বলছিলাম, তা চাঁদে যাবার খরচা কম নয়, ওরা পারবে কেন? তাই চাঁদু নিজেই স্পেসশিপ বানাবে। তাই নিয়ে এত ভাবতে হয় যে পড়া করার সময় পায় না। ফলে বি-এস্-সিতে সুবিধা করতে পারে নি।'

এই অবধি বলে বাবা আর মেজকাকু যে যার নিজের হাতঘড়ি দেখলেন। মেজকাকু জানলার কাছে গিয়ে বললেন, 'দশটা বাজতে দশ মিনিট; আমাদের সকলের জন্যে রাঁধতে দিয়েছ আশা করি, বড়দা?'

রামকানাই দরজার কাছ থেকে বলল, 'খিচুড়ি মাংস, আলুভাজা, বেগুনভাজা।'

গুপি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। আমি বললাম, 'কি, মেজ কাকু, তোমার শুধু খাওয়ার ভাবনা।'

গুপি আর ছোটমামা একসঙ্গে বলল, 'খাওয়ার ভাবনা খারাপ নাকি? উঃ পেটে চড়া পড়ে গেছে!'

ডাক্তারবাবু এলেন। আমার পা পরীক্ষা করলেন। হাঁটালেন চলালেন, ওঠ-বোস করালেন। তারপর ওষুধপত্র মালিশের ব্যবস্থা করে দিয়ে বললেন, 'পানু, এও তোমার এক রকম পরীক্ষা শেষ হল। তুমি খুব ভালো ভাবে পাশ করেছ। একমাস এক্সারসাইজ করবে, বাড়াবাড়ি করবে না। তারপর স্কুলে যেতে পারবে। কেমন, খুশি তো?' আমার খুব সর্দি এসে গেল, কিছুই বলতে পারলাম না।

এমন সময় নিতাই সামন্ত এসে ঢুকলেন। সবাই চুপ।

মেজকাকু একটু কেশে বললেন, 'এই যে কানু, তোমার সাক্ষী-সাবুদ, অনেক কষ্টে আটকে রাখা গেছে।'

বাবা বললেন, 'তা ছাড়া অবিশ্যি দৌড়-ঝাঁপ করার মতো ওদের ক্ষমতাও নেই।'

ছোটমামা ভাঙা গলায় বললেন, 'দুদিন খাই নি। পিপেতে বন্ধ করে রেখেছিল।'

নিতাই সামন্ত বললেন, 'তাই নাকি? ভাগ্যিস গুপিরা গেছিল—!'

ছোটমামা চি চি করে বললেন, 'মোটেই ওরা আমাকে উদ্ধার করে নি। আমিই বরং—'

গুপি বলল, 'ফের!' ছোটমামা থেমে গিয়ে ঢোক গিলতে লাগলেন।

'বাবা আর মেজকাকু একসঙ্গে বললেন, 'এবার তাহলে রহস্য উদ্ঘাটন হোক।'

নিতাই সামন্ত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন ধৈর্য ধরুন। বিনু তালুকদার রিং লিডারদের নিয়ে এখানে আসছেন, মোকাবিলা করতে। অর্থাৎ সবাইকে মুখোমুখি এনে ব্যাপার খোলসা করতে। তেওয়ারি রাখুর দলও আসবে, কিছু আসবাব সরালে ভালো হয়।'

আমি বললাম 'আমার ঘরে কেন? তার চেয়ে সবাই মিলে বসবার ঘরে গেলে হয় না?'

সামন্ত বললেন, 'আরো ভালো হয় একদল যদি এখনি খেয়ে নেয়। চাঁদু, গুপি, পানু, এরা খেয়ে নিক। দেখো, আবার পালাবার চেষ্টা করলে হুলিয়া লাগিয়ে ধরিয়ে এনে ফাটকে দেব কিন্তু। আর ভালোমানুষের মতো খেয়ে

নিলে, তোমাদের স্টেটমেণ্ট নিয়ে আমার জিপে করে যার যার বাড়ি পাঠিয়ে দেব। তোমরা কিছু আসামী নও, তোমরা হলে পুলিসের পক্ষের সাক্ষী।'

দরজার কাছ থেকে রামকানাই বলল, 'কোনো ভয় নেই। খাবার ফেলে ওনারা সগ্গেও যাবেন না। রান্না তৈরি।'

বাবা বললেন, 'চোপ।'

ছোটমামা বললেন, 'খেয়ে এসে সব বলব। কিন্তু আমাকেও গুপিদের ওখানে পাঠাবেন। বাবার কাছে এমনি গেলে বাবা দাড়ি ছিঁড়ে দেবেন।'

খেয়ে দেয়ে সবে এসেছি অমনি আমাদের সদর দরজার ঘন্টি তিনবার বেজে উঠল। নিতাই সামন্ত লাফিয়ে উঠলেন, 'ঐ, ঐ বিনু তালুকদারের সংকেত। আপনারা তিনটে বড় বড় শকের জন্য প্রস্তুত হোন।'

আমার পকেট থেকে বিদ্যুৎ আবার বকম-বকম করতে লাগল। আর নেপো তার পিঠটাকে কুলোর মতো করে, লোম ফুলিয়ে তিনগুণ বড় হয়ে, দাঁতের ফাঁক দিয়ে অদ্ভুত একটা ট্স্স্ ফস্স্ শব্দ করতে লাগল। ক্রমশঃ

॥ আম যদি নাই খাস ॥

॥ ঝুমুর চৌধুরী ॥

আম যদি নাই খাস, খা না আমসত্ত্ব
রোগ হ'লে ভাত দেব, সেরে গেলে পথ্য।
কোকিলের মত কাক
গান গায়, ভবে না!
সোনার পাথর বাটি
কেন বল হবে না?
পরশমণির মোহ
আর ভবে রবে না।
কস্তুরী মৃগসম হয়ে যাবি মত্ত ॥

পেঁয়াজ না খাস যদি, খেতে দেব পেঁয়াজি
কল্প তরুর কাছে দান চাওয়া রেওয়াজই।
লাট-খাওয়া ঘুড়ি হয়ে
লাট খা না শূন্যে:
হযবর গান গেয়ে
প্রাণ ভর পুণ্যে:
চাঁদ তুই চাস নাকো?
বেশ তবে MOON নে।
স্ক্রুটা এঁটে মাথাটায় করে নে না গর্ত্ত ॥
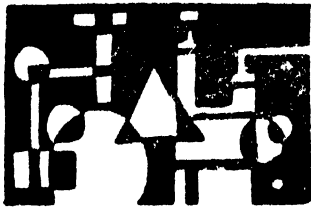
॥ ডারলিং পুরস্কার ॥

চুণীলাল রায়

ম্যালেরিয়া একটা পুরনো অসুখ। সুদূর অতীত থেকেই এই অসুখটি মানুষের দুর্ভাগ্যের একটা প্রধান কারণ হয়ে এসেছে। এই রোগ গ্রীষ্মমণ্ডলের সমস্ত জায়গায় বিস্তৃত।

তোমরা একথা জানো যে বাংলাদেশে আগে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ছিল ভীষণ সাংঘাতিক। ম্যালেরিয়াতে ভুগে কতজন যে অকালে প্রাণ হারিয়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই। শুধু তাই নয় সমস্ত ভারতবর্ষই ছিল ম্যালেরিয়ার একটা প্রধান ঘাঁটি।

কিন্তু এই রোগের বাহন যে 'অ্যানোফিলিস' নামে এক ধরনের মশা একথা আবিষ্কার হয়েছে মাত্র সেদিন—১৮৯৭ সালে। আর আবিষ্কর্তা হলেন রোনাল্ড রস। কলকাতারই প্রেসিডেন্সী জেনারেল (পি. জি.) হাসপাতালের (বর্তমানে শেঠ সুখলাল কারনানী হাসপাতাল) এক ছোট্ট ঘরে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণার পর তিনি তাঁর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

সেদিনই প্রথম মানব সভ্যতার এই শত্রুর বিরুদ্ধে সার্থক যুদ্ধ ঘোষণা করল মানুষ।

রোনাল্ড রস তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য পেলেন 'স্যার' খেতাব, এ'ছাড়া নোবেল পুরস্কার দেবার দ্বিতীয় বছরে (১৯০২) চিকিৎসা বিদ্যা এবং শারীরতত্ত্ব বিভাগে তাঁকে 'নোবেল পুরস্কার' দিয়ে সম্মানিত করা হ'ল।

সমস্ত বিশ্ব জুড়ে এই যুগান্তকারী আবিষ্কার নিয়ে সেদিন হৈ হৈ পড়ে গিয়েছিল।

ঠিক এমনি সময়ে ১৯০৩ সনে আমেরিকার বাল্টিমোর থেকে একজন ছাত্র চিকিৎসা বিজ্ঞানে 'ডক্টরেট' ডিগ্রী নিয়ে বের হ'ল। তার সামনে রয়েছে উজ্জ্বল ভবিষ্যত। সরকারের অধীনে যে কোন চাকরী নিয়ে শহরেই সে সুখে স্বচ্ছন্দে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারত।

কিন্তু তার মাথায় তখন ঢুকেছে অন্য চিন্তা। মানব সেবাব্রত গ্রহণ করে মানুষের যদি সে প্রকৃত চিকিৎসাই করতে না পারল তবে নিজের অর্থকরী সুখ দিয়ে কি হবে? এই চিন্তাই ঘুরিয়ে দিল তার জীবনের পথ। জন্ম হ'ল এক নতুন মানুষের, এক নতুন সেবাব্রতীর।

ম্যালেরিয়া রোগের তখন চিকিৎসকের অভাব ছিল খুব। তাই এই মহামারী রোগের কারণ

আবিষ্কার করা সম্ভব হলেও তার ব্যাপক চিকিৎসা শুরু হয়নি তখনও। ইনিই ডাঃ স্যামুয়েল টেইলর ডারলিং।

স্যামুয়েল টেইলর ডারলিং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে নিউজার্সীর হ্যারিসন নগরে ১৮৭২ সনের ৬ই এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন।

আগেই বলেছি ১৯০৩ সনে মাত্র ৩১ বছর বয়সে তিনি 'ডক্টরেট' ডিগ্রী পান। এরপর ১৯০৬ থেকে ১৯১৫ সন অবধি তিনি ইসথামিয়া ক্যানাল কমিশনের গবেষণাগারগুলির প্রধান হিসাবে কাজ করেন। এই সময় তাঁরা পানামা ক্যানাল অঞ্চলে কাজ চালান।

পরবর্তীকালে তিনি রকফেলার ফাউণ্ডেশন-এ যোগ দেন। এবার তিনি জাভা ও ফিজি দ্বীপপুঞ্জে 'অ্যানেমিয়া' বা রক্ত শূন্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও গবেষণা চালান।

দু' বছরের জন্য (১৯১৮-২০) তিনি ব্রাজিলের সাওপলো-তে স্বাস্থ্যবিদ্যার অধ্যাপক হিসাবেও কাজ করেছিলেন।

১৯২১ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্য একটি অঙ্গরাজ্য জর্জিয়ার লীসবার্গ-এ তিনি ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত গবেষণাগারের প্রধান অধিকর্তা নিযুক্ত হ'ন। তিনি এবার এই কাজে অনলস সাধকের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

তাঁর সাধনা কেবলমাত্র দেশবাসীর কাজেই এবার লেগে থাকল না। বিশ্ববাসীর সেবার জন্যও তাঁর মন উন্মুখ হয়ে রইল।

তাই এবার জাতিসংঘের (League of Nations) ম্যালেরিয়া কমিশন থেকে তাঁর ডাক পড়ল। তিনি সে ডাকে সাড়া দিলেন এবং একজন বিশিষ্ট সদস্য হিসাবে নিযুক্ত হলেন।

তাঁর গবেষণা এবার আর কেবলমাত্র ম্যালেরিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না। তাঁর দান রয়েছে 'জ্বর' সংক্রান্ত গবেষণার উপরও। জ্বর সেরে গিয়ে আবার যে আগের খারাপ অবস্থায় ফিরে আসে এর কারণ সম্বন্ধেও তিনি অনুসন্ধান চালিয়েছেন। তাছাড়া আমাশা আর বক্রকৃমির ছোঁয়াচে রোগ সম্বন্ধেও তিনি গবেষণা চালিয়েছিলেন।

অবশ্য একথা ঠিকই যে ম্যালেরিয়ার উপরই তাঁর গবেষণা এবং দান ছিল বিরাট এবং ব্যাপক।

আগেই বলেছি তিনি জাতিসংঘের ম্যালেরিয়া কমিশনের সদস্য হিসাবে কাজ করছিলেন। এই কাজে নিযুক্ত থাকার সময় লেবাননের রাজধানী বেইরুটের কাছে এক শোচনীয় মোটর দুর্ঘটনায় এই মহান সেবাব্রতীর জীবন অবসান ঘটল। এটা ১৯২৫ সনের ২০শে মে'র ঘটনা।

তাঁর এই মৃত্যুতে সর্বত্র একটা গভীর শোকের ছায়া নেমে এল। কিন্তু তিনি যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন তা যাতে ব্যর্থ না হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখা হল।

আর এ জন্যই জাতিসংঘের উদ্যোগে ডারলিং ফাউণ্ডেশন সংস্থা গঠিত হল ১৯২৯ সনে।

তাঁর মহান স্মৃতিকে চিরকাল জাগিয়ে রাখার জন্য দেশবিদেশ থেকে অকাতরে অর্থ আসতে

লাগল। এই বিরাট কর্মকাণ্ডকে আরও সুষ্ঠু এবং সুন্দর রূপ দেবার জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদাও তোলা হ'ল।

ডারলিং পুরস্কারের টাকা এবং পদকের টাকা দেওয়া হয় এই ডারলিং ফাউণ্ডেশনের টাকা থেকেই।

এই পুরস্কারের অর্থমূল্য একহাজার সুইস ফ্রাংক, এই সংগে একটি ব্রোঞ্জ পদকও দেওয়া হয়ে থাকে।

এই পুরস্কার তখনই দেওয়া হয় যখন ফাউণ্ডেশনের জমা সুদের টাকা এই পুরস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থর সমান হয়। প্রত্যেক বছর হয় না।

নিয়মিত ব্যবধানে এই পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে।

বর্তমানে (U.N.O.) বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (W.H.O.) এই পুরস্কারের জন্য যোগ্য প্রার্থী মনোনীত করে থাকেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে।

ম্যালেরিয়া রোগের কারণ, এই রোগের মহামারী এবং সংক্রামকতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান, রোগের যথোপযুক্ত চিকিৎসা এবং রোগ নিবারক ওষুধ নির্ণয়ে সুবিদিত কাজের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে।

১৯৩৩ সনে এই পুরস্কার প্রথম দেওয়া শুরু হয়। কোন কোন বছরে এই পুরস্কারটি দুজন প্রাপককে ভাগ করেও দেওয়া হয়েছে।

প্রথম বছরের পুরস্কারটি দেওয়া হয়েছিল লণ্ডনের স্বাস্থ্য অধিকর্তা দপ্তরের কর্নেল এস. পি. জেমস-কে। দ্বিতীয় বারের পুরস্কার দেওয়া হয় ১৯৩৭ সনে। নেদারল্যাণ্ডের অধ্যাপক এন এইচ স্বোয়েলেন গ্রেবেলকে। এ ছাড়া আর যাঁরা পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন আমেরিকার ডাঃ পি এফ রাসেল (১৯৫৭)। ইতালীর ডাঃ ই জে পাম্পানা (১৯৫৯), রুমানিয়ার এম সিউকা এবং রাশিয়ার পি জি সারগ্রিভ (১৯৬৬)। শেষের দুজনই অধ্যাপক।

ভারতের জন্য এই পুরস্কার জয়ের গৌরব প্রথম অর্জন করে এসেছেন লেফ্‌টেনান্ট কর্নেল যশোবন্ত সিং। ১৯৬৮ সনের পুরস্কারটি ইনি বৃটেনের ডাঃ জর্জ গিগ্‌লিওলি র সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন।

লেফ্‌টেনান্ট কর্নেল যশোবন্ত সিং ভারতের বিজ্ঞান পরিষদের জাতীয় সংস্থা এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর সভ্য।

১৯০৯ সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৬ সনে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি তাঁর চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়ন শেষ করেন। এরপর তিনি লণ্ডন থেকে নাগরিক স্বাস্থ্য বিষয়ে এবং ট্রপিকাল মেডিসিনেও ডিপ্লোমা লাভ করেন।

ভারতে জন স্বাস্থ্য বিভাগে তাঁর কাজ সাফল্যে পূর্ণ। ১৯৫৮ সনে তিনি ভারতের স্বাস্থ্যদপ্তরের ডিরেক্টর জেনারেল নিযুক্ত হন। বহুদিন ধরে তিনি ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে যুক্ত আছেন। তা'ছাড়া ঐ সম্বন্ধে নানা গবেষণার কাজেও তিনি জড়িত।

ম্যালেরিয়া এবং নানারকম কীট বিদ্যার উপর তিনি একশ' কুড়িখানিরও বেশি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন। এই সব রোগকে ধ্বংস করে ফেলা এবং রোগ থেকে মুক্তির উপায় তিনি এতে নির্দেশ করেছেন।

তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৯৫৩ সনে আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া দূর করার কাজ শুরু হয়েছিল। তাঁর এ কাজও সফল হয়। আজ ভারতের সমস্ত জায়গা থেকে ম্যালেরিয়া রোগ চিরতরে দূর করার কাজ চলেছে। অনেক জায়গা রোগশূন্যও হয়েছে।

কুট্টী পিসি

চুনী দাশ

রোজই ভাবে কুট্টী পিসি
খুব সকালে উঠবে
তারপরে সে হন্‌হনিয়ে
মাছ-বাজারে ছুটবে
বাজার থেকে ইলিশ এনে
ইচ্ছে মতন কুটবে।
কুটেই শেষে কুট্টী পিসি
রোজই ভাবে রাঁধবে
রেঁধে বেড়ে তারপরে সে
মাথার খোঁপা বাঁধবে!
খোঁপা বেঁধেই বসবে খেতে
কাউকে না সে সাধবে।
এসব কথা ভেবে রোজই
রাত হয়ে যায় গাঢ়
তাই সকালে ডাকলে পিসি
ঘুমেই জড়ায় আরো।
কুট্টী পিসির ঘুম ভাঙানো
সাধ্য নয় যে কারো!!

প্রকৃতি-পড়ুয়া 'লিন্'—
উদ্ভিদ-বিদ্যার জনক

জীবন সর্দার

একটি শিশু ছিল, খাবার নয়, একটি ফুল পেলেই তার কান্না থেমে যেত।

শিশুটির বাবা নীলস্ লিনেয়াস্ ছিলেন সুইডেনের রাশউলট গ্রামের ছোট্ট গির্জার যাজক। মা ক্রিশচিনা ব্রডার সোনিয়া যাজকের মেয়ে। তাঁদের 'পয়সা' বেশি ছিল না, গাছপালার জন্য ভালবাসা ছিল বেশি। ছোট্ট বাড়িটির চারপাশ তাঁরা জানা অজানা নানান গাছে অবাক করা একটি বাগান করে তুলেছিলেন। এই বাগানেই তাঁদের প্রথম আদরের ছেলেটি, কার্ল ভন্ লিনেয়াসের সাথে গাছপালার প্রথম পরিচয়। এই ছেলেটির কান্না থামাতে, বাবা মা খাবার বা খেলনা দিতেন না। দিতেন ফুল। কী আশ্চর্য! ফুল পেলেই শিশুটির কান্না থেমে যেত।

১৭০৭ সালের ২৩শে মে ছেলেটির জন্মের পর থেকেই বাবা মা চেয়েছিলেন ওদের ছেলেটিও হবে যাজক। স্কুলের পড়া শেষ করে ছেলেটি বলল—সে হবে ডাক্তার। সে সময়ে ডাক্তারী আর উদ্ভিদ-বিদ্যার যোগাযোগ ছিল খুব। অনেক ভেবে ছেলের ইচ্ছায় তাঁরা মত দিলেন। নিজের পায়ে দাঁড়াবে বলে 'লিন্' এলেন শহরে। পকেটে তাঁর মাত্র দশ পাউণ্ড।

প্রথম লানড্, পরে উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। একজন অধ্যাপক দেখলেন উদ্ভিদবিদ্যায় লিনের যা জ্ঞান তার তুলনা হয় না। তাঁর বাড়িতে লিনকে থাকতে দিলেন, নিজের লাইব্রেরী থেকে বই দিলেন, যত চাই। থাকা আর বইএর ভাবনা ঘুচে গেল, লিন এবার দিনরাত উদ্ভিদ-বিদ্যার বই নিয়ে মেতে রইলেন।

তখনকার উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের বই পড়ে পড়ে তাঁর ধারণা হ'ল উদ্ভিদবিদ্যার বিশেষ করে গাছ-পালার নাম গোত্র পরিচয় সবকিছু যেন উলটপালট। উদ্ভিদবিদ্যাকে ঠিকমত সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে তাঁর ভারি সখ হল। তিনি গাছপালা নিয়ে লিখতে শুরু করলেন ল্যাটিন ভাষায়। ল্যাটিন তিনি ছোটবেলা থেকেই শিখেছিলেন ভাল করে। তাঁর এই জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়েই তাঁকে পড়াতে ডাকা হল। তিনি গাছপালা চেনাবার ভার নিলেন।

একবার একটি কঠিন কাজের ভার নিলেন—সারা ল্যাপল্যানডের গাছপালার খোঁজখবর আনতে

হবে। ঘোড়ার পিঠে চেপে একা একা প্রায় চারহাজার মাইল ঘুরে লিন ফিরে এলেন। শুধু গাছপালার নয়, এবার লিন ল্যাপবাসীদের আচার আচরণের যে খবর আনলেন তার তুলনা হয় না। তাঁর সব কাজেই এক নতুন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতেন। এই সাতাশ বছর বয়সের ভেতর লিখেছেন অনেক, অনেক ঘুরে অনেক গাছপালা পোকামাকড় পাখি আর খনিজের নমুনা জোগাড় করেছেন। কিন্তু এসব করে সে সময়ে খাবার খরচ জুটত না। এক বন্ধু বললেন, হল্যানড্ গিয়ে ডাক্তারীর ডিগ্রি আনতে। তাই করলেন।

ডাক্তারীর ডিগ্রি পেতে দেরী হল না। চাকরীও পেলেন একটি। সবচেয়ে বড় কথা, নিজের বই ছাপাবার সুযোগ পেলেন। লিন এতটা আশা করেননি। ১৭৩৭ সালে তাঁর লেখা 'জেনেরা প্লানটেরাম' আর 'ফ্লোরা ল্যাপোনিকা' বই দুটো বেরবার সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ভিদ বিজ্ঞানী বলে তাঁর নাম ছড়াতে শুরু করে। সে বছরেরই শেষদিকে বেরল 'হবটাস ক্লিফোরটিয়েনাস।' বইগুলো উদ্ভিদবিদ্যার পড়াশুনায় বিপ্লব করে দিল। পুরনো অকেজো জ্ঞান আর নিয়ম বদলে দিলেন লিন'। নতুন নিয়মে গাছপালার ল্যাটিন নাম রাখলেন। এতে পৃথিবীর যে কোন জায়গার যে কোন গাছের পরিচয় জানা সোজা হয়ে গেল।

পুংকেশর আর গর্ভপত্র দেখে গাছের শ্রেণী ভাগ করার নিয়ম যেটি তিনি প্রথমবার করেছিলেন, সেটি এখন অচল বটে, কিন্তু 'গণ আর প্রজাতি' দিয়ে নামকরণের নিয়মটি এখনো চালু। যেমন যে ফুলের একটিমাত্র পুংকেশর তারা পড়বে 'মনানড্রিয়া' এই 'শ্রেণীতে'। মনানড্রিয়া শ্রেণীর একটিই বর্গ 'মনোগাইনিয়া'—মানে যে ফুলের একটি গর্ভদণ্ড। এইভাবে চব্বিশটি শ্রেণী বিভাগ করেছিলেন। প্রত্যেকটি বর্গ আবার 'গণ' আর 'গণ' ভাগ করেছিলেন 'প্রজাতিতে'। ধর, আদা একটি প্রজাতি, তার গন জিনজিকর তার বর্গ মনোগাইনিয়া, তার শ্রেণী মনানড্রিয়া। আধুনিক নিয়ম হয়ত 'ভালো' কিন্তু লিনেয়াসই পথ দেখিয়েছেন, তার জন্য তাকে বলা হয় উদ্ভিদবিদ্যার জনক। ১৭৫৩ সালে তাঁর 'স্পিসি প্লানটেরাম' বইটি ছাপা হয়। তাতে তাঁর দেওয়া আটহাজারেরও ওপর গাছপালার নাম ছিল। আর অনেক প্রজাতির নাম তাঁর প্রিয়জনের সাথে মিলিয়ে তিনি রেখেছিলেন। মজার ব্যাপার না। তাঁরা কেউ নেই নামগুলো রয়ে গেল।

তাঁর জীবনের দুঃখের দিন শেষ হয়েছে বহু আগে। এখন যশ এল, টাকাকড়িও। বিজ্ঞানচর্চা আর গবেষণায় ছাত্রদের নিয়ে বাকি দিনগুলি সুখের ঘরে কাটালেন। ১৭৭৫ সালে তাঁর বাড়ির একটি গাছ কাটিয়ে বললেন, এটা দিয়ে আমার 'কফিন' হবে। তারপর মাত্র তিনবছর কাটল। একটি ফুল হাতে পেলে শিশু বয়সে তিনি কান্না ভুলতেন। একটি গাছের তৈরী শবাধার সব হাসিকান্না থেকে তাঁকে আড়াল করল, আমাদের ভোলাতে একদিন—১৭৭৮ সালের ১০ই জানুয়ারী।

পড়ুয়াদের প্রশ্ন।

১। **শাশ্বতী দত্ত প্র. প। ১৩৫।** খড়্গপুর থেকে লিখেছে:—আমাদের বাগানে এবার একটি নতুন রকমের গাঁদাফুল হয়েছে। গত বছর আমাদের বাগানে বড় 'আফ্রিকান' গাঁদা লাগানো হয়েছিল। তার মধ্যে বেশীর ভাগ ফুলই ছিল 'ডবল'। শুধু দু' একটি গাছে পাতি গাঁদাফুল হয়েছিল।

ডবল পাপড়ির গাঁদাফুল শুকিয়ে রাখা হয়েছিল। সেগুলো থেকে এবার চারা তৈরী করা হয়। কিন্তু সেই চারাগাছগুলো বড় হলে, তার মধ্যে অনেক গুলো গাছেই পাতি গাঁদা হয় যা আগের বার হয়নি। তাছাড়া, একটি গাছে অন্য এক রকম গাঁদা হয়েছে। এই ফুলে পাতি গাঁদার মতোই কয়েকটা মাত্র বড় পাপড়ি বৃত্তাকারে সাজানো। আর ভেতরে অসংখ্য ছোট ছোট পাপড়ি প্রকাণ্ড চুড়োর মতো করে সাজানো। দেখতে খুবই সুন্দর ফুলটি। 'ডবল' পাপড়ির গাঁদাফুলের বীজ থেকে পাতি গাঁদা আর এই অদ্ভুত গাঁদাফুলের গাছ কি করে হলো?

উত্তর। সব প্রকৃতি-পড়ুয়াদের কাছেই আমি উপরের প্রশ্নটির উত্তর চাইছি। উত্তরটি ভেবে দেখে জানাও। কয়েকটি সংকেত বলে দিচ্ছি উত্তরের: কোন কোন ফুলের বৃতংশ পাপড়ির আকার নেয়, পাপড়ি নেয় পুংকেশরের আকার। গোলাপ গন্ধরাজ কয়েক জাতের ফুলের গর্ভদণ্ডও পাপড়ির আকার নেয়। ঐ সব ফুলগাছের যত্ন নিলে ঐ কারণে পাপড়ির সংখ্যা বেড়ে যায়। দেখ ত দেখি পরীক্ষা করে ফুলের 'গর্ভপত্র' পাপড়ির আকার নেয় কিনা!

২। **বনানী রায়,** জয়পুর, রাজস্থান থেকে লিখছে, 'পাহাড় থেকে নেবে' (প্র. প দপ্তর নভেম্বর ৬৮) লেখাটিতে এক জায়গায় আছে, সাদা পাথরের পাহাড় আর রঙিন পাথরের পাহাড় পাশাপাশি এবং সূর্যের আলোও সমান পাচ্ছে, তবুও সাদা পাহাড়ের ঠাণ্ডা বেশি হবার কারণ কি?

আর একটি প্রশ্ন—পাহাড় উধাও হওয়ার ব্যাপারটা, ঐ লেখা থেকে পড়ে বুঝলাম না। ধস নামার ব্যাপারটা কি?

উত্তর: প্রথম প্রশ্নের উত্তর সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বল—একই সাদা জিনিস আর রঙিন জিনিসের কোনটি আগে, আর বেশি গরম হবে। নিশ্চয়ই রঙিন। সে নিয়ম এখানেও খাটে। [ব্যাপারটি ঘটেছিল যমুনোত্রী যাবার পথে। ভৈরবঘাটির আগে একটি 'রূপান্তরিত শিলার' পাহাড় পেরবার সময় যমুনোত্রীর মাইল চার আগে।]

পরের প্রশ্নটির উত্তর বড় করে লেখার ইচ্ছে আছে এক সময়। বরফ আর মাটি পাথরের যে কটি ধস্ নাবতে দেখেছি, শুধু এইটুকু এখন বলছি, প্রত্যেকবারই উপরের অংশের চাপে নিচের অংশ ভেঙ্গে পড়েছে। মাটি পাথরের ধসের বেলায় কয়েকবার দেখেছি মুষলধার বৃষ্টিতে নিচের মাটি নরম হয়ে গলে গিয়ে উপরের ভার সইতে না পেরে ধসে পড়েছে। একটু শব্দে বরফের ধস নাবতেও দেখেছি।

পাখির পরিচয়

একটি পাখির দেহের কোন অংশের কি নাম জান? বুক পেট ডানা পা ব্যস্। না, এতটুকু জানলে চলবে না। ধর, পায়ের অংশ—জঙ্ঘা, গুল্ফ আর আঙ্গুল। আঙ্গুল সামনের আর পেছনের। এবার নানান জাতের পাখির পায়ের দিকে দেখ, জঙ্ঘা গুল্ফ আর আঙ্গুলের গড়ন ধরনের হেরফেরে পাখিটির খাওয়া দাওয়া হাবভাব আলাদা আলাদা হয়ে গেছে, অন্য কারণও আছে। এবার চড়ুই পায়রা হাঁস মুরগী কাক চিল পানকৌড়ী কাঠঠোকরা জলপিপি আর ডাহুকের পা কার কেমন যতটা পার দেখে আমাকে লিখে জানাও।

অজয় হোম

ফুটবল

মানুষ ভাবে এক হয় আর এক। মোহনবাগান যেভাবে রোভার্স খেলেছিল তাতে ভেবেছিলাম বুঝিবা ডুরাণ্ডও জিতবে। কিন্তু সেমিফাইনালে একদিন ড্র করে পরে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের কাছে হারে ২-১ গোলে। এই বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স আগে 'পাঞ্জাব পুলিশ' নামে পরিচিত ছিল। মোহনবাগান না পারলেও আশা ছিল গতবারের ডুরাণ্ড বিজয়ী অপর দুইটি দল ইস্টবেঙ্গলের উপর। তারা লিডার্স ক্লাবকে ১-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে। এই নিয়ে তাদের ৮ বার ডুরাণ্ড ফাইনালে ওঠা। এসব সত্ত্বেও ডুরাণ্ড কাপ এবছর বাংলায় এল না। বর্ডার সিকিউরিটি ফাইনালে শক্তিশালী ইস্টবেঙ্গলকে হারাল ১-০ গোলে। এই প্রথম এদের ডুরাণ্ড জয়। খুবই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের মতো দুই বাঘা দলকে পরিষ্কারভাবে হারিয়ে।

এই ফেব্রুয়ারিতেই সন্তোষ ট্রফি খেলা হবে বাঙ্গালোরে। ১৯৬২ সালে বাংলা শেষ বিজয়ী হয়। গত পাঁচ বছর ধরে দেখছি বাংলা দলে বাঙালি নেই বললেই হয়। নামে বাংলা আসলে সর্ব ভারতীয় দল। কলকাতার নামকরা দলগুলি খেলোয়াড় ভাড়া করে আনে বাইরে থেকে। কিন্তু তাঁরা কেউই বাংলার মানমর্যাদার জন্যে প্রাণ দিয়ে খেলেন না। সুতরাং আই. এফ.-এর উচিত দল গড়ার সময় মনে রাখা যে বাইরের খেলোয়াড় যত কম হয় ততই মঙ্গল। দলগত সংহতি, ট্যাকটিকস্, ও উদ্দীপনা বাংলা দলের তাতে বাড়বে বই কমবে না।

স্পোর্টস

দিল্লীতে জাতীয় স্কুল গেমসে বহু নতুন রেকর্ড হয়েছে। সকলেই প্রায় আগের রেকর্ড ভেঙেছেন। বাঙালি বালক বালিকাদের মধ্যে ভালো করেছে বালকদের হাইজাম্পে—১ম তাপস পাল (১·৭৫ মিটার), ২য় পোকার মন (রাজস্থান), ৩য় আনন্দ আমেদ (মধ্যপ্রদেশ)। বালিকাদের ডিসকাস ছোঁড়ায়—১ম সুন্দর (রাজস্থান, দূরত্ব ২৬·৮৫ মিটার), ২য় অনুভা চ্যাটার্জি (পেতলের বলে ছুঁড়তে হয়েছে বলে হাত ফসকেছে। লোহার বলেই অনুভার অনুশীলন।), ৩য় পুষ্প (রাজস্থান)। বালিকাদের লংজাম্পে—১ম সুবি নন্দী (দূরত্ব ৪·৮৬ মিটার), ২য় সুজাতা (রাজস্থান), ৩য় কিরণ কাপুর (পাঞ্জাব)।

ক্রিকেট

দলীয় ট্রফিতে পূর্বাঞ্চল জেতা ম্যাচ হারল অর্থহীন ভাবে দক্ষিণাঞ্চলের কাছে। সুব্রত গুহর বল করা দেখে খুশি হয়েছি। আগের চেয়ে বল করার ধরন উন্নত হয়েছে। দিলীপ দোসীর বল প্রথম দেখলাম। ভালো লাগল।

রঞ্জি ট্রফিতে বাংলা মহীশূরকে হারিয়ে ফাইনালে খেলতে যাবে বোম্বাইতে বোম্বাইয়ের বিরুদ্ধে। ফলাফলের কথা আগে থাকতে না বলাই ভালো। এই ফাইনালে উঠার মূলে আছে দোসী আর গুহর অপূর্ব বোলিং।

স্কুল-ক্রিকেট: অস্ট্রেলিয়া সফর

ভারতীয় স্কুল দল শেষ দু'টি খেলা খেলে পার্থ-এ।

ভারতীয় স্কুল এক ইনিংস ও ২৯ রানে ওয়েস্ট্ অস্ট্রেলিয়া কানট্রি স্কুল দলকে হারায়: ভরত—২৪৪। ওয়েস্ট্ অস্ট্রেলিয়া—১০৫ ও ১১০ রান।

পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া স্কুল ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে শেষ খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। অধিনায়ক রাজা মুখার্জি মাত্র তিন রানের জন্যে নিজস্ব শতরান থেকে বঞ্চিত হয়। পঃ অস্ট্রেলিয়া—২৮২ (কানিংহ্যাম ৬৮, ভূপারুজেন ৫২)। ভারত ২৬৩ (রাজা মুখার্জি ৯৭, লক্ষ্মণ সিং ৪৭; হাইন ৭৭ রানে ৬ উইকেট)।

ফেরার পথে সিঙ্গাপুরে দুটো ম্যাচ খেলে। প্রথমটি একদিনের খেলায় একটি সিঙ্গাপুর একাদশকে ৯ উইকেটে পরাজিত করে। সিঙ্গাপুর—১০৩ (ডিসিলভা ৩০; দীপঙ্কর সরকার ৩১ রানে ৩, ট্যাগুন ২৬ রানে ৩ উইঃ)। ভারত—১ উইঃ ১০৭ (লক্ষ্মণ সিং ৭৫ নট আউট)।

দ্বিতীয় খেলাও ছিল সিঙ্গাপুর একাদশের বিরুদ্ধে। প্রচণ্ড বৃষ্টির জন্যে খেলাটি শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়। ভারত—৯ উইঃ ১৩২ (রাজা মুখার্জি ৪১, সুদ ২৯; জন মার্টেমস্ ৩৬ রানে ৫ উইঃ)। সিঙ্গাপুর—১ উইঃ ১০ (খেলা পরিত্যক্ত)।

সি কে নাইডু ট্রফি

কলিকাতায় সম্প্রতি জাতীয় স্কুল ক্রিকেট সি কে নাইডু ট্রফি শেষ হল। আটটি রাজ্যের

স্কুল দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিল। গত বছরের বিজয়ী ছিল পাঞ্জাব স্কুল। এবছর বিজয়ী হল বাংলা রাজা মুখার্জির অধিনায়কত্বে। বাংলা হারাল গুজরাটকে ৯ উইকেটে; দিল্লীর বিরুদ্ধে পলাশ নন্দী ১১২ ও রাজা মুখার্জি ১১৮ রান সমেত ৬ উইকেটে ৪৪৬ রান করায় দিল্লী প্রথম ইনিংসে ১২২ রান করে খেলা ছেড়ে দেয়। বাংলা ফাইনালে অন্ধ্রকে হারায় ২১৯ রানে। সম্ভব হয় প্রলয় চেল-এর মারাত্মক বোলিং-এ ৬ ওভারে মাত্র ১২ রানে ৭টি উইকেট দখলে। মহারাষ্ট্র দিল্লিকে হারিয়ে ৩য় স্থান লাভ করে। বাংলার এই জয়ের মূলে বোলিং-এ রবি ব্যানার্জি, দীপঙ্কর সরকার, প্রলয় চেল এবং ব্যাটিং-এ পলাশ নন্দী ও রাজা মুখার্জির দান অনস্বীকার্য। কিন্তু মাঠে ফিল্ডিং এ রাজা মুখার্জিকে খুব স্লো মনে হয়েছে। এখনই এই আচরণ খুবই খারাপ লাগে। বড়ো খেলোয়াড় হয়েছি এ মনে ভাবলে খেলা নষ্ট হয়ে যাবে।

ভারতীয় স্কুল দল ফিরে এল অস্ট্রেলিয়া সফর করে। ফলাফল বিচার করলে এই সফর সফল। অনেক কিছু শেখার সুযোগও তারা পেয়েছে। সে শিক্ষা কতটা হয়েছে তা জানা যাবে ভবিষ্যতের খেলাধূলায়। এই সফরে বল করেছে দীপঙ্কর সরকার অনুপম। ব্যাটিংএ লক্ষ্মণ সিং, ঘাভরি ও রানা মুখার্জি সাফল্য লাভ করেছে।

ভারতীয় ক্রিকেটের যে দুর্বলতা ফাস্ট বোলিং-এ তা স্কুল ক্রিকেটের মধ্যেও বর্তমান। অস্ট্রেলিয়া সফরে বেশ কিছু ফাস্ট বোলার ও বাম্পারের সম্মুখে দাঁড়াতে হয়েছে। সে দাঁড়ানো খুব ভালো হয়নি। ভারতের কোনো প্রদেশের স্কুলেই যদি সত্যিকারের ফাস্ট বোলার না থাকে তবে কী করে যে ফাস্ট বোলার সৃষ্টি হবে তা ভেবে পাই নে। তোমাদের মধ্যে যারা বল করো তারা জোর বল করার চেষ্টা করতে থাকো। একজনও কি পারবে না ফাস্ট বোলার তৈরি হতে?

সম্ভাবনা একেবারে নেই এমন কথা বলব না। নাইডু ট্রফিতে দেখলাম গুজরাটের অলরাউণ্ডার কারসেন ঘাভরির মধ্যে। মহারাষ্ট্রের আনান্ত্রানিওয়ালা মোটামুটি জোরে বল করলেই কয়েক ওভারেই হাঁফিয়ে পড়ে। ঠিকমতো কোচ করতে পারলে অন্ধ্রের নরেন্দর রাজ, সিকে নাইডুর এক নাতির মধ্যে অনেক সম্ভাবনা।

ব্যাটিং-এও অনেকের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল মনে হল। যেমন, পাঞ্জাবের অধিনায়ক বিজয়, পাঞ্জাবের হনুসরাজ, মহারাষ্ট্রের রমেশ বোরদে ও ভরত কুন্দরন, অন্ধ্রের নরেন্দরের ভাই গৌরমোহন রাজ ও নরসিনহা রাও।

অধিনায়কত্বে সি কে নাইডুর অপর নাতি চন্দনরাজের জুড়ি পেলাম না। তিনটি ভাই-অপূর্ব। ঠাকুর্দার নাম রাখার যোগ্যতা এদের আছে।

‘বৈজনাথ ও বাগেশ্বর’

ভাস্বতী দত্ত—বয়স ১২ বছর —গ্রাহক নং ২৬৮৬

গত পূজায় নৈনীতাল গিয়ে ঠিক করলাম যে রানীক্ষেত হয়ে কৌশানী যাব। বাবা ওখানকার তিনটে বাংলোর মধ্যে যে কোন একটাতে জায়গা ঠিক করবার জন্য আলমোড়ার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে টেলিগ্রাম করলেন। যথাসময়ে আমাদের বুকিং কার্ড এসে গেল ও পরদিনই আমরা ১২টার বাসে রওয়ানা হয়ে রানীক্ষেত পৌঁছলাম। ওখানে গিয়ে একটা হোটেলে উঠলাম। ঠিক হল দুদিন পরে একটা ট্যাক্সিতে করে আমরা কৌশানী রওয়ানা হব। ওখানে পৌঁছে আমরা সেইদিনই কৌশানী থেকে কিছুদূরে বহুপ্রাচীন ‘বৈজনাথ’এর মন্দির ও বাগেশ্বরে ‘গোমতী’ ও ‘সরযূ’ নদীর সঙ্গম দেখতে পাব। নির্দ্ধারিত দিনে আমরা ভোরবেলা উঠে সব বাঁধাছাঁদা করে কৌশানী রওনা হলাম। ‘কোশী’ ও ‘রামেশ্বর’ নামে দুটো শহর পেরিয়ে কোশী নদীর পাড়ে পাড়ে মোটর রাস্তা দিয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে কৌশানী পৌঁছান গেল। রানীক্ষেত থেকে কৌশানীর দূরত্ব প্রায় ৫৮ মাইল। হিমালয়ের তুষার চূড়াগুলো এখান থেকে বেশ বড় এবং স্পষ্ট দেখা যায়। ওখানে চা খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে আমরা রওনা হলাম ‘বৈজনাথ’ ও ‘বাগেশ্বরে’র দিকে।

কৌশানী থেকে কিছুদূর গিয়ে ‘গরুড়’ নামে একটি ছোটখাট শহর পেরিয়ে ‘বৈজনাথে’ এসে থামলাম। এখানকার মন্দির বহু প্রাচীন। শোনা যায়, মহাদেবের বিয়ের শোভাযাত্রা বৈজনাথে থেমেছিল। পূজারী মন্দিরের ভিতরের শিবলিঙ্গ দেখিয়ে বললেন ওটা নাকি দ্বাদশ লিঙ্গের এক লিঙ্গ। জায়গাটা খুব সুন্দর। মন্দিরটাও গোমতী নদীর পাড়েই। ওখানে একটা ছোট ঘরের মধ্যে রাখা কয়েকটি প্রাচীন মূর্তি দেখে আমরা রওনা দিলাম বাগেশ্বরের উদ্দেশ্যে।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে বাগেশ্বরে পৌঁছানো গেল। বেশ বড় শহর। রাত্রের আহারের জন্য ওখান

থেকে আমরা কিছু তরকারী কিনলাম। ওখানে গোমতী ও সরযূ নদী এক সঙ্গে মিলেছে। পাহাড়ী নদী, তাই বেশ স্রোত। ওখানে বাগেশ্বর মহাদেবের একটা মন্দির আছে। সঙ্গমের জল মাথায় নিয়ে নদীর ধারে পড়ে থাকা রাশি রাশি পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে কয়েকটা ফটো তুললাম। তারপর যখন গাড়িতে এসে উঠলাম, তখন বিকেল হয়ে এসেছে। সন্ধ্যার মধ্যেই আমরা কৌশানী পৌঁছে গেলাম। স্মৃতির মণিকোঠায় সযত্নে রেখে দিলাম 'বাগেশ্বর' ও বৈজনাথের নাম।
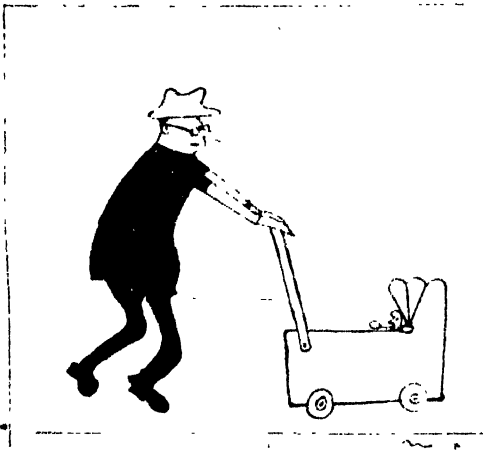
বিশেষ দ্রষ্টব্য

তোমাদের নামগুলি হারিয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি জানাও। আগামী মাসে ছাপাতে হবেত।

মজার ধাঁধা

(১)

উদয়ন মুখোপাধ্যায়

বয়স ১০ বছর ৮ মাস। গ্রাহক সংখ্যা ২২৫৭

ক। এমন একটি তিন অক্ষরের কথা বল যে—প্রথম অক্ষর ছাড়লে একটি খাবারের নাম হয়, শেষ অক্ষর ছাড়লে একটি বিষাক্ত প্রাণীর নাম হয় ও মাঝের অক্ষর ছাড়লে মানে হয় 'ব্যতীত'।

খ। দুজন সাহেব রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের খানিকটা পেছন পেছন একজন বাঙালী আসছিল। তাদের এই দূরত্বের মাঝামাঝি জায়গায় রাস্তার ধারে একটি গাছ ছিল ও তাতে একটি পাখী বসে। হঠাৎ বাঙালী লোকটি খুব জোরে পাখীটির নাম ধরে ডাকল। অমনি সাহেব দুজন দিক্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগল। বল ত, পাখীটির নাম কি?

গ। একজন মারা যাবার সময় তাঁর দুই ছেলেকে দুটি ঘোড়া দিয়ে গেলেন ও বলে গেলেন কোথায় তাঁর সম্পত্তি আছে। এখন, তিনি শর্ত করে গেলেন যে—যার ঘোড়া পরে পৌঁছুবে সেই সম্পত্তি পাবে।

যেদিন সম্পত্তি নেবার দিন এল দুজন ভাই ই দাঁড়িয়ে রইল। কেউ ই এগোচ্ছে না। হঠাৎ একজন সন্ন্যাসী ব্যাপারটা দেখতে পেয়ে দুজনকেই কানে কানে একটা পরামর্শ দিলেন।

একটু পরেই দেখা গেল যে—দুজনেই খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে, সম্পত্তি যেখানে আছে সেদিকে যেতে লাগল। বল ত, সন্ন্যাসী কি পরামর্শ দিয়েছিলেন?

(২)

শশাঙ্ক শেখর সেন—বয়স ১০ বছর—গ্রাহক নং ১৯৯

নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে কোন বিখ্যাত নাবিকের নাম লুকানো আছে?

হাভানা, মস্কো, কানাডা, নাগাল্যাণ্ড মাদ্রাজ।

(৩)

শুভ্রা বিশ্বাস—বয়স ১৪ বছর—গ্রাহক সংখ্যা ২০২৯

(ক) চার অক্ষরে নাম তার সর্বলোকে জানে,
প্রথম দুটো বাদ দিলে শুধু দাগ টানে।
শেষের দুটো বাদ দিলে কালো কুচকুচ করে
আগ-পাছ বাদ দিলে বালি ধূ ধূ করে।

(খ) বছরের কোন পর্ব—(তিন অক্ষরে নাম)—
প্রথম দ্বিতীয় নিলে মারলে যায় প্রাণ,
প্রথম তৃতীয় নিলে স্কুলে গিয়ে পান।
বল দেখি ভাইবোন কিবা তার নাম ?

ধাঁধার উত্তর

দেবাশীষ মুখার্জী—গ্রাহক নং ১৫৬৭—বয়স ১২ বছর

(১) ঘড়ি (২) নিস্তব্ধতা

জর্জ নিডিভার

পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়

বয়স ১৫ বছর—গ্রাহক সংখ্যা ১৩৫৯

জর্জ নিডিভার একজন ক্যালিফোর্নিয়া দেশের শিকারী। অন্য যেকোন শিকারীর থেকে তার দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ, লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ আর সে ছিল অসম সাহসী। একটি রেড্ ইণ্ডিয়ান বালক শিকারের সময় সর্বদাই তার সঙ্গে থাকত। জর্জ যে সমস্ত শিকার করত, বালকটি সেগুলি সংগ্রহ করত। একদিন জর্জ আর জন (সেই বালকটির নাম) একটি খাড়া পাহাড়ের মাঝখানে একটা সরু রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে এমন সময়ে দুটি ভালুক তাদের অজ্ঞাতসারে তাদের দিকে এগুতে লাগল। বালকটিই প্রথমে ভালুকটিকে দেখতে পায়। সে তখন চিৎকার করতে করতে ছুটল। একটি ভালুক তাকে তাড়া করল। জর্জের বন্দুকে একটিমাত্র গুলি ছিল। সে তাই দিয়ে জনের অনুসরণকারীকে হত্যা করল। অন্য ভালুকটি নিডিভারের দিকে এগুতে লাগল। সে তখন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সে জানত যে বন্দুকের কুঁদা বা কাঠের মুগুর এ ব্যাপারে কোন কাজেই আসবে না। কাজেই সে চুপ করে দাঁড়িয়ে ভালুকটির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ভালুকটা একেবারে থেমে আবার এগুল। নিডিভার তবুও নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। ভালুকটি আবার থামল আর বিস্মিত ভাবে শিকারীর দিকে তাকাল। অবশেষে ফিরে গেল। জর্জ নিজের কথা চিন্তা না করে একমাত্র গুলিটিতে জনের প্রাণরক্ষা করেছিল, এই মনোভাব তার মহৎ হৃদয়ের পরিচায়ক।

* একটি ইংরেজী গল্পের অনুকরণে লিখিত।

চিঠি

কমলেশ দাশগুপ্ত—১৫ বছর—গ্রাহক নং ২০৫৭

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক,

সন্দেশ পড়ে খুবই আনন্দ পাই। কিন্তু 'সন্দেশ'কে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার একটা পন্থা মাথায় এসে যাওয়ায় সে বিষয়ে আপনাকে লিখছি।

মাঝে মাঝে 'সন্দেশ'-এ এক ধরনের ধাঁধার খেলা দেওয়া যেতে পারে ইংরাজিতে যাকে বলে 'Brain twister' অথবা 'Brain test' ইউরোপ আমেরিকার স্কুল কলেজের ছেলে মেয়েদের মধ্যে অনেক কাল ধরেই এই ধরনের খেলার প্রচলন আছে। এর ফলে তাদের রীতিমত মগজের কসরত করতে হয় এবং তাদের বুদ্ধির ও 'কমন সেন্স'-এর বৃদ্ধি হয়। তাছাড়া তাদের চিন্তা করবার ও বিচার করবার শক্তিও ধারালো হয়ে ওঠে।

খেলাটা কেমন বলছি। ধরুন একটা খুনের ছবি দেওয়া হল। ঘরের অবস্থা মৃতের অবস্থান, এবং আরও কিছু খুঁটিনাটি ছবিটিতে আছে। ছবিটির সঙ্গে কিছু 'data' দেওয়া থাকে এবং কিছু প্রশ্ন থাকে। সেই প্রশ্নগুলির উত্তর পাঠককে দিতে হবে, এবং সর্বশেষে কে খুনী বা চুরির ঘটনা হ'লে কে চোর তা বলতে হ'বে। ধাঁধা লাগিয়ে দেওয়ার জন্য আসামী হ'তে পারে এরকম আরও কয়েকজন লোকের উল্লেখ থাকবে।

হয়তো আপনারা পূর্বেই এরকম একটা পরিকল্পনাকে রূপান্তরিত করার অসুবিধাগুলি সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন। কিন্তু আমি সেটা জানি না বলেই প্রস্তাবটি করেছি। আশা করি প্রস্তাবটি আপনার মনোমত হবে। অবশ্য ছাপাবার অসুবিধা থাকলে বা অন্য কোন অসুবিধা থাকলেও সেটি আমার অজানা।

আমার শ্রদ্ধা জানবেন। ইতি —নমস্কারান্তে

দুটি অভিজ্ঞতা

সুজাতা বিশ্বাস—গ্রাহক সংখ্যা ২০৩৭ বয়স ১৬ বছর

সন্দেশ প্রিয় বন্ধুরা! তোমাদের আমার জীবনের দুটি অভিজ্ঞতার কথা আজ লিখতে বসেছি। জানি না তোমাদের ভাল লাগবে কি না। আশা করি ভাল লাগবে।

* * * *

১৯৬৫ সাল। ফাল্গুনের শেষ। বাবা মার সঙ্গে কোলকাতা থেকে বাড়ি ফিরলাম ২৬ দিন পর বেড়িয়ে। চৈত্র মাসের প্রথম। মেখলীগঞ্জের আবহাওয়া রুক্ষ তিস্তা নদীর বালি উড়িয়ে নিয়ে আসছে তখন পশ্চিমা বাতাস। আমাদের বাড়ি থেকে তিস্তা নদী ৩ মিনিটের পথ।

পাকিস্থান আমাদের বাড়ি থেকে ৩ মাইল। সেদিন রাত্রে আমাদের বাড়িতে, আমার এক

কাকা ও দাদা কোলকাতা থেকে নূতন বৌ নিয়ে এসেছে, তাই একটু উৎসব। হঠাৎ শোনা গেল গুড় ম! ভয়ে আমরা তখন কাঠ! এর পর থেকে আমাদের হিন্দুস্থানের এবং পাকিস্থানের সীমান্তে গর্জে উঠতে লাগল, মেশিনগান, মর্টার, রাইফেল ইত্যাদি। আমরা কোন রকমে খাওয়া দাওয়া সেরে ঘরে এলাম। কিন্তু কারও চোখে ঘুম নেই। মর্টারের শব্দে বাড়ি ঘর কাঁপতে লাগল।

পরদিন সূর্যের আলো ফোটার সঙ্গে, সঙ্গে দেখতে পেলাম আমাদের সামনের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে অসংখ্য সৈন্য। রাত্রিকালের দু'একজন সৈন্যের মৃত দেহও আমাদের সামনে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সব বাসায় তখন গোছগাছ চলছে। তারা মেখলীগঞ্জ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ভয়ে আমরাও গোছগাছ করে, যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। আমরা বাসস্ট্যাণ্ডে গিয়ে দাঁড়ালাম, কিন্তু বাসে ভীড়ের জন্য ওঠা অসাধ্য। সকাল থেকে দাঁড়িয়ে থেকে বেলা ১—৩০ মিঃ কি ২টার সময় বাসে উঠে আমরা জলপাইগুড়ির দিকে রওনা হলাম। হিন্দুস্থানের সীমান্তে তখনও শত্রুদের আক্রমণ এবং আমাদের নওজোয়ানদের পাল্টা জবাবের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

প্রায় ১০।১২ দিন পর আমরা আবার ফিরে এলাম। তখন সীমান্ত শান্ত। সমস্ত মেখলীগঞ্জে সৈন্য বাস করছে। কোন কোন বাড়িতে লোক আছে। রাত্তিরে তখন আলো জ্বালা নিষেধ।

ভয়ে আতঙ্কে কিছুদিন থাকার পর, সব বাসার লোক ফিরে আসছে। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা আবার একটু একটু করে আরম্ভ হোয়েছিল।

* * * *

১৯৬৮ সালের ৫ই অক্টোবর। সারারাতের অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতের জন্য রাস্তা, ঘাট, নদী, নালা জলে পরিপূর্ণ। সকাল বেলায় টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ছাতা নিয়ে সব বাড়ি থেকে লোক জল দেখতে বেরিয়েছি। এত জল এর আগে কেউ কখনও দেখতে পায়নি। আমিও একটু দেখতে গেলাম। ফিরে এসে, হাত, মুখ, ধুয়ে চা খেয়ে পড়তে বসলাম।

বেলা ১১টার সময় আমাদের ভিতর বাড়ি থেকে চিৎকার, 'জল আসছে জল আসছে' ছুটে দেখি সত্যি। সবাই বলল 'বন্যা, এ যে ঘোলা জল'। কেউ বলল 'জল বেশী হবে না, কই, অ্যানাউন্স ত করল না যে বন্যা আসবে।' দেখতে দেখতে জল ঘরের ডোয়া, তারপর বারান্দা, তারপর কোমর, জল ঘরে, ভয়ে সব একেবারে কাঠ। জল আমার গলা পর্যন্ত উঠল। বাড়ির আর সবাই ঘরের ছাদে গিয়ে উঠল। আমিও সাঁতার দিয়ে, বাড়ির পিছন দিক দিয়ে ছাদে উঠলাম। কত গরু কুকুর ভেসে যেতে লাগল। আমাদের, যে বড় বড় টেবিল, সেগুলি ভেসে গেল। কত লোকের কত জিনিস ভেসে যেতে লাগল। চারদিকে শুধু চিৎকার 'বাঁচাও' 'বাঁচাও' আর সর্বনাশা জলের আনন্দ কোলাহল।

রাত প্রায় আটটা নাগাদ আমাদের একখানি নৌকায় স্থানীয় থানায় নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে এসে দেখি যে, অনেক লোক এর আগেই এসে সেখানে স্থান নিয়েছে।

তারপরদিন থেকে জল কমতে আরম্ভ করল। আমরা ভিজা জামা কাপড়ে, অনাহারে, রইলাম। শিশুরা কাঁদতে লাগল।

বেলা ১০।১১ টার সময় আমি ও আর একটি মেয়েকে নিয়ে, বাসার কাউকে কিছু না জানিয়ে বাসামুখে রওনা হলাম। তখন কোথায় কোমর, কোথায় বুক জল, এইভাবে কোথাও হেঁটে কোন রকমে কোথাও সাঁতার দিয়ে বাসায় এসে দেখি, ঘরে তখনও হাঁটু জল, পলিমাটি, কাদা, আর আমার সবচেয়ে দুঃখ হল আমার বইগুলি আমি আলমারীর মাথায় রেখে গিয়েছিলাম। সেই আলমারীটিই পড়ে গেছে, আমার আর একখানাও বই নেই! বিছানা, কাপড়চোপড কিছু আর নেই। কিছুক্ষণ কাঁদলাম। তারপর দেখি চালের টিনটা ঠিক আছে, উপরের তাক থেকে একটা কাপড়ে কিছু চাল নিয়ে আবার ফিরে গেলাম সেই নিরাপদ স্থানে। সেই দিন রাত্রে ওখানে লবণ ছাড়া ভাত, খেলাম, আর কিছুনা।

তার পরদিন বাসায় এলাম, ঘরবাড়ি দেখে সবাই কাঁদতে লাগল। তারপর পরিষ্কার করা আরম্ভ হল। এখনও আমাদের এখানে বন্যার চিহ্ন বিদ্যমান। এবং এখনও তা পরিষ্কার করায় আমরা ব্যস্ত।

* * * *

আমার জীবনের এই দু'টি অভিজ্ঞতা থেকে এ সব বিষয়ে আমি যতখানি বুঝতে পেরেছি, তা তোমরা বুঝতে পারবে না। যুদ্ধ বইতে পড়ে দেখা, বন্যার কথা লোকমুখে বা সংবাদ পত্রে পড়া এবং প্রত্যক্ষ দেখা তার মধ্যে অনেক তফাৎ। যুদ্ধের ফলে আমাদের বা কারও কোন কিছু ক্ষতি হয়নি, কিন্তু বন্যার ফলে মানুষের ক্ষয় ক্ষতি অবর্ণনীয় তবু আমরা প্রাণে বেঁচে আছি, সেই ঢের।

(১) সুমিত কুমার মাইতি, ৫৬৫, বয়স ৮

নিজের হাতে চিঠি লিখবে ভাই, নিজের কথা লিখবে।

(২) নীতিশরঞ্জন গুহ, ১৬০৩, বয়স ১১

জানই তো ভালো হলে আমরা খুসি হয়ে ছাপি। এর মধ্যে রাগ অভিমানের কথা কি করে ওঠে ন। ছোট বোনের নাম বয়স পাঠিও। সে-ও গ্রাহিকা হতে পারে।

(৩) অণুতোষ ও অশোক চট্টোপাধ্যায়

কই, তোমাদের ধাঁধার উত্তর তো আমরা পাইনি। পেলে নিশ্চয়ই ছাপতাম। নেতাজী বাংলা দেশের গর্ব, তাঁকে তোমরা শ্রদ্ধা করবে না তো কাকে করবে?

(৪) লিপি ঘোষ, নতুন গ্রাহিকা, বয়স ১১

কবিতা পেলাম। যদি দেখ হাতপাকাবার আসরে বেরিয়েছে, তা হলেই বুঝবে আমাদের ভালো লেগেছে। তবে অনেক লেখা জমে আছে বলে নতুন লেখাগুলো ছাপতে দেরি হয়।

(৫) অমিত বাগচি, ২৬৭৪, বয়স ১৫

নাম-সংখ্যা বয়স, তার বেশি কি দরকার? সন্দেশ প্রথম বেরোয় ১৯১৩ সালের এপ্রিলে। প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী। ১৯১৫ সালে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বড় ছেলে সুকুমার সন্দেশ সম্পাদনা করেন। ১৯২৩ সালে মাত্র ৩৬ বছর বয়সে তিনি পরলোকে যান। তখন তাঁর মেজো ভাই সুবিনয় পত্রিকার সম্পাদক হল। ওই সময়ে নানান বিপর্যয় দেখা দিল, ছাপাখানা উঠে গেল, পত্রিকা উঠে গেল। মাঝে চেষ্টা করা সত্ত্বেও কাগজ চালানো গেল না। তারপর বহু বছর বাদে সুকুমারের একমাত্র সন্তান সত্যজিৎ আবার নতুন করে কাগজ প্রকাশ করেন। এই ছিল তাঁর স্বর্গগতা মায়ের একান্ত ইচ্ছা। বছর দুই পরে পত্রিকার স্বত্বাধিকার সুকুমার সাহিত্য সমবায় সমিতি গ্রহণ করেন। এখনো তাঁরাই চালাচ্ছেন। সত্যজিৎ ও সুকুমারের ছোট কাকা প্রমদারঞ্জনের কন্যা লীলা মজুমদার সম্পাদকীয় কর্তব্য সমাধা করেন। এই ফাল্গুন সংখ্যাটি হল নতুন সন্দেশের অষ্টম বছরের একাদশ সংখ্যা।

(৬) দিবালোক সিংহ, ১২৬৫

বয়স না দিলে উত্তর দিই কি করে?

(৭) প্রসূন রায়, ২০৯৭, বয়স ১৪

বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞানের বিভাগ খোলা সম্পর্কে কি করা যায় দেখব বইকি।

(৮) সায়ন্তন গুপ্ত, ২১৭৩

বয়স দাও নি কেন ?

(৯) অম্লান ভট্টাচার্য, ২১৭০, বয়স ১৯

তোমার কবিতাটি না ছেপে পারলাম না এবং তোমার ইচ্ছাগুলোর কি করা যায় দেখব।

নারায়ণ গাঙ্গুলীর গল্প দিও সন্দেশে,
সুকুমার রায়ের হাসি তুমি দিও ঠেসে।
ধীরেন ধরের নাটক তারি সাথে দিও।
নলিনী দাশের গল্প তাও তুমি নিও।

(১০) হেনা মোহন্ত, নতুন গ্রাহিকা, বয়স ১৭

ছবি বা লেখা ভালো হলেই ছাপা হয়। শারদীয়া সংখ্যা ছাড়াও অ্যাডভেঞ্চারের গল্প ছাপি বই-কি।

(১১) কাজরী দত্ত, ৯৪২, বয়স ১৪

পুরনো গ্রাহক গ্রাহিকাদের আমরাও পুরনো বন্ধু বলে মনে করি।

(১২) সত্যশ্রী উকীল, ২১৬২, বয়স ১২

শারদীয়া সংখ্যা ভালো লেগেছিল জেনে খুসি হলাম। কই, আর লেখা পাঠাচ্ছ না যে ?

(১৩) অপরাজিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২১৭৪, বয়স ১৩

মহাশ্বেতা দেবী ছোটদের জন্য ও বড়দের জন্য সমান ভালো লেখেন। তিনি সন্দেশের শুভকামী বন্ধু। এর আগেও লিখেছেন এবং পরেও লেখা দেবেন আশা রাখি! তবে সব সময় কি আর সকলে লিখে উঠতে পারে ?

সুকুমার রায় ও উপেন্দ্রকিশোরের প্রায় সব বই-ই আলাদা ভাবে পাওয়া যায়। একসঙ্গে একটা বই করে ছাপানো মুস্কিল।

(১৪) সন্দীপ সেনগুপ্ত ২৮০৪, বয়স ১৩

শার্লক-হোম্‌সের জীবনী আবার কি ? সে তো আর সত্যিকার মানুষ নয়। তার সম্বন্ধে কন্যান ডয়ল যে-সব গল্প রচনা করেছেন তার মধ্যে থেকেই জোড়া তালি দিয়ে একটা জীবনী খাড়া কর না কেন। গল্পে তার নিবাস, চেহারা, ভাই, বন্ধু, দৈনন্দিন জীবন ইত্যাদি সব পাবে। ভারতের বাইরে পত্রবন্ধু পাতবার আমাদের কোনো ব্যবস্থা নেই। কমিক্‌স্ ভালো হলে খুব-ই ভালো। দেখা যাক।

(১৫) স্বাহা ও শুভঙ্কর বাগচি, ২১৫৯

বয়স দাও নি কেন ? বয়স ছাড়া কিছু হয় না।

(১৮) পত্রবন্ধু চাই

(ক) মিত্রা রায় চৌধুরী, ১৪২৫, বয়স ১০
শখ, আঁকা, বই পড়া, ডাকটিকিট জমানো।

(খ) জয়শ্রী তরাত ২০৮৬, বয়স ১২
শখ, গান করা, বই পড়া, আঁকা।

(গ) ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত ২০৮৪, বয়স ১৪
শখ—বইপড়া, গল্প লেখা, ইত্যাদি।
ভাই, নাম ভুল ছাপার জন্যে দুঃখিত।

(ঘ) দুলাল সমাদ্দার, ২০২৯, বয়স ১০
শখ, আঁকা , বই পড়া, গল্প শোনা।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

* আমাদের হাতে এজেন্টদের কাছ থেকে যথেষ্ট সংখ্যায় শারদীয়া সন্দেশ এসে গেছে! *

* সুতরাং আমরা এ'বছর যাদের শারদীয়া সংখ্যা ডাকে হারিয়েছে তাদের সকলকেই আর এক কপি বিনামূল্যে দেওয়া স্থির করেছি *

* কিন্তু এই সংখ্যাটি সাধারণ ডাকে পাঠানো হবে না। হয় হাতে হাতে নিয়ে যাও নইলে ডাক মাশুল সহ রেজিস্ট্রি খরচ বাবদ ১৲ টাকা পাঠাও *

আমচোর

ছোটদের জন্য ছোট্ট গল্প

পুণ্যলতা চক্রবর্তী

বাগানের গাছে অনেক আম হয়েছে।

একটা বাঁদর গুটি-গুটি সেই দিকে চলেছে দেখেই দুই কুকুর "রাজা" আর "রাণী" তেড়ে গেল। বাঁদরটা সুট করে আম গাছে উঠে গেল; কুকুর তো গাছে চড়তে পারে না, ওরা গাছতলায় দাঁড়িয়ে রইল।

নিচে থেকে দুই কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে উপর থেকে বাঁদরটা আম খেয়ে খোসা আর আঁটিগুলো ওদের গায়ে ছুঁড়ে মারছে!

ভীষণ রেগে ওরা পাগলের মত ছুটোছুটি চেঁচামেচি করছে।

সারাদিন এমনি চলল। বাঁদরটা কুকুরের ভয়ে নামতে পারছে না, ডালে বসে কিচিরমিচির বকছে আর ভেংচি কাটছে।

কুকুরাও ভাবছে, "যাবে কোথায় বাছাধন? এক সময়ে তো নামতেই হবে?" তারা গাছতলা থেকে নড়ছে না।

রোজ রাজা আর রাণী এক সাথে এক পাতে খায়; আজ রাজা এসে আগে খেয়ে গেল, রাণী বসে পাহারা দিল তারপর রাজা গিয়ে পাহারায় বসল, তখন রাণী খেতে এল।

রাত হয়ে গেল, তখন রাজা আর রাণীকে ধরে এনে বেঁধে দেওয়া হল। সেই সুযোগে বাঁদরটা নেমে তিড়িং তিড়িং করে পালিয়ে গেল!
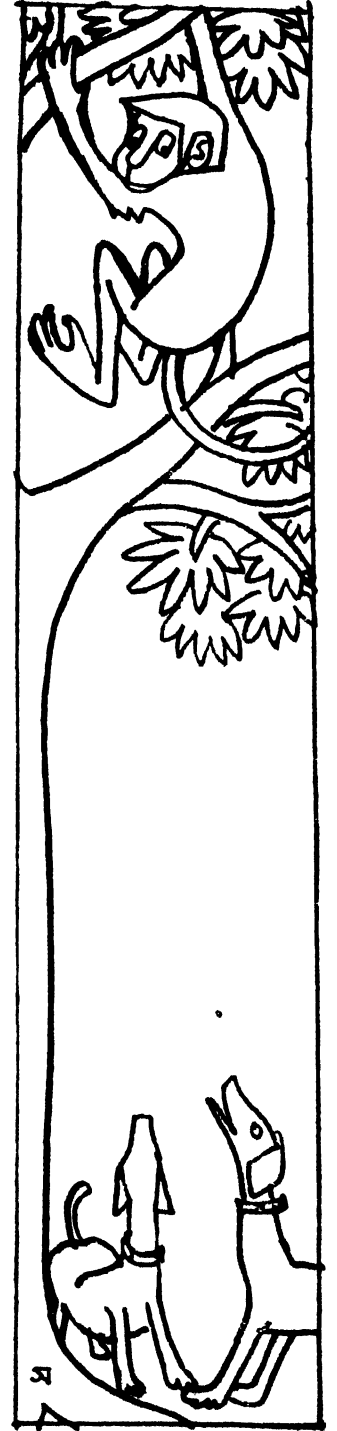
(১৫ই মার্চ—উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ)

(১)

(একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ ব্যবহার ক... ধাঁধা গতমাসে তোমাদের অনেকের খুব ভাল ...গেছিল। তাই এবারেও সেরকম আরো কয়েকটি দেওয়া হল।)

১। (ক) কৃত্রিম, কপট, মেকি, ভুয়ো, মিথ্যাচারী।
 (খ) কত প্রাণী ধরা পড়ে যায় ফাঁদে তারই !

২। (ক) কভু বা লাফিয়ে চলে কভু ঝোলে ডালে।
 (খ) ঘণ্ট বা ভাজা খাই, খাই ঝোলে—ঝালে।

৩। (ক) আহা, কিবা ভঙ্গিতে ঘোড়া ছোটে ভালো।
 (খ) বরষার বনবীথি করে থাকে আলো।

৪। (ক) সুহৃদের কাছে শুনি, ভুল যবে করি।
 (খ) তার পদভরে মাটি কাঁপে থরথরি !

(২)

আধুনিক যুগে তাকে প্রতিদিন দরকার,
মাথা কেটে ফেলে দেখ কত বড় জানোয়ার !
ল্যাজা বাদে তার সাথে সকালেই দেখা হয়।
পেট কেটে লেগে যাও ফল পাবে নিশ্চয়।

(৩)

নাসিকোত্তলন পুরের মানুষেরা মোটেই মিশুক নয়। পবন, ফলন, বচন, ভজন আর মদনবাবু ...কই পাড়ায় থাকেন, অথচ তাঁরা সবাই সবাইকে চেনেন না।

তাঁদের পদবী হল কারকুন, খাসনবিশ, গাঙ্গুলি, ঘোষ আর চট্টোপাধ্যায়, কিন্তু কার যে কি পদবী ...ও তাঁরা সবাই সঠিক জানেন না।

আমেদ মুচি

প্রভাতকুমার গুপ্ত

(পারস্যদেশের গল্প)

পারস্যদেশে এক বড় শহরে বাস করত আমেদ। সে ছিল যেমন সৎ তেমনি পরিশ্রমী। সংসারে সে আর তার স্ত্রী। দুজনের জীবন শান্তিতে আর স্বচ্ছলভাবে কেটে গেলেই হল, এর বেশি টাকা রোজগারের লোভ তার মোটেই ছিল না।

কিন্তু তার স্ত্রী সিতারা ছিল স্বামীর ঠিক উল্টো, বড়লোক হবার লোভ তার ষোল আনা। দামী দামী গহনা পোশাক পরে জাঁকজমক করে থাকবে, এ ছিল তার মনের কামনা।

একদিন শহরের একজন বড় ঘরের বৌকে দেখে সিতারার হাহুতাশ শুরু হয়ে গেল। তাঁর পরনে দামী পোশাক গায়ে মণিমুক্তার জড়োয়া গয়না। সহরের একটা সেরা বাড়িতে গিয়ে তিনি ঢুকলেন। সে যেন খাস বেহেস্ত। সিতারার বুদ্ধিসুদ্ধি ঘুলিয়ে গেল। সে ভাবতে লাগল—আহারে! ঐ মেয়েটির বদলে আমি যদি ও বাড়ির বৌ হতে পারতাম তাহলে আমার জীবনের সাধ পূর্ণ হত। যাক্‌গে বৌটিকে, খুঁজে বের করতে হচ্ছে। ফটকের কাছে গিয়ে দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করে সে জানতে পারল উনি বাদ্‌শার প্রধান জ্যোতিষীর স্ত্রী।

সিতারা ফিরে গেল বাড়িতে। স্বামী অন্যদিনের মত হাসিমুখে তাকে কাছে ডাকল। জিজ্ঞেস করল, সিতারা কোথায় গিয়েছিল, বেশ আনন্দে সময়টা কাটিয়ে এল কি না, এই সব। কিন্তু সিতারা ভ্রূকুটি করে রইল, কোন উত্তর দিল না।

স্বামী তার সঙ্গে মিষ্টিমুখে কত কথা বলল, তার গরম মেজাজকে নরম করবার জন্য অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। অনেক সাধ্য সাধনার পর শেষে সে বলল —'বড় যে ভালবাসার

া বলে যাও সব সময়, তার প্রমাণ দিতে পার কিছু ? তা নইলে কি করে বুঝব তুমি সত্যি ত্য আমাকে ভালবাস কিনা।'

আমেদ জবাব দিল—'কি প্রমাণ চাও তুমি ? ভালোবাসার কোন প্রমাণ দিতে আমি পিছপা , জেনো।'

সিতারা বলল—'আচ্ছা, তবে তুমি জুতো সেলাই করার পেশা ছেড়ে দাও। এ একটা হীন বসা, আর এতে তোমার যা বলিহারি রোজগার, তাতে কি আমার মন ওঠে, ভেবেছ ? জুতো সেলাই ড়ে দিয়ে তুমি জ্যোতিষী হও। গ্রহ নক্ষত্রের বিচার করে লোকের অদৃষ্ট গণনা করতে লেগে যাও, হলে দুদিনের মধ্যেই তোমার বরাৎ ফিরে যাবে, আমিও টাকা পয়সার মুখ দেখে একটু আরাম করতে রব।'

'জ্যোতিষী ! তুমি বল কি ?' আমেদ যেন আকাশ থেকে পড়ল, 'পণ্ডিত না হলে কি কেউ যাতিষী হতে পারে ? তুমি কি জান না এসব কথা ? আমি এক মুখ্যু সুখ্যু মুচি, জ্যোতিষীর বিদ্যা-দ্ধ আমি পাব কোথেকে ?'

তার স্ত্রী বলল—'ওসব কিছু জানতে চাই না আমি, তুমি যদি আমার কথামত কাজ না কর, তবে মি আর থাকব না তোমার কাছে, এই তোমাকে পষ্ট বোলে দিলাম।'

সিতারা তারপর তাকে অনেক করে বোঝাল, অনেক কাকুতি মিনতি করল। আমেদ শেষটায় য়ে পড়ে বলল—'আচ্ছা, না হয় দেখব একবার চেষ্টা করে।'

নিজের ব্যবসা ছেড়ে দেওয়ার মতলব তার মোটেই ছিল না। কিন্তু স্ত্রীকে সে খুব ভালবাসত। কে খুশি করার জন্যেই সে চামড়া আর যন্ত্রপাতির নাম মাত্র পুঁজিপাটা তার যা ছিল, সব বিক্রী রে ফেলল আর সেই টাকায় জ্যোতিষী ব্যবসার সাজসরঞ্জাম কিনে নিল। তার মধ্যে জলচৌকি কখানা, হাটে গিয়ে সেই জলচৌকিখানা সামনে পেতে বসল। তারপর গলার সুর চড়িয়ে জাহির রতে লাগল—'জ্যোতিষী, জ্যোতিষী চান ত এদিকে আসুন। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র সব কিছু ফলাফল ণনা করে বলে দিতে পারি। আপনাদের ভবিষ্যৎ জানতে চান ত আসুন, সব জানতে পারবেন মার কাছে।'

মুচিকে শহরের অনেকে চিনত। দেখতে দেখতে চারদিকে একটা ছোটখাট ভিড় জমে গেল। কজন বলে উঠল 'ওহে বন্ধু আমেদ, জুতো সেলাই করে করে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি ?' কলেই তাকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে আরম্ভ করল। সকলেরই ধারণা হল যে, তার বুদ্ধি সুদ্ধি লাপ পেয়েছে।

বেচারা আমেদ সে নিজেও বেশ বুঝতে পারছিল যে, ওদের কথাই ঠিক। কিন্তু কি করবে ? ীকে খুশি করার জন্যেই ও সব তাকে করতে হচ্ছিল। বাইরের ঠাট বজায় না রাখলে তার চলবে কন ? ঠাট্টা বিদ্রূপ মোটেই সে গায়ে মাখল না। অন্তত বাইরে এমন ভাব দেখাতে লাগল যেন ওসব সে গ্রাহ্যই করে না।

আমেদ বসে আছে, এমন সময় বাদশার স্যাকরা এলো সেদিকে। স্যাকরার বড় বিপদ বাদশার মুকুটের একটা বড় পদ্মরাগ মণি সে হারিয়ে ফেলেছে। মণি না পেলে যে তার গর্দান নওয়ার হুকুম হবে, তা সে ভাল করেই জানে। সম্ভব অসম্ভব সব জায়গা তো খুঁজে পেতে দেখেছে' পরিচিত সে সকলের কাছে খোঁজ করেছে, কিন্তু কোথাও মণির কোন সন্ধানই পায়নি।

হাটের ভেতর একটা ছোট ভিড় দেখে সে জিজ্ঞেস করল, 'কি হচ্ছে ওখানে'। একটি লোক হাসতে হাসতে বলল,—'ওখানে আমেদ মুচি বসে আছে। সে একজন জ্যোতিষী বনে গেছে আর তার ধারণা, সে গ্রহ নক্ষত্রের ফলাফল বলে দিতে পারে।'

যে লোক ডুবতে বসেছে, সে একটা কুটো পেলেও আঁকড়ে ধরতে চায়, স্যাকরার কানে যেই জ্যোতিষী শব্দটি গেছে, অমনি সে আমেদের কাছে হাজির। তাকে বললে,—'বাদশার পদ্মরাগ মণি কোথায় আছে গুণে বলে দিতে হবে। যদি পার তবে তোমাকে দুশো সোনার মোহর দেব, আর যদি না পার তবে জোচ্চুরির জন্য তোমার যাতে প্রাণদণ্ড হয়, তার বিহিত ব্যবস্থা করব। ছ ঘণ্টা সময় দিলাম তোমাকে, এর মধ্যে বলে দিতে হবে পদ্মরাগ মণি কোথায় আছে।' ক্রমশঃ

প্রোফেসর শঙ্কু ও কোচাবাম্বার গুহা

বিচার
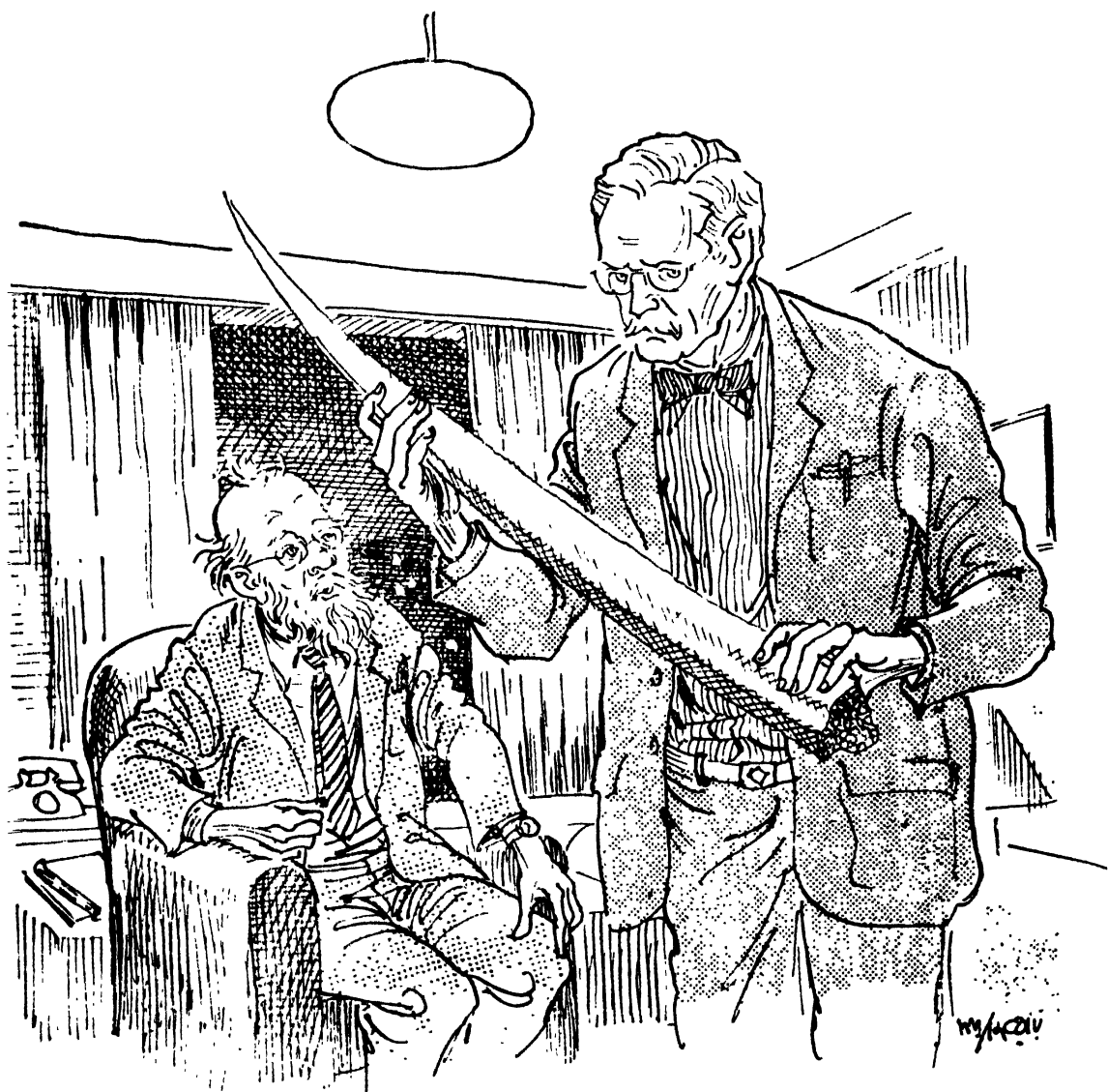
অতীন মজুমদার

ডাকে কি জোর হাতি সিংহের নাক,
বাজে যেন লক্ষ—হাজার শাঁখ!
সে ডাক শুনে সবারই ঘুম ছোটে
মাঝ-রাতে রোজ তাইত' জেগে ওঠে।
ঘুমুতে কেউ পারেনা তারপর,
জেগে জেগেই কাটায় সে প্রহর।
সেদিন ভোরে সবাই এসে তাই
বল্ল,—মহারাজ, এর বিচার চাই!
হাতি সিংহের নাক ডাকার এই ধুম
দেয় ভাঙ্গিয়ে কেন সবার ঘুম?
—ক'দিন ধরে' এম্নি জাগা যায়?
বিচার করুন—নইলে বাঁচা দায়!
শুনে' হেসে বলেন গবু রাজা,—
বেশতো, বিচার করেই দেব সাজা।
নাক ডাকে যার তার কোনো দোষ নেই,
ডাকৃছে যাকে—আসল দোষী সে-ই।
ডাকটা শুনে' কেন সে চুপ থাকে?
রোজই রাতে নাকটা যে তাই ডাকে।
সাড়া দিলেই এম্নি ক'রে আর
নাকটা বাপু ডাকে না বার বার।
বল কে সে—নামটা বল খুলে'
চড়িয়ে তাকে দিচ্ছি আমি শূলে।
শুনে' সবাই ভাবতে বসে—তাইত',
ডাকৃছে কাকে সেটাই জানা নাইত'!

অষ্টম বর্ষ—দ্বাদশ সংখ্যা চৈত্র ১৩৭৫/এপ্রিল ১৯৬৯

সীয়ারাম : নির্মলেন্দু গৌতম

মিঠু আমার খুব কাছে সরে এসে বলল, 'এখন কী হবে বলতো ? নিচে নামব কি ক'রে ?'

ভয় ভয় গলায় আমি বললুম, 'সুধামাসীরা না আসা অবৃদি এমনি ভূত হয়ে থাকতে হবে এখানে।'

এমনিতেই আমার ভয় করছিল এবার ভূতের কথা নিজে বলে নিজেই খুব ভয় পেলাম আমি। কাঁটা দিয়ে উঠল শরীর। বুকের মধ্যে জোরে ঢিপ ঢিপ শব্দ হতে থাকল। মিঠুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম মিঠুও ভয় পেয়েছে। ওর গলা যে ভয়েই কেঁপে যাচ্ছে তাতেও আমার সন্দেহ নেই।

সত্যি করেই নামবার উপায় নেই এখন! নিচে সুধামাসীদের যমদূতের মতো কুকুর এলসিটা আমাদের পাহারা দিচ্ছে।

আমি আর মিঠু যখন ছাদে উঠেছিলাম তখন সুধামাসীরা বাড়িতে ছিলেন। এলসিটা বাঁধা ছিল শেকলে। আমরা ওপর থেকে বাইনোকুলারটা দিয়ে যখন চারদিকটা দেখছিলাম, তখন সুধামাসী চলে গেছে বেড়াতে। আমরা যে ওপরে আছি সুধামাসীর বোধহয় মনেই ছিল না। মনে থাকলে হয় ডেকে যেতো, নাহলে এলসিটাকে বেঁধে রেখে যেতো। এলসিটা বাঁধা থাকলে এমন অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হত না।

অন্ধকারটা ক্রমে বেড়ে উঠছে। শির্ শির্ করে হাওয়াও দিচ্ছে। মিঠু ধরা গলায় বলল, 'চ্যাঁচালে কেমন হয় ?'

আমি বললুম, 'কেউ শুনতে পাবে না।'

সত্যি কথাই চ্যাঁচালেও কেউ শুনতে পাবে না। কারণ বাড়ির চারদিকে অনেকখানি জায়গা। তারপর বেশ উঁচু দেয়াল। তাছাড়া চারপাশের বাড়িগুলোও বেশ দূরে দূরে। দারোয়ান রামশরণও ফেরেনি এখনও। তাহলে ঠিক টের পেতুম।

যমদূতের মতো এলসিটা ঘুরে বেড়াচ্ছে ছাদের সিঁড়ির কাছে। মাঝে মাঝে সিঁড়ি বেয়ে দরজার কাছে মুখ এগিয়ে ঘেউ ঘেউ করে ডাক দিচ্ছে। যখুনি ডাক দিচ্ছে তখুনি আমি আর মিঠু ভালো করে দেখে নিচ্ছি ছাদের দরজার খিলটা তেমনি আঁটা আছে কিনা। একবার যদি ছাদে উঠবার সুযোগ পায়!

সুযোগ পেয়েছিল অবশ্য। মিঠু ছাদের সিঁড়ি বেয়ে ঠিক অর্ধেকটা নেমেছিল। আমি ছিলাম ওর পেছনে সিঁড়ির ওপরে ছাদের দরজায়। হাতে আমার বাইনোকুলার। ছাদের ওপর খানিকটা আলো ছিল, কিন্তু ছাদের সিঁড়ির তলাটা ছিল আবছা অন্ধকার। ঠিক সেই সময় বারান্দার ওদিক থেকে এলসিটা 'ঘেউ' বলে গর্জে উঠে দুই লাফে এসে গিয়েছিল সিঁড়ির তলায়। ঠিক যমদূতের মতো। মিঠু সঙ্গে সঙ্গে ওর মতোই দুই লাফে উঠে এসেছিল আমার পাশে। এলসিটা তখন সিঁড়ি বেয়ে লাফিয়ে প্রায় আমাদের কাছাকাছি। আমি আর মিঠু চোখের পলকে দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে দড়াম করে বন্ধ করে ফেলেছিলাম দরজাটা। শক্ত করে খিল এঁটে ছিলাম। আমাদের দু'জনের বুকের ভেতর কতোক্ষণ যে ভয়ে কেঁপেছিলো বলতে পারব না। এখনও সেই কাঁপুনি আছে। তারপর দরজার কাছে এলসিটার সে কি গর্জন আর দৌড়োদৌড়ি। দরজাটা তেমন শক্ত না হলে ভেঙেই ফেলত। আমরা দরজাটাতে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। খিলটা যদি ভেঙে যায়। কি ভেবে খানিক বাদে কুকুরটা থেমেছে। এখন পাহারা দিচ্ছে। বেরোবার চেষ্টা করলে আর রক্ষে থাকবে না।

দারোয়ান রামশরণ বোধহয় দূরে কোথাও গেছে। এতক্ষণে না হলে একটা ঢোলক বাজিয়ে গান ধরত। রামশরণ থাকলে ওকে চেঁচিয়ে ডেকে উদ্ধার পাওয়া যেত। এলসিটার সঙ্গে ওর খাতির আছে দেখেছি।

কথাটা ভাবতে ভাবতেই রামশরণের ঘর থেকে ঢোলকের শব্দ এল। 'সীয়ারাম সীয়ারাম' বলে গান ধরল। ফিরেছে তাহলে।

আমি মিঠুকে বললাম, 'আমরা দু'জনে একসঙ্গে চেঁচিয়ে রামশরণকে ডাকি।'

মিঠু লাফিয়ে উঠে বলল, 'একসঙ্গে ডাকলে ঠিক-ঠিক আমাদের গলা শুনতে পাবে রামশরণ।'

আমরা ছাদের কোণার এসে দু'জনে একসঙ্গে, 'রামশরণ, রামশরণ' বলে ডাকতে থাকলাম। একবার দুবার নয়, অনেকবার। কিন্তু তবু রামশরণের ঢোলক আর গান চলতেই থাকল। ঢোলকের আর গলার শব্দে আমাদের গলার স্বর ওর কানে পৌঁছুচ্ছেই না। কাজেই দু'জনেই থেমে গেলুম।

আমি ছাদের ওপরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ভয় ভয় গলায় বললুম, 'এখন কি করা যায়।'

মিঠু একটু ভেবে বলল, 'আমার পকেটে কাঁচের গুলি আছে অনেকগুলো। ওর টিনের চালের ওপর ঢিল ছুঁড়তে থাকি সেগুলো দিয়ে। গান থেমে যাবে।'

আর দেরি নয়, মিঠু আমার কাছে কিছু দিতেই দু'জনে একসঙ্গে টিনের চালের ওপর ছুঁড়ে দিলুম কয়েকটা। সঙ্গে সঙ্গে ঢোলক আর গান দুই-ই থামল। আমরা একসঙ্গে চেঁচালুম' 'রামশরণ, রা-ম শ-র-ণ—'

কোনো উত্তর নেই। দারুণ নিঝ্‌ঝুম হয়ে গেলো রামশরণের ঘর। ঢোলকের শব্দও নেই, গানও নেই।

ফের কয়েকটা ঢিল ছুঁড়ে ফের চেঁচিয়ে ডাকলুম রামশরণকে। আর সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণ জোরে 'সীয়ারাম সীয়ারাম' বলে চেঁচিয়ে ছুটতে ছুটতে গেট পেরিয়ে রামশরণ উধাও হয়ে গেল!

মিঠু দারুণ ভয় পেয়ে বলল, 'কি হলোরে ?'

কান্না চেপে বললাম, 'ও এসব ভূতুড়ে কাণ্ড ভেবেছে। জোরে চেঁচিয়েছি বলে আমাদের গলাটা ওর ভূতের গলার মতো সরু মনে হয়েছে।'

এলসিটা খুব ডাকছে এখন।

মিঠু হঠাৎ বলল, 'আয়, এবার আমরা চেঁচিয়ে সুধামাসীকে ডাকি।'

'তার চাইতে চেঁচিয়ে গান গাই। সুধামাসীরা হয়তো আরো একঘণ্টার আগে ফিরবে না।'

'গান গাইতে পারব না আমি। সুধামাসীকে ডাকলে ভয়টা কমেও যেতে পারে।' আমারও মনে হল সুধামাসীকে ডাকলে আমাদের ভয়টা কমে যাবে।

দু'জনে একসঙ্গে ডেকে উঠলুম, 'সুধা-মা-সী-ই-ই—'

তারপর বার চারেক। অবশ্য খানিকটা থেমে থেমে।

পাঁচবারের বার হঠাৎ রামশরণের গলা শুনলুম, 'জয় সীয়ারাম!' তারপরই সুধামাসীর গলা, 'ছাদের ওপর কে ?'

আমাদের দু'জনের শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল আনন্দে।

সুধামাসী ফের চেঁচিয়ে উঠল, 'ছাদের ওপর কে ?'

'আমি মিঠু' বলতে গিয়ে মিঠু কেঁদে ফেললো। আমি বললাম, 'মিঠু আর আমি।'

সুধামাসী ছুটতে ছুটতে আরো কাছে এল। অবাক গলায় বলল, 'ওমা, তোরা ওখানে কেন ?'

'এলসি আমাদের নামতে দেয়নি ছাদ থেকে।'

'তাই তো, ওপরে ছিলি···' বলতে সুধামাসী ছাদে ওঠবার জন্য নিচের দরজার তালা খুলতে ছুটলেন। পেছনে রামশরণ।

'দরজা খোল! এলসিকে বেঁধেছি।'

সুধামাসী ছাদের দরজা ঠেলছে।

আমি এগিয়ে দরজা খুলে দিলাম। সুধামাসী হাসতে হাসতে বলল, 'আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে তোরা ওপরেই আছিস। তাই কুকুরটাকে খুলে রেখে চলে গিয়েছিলাম।···খুব ভয় পেয়েছিস বুঝি ?'

আমাদের দু'জনকে জড়িয়ে ধরল সুধামাসী।

মিঠু বলল, 'আর ভয় পাচ্ছি না!'

'রামশরণের চালে তোরা ঢিল দিয়েছিলি বুঝি ডেকেও ছিলি বুঝি নাম ধরে।' সুধামাসী জিজ্ঞেস করছিল আমি বললাম, 'হুঁ!'

হাসতে হাসতে সুধামাসী বলল, 'ভীতুটা সব ভুতুড়ে কাণ্ড ভেবে ছুটে আমায় ডেকে এনেছে। অবশ্য ও নিজে আসতে চাচ্ছিল না। দারুণ বীরপুরুষ যে!'

রামশরণ সুধামাসীর পেছনে দাঁড়িয়েছিল। সুধামাসীর কথাটা শুনে বড় করে করে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'সীয়ারাম!'

তুই

[সেই যে চালাক শেয়াল
যার বাপ দিয়েছিল দেওয়াল,
একটি করে কুমীর ছানা
করছে জলযোগ।
সন্দেহ তো নেই
ঢুকছে পেটে যেই,
বাচ্চাগুলোর যাচ্ছে সেরে
সকল প্রকার রোগ।
যখন গেল জানাই
ছ'টা কুমীর ছানাই
গুরু মশাই পাঠিয়েছেন
সোজাই স্বর্গধাম।
ভেঙে যে পাঠশালায়
ছাত্ররা সব পালায়,
ভাবলে সবাই বাঁচলে নিজে
থাকবে বাপের নাম।]

ছাগল ছানা। বল তো দেখি দোস্ত রে,
সব তো তোর মুখস্থ রে,
গুরু মশাই কোন দিকে যান
পুঁটলী বেঁধে রোজ ভোরে ?

ভেড়ার ছানা। গুরু গেছেন তর্পণে,
বাপকে পিণ্ড অর্পণে,
আছিস তো তুই ব্যস্ত শুধুই
কাঁঠাল পাতা চর্বনে।

কুকুর ছানা। কাটছ শুধুই কুষ্ঠি হে,
নাশ যে হোল ভুষ্টি হে,
কুমীরগুলো কোথায় গেল
ছিল যে এক গুষ্টি হে।

বেড়াল ছানা। দাঁড়িয়ে হাঁদা ঠায় দেখি,
শুধাই ওকে আয় দেখি,
সৃষ্টিছাড়া ওর দাদারা
কোথায় চলে যায়, দেখি ?

ছাগল ছানা। সত্যি করে বল হাঁদা,
রাস্তা ভরা জল কাদা,
এর মাঝে তোর ছোড়দাদা,
কোথায় গেল ঘরের বার ?

হাঁদা। বলেন গুরু, তাঁর ঠেঁয়ে
লম্বা বেতের মার খেয়ে,
গেলই দাদা পার পেয়ে
একেবারে যমের দ্বার।

ভেড়ার ছানা। বাপরে, হ্যাঁরে, এই ধাঁদা,
কোথায় রে তোর সেই দাদা
চুলোয় সেঁকে রং সাদা,
গুরু মশাই করলে যার ?

হাঁদা। শুনছি নাকি কাল রাতে
পুড়ে গরম কয়লাতে
ফোসকা পড়ে পায় হাতে,
প্রাণ পাখিটা সরলে তার।

্র ছানা। ব্যাপার গ্যাঁড়াকল দেখি,
এবার হাঁদা বল দেখি,
তোর ট্যারাদার ভাগ্যে কি,
একই ব্যাপার ঘটল রে ?

া। গুরু কেরোসিন তেলে
যেই না হ্যারিকেন জ্বেলে
সেঁক দিয়েছেন, সেই ছেলে
তুলল পটল পট্ করে।

াল ছানা। তোর যে দাদা, নাম বোঁচা,
যাহার ছিল নাক মোছা,
সেও কি দিল দৌড় চোঁচা
প্রাণ বাঁচাতে খুব জোরে ?

া। যেই না গুরু রাগ করে,
সাঁড়াশীটা তাক্ করে
পাক দিয়েছেন নাক ধরে,
প্রাণটা খাঁচা ছাড়ল রে।

াল ছানা। তোর যে দাদার টাক ছিল,
বোঁচা নামে ডাক ছিল,
এখন যে আর কাক চিলও
পাচ্ছে না তার গন্ধ তো ?

া। মুণ্ডুখানা তার মুছে,
গুরু মশাই গুণ ছুঁচে,
যেই দিয়েছেন টাক খুঁচে,
নাড়িই হল বন্ধ তো।

ুর ছানা। বাপরে, ওরে, এই হাঁদা
কোথায় রে তোর বড়দাদা,
পেটের ভেতর একগাদা
চর্বি জমা করল যে ?

দা। দুদিন ধরেই জল সাবু,
খেয়েই দাদা হয় কাবু,
তিনটি দিনেই ফুলবাবু
চক্ষু উলটে মরল যে।
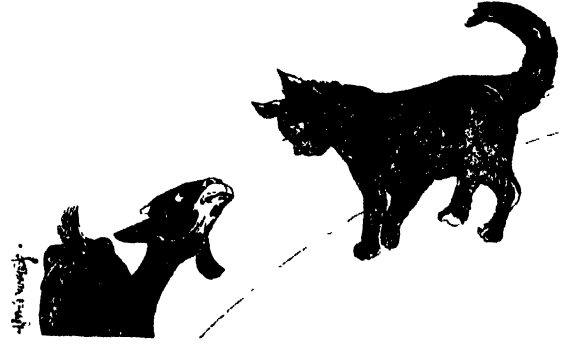
বেড়াল ছানা। বাপরে বাপ, পালিয়ে চল ;
রক্ত ভয়ে হচ্ছে জল।
পাঠশালাটার আ: চ. াটা
শুধুই শিকার ধরার ছল।

ছাগল ছানা। তোর কথাটা মন্দ নয়,
আমরা তো আর অন্ধ নয়।
লাফ দিয়ে পার হচ্ছি পগার,
বিদ্যেটা থাক বন্ধ নয়।

কুকুর ছানা। হচ্ছি ভেবে হদ্দ যে,
এতই কি অভদ্র যে,
বাবার শ্রাদ্ধ সেরেই সদ্য
গিলবে মোদের অদ্য সে।

ভেড়ার ছানা। কাঁপছে পিলে, ধরছে হাঁফ,
ফিরেই পেটে ভরবে সাফ,
আর দেরি নয়, থাকতে সময়
পালিয়ে চল বাপরে বাপ।

[চারটি পোড়োই গায়েব ;
ফিরে মাষ্টার সায়েব
দেখেন যে তাঁর পাঠশালাতে
দিচ্ছে ইঁদুর ডন্ ;

সবাই যদি পালায়—
যারা পরের পালায়
ঢুকবে পেটে—মেজাজ ঠাণ্ডা
থাকবে কতক্ষণ ?
ধরে কুমীর ছানা,
বাজার থেকে আনা
র‍্যাদায় করে ঘষতে থাকেন
তাহার মগজটি ;
সেটা যতই চেঁচায়,
বলেন, এ আর কে চায়,
বুদ্ধিটা সাফ করবো নইলে
আমার গরজ কি ?]

শেয়াল। কুমীর দাদার ছানা
ওরে ছোটো খোকারে,
তুই যে সবার চেয়ে
একটুকু বোকারে।
সব পোড়োগুলো যে
চোখে দিলো ধুলো যে
তোকেই ধরেছি শেষে
হয়ে এক রোখারে।
কুমীর দাদার ছানা
ওরে ছোট খোকারে
ভোঁতা তোর মগজটা
করে দেব চোখারে।
র‍্যাদা ঘষে খুলিতে
করে ঘুলঘুলি যে
ছেড়ে দেব গোটা ছয়
কালো কালো পোকারে।
ভোঁতা তোর বুদ্ধিটা
হয়ে যাবে চোখারে।
[.এমন সময় কুমীর
এলেন যে ঝুমঝুমির
প্যাকেট হাতে তাড়াতাড়ি
ছেলের নিতে খোঁজ।
দেখিয়ে দিল শেয়াল
আড়াল করে দেয়াল
একটি ছেলেই বারে বারে
দিয়ে ছয়টি পোজ।]

কুমীর। শেয়াল ভায়া, শেয়াল ভায়া,
পাঠশালাতে রইছ কি
এখনও সন্ধ্যে বেলায়
ছাত্রের ভার বইছ কি ?

শেয়াল। এসো, এসো, কুমীর দাদা,
হাঙর রাজার ভোজটা কি
ছেড়েই এলে, ভুল করলে,
হচ্ছে সেটা রোজ নাকি ?

কুমীর। বিয়ে তো আর করলে নাকো,
বুঝলে নাকো ভায়া হে ;
ছেলেরা সব রইল দূরে,
ছেলের বড়ো মায়া হে।

শেয়াল। সাগর ছেড়ে পালিয়ে এসে
বেশ করেছ মোর দাদা,
ডাঙার এমন সুখটা ছেড়ে
সেখানে রয় কোন গাধা ?

কুমীর। এই বারেতে একে একে
ছেলে আমার দেখাও হে,
বুঝতে পারি, পাঠশালাতে
কেমন পড়া শেখাও হে।

শেয়াল। এই তোমার জ্যেষ্ঠ ছেলে,
ছিল তো এ খুব মোটা ,
বালি খেয়ে শুকিয়ে এখন
একেবারেই চুপ ওটা।

[illegible]র। বেজায় আমার আনন্দ আজ
কেমন করে সইব হে,
গ্রামে গ্রামে তোমার কথা
দরাজ গলায় কইব হে!

[illegible]াল। এই যে তোমার মধ্যমটি
মাথায় ছিল টাক যে হে
মুণ্ডুটা ওর এখন কেমন
টেরি দিয়ে ঢাকছে হে।

[illegible]ীর। অবাক হয়ে চেয়ে তোমার
দেখছি যে হাত যশটা গো।
বজ্র তোমার আঁটুনিটা,
নয়কো মোটেই ফস্কা গো!

[illegible]য়াল। এই যে তোমার বোঁচা ছেলে
নাকটি ছিল চ্যাপটা যে,
এখন কেমন তীক্ষ্ণ যেন
সৌরাষ্ট্রের ম্যাপটা হে।

[illegible]মীর। ভেবেছিলাম সাঁড়াশীতে
শুধুই নড়া দাঁত তোলে,
এখন দেখি এই ওষুধে
খ্যাঁদা তাহার জাত ভোলে!

[illegible]শয়াল। কেমন এখন নজর দেখ
চক্ষুতে যার দোষ ছিল,
নিয়ম করে চোখের পাতায়
হ্যারিকেনটা ঘষছিল।

কুমীর। শুধুই চোখের দোষ ঘোচেনি,
এ যে অবাক কাণ্ড হে,
এই কদিনেই চোখ দুটো ওর
হয়েছে প্রকাণ্ড যে!

শেয়াল। এই যে তোমার নোংরা ছেলে
রংটা ছিল ময়লা যার,
এখন কেমন ফরসা, যেন
দুধের হাঁড়ি গয়লাটার;

কুমীর। কাকের ছানার মতোই ওটার
ছিল গায়ের রং কালো,
এখন দেখি লাগছে সাদা
বাঘের মতোই জমকালো!

শেয়াল। মাথায় খাটো পুত্র তোমার
কেমন শরীর দীর্ঘ তার,
বেতের ঘায়ে আকাশমুখো
উঠছে এবার শিরগো তার।

কুমীর। জানতাম যে মারের চোটে
শুধুই যত ভূত ভাগে,
সারতে কভু শুনিনিতো
এতোরকম খুঁত আগে!

শেয়াল। সামনে এবার দাঁড়িয়ে দেখ
তোমার ছোট্ট খোকা হে,
র‍্যাদা দিয়ে করব ঘষে
মগজটা ওর চোখা হে।

কুমীর। তোমার হাতের কীর্তি দেখে
বিস্ময়েতে মরছি গো,
বারেবারেই তোমায় ঘুরে
প্রণাম আমি করছি গো।
একটি দিনের দাওগো ছুটি
দেখাই ওদের গিন্নীকে
সবাই মিলে পীর তলাতে
চড়াব আজ শিন্নী হে।

শেয়াল। কুমীর দাদা, কুমীর দাদা,
নাওগো আমার নমস্কার,
তুমি যে আজ হচ্ছ খুসি
এটাই আমার পুরস্কার।
আরেকটি দিন সারতে নেবে
ছোট ছেলের ক্ষীণ মগজ,

ফিরবে হয়ে একেবারে
হাইকোর্টেরই সেসন জজ।
সব ছেলেকেই শেখাবো যে
ইংরেজি আজ রাতটি হে,
কাল সকালেই ফিরবে ঘরে
বিদ্যে সাগর সাতটি হে।

কুমীর। আচ্ছা, ওরা থাক্।
আজ রাতটা বরং যাক্।
একটা দিনের জন্যে আবার
থাকবে কেন ফাঁক্।
এই রাতটা থাক,
আর একটু তালিম পাক,
ইংরেজিতে শিখুক ওরা
পাপ্পা মাম্মা ডাক।
ভর্তি করে তাক
আমি রাখব মধুর চাক
কাল সকালেই ফিরেই না হয়
রুটির সাথে থাক।
আজকে না হয় থাক,
বরং কাল করবো জাঁকে
বিদ্যে সাগর হয়ে যখন
ফিরবে গোটা ঝাঁক।
[কুমীর গেলে ঘর
পণ্ডিত প্রবর
শেয়াল ভাবেন পাঠশালাতে
কি আর প্রয়োজন ?
ধরে শেষ ছানাটার কান
তাকে করেন জলপান ;
পাঠশালাটা ভেঙে দিয়ে
করেন পলায়ন।]

শেয়াল। কুমীর দাদার ছানা
সাতখানা খোকা যে,
পড়িয়ে দেখেছি আমি
এরা বড় বোকা যে।
যতো ঘাম ঢালি হে,
হাড় করি কালি হে,
কিছুতেই যাবে নাকো
ব্যাটাদের ধোঁকা যে
কুমীর দাদার ছানা
এরা বড় বোকা যে।
আর কিছু নাই হোক,
বোঁচা নাক, ট্যারা চোখ
সারাতে না পারলেও
মজুরী তো পেয়েছি ;
তাই ভেবে একে একে
ছানাগুলো খেয়েছি।
পাঠশালা ভেঙে দিয়ে
এবারে পালাই হে,
কুমীরের কাছ থেকে
বহু দূরে যাই হে।
পৃথিবীটা গোল তো ;
পালটিয়ে ভোল তো
পুনরায় সকলের
দেখা যেন পাই হে।
আসি তবে,—'যাই' কথা
বলতে যে নাই হে।

(ইথিওপিয়ার গল্প)

দেবব্রত ঘোষ

এক গরমের দিন। একপাল ছাগল আর ভেড়া চরাতে গিয়েছিল রাখাল। দূর পাহাড়ের কোলে। ছাগলরা, ভেড়ারা চরে চরে খাচ্ছিল। রাখাল ছিল শুয়ে। মস্ত এক পাথরের ধার ঘেঁষে। ছায়ায় ছায়ায় ; আর ঘুমিয়ে পড়েছিল।

এখন হয়েছে কি, তার পালের একটা ছাগল অনেক দূর এগিয়ে গেছে, টপকে টপকে। যেখানে চাষীরা টুকরো টুকরো পাথরের পাঁচিল আর কাঁটাগাছ দিয়ে ঘিরেছে তাদের ক্ষেত, যে ঘেরার মধ্যে ইয়া বড় বড় সব ভুট্টার গাছ হয়েছে। সেইখানে টপকে টপকে ভিতরে ঢুকল ছাগলটা। মনের সুখে চিবুতে লাগল ভুট্টার পাতা, ভুট্টার ডগা আর ছড়া।

এর মধ্যে রাখালের ঘুম ভেঙেছে। দেখছে বেলা পড়ে এল। হেই হেই করে সব ছাগলকে, সব ভেড়াকে জড় করল। কিন্তু একটা ছাগল যে কম। খোঁজ, খোঁজ। খুঁজতে খুঁজতে দেখল তাকে চাষীর ক্ষেতে।

হ্যাট্, হ্যাট্। রাখাল হাঁকল।

ছাগলটা ঘাড় ফিরিয়ে শুধু দেখল। আর বেশি বেশি করে কামড় দিল ভুট্টার পাতায়।

হ্যাট্, হ্যাট্। আবার হাঁকল রাখাল।

ছাগলটা আবার ঘাড় ফেরাল। নড়ল না, যেন 'লাঠির গুঁতো ছাড়া নড়ছি না'—বলে আবার কামড় দিল ভুট্টার পাতায়।

কথাটা মন্দ বলেনি। রাখাল তার লাঠি নিয়ে ঢুকল ভিতরে। দিল এক গুঁতো ছাগলটাকে। ছাগল এবার নড়ল। চলল ঘরমুখো গুঁতো খেতে খেতে।

ছাগল আর ভেড়ার মালিক তেকলে। সন্ধ্যেবেলায় ছাগল দুইতে বেরুল সে। ভুট্টা খাওয়া

ছাগলটা কিন্তু দুধ দিল না। 'ব্যাপারটা কি?'—রাখালকে ডাকল তেকলে। 'কি জানি।'—রাখাল বলল। ছাগলটা হঠাৎ বলে উঠল, 'আমাকে মেরেছে ও! তাই।'

তেকলের চোখ কপালে উঠল। এ যে দিব্যি কথা বলে। দুধ না দিক সহ্য হয়—কিন্তু কথা-কওয়া ছাগল? সব্বোনাশ, লোকে বলবে কি?

সেই সন্ধ্যেবেলাতেই ছাগলটাকে কাটা হল। কেটেকুটে ছাল ছাড়ানো হল। একখানা ঠ্যাং আর খানিকটা মেটুলি নিয়ে ঝিকে ডাকল তেকলে। 'এগুলো পাশের বাড়িতে দিয়ে আয়। বলবি আমরা আজ ছাগল কেটেছি তাই।'

ঝি একটা খেজুর পাতার ঠোঙায় নিয়ে চলল মাংস। মাংসটা বেশ লালচে। সোঁদা সোঁদা গন্ধও মন্দ নয়।,

'খাও না এক টুকরো।' কে যেন বলল। চমকে উঠল ঝি।

'আরে খাও খাও, কিচ্ছু হবে না'।—ঠোঙার মাংস বলে উঠল ফের।

'মন্দ কি।'—এদিক ওদিক চেয়ে মেটুলির একটুকরো মুখে ফেলল ঝি। খিদেও পেয়েছিল তার।

পাশের বাড়িতে হাজির হয়ে দরজায় টোকা দিল সে। 'তেকলে ছাগল কেটেছে। তোমাদের একটু ভাগ পাঠিয়েছে মাংসের।'—বলল পড়শিকে।

'ভাগ ত তুমিও খেয়েছ বাপু। নাও নি তুমি ভাগ? রাস্তায় আসতে আসতে?'—মাংস কথা কয়ে উঠল।

পড়শি ত ভয়ে কাঠ। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিল! ও বাবা কথা-কওয়া মাংস খাব কেমন করে? ফেরৎ নিয়ে যাও, ফেরৎ নিয়ে যাও এক্ষুণি।'

ঝি ফিরে এল, তেকলেকে বলল, 'ওরা মাংস নিল না।'

'কেন?'

'মাংস যে কথা বলে!'—নিজেই বলল মাংস।

'কি, কি, কি বলছ?'—তেকলে চমকে উঠল।

'তাছাড়া তোমার দেওয়া মাংস ত সবটা পৌঁছয়নি সেখানে। তোমার ঝি রাস্তাতেই খানিক সাবাড় করেছেন।'—মাংস আবার বলল।

'রক্ষে কর। কথা-কওয়া মাংসের আর দরকার নেই আমার।'—তেকলে সব হাড়-গোড়, ছাল-চামড়া আর মাংস এক করে চলল নদীর ধারে, দিল ছুড়ে ফেলে।

তারপর হনহনিয়ে ফিরল বাড়ি।

এদিকে মাংস-টাংস ত সব পড়ল জলে; কিন্তু ছালটা আটকে রইল পাড়ে। এক চাষী সকালবেলায় তাই না দেখে ঘরে নিয়ে এল। দেয়ালে রাখল ঝুলিয়ে। শুকোবে।

সেদিন চাষী সারাদিন মাঠে মাঠে কাজ করেছে, ফিরতে সন্ধ্যে উৎরে গেছে। চাষী-বউএর শরীরটাও আবার ভাল ছিল না সেদিন। দরজাটা ভেজিয়ে রেখে শুয়ে পড়েছিল। শুয়ে শুয়ে

ঘুমিয়ে পড়েছিল।

অন্ধকারে চাষী এসে হাজির। দরজা বন্ধ দেখে চটে গেল সে। 'দরজা খোল। খিদের জ্বালায় মরছি আমি, আর উনি এখন দিব্যি ঘুম লাগাচ্ছেন।'—চেঁচিয়ে বলল চাষী।

'কেন বাপু হল্লা লাগিয়েছ? দরজা ভেজানো আছে, খোল আস্তে আস্তে। ঘরের কোণে খাবার ঢাকা আছে, খাও গিয়ে। চেঁচামেচিতে কি কাজ?'—দেয়ালে টাঙানো চামড়াটা মিহিগলায় বলল।

এক ধাক্কায় দরজা খুলে ফেলল চাষী। দেখে বৌ দিব্যি কম্বলমুড়ি দিয়ে শুয়ে।

'সারাদিন মাঠে মাঠে খেটে খেটে হাড় কালি হল, আর উনি শুয়ে শুয়ে মেজাজ দেখাচ্ছেন। খাবারটুকুও ধরে দিতে পারেন না দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা।'—চাষী হাতের লাঠিটা উচিয়ে বউকে মারতে উঠল।

'থামো।'—চামড়াটা মোটা গলায় বলল। 'মাতালরাই বউকে ঠেঙায়।' 'কে?'—চাষী চমকে গেল। হাতের লাঠি শূন্যে উঠেই রইল।

'তোমার হল্লায় বাপু মরা মানুষ লাফিয়ে ওঠে।'—চামড়াটা আবার বলল।

'এঁ্যা, চামড়ায় কথা বলে? রক্ষে কর, কথা-কওয়া চামড়ায় দরকার নেই আমার।'—চাষী একটানে চামড়াটা নামিয়ে দিল। জ্বলন্ত উনুনে দিল ফেলে। পুড়িয়ে পুড়িয়ে ছাই করে তবে মেটাল গায়ের রাগ।

পরদিন চাষী আর চাষী-বৌ একসংগে হাটে বেরিয়েছে। সেই ফাঁকে তিন তিনটে চোর ঢুকল তার বাড়িতে। জিনিসপত্র বোঝাই করে নিয়ে বেরুতে যাবে, উনুনের ছাই কথা কয়ে উঠল, 'মুখে আচ্ছা করে ছাই মাখ্‌না, কেউ দেখলেও চিনতে পারবে না।'

চোরেরা ভাবল ওদেরই মধ্যে কেউ বুঝি বলেছে। 'মন্দ নয় কথাটা।' সবাই খাবলা খানেক ছাই নিয়ে মুখে মেখে ফেলল, উনুন থেকে।

কিন্তু যেই তারা রাস্তায় বেরিয়েছে, ওদের মুখের ছাই, ঠোঁটের ছাই চেঁচিয়ে উঠল মানুষের গলায় 'চোর, চোর, চোর, চোর!'

গাঁয়ের লোকেরা এল ছুটে, ধরে ফেলল চোরগুলোকে আর লাগাল জোর পিটুনি।···

ছাগলটার মজা দেখেছ? পুড়ে পুড়ে ছাই হয়েও কথা বন্ধ করতে পারল না। কথা না-কয়ে থাকা কি কঠিন, সত্যি!

রাখাল ছেলে

সুশীলকৃষ্ণ সেনগুপ্ত

গাঁয়ের ধারে
নদীর পাড়ে
রাখাল ছেলে
বেড়ায় খেলে,
চরায় ধেনু
বাজায় বেণু।
বোশেখ মাসে
শুকনো ঘাসে
গাছের ছা'তে
গামছা পাতে,
শীতল ভুঁয়ে
ঘুমায় শুয়ে।
ছুপুর হ'লে
'হেললু'—ব'লে
নদীর ঘাটে
সাঁতার কাটে,
সিনান করে।
আমের আশে
গাঁয়ের পাশে
বাগান জুড়ে
বেড়ায় ঘুরে।
বঁইচি বনে
আপন মনে
বঁইচি তোলে
বিকেল হ'লে!
আশিন মাসে
ক্ষেতের পাশে,
নিজের হাতে
বটের পাতে
মুকুট গড়ে;
মাথায় পরে
সাজায় কত
মনের মত
কাশের ফুলে,
শালুক তুলে,
ভোম্‌রা ধ'রে,
যতন ক'রে
খেলার বাড়ি
ছ'তিন সারি!
মিটলে খেলা
সাঁঝের বেলা
বাঁশীর তালে
গরুর পালে
গোঠের থেকে
চালায় হেঁকে।
উড়িয়ে ধুলো
বাছুরগুলো
লাফায় সবে
হাম্‌বা রবে।
সবার শেষে
মুচকি হেসে
বাজিয়ে বেণু
তাড়িয়ে ধেনু
রাখাল ফেরে
আপন ঘরে।

আমেদ মুচি

প্রভাতকুমার গুপ্ত

(পারস্যদেশের গল্প)

(স্ত্রী সিতারার বড়লোক হবার লোভ মেটাতে আমেদ মুচি জ্যোতিষী সেজে হাটে গিয়ে বসেছে। বাদশার স্যাকরা এসে বলল—'বাদশার পদ্মরাগ মণি খুঁজে দিতে পারলে দুশো সোনার মোহর দেব। না পারলে প্রাণদণ্ড।')

বেচারা আমেদ কি করবে ভেবে কূল কিনারা পেল না। এমন বিপদের মধ্যে তার স্ত্রীই তাকে জোর জুলুম করে ঠেলে দিয়েছে, এই কথাটাই শুধু তার মনে জাগল। মনের দুঃখে সে বলে উঠল—'হায়, স্ত্রীলোক, মরুভূমির ড্রাগন তোমার কাছে তুচ্ছ, তুমি তার চেয়েও মানুষের বড় শত্রু।'

এদিকে হয়েছে কি বাদশাহের মুকুট থেকে পদ্মরাগ মণি চুরি করে ছিল স্যাকরার বিবি—আর তারই একজন দাসী দাঁড়িয়েছিল ভিড়ের মধ্যে, আমেদের জল চৌকির কাছে। আমেদের মুখের ঐ কথাগুলি শুনে সে দৌড়ে বাড়িতে গিয়ে স্যাকরার স্ত্রীকে বলল—'মা, তুমি ধরা পড়ে গেছ। সহরে এক নতুন গণৎকার এসেছে, সেও জানতে পেরেছে, বাদশার মুকুট থেকে পদ্মরাগ মণি সরিয়েছ তুমিই।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই নাকি? কি হবে তবে? মুখ শুকিয়ে গেল বিবির। তিনি বোরখা পরে তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন বাজারের দিকে। সেখানে আমেদ বসেছিল জলচৌকিটি সামনে পেতে। আমেদ সত্যি সত্যি কতটুকু জানে, তা বুঝে দেখবার চেষ্টা না করেই বিবি কেঁদে কেটে একেবারে তার পা জড়িয়ে ধরলেন। বললেন—'আমার প্রাণ নিয়ে টানাটানি, মান সম্ভ্রমও বুঝি বাঁচে না। আমাকে রক্ষা কর। আমি তোমাকে সব খুলে বলছি।'

আমেদ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল—'কি বলতে চাও তুমি?'

বিবি জবাব দিলেন—'নতুন কিছু নয়, তুমি যা জান সেই ব্যাপারটাই খুলে বলছি। বাদশার

মুকুট থেকে পদ্মরাগ মণিটা আমিই সরিয়েছিলাম, একথাও তুমি জেনে ফেলেছ, মণিটা দেখে খুব লোভ হয়েছিল আমার, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, কাজটা অন্যায় হয়ে গেছে, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে বাঁচাও এখন।'

মহিলাটির কথা শুনে আমেদ আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিল আর কি, কিন্তু মনের ভাবটা সে চেপে রাখল। ভারিক্কী চালে বলল—'তুমি কি করছ না করছ সবই আমি জানি। সময় থাকতে যে তুমি আমার কাছে এসে সব স্বীকার করেছ, এতে ভালই হল। এক্ষুনি বাড়ি ফিরে যাও তুমি, সেখানে গিয়ে তোমার স্বামী যে কুর্সিতে বসে বিশ্রাম করেন, সেই কুর্সির গদীর নীচে মণিটা রেখে দিয়ো। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

স্যাকরার বিবি দৌড়ে বাড়িতে ফিরে গিয়ে আমেদের কথানুযায়ী কাজ করল। তারপর সে স্বামীর অপেক্ষায় বসে রইল।

স্ত্রী চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ পরেই স্যাকরা আবার আমেদের জলচৌকির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। মুচি তাকে ইসারায় ডাকল। কাছে আসতেই বলল—'শোন, আমি চন্দ্রসূর্যকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তাদের কাছ থেকে জানলাম, তুমি যে পদ্মরাগ মণিটি হারিয়েছ, সেটা তোমার কুর্সির গদীর নীচে রয়েছে। বাড়ি গিয়ে সেখানে খোঁজ করে দেখো গে।'

স্যাকরা ভাবল, বলে কি! লোকটার মাথায় ছিট আছে নাকি? কিন্তু যদি কোন গতিকে মণিটা সেখানেই পাওয়া যায়। খুঁজে দেখতে আপত্তি কি? দৌড়ে সে ফিরে গেল বাড়িতে। কুর্সির গদী তুলতেই পেয়ে গেল পদ্মরাগ মণিটা। আমেদের কথা হুবহু ফলে গেল। তখন তার আনন্দ আর দেখে কে?

আমেদের কাছে সত্যিই সে কৃতজ্ঞ। ফিরে গিয়ে তাকে দুশো সোনার মোহর দিল। বলল—'সত্যিই তুমি এই পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। দুনিয়ার সেরা জ্যোতিষী তুমি।'

মুচি যখন এই সোনার রাশি দেখল আর বুঝতে পারল যে, এ সবই এখন তার, তখন সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে যেন সে বাঁচল। বাজারের দোকানের আসন ছেড়ে উঠে সে চলে গেল বাড়িতে তার স্ত্রীর কাছে।

তাকে দরজার কাছে আসতে দেখেই তার স্ত্রী দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করল—'তোমার কাজে সিদ্ধি কেমন হল, বল শুনি।'

আমেদ মুখে কিছু না বলে সেই দুশো সোনার মোহর মেলে ধরল তার স্ত্রীর সামনে। 'এই নাও' —সে বলল 'নিয়ে যাও এগুলো।' এবার তোমার তৃষ্ণা মিটবে আশা করি আর আমাকেও রেহাই দেবে। নিজের খুশিমত নিজের ব্যবসা নিয়ে থাকব। জুতো সেলাই করব, চুরি জোচ্চুরির ধার ধারব না। প্রাণ হাতে নিয়ে বিপদের ফাঁদে পা দেওয়ার দরকার কি? বাবা, খুব ফাঁড়া কেটেছে আজ। আমার প্রাণটা নিয়ে টানাটানি পড়ুক, তা নিশ্চয় তুমিও চাও না।'

কিন্তু মোহরগুলের দিকে তাকাতে তাকাতে সিতারা ভাবল, আরো শ দুই পেলে কি চমৎকারই

না হয়। স্বামীর সঙ্গে সে খুব মিষ্টি মুখে কথাবার্তা বলতে শুরু করল। বলল—'আমেদ সাহস সঞ্চয় কর। তোমার নতুন জীবনে প্রথম দিনই হাতে হাতে কেমন ফল পেয়েছ দেখ। এমনটি কি আর আশা করতে পেরেছিলে? দেখবে শীগগিরই আমরা আমীর ওমরাহের মত ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠব। তুমি ভয় পেয়ে পিছিয়ে যেয়ো না, বরাৎ আমাদের খুলে যাবেই।'

আমেদ স্ত্রীকে কতভাবে বোঝাতে চাইল। বলল—'দেখো, আমি ঐ মূর্খ মুচি বইত কিছু না। আর কিছু বিদ্যা যদি জাহির করতে যাই তবে বিপদে পড়ব।' কিন্তু সিতারা কিছুতেই শুনবে না। সে একেবারে কান্নাকাটি লাগিয়ে দিল। হাতে পায়ে ধরে কাকুতি মিনতি করে স্বামীকে বলল—'আর একটিবার চেষ্টা করে দেখো, না হয় অন্তত আর একদিনের জন্যে।'

আমেদের মনটা ছিল নরম আর সে তার একগুঁয়ে স্ত্রীকে ভালবাসত। তার কান্না আর কাকুতি মিনতিতে স্থির থাকতে না পেরে আমেদ পরদিনও আবার রাস্তার মোড়ে তার জলচৌকিটা পেতে বসল। আগের দিনের মতই সে হাঁক ডাক শুরু করল—'আমি একজন জ্যোতিষী, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ নক্ষত্রের ফল আমি জানি। তোমাদের জীবনে কি কি ঘটবে, সব বলে দিতে পারি আমি।'

দেখতে দেখতে তাকে ঘিরে একটা ছোট খাট ভিড় জমল। কেউ কেউ তাকে টিটকারী দিতে আরম্ভ করল। কিন্তু অনেকের মনেই তার গুণপনা সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মেছিল। স্যাকরার পদ্মরাগ মণি চুরির গল্প তারা শুনেছিল। আমেদই ত স্যাকরার মণির সন্ধান বাৎলে দিয়েছিল।

সূর্য তখন একেবারে মাথার উপর। আমেদ গরমে ক্লান্ত। সেই সময় সেই দিক দিয়ে যাচ্ছিলেন একজন মহিলা, পুরু বোরখার আড়ালে মুখ তাঁর ঢাকা। মাথা নীচু, দুশ্চিন্তায় মন ভার। তিনি একটা খুব দামী গলার হার হারিয়ে ফেলেছেন। স্বামীকে জানাতে ভয়, তিনি হয়ত রাগ করবেন আর স্ত্রীকে খুব অসাবধান ভাববেন।

মহিলাটি ঐ পথে যাচ্ছেন, এমন সময় তিনি শুনতে পেলেন, কে যেন বলল—'ঐ দেখেছ একজন নতুন জ্যোতিষী। বাদশার মুকুটের পদ্মরাগ মণি চুরি গিয়ে ছিল আর এই জ্যোতিষীই স্যাকরাকে বলে দিয়েছিল, কোথায় সেটা পাওয়া যাবে। লোকটা একেবারে সবজান্তা, মানুষের মনের চিন্তার গতিও তার নখদর্পণে।'

মহিলাটি থম্‌কে দাঁড়ালেন। মনে মনে ভাবলেন, লোকটা হয়ত আমার হারও বের করে দিতে পারে। আস্তে আস্তে আমেদের জলচৌকির কাছে গিয়ে তিনি বললেন—"জ্যোতিষী সাহেব, লোকে বলে, দুনিয়ার কিছুই আপনার অজানা নেই, যদি তাই হয় তবে বলুন দেখি, আমার যে গলার হারটা হারিয়ে ফেলেছি, তা কোথায় পাব। আপনার কথায় যদি তা ফিরে পাই, তবে আপনাকে পঞ্চাশটি সোনার মোহর দেব।'

বেচারা আমেদ! আবার সে পড়ল বিপদে। সে কি করে বলবে, কোথায় মহিলার হার পাওয়া যাবে? হারটিতো সে জন্মেও চোখে দেখেনি, আর এই খানিকক্ষণ আগে পর্যন্ত এর কথা সে কানেও শোনেনি। সে এক দৃষ্টে মাটির দিকে চেয়ে রইল, যাতে মহিলাটি তার মনের ভাব ধরতে না পারেন। এই

নতুন ফ্যাসাদের হাত থেকে কি করে রক্ষা পাওয়া যায় তাই সে ভাবতে লাগল। মনে মনে এই সব কথা চিন্তা করছে, এমন সময় মহিলাটির বোরখার একটা বড় ফুটোর দিকে তার দৃষ্টি পড়ল। কিছুমাত্র চিন্তা না করেই হঠাৎ সে বলে উঠল—'ফুটোর কাছে খুঁজে ছাখো ভালো করে।'

মহিলাটির মনে তখন একমাত্র নিজের লোকসানের দুর্ভাবনা। এছাড়া আর কোন চিন্তাই নেই তাঁর মনে। আমেদের কথা শুনে তিনি ভাবলেন, সে নিশ্চয়ই তাঁর হার সম্বন্ধে কথাগুলো বলেছে। মিনিট খানেক কি একটা চিন্তায় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন, তারপরেই, 'আমি এক্ষুনি ফিরে আসছি' বলে তিনি পা চালিয়ে চলে গেলেন বাড়িতে।

তার খানিকক্ষণ পরই দেখা গেল, সেই মহিলাটি আবার আমেদের জলচৌকির পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। এক হাতে রয়েছে তার গলার হার, অন্য হাতে সোনার মোহর ভর্তি এক থলে। তিনি বললেন—'জ্যোতিষী সাহেব, এই নাও মোহর, এগুলো তোমার হক্ পাওনা, তোমার উপযুক্ত পুরস্কার। তুমি যখন আমাকে ফুটোর ভিতর দেখতে বললে, তখন হঠাৎ আমার মনে পড়ল যে, স্নানে যাওয়ার সময় আমি হারগাছা দেয়ালের একটা গর্তের ভিতরে রেখে গিয়েছিলাম সাবধানে। এখন বুঝলাম, দেশের আর সব জ্যোতিষী তোমার কাছেও লাগে না, তোমার বিদ্যাবুদ্ধির এক কণাও তাদের নেই।'

আমেদ সেই দিন সন্ধ্যায় বাড়ি যেতে যেতে ভাবল, যাক্, খোদার দয়ায় বেঁচেছি বরাৎগুণে এ যাত্রায়ও ফাঁড়া কেটে গেল। সে ঠিক করল লোভে পড়ে আর সে নসীবের পরীক্ষায় লাগবে না। দু দুবার বেঁচেছে। কিন্তু তিনবারের বারও যে সে রেহাই পাবে, এই ভরসা কোথায়?'

কিন্তু স্ত্রীর হাতে সেই পঞ্চাশটি সোনার মোহর দেওয়ার পর থেকে তার স্ত্রী, আর কিছুতেই তাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। সে কেবলই সোনা চায়, আরো সোনা, অফুরন্ত সোনা। যাতে সেও দেশের নামকরা ধনীগৃহিণীদের একজন হয়ে উঠতে পারে: কাতরভাবে সে বলল—'দেখ আর একবার যাও। অদৃষ্ট যখন সদয় তখন নিশ্চয়ই কপাল খুলবে'।

ও দিকে হয়েছে কি, বাদশার খাস মহলে তখনই একটা বড় রকমের চুরি হয়ে গিয়েছিল। সোনা আর মণিমুক্তা ভরতি চল্লিশটি সিন্দুক চুরি। কারা যে সরিয়েছে, কোথায়ই বা নিয়ে গেছে, কেউ জানে না, কেউ বলতে পারে না।

বাদশা তাঁর জ্যোতিষীকে ডেকে পাঠালেন। আজ থেকে সাতদিনের মধ্যে সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে এই চল্লিশটি সিন্দুকের সন্ধান তোমাকে বের করে দিতে হবে। নইলে তোমার গর্দান নেওয়া হবে। জেনো'—বললেন বাদশাহ। জ্যোতিষী তাঁর যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন, কিন্তু সাতদিন পার হয়ে গেল তবু বাদশার ধনদৌলতের কোন সন্ধানই হল না। গর্দান গেল জ্যোতিষীর।

নতুন জ্যোতিষী আমেদের কথা বাদশার কানে গেল। তার অদ্ভুত কীর্তিকলাপের কথা তিনি শুনলেন। 'এক্ষুনি নিয়ে এস তাকে'—বললেন বাদশা। আমেদকে নিয়ে আসার জন্য একদল লোক পাঠিয়ে দিলেন। আমেদ শুনল, কি জন্য তার তলব পড়েছে বাদশার দরবারে। শুনে স্ত্রীকে বলল—'ওগো ছাখো। কি বিপদ ডেকে আনলে তুমি। এবার একেবারে মরণের ডাক এসেছে, এ সবেরই মূলে তুমি।'

বাদ্‌শার কাছে এসে আমেদ একবারে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তাঁকে কুর্নিস করল। তাঁর আদেশ না শোনা পর্যন্ত পড়ে রইল তেম্নিভাবে।

বাদশা তার দিকে তাকিয়ে বললেন—'ওঠ আমেদ। বল, আমার চল্লিশটা সোনার সিন্দুক কে চুরি করেছে?'

আমেদ মিনিট খানেক যেন খুব গভীরভাবে চিন্তা করল, তারপর জবাব দিল,—'জাঁহাপনা, সেত একজন নয়, অনেক। আমি দেখতে পাচ্ছি চল্লিশ জন চোর, তাদের এক এক জনের মাথায় এক একটা সিন্দুক।'

বাদ্‌শা বললেন—'এঁ্যা, তাই নাকি? আচ্ছা, এখন বলত, চোরগুলি কারা আর সোনাগুলি নিয়ে কি করেছে তারা?'

আমেদ বলল—'সে ত আমি এখনই বলতে পারব না। গ্রহনক্ষত্র আর চন্দ্রের বিচার করে দেখতে সময় লাগবে। আমাকে চল্লিশ দিনের সময় দিন, তারপরে পাবেন আপনার প্রশ্নের উত্তর।'

বাদশা বললেন, 'বেশ, তাই হবে, তোমাকে চল্লিশ দিনের সময় দিলাম। কিন্তু ঐ সময়ের পরে আমি যা জানতে চাই তা যদি বলতে না পার, তবে আমার আগের জ্যোতিষীর মতো তোমার গর্দান নেওয়া হবে।'

আমেদ বাড়ি এল। তার মাথা গেল গুলিয়ে, বাদশাকে কথা দিয়ে এসেছে, কিন্তু কি করে সেই কথা রাখবে? স্ত্রীকে ডেকে বলল—'তুমিই আমার সর্বনাশ করলে। এ যাত্রা আর নিস্তার নেই, ধরা পড়তে হবে। আর মাত্র চল্লিশ দিন আছে আমার পরমায়ু। এক কাজ কর, চল্লিশটা খেজুর নিয়ে এসো। এনে সবগুলো একটা বৈয়ামে রাখো? আমি রোজ একটা করে খেজুর খাব আর রোজ খাওয়ার সময় খেজুর গুণে বুঝতে পারব, মরবার আর কতদিন বাকি রইল।'

সিতারা কতকগুলো খেজুর নিয়ে এল, তার থেকে গুণে চল্লিশটা স্বামীর কথামত একটা বৈয়ামে রাখল। তারপর দুজনে মিলে সোনার সিন্দুক চুরি সম্বন্ধে নানারকম আলাপ আলোচনা করতে লাগল। কারা চুরি করেছে। চোর ধরা সম্ভব কিনা এইসব বিষয়ে তাদের আলোচনা চলল।

এদিকে যে চল্লিশজন চোর রাজার ধনদৌলত চুরি করেছিল, তাদের মনে রীতিমত ভয় ঢুকেছে। নতুন জ্যোতিষী আমেদ চোরের ঠিক ঠিক সংখ্যা বাদশাকে বলে দিয়েছে, এই কথা তারা শুনতে পেয়েছিল। 'তা হলে কারা চোর, তাও সে নিশ্চয়ই জানে, মনে হচ্ছে'—এই সব কথা ওরা বলাবলি করতে লাগল।

দস্যুদের সর্দার বলল—'তোমাদের মধ্যে একজন কেউ সন্ধ্যার পর লোকটার বাড়িতে যাও। গিয়ে তার স্ত্রীর সঙ্গে সে কী আলাপ করে, আড়ি পেতে তা শুনতে চেষ্টা করবে। সে হয়ত কথায় কথায় স্ত্রীর কাছে আমাদের সম্বন্ধে সবই বলে দিতে পারে। তখন আমরা বুঝতে পারব আমাদের কী করা কর্তব্য।'

এই পরামর্শমত রাতের অন্ধকার একটু ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই একজন চোর চুপি চুপি

আমেদের বাড়িতে গিয়ে একটা পর্দার পিছনে লুকিয়ে রইল। ওখান থেকে ওদের কথাবার্তা শোনা যায়, কারো চোখে পড়বার ভয়ও নাই। আমেদ যখন বৈয়াম থেকে প্রথম খেজুরটি তুলে নিচ্ছিল, ঠিক ঐ সময়েই চোরটি এসেছিল। আমেদ বলল—'এইযে, চল্লিশটির মধ্যে এইটি হল এক নম্বর।'

এই কথা শুনেই চোরের মনে দারুণ ভয় ধরল। সে দৌড়ে চলে গেল সর্দারের কাছে। 'নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন ভৌতিক জাতুবিদ্যার ব্যাপার আছে। আমাকে মোটেই দেখতে পায়নি, তবু সে বুঝতে পেরেছিল যে, আমি সেখানে রয়েছি'—চোরটি বলল।

পরদিন রাত্রে সর্দার তুজনকে পাঠাল। তারাও এসে পৌঁছেছে আর আমেদ দ্বিতীয় খেজুরটি খেতে খেতে স্ত্রীকে বলল—'চল্লিশের মধ্যে এই হল গিয়ে আজ তুটি '

দস্যু সর্দার রোজ রাত্রে একজন করে বেশী লোক পাঠাতে লাগল। আর, রোজ রাত্রে আমেদ খেজুর খাওয়ার সময় যে সংখ্যা বলত তা তারা শুনতে পেত। শেষের রাত্রে তারা সবাই মিলে গেল। সেদিন বৈয়াম থেকে শেষ খেজুরটি তুলতে তুলতে মুচি বলল—'সংখ্যা এবার পূর্ণ হল। আজ রাত্রে চল্লিশ গোনা হয়ে গেল।'

চোরদের মনে তখন আর সন্দেহমাত্র রইল না। নিশ্চয় তাদের সম্বন্ধে সবই জানে। তারা বুঝল একে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করা বৃথা। এখন বাকি আছে একমাত্র পন্থা—ঘুসের লোভ দেখিয়ে একে হাত করা যায় কিনা। ভোর হওয়ার খানিক আগে তারা আমেদের বাড়িতে গিয়ে দরজা ধাক্কা দিতে আরম্ভ করল।

আমেদ বেচারা ভাবল বাদ্শার পাইক এসেছে তাকে বন্দী করে নিয়ে যেতে। সে বিছানা থেকে উঠে পড়ল এক লাফ দিয়ে, চেঁচিয়ে বলল 'বুঝতে পেরেছি তোমরা কী চাও। কাজটা কিন্তু তোমাদের ভারি অন্যায়, একেবারে পাপের একশেষ।' দস্যু সর্দার বলল—'আমেদ, তুমি বুদ্ধিমানদের চেয়েও সেরা বুদ্ধিমান। আর, আমাদের কুকর্মের কথা যে তোমার অজানা নেই, তা আমরা জানি। আমরা তোমার কোন অনিষ্ট করতে আসিনি। বরং তোমাকে এই তু হাজার সোনার মোহর দিতে এসেছি। বাদশাকে কিন্তু আর কিছু জানাবেনা বল।'

'জানাবোনা কিছু! বটে! তুনিয়া সুদ্ধ সবাইকে জানিয়ে দেব।'

তার কথা শুনে দস্যুরা ভয়ে একবারে মুষড়ে পড়ল। তাকে কাকুতি মিনতি করে বলল—'বাদশার ধনদৌলত সব আমরা ফিরিয়ে দিচ্ছি। তুমি, সদয় হও আমেদ।'

মুচি চমকে উঠল। চোখ রগড়াতে রগড়াতে দেখল, তার ঘুম সত্যি ভেঙেছে কিনা। এতক্ষণে সে বুঝতে পেরেছে, এরা নিশ্চয়ই সেই চোরের দল, বাদশার পাইক নয়। আর, তারা যে তার হাতের মুঠোয় এসে গেছে, তাও চট করে সে বুঝতে পারল।

কড়া গলায় সে বলল 'চোরের দল সব, আমার হাত থেকে রেহাই নেই তোদের। তবে তোদের অনুতাপ এসেছে দেখছি। দেখি কতটা তোদের বাঁচাতে পারি তোরা এক কাজ কর। 'হেমানে'র যে ধ্বংসস্তূপ আছে তার দক্ষিণ দেয়ালের কাছে এক্ষুণি সিন্দুক গুলোকে নিয়ে তোরা চলে যা। সেখানে

মাটির এক ফুট নীচে সিন্দুক গুলোকে পুঁতে রাখ। যদি এইভাবে কাজ করিস্‌ তবে হয়ত তোরা প্রাণে বাঁচতে পারিস।

চোরের দল তখনই আমেদ মুচির কথামত কাজ করতে চলে গেল। আর আমেদ আবার শুয়ে পড়ল বিছানায় গিয়ে।

আর কিছুক্ষণ পরেই একদল পাইক এল আমেদকে বাদ্‌শার কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

আমেদ উঠে তার সবচেয়ে ভালো পোশাক পরল আর বাদ্‌শার কাছে গিয়ে হাজির হল একেবারে নিরীহ গোবেচারার মত। 'আমেদ, আমার ধনদৌলতের সন্ধান পেয়েছ?' জিজ্ঞাসা করলেন বাদ্‌শা।

মুচি বলল—'জাঁহাপনা, কোনটা বেশি চান—ধনদৌলত ফিরে পেতে, না, চোর ধরতে? আমি গ্রহ নক্ষত্রের বিচার করে দেখলাম, দুটোর একটা মাত্র আপনি পেতে পারেন।'

বাদ্‌শা এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন, তারপর বললেন—'চোর গুলোকে শাস্তি দিতে পারলে আমি খুবই খুশি হতাম, কিন্তু দুয়ের একটামাত্র যদি পাওয়া যায় তবে আমি ধনদৌলতই চাই।'

আমেদ বলল—'তবে চলুন আমার সঙ্গে। আমি দেখিয়ে দেব কোথায় সেগুলো আছে।' আমীর ওম্‌রাহদের নিয়ে বাদ্‌শা আমেদের সঙ্গে 'হেমান' ধ্বংসস্তূপের কাছে গেলেন। তারা দক্ষিণ দিকের দেয়ালের কাছে আসতেই আমেদ সেখানে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে আকাশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। জ্যোতিষীরা যেমন মন্ত্রোচ্চারণ করে থাকে আমেদ সেই রকম কীসব বিড়বিড় করে বলল। তারপর পায়ের নীচের মাটি দেখিয়ে সেইখানে খুঁড়তে বলল লোকজনদের।

লোকগুলো খুব তোড়জোড় করে কাজে লাগল, কিন্তু অল্প একটু খুঁড়তেই চল্লিশটি সিন্দুকের দেখা পাওয়া গেল। মাটি খুঁড়ে তারা একটি একটি করে সিন্দুক তুলে উপরে ওঠাল। দেখা গেল' প্রত্যেকটি সিন্দুকের তালাতেই বাদ্‌শার সীলমোহর রয়েছে, একটাও ভেঙ্গে যায়নি।

বাদশার আনন্দের আর সীমা রইল না। তিনি আমেদকে দরবারে একটা উচ্চপদ দিয়ে দিলেন। দেশের মধ্যে বাদ্‌শার ঠিক পরেই হল তার পদমর্যাদা। কিন্তু সিতারাকে সে বাদ্‌শাহী মহলের ত্রিসীমানাতেও ঢুকতে দিল না। তার মতে, যে স্ত্রী কেবল নিজের স্বার্থ চিন্তাই জানে আর কিছু জানে না সে কখনো স্বামীর ধনদৌলতের ভাগ্য নেওয়ার অধিকার পেতে পারে না।

নতুন বছর এল — শোন গ্রাহকেরা ভাই,
তাড়াতাড়ি বলে দাও তোমাদের কিকি চাই,
শীঘ্র পাঠাও চাঁদা করোনাক দেরী আর,
নতুন গ্রাহক কর — এক — দুই — তিন — চার!

সিঙ্গাপুরে যে ম্যাজিক দেখেছি

যাদুকর এ. সি সরকার

সিঙ্গাপুরের র‍্যাফেলস হোটেলের সামনে প্রায়ই একজন বুড়ো চীনে যাদুকরকে বসে থাকতে দেখতাম। প্রথম যেবার সিঙ্গাপুরে যাই সেবারে ওর দেখা তত বেশি পেতাম না কিন্তু দ্বিতীয় বার যখন গেলাম তখন রোজই ওর দেখা পেতাম নির্দিষ্ট সময়ে আর নির্দিষ্ট জায়গাতে। সামনে কতকগুলো কি সব শিকড় বাকড় গাছ গাছড়া আর তাবিজ-কবচ নিয়ে ও বসে থাকত। লোক জমানোর জন্য দু একটা বেশ মজাদার যাদুর খেলা দেখাত ও নিপুণ হাতে। বেশ কিছু লোক জমলেই ও সুরু করত ওর আসল কাজ—ওষুধ আর জড়িবুটি বিক্রি!

একটা ম্যাজিক ও প্রায়ই দেখাত। ম্যাজিকটা হচ্ছে এই রকম। ওর গায়ে থাকত একটা পুরনো বুক খোলা কালো কোট। এই কোটের বাটন হোল (button Hole)-এর দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও বলত,

'বন্ধুগণ, আপনারা দেখুন, আমার এই বোতামের ঘরে কোন ফুল নেই। আমার যাদুর গুণে এখানে এক্ষুণি একটা তাজা গোলাপ এসে যাবে। ওয়ান—টু—থ্রি ......'

'থ্রি' বলার সঙ্গে সঙ্গে ওর বোতামের ঘরে সত্যি সত্যিই একটা তাজা গোলাপ ফুল এসে যেত। ব্যাপার দেখে ওর দর্শকেরা অবাক হয়ে হাততালি দিয়ে উঠতেন।

তোমরাও ইচ্ছে করলে এই মজাদার ম্যাজিকটা দেখিয়ে তোমাদের বন্ধু বান্ধবকে অবাক করতে পার। কায়দাটা শুনে নাও:

এ খেলার জন্য দরকার এক টুকরো শক্ত অথচ সরু কালো সুতো আর ইঞ্চি ছ'য়েক ভাল ইলাস্টিক। একটা গোলাপ-কুঁড়ি নিয়ে তার বোঁটার সঙ্গে শক্ত করে কালো সুতোটা বেঁধে নিয়ে সুতোটাকে সামনের দিক থেকে 'বটন হোলের' ভেতর দিয়ে গলিয়ে দিয়ে এই সুতোর ওমাথায় বাঁধতে হবে ইলাস্টিকটার এক মাথা। এর পরে এই ইলাস্টিকটার অন্য মাথা কোটের কলারের ওপিঠে সেফ-পিনের সাহায্যে এমন ভাবে আটকাতে হবে যাতে এর টানে কালো সুতোর সবটুকু কলারের আড়ালে চলে আসে আর গোলাপ-কুঁড়িটা সেঁটে থাকে 'বটন-হোল'-এর উপরে।

খেলা করবার সময়ে এই গোলাপ-কুঁড়িটাকে হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে থাকলে ইলাস্টিক টান টান হয়ে থাকবে। কালো সুতোটা কালো কোটের উপরে লেপ্টে থাকাতে তা দেখা যাবে না।

এখন ওয়ান-টু-থ্রি বলে মুঠো থেকে কুঁড়িটা ছেড়ে দাও দেখবে কুঁড়িটা আপনা থেকেই ইলাস্টিকের টানে 'বটন-হোল'-এ পৌঁছে যাবে।

বার কতক আচ্ছা মতন প্র্যাকটিস করে নাও তবেই হ'ল।

(আমার নাম পানু, বয়স বারো বছর। বাস থেকে পড়ে গিয়ে আমার শিরদাঁড়া জখম হয়ে গিয়েছে বলে হাঁটতে পারি না, একটা ছোট গাড়ি চড়ে বাড়ির মধ্যে ঘুরে বেড়াই আর তেতলার জানলা দিয়ে চারদিকে দেখি। ভজুদা বলেন—হাঁটতে চেষ্টা কর। এক্সারসাইজ কর্। আমার পোষা বেড়ালের নাম নেপো। ভজুদা সকালে আমাকে তিন ঘণ্টা পড়ান, আমি বাড়িতে বসেই বার্ষিক পরীক্ষা পাশ করেছি।

বড় মাস্টার প্রতি রবিবারে আমাকে গল্প বলতে আসেন। গুপি আমার বন্ধু, সেও গল্প শোনে। তিনি লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা করেছেন, সারা পৃথিবী ঘুরে সাংঘাতিক, রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। ঝড়ের মধ্যে জাহাজডুবি হয়েছিল, হাঙরে একটা পা কামড়ে টেনে নিয়েছিল, এখন কাঠের পা। অগ্নিকাণ্ডে বৌ-এর মুখ পুড়ে গিয়েছিল। এখন সব ছেড়ে ছুড়ে সামান্য টাকায় আমাদের বাড়ির পাশের ছাপাখানার প্রুফ দেখেন আর নাইট স্কুল চালান। তাঁর নতুন এসিস্টাণ্ট তলাপত্র আমাদের বাড়ি এসেছিলেন।

গুপি তার ছোট মামার কাছ থেকে নানা বই আনে, মঙ্গলের মানুষ, চন্দ্রনাথের চন্দ্রযাত্রা—এই সব। আমরা ঠিক করেছি বড় হয়ে চাঁদে যাব। গুপির ছোটমামা মহাকাশ-যান বানাবে। এখন থেকে লোহা পেরেক জমাচ্ছে।

ভজুদাদের কলেজের প্রিন্সিপ্যালের নতুন গাড়ি চুরি হয়ে গেছে মেজকাকুর গাড়িও। আজকাল হরদম গাড়ি চুরি হচ্ছে। কিন্তু এবার বিখ্যাত গোয়েন্দা বিনু তালুকদার তাঁর দলবল নিয়ে আসরে নেমেছেন। মোটর চোরদের ঘাঁটিশুদ্ধ নাকি তাঁরা বের করে দেবেন! কানু সামন্তর মুখে খালি সেই কথা।

কদিন থেকে নেপোকে পাওয়া যাচ্ছে না! গতমাসে এই পাড়া থেকে ছত্রিশটা বেড়াল নিখোঁজ।

বাড়ির পেছনের 'ঠাণ্ডাঘরটা' থেকে দারুন খটখট ঝনঝন আওয়াজ আসছে। ওখানে নাকি স্পেসশিপ

বানাচ্ছে। একদিন ঠাণ্ডাঘরের দেওয়ালের একটা চোঙার মুখ দিয়ে একপাল বেড়াল বেরিয়ে এল, কিন্তু তার মধ্যে নেপো ছিল না।

গভীর রাত্রে বেরিয়ে সেই চোঙার মধ্যে দিয়ে খোঁজ করতে গিয়ে ছোট মামা নিখোঁজ হল। পায়রার পায় বাঁধা চিঠিতে খবর পেয়ে গুপিও গেল। ছোটমাস্টারও সঙ্গে গেলেন। সমস্ত পাড়া অন্ধকার।

গুপির আর্তনাদ শুনে গাড়ি চালিয়ে গিয়ে একটা তক্তা দিয়ে আমাদের বারাণ্ডার সঙ্গে পাশের বাড়ির যোগ করে দিতেই গুপি আর ছোটমামা নেপোকে নিয়ে চলে এল।

মেজকাকুর মুখে বিনু তালুকদারের 'কেল্লা ফতে' করার খবর শুনেই তারা দুজন মূর্চ্ছা গেল। উত্তেজনার চোটে আমি হেঁটে গিয়ে তাক থেকে জলের গেলাস এনে তাদের মাথায় জল ঢাললাম। মা-বাবাও স্তম্ভিত, আমি নিজেও। ডাক্তারবাবু দেখে বললেন যে এবার এক্সারসাইজ করতে করতে এক মাসের মধ্যে আবার পা স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

এদিকে শুনলাম যে 'রিং লিডারদের' সঙ্গে নিয়ে বিনু তালুকদার নাকি আমাদের বাড়ি আসবেন। গুপি আর ছোটমামাকে সাক্ষী দিতে হবে।

তাদের পায়ের শব্দে নেপো পিঠ ফুলিয়ে ফ্যাসফ্যাস করতে লাগল)।

১১

শেষ পর্যন্ত সে রাত্রে আর কিছু শোনা হল না। ডাক্তারবাবু নিশ্চয় আমাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়েছিলেন। হঠাৎ কেমন ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে গুপি আমাকে ঠেলে তুলল। রাতে সে বাড়ি যায় নি। আমার ঘরের কৌচে ঘুমিয়েছিল। অথচ আমি সে বিষয় কিছুই জানি না। ছোটমামার দেখা নেই।

চোখ খুলতেই গুপি আমার হাতে আমার হারানো-খাতা গুঁজে দিল। দুমড়োনো মুচড়োনো আঁচড়ানো কামড়ানো। এই আমার সেই আদি নেপোর বই। পরে গুপি নিয়ে গিয়ে মোড়ের মাথায় দোকান থেকে বাঁধিয়ে দিয়েছে। এতে আমি সমস্ত ব্যাপারটার যতখানি মনে আছে লিখে রেখেছি। যেমন মলাটে 'নেপোর বই' নাম লেখা ছিল, তেমনি আছে। ভেবেছিলাম কেমন বাড়েটাড়ে বাচ্চা বয়স থেকে সব লিখে রাখব। সে আর নানা কারণে হয়ে ওঠে নি। তাছাড়া সব কথা লেখাও যায় না। মচাপাজি।

খাতা পেয়ে অবাক হয়ে উঠে বসে গুপির দিকে তাকালাম। গুপি বলল, 'কাল বড় মাস্টারের ঘর থেকে ছোট মামা ওটাকে উদ্ধার করেছিল। এমনি অবাক হলাম যে পায়ের জোর চলে গেল, খাট থেকে পড়ে গেলাম, নিজেই খচমচ করে উঠে বললাম, 'তা-তার মানে?' খানিকটা তোতলামি এসে গেল। পা জখম হবার পর থেকে একটু তোত্‌লাই। আজকাল প্রায় সেরে গেছে।

গুপি বলল, 'সে অনেক কথা।' বলে মুচকি হাসতে গিয়ে ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে কাঁদতে লাগল। আমি হাঁ করে চেয়ে রইলাম। তারপর বললাম, 'পোড়া বৌ মরেছে বুঝি?' গুপি মাথা নেড়ে বলল, 'পোড়া নয়। বৌ নয়।' 'তবে?' 'ওর দাদা।' আমি বললাম, 'দাদা মরেছে তো তুই কাঁদছিস কেন? তাকে তো চিনিস্‌ও না।'

গুপি বলল, 'মরে নি।' 'তবে কেন কাঁদছিস্?'

'উনি বর্মায় যান নি কখনো, জাহাজডুবি হয় নি, বাঁদরদের দ্বীপ থেকে তাড়ান নি, ডুবো-জাহাজে নেমে সোনা তোলেন নি, বনের দেউয়ের পাহাড়ে ওঠেন নি। ম্যাও নামে বেড়াল ছিল না। সব বানানো কথা।

ওঁর দাদা বলেছে।'

তাই শুনে আমারো কেমন পেট কামড়াতে লাগল।

'তবে কি বৌ রামুডাকাতের মেয়ে নয়?' গুপি বলল, 'না, না, কারো মেয়ে নয়, বৌ-নয়, ও-ই দাদা!' কেমন গোলমাল লাগতে লাগল। 'কার দাদা?'

'বড় মাস্টারের দাদা! মোটর চুরির ব্যবসা ওঁর। ঠাণ্ডা ঘরের মালিক।' তারপর আরো খানিকটা কেঁদে বলল, 'স্পেসশিপ তৈরি হয় না ওখানে! চোরাই গাড়ির চেহারা বদলি করা হয়। বিনু তালুকদার সবাইকে ধরেছে। তাই কাল আর আসতে পারে নি। আজ আসবে, তোর জবানি নেবে।'

আমি বললাম, 'আ—আ—আমি কি—কি—কি—কিসের বিষয় জবানি দে-ব?' গুপি অবাক হয়ে বলল, 'বেড়ালের।' 'কি বেড়ালের জবানি?' 'নেপো বেড়ালের।'

আমি হাঁ করে তাকিয়েই রইলাম। নেপো ঘরে ঢুকে গুপিকে দেখে রেগে গর—র—র গ—র—র করতে লাগল। গুপি দুঃখিত হয়ে বলল, 'এক রকম বলতে গেলে আমিই ওকে বাঁচালাম আর আমার উপর রাগ দেখাচ্ছে দেখ!'

'না, না, তোর উপরে ঠিক নয়। তুই আমার আলোয়ানের উপর বসেছিস্ কি না, ঐখানে ও বসে।' গুপি সরে বসে বলল, 'দাদা অবসর সময় হার্মোনিয়ম বানাত। অনেক জায়গায় নাকি তার খুব চাহিদা। অনেক পয়সা কামাত।'

আমি বললাম. 'কি রকম হার্মোনিয়ম?'

গুপি অবাক হয়ে গেল। 'কেন, বেড়ালের হার্মোনিয়ম নিশ্চয়। নাকি সন্দেশ পড়ে শিখেছিল। খালি ঐ বেড়াল ধরা একটা সমস্যা হয়েছিল। সব বেড়ালের সারে গামার সুর ঠিক থাকে না। সুর ঠিক না হলে লোকে কিনবে কেন। বেসুরো গান কে শুনতে চায়?'

কখন যেন বাবা এসে দাঁড়িয়েছিলেন টের পাই নি। বেজায় আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'বেড়ালের হার্মোনিয়ম আবার কি?' আমি বললাম, 'সেই যে সুবিমল রায় সন্দেশে লিখেছিলেন, কে যেন বানিয়েছিল। কাঠের খোপে বেড়াল বসাতে হয়, তলা দিয়ে ল্যাজ ঝোলে। একেক বেড়ালের একেক সুর হওয়া চাই, সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-সা। ল্যাজ ধরে টানলেই বেড়াল ঐ সুরে ম্যাও ধরে। দিব্যি গানটান বাজানো যায়।'

বাবা বললেন 'পাগল নাকি?' গুপি একটু চটে গেল। 'না কাকা, পাগল নয়। অনেক বেড়াল জোগাড় করতে হত, তাদের সুর ঠিক চিনে গলায় টিকিট ঝোলানো হত। টিকিট তো সবাই দেখেছে। নেপোর গলাতেও ছিল।'

বড় মাস্টার ওর ল্যাজে পা দিতেই ও একেবারে এক টানে সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-সা আ-আ করে চেঁচিয়ে উঠে দে পিট্টান। বাড়ি গিয়ে দাদার কাছে ঐ কথা বললেন। শুনে অবধি দাদা আর বড় মাস্টারকে ছাড়ান দেয়নি। ওটি আমার চাই ডি লুক্স হার্মোনিয়ম বানাব। বড় মাস্টার দাদাকে ঘরে আটকে রাখার জন্যে বেড়াল জোগাড় করে দিতেন। নইলে দাদা কোথায় কি করে বসবে তার ঠিক কি। নাকি সতেরোবার জেল খেটেছে, পৃথিবীর নানান্ দেশে, নানান্ নামে। ঐ ছাদে বেড়ালরা চরত। মাছ আসত ওদের-ই জন্যে। কিন্তু বেশি খেলে গলার সুর খোলে না। তাই খাওয়া কমানো হয়েছিল। ঠাণ্ডা ঘরের চোরাই গাড়ির কারখানায় ওরা থাকত। খাওয়া কমানোতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। অমনোনীতরা ছাড়াই থাকত। তেওয়ারি তাদের গলা সাধত। মহা দৌড়ঝাঁপ করত ওরা। চোঙা খোলা পেয়ে ওরাই নদীর স্রোতের মতো বেরিয়ে এসেছিল। চোঙার বাইরে

থেকে মাছের গন্ধ একটুখানি নাকে ঢুকতে না ঢুকতেই।'

আমি বললাম, 'আর ছোটমামা?' গুপি একটু হাসল। 'ছোট মামাই তো চোঙা দিয়ে কারখানায় ঢুকে, বেড়ালদের খাঁচা আবিষ্কার করে, নিজেই একেবারে থ। ছোটমামা একটা হীরো।'

এই বলে গুপি আরো খানিকটা কেঁদে নিল। আমি বললাম, 'ওরকম করিস্ না। তা হলে আরেকটা দামোদর ড্যালি তৈরি হয়ে যাবে।'

গুপি বলল, 'চাঁদে যাবে না বলছে যে। নাকি বড্ড হাঙ্গামা।' বেজায় রাগ হল। চেঁচিয়ে বললাম 'চাঁদে যাবে না তো করবেটা কি শুনি?'

গুপি বলল, 'পুলিসে চাকরি নেবে।'

'পু-পু-লিসে চাক্‌রি নেবে? সে আবার কি?'

'বিমু তালুকদার ওকে হাত করেছে বুঝলি না। ওকে দিয়ে কাজ হাঁসিল করেছে এখন আর কি ওকে ছাড়ে।'

বাইরের দরজার ঘন্টি পড়ল। বাবা লাফিয়ে উঠে বললেন, 'ঐ যে মিঃ তালুকদারের দল এলেন বোধ হয়।'

সঙ্গে সঙ্গে মেজকাকু, আর কানু সামন্ত, ঘরে ঢুকে ধপাধপ করে একেকটা চেয়ারে বসে কপালের ঘাম মুছতে লাগলেন। মেজকাকু বললেন, 'উঃ, সাধে ওকে লোকে নাম দিয়েছিল গোরিলা ঘোষাল! গায়ে কি জোরটা দেখলে? একবার গা ঝাড়া দেয় তো তোমাদের সব চাইতে জোয়ানো পাঁচ ছয়টা ছিটকে পড়ে! আবার তেজ কত! বুক চাপড়ে বলল,—কি কর্‌বি রে তোরা আমার? বৌ সেজে ঘোমটা দিয়ে সাত বছর কাটালাম, এখন আর আমার ভয় ডর বলে কিছু নেই। দে না পাঁচ বছরের জন্যে জেলে। পায়ের উপর পা দিয়ে তোদের পয়সায় দুবেলা খাব আর আমার হার্মোনিয়মের বইটা এই অবসরে লিখে ফেলব!—চাঁদু এল না; কালকের অত উত্তেজনার ফলে ওর পেটের অসুখ করেছে।'

কানু সামন্ত বললেন, 'কি জানি শেষ পর্যন্ত গাড়ি চুরির কেসটা টিকবে কি না। ওখানে তো ঐ দুটো ভাঙা গাড়ি ছাড়া কিছু পাওয়া গেল না। নাকি গাড়ি সারাবার কারখানা। ও দুটোকে সের দরে কিনেছে। লাইসেন্স নেই বলে লুকিয়ে কাজ করে। এদিকে বেড়ালের হার্মোনিয়ম তৈরি করা কিছু বে-আইনী নয়। ঐ লাইসেন্স নেই বলে যা খানিকটা জরিমানা করা যেতে পারে।'

'বাবা বললেন, সবটা খুলে না বললে ঠিক বুঝতে পারছি না।' কানু সামন্ত বললেন, 'তাও বুঝলেন না? এর মধ্যে দুটো ব্যাপার জড়িত, এক গাড়ি চুরি, দুই বেড়াল চুরি। চোরের সরদার কিন্তু একজন-ই। ঐ যে বললাম গোরিলা ঘোষাল, বড় মাস্টারের দাদা। ঠাণ্ডা ঘরটা একটা ভাঁওতা। ওটা আসলে মোটরের কারখানা। আমাদের বিশ্বাস চোরাই গাড়ির কিন্তু তার কোন প্রমাণ পাচ্ছি না। তাছাড়া হার্মোনিয়মের কাঠের খোল তৈরি হয় ওখানে। তারি ঠক ঠক শোনা যায়। এঁরা তাই শুনে ঐ স্পেসশিপ বানাচ্ছে বলে আহ্লাদে আটখানা!

দেখলাম চমৎকার ব্যবস্থা। ঠাণ্ডাঘরের ছাদে ওঠার সিঁড়ি আছে ভিতরে। ছাদের কোনা দিয়ে নাইলনের দড়ির মই বেয়ে ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে বড় মাস্টারের ঘরে যাওয়া যায়। আবার সেখান থেকে বড় সিঁড়ি দিয়ে ছাপাখানার ভিতরে নামা যায়। নাইট ওয়াচম্যানের ঘরেও ঢোকা যায়। তাড়া খেয়ে গুপিরা তাই করে ছিল। তারপর পানু তক্তা ফেলে দিতেই এবাড়িতে পালিয়ে আসতে পেরেছিল। নইলে গোরিলা ওদের মেরে পাট করে দিত! তার আগে কি হয়েছিল সে-কথা গুপিই ভালো বলতে পারবে।'

গুপি দেখলাম খুব খুসি। হাসতে হাসতে বলল, 'ছোটমামারের সঙ্গে গলি দিয়ে ঢুকে ওমাথায় গিয়ে দেখি ঠাণ্ডাঘরের গায়ের ছোট দরজাটা খোলা, হাওয়ায় দুলছে। ঐখান দিয়ে ঢুকলাম। একটা প্যাসেজ দিয়ে যেতেই কারখানা। লোহালক্কড়, কাঠের ডাঁই, যন্ত্রপাতি। তেলে প্যাচ প্যাচে বিশ্রী জায়গা। একটা নিয়ন বাতি জ্বলছে। কেউ কোথাও নেই। তারপর একটা ফ্যাঁস ফ্যাঁস ফোঁস ফোঁস ম্যাও-ম্যাও মিউ মিউ শুনে দেখি বিরাট এক খাঁচার খোপে খোপে শত শত বেড়াল। এমন সময় কাতর কণ্ঠে কে বলল, 'বাঁচাও।' এ ছোটমামা না হয়ে যায় না। দেখি মস্ত খাঁচার এক ধারে আলাদা খোপে গুঁড়ি মেরে ছোটমামা বসে। ভয়ে আধমরা। চোঙা দিয়ে ওকে নামতে দেখেই কারখানায় যারা কাজ করছিল তারা ভূ—ত ভূ—ত বলে খিড়কি দোর খুলে দে দৌড়। ছোটমামা ঘরটা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেন ছাদ অবধি সিঁড়ি উঠে গেছে।

সিঁড়ি বেয়ে ঠাণ্ডাঘরের ছাদে গিয়ে দেখেন, সামনে নাইলনের মই ঝুলছে। তাই বেয়ে একেবারে বড় মাস্টারের ঘরে, পোড়া বৌয়ের মুখোমুখি। কিন্তু সে পোড়া বৌ নয়। এক হাত ঘোমটা ঝোলা গোঁপ মোটা বেঁটে গোরিলা ঘোষাল হারমোনিয়ম পালিশ করছে। ওকে দেখে সে হুঙ্কার লাগিয়ে উঠল। তারপর এক মিনিটের মধ্যে বগলদাবা করে, স্বচ্ছন্দে দড়ির মই বেয়ে, সিঁড়ি দিয়ে একেবারে ঠাণ্ডা ঘরে। তারপর বেড়ালের খাঁচার অন্য অর্ধেকে পুরে বাইরে থেকে শিকল তুলে, কাষ্ঠ হেসে কোনো কথা না বলে আবার সিঁড়ি বেয়ে অদৃশ্য। সেই ইস্তক ছোটমামা ঐখানে বন্ধ, চ্যাঁচাবারো জো নেই। শব্দ করলেই বেড়ালরা নাকি নখ বার করে। তখন কানু সামন্ত সাত আট জন পুলিশ নিয়ে ঢুকলেন। এসেই আগে খাঁচার দরজা খুলে দিলেন।

কানু সামন্ত খুব হাসতে লাগলেন। 'আর বলেন কেন, দাদা, খাঁচা খুললেও বেরোয় না। টেনে বের করতে হল। তখন আবার কিছুতেই নড়ে না, দ্বিতীয় খাঁচায় নাকি বেঁড়ে ল্যাজের বেড়ালটা-ই নেপো, ওকে না নিয়ে নড়বে না। অগত্যা তাদের সবাইকে ছাড়া হল। তারা আবার আমাদের ঘেঁষে সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠল। তারপর সে যা হৈ-হৈ! গোরিলা ঘোষাল লাঠি হাতে তেড়ে এল। গুপি আর চাঁদু তখুনি দুদ্দাড় দৌড়। পিছন পিছন গোরিলা ছুটল। পানুই শেষটা ওদের বাঁচাল এ আমি বলতে বাধ্য।'

একটু খুসি না হয়ে পারলাম না। কানু সামন্ত বললেন, 'অনেক কষ্টে গোরিলাকে ধরা হল। তারপর তাকে আমাদের ভ্যানে তুলে বড় মাস্টারের খোঁজে ছাপাখানায় গিয়ে দেখি তিনি চোখে ম্যাগনিফাইং চশমা এঁটে প্রুফ দেখছেন। এত সব কাণ্ড হল, তার কিছুই নাকি টের পান নি! বুঝলেন দাদা, ঐ নাইটস্কুলের ছাত্রদের মধ্যে বিনু তালুকদারের চর ছিল। চায়ের দোকানের বুড়ি সেজে ঘুঘু সমাদ্দার খবর সংগ্রহ করে দিত! বিনু তালুকদার একবার ধরলে কাউকে ছাড়ে না! সব প্ল্যান তার-ই।'

এই অবধি বলে কানু সামন্ত হাতঘড়ির দিকে তাকালেন।

এর মধ্যে বিনু তালুকদার কোত্থেকে এল বুঝলাম না।

বাবা আবার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

'মিঃ তালুকদার তো কই এখনো এলেন না?'

'আসবেন, আসবেন। ঐ বড় মাস্টারটিকে নিয়েই হয়েছে মুস্কিল। সব দেখেশুনে মনে হয় দাদার সঙ্গে হ্যাণ্ড-ইন্-গ্লভ যাকে বলে। অথচ বে-আইনী কিছু করেছেন বলে প্রমাণ খুঁজে পাচ্ছি না। এদিকে কি বলছেন জানেন, ওঁর দাদার নাকি একা জেলে কষ্ট হবে, ওঁকে সাকরেদ বলে ধরতে হবে। তা হলে নাকি 'বর্মার জঙ্গলে' নাম দিয়ে অদ্ভুত স্মৃতিকথা লেখার সময় পাবেন।'

মেজকাকুও হেসে কুটোপাটি। 'শোন একবার কথা! লোকটা চব্বিশ পরগণার বাইরে কখনো পা দিলে

দিল না, উনি আবার বর্মার জঙ্গলে লিখবেন !'

ভীষণ রাগ হল। আমি কিছু বলার আগেই গুপি চেঁচিয়ে মেচিয়ে বলতে লাগল, 'কিচ্ছু দরকার নেই বর্মা যাবার। লিখতে হলে যাবার দরকার করে না, লিখবার ক্ষমতা থাকা চাই।—'

ঠিক এই সময় সুড়সুড় করে ছোট-মাস্টার ঘরে ঢুকলেন। তাঁকে দেখেই গুপি রেগে চতুর্ভুজ হয়ে উঠল। 'কাল আমাকে শত্তুরের গর্তে ঠেলে দিয়ে কোথায় কেটে পড়লেন, স্যার ? আমি—'কানু সামন্ত ছুটে এসে গুপির মুখ চেপে ধরে বলল, 'স্-স্-স্ কাকে কি বলছ ! উনিই বিনু তালুকদার, ছোট মাস্টারের ভেক ধরে এমন কি আমার পর্যন্ত চোখে ধুলো দিয়েছিলেন।'

গুপি আমার দিকে তাকাল। আমি গুপির দিকে তাকালাম। তারপর গুপি ছুটে গিয়ে ছোট মাস্টারের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে গড়ে বলল, 'স্যার, আমিও পুলিসে চাকরি করব।'

বিনু তালুকদার ওর পিঠ চাপড়ে, আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'স্পেসশিপের মডেলটা—' আমি বললাম, 'বি-এস্ সি, পাস করে পুলিসে ঢুকব। চাঁদে গিয়ে কাজ নেই। যাওয়া হবেও না।'

'হবে না মানে ? এই হল বলে। তারপর স্পেসশিপেও গুপ্ত গোয়েন্দা রাখা হবে। ওঃ বলতেই ভুলে যাচ্ছিলাম, তোমাদের বড় স্যার রবিবারে এসে তোমাদের গল্প বলবেন। বর্মার সব ভালো ভালো অভিজ্ঞতা মনে পড়েছে ফাটকে বসে বসে। এখন স্নান-খাওয়া করতে বাড়ি গেছেন।'

তখন গুপি আর আমি উঠে গিয়ে খাবার ঘরের দিকে চললাম। সমাপ্ত।

ছোট্ট খুকুর খেলাঘরে

শৈলেন দত্ত

ছোট্ট খুকুর খেলাঘরে টাট্টু ঘোড়া আছে
দম দিলে সে কান ঝাড়া দেয়, ল্যাজ দুলিয়ে নাচে।
তেল চুক্ চুক্ সারাটা গা সাদা এবং কালো
মাথার ওপর পালক গোঁজা, শরীরটা জমকালো।
দম দিলে সে খুকুর সাথে অনেক কথা বলে
ইচ্ছেমত টগবগিয়ে এদিক ওদিক চলে।
ঘুমের খুকু দুপুর বেলা চড়ে তাহার পিঠে
ঘুরে আসে তেপান্তরের নাম-না-জানা ভিটে।
ঘুম ভাঙলে খুকু দেখে টাট্টু ঘোড়া ঠিক
দাঁড়িয়ে আছে আগের মতন যায় নি কোন দিক।

ক্রীড়াজগৎ

অজয় হোম

নতুন খবর হল আমাদের পশ্চিমবঙ্গে খেলাধুলার জন্যে এই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়োগ হল। স্পোর্টস কাউন্সিল সৃষ্টি হলেও কোনও ক্রীড়ামন্ত্রীর পদ ছিল না। এই নতুন রাষ্ট্রমন্ত্রী আশার কথা শুনিয়েছেন। খেলাধুলাকে শহরের মধ্যে আটকে না রেখে গ্রামে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করবেন। গ্রামে খেলাধুলা অবশ্যই আছে কিন্তু সেখানে পরিকল্পনার বড়ো অভাব। সাংগঠনিক কাঠামো প্রায় না থাকার মধ্যে। আমরা আশা করবো তাঁর পরিকল্পনা যেন সুদূরপ্রসারী হয় নচেৎ সুফল ফলবে না!

কলকাতায় বেশ কিছুদিন হল শুরু হয়েছে হকি মরশুম। ক্রিকেট মরশুম শেষ হতে অল্প বাকি। শেষ পর্যায়ের খেলা চলছে। এদিকে ফুটবল খেলোয়াড়দের দলবদলের পালা শুরু হয়ে গেছে। ব্যাঙ্গালোরে জাতীয় ফুটবল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বাংলার দলগঠন হয়ে গেছে।

হকি

কোচিনের এরনাকুলামে জাতীয় হকি খেলা আজ শেষ হল। বাংলার নাম করা খেলোয়াড়রা এতদিন সেখানে ছিলেন। তাই কলকাতার মাঠ তেমন জমে নি। রেলদল ফাইনালে ওঠে বাংলাকে সেমিফাইনালে দুবার হারিয়ে। প্রথমবার ৩-০ গোলে, দ্বিতীয়বার ১-০ গোলে। দ্বিতীয়দিন বাংলা খুব ভালো খেলে। ফাইনালে গতবারের বিজয়ী রেলদলের সঙ্গে পাঞ্জাবের খেলা ১-১ গোলে অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। দ্বিতীয় দিন ঐ খেলার পুনরনুষ্ঠানে বিজয়ী হয় পাঞ্জাব ১-০ গোলে রেলদলকে হারিয়ে।

দুঃখ হয় যখন দেখি হকিতে নাম করা যেতে পারে এমন কোনো বাঙালি খেলোয়াড় নেই। বাংলা থেকে কোনো খেলোয়াড় বার হয় না কেন? ফুটবল ক্রিকেটে বাঙালি খেলোয়াড়দের যতটুকু যোগ্যতা আছে, হকিতে তার কণামাত্র নেই। এর একমাত্র কারণ হকিতে আমাদের উদাসীনতা। ক্রিকেট ও ফুটবল মরশুমের মাঝে কলতাকায় হয় কিছুদিনের হকি খেলা। কর্তাব্যক্তিরা কোনোমতে মরশুম শেষ করার চেষ্টা করেন। অসহ্য গরমের মধ্যে এক মাঠে দুটো করে খেলার ব্যবস্থা। এবছর মরশুম শুরু হল এক মাঠে প্রথম ডিভিসনের দুটি খেলা দিয়ে। শেষের দিকে হবে সকালে বিকালে। যে করে হোক মরশুম শেষ করতে হবে তো! হকির জন্যে না আছে আমাদের কোনো কোচিং সেণ্টার, না আছে কোনো ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা। এমন কি এই যে বাংলা জাতীয় হকি খেলে ফিরল তাও খেলতে গেছে হকি মরশুম আরম্ভ হবার আগেই। খুবই অসুবিধার কথা, এবং বিনা অনুশীলনে ভালো খেলা সেখানে অসম্ভব। অথচ এই মার্চ মাসেই আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা হবে লাহোরে। পাকিস্তানে। ভারত সেখানে অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী।

আমরা মুখেই শুধু হকি বলি। অলিম্পিক হেরে ফিরে আক্ষেপ করি। কেবল বাংলাদেশেই হকির মান নীচু নয়, ভারতের অনেক রাজ্যেই এই হাল একমাত্র পাঞ্জাব ছাড়া। তারাই ঠিক মনপ্রাণ দিয়ে হকিকে গ্রহণ করেছে। আগে দক্ষিণ ভারত থেকেও কিছু গুণী খেলোয়াড় তৈরী হতো। এখন তাও হয় না। হকিকে জনপ্রিয় করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা এবং উঠতি খেলোয়াড়দের উৎসাহিত না করলে হকির হারানো গৌরব ফিরে আসবে না। লাহোরে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারত যদি বিজয়ী হয়ও তবু মেকসিকো অলিম্পিকে সোনারূপো হারিয়ে তৃতীয় শক্তির দল হিসেবে যে কলঙ্ক ছাপ পড়েছে তা মুছবে না হেরে ফিরলে যেটুকু সুনাম আছে তাও তলিয়ে যাবে। সুতরাং নির্বাচক মণ্ডলীর সতর্কতার প্রয়োজন আছে। দলগড়ার ব্যাপারে কোনদিক থেকে কোনোরকম প্রভাব বিস্তার না হতে পারে সেটাই আমাদের কাম্য।

ক্রিকেট

বোম্বাইতে বাংলা খেলতে গিয়েছিল পাঁচ দিনের রঞ্জিট্রফির ফাইনাল। বোম্বাই এবারও জিতেছে। এই নিয়ে তারা ২০ বার এবং পর পর ১১বার এই ট্রফি ঘরে তুলল। এই খেলার শেষে ভারতের মিডিয়ম ফাস্ট বোলার খুদে দৈত্য আর বি দেশাই—রমাকান্ত ভিখাজি দেশাই—২৯ বছর বয়সেই প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন।

খেলার দ্বিতীয় দিনে বাংলা ৩৮৭ রানে ইনিংস শেষ করাতে আমাদের মনে আশা জেগেছিল শিকে বুঝি ছিঁড়ল! কারণ, এই রান সংখ্যাই বোম্বাইয়ের বিরুদ্ধে রঞ্জি ট্রফিতে বাংলার সর্বোচ্চ রান চুনি গোস্বামী (৯৬), দেবু মিত্র (৬১) এবং সুব্রত গুহ (৬২) ও গোপাল বসুর (৪০) সপ্তম উইকেটের জুটিতে এই রান সংখ্যায় পৌঁছানো সম্ভবপর হয়। আশা আরও হয়েছিল বাংলার বোলিং বোম্বাই অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী বলে। মহীশূরের বিরুদ্ধে বাংলার বোলাররা যে নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন তাতে আশা করাটা বিন্দুমাত্র অন্যায় হয় নি।

ইংরাজিতে একটা কথা আছে— 'হু মিস দি ক্যাচ, মিস দি ম্যাচ'—সেটা যে কত বড়ো সত্যি কথা তা প্রমাণ হল এই ফাইনাল খেলায়। তৃতীয় দিনের গোড়ায় বোম্বাইয়ের রানসংখ্যা তখন ১ উইকেট ৫৩। ওয়াদেকার ব্যাট করছেন। গালিতে ফিল্ডিং করছেন পরিবর্ত (সাবস্টিটিউট) খেলোয়াড় জলি সরকার। ওয়াদেকার ক্যাচ তুললেন কিন্তু সেই সহজ ক্যাচটি জলি সরকার ধরতে পারলেন না। সুতরাং খেলার মোড় ঘুরল না। বোম্বায়ের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটল না। বাংলার জয়ের আশা আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। ওয়াকেদার ১৩৩ রান করে থামলেন এবং দলকে জয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। শুধু ওয়াদেকার নয় ভোসলে গোপাল বসুর বলে তাঁর নিজের হাতে এবং সোলকার দোসীর বলে সুব্রতর হাতে ক্যাচ দিয়ে নবজীবন লাভ করেন। এত ক্যাচ ফেলে কি ম্যাচ জেতা সম্ভব?

আমরা ফিল্ডিং অনুশীলন করি না। নেটে শুধু ব্যাটিং ও বোলিংই প্র্যাকটিস করি। তাই ম্যাচে ক্যাচ হরদম ফেলি। সুদক্ষ কোচের তত্ত্বাবধানে ফিল্ডিং অনুশীলনের ব্যবস্থা না করলে রঞ্জি ট্রফি ঘরে তোলা স্বপ্নই থেকে যাবে।

হাবুলদা একটা ছয় !

সম্প্রতি ৭৫ বছর বয়সে পরলোক গমন করলেন ক্রিকেট ও ফুটবল খেলোয়াড় নির্মলকুমার মিত্র। ভালো নামে তাঁকে বিশেষ কেউ চিনতো না। কুমারটুলীর হাবুল মিত্র হাবলা মিত্তির বা এন মিত্র বললে চোখের উপর ভেসে উঠত লম্বা চওড়া এক বলিষ্ঠ নির্ভীক মূর্তি। তিনি ১৯২০ সালে আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে ব্ল্যাকওয়াচের বিপক্ষে খেলেছিলেন। ১৯২৬ সালে এম সি সির আর্থার গিলিগানের টিমের বিরুদ্ধে এক দিনের এক খেলায় ইডেনে সবচেয়ে বেশি রান করেছিলেন। সেই খেলায় মিডিয়ম-ফাস্ট বোলার মরিস টেটকে স্কোয়ারকাট মেরে প্যাভিলিয়নের পাশে টালির ছাউনিতে ফেলে ওভার বাউণ্ডারি করেন। তাঁর খেলা দেখেছি। অনেক অর্ধশত ও সেঞ্চুরি দেখেছি। যত জোরে বল তত জোরে মার। সাহেব দল হলে তাঁর মারের বহর যেন বেড়ে যেত। তিনি মাঠে নামলে সব ফিল্ডসম্যানেরা রোপের ধারে না হলে স্ক্রিনের দুপাশে গিয়ে দাঁড়াতো। তিনি সোজা স্ক্রিনের উপর দিয়ে না হয় ফিলডারদের মাথার উপর দিয়ে বল পাঠাতেন। খেলাটা হয়তো পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত ছিল না, কিন্তু ইডেনে ব্যাট নাচিয়ে তৎকালীন কলকাতার বাঘা বাঘা সাহেব বোলারদের বল স্ক্রিনের উপর দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া আজও চোখের উপর ভাসছে। দূরে অর্থাৎ লং বা কানট্রিতে ফিল্ডিং করতেন। তাঁর হাতে ক্যাচ ফসকাতে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। আজকাল এরকম মারনেওয়ালা খেলোয়াড় দেখতে পাই না। তোমরাও দেখতে পেলে খুশি হতে। তিনি মাঠে নামলেই দর্শকরা চিৎকার করে উঠতো, 'হাবুলদা একটা ছয়'। তিনি দর্শকদের খুশি করতেন। আর ওই অযথা ঝুঁকি নিয়ে ছয় মারতে গিয়ে আউটও হতেন অনেক সময় কিন্তু দর্শকদের বিমুখ করতে কখনও দেখি নি।

(প্রোফেসার শঙ্কুর ডায়রি থেকে—বোলিভিয়ার কোচাবাম্বা শহর থেকে ১৫০ মাইল দূরে ভূমিকম্পের ফলে একটা পাহাড়ে গুহা আবিষ্কৃত হয় এবং তার মধ্যে প্রাচীন মানুষের আঁকা ছবি পাওয়া যায়। আমার বন্ধু প্রোফেসর ডামবার্টনের নিমন্ত্রণে এসেছি, সেই বিষয়ে অনুসন্ধান করতে। স্থানীয় প্রোফেসর কর্ডোবার সতর্কবাণী অগ্রাহ্য করে গুহায় ঢুকে আমরা আশ্চর্য সুন্দর এবং উজ্জ্বল ছবি ও নকশা দেখেছি। অনেক প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের ছবি আছে। ড্রাইভার পেড্রোকে গুহার বাইরে পাহারায় রেখে এসেছিলাম। আর্ত চিৎকার শুনে বাইরে এসে তার মৃতদেহ চোখে পড়ল। পাশেই একটা বিশাল কাঁটার মতন পড়ে আছে—যেটা কোন ধাতুর তৈরি নয়! তবে কি?—)

(২)

পেড্রোর মৃতদেহ তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে, তার বৃদ্ধ বাবাকে সান্ত্বনা ও কিছু টাকাকড়ি দিয়ে হোটেলে যখন ফিরেছি তখন টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। ঘড়িতে তখন বেজেছে সাতটা।

হোটেলে ঢুকে দেখি সামনেই একটা সোফায় বসে রয়েছেন প্রফেসার কর্ডোবা। আমাদের দেখেই ভদ্রলোক বেশ ব্যস্ত ভাবে উঠে এগিয়ে এলেন।

'যাক্, তোমরা তাহলে ফিরেছ !'

ডামবার্টন বলল, 'ফিরেছি, তবে সকলে না।'

'তার মানে ?'

শুনতে শুনতে কর্ডোবার চোখে মুখে একটা অদ্ভুত ভাব জেগে উঠল, যার মধ্যে আক্ষেপের চেয়ে উল্লাসের মাত্রাটা অনেক বেশি। চাপা উত্তেজনার সঙ্গে সে বলল, 'আমার কথা বোধ হয় তোমরা বিশ্বাস করনি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছ ত ? আমি জানি ও জঙ্গলে সব অদ্ভুত জানোয়ার রয়েছে, যা পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। আর আমি জানি গুহার ছবি সম্পর্কে তোমাদের ধারণা ভুল। ওখানে ইন্‌কা জাতীয় কোন সভ্য লোক বাস করত, আর সেও খুব বেশি দিন আগে নয়। ছবির জানোয়ারগুলো দেখেই ত তোমরা গুহার বয়স অনুমান করছিলে ? কিন্তু এখন বুঝতেই পারছ, ওর মধ্যে অদ্ভুত এক ধরনের জানোয়ার এখনো আছে, লোপ পেয়ে যায় নি। কাজেই আমার অনুমান ঠিক। তোমাদের ভালোর জন্যেই বলছি, এ গুহায় তোমরা আর বৃথা সময় নষ্ট কোর না।

কর্ডোবা কথাগুলো বলে হন হন করে হোটেল থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

ডামবার্টন বলল, 'ভয় করছে, ও নিজে একা বাহাদুরী নেবার জন্য ফস্ করে না খবরের কাগজে কিছু বারটার করে বসে। এখনো কিছুই পরিষ্কার ভাবে জানা যায় নি, অথচ ও আমাদের টেক্কা দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

আমি বললাম, 'তাও ত জানেনা যে গুহার ভিতরে আমরা খুট্‌খুট শব্দ শুনেছি। তাহলে ত ও বলে বসত যে এখনও গুহার মধ্যে লোক বাস করছে—ছবিগুলো পঞ্চাশ হাজার নয়, পাঁচ বছর আগে আঁকা।'

আমরা রীতিমত ক্লান্ত বোধ করছিলাম—তাই চট্‌পট্ যে যার ঘরে চলে গেলাম। বৃষ্টিটা বেশ জোরেই নেমেছে, তার সঙ্গে মাঝে মাঝে মেঘের গর্জন আর বিদ্যুতের চমক। গরম জলে স্নান করে, পর পর দুকাপ কফি (এখানকার কফি ভারি চমৎকার) খেয়ে ক্রমে শরীর ও মনের জোর ফিরে এলো। ডিনারও ঘরেই আনিয়ে খেলাম। তারপর বসলাম আমার তোলা ছবিগুলো নিয়ে। উদ্দেশ্য হিজিবিজিগুলোর রহস্য উদ্ঘাটন করা। অপরিচিত অক্ষরের মানে বার করতে আমার জুড়ি কমই আছে। হারাপ্পা আর মোহেঞ্জোদারোর লেখার মানে পৃথিবীতে আমিই প্রথম বার করি।

দেড় ঘণ্টা ধরে হিজিবিজিগুলো পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়ে একটা জিনিস আবিষ্কার করলাম, যেটা তৎক্ষনাৎ ডামবার্টনকে ফোন করে জানালাম চিহ্নগুলো সবই বৈজ্ঞানিক ফরমুলা, আর তার সঙ্গে আমাদের আধুনিক যুগের অনেক ফরমুলার মিল আছে।

ডামবার্টন পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার ঘরে চলে এসে আমার কথা শুনে ধপ করে খাটের উপর বসে পড়ে বলল, 'দিস্ ইজ টু মাচ ! সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে শ্যাঙ্কস্। এ ফরমুলা পঞ্চাশ হাজার বছর আগের বনমানুষে বার করেছে, এটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না।'

আমি বললাম, 'তাহলে ?'

'তাহলে আর কী! তাহলে ইতিহাস আবার নতুন করে লিখতে হয়! আদিম মানুষ সম্বন্ধে আজ অবধি যা কিছু জানা গেছে, তার কোনটাই এই অঙ্কের ব্যাপারের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায় না।

পেড্রোর মৃতদেহের কাছেই যে কাঁটার মত জিনিসটা পাওয়া গিয়েছিল সেটা আমার ঘরে নিয়ে এসেছিলাম। ডামবার্টন অন্যমনস্কভাবে সেটা হাতে তুলে নিয়েছিল। হঠাৎ ও সেটা নাকের সামনে ধরে তার গন্ধ শুঁকতে লাগল।

'শ্যাঙ্কস্!'

ডামবার্টনের চোখ জ্বলজ্বল করছে।

'শুঁকে দেখ।'

আমি কাঁটাটা হাতে নিয়ে নাকে লাগাতেই একটা চেনা-চেনা গন্ধ পেলাম। বললাম, 'প্লাস্টিক।'

ঠিক! কোন সন্দেহ নেই। খুব চতুর কারিগরি—কিন্তু এটা মানুষের হাতেই তৈরী। এটার সঙ্গে কোন জানোয়ারের কোন সম্পর্ক নেই।

'কিন্তু এর মানে কী?'

প্রশ্নটা করা মাত্রই এর অনেক গুলো উত্তর এক ঝলকে আমার মনের মধ্যে খেলে গেল! বললাম, 'ব্যাপার গুরুতর। প্রথম—পেড্রো কোন জানোয়ারের ভয়ে মরেনি। তাকে মানুষ মেরেছে! খুন করেছে। তার মানে একটাই হতে পারে—যে খুন করেছে সে চাইছেনা যে আমরা গুহার কাছে যাই। আততায়ী যে কে, সেটা বোধহয় স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।'

'হুঁ!'

ডামবার্টন খাট থেকে উঠে পায়চারি শুরু করল! তারপর বলল, 'আমাদের এখানে টিকতে দেবে মনে হয় না।'

'কিন্তু এইভাবে হার মানব?' আমার বৈজ্ঞানিক মনে বিদ্রোহের ভাব জেগে উঠেছিল। ডামবার্টন বলল, 'একটা কাজ করা যায়।'

'কী?'

কর্ডোবাকে বলি, ক্রেডিট নেবার ব্যাপারে আমাদের কোন লোভ নেই! আসলে যেটা দরকার, সেটা হল এই আশ্চর্য গুহার তথ্যগুলো পৃথিবীর লোককে নির্ভুলভাবে জানানো। সুতরাং কর্ডোবা আমাদের সঙ্গে আসুক। আমরা একসঙ্গে অভিযান চালাই। তার অনুমানে যদি ভুল হয়, তবু তার নামটা আমাদের সঙ্গেই জড়ানো থাকবে। লোকের চোখে আমরা হব একটা team। কী মনে হয়?'

'কিন্তু খুনীকে এইভাবে দলে টানবে?'

'খুনের প্রমাণ ত নেই। অথচ এটা না করলে সে আমাদের কাজে নানান বাধার সৃষ্টি করবে। আমাদের কাজ শেষ হোক। তারপর ওর মুখোস খুলে দেওয়া যাবে। এখন কিছু বলবনা এমন কি, আমরা যে বুঝতে পেরেছি কাঁটাটা প্লাস্টিকের, সেটাও বলবনা। ওকে বুঝতে দেবো আমরা ওর বন্ধু।'

'বেশ, তাই ভালো।'

কর্ডোবাকে ফোন করে পাওয়া গেল না। এমন কি, তার বাড়ির লোকেও জানেনা সে কোথায় গেছে। ঠিক করলাম কাল সকালে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করব। আমাদের এসব কাজ ব্যর্থ যেন না হয় তার জন্য যা কিছু দরকার করতে হবে।

ভয় হচ্ছে আকাশের অবস্থা দেখে। কালও যদি এমন থাকে তাহলে আর বেরোন হবে না। তবে ছবি রয়েছে প্রায় আড়াইশ। সে গুলো ভালো করে দেখেই সারাদিন কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

২০শে আগস্ট

যা ভয় পেয়েছিলাম তাই হল। আজ সারাদিন হোটেলের ঘরে বসেই কাটাতে হল। এখন রাত সাড়ে দশটা এতক্ষণে বৃষ্টি একটু ধরেছে।

তবে ঘরে বসেও ঘটনার কোন অভাব ঘটেনি। প্রথমত আজও সারাদিন কর্ডোবার কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি অনেকবার টেলিফোন করা হয়েছে। ওর বাড়ির লোক দেখলাম বেশ চিন্তিত। পাগলামোর বশে বেরিয়ে গিয়ে ভূমিকম্পের ফলে রাস্তায় যেসব ফাটল হয়েছে, তার একটায় হয়ত পড়ে টড়ে গেছে—এই তাদের আশঙ্কা।

এদিকে ডামবার্টনের মাথায় আরেকটা আশ্চর্য ধারণা জন্মিয়েছে। দুপুরবেলা হন্তদন্ত হয়ে আমার ঘরে এসে বসল, 'সর্বনাশ!'

আমি বললাম 'আবার কী হল?'

ডামবার্টন সোফাতে বসে বলল, 'এটা তোমার মাথায় ঢুকেছে কি, যে দেয়ালের ওই সব সাংকেতিক ফরমুলাগুলো সব আসলে কর্ডোবার লেখা? ধর যদি ছবির পাশে ওই হিজিবিজি গুলো লিখে সে প্রমাণ করতে চায় সে গুহাবাসী লোকেরা কি ভাবে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিল? এমন একটা জিনিস যদি সে প্রমাণ করতে পারে, তাহলে তার খ্যাতিটা কেমন হবে তা বুঝতে পারছ?'

'সাবাস বলেছ!'

সত্যিই, ডামবার্টনের চিন্তাশক্তির তারিফ না করে পারলাম না। ডামবার্টন বলে চলল, 'কী শয়তানী বুদ্ধি লোকটার ভাবতে পার? আমি এখানে এসে পৌঁছাবার প্রায় দশদিন আগে গুহাটা আবিষ্কার হয়েছিল। কর্ডোবা তখন সময় পেয়েছে গুহাকে নিজের মত করে সাজানোর জন্য। ওইসব পাথরের যন্ত্রপাতি ও-ই তৈরী করিয়েছে—যেমন প্লাস্টিকের কাঁটাটা করিয়েছে।'

আমি বললাম, 'ফরমুলাগুলোর পিছনে বোধ হয় মিথ্যাই সময় নষ্ট করলাম। কিন্তু—' আমার মনে হঠাৎ একটা খটকা লাগল—'গুহার ভিতরে খুট্ খুট্ শব্দটা কোত্থেকে আসছিল?'

'সেটাও যে কর্ডোবা নয় তা কী করে জানলে? ও যদি পেড্রোকে খুন করে থাকে, তাহলে ও সেদিন গুহার আশে পাশেই ছিল। হয়ত গুহার আরেক মুখ আবিষ্কার করেছে। সেখানে গিয়ে ঢুকে আমাদের ভয়টয় দেখানোর জন্য শব্দটা করছিল।'

'কিন্তু এই সব করে ও অন্তত আমাকে হটাতে পারবেনা।'

ডামবার্টন বলল, 'আমাকেও না। কাল যদি বৃষ্টি থামে তাহলে আমরা আবার যাবো।'

'আলবৎ! আমার অ্যানিস্থিয়ান বন্দুকের কথাও আর ও জানে না।'

ডামবার্টন চলে গেলে পর বসে বসে ভাবতে লাগলাম। কর্ডোবা যদি সত্যিই এত সব কাণ্ড করে থাকে, তাহলে বলতে হয় ওর মত কূটবুদ্ধি শয়তান বৈজ্ঞানিক আর নেই। সত্যি বলতে কি, ওকে বৈজ্ঞানিক বলতে আর আমার ইচ্ছা করছেনা।

কাল যদি গুহার আরো ভিতরে গিয়ে আর নতুন কিছু পাওয়া না যায়। তাহলে আর এখানে থেকে লাভ নাই। আমি দেশে ফিরে যাবো। গিরিডিতে অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। আর বেড়াল নিউটনের জন্যেও মন কেমন করছে।

২২শে আগস্ট

মানুষের মনের ভাণ্ডারে যে কত কোটি কোটি স্মৃতি জমে থাকে, তার হিসাব কেউ কোনদিন করতে পারেনি। আর কীভাবে ব্রেনের ঠিক কোন খানে সেগুলো জমা থাকে, তাও কেউ জানে না। শুধু এই টুকুই আমরা জানি যে, যেমনি বহুকালের পুরোন কথাও হঠাৎ হঠাৎ কারণে অকারণে আমাদের মনে পড়ে যায়, তেমনি কোন কোন ঘটনা একেবারে চিরকালের মত মন থেকে মুছে যায়। আর তেমনি আবার এক একটা ঘটনা থাকে সেগুলো কোনদিন ও ভোলা যায় না। একটু চুপ করে বসে থাকলেই দশ বছর পরেও এসব ঘটনা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তার উপর সে ঘটনা যদি কালকের মত সাংঘাতিক হয়, তাহলে সেটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরে একটা শিহরণ অনুভব করা যায়। আমি যে এখনো বেঁচে আছি সেটাই আশ্চর্য, আর কোন্ অদৃশ্য শক্তি যে আমাকে বার বার এভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচায় তাও জানি না।

কাল ডায়রি লেখা হয়নি, তাই সকাল থেকেই শুরু করি।

বৃষ্টি পরশু মাঝরাত থেকেই থেমে গিয়েছিল। আমাদের জীপ তৈরী ছিল ঠিক সময়ে। আমি আর ডামবার্টন ভোর ছটায় হোটেল থেকে বেরোই। আমাদের জীপের ড্রাইভারের নাম মিগুয়েল, সেও জাতে স্প্যানিশ। গাড়ী রওনা হবার কিছু পরেই মিগুয়েল বলল, কর্ডোবার নাকি এখনো পর্যন্ত কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। শুধু এই টুকু জানা গেছে যে হেঁটে বেরোয়নি। জীপ নিয়ে বেরিয়েছে। আমরা প্রমাদ গুণলাম তাহলে কি আবার সে গুহার দিকেই গেছে নাকি? গতকালই গেছে? এই বৃষ্টির মধ্যে?

সাড়ে তিন ঘণ্টা পর আমাদের প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। কর্ডোবার জীপ পাহাড়ের ফাটলের সামনে গুহার রাস্তার মুখটাতেই দাঁড়িয়ে আছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে জীপটার ওপর দিয়ে প্রচুর ঝড় ঝপ্টা গেছে। ড্রাইভার বোধহয় কর্ডোবার সঙ্গেই গেছে, কারণ গাড়ি খালি পড়ে আছে।

আমরা আর অপেক্ষা না করে রওনা দিলাম। মিগুয়েল বলল, 'বাবু, আপনারা যাবেন, এটা আমার একদম ভালো লাগছে না। আমি যেতাম আপনাদের সঙ্গে, কিন্তু কাল পেড্রোর যা হল, তারপরে মনে বড় ভয় ঢুকেছে। আমার বাড়িতে তো ছেলে রয়েছে!'

আমরা দুজনেই বললাম 'তোমার কোন প্রয়োজন নেই; কোন ভয়ও নেই। যদি বিপদের

আশঙ্কা দেখ, তাহলে আমাদের জন্য অপেক্ষা না করে চলে যেও। তবে বিপদ কিছু হবে বলে মনে হয় না। আর দুষ্টু লোককে শায়েস্তা করার অস্ত্র আমাদের কাছে আছে।'

গুহার মুখে পৌঁছে চারদিকে জনমানবের কোন চিহ্ন দেখতে পেলাম না। অন্যদিনের মতই সব নিঝুম, নিস্তব্ধ। জমিটা পাথুরে ও জঙ্গলের দিকে ঢালু হয়ে গেছে বলে রাত্রের বৃষ্টির ফলে জল দাঁড়ায়নি এখানে। বৃষ্টি যে হয়েছে সেটা প্রায় বোঝা যায়না।

কর্ডোবা কি তাহলে গুহার ভিতরেই রয়েছে, না জঙ্গলের দিকে গেছে?

ডামবার্টন বলল, 'বাইরে অপেক্ষা করে কি কিছু লাভ আছে?'

আমি 'না' বলে গুহার দিকে কয়েক পা এগোতেই, গুহার মুখের ডান পাশে বাইরের পাথরের গায়ে একটা ফাটলের ভিতর একটা সাদা জিনিস দেখতে পেলাম। এগিয়ে হাত ঢুকিয়ে দেখি সেটা একটা ভাঁজ করা চিঠি—কর্ডোবার লেখা। ভাঁজ খুলে দুজনে একসঙ্গে সেটা পড়লাম। তাতে লেখা আছে—

প্রিয় প্রোফেসর ডামবার্টন ও প্রোফেসর শঙ্কু, তোমরা আবার এখানে আসবে তা জানি। এ চিঠি তোমাদের হাতে পড়া মাত্রই বুঝবে আমার কোন বিপদ হয়েছে, আমি গুহায় আটকা পড়েছি। সুতরাং তোমরা ঢোকার আগে কাজটা ঠিক করছ কিনা সেটা একটু ভেবে নিও। আমি মরলেও, গুহার রহস্য ভেদ করেই মরব, কিন্তু লোকের কাছে সে রহস্যর সন্ধান দিতে পারবনা। তোমরা যদি বেঁচে থাক, তাহলে এই গুহার কথা তোমরা প্রকাশ করতে পারবে। আমার একান্ত অনুরোধ যে তোমাদের সঙ্গে যেন আমার নামটাও জড়িয়ে থাকে।

পেত্রোর মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ি সেটা হয়ত বুঝতে পেরেছ। কাঁটাটা আমারই ল্যাবরেটারিতে তৈরী। তবে জঙ্গলে পায়ের দাগ আমি সত্যিই দেখেছিলাম সুতরাং ও ব্যাপারে তোমরা নিশ্চিন্ত হলে সাংঘাতিক ভুল করবে।

জানি, ঈশ্বর তোমাদের রক্ষা করবেন। তোমরাত আর আমার মত পাপী নও। ইতি—

পোরফিরিও কর্ডোবা

ক্রমশঃ

দুই শেয়াল

গৌরী ধর্মপাল (চৌধুরী)

এক বনের মধ্যে পাশাপাশি দুই গর্তে দুই শেয়াল থাকত। একজনের নাম একশেয়াল, আর একজনের নাম খ্যাঁকশেয়াল।

একদিন একশেয়াল খ্যাঁকশেয়ালকে বললে—দাদা, এ বনের চৌহদ্দি কত তুমি, জানো।

খ্যাঁকশেয়াল বললে, তা আর জানি না? তোর পায়ের একশ পা চওড়া আর আমার পায়ের একশ পা লম্বা—এই হল এ বনের চৌহদ্দি। একেবারে পাকা হিসেব।

একশেয়াল বললে, আর বনে কতগুলো গাছ আছে, দাদা, গুনে দেখেছ?

খ্যাঁকশেয়াল বললে, তা আর গুনি নি? তাহলে মাঝে মাঝে যে একা একা ইদিক বিদিক ঘুরে বেড়াই, সে কিসের জন্যে? শোন্, তোর গায়ে যতগুলো লোম' ততগুলো গাছ। একটা কম না একটা বেশি না।

এক শেয়াল বললে, দাদা, লোম যদি খসে?

—তাহলে বুঝবি, একটা গাছ খসল।

—আর লোম যদি গজায়?

—তাহলে বুঝবি গাছ গজালো। একেবারে পাকা হিসেব। এদিক ওদিক হবার যো নেই।

একদিন এক শেয়ার আর খ্যাঁকশেয়াল গর্তে ঘুমিয়ে আছে, আর বনে তো আগুন লেগেছে। তখন খ্যাঁকশেয়াল তাড়াতাড়ি একশেয়ালকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে বলছে--ওরে আগুন আগুন। পালা পালা পালা।

বনের গাছপালা পুড়ছে, একশেয়াল খ্যাঁকশেয়াল দৌড়চ্ছে, আর থেকে থেকে থমকে থেমে একশেয়াল বলছে, দাদা, একশ ছেড়ে দুশ হল, তিন-চার পাঁচ সাতশ হল, বন তো কই ফুরোল না? খ্যাঁকশেয়াল বলছে, ফুরোবে বাবা ফুরোবে, তুই দৌড়ো না। কুড়োতে কুড়োতে বুড়োয়, দৌড়তে দৌড়তে ফুরোয়।

একশেয়াল আবার দৌড়চ্ছে, আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলছে।

বন তো সাবাড় — লোম তো দাদা খসছে না?
গাছ তো কাবার — হিসেব তো কই মিলছে না?

তখন খ্যাঁকশেয়াল বলবে, ওরে পাগলা দেখছিস না,

জ্বলছে আগুন লকলকিয়ে, হিসেব পুড়ে ছাই,
ভাবনা ছেড়ে দৌড়ে আগে প্রাণ বাঁচা না ভাই।

তখন একশেয়াল বললে, সত্যি আমি কি বোকা।
খ্যাঁকশেয়াল বললে, সে কথা অ্যাদ্দিনে বুঝলি?
তারপর দুজনে মিলে দৌড় দৌড় দৌড়!

॥ হবুচন্দ্র রাজা ও গবুচন্দ্র মন্ত্রী ॥

—মহম্মদ কামাল হোসেন বয়স-১৩. সভ্য সংখ্যা-১৩৬০

প্রাতঃস্মরণীয় হবু রাজা ও গবু মন্ত্রীর দেশেই বাস করত মোহিতলাল। হবু রাজার দেশটাও নেহাৎ ছোট নয়, আর তাই মোহিতলালের জমি জায়গারও অভাব ছিল না। যে বৎসরের কথা বলছি সেবার মোহিতলালের বাগানে কাশ্মীর থেকে চারা আনা আপেল গাছে প্রথম ফল ধরেছে। ইয়া বড় সব লাল লাল দেখতেই সে এক! আর হবুরাজার দেশে মাটিরও একটা গুণ আছে। ফলগুলো দেখে মোহিতলাল ভাবল, হাজার হোক গাছের প্রথম ফল। রাজাকে দেওয়া উচিত। আর কে না জানে, যে হবু রাজার আশীর্বাদেই প্রজাদের এত সুখ। এরপর সে করল কি, এক ঝুড়ি আপেল পাড়ল। তারপর ঝুড়ির ওপরটা একটা লাল রঙের ঝকমকে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাজসভার দিকে চলল।

হবু রাজার কীর্তিকলাপই আলাদা। বেলা চৌদ্দ প্রহরে ঘুম থেকে উঠলেন। তারপর আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বললেন, 'এ্যাও'। ব্যাস তক্ষুণি সিপাই সান্ত্রীর দল যো হুকুম বলে সামনে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর চলল গোঁফে তেল মর্দন। দুজন পালোয়ান মিলে এই কাজ সমাধার পর স্নান করতে গেলেন। স্নান করে এসে টেরি ছেঁটে, রাজকীয় পোশাক আশাক পরে খাওয়া দাওয়া শেষ করলেন। খাওয়া-দাওয়াও এক এলাহি ব্যাপার। যাক সব কাজ শেষ করে হাতীর ওপর চেপে রাজসভা অভিমুখে যাত্রা করলেন।

হবু রাজার রাজসভা জমজমাট। পাত্র মিত্র সব আছে। রঙবেরঙের ঝালরে ঝিলিক মারছে। এমন সময় বাইরে হৈ চৈ শোনা গেল। নকিবদার হাঁকল—শ্রীশ্রীশ্রীলশ্রী যুক্ত রাজন হবুচন্দ্র মহামান্যবর ভূস্বামী বাহাদুর। হবু রাজা সভাগৃহে প্রবেশ করে আসন গ্রহণ করে হাঁপ ছাড়লেন। পাত্র মিত্রগণও এতক্ষণে বসতে পেয়ে হাঁপ ছাড়ল। মোহিতলালও হাঁপাতে হাঁপাতে সভাগৃহে প্রবেশ করে হাঁপ ছাড়ল, মোটমাট সে এক হাঁপাহাপি ব্যাপার।

হবু রাজা মোহিতলালকে দেখে তার এহেন সময়ে আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করলেন। মোহিতলাল আপেলের ঝুড়িটা তাঁর পায়ের তলায় রাখল। হবু রাজা একটা আপেল তুলে নিয়ে এক কামড় দিলেন। তারপর আর একটা আপেল গবু মন্ত্রীকে দিলেন। গবু মন্ত্রী খেলেন। হবু রাজা জিজ্ঞাসা করলেন কেমন লাগল? গবু মন্ত্রী বলল 'রাজনের ইচ্ছা অনুযায়ী।' হবু রাজা খুসি হলেন। ডাকলেন 'খাজাঞ্চি'—খাজাঞ্চি বলল —যো হুকুম। হবু রাজা বললেন—এই লোকটা আমাদের আপেল খাইয়ে আনন্দ দিয়েছে। এক্ষুণি একে একশো স্বর্ণ মুদ্রা দাও! মোহিতলাল একশো স্বর্ণ মুদ্রা পেয়ে আনন্দে লাফাতে লাফাতে বাড়ি গেল।

সেবার মোহিতলালের বাগানে বিরাট কাঁঠাল হয়েছে। গন্ধে চারিদিক ভরপুর। মোহিতলাল ভাবল এই কাঁঠাল যদি সে রাজার সামনে হাজির করে তবে রাজা না জানি কত খুসিই হবেন। আর আর চাই কি খুসির চোটে তিনি হাজার স্বর্ণ মুদ্রা দিতেও কসুর করবেন না।

তারপরের দিন, সেই আগেকার মতো একটা বিরাট পাকা কাঁঠাল মাথায় করে নিয়ে চলল। রাজসভায় প্রবেশ করে কাঁঠালটা হবু রাজার পায়ের কাছে রাখল। এদিকে হবুরাজার মনমেজাজ সেদিন ভীষণ খারাপ। কেননা তাঁর দূত ছোকরা খানিক আগে জানিয়েছে যে, মিষ্টি কাজী তার দেশে একটা কাগজে 'হবু রাজা কাঁচকলা খায়' নামে একটা কবিতা ছাপিয়াছে। এমন সময় কাঁঠালটা দেখে ডাকলেন —সান্ত্রী। মোহিতলাল অবশ্য খাজাঞ্চির বদলে সান্ত্রীকে ডাকতে দেখে কিছু অবাক হলেও চুপ করে ছিল। সান্ত্রী এলে রাজা বোমার মত ফাটলেন—কি এত লোভ। এই শোন, এক্ষুণি কাঁঠালটা ওর মাথায় ভাঙ্গ। তারপর লাঠি মারতে মারতে দূর করে দে।

যা হবার হোল। মাথায় কাঁঠাল ভাঙা নিয়ে আর সান্ত্রীর লাঠি খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে মোহিতলাল নাকে খত দিল আর কোনদিন জীবনে লোভ করবে না।

আর হবু রাজার রাজসভা? পাত্র মিত্র সবাই ঘাড় দুলিয়ে বলতে লাগল—সাধু! সাধু! মহারাজ যোগ্য বিচারকই বটে।

নৈনিতাল ভ্রমণ

পূর্ণা মজুমদার

বয়স ১৫ বছর—গ্রাহক সংখ্যা ১৯২৪

পরীক্ষার মাঝখানে শুনলাম, আমরা দশদিনের জন্য নৈনিতাল যাচ্ছি—খুব আনন্দ হলেও যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। যাইহোক দেখলাম গোছগাছ শুরু হয়েছে এবং সত্যিই ছুটি হবার পরদিনই আমরা সদল-বলে 'শেয়ালদা পাঠানকোট এক্সপ্রেসে' চড়ে রওনা দিয়েছি—তখন যেন বিশ্বাস হোল ঠিকই 'আমাদের যাত্রা হোল শুরু'!

ট্রেন চলতে শুরু কোরল, ক্রমশঃ বিহারের লালমাটির দেশ পার হয়ে, কখন যেন উত্তর প্রদেশের রুক্ষ অথচ উর্বর ভূমিতে প্রবেশ করেছি খেয়াল নেই—দেখা গেল লক্ষ্মৌ স্টেশনে ঢুকেছি। এখানে রাত

৮টায় আমাদের আবার ট্রেন বদল করে 'নৈনিতাল এক্সপ্রেসে' কাঠগোদাম অভিমুখে যেতে হবে। কাঠগোদামে পৌঁছলাম বেলা ৮ টায় কিন্তু ভোর থেকেই আমরা সবাই উৎসুক আগ্রহে জেগে বসলাম গাড়ী ঘুরে ঘুরে পাহাড়ে উঠছিল দেখতে খুব ভাল লাগছিল। কাঠগোদামে নেমে একটা ট্যাক্সীতে নৈনিতাল যাবার জন্য রওনা হলাম। গাড়ীতে যেতে প্রায় দুঘণ্টা লাগে, বেশ একটু ঠাণ্ডা লাগছিল। পাহাড়ে আমি আর একবার গিয়েছি, মুসৌরি। খুব ভাল লাগছিল আমার। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, যে মুসৌরি খুব শুকনো জায়গা অথচ নৈনিতালে কত গাছপালা চারিদিকে সবুজ হয়ে আছে—কি অপূর্ব সেই দৃশ্য! আমরা যত ওপরে উঠছি নিচের কাঠগোদামে সেই ছেড়ে আসা স্টেশন নদী, বাড়ি ইত্যাদি খুব ছোট ছোট মনে হচ্ছিল। নৈনিতালের দিকে ক্রমশ উঠছি বুঝতে পারলাম। হোটেলে পৌঁছে স্নানাহার সম্পন্ন করে আমরা নৈনিতাল শহরটি দেখতে বেরোলাম। শহরটি ছোট- চারিদিকে পাহাড়ের গায়ে ওপর নিচে ধাপে ধাপে বাড়ি— মাঝখানে লেক্! রাত্রের-নৈনিতালের অপূর্ব দৃশ্য !!

রাত্রে লেকের জলে আলো ঝল্‌মলে ছোট শহরটির ছায়া পড়ে—আমাদের হোটেলের বারান্দায় বসে দেখতে খুব ভাল লাগত। সারাদিন হেঁটে হেঁটে বেড়িয়েও কোন ক্লান্তি অনুভব করিনি। সুন্দর লেক্‌টির চারিদিকেই চওড়া রাস্তা—হেঁটে বা ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানো যায়। নৈনিতালের দুটি ভাগ—শহরে প্রবেশ করার পথ হ'ল 'তাল্লিতাল',—সেখানে ছোট খাট বাজার ইত্যাদি ছাড়া বিশেষ কিছুই নেই, কিন্তু 'মাল্লিতাল'—বর্তমানে আস্তে আস্তে গড়ে উঠছে এবং এইখানেই 'সেক্রেটারিয়েট', 'স্কেটিং রিঙ্ক', বড়াবাজার, সুন্দর বাগানবাড়ির মতন বড় বড় হোটেল ইত্যাদি আছে।

দু একদিন পর আমার কাকু এবং ছোড়দা নৈনিতালের বিখ্যাত এবং সবচেয়ে উঁচু 'নৈনা' পাহাড়ের চূড়ায় চড়েছিলেন। সেই পাহাড়ের উচ্চতা ৮০০০ ফিটের চেয়েও বেশি। শুনেছিলাম রাস্তা খুব খারাপ তাই তখন আমার যাবার সাহস হল না, কিন্তু পরে ওদের কাছে দূরে তুষারমণ্ডিত নন্দাদেবী, ত্রিশুল ইত্যাদি চূড়া দেখতে পাওয়া যায় শুনে. আমারও খুব পাহাড়ে চড়বার ইচ্ছা জাগল। তাই পরের দিন আবার আমরা সকলেই 'স্নো-ভিউ' পাহাড়ে উঠলাম। এই পাহাড়টির উচ্চতা অবশ্য অত বেশি নয় ও রাস্তাও বেশ ভাল। কিন্তু দুঃখের বিষয় একটু বেলা হয়ে যাওয়াতে আর মেঘে ঢেকে যাওয়াতে কোনো তুষারমণ্ডিত পাহাড়ের দৃশ্য দেখা গেল না।—তবে ৭০০০ ফিট ওপরের দৃশ্যও কিছু কম সুন্দর ছিল না।—আমরা সেটুকু দেখেই তৃপ্তি পেলাম।

এরমধ্যে একদিন টুরিস্ট বাসে করে আমরা রাণীক্ষেত গেলাম। রাণীক্ষেত যাবার রাস্তাটি বড় চমৎকার—পাহাড়ের গা বেয়ে ঘুরে ঘুরে রাস্তা চলে গেছে। সেই পাহাড়ের গায়েই চাষীরা ক্ষেত করেছে —'নৈনিতাল আলু'র ক্ষেত, ধানের ক্ষেত। একে বলে 'Terrace Farming' দেখেই বুঝলাম শহরটির নাম 'রাণীক্ষেত' কেন হয়েছে।

রাণীক্ষেত যাবার পথে বিখ্যাত ভাওয়ালী স্যানিটোরিয়ামের পাশ দিয়ে গেলাম। অবশেষে ৬৫০০ ফিট উঁচুতে রাণীক্ষেতে পৌঁছলাম। সেখানকার সর্বোচ্চ জায়গা 'গল্‌ফ্‌-কোর্স' থেকে দূরে আবছায়া হিমালয়ের চূড়া দেখা গেল। চারিদিকে পাইন গাছের জঙ্গল—লম্বা লম্বা পাইন গাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে

আছে—হাওয়ায় তার পাতায় পাতায় কি অদ্ভুত শন্‌শন্‌ শব্দ। নৈনিতাল, রাণীক্ষেত এই দুটি জায়গাতেই একটি দৃশ্য আমায় বড় চোখে লেগেছিল আমাদের দেশে যেমন পথে ঘাটে পেয়ারা গাছ—ওখানে সেইরকম 'খোবানি'র গাছ—ফলে নুয়ে পড়েছে। আমরা খুব পাকা পাকা খোবানি খেয়েছিলাম।

আমাদের ফেরার দিন এসে গেল। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও নৈনিতালের সেই সুন্দর পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে আবার আমরা নিচে নেমে এলাম। যদিও মোটে দশদিন নৈনিতালবাস তবু তার সেই স্মৃতিটুকু বহুদিন অবধি আমার কাছে অম্লান হয়ে থাকবে।

ধাঁধার উত্তর

(১)

উদয়ন মুখোপাধ্যায়—বয়স ১০ বছর—গ্রাহক সংখ্যা ২২৫৭

ক। বিছানা।

খ। বুলবুল।

গ। সন্ন্যাসী বললেন ঘোড়া বদল করে নিতে তাহলে দুজনেই অন্যের ঘোড়া চেপে দুটোই আগে চালাতে চেষ্টা করবে!

(২)

শুভ্রা বিশ্বাস—বয়স ১৪ বছর—গ্রাহক সংখ্যা ২০২৯

ভাস্কোডাগামা।

(৩)

শশাঙ্কশেখর সেন—বয়স ১০ বছর—গ্রাঃ নং ১৯৯

ক। জামরুল। খ। চড়ক।

নতুন ধাঁধা

(১)

অনীতা চট্টোপাধ্যায়—বয়স ১২ বছর—গ্রাঃ নং ২২৩৯

দুইজন ভদ্রমহিলা পথ দিয়ে যাচ্ছেন।

একটি পথিক জিজ্ঞাসা করল—আগে যান উনি তোমার কে হন?

পিছনের মহিলা উত্তর দিলেন—আমার শ্বশুর ওর শাশুড়ীকে মা বলে ডাকেন।

ভদ্রমহিলা দুটি কে কার কি হন বল ত?

মজার খেলা

গৌতম কুমার বেরা

গ্রাহক নং—২১১৬ বয়স, ১৫

আমি একদিন কয়েকটি পুরাতন 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা উল্টাচ্ছিলাম, হঠাৎ একটি মজার খেলা চোখে পড়ল, সেই খেলাই বলছি :—

১২৩৪৫৬৭৯ এই রাশিটি লিখ।

এবার এই রাশিটির যে কোনো সংখ্যা আমাকে বল। ধর ৭।

এবার ৭কে ৯ দিয়ে গুণ কর। হল ৬৩।

তারপর—১২৩৪৫৬৭৯ কে ৬৩ দিয়ে গুণ কর।

১২৩৪৫৬৭৯
× ৬৩
৩৭০৩৭০৩৭
৭৪০৭৪০৭৪
৭৭৭৭৭৭৭৭৭

যে সংখ্যাটাই ধরবে তাকে ৯ দিয়ে গুণ করে যে গুণফল পাবে তাই দিলে (১২৩৪৫৬৭৯) কে গুণ করলেই দেখবে যে, যে-সংখ্যাটা ধরেছিলে, গুণফলের প্রত্যেকটি সংখ্যাই তাই হয়েছে !

অর্থাৎ যদি ধর ৩। তাহলে ৩ × ৯ = ২৭ ; ঐ সংখ্যাকে ২৭ দিয়ে গুণ করলে হবে ৩৩৩৩৩৩৩৩৩।

মাঘ মাসের সন্দেশের ছবি

(১) মজার ধাঁধার উপর যে গ্রামের দৃশ্যটি ছাপা হয়েছিল, সেটা এঁকেছে—১৪৬০ গ্রাহিকা কেয়া বসু—বয়স ১৩ বছর।

(২) ৭৪৭ পৃষ্ঠার তলায় (বাঁদিকে) গরু কে গোয়ালা জাব দেবার ছবি এঁকেছে অরুণ রায়, বয়স ১২½ গ্রাহক নং ২৭৩৩।

গ্রাহকদের আঁকা আরো অনেক ছবি মনোনীত হয়ে রয়েছে। এ বছর আর ছাপাবার সময় হল না আগামী বছরে ক্রমে ক্রমে বেরোবে।

বসন্তে

জীবন সর্দ্দার

২১শে মার্চ দুটি ঘটনা ঘটেছে। ঘটনা দুটি আকর্ষণীয় আমাদের কাছে:

এক। সেদিন দিনরাত্রি সমান হয়েছিল। আর, দুই। সেদিন ভূ-বিষুবরেখা সূর্য বরাবর ছিল, তারপর থেকে উত্তর-গোলার্ধ সূর্যের দিকে হেলছে।

ফল: উত্তর গোলার্ধের জলহাওয়ায় পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। গরম পড়ছে, আর দিন বড় হচ্ছে—কয়েকটি কথায় জলহাওয়া পালটানোর বিরাট্ বিষয়টির অনেকখানি বলা হয়ে গেল। কিন্তু সব কথা বলা হ'লো না। কেননা, গরম পড়লে আর দিন বড় হবার সাথে সাথে আকাশে মাটিতে গাছে জলে আরও যে কত কিছু বদল হয়, সে কথাও বলতে হবে।

সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের কোন বদল হচ্ছে রোজ একটু করে। হেরফের হচ্ছে আকাশের রং ফেরায়। ক্লান্তিহরা বাতাস বইতে শুরু করেছে নতুন দিক থেকে। দক্ষিণের বাতাসের সাথে যেন বেল আর বকুল ফুলের যোগ আছে। চাঁপারও। সূর্যমুখী তারও—তবে গরম বাড়ার সাথে। আমের গাছে মুকুল দেখেছি কদিন আগে থেকেই। আর দেখেছি কাককে বাসা বানাতে। উঁচুতে বসে শিষ দিচ্ছে দোয়েল। কোকিলের ডাক শুনে থেমে গেলাম পথের মাঝে। এদিকে সেদিকে ঘুরে ফিরে নজর এলো শিরীষ মাদার শিমুল পলাশ গাছগুলো রঙীন হয়ে উঠেছে ফুলে। পাতা ঝরে নতুন পাতায় কিংবা ফুল ফুটে ভরে উঠেছে আরও কত গাছ।

[প্রকৃতি-পড়ুয়াদের অজানা নয় যে নতুন পাতা এলে গাছে সেবার ফল ধরবে না। কেননা, আলো আর হাওয়া থেকে গাছের রস মিশিয়ে পাতা যেটুকু খাবার তৈরী করে, গাছের 'খিদে' মিটিয়ে বেশি না থাকলে ফলের 'প্রয়োজন' মিটবে না। তাই নতুন পাতা মানে ফলের আশা নেই। অবশ্য একই সঙ্গে গাছের এক ডালে নতুন পাতা অন্য ডালে ফল ধরতে পারে।]

দিন আর রাত্রি—কথা দুটিকে আলো আর অন্ধকার মনে ভেবে দেখলে, সমস্ত ঘটনাটি, আগে যা বলেছি, তার অর্থ পরিষ্কার হয়ে যাবে। ফুল পাখি গাছ পোকা মাছ ফল সব কিছুই কতক্ষণ আলোতে থাকবে আর কতক্ষণ অন্ধকারে তা দিয়েই অনেকখানি ঠিক হয় তারা কে কখন আসবে যাবে আলোর সাথে তাপ তাপের সাথে আবহাওয়ার কথা মনে রাখতে ভুল যেন না করি।

আমি কয়েকটি ফুলের নাম পাখির নাম গাছের নাম করেছি আগে, যাদের দেখেছি ঠিক একুশে মার্চের কদিন আগে থেকে কদিন পর পর্যন্ত। কারণ হিসেবে বলতে চেয়েছি, দিন বড় হওয়া আর শীত কমে গিয়ে তাপ বেড়ে যাওয়ার সাথে ওদের 'দেখা দেবার' যোগ আছে। যোগ আছে বলেই 'হাওয়া বদলের' সাথেই, যারা আগে ছিল না, অথচ এই হাওয়াতে যারা প্রাণ পায় তারা দেখা দিল। আর যারা এসেছিল সারা শীত ধরে, এখন এই আলোয় তাপে থাকতে না পেরে তারা এবার বিদায় নেবে। কিন্তু প্রাণের সাড়া থেমে যাবে না। যেমন ছিল তেমন থাকবে না অন্য রকম অন্য কিছু তার জায়গা নেবে।

এই বসন্তে খুঁজে দেখে মেঠোখসড়ায় লিখে রাখো—কি কি এলো বা গেল। তারপর, পরের পর ঋতুতে তা মিলিয়ে নাও। আসছে বছর বসন্তে দেখবে তোমার মেঠোখসড়ার পাতা ভরে উঠেছে নতুন কত প্রাকৃতিক খবরে।

: দুটি প্রকৃতি পড়ুয়ার পরিবেশ :

১। **প্রপ অশ্রুকুমার মণ্ডল,** ২৪ পরগনার রঘুনাথপুর গ্রাম থেকে লিখেছে :

আমাদের গ্রামের পূর্বদিক দিয়ে একটা নদী চলে গেছে—তার নাম ইছামতী। ঐ ইছামতীরই একটি শাখা আমাদের বাড়ির একেবারে পাশ দিয়েই চলে গেছে। এ নদীর জোয়ার ভাঁটা আমাদের খেলার সাথি। আমাদের বাড়ির ছাদে উঠে, ধানচাষের পর পূবদিকে তাকালে স্বপ্নের মত মনে হয়। বর্ষায় সবুজ দিগন্ত, হেমন্তে সোনালী। দক্ষিণে আছে কয়েকটা ছোট ছোট বাগান। বাগানে নানা জাতের গাছ আছে। গরমে গাছের তলায় বসে দেখি দূরে ফাঁকা মাঠে কড়া রোদে কেমন ঝিলিমিলি ধোঁয়া ওঠে। বর্ষায় একটু অসুবিধা, রাস্তায় কাদা। এই অসুবিধাটি ছাড়া বর্ষাকে আমার ভালো লাগে। কতকিছু দেখতে পাই। মাছ পোকা পাখি, নদীর ধারে জলার ফুল। শরতে মাঠ সবুজ ধান গাছে ভরা চারি দিকে সাদা সাদা ফুল (জলার), মাঠ ঘাট জলে টৈটম্বুর—সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

২। **প্রপ পবিত্রকুমার বসু** নদীয়া জেলার অঞ্জনগড় গ্রাম থেকে লিখেছে: আমার চার পাশের একটি প্রাকৃতিক বিবরণ যদি পঁচিশ বছর আগে লিখতাম তবে এই রকম দাঁড়াত উপরে নীল আকাশ তার নীচে ধুধু মাঠ। মাঠে বাবলা খেঁজুর জাতীয় গাছ আর কাঁটা গাছের ঝোপ। গ্রামের ওপর দিকে অঞ্জনা নামে একটি নদী আছে। নদীটি তখন খরস্রোতা ছিল তবুও তখন এখানে চাষবাস হতো না। ঘরবাড়ি ছিল না কারো। এখন সেই বিশাল প্রান্তরে কত গাছ কত বাড়ি। মাঠ জুড়ে কত কিছুর চাষবাস হচ্ছে। ধান পাট আখ মেস্তা অড়হড় আরও কত শাকসব্জী। গ্রামের গাছপালা গুলোর বয়স বেশী নয়। আম জাম কাঁঠাল লিচু এমনি প্রায় সবরকম ফলের গাছ আছে। জবা গোলাপ স্থলপদ্ম বেল জুই গন্ধরাজ আর ও অনেক ফুলের গাছ আছে অনেক বাসায়। শালিক পায়রা চড়াই পাখিরা ত আছেই, কাঠঠোকরা বুলবুল দোয়েল, হলদেপাখি হাঁড়িচাচা কানকুও আর

কয়েক রকম প্যাঁচাও দেখতে পেয়েছি। এদের সাথে গাছে গাছে কাঠবিড়ালী। আগে অঞ্জনা ছিল খরস্রোতা এখন তাতে জল নেই। খড়ে নদীতে বাঁধ দেওয়ায় এ নদীতে জল নেই। এখন অঞ্জনা শুকিয়ে খট্‌খটে হয়ে গেছে। বর্ষাকালে যখন খুব বৃষ্টি হবে তখন অঞ্জনা নদীতে আবার জল বাড়বে। তখন নদীর আশেপাশের বাড়ি, গাছপালা মাঠ নীল আকাশ মিলিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য হবে খুব সুন্দর।

পাখির পরিচয় : দোয়েল

ছবি : শর্মিলা রায়

সাদা কালো একটি পাখি বসন্তকালের শুরু থেকে বর্ষাকালের শেষ অবধি, উঁচু কোন খুটির মাথায় বসে, ডালে বা তারে বসে সকালে আর সন্ধ্যায় আপন মনে শিষ দেয় চড়া সুরে। পাখিটির মাথা ঘাড় গলা বুক পিঠ লেজের মাঝখানটা চকচকে কালো। কালো কালো পা, ঠোঁটও কালো। বাকি সব সাদা। মেয়ে পাখিটির কালোর বদলে ফ্যাকাসে। পাখিটাকে কোথাও বলে দহিয়াল, কোথাও বলে পাপিহরা। আমরা বলি দোয়েল। লেজটা পিঠের উপর তুলে মাটিতে নেবে লাফিয়ে লাফিয়ে পোক ধরে খায়। দুরন্ত বেগে উড়ে গিয়ে উড়ন্ত পোকা ধরে খায় কোথাও বসে। লেজটা কখনো নামিয়ে, ছড়িয়ে, কখনো গুটিয়ে তুলে সে খাওয়া সারে। শহরে বা গ্রামে সারা বাড়ির বাগানে ঘুরে বেড়াতে সে ভয় পায় না। বাসা বাঁধে গাছের কোটরে বা উঁচু দেয়ালের ফোকরে শুকনো ঘাস খরকুটো ঝরাপালক এসব দিয়ে। মার্চ থেকে জুলাইএর মধ্যে খোঁজ নিলে তিনচারটে সবজেটে ছিট্ ছিট্ ডিম সে বাসায় দেখতে পাবে। মিষ্টি সুরে দোয়েলের মত শিষ দিতে পারে এমন পাখি কমই আছে।
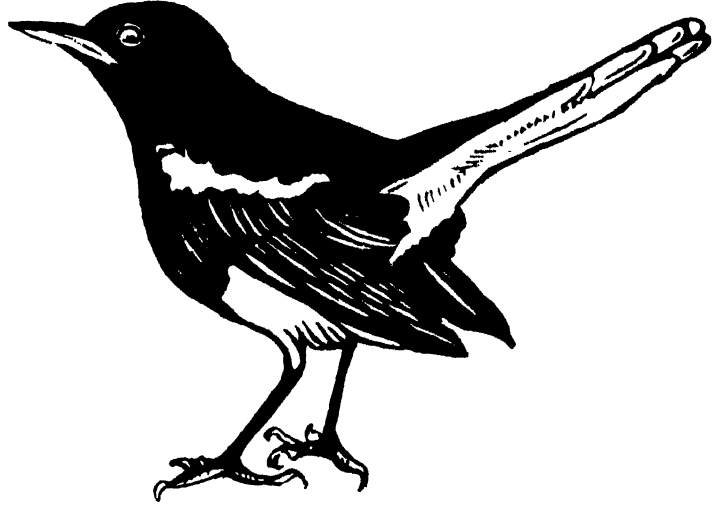
মাইথন ড্যাম

চন্দ্রশেখর গোস্বামী

দূর দূর যদ্দুর দৃষ্টি চলে—
নীল নীল ঝিলমিল আকাশতলে
কল কল উচ্ছল
চঞ্চল ঘোলাজল
করছে খেলা, খোলা দিগঞ্চলে।
দূর দূর যদ্দুর দৃষ্টি চলে॥

শুয়ে আছে বরাকর নদের 'পরে
পাহাড়িয়া অজগর কলেবরে।
ঘরে ঘরে আলো জ্বলে
কারখানা কল চলে
মানুষের সভ্যতা মাথায় ধরে—
মাইথন ড্যাম শুয়ে নদীর 'পরে॥

(সমুদ্রের তলদেশ সম্বন্ধে জানবার জন্য স্ট্র্যাটফোর্ড জাহাজ সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল, তারপরে আর ফিরে আসেনি। এই অভিযানের নেতা ছিলেন মহাপণ্ডিত ডঃ ম্যারাকট ও জাহাজের অধিনায়ক ক্যাপটেন হাওসি। সঙ্গে ছিলেন বিখ্যাত প্রাণিবিদ মিঃ সাইরাস হেডলি, ইঞ্জিনিয়ার বিল স্ক্যানল্যান ও আরো ২০ জন।

স্ট্র্যাটফোর্ড জাহাজ থেকে হেডলি তাঁর বন্ধু জেমস্ ট্যালবটকে লেখেন যে একটি বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের তলদেশে অনুসন্ধান চালানই হল ম্যারাকটের উদ্দেশ্য।

স্ট্র্যাটফোর্ড জাহাজ রওনা হবার কয়েকদিন পর, ৩রা অক্টোবর, 'আরোইয়া' জাহাজের গ্রাহক যন্ত্রে এক অদ্ভুত বেতারবার্তা ধরা পড়ে—'ঝড়ে জাহাজ কাত। হয় ত আর আশা নেই। ম্যারাকট, হেডলি, স্ক্যানল্যান আগেই গেছেন। ব্যাপার অবোধ্য। ওলনতারের আগায় হেডলির রুমাল। ঈশ্বর ভরসা। এস্ এস্ স্ট্র্যাটফোর্ড।'

৫ই জানুয়ারি আরাবেলা নোউলস্ নামক জাহাজ হাল্কা গ্যাসে ভরা এবং বিশেষ উপাদানে তৈরি একটি ঝকঝকে গোলকের ভিতর হেডলির দ্বিতীয় চিঠিতে এক অত্যাশ্চর্য বিবরণ জানতে পারে;

জানা যায় যে এক ঝুলন্ত খাঁচার মতন যন্ত্রের সাহায্যে ম্যারাকট, হেডলি ও স্ক্যানল্যান আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের তলায় এক গভীর খাদের ধারে অনুসন্ধান চালাচ্ছিলেন। জাহাজের সঙ্গে তাঁদের নলের

মধ্য দিয়ে টেলিফোন যোগাযোগ ছিল। হঠাৎ রাক্ষুসে কাঁকড়া ও চিংড়ির মাঝামাঝি একটা জীব দাঁড়া দিয়ে সেই যোগাযোগ ছিন্ন করে দেবার পর তাঁরা খাঁচাশুদ্ধ সেই সুগভীর খাদের মধ্যে পড়তে লাগলেন। পাঁচ মাইলের ওপর নামাবার পর খাঁচা যেখানে থামল, সেখানে স্নিগ্ধ এক আলোর মধ্যে তাঁরা এক বিলুপ্ত নগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেলেন। অক্সিজেনের অভাবে যখন তাঁরা মৃত প্রায় তখন জানলা দিয়ে হঠাৎ দেখতে পেলেন একটা মানুষের মুখ!)

(পাঁচ)

'একি আমার মস্তিষ্ক বিকার? ম্যারাকটের কাঁধ খামচে ধরে সজোরে নাড়া দিলাম। তিনি সোজা হয়ে বসে সেই দৃশ্য দেখে হতভম্বের মত চেয়ে রইলেন। তিনিও যখন সেটা দেখতে পাচ্ছেন তখন নিশ্চয়ই সেটা আমার ভুল নয়। মুখখানা লম্বাটে, রোগামত, রংটা একটু ময়লা, আর তাতে ছোট ছুঁচাল দাড়ি। চোখ দুটি উজ্জল, তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমাদের অবস্থাটা সে বেশ খুঁটিয়ে দেখে নিল। আশ্চর্য সেও কম হয়নি, তার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল। আমাদের আলোগুলি তখন পুরোদমে জ্বলছিল। দৃশ্যটা তার চোখে খুবই আশ্চর্য আর অদ্ভুত লেগেছিল সন্দেহ নেই। এদিকে নিঃশ্বাসের কষ্টে ততক্ষণে ম্যারাকট্ ও আমার দুজনেরই হাত চলে গেছে আমাদের গলার কাছে, দুজনের বুক উঠছে পড়ছে হাপরের মত। আগন্তুক আমাদের দিকে একবার হাত নেড়েই তাড়াতাড়ি চলে যেতে লাগল।

ম্যারাকট চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আমাদের ফেলে চলে গেল!'

আমি বললাম, 'কিংবা হয়ত লোক ডাকতে গেল। স্ক্যানল্যানকে কোচের উপর তোলা যাক্, নিচে পড়ে থাকলে বেচারা মারা যাবে।'

স্ক্যানল্যানকে আমরা ধরাধরি করে সেটির উপর টেনে তুলে মাথাটাকে কুশনের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখলাম। তার মুখের রং তখন পাঁশুটে হয়ে গেছে, বিকারের ঘোরে বিড় বিড় করছে।

ভাঙ্গা গলায় বললাম, 'এখনও আমাদের আশা আছে।' কিন্তু একি, আমার গলা? এত বিকৃত?

ম্যারাকট চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কিন্তু এ পাগলামি! সমুদ্রের তলায় মানুষ থাকবে কি করে? এ সামূহিক মতিভ্রম, আমরা দুজনেই এক সঙ্গে পাগল হয়ে যাচ্ছি।'

সেই অপার্থিব বিষণ্ণ আলোয় চারিদিকের নির্জন নিরানন্দ দৃশ্যের দিকে চেয়ে মনে হল হয়ত ম্যারাকটের কথাই ঠিক। তারপরেই দেখলাম যেন দূরে ছায়ার মত কি বা কারা আসছে। ক্রমে ছায়াগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠে মানুষের মূর্তি নিলে। এক দল লোক সমুদ্রের মেঝের উপর দিয়ে তাড়াতাড়ি আমাদের দিকে আসছে। একটু পরেই তারা আমাদের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে আঙুল বাড়িয়ে আমাদের দেখতে লাগল আর হাত নেড়ে নিজেদের মধ্যে ইশারায় পরামর্শ করতে লাগল। দলের মধ্যে একজনকে দেখতে বেশ মাতব্বর গোছের। জবরদস্ত চেহারা, প্রকাণ্ড মাথা, আর মুখে ঘন দাড়ি। সে আমাদের ইস্পাতের গোল খাঁচাটার চারিদিক চট্‌পট দেখে নিল। আমরা যে গম্বুজটার উপর নেমেছিলাম, খাঁচার

তলাটা তার থেকে অনেকখানি বেরিয়ে থাকায় সে সহজেই দেখতে পেল যে খাঁচাটার তলায় একটা কব্‌জাওয়ালা ছোট দরজা আছে। তার কথায় একজন ছুটে কোথায় গেল আর সে নিজে আদেশের ভঙ্গীতে বার বার ইসারা করতে লাগল দরজাটা খুলতে।

আমি বললাম, 'মন্দ কি, এমনি তো দম আটকে মরছি, অমনি না হয় ডুবে মরব।'

ম্যারাকট বললেন, 'আমরা ডুবে না মরতে পারি। নিচে থেকে জল ঢুকলে ভিতরকার ঘন হাওয়ার চাপ ঠেলে বেশিদূর উঠতে পারবে না। স্ক্যান্‌ল্যানকে একটু ব্র্যাণ্ডি দাও, এক বার শেষ চেষ্টা করব।'

আমি স্ক্যান্‌ল্যানের গলায় খানিকটা ব্র্যাণ্ডি ঢেলে কোনো মতে গিলিয়ে দিলাম। সে ফ্যাল ফ্যাল করে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। ম্যারাকট আর আমি ধরাধরি করে তাকে 'সেটি'র উপর সোজা করে বসালাম। তখনো তার ঘোরটা পুরোপুরি কাটে নি, যা হোক কোনোমতে তখনকার অবস্থাটা কয়েক কথায় আমি তাকে বুঝিয়ে দিলাম।

ম্যারাকট বললেন, 'ব্যাটারিগুলোতে যদি জল লাগে তাহলে কিন্তু ক্লোরিন-পয়জনিং হতে পারে। বাতাসের টিউবগুলো সব খুলে দাও, কারণ বাতাসের চাপ ভিতরে যতই বেশি হবে জল ঢুকবে ততই কম। এবার এস আমার সঙ্গে দরজাটাতে টান লাগাও।'

আমরা গায়ের সবখানি জোর লাগিয়ে টান মারতেই দরজার গোল কপাটটা খুলে গেল। আমার মনে হচ্ছিল যেন আত্মহত্যা করছি! সবুজ জল খাঁচার আলোয় চিক্‌মিক্ করতে করতে কল কল করে ভিতরে ঢুকতে লাগল। দেখতে দেখতে জল আমাদের পা পর্যন্ত উঠল, তারপর হাঁটু পর্যন্ত, তারপর কোমর পর্যন্ত—তার উপরে আর উঠল না। কিন্তু বাতাসের চাপ অসহ্য হয়ে উঠল। আমাদের মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল, কান ফেটে যাবার মত হল। এ অবস্থায় বেশিক্ষণ বাঁচা অসম্ভব। উপরের র‍্যাকটা আঁকড়ে ধরে কোনোমতে দাঁড়িয়ে রইলাম—যাতে জলের মধ্যে পড়ে না যাই।

'দাঁড়িয়ে থাকায় আমরা আর পোর্ট হোলের ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে দেখবার সুযোগ পাচ্ছিলাম না, আমাদের উদ্ধারের কি ব্যবস্থা হচ্ছে তাও বুঝতে পারছিলাম না। সত্যিই আমাদের বেরুবার যে কোনো উপায় হতে পারে এ একেবারেই কল্পনার অতীত বলে' মনে হচ্ছিল। হঠাৎ দেখি জলের ভিতর থেকে সেই মাতব্বর চেহারার লোকটি আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, তারপরেই সেই গোল দরজাটা পেরিয়ে এসে 'সেটি'র উপর আমাদের পাশে দাঁড়াল। মাথায় সে খাটো, আমার কাঁধের সমান, কিন্তু বেশ জোরালো চেহারা। তার বড় বড় পিঙ্গল আশ্বাসভরা দৃষ্টি আর সেই সঙ্গে যেন একটু কৌতুকের আমেজ। ভাবখানা যেন 'কি বাছাধনেরা, ভাবছ বুঝি এ যাত্রা আর রক্ষে নেই? যাক্ ভয় পেও না, আমি তোমাদের রক্ষার উপায় জানি।'

'এতক্ষণে আমি একটা অতি আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ করলাম। মানুষটির—যদি সে আমাদের মত মানুষই হয়ে থাকে—মাথা আর গা একটা স্বচ্ছ ঢাকনির ভিতর, কেবল হাত আর পা বাইরে। ঢাকনিটা এমন স্বচ্ছ যে জলের ভিতর সেটা দেখাই যায় না, কেবল এখন জলের বাইরে থাকাতে সেটা রুপোর মত

ঝক্‌মক করছিল। ঢাকনির ভিতর তার ছটি কাঁধের উপর ছটো বাক্সের মত কি যেন কাঁধের সঙ্গে গোল করে খাপ খাইয়ে বসানো। দেখতে কতকটা যেন সেনাপতিদের এপলেটের (epaulette) মত। বাক্সছটোর গায় অনেকগুলো করে ছেঁদা।

'আবার দেখি খাঁচার গোল দরজাটা দিয়ে আর এক জনের মাথা উঁকি মারছে। দরজার ভিতর দিয়ে কে একটা প্রকাণ্ড কাঁচের বুদ্‌বুদের মত জিনিস ভিতরে চালান করে দিল। তারপর আর একটা, আবার একটা। ক্রমে তিনটে সেই রকম জিনিস এসে জলের উপর ভাসতে লাগল। তার পর ছয়টি ছোট ছোট বাক্সও এল আর আমাদের এই অজানা জগতের নতুন বন্ধু সেগুলি সঙ্গের পেটি দিয়ে এক এক করে আমাদের প্রত্যেকের কাঁধে এঁটে দিলেন। তখন আমার মনে হতে লাগল যে এই আশ্চর্য লোকদের বেঁচে থাকার মধ্যে যে কোনো প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ আছে তা নয়। হয়ত ঐ ছটো বাক্সর মধ্যে একটার সাহায্যে কোনো নতুন উপায়ে অক্সিজেন তৈরি হয় আর অন্যটার সাহায্যে নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরুনো কার্বন ডাইঅক্সাইড্ গ্যাস্ শুষে ফেলা হয়। সেগুলো আঁটা হয়ে গেলে সেই স্বচ্ছ পোষাক কয়টি আমাদের মাথা গলিয়ে পরিয়ে দিলেন। সেগুলোর স্থিতিস্থাপক পটি আমাদের কোমর আর বগলের কাছে শক্ত হয়ে এঁটে বসল, একটুও জল যাতে ঢুকতে না পারে। তার মধ্যে আমরা অতি স্বচ্ছন্দে নিঃশ্বাস ফেলতে পারছিলাম। চেয়ে দেখি ম্যারাকট তাঁর কাঁচের পোষাকের ভিতর থেকে তাঁর সেই ধারালো উজ্জ্বল দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছেন। আর স্ক্যান্‌ল্যানের হাসি হাসি মুখ দেখে বুঝলাম এদের এই যন্ত্রের কৃপায় সে আবার এখন সেই আমুদে বিল্ স্ক্যান্‌ল্যান্। আমাদের উদ্ধারকর্তা আমাদের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন। তাঁর গম্ভীর ভাব সত্ত্বেও তিনি যে খুসি হয়েছেন তা বোঝা যাচ্ছিল। আমাদের ইসারা করলেন তাঁর পিছন পিছন খাঁচার ভিতর থেকে বেরিয়ে যেতে। আমাদের দরজা পার করিয়ে দেবার জন্য ডজন খানেক হাত এগিয়ে এল। সেই অচেনা হাতগুলি ধরে' আমরা সাগরজলের সেই অজানা রাজ্যে প্রথম পা দিলাম।

'ব্যাপারটা ভাবতে আমার এখনো অবাক্ লাগে। পাঁচ মাইল গভীর জলের তলায় আমরা তিনজন! কোনো কষ্ট নেই, দিব্য স্বচ্ছন্দে চলা ফেরা করছি। অনেক বিজ্ঞানী যা নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েছেন কোথায় সেই বিরাট জলের চাপ? আমাদের চারিদিকে যে রঙ বেরঙের মাছগুলি অক্লেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তাদের চেয়ে আমরা কিছু কম আরামে ছিলাম না। অবশ্য আমাদের শরীর সেই কাচের পোষাকের মধ্যে সুরক্ষিত ছিল। তবে আমাদের হাত-পাগুলো তো খোলা ছিল, হাত পায়ের চারিদিক ঘিরে বেশ একটু চাপ অনুভব করা ছাড়া আর কিছুই বোধ করছিলাম না, আর সেই চাপবোধটাও ক্রমে সয়ে যাচ্ছিল। সবাই একসঙ্গে দাঁড়িয়ে আমাদের ছেড়ে আসা গোল খাঁচাটার দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে মনে কি অপূর্ব বিস্ময়ই না জাগছিল। আলোর সুইচগুলো আমরা খোলাই রেখে এসেছিলাম, খাঁচাটার ছপাশ দিয়ে হলদে আলোর বন্যা ছুটছিল। সে এক অপরূপ দৃশ্য। জানলাগুলির কাছে মাছের ঝাঁক এসে ভিড় করছিল যেন এক এক টুকরো মেঘ। আমরা অবাক্ হয়ে এই সব দেখছি এমন সময়ে সেই নেতৃস্থানীয় লোকটি ম্যারাকটের হাত ধরে নিয়ে এগুলেন। আমরাও তাঁদের পিছন পিছন জলরাজ্যের

সেই 'জলার পাঁকের মধ্যে দিয়ে ভারী ভারী পা ফেলে চলতে লাগলাম।

'এই সময় হঠাৎ একটা ব্যাপার ঘটল যাতে আমাদের অদ্ভুতকর্মা নতুন সঙ্গীরা যেমন আশ্চর্য হল আমরাও তেমনি আশ্চর্য হলাম। প্রথমে আমাদের মাথার উপর অনেক উঁচুতে একটা ছোট কালো মত কি যেন দেখা গেল। আমাদের পৃথিবীর আকাশ যেমন নীল, এখানকার এই জলের আকাশ তেমনি কালো। এই কালো আকাশের ভিতর থেকে সেটা দুলতে দুলতে নেমে এসে আমাদের খুব কাছেই পড়ল। সেটা আর কিছুই নয়, 'স্ট্র্যাট্‌ফোর্ড'-এর সেই ওলন-তারের সীসা, যে অতল দেশের উদ্দেশে অভিযান তারই গভীরতা মাপার জন্য আমাদের পিছন পিছন এসে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু সেটা যে একেবারে আমাদের পায়ের কাছেই এসে পড়বে তা হয়ত জাহাজের লোকেরা ঘুনাক্ষরেও কেউ ভাবেনি। সীসাটা স্থির হয়ে সেই সিন্ধুমলের ভিতর পড়ে রইল, মনে হল সেটা যে তল পেয়েছে তা হয়ত'স্ট্র্যাটফোর্ড-এর লোকেরা টের পায় নি। ওলন-তারটা সোজা উপর দিকে উঠে গেছে, তার এ মুড়োয় আমরা আর ও মুড়োয় আমাদের জাহাজের ডেক্‌, মাঝখানে পাঁচ মাইল জলের ব্যবধান। আহা, যদি একটা চিঠি লিখে তারটার সঙ্গে বেঁধে দিতে পারতাম! কোনো রকমেই একটা বার্তা কি পাঠানো যায় না যাতে ওরা জানতে পারে আমরা এখনও সুস্থ দেহে বেঁচে বর্তে আছি? আমার কোটটা কাঁচের পোষাকে ঢাকা, কাজেই তার পকেট আমার নাগালের বাইরে। কিন্তু কোমর থেকে নিচের দিকে খোলা আর আমার রুমালটা দৈবাৎ প্যাণ্টের পকেটেই ছিল। ওলন তারের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রব্যবস্থার ফলে সীসাটা আপনি তার থেকে খুলে আসে। তার আগেই আমি রুমালটা বার করে সীসার একটু উপরে তারের সঙ্গে বেঁধে দিলাম। একটু পরেই দেখলাম আমার সাদা রুমালটি উপর দিকে ছুটে চলেছে, যে জগৎ হয়ত আর আমি কোনোদিন দেখতে পাব না রুমালটি সেই জগতে ফিরে যাচ্ছে। আমাদের নতুন আলাপীরা সেই পঁচাত্তর পাউণ্ড ওজনের সীসাকে গভীর কৌতূহলের সঙ্গে পরীক্ষা করল, শেষে সঙ্গে করে নিয়ে চলল।

গম্বুজগুলির পাশ দিয়ে এঁকে বেঁকে চলতে চলতে প্রায় দুশোগজ যাবার পর আমরা একটা দরজার সামনে এসে পৌছালাম। দরজাটি ছোট, চৌকো করে কাটা। তার দু পাশে থাম আর মাথার উপরে খোদাই করে কিছু লেখা আছে মনে হল। দরজাটা খোলাই ছিল, তাই দিয়ে ঢুকে আমরা একটা বেশ বড় খালি ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। দরজাটার কবাট শো কেসের কবাটের মত টানা ধরনের। দেওয়ালের গায়ে একটা হাতল, আমরা ঘরে ঢুকতেই সেটা ধরে টেনে দরজাটা বন্ধ করে দেওয়া হল মিনিট কয়েক দাঁড়ানোর পর মনে হল কোথাও একটা খুব জোরালো পাম্প চলছে। আমরা অবশ্য আমাদের কাঁচের পোষাকের ভিতর থেকে কোনও আওয়াজ শুনতে পেলাম না,কিন্তু দেখলাম আমাদের মাথার উপরে জলের দেয়াল নেমে দেখতে দেখতে আসছে। মিনিট পনের না যেতেই দেখি আমরা পাথরের টালি বসানো ভিজে মেঝের উপর দাঁড়িয়ে আছি, আমাদের নতুন বন্ধুরা আমাদের স্বচ্ছ পোষাকগুলি খুলতে ব্যস্ত। তার পরেই আমরা সেই ঘরে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে লাগলাম। ঘরটি আলোয় উজ্জ্বল আর বেশ গরম। অতলস্পর্শ সমুদ্রগহ্বরের বাসিন্দারা হাসিমুখে কথা বলতে বলতে আমাদের চারিপাশে ভিড় করতে

লাগল, তাদের হাত ঝাঁকানি আর পিঠ-চাপড়ানির চোটে আমরা অস্থির। তারা একটা অদ্ভুত ভাষায় কথা বলছিল, তার আওয়াজগুলি বেশির ভাগই অনেকটা যেন লোহার উপর উখা ঘষার মত। তার একটি কথাও আমাদের বোধগম্য হচ্ছিল না বটে, কিন্তু পৃথিবীর অন্তস্তলে জলের তলাতেও মানুষ মানুষের মুখের হাসি আর চোখের চাউনির ভাষা বুঝতে পারে। কাঁচের পোষাকগুলো দেওয়ালের গায়ে নম্বরওয়ালা কাঁটাতে ঝুলিয়ে রাখা হল। তারপর তারা কেউ বা আমাদের সামনে সামনে পথ দেখিয়ে, কেউ বা আমাদের একরকম ঠেলেই ভিতরের একটা দরজার দিকে নিয়ে চলল। সেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে আমরা একটা খুব লম্বা ঢালু বারান্দায় পড়লাম। 'দরজাটা বন্ধ করে' দেওয়া হল। তখন আর বোঝবার উপায় রইল না যে আমরা দৈবক্রমে আটলান্টিক মহা সমুদ্রের তলায় এক অজানা জাতির অতিথি, আমাদের আপন জগৎ থেকে চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন।

'অসম্ভব ধকলের পর হঠাৎ আরাম পাওয়াতে এবার আমরা ক্লান্তিতে যেন মরে যাবার জো হলাম। এমন কি বিল্ স্ক্যান্‌ল্যান্, যে কিনা একটি ছোটখাট হারকিউলিস্ বললেই হয়, সেও পা টেনে টেনে চলছিল। ম্যারাকট্ আর আমি তো আমাদের সঙ্গিদের উপর ভর দিয়ে চলতে পেয়ে বর্তে গিয়েছিলাম। তবু কিন্তু ওরই মধ্যে যতটা সম্ভব সব খুঁটিনাটি দেখে নিতে ছাড়ছিলাম না। বাতাসটা যে কোনো একটা যন্ত্রের সাহায্যে তৈরি হচ্ছিল তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, কারণ দেয়ালের গায়ে গোল গোল গর্ত দিয়ে দমকে দমকে বাতাস ভিতরে ঢুকছিল। দেখলাম ব্যাপ্ত বা ছড়ানো আলো চারিদিকে সমানভাবে বিছিয়ে রয়েছে। বুঝলাম ইউরোপের ইনজিনিয়ররা ল্যাম্প্ আর ফিলামেন্ট্ বাদ দিয়ে কেবল প্রতিপ্রভার সাহায্যে আলোক সৃষ্টির উপায় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন* এ তারই বড় রকমের একটা নমুনা। বারান্দার কানিসের উপর ঝোলানো কাচের লম্বা লম্বা টিউবের ভিতর এই আলো জ্বলছিল। বারান্দার শেষে একটা প্রকাণ্ড 'হল'। সেখানে পুরু গালিচা পাতা। গিল্‌টি করা কুর্সি আর ঢালু সোফা দিয়ে ঘরটি সাজানো, দেখলে যেন ইজিপ্‌শিয়ান্ সমাধি গৃহের মত ভাব আসে। তখন আর সকলকে বিদায় দিয়ে রইলেন কেবল আমাদের বন্ধু সেই চাপদাড়ি লোকটি আর তাঁর দুজন পরিচারক। তিনি নিজের বুকের উপর আঙুল ঠুকে কয়েকবার বললেন 'মাণ্ডা'। তারপর আমাদের এক এক জনের দিকে আঙুল দেখিয়ে ইসারায় আমাদের নাম জানতে চাইলেন। ম্যারাকট্, হেড্‌লে আর স্ক্যান্‌ল্যান্ এই নাম কয়টি নির্ভুলভাবে বলতে পারা অবধি বার বার উচ্চারণ করলেন। তারপর আমাদের বসবার ইঙ্গিত করে' পরিচারককে কি যেন বললেন। সে চলে গেল আর একটু পরেই একজন পাকা চুলদাড়ি-ওয়ালা খুব বুড়ো ভদ্রলোককে সঙ্গে করে' ফিরে এল। বৃদ্ধের মাথায় একটা কালো রঙের টুপি, তার উপরটা ক্রমশঃ সরু হয়ে গেছে। বলতে ভুলে গেছি, সকলেরই পরনে হাঁটু পর্যন্ত ঝোলা রঙীন পোষাক আর পায়ে মাছের চামড়ার কিংবা আর কোনোরকম আ-কষা চামড়ার উঁচু বুট। বোঝা গেল বৃদ্ধ ভদ্রলোক ডাক্তার, কারণ তিনি আমাদের শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করে' দেখলেন। তাঁর পরীক্ষার উপায় অতি সহজ, কেবল প্রত্যেকের কপালে হাত দিয়ে চোখ বুঁজে আমাদের শরীরের ভিতরকার

* কনান ডয়েল যখন এ গল্প লেখেন তখন সবে টিউব লাইটের জল্পনা কল্পনা চলেছে।

অবস্থার ছাপটা যেন তাঁর মনের মধ্যে এঁকে নিচ্ছিলেন। মনে হল পরীক্ষার ফলে তিনি একটুও খুশী হননি, কারণ তিনি আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন আর গুরুগম্ভীর চালে মাণ্ডাকে দু চারটি কথা বললেন। তাই শুনে মাণ্ডা তখনি আবার পরিচারকটিকে বাইরে পাঠালেন। এবার সে ট্রে'-তে করে' খাবার আর এক বোতল ব্র্যাণ্ডি এনে হাজির করল। আমরা এতই ক্লান্ত হয়েছিলাম যে সেগুলি কি তা আর চেয়ে দেখলাম না, কিন্তু খেয়ে শরীরটা চাঙ্গা হল। তখন আমাদের আর একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে তিনটি বিছানা পাতা, তার একটাতে আমি গা ঢেলে দিলাম! আবছা রকমের মনে পড়ে বিল্ স্ক্যান্ল্যান্ এসে পাশে বসল।

'সে বললে, 'এই ধর গিয়ে ইয়ার, ঐ কয় ঢোক ব্র্যাণ্ডির কুদরতেই টিকে গেলুম আর কি। কিন্তু এ আমরা এলুম কোথায় বল তো?'

'তুমি যা জান আমিও তাই '

'নিজের বিছানায় গিয়ে শুতে শুতে ঘুম-জড়ানো গলায় বিল্ বললে, 'এইবার লম্বা হলুম।'

'এর পর আর কিছু আমার কানে যায়নি। এমন অজ্ঞানের মত ঘুম আর কখনও ঘুমিয়েছি বলে' মনে পড়ে না।

ক্রমশঃ

সন্দেশ

১. প্রকাশের স্থান—কলিকাতা।

২. সময়—মাসিক।

৩. মুদ্রকের নাম—শ্রীঅশোকানন্দ দাশ।
জাতি—ভারতীয়।
ঠিকানা—১৭২/৩, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯।

৪. প্রকাশকের নাম—শ্রীঅশোকানন্দ দাশ।
জাতি—ভারতীয়।
ঠিকানা—১৭২/৩, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯।

৫. সম্পাদকের নাম—শ্রীমতী লীলা মজুমদার এবং সত্যজিৎ রায়।
জাতি—ভারতীয়।
ঠিকানা—৩০, চৌরঙ্গী, কলিকাতা—১৩ এবং ৩, লেক টেম্পল্ রোড, কলিকাতা-২৯

৬. সুকুমার সাহিত্য সমবায় সমিতি লিমিটেড।
১৭২/৩, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯।

আমি, অশোকানন্দ দাশ বিবৃতি দিচ্ছি যে উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে সম্পূর্ণ সত্য—ইতি অশোকানন্দ দাশ।

চিঠিপত্র

সন্দেশের আরেকটি বছর শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রিয় গ্রাহক গ্রাহিকাদের কয়েকটি মনের কথা বলি। নতুন বছরের কাগজে তোমাদের কয়েকটি ইচ্ছাও পূর্ণ করার চেষ্টা করব। প্রথমতঃ ছবিতে গল্প তোমরা ভালোবাস। এ বছরের বিশেষ সংখ্যাগুলিতে একটু বড় করে সাধারণ সংখ্যাতেও মাঝেমাঝেই ছোট করে, ছবিতে গল্প দেওয়া হবে।

তারপর চিঠিপত্রে তোমরা অনেক সময় বিজ্ঞানের আসর, সাধারণ জ্ঞানের আসর এ সব বিষয়ে প্রশ্নোত্তরের বিভাগের কথা লিখে থাকো। এবার থেকে এইরকম প্রশ্নোত্তরের বিভাগ থাকবে। তোমরা প্রশ্ন পাঠিও। তাই বলে সব প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া হবে একথা বলছি না। ভালো প্রশ্ন হলেই তার উত্তর দেওয়া হবে। ভালো প্রশ্ন পাঠিও।

অন্ততঃ দুটি করে ধারাবাহিক গল্প থাকবে। বড় বড় ছোট গল্পও মাঝে মাঝে থাকবে। প্রতি সংখ্যাতে গল্প সল্প থাকবে। এইতো গেল আমাদের চেষ্টার কথা। তেমনি তোমরাও আমাদের গ্রাহক বাড়াবার চেষ্টা করবে তো? এই পত্রিকার গোড়াতে যে কাগজ দেওয়া আছে, সেটি পড়ে দেখো। যারা গ্রাহক হতে চায়, তাদের অভিভাবকদের চিঠি পেলে ভালো হয়। গতবার অনেক ভি-পিতে পাঠানো পত্রিকা ফিরে এসেছিল। বোধহয় গুরুজনদের মত না নিয়েই তোমরা কেউ কেউ নতুন গ্রাহকের নাম—ঠিকানা দিয়েছিলে। প্রত্যেকে যদি একজন করে নতুন গ্রাহক করে দাও, তাহলেই আমাদের সব সমস্যা মিটে যায়।

সমস্যা বললাম, কারণ সন্দেশ বড় কষ্টে চলে। আমাদের লেখকরা, আমরা নিজেরা, বিনি পয়সায় খাটি, তবু আরো কিছু গ্রাহক না হলে এ ভাবে বেশিদিন কাগজ চালানো যাবে না। কাগজকে বাঁচাতে তোমরাও আমাদের সাহায্য করবে তো?

অনেক চিঠি আমরা পেয়ে থাকি, কিন্তু জানইতো সব চিঠির উত্তর দেওয়া যায় না। জায়গাও কুলোয় না, তাছাড়া নিতান্ত ব্যক্তিগত চিঠির উত্তর আসরে দেওয়া ঠিক নয়। মাঝে মাঝে উত্তর দেবার মতো কিছু থাকেও না। এবার কিছু চিঠির উত্তর দেওয়া যাক।

(১) শশাঙ্ক শেখর সেন—১৯৯, বয়স ১০

তোমার আর শুভ্রা বিশ্বাসের গ্রাহক সংখ্যা গোলমাল হয়ে গেছিল লিখেছ। ছাপার সময় হয়ে থাকবে। সেজন্যে আমরা দুঃখিত।

(২) অঞ্জন ভট্টাচার্য—২৩৬১, বয়স ১২

তোমার শুভেচ্ছায় আমরাও খুসি।

(৩) সন্দীপ সেনগুপ্ত—২৮০৪, বয়স ১৫

অঞ্জনের তেরোটি খেলার উপরে তুমি আরো যে কটি দিয়েছ সেগুলি এখানে ছাপলাম। যথা:—
(১) রাগবি (২) সফ্‌ট বল (৩) ওয়াটার পোলো (৪) স্নুকার (৫) বল ব্যাডমিণ্টন।

তাছাড়া দেশী খেলা 'কিং ও পিণ্টু'র নামটা কিন্তু পুরো দেশী নয়। কি করে খেলে তাওতো বললে না।

ভারতের বাইরের পত্রবন্ধুদের কথা কিন্তু আমরা জানি না।

(৪) বাণী সরকার, ২১৭৫, বয়স ১১

না ভাই, কবিতা ছুটি চলল না। আরেকটু ভালো করে ছোটদের উপযুক্ত করে লেখ না কেন?

(৫) অমিতাভ পাল, ২০১২, বয়স ১৪,

ভাই, কবিতা বা লেখা একটু ভালো হলেই ছাপা হয়। ভালো না হলে কি করে ছাপি বল? এবারেরটা মন্দ হয় নি, কিন্তু খুব মৌলিক বলে মনে হচ্ছে না।

(৬) নীতীশরঞ্জন নিশীথরঞ্জন ও সমীর গুহ ১৬০৩,

বয়স না দিলে কোনো কিছুই চলে না ভাই, সে তো তোমরা জানই।

(৭) কেয়া বসু, ১৪৬০, কারুবাকী ও বিপাশা দত্ত, ৮৯০

চিঠি পেয়ে খুসি হলেও, বয়স না দিলে উত্তর দেওয়া যায় না, ভাই।

(৮) অনীতা চট্টোপাধ্যায়, ২২৩৯, বয়স ১৩

না ভাই, ধাঁধাগুলির প্রথমটির উত্তর লিখতে নিজেই অসাবধানতা বশতঃ ভুল করলে চলবে কেন? দ্বিতীয়টি বড় পুরনো।

(৯) সুজাতা বিশ্বাস, ২০৩৭, বয়স ১৬

শারদীয়া সংখ্যার দাম ইত্যাদি প্রতি সংখ্যাতেই তো ছাপা হয়। একটু নজর করে দেখো।

পত্রবন্ধু চাই—শখ—ছবি আঁকা, গল্প লেখা, গল্পের বই পড়া।

(১০) জয়শ্রী, স্বাগতা, অরূপকুমার তরাত, ২০৮৬, বয়স ১২, ১০, ৭।

পত্রবন্ধু চাই। শখ—জয়শ্রীর:—গানবাজনা, গল্পের বই পড়া, ছবি আঁকা, লেখা।

স্বাগতার:—গল্পের বই পড়া, গল্প কবিতা লেখা।

অরূপের:—ডাকটিকিট সংগ্রহ ও বই পড়া।

(১১) ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, ২০০৪, বয়স ১৫

সে কি!! গত মাসেই তো নাম ছাপা হয়ে গেছে।

(১২) দেবাশিস ভট্টাচার্য, ২৫৫৪, বয়স ১৪

সন্দেশ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সালের এপ্রিল মাসে। প্রথম সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোর। তিনি লীলা মজুমদারের জ্যাঠামশাই ও সত্যজিৎ রায়ের ঠাকুরদাদা। সুকুমার রায় ১৯৫০ সালে সম্পাদক

হন। 'প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর' এই কথাগুলি উপরে লিখে, আমাদের অপিসের ঠিকানায় চিঠি পাঠাও। সংখ্যা ও বয়স দিও।

(১৩) দেবাশিস মৈত্র ২৩২২, বয়স ১১½

হাত পাকাবার আসরের লেখা খাতার পাতার এক পৃষ্ঠায় সাধারণ কালি দিয়ে লিখো। ছবি হলে, ড্রইং বুকের কাগজে অন্তত: পোস্টকার্ডের মাপে, ড্রইং কালি দিয়ে এঁকো। ছবিতে গল্পের ব্লক করার অনেক খরচ। সে কি আর হাত পাকাবার আসরে পেরে উঠব? কিছুদিন আগে জুল ভার্নের ধারাবাহিক গল্প প্রায় আড়াই বছর ধরে বেরিয়েছিল। সে কি তুমি পড় নি? তার নাম ছিল আশ্চর্য দ্বীপ, ৺কুলদারঞ্জন রায়ের অনুবাদ। ড্রপড্ ফ্রম দি ক্লাউডস্, দি মিস্ট্রিরিয়াস্ আইল্যাণ্ড আর দি সিক্রেট অফ দি আইল্যাণ্ড, তিনটি বই একসঙ্গে করে ঐ নামে ছাপা হয়েছিল। তোমার কাছে না থাকলে, বন্ধুদের কাছ থেকে পুরনো সংখ্যা জোগাড় করে পড়ে দেখো। ভালো লাগবে। শীঘ্রই সেগুলো বই হয়ে আবার বেরুবে—সন্দেশে বিজ্ঞাপন দেখতে পাবে।

(১৪) সোনালী লাহিড়ী, ১৮৬৩, বয়স ?

(১৫) জয়ন্তকুমার রায়, ২০৫১, বয়স ১৬, ধাঁধা চলল না ভাই। ভ্রমণ কাহিনী লেখ না কেন?

(১৬) ভাস্বতী দত্ত, ২৬৮৬, বয়স ১৩

প্রকৃতি পড়ুয়ার বিষয়ে ১২ নং চিঠিতেই জানতে পারবে। শাশ্বতীর নাম দিয়েছ, বয়স দাও নি কেন, ভাই?

(১৭) শুভ্রা মজুমদার, ২২১৫, বয়স ১০½

তোমার প্রথম ধাঁধাটি এখানেই দিলাম। চিঠির উত্তরে বন্ধুরা জবাব দিতে পারে।

দু অক্ষরে নাম ফলের, বাংলাদেশে ফলে।
পাকা ফল কত মিঠে দিয়ে দেখ গালে।
প্রথম অক্ষরটি ইংরেজি শব্দ হলে,
দ্বিতীয় অক্ষর তার মানে দেয় বলে।

'ফলে'র সঙ্গে 'গালে' কিন্তু মেলে না ভাই।

(১৯) সঙ্ঘমিত্রা চক্রবর্তী, ২২৮৭, বয়স ১২

সুকুমার রায় সত্যজিৎ রায়ের বাবা আর উপেন্দ্রকিশোর তাঁর ঠাকুরদাদা।

(১৯) শুভাশিস ধর, ২২০২, বয়স ১১½

ধাঁধার উত্তর বড় দেরিতে পেয়েছিলাম ভাই। হাত পাকাবার আসরে ধারাবাহিক জায়গা কুলোয় না।

(উত্তর পাঠাবার শেষ দিন ৩০শে এপ্রিল। উত্তর দাতারা ঠিক সময় নতুন বছরের চাঁদা পাঠাতে ভুলো না কিন্তু।)

ল	লা	ল	নী	ল
ম	লা	বে	য়ে	কা
ক	নি	গু	ছে	পী
বু	স	দে	সা	লা
জ	হ	ল	দা	গো

(১)

এই ঘরগুলির মধ্যে কোন একটি ঘর থেকে শুরু করে ঠিক মতন পর পর সব ঘরে যেতে পারলে অনেকগুলি রঙের নাম পাওয়া যাবে। মনে রেখো—

(ক) কোন ঘর ডিঙোতে পারবে না।

(খ) কোন ঘরে দুবার যেতে পারবে না।

(গ) কোন ঘর বাদ দিতেও পারবে না।

(ঘ) পাশাপাশি ডাইনে বাঁয়ে বা উপর নীচে যাওয়া চাই—কোনাকুনি গেলে চলবে না।

দেখ তো কয়টা রঙের নাম এইভাবে বার করতে পার।

(২)

রূপে তার আলো হয় চারিধার,
ল্যাজ্জা কেটে দেখ বেশি নয় আর,
পেট যদি কাট তবে লাগে বহু কাজে,
মাথা কেটে দিলে তবু ঝুমুঝুমু বাজে।

(৩)

সন্ন্যাসীর বরে রাজসরোবরের ঠিক মাঝখানে অপূর্ব-সুন্দর একটি মায়া কমল ফুটেছে। ফুলটির আশ্চর্য গুণ হল যে প্রতিদিন এটি বেড়ে আগের দিনের আয়তনের ঠিক দ্বিগুণ হয়ে যায়।

রাজপণ্ডিত হিসাব করে দেখেছেন যে ফুটবার ঠিক ২৩ দিন পরে পদ্মফুলটি বিরাট গোলাকার সেই সরোবরকে সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলবে।

বল তো আয়তনে সরোবরের ঠিক অর্ধেক বড় হতে পদ্মফুলটির কতদিন লাগবে?

ফাল্গুন মাসের ধাঁধার উত্তর

১। (ক) জাল (খ) কপি (গ) কদম (ঘ) বারণ।

২। কাগজ।

৩। বচন কারকুন, ফলন খাসনবিশ, পবন গাঙ্গুলি, মদন ঘোষ আর ভজন চট্টোপাধ্যায়।

কারকুন চেনে খাসনবিশ, ঘোষ ও চট্টোপাধ্যায়কে। খাসনবিশ চেনে কারকুন ও চট্টোপাধ্যায়কে। ঙ্গুলি চেনে কেবল ঘোষকে।

ঘোষ চেনে গাঙ্গুলি, কারকুন ও চট্টোপাধ্যায়কে আর চট্টোপাধ্যায় চেনে কারকুন, খাসনবিশ ং ঘোষকে।

এই ধাঁধার উত্তরের দুটো অংশ আছে, প্রথম কার কি পদবী এবং দ্বিতীয়—কে কাকে চেনে; তামরা অনেকে কেবল একটি অংশেরই উত্তর দিয়েছ, প্রথমটা, কিন্তু একটু হিসাব করে দেখলেই বুঝতে ব যে প্রথমটা বার করতে পারলে দ্বিতীয়টা অতি সহজেই বেরিয়ে আসবে।

দাতাদের নাম—

(বিশেষ দ্রষ্টব্য—এবার অন্যান্য বারের তুলনায় সঠিক উত্তরের সংখ্যা কম থাকাতে প্রথম ধাঁধায় তনটি ঠিক হলেই এবং তৃতীয় ধাঁধায় প্রথমাংশ ঠিক হলেই সঠিক উত্তর বলে ধরা হয়েছে)

দের সব কয়টি উত্তর ঠিক হয়েছে—

৫৭ শাশ্বতী দত্ত, ১৭৫ অনিতা রায়, ১৮১ মিষ্টি ও বাসবেন্দু গুপ্ত, ২৯৫ শম্পা ও শর্মিলা দত্ত, ১ অজন্তা ও বন্দিতা ঘোষ, ৩৯৩ নন্দিতা বন্দনা ও দেবাশীষ বরাট, ৮৩৮ সুপ্রতীক বাগচী, ৯৮৩

জ্যোতির্ময় ইন্দ্রানী ও ঈশানী মজুমদার, ১২৩২ নন্দিনী দত্ত মজুমদার, ১২৯৮ রুদ্রনাথ ঘোষ দস্তিদার ১৪০১ মহাশ্বেতা গঙ্গোপাধ্যায়, ১৪৪৫ পার্থপ্রতিম গুপ্ত, ১৪৬০ কেয়া বসু, ১৬১৩ ভারতী ও অভিনিত দে ১৬৫১ হাম্বির মজুমদার, ১৮৮৫ রীনা ও হেনা ভট্টাচার্য, ১৮৯৪ সুস্মিতা কাঞ্জিলাল, ১৯৩৮ লীনা মিত্র ২১৫৯ স্বাহা ও শুভস্বর বাগচী ২১৭৩ সায়ন্তন গুপ্ত, ২২১৫ শুভা মজুমদার, ২২৩৯ অনীতা ও প্রণ ট্টোপাধ্যায়, ২১৫৭ উদয়ন মুখোপাধ্যায়, ২৭৩৫ উৎপল ভট্টাচার্য।

যাদের দুটো উত্তর ঠিক হয়েছে—

১১৫ অর্পিতা, কিশলয় ও কিশোর চক্রবর্তী, ২৮৪ নূপুর ও মিঠু দাশগুপ্ত, ২৮৮ গোপা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৬৭২ শুভ্রাশিস গুহ, ১৮০৫ দেবাশীষ রক্ষিত, ১৮৬৩ সোণালী লাহিড়ী, ২০৩০ মিত্রা মুখোপাধ্যায়, ২০৭২ মৈত্রেয়ী ব্যানার্জী, ২০৯৩ দেবাশিস দত্ত, ২১৪২ স্বর্ণাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২২০২ শুভাশীষ র, ২৭৪০ সোণালী বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৮২৮ অস্মিতা সেনগুপ্ত।

একটি উত্তর ঠিক—

২২৬ জয়ন্ত ও প্রবালকুমার নন্দীরায়, ১৪৮১ উত্তমকুমার বটব্যাল, ২০৮৪ ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, ২৮৭ সর্বমিত্রা চক্রবর্তী, ২৫৪৪ সান্ত্বনা রায়চৌধুরী, ২৬৭৬ শুদ্ধেন্দু ও সৌমেন্দু গাঙ্গুলী।

টুন্‌টুনি

কমল গুপ্ত

টুন্‌টুনি পাখিটা আড়ে আড়ে থাকে—
উড়ে যায় কত পাখি কত ঝাঁকে ঝাঁকে
অদ্ভুত ডাকে।

টুন্‌টুনি কেঁদে ওঠে
মন ছোটে
কথা ফোটে
ফোটেনা ফোটেনা।
একদিন ঝ'রে প'ল শিকলি ঝড়েতে

টুন্‌টুনি নেচে ওঠে টুন্‌ টুন্‌ টুন
টুন্‌টুনি উড়ে গেল ঝড়েতে।